মিসির আলি অমনিবাস

হুমায়ূন আহমেদ

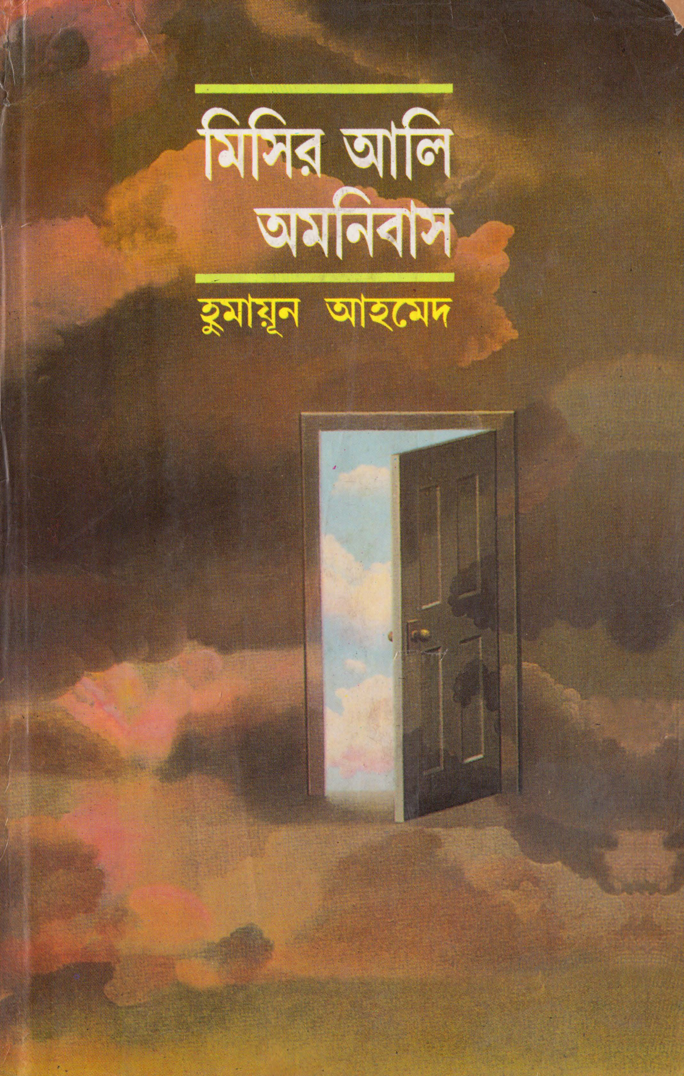

১

মিসির আলি অমনিবাস

হুমায়ূন আহমেদ

প্রতীক

মিসির আলি অমনিবাস
১

হুমায়ূন আহমেদ

১ মিসির আলি অমনিবাস হুমায়ূন আহমেদ

মিসির আলি অমনিবাস

এই পর্বে রয়েছে দেবী ■ নিশীথিনী ■ নিষাদ ■ অন্য ভুবন ■ বৃহন্নলা ■ ভয় ■ বিপদ ■ অনীশ ■ মিসির আলির অমীমাংসিত রহস্য।

সমকালীন কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে হুমায়ূন আহমেদ এখন জনপ্রিয়তার শীর্ষে। গ্রন্থজগতের পরিসংখ্যান বিগত কয়েক বৎসর যাবত এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করছে। এই কথাশিল্পীর সৃজনশীলতার ক্ষমতা ইতোমধ্যেই প্রায় কিংবদন্তীতুল্য।
কিশোরবয়সী থেকে বৃদ্ধ, স্বল্পশিক্ষিত থেকে বুদ্ধিজীবী পণ্ডিত—সকলেই তাঁর উপন্যাসের আগ্রহী পাঠক, অথবা টেলিভিশনের পর্দায় তাঁর কাহিনীর নাট্যরূপায়ণের বিমুগ্ধ দর্শক। কোন ক্ষমতায় এভাবে সকলকে কাছে টানেন হুমায়ূন আহমেদ? চিত্রল গতিময় সহজ ভাষাবিন্যাস। অভাবনীয় ঘটনা বিশ্বাসযোগ্যভাবে ঘটানোর মনোহারী কৌশল। কল্পনা হার মেনে যায় এমন অকল্পনীয় বিদ্যুন্নিভ সংলাপ। এবং তাঁর কাহিনীতে ছড়ানো জীবন কখনোই আমাদের চেনা মধ্যবিত্ত সমাজসত্যের বাইরে ছোটাছুটি করে না। মধ্যবিত্ত-জীবনের আশা-নিরাশা, অনিশ্চিতি এবং দোলাচলপ্রবণ মূল্যবোধ, তার সামান্য লাভ ও সামান্য ক্ষতির বন্ধনে আতুতিময় অস্তিত্ব। হুমায়ূন আহমেদের যে-কোনো উপন্যাস ধারণ করে আছে তাঁর সৃজনীসত্তার মনন-কল্পনার এ-সকল উপাদান। সাধারণ মানুষের কাতর জীবন চূর্ণকণায় ছড়িয়ে থাকে তাঁর লেখায়।
যখন প্রথম উপন্যাস 'নন্দিত নরকে' বেরোয়, তখন প্রথিতযশা অধ্যাপক ডক্টর আহমদ শরীফ লিখেছিলেন, "হুমায়ূন আহমেদ বয়সে তরুণ, মনে প্রাচীন দ্রষ্টা, মেজাজে জীবনরসিক, স্বভাবে রূপদর্শী, যোগ্যতায় দক্ষ রূপকার। ভবিষ্যতে তিনি বিশিষ্ট জীবনশিল্পী হবেন এই বিশ্বাস ও প্রত্যাশা নিয়ে অপেক্ষা করব।" এভাবেই যাত্রা শুরু হয়েছিল হুমায়ূন আহমেদের। তারপর ক্রমাগত পথচলার প্রবাহে একের পর এক সাহিত্যকর্ম উপহার দিয়ে চলেছেন এ-দেশের পাঠকসমাজকে। পণ্ডিত সমালোচক ও হৃদয়বান গল্পপ্রেমিক উভয়েরই প্রত্যাশা তিনি পূরণ করে চলেছেন।
একই সঙ্গে অতিপ্রজ অথচ শিল্পরুচিময় লেখক তাঁর মতো আর কেউ এই মুহূর্তে আছেন কি না সন্দেহ। প্রতি বৎসর অব্যাহত গতিতে তাঁর ফসলের ডালা ভরে উঠছে। প্রতীক প্রকাশনা সংস্থার আনন্দ ও গর্ব যে, হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাস ও সায়েন্স ফিকশান সমগ্রের মতো মিসির আলি অমনিবাসও প্রকাশ করতে পারল।

হুমায়ূন আহমেদের জন্ম ময়মনসিংহের মোহনগঞ্জ গ্রামে, ১৯৪৮ সালের ১৩ই নভেম্বর তারিখে। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ডাকোটা স্টেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পলিমার কেমিস্ট্রিতে গবেষণা করে ১৯৮২ সালে পি-এইচ.ডি. ডিগ্রী অর্জন করেছেন, বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নশাস্ত্রে অধ্যাপনারত। লেখক-জীবনে সাফল্যের প্রথম উল্লেখযোগ্য স্বীকৃতি পেয়েছিলেন অপেক্ষাকৃত নবীন বয়সে, ১৯৮১ সালে, 'বাংলা একাডেমী পুরস্কার' প্রাপ্তির মাধ্যমে। এ ছাড়াও তিনি পেয়েছেন শিশু একাডেমী ও লেখক শিবির পুরস্কারসহ আরো অনেক পুরস্কার।

মিসির আলি অমনিবাস

হুমায়ূন আহমেদ

মিসির আলি অমনিবাস ১

হুমায়ূন আহমেদ

প্রতীক

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩
দ্বিতীয় মুদ্রণ : জানুয়ারি ১৯৯৭
তৃতীয় মুদ্রণ : মে ১৯৯৮
পঞ্চম মুদ্রণ : জুলাই ২০০০

প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা ৪৬/২ হেমেন্দ্র দাস রোড সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০'র পক্ষে এফ. রহমান কর্তৃক প্রকাশিত এবং নিউ পুবালি মুদ্রায়ণ ৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০ কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : বিদেশী
তৈলচিত্র অবলম্বনে
আলমগীর রহমান

মূল্য : ২৭৫.০০ টাকা মাত্র

MISHIR ALI OMNIBUS BY HUMAYUN AHMED.
Published by PROTIK. 46/2 Hemendra Das Road Sutrapur, Dhaka-1100
Fifth Edition : July 2000 Price : Taka 275.00 Only

একমাত্র পরিবেশক : অবসর প্রকাশনা সংস্থা
বিক্রয়কেন্দ্র : ৩৮/২ক বাংলাবাজার (দোতলা), ঢাকা-১১০০

উৎসর্গ

'**মিসির** আলি অমনিবাস' আমার অতি প্রিয় গ্রন্থের একটি। প্রিয় গ্রন্থের **সঙ্গে** প্রিয়জনের নাম যুক্ত থাকাই বাঞ্ছনীয়। মিসির আলির লজিক এই **কথাই** বলে। কাজেই বইটি **গুলতেকিনের** জন্যে।

মিসির আলির কথা

'মিসির আলির কথা' শিরোনামে নিজের কথা বলে নিই আমি। তখন থাকি নর্থ ডেকোটার ফার্গো শহরে। এক রাতে গাড়ি নিয়ে যাচ্ছি মন্টানায়। গাড়ি চালাচ্ছে আমার স্ত্রী গুলতেকিন। পেছনের সীটে আমি আমার বড় মেয়েকে নিয়ে গুটিসুটি মেরে বসে আছি। গুলতেকিন তখন নতুন ড্রাইভিং শিখেছে, হাইওয়েতে এই প্রথম বের হওয়া, কাজেই কথাবার্তা বলে তাকে বিরক্ত করছি না। চুপ করে বসে আছি এবং খানিকটা আতঙ্কিত বোধ করছি। শুধু মনে হচ্ছে অ্যাকসিডেন্ট হবে না তো? গাড়ির রেডিও অন করা। কান্ট্রি মিউজিক হচ্ছে। ইংরেজি গানের কথা মন দিয়ে শুনতে ইচ্ছে করে না। কিছু শুনছি, কিছু শুনছি না এই অবস্থা। হঠাৎ গানের একটা কলি শুনে চমকে উঠলাম—

Close your eyes and try to see

বাঃ, মজার কথা তো! আমি নিশ্চিত, মিসির আলি চরিত্রের ধারণা সেই রাতেই আমি পেয়ে যাই। মিসির আলি এমন একজন মানুষ, যিনি দেখার চেষ্টা করেন চোখ বন্ধ করে। যে পৃথিবীতে চোখ খুলেই কেউ দেখে না, সেখানে চোখ বন্ধ করে দেখার এক আশ্চর্য ফলবতী চেষ্টা।

তারো অনেক দিন পর 'দেবী' লিখি। মিসির আলি নামের অতি সাধারণ মোড়কে একজন অসাধারণ মানুষ তৈরির চেষ্টা 'দেবী'তে করা হয়— একজন মানুষ, যাঁর কাছে প্রকৃতির নিয়ম-শৃঙ্খলা বড় কথা, রহস্যময়তার অস্পষ্ট জগৎ যিনি স্বীকার করেন না। সাধারণত যুক্তিবাদী মানুষরা আবেগবর্জিত হন। যুক্তি এবং আবেগ পাশাপাশি চলতে পারে না। মিসির আলির ব্যাপারে একটু ব্যতিক্রমের চেষ্টা করলাম, যুক্তি ও আবেগকে হাত ধরাধরি করে হাঁটতে দিলাম। দেখা যাক কি হয়।

যা হল তা অভাবনীয়! পাঠকরা মিসির আলিকে গ্রহণ করলেন

গভীর ভালবাসায়। তাঁদের কাছে মিসির আলি শুধু গল্পের চরিত্র হয়ে থাকল না, হয়ে গেল রক্তমাংসের একজন — বিপদে যার কাছে ছুটে যাওয়া যায়।

আমাকে প্রায়ই জিজ্ঞেস করা হয়, মিসির আলি বলে কি আসলেই কেউ আছে? এই চরিত্রটি কি আমি কাউকে দেখে তৈরি করেছি? তাঁদের অবগতির জন্যে বিনীত ভাবে জানাই — না, মিসির আলিকে আমি দেখি নি। অনেকে মনে করেন লেখক নিজেই হয়তো মিসির আলি। তাঁদেরকেও বিনীতভাবে জানাচ্ছি — আমি মিসির আলি নই। আমি যুক্তির প্রাসাদ তৈরি করতে পারি না এবং আমি কখনো মিসির আলির মতো মনে করি না প্রকৃতিতে কোনো রহস্য নেই। আমার কাছে সব সময় প্রকৃতিকে অসীম রহস্যময় বলে মনে হয়।

মিসির আলিকে নিয়ে বেশ কিছু লেখা লিখেছি। কিছু ভুলভ্রান্তিও করেছি। যেমন 'অন্য ভুবনে' মিসির আলিকে বিয়ে দিয়ে দেয়া হয়েছে। এটি বড় ধরনের ভুল, এই চরিত্রটি বিবাহিত পুরুষ হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। মিসির আলিকে একজন নিঃসঙ্গ মানুষ হিসেবেই মানায়, যিনি ভালবাসার গভীর সমুদ্র হৃদয়ে লালন করেন, কিন্তু সেই ভালবাসাকে ছড়িয়ে দেবার মতো কাউকেই কখনো কাছে পান না।

ভুলত্রুটি সত্ত্বেও আমার প্রিয় চরিত্রের একটি হচ্ছে মিসির আলি। মিসির আলিকে নিয়ে লিখতে আমার সব সময়ই ভালো লাগে। এই নিঃসঙ্গ, হৃদয়বান, তীক্ষ্ণ ধীশক্তির মানুষটি আমাকে সব সময় অভিভূত করেন। যতক্ষণ লিখি ততক্ষণ তাঁর সঙ্গ পাই, বড় ভালো লাগে।

হুমায়ূন আহমেদ

এলিফেন্ট পার্ক
ফেব্রুয়ারি '৯৩

সূচীপত্র

দেবী	১
নিশীথিনী	৭২
নিষাদ	১৬২
অন্য ভুবন	২২২
বৃহন্নলা	২৭৯
ভয় [গল্পগ্রন্থ]	৩১৪
বিপদ	৩৬৯
অনীশ	৪০৯
মিসির আলির অমীমাংসিত রহস্য	৪৫১

মিসির আলি অমনিবাস : প্রকাশকের নিবেদন

আমরা মিসির আলি অমনিবাস প্রকাশ করতে পেরে আনন্দিত ও গর্বিত। এই সঙ্গে বিনীতভাবে জানাচ্ছি, এখন থেকে মিসির আলি বিষয়ক আর কোনো লেখা 'উপন্যাস সমগ্রে' গ্রন্থিত হবে না। মিসির আলি অমনিবাস শিরোনামে স্বতন্ত্রভাবে পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত হবে।

দেবী

১

মাঝরাতের দিকে রানুর ঘুম ভেঙে গেল।

তার মনে হল ছাদে কে যেন হাঁটছে। সাধারণ মানুষের হাঁটা নয়, পা টেনে-টেনে হাঁটা। সে ভয়ার্ত গলায় ডাকল, 'এই, এই।' আনিসের ঘুম ভাঙল না। বাইরে টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। অল্প-অল্প বাতাস। বাতাসে জামগাছের পাতায় অদ্ভুত এক রকমের শব্দ উঠছে। রানু আবার ডাকল, 'এই, একটু ওঠ না। এই।'

'কী হয়েছে?'

'কে যেন ছাদে হাঁটছে।'

'কী যে বল! কে আবার ছাদে হাঁটবে? ঘুমাও তো।'

'প্লীজ, একটু উঠে বস। আমার বড় ভয় লাগছে।'

আনিস উঠে বসল। প্রবল বর্ষণ শুরু হল এই সময়। ঝমঝম করে বৃষ্টি। জানালার পর্দা বাতাসে পতপত করে উড়তে লাগল। রানু হঠাৎ দেখল, জানালার শিক ধরে খালিগায়ে একটি রোগামতো মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। মানুষটির দু'টি হাতই অসম্ভব লম্বা। রানু ফিসফিস করে বলল, 'ওখানে কে?'

'কোথায় কে?'

'ঐ যে জানালায়।'

'আহ্, কী যে ঝামেলা কর! নারকেল গাছের ছায়া পড়েছে।'

'একটু বাতিটা জ্বালাও না।'

'রানু, তুমি ঘুমোও তো।'

আনিস শোবার উপক্রম করতেই ছাদে বেশ কয়েক বার থপথপ শব্দ হল। যেন কেউ-একজন ছাদে লাফাচ্ছে।

রানু চমকে উঠে বলল, 'কিসের শব্দ হচ্ছে?'

'বানর। এ জায়গায় বানর আছে। কালই তো দেখলে ছাদে লাফালাফি করছিল।

'আমার বড় ভয় করছে। একটু উঠে গিয়ে বাতি জ্বালাও না। পায়ে পড়ি তোমার।'

আনিস বাতি জ্বালাল। ঘড়িতে বাজে দেড়টা। ছাদে আর কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না। তবু রানুর ভয় কমল না। সে কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগল। আনিস বিরক্ত স্বরে বলল, 'এ-রকম করছ কেন?'

'কেন জানি অন্য রকম লাগছে আমার। একটা খুব খারাপ স্বপ্ন দেখেছি।'

'কী স্বপ্ন?'

'দেখলাম আমি যেন ...'

কথার মাঝখানে হঠাৎ রানু থেমে গেল। কে যেন হাসছে। ভারি গলায় হাসছে। রানু কাঁপা স্বরে বলল, 'হাসির শব্দ শুনতে পাচ্ছ? কে যেন হাসছে।'

'কে আবার হাসবে! বানরের শব্দ। কিংবা কেউ হয়তো জেগে উঠেছে দোতলায়।'

আনিস লক্ষ করল, রানু খুব ঘামছে। চোখ-মুখ রক্তশূন্য। বালিশের নিচ থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল। দেশলাই জ্বালাতে-জ্বালাতে বলল, 'কী স্বপ্ন দেখছিলে?'

'দিনের বেলা বলব।'

'কী যে সব কুসংস্কার তোমাদের! এখনো ভয় লাগছে?'

'হ্যাঁ।'

'ভয়টা কিসের? চোর-ডাকাতের, না ভূতের?'

'বুঝতে পারছি না।'

'ঠিক আছে, বাতি জ্বালানোই থাক। বাতি জ্বালিয়েই ঘুমাব আজকে। এখন বল দেখি, কী স্বপ্ন দেখলে।'

'দিনের বেলা বলব।'

'আহ্, বল না! বললেই ভয় কেটে যাবে।'

রানু আনিসের বাঁ হাত শক্ত করে চেপে ধরল। থেমে-থেমে বলল, 'দেখলাম, একটা ঘরে আমি শুয়ে আছি। একটা বেঁটে লোক এসে ঢুকল। তারপর দেখলাম, সে আমার শাড়ি টেনে খুলে ফেলার চেষ্টা করছে।'

আনিস শব্দ করে হাসল।

রানু বলল, 'হাসছ কেন?'

'হাসব না? এটা কি একটা ভয় পাওয়ার স্বপ্ন?'

'তুমি তো সবটা শোন নি।'

'সবটা শুনতে হবে না। পরে কী হবে তা আমার জানা। তুমি যা দেখেছ তা হচ্ছে একটা সেক্সুয়াল ফ্যান্টাসি। যুবক-যুবতীরা এ-রকম স্বপ্ন প্রায়ই দেখে।'

'আমি দেখি না।'

'তুমিও দেখ। মনে থাকে না তোমার।'

'আমি স্বপ্ন খুব কম দেখি। যা দেখি তা সব সময় সত্যি হয়। তোমাকে তো বলেছি অনেক বার।'

আনিস চুপ করে রইল। রানু এই কথাটি প্রায়ই বলে। বিয়ের রাতে প্রথম বার বলেছিল। আনিস সেবারও হেসেছে। রানু অবাক হয়ে বলেছে, 'আপনি আমার কথা

বিশ্বাস করলেন না, না?'

'নাহ্।'

'আমি আপনার গা ছুঁয়ে বলছি, বিশ্বাস করুন আমার কথা।'

রানু এমনভাবে বলল, যেন আনিসের বিশ্বাসের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। আনিস শেষ পর্যন্ত হাসিমুখে বলল, 'ঠিক আছে বিশ্বাস করলাম, এখন দয়া করে আপনি-আপনি করবে না।' রানু ফিসফিস করে বলল, 'আপনার সঙ্গে যে আমার বিয়ে হবে, সেটাও আমি জানতাম।'

'এটাও স্বপ্নে দেখেছিলে?'

'হুঁ। দেখলাম, একটি লোক খালিগায়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার পেটের কাছে একটা মস্ত কাটা দাগ। লোকটিকে দেখেই মনে হল, এর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। আমি তাকে বললাম, কেটেছে কীভাবে? আপনি বললেন, 'সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে ব্যথা পেয়েছিলাম।'

আনিস সে-রাতে দীর্ঘক্ষণ কোনো কথা বলতে পারে নি। তার পেটে একটা কাটা দাগ সত্যি-সত্যি আছে, এই মেয়েটির সেটা জানার কথা নয়। তবে সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে কাটে নি। জামগাছ থেকে পিছলে পড়ে কেটেছে। ব্যাপারটা কাকতালীয়, বলাই বাহুল্য। মাঝে-মাঝে এমন দু'-একটা জিনিস খুব মিলে যায়। তবুও কোথায় যেন একটা ক্ষীণ অস্বস্তি থাকে।

বাইরে বৃষ্টি খুব বাড়ছে। ঝড়টড় হবে বোধহয়। শোঁ-শোঁ আওয়াজ হচ্ছে জানালায়। একটি কাঁচ ভাঙা। প্রচুর পানি আসছে ভাঙা জানালা দিয়ে, শীত-শীত করছে।

'রানু, চল ঘুমিয়ে পড়ি।'

'সিগারেট শেষ হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

বিছানায় ওঠামাত্র প্রবল শব্দে বিদ্যুৎ চমকাল। বাতি চলে গেল সঙ্গে-সঙ্গে। শুধু এ-অঞ্চল নয়, সমস্ত ঢাকাই বোধ করি অন্ধকার হয়ে গেল। আনিস বলল, 'ভয় লাগছে রানু?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, হাসির গল্পটল্প কর। এতে ভয় কমে যায়। বল একটা গল্প।'

'তুমি বল।'

আনিস দীর্ঘ সময় নিয়ে এক জন পাদ্রী ও তিনটি ইহুদি ও তিনটি মেয়ের গল্প বলল। গল্পের এক পর্যায়ে শ্রোতাকে জিজ্ঞেস করতে হয়--পাদ্রী তখন কী বলল? এর উত্তরটি হচ্ছে পাঞ্চ লাইন। কিন্তু কিচ্ছু জিজ্ঞেস করল না রানু। সে কি শুনছে না? আনিস ডাকল, 'এই রানু, এই!' রানু কথা বলল না। বাতাসের ঝাপ্টায় সশব্দে জানালার একটি পাল্লা খুলে গেল। আনিস বন্ধ করবার জন্যে উঠে দাঁড়াতেই রানু তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁপা গলায় বলল, 'তুমি যেও না। খবরদার, যেও না!'

'কী আশ্চর্য, কেন?'

'একটা-কিছু জানালার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে।'

'কী যে বল!'

'প্লীজ, প্লীজ।'

রানু কেঁদে ফেলল। ফোঁপাতে-ফোঁপাতে বলল, 'তুমি গন্ধ পাচ্ছ না?'

'কিসের গন্ধ?'

'কর্পূরের গন্ধের মতো গন্ধ।'

এটা কি মনের ভুল? সূক্ষ্ম একটা গন্ধ যেন পাওয়া যাচ্ছে ঘরে। ঝন্ঝন্ করে আরেকটা কাঁচ ভাঙল। রানু বলল, 'ঐ জিনিসটা হাসছে। শুনতে পাচ্ছ না?' বৃষ্টির শব্দ ছাড়া আনিস কিছু শুনতে পেল না।

'তুমি বস তো। আমি হারিকেন জ্বালাচ্ছি।'

'না, তুমি আমাকে ধরে বসে থাক।'

আনিস অস্বস্তির সঙ্গে বলল, 'তুমি ঐ জানালাটার দিকে আর তাকিও না তো।' আনিস লক্ষ করল, রানু থরথর করে কাঁপছে, ওর গায়ের উত্তাপও বাড়ছে। রানুকে সাহস দেবার জন্যে সে বলল, 'কোনো দোয়া-টোয়া পড়লে লাভ হবে? আয়াতুল কুর্সি জানি আমি। আয়াতুল কুর্সি পড়ব?'

রানু জবাব দিল না। তার চোখ বড়-বড় হয়ে উঠেছে। মুখ দিয়ে ফেনা ভাঙছে নাকি? শ্বাস ফেলছে টেনে-টেনে।

'এই রানু, এই।'

কোনোই সাড়া নেই। আনিস হারিকেন জ্বালাল। রান্নাঘর থেকে খুটখুট শব্দ আসছে। ইঁদুর, এতে সন্দেহ নেই। তবু কেন জানি ভালো লাগছে না। আনিস বারান্দায় এসে ডাকল, 'রহমান সাহেব, ও রহমান সাহেব।' রহমান সাহেব বোধহয় জেগেই ছিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে বেরুলেন।

'কী ব্যাপার?'

'আমার স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।'

'কী হয়েছে?'

'বুঝতে পারছি না।'

'হাসপাতালে নিতে হবে নাকি?'

'বুঝতে পারছি না।'

'আপনি যান, আমি আসছি। এক্ষুণি আসছি।'

আনিস ঘরে ফিরে গেল। মনের ভুল, নিঃসন্দেহে মনের ভুল। আনিসের মনে হল, সে ঘরের ভেতর গিয়ে দাঁড়ানোমাত্র কেউ-একজন যেন দরজার আড়ালে সরে পড়ল। রোগা, লম্বা একটি মানুষ। আনিস ডাকল, 'রানু।' রানু তৎক্ষণাৎ সাড়া দিল, 'কি?'

ইলেকট্রিসিটি চলে এল তখনই। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই রহমান সাহেব এসে উপস্থিত হলেন। উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন, 'এখন কেমন অবস্থা?' রানু অবাক হয়ে বলল, 'কিসের অবস্থা? কী হয়েছে?'

রহমান সাহেব অবাক হয়ে তাকালেন। আনিস বলল, 'তোমার শরীর খারাপ করেছিল, তাই ওঁকে ডেকেছিলাম। এখন কেমন লাগছে?'

'ভালো।'

রানু উঠে বসল। রহমান সাহেবের দিকে তাকিয়ে মৃদু স্বরে বলল, 'এখন আমি ভালো।'

রহমান সাহেব তবুও মিনিট দশেক বসলেন। আনিস বলল, 'আপনি কি ছাদে দাপাদাপি শুনেছেন?'

'সে তো রোজই শুনি। বাঁদরের উৎপাত।'

'আমিও তাই ভাবছিলাম।'

'খুব জ্বালাতন করে। দিনে-দুপুরে ঘর থেকে খাবারদাবার নিয়ে যায়।'

'তাই নাকি?'

'জ্বি। নতুন এসেছেন তো। কয়েক দিন যাক, টের পাবেন। বাড়িঅলাকে বলেছিলাম গ্রিল দিতে। তা দেবে না। আপনার সঙ্গে দেখা হলে আপনিও বলবেন। সবাই মিলে চেপে ধরতে হবে।'

'জ্বি, আমি বলব। আপনি কি চা খাবেন নাকি এক কাপ?'

'আরে না না। এই রাত আড়াইটার সময় চা খাব নাকি, কী যে বলেন। উঠি ভাই। কোনো অসুবিধা দেখলে ডাকবেন।'

ভদ্রলোক উঠে পড়লেন। রানু চাপা স্বরে বলল, 'এই রাত-দুপুরে ভদ্রলোককে ডেকে আনলে কেন? কী মনে করলেন উনি।'

'তুমি যা শুরু করেছিলে। ভয় পেয়েই ভদ্রলোককে ডাকলাম।'

'কী করেছিলাম আমি?'

'অনেক কাণ্ড করেছ। এখন তুমি কেমন, সেটা বল।'

'ভালো।'

'কী রকম ভালো?'

'বেশ ভালো।'

'ভয় লাগছে না আর?'

'নাহ্।'

রানু বিছানা থেকে নেমে পড়ল। সে বেশ সহজ ও স্বাভাবিক। ভয়ের কোনো চিহ্নও নেই চোখে-মুখে। শাড়ি কোমরে জড়িয়ে ঘরের পানি সরাবার ব্যবস্থা করছে।

'সকালে যা করবার করবে। এখন এসব রাখ তো।'

'ইস্, কী অবস্থা হয়েছে দেখ না।'

'হোক, এস তো এদিকে।'

রানু হাসি-হাসি মুখে এগিয়ে এল।

'এখন আর তোমার ভয় লাগছে না?'

'না।'

'জানালার পাশে কে যেন দাঁড়িয়ে ছিল বলেছিলে?'

'এখন কেউ নেই। আর থাকলেও কিছু যায় আসে না।'

আনিস দ্বিতীয় সিগারেটটা ধরাল। হালকা গলায় বলল, 'এক কাপ চা করতে পারবে?'

'চা, এত রাতে!'

'এখন আর ঘুম আসবে না, কর দেখি এক কাপ।'

রানু চা বানাতে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই পানি ফোটার শব্দ হল। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে ঝমঝম করে। রানু একা-একা রান্নাঘরে। কে বলবে এই মেয়েটিই অল্প

কিছুক্ষণ আগে ভয়ে অস্থির হয়ে গিয়েছিল। ছাদে আবার ঝুপঝুপ শব্দ হচ্ছে। এই বৃষ্টির মধ্যে বানর এসেছে নাকি? আনিস উঠে গিয়ে রান্নাঘরে উঁকি দিল। হালকা গলায় বলল, 'ছাদে বড় ধুপধাপ শব্দ হচ্ছে।' রানু জবাব দিল না।

আনিস বলল, 'এই বাড়িটা ছেড়ে দেব।'

'সস্তায় এ-রকম বাড়ি আর পাবে না।'

'দেখি পাই কি না।'

'চায়ে চিনি হয়েছে তোমার?'

'হয়েছে। তুমি নিলে না?'

'নাহ্, রাত-দুপুরে চা খেলে আমার আর ঘুম হবে না।'

রানু হাই তুলল। আনিস বলল, 'এখন বল তো তোমার স্বপ্ন-বৃত্তান্ত।'

'কোন স্বপ্নের কথা?'

'ঐ যে স্বপ্ন দেখলে। একটা বেঁটে লোক।'

'কখন আবার এই স্বপ্ন দেখলাম? কী যে তুমি বল!'

আনিস আর কিছু বলল না। চা শেষ করে ঘুমুতে গেল। শীত-শীত করছিল। রানু পা গুটিয়ে বাচ্চা মেয়ের মতো শুয়েছে। একটি হাত দিয়ে জড়িয়ে রেখেছে আনিসকে। তার ভারি নিঃশ্বাস পড়ছে। ঘুমিয়ে পড়েছে বোধহয়। জানালায় নারকেল গাছের ছায়া পড়েছে। মানুষের মতোই লাগছে ছায়াটাকে। বাতাসে গাছের পাতা নড়ছে। মনে হচ্ছে মানুষটি হাত নাড়ছে। ঘরের ভেতর মিষ্টি একটা গন্ধ। মিষ্টি, কিন্তু অচেনা।

আনিস রানুকে কাছে টেনে আনল। রানুর মুখে আলো এসে পড়েছে। কী যে মায়াবতী লাগছে! আনিস ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলল। ওদের বিয়ে হয়েছে মাত্র ছ' মাস। আনিস এখনো অভ্যস্ত হয়ে ওঠে নি। প্রতি রাতেই রানুর মুখ তার কাছে অচেনা লাগে। অপরূপ রূপবতী একটি বালিকার মুখ, যাকে কখনো পুরোপুরি চেনা যায় না। আনিস ডাকল, 'রানু, রানু।' কোনো জবাব পাওয়া গেল না। গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন রানু। আনিসের ঘুম এল না। শুয়ে-শুয়ে ঠিক করে ফেলল, রানুকে ভালো এক জন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে যেতে হবে। অফিসের কমলেন্দুবাবু এক ভদ্রলোকের কথা প্রায়ই বলেন, খুব নাকি গুণী লোক। মিসির সাহেব। দেখালে হয় এক বার মিসির সাহেবকে।

রানু ঘুমের ঘোরে খিলখিল করে হেসে উঠল। অপ্রকৃতিস্থ মানুষের হাসি শুনতে ভালো লাগে না, গা ছমছম করে।

২

ভদ্রলোকের বাড়ি খুঁজে বের করতে অনেক দেরি হল। কাঁঠালবাগানের এক গলির ভেতর পুরোনো ধাঁচের বাড়ি। অনেকক্ষণ কড়া নাড়বার পর অসম্ভব রোগা এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। বিরক্ত মুখে বললেন, 'কাকে চান?'

'মিসির সাহেবকে খুঁজছি।'

'তাকে কী জন্যে দরকার?'

'জ্বি, আছে একটা দরকার। আপনি কি মিসির সাহেব?'

'হ্যাঁ। বলেন, দরকারটা বলেন।'

রাস্তায় দাঁড়িয়ে সমস্যার কথা বলতে হবে নাকি? আনিস অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। কিন্তু ভদ্রলোকের ভাবভঙ্গি এ-রকম যে, বাইরেই দাঁড় করিয়ে রাখবেন, ভেতরে ঢুকতে দেবেন না। আনিস বলল, 'ভেতরে এসে বলি?'

'ভেতরে আসবেন? ঠিক আছে, আসুন।'

মিসির সাহেব যেন নিতান্ত অনিচ্ছায় দরজা থেকে সরে দাঁড়ালেন। ঘন অন্ধকার। তিন-চারটা বেতের চেয়ার ছাড়া আসবাবপত্র কিছু নেই।

'বসুন আপনি।'

আনিস বসল। ভদ্রলোক বললেন, 'আজ আমার শরীর ভালো না। আলসার আছে। ব্যথা হচ্ছে এখন। তাড়াতাড়ি বলেন কি বলবেন।'

'আমার স্ত্রীর একটা ব্যাপারে আপনার কাছে এসেছি। আপনার নাম শুনেই এসেছি।'

'আমার নাম শুনে এসেছেন?'

'জ্বি।'

'আমার এত নামডাক আছে, তা তো জানতাম না! স্পেসিফিক্যালি বলুন তো কার কাছে শুনেছেন?'

আনিস আমতা-আমতা করতে লাগল। ভদ্রলোক অসহিষ্ণু স্বরে বললেন, 'বলুন, কে বলল?'

'আমাদের অফিসের এক ভদ্রলোক। কমলেন্দুবাবু। আপনি নাকি তাঁর বোনের চিকিৎসা করেছিলেন।'

'ও আচ্ছা, চিনেছি, কমলেন্দু। শোনেন, আমি কিন্তু ডাক্তার না, জানেন তো?'

'জ্বি স্যার, জানি।'

'আচ্ছা, আগে এক কাপ চা খান, তারপর কথা বলব। রুগীটি কে বললেন? আপনার স্ত্রী?'

'জ্বি।'

'বয়স কত?'

'ষোল-সতের।'

'বলেন কী! আপনার বয়স তো মনে হয় চল্লিশের মতো, ঠিক না?'

আনিস শুকনো গলায় বলল, 'আমার সাঁইত্রিশ।'

'এ-রকম অল্পবয়সী মেয়ে বিয়ে করেছেন কেন?'

এটা আবার কেমন প্রশ্ন! আনিসের মনে হল, কমলেন্দুবাবুর কথা শুনে এখানে আসাটা ঠিক হয় নি। ভদ্রলোকের নিজেরই মনে হয় মাথার ঠিক নেই। এক জন অপরিচিত মানুষকে কেউ এ-রকম কথা জিজ্ঞেস করে?

'বলুন বলুন, এ-রকম অল্পবয়েসী মেয়ে বিয়ে করলেন কেন?'

'হয়ে গেছে আর কি।'

'বলতে চান না বোঝা যাচ্ছে। ঠিক আছে, বলতে হবে না। চা'র কথা বলে আসি। চা খেয়ে তারপর শুরু করব।'

ভদ্রলোক আনিসকে বাইরে বসিয়ে ভেতরে চলে গেলেন। তারপর আর আসার নামগন্ধ নেই। আট-ন' বছরের একটি বাচ্চা মেয়ে এক কাপ দারুণ মিষ্টি সর-ভাসা চা দিয়ে চলে গেল। তারপর আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। দেখতে-দেখতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। আনিস বেশ কয়েক বার কাশল। দু' বার গলা উঁচিয়ে ডাকল, 'বাসায় কেউ আছেন?' কোনো সাড়া নেই। কী ঝামেলা।

কমলেন্দুবাবু অবশ্য বারবার বলে দিয়েছেন—এই লোকের কথাবার্তার ঠিকঠিকানা নেই। তবে লোকটা অসাধারণ। আনিসের কাছে অসাধারণ কিছু মনে হয় নি। তবে চোখের দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ। এইটি অবশ্য প্রথমেই চোখে পড়ে। আর দ্বিতীয় যে-জিনিসটি চোখে পড়ে, সেটি হচ্ছে তার আঙুল। অস্বাভাবিক লম্বা-লম্বা সব ক'টা আঙুল।

'এই যে, অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলাম।'

'না, ঠিক আছে।'

'ঠিক থাকবে কেন? ঠিক না।'

লোকটি এই প্রথম বার হাসল। থেমে-থেমে বলল, 'আলসার আছে তো, ব্যথায় কাহিল হয়ে শুয়ে ছিলাম। অমনি ঘুম এসে গেল।'

'আমি তাহলে অন্য এক দিন আসি?'

'না, এসেছেন যখন বসুন। চা দিয়েছিল?'

'জ্বি।'

'বেশ, এখন বলুন কী বলবেন।'

আনিস চুপ করে রইল। এটা এমন একটা ব্যাপার, যা চট করে অপরিচিত কাউকে বলা যায় না। ভদ্রলোক শান্ত স্বরে বললেন, 'আপনার স্ত্রীর মাথার ঠিক নেই, তাই তো?'

'জ্বি-না স্যার, মাথা ঠিক আছে।'

'পাগল নন?'

'জ্বি-না।'

'তাহলে আমার কাছে এসেছেন কেন?'

'মাঝে-মাঝে সে অস্বাভাবিক আচরণ করে।'

'কী রকম অস্বাভাবিক?'

'ভয় পায়। মাঝে-মাঝেই এ-রকম হয়।'

'ভয় পায়? তার মানে কী? কিসের ভয়?'

'ভূতের ভয়।'

'ঠিক জানেন, ভয়টা ভূতের?'

'জ্বি-না, ঠিক জানি না। মনে হয় এ-রকম।'

ভদ্রলোক একটি চুরুট ধরিয়ে খকখক করে কাশতে-কাশতে বললেন, 'বর্মা থেকে আমার এক বন্ধু এনেছে, অতি বাজে জিনিস।' আনিস কিছু বলল না। তবে এই ভদ্রলোকের স্টাইলটি তার পছন্দ হল। ভদ্রলোক অবলীলায় অন্য একটি প্রসঙ্গ নিয়ে এসেছেন। এবং এমনভাবে কথা বলছেন, যেন আগের কথাবার্তা তাঁর কিছুই মনে নেই।

'এ-রকম চুরুট চার-পাঁচটা খেলে যক্ষ্মা হয়ে যাবে। আপনাকে দেব একটা?'

'জ্বি-না।'

'ফেলে দিতে মায়া লাগে বলে খাই। খাওয়ার জিনিস না। অখাদ্য। তবে হাভানা চুরুটগুলি ভালো। হাভানা চুরুট খেয়েছেন কখনো?'

'জ্বি-না।'

'খুব ভালো। মাঝে-মাঝে আমার এক বন্ধু আমাকে দিয়ে যায়।'

ভদ্রলোক চুরুটে টান দিয়ে আবার ঘর কাঁপিয়ে কাশতে লাগলেন। কাশি থামতেই বললেন, 'এখন আমি আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করব। যথাযথ জবাব দেবেন।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'প্রথম প্রশ্ন, আপনার স্ত্রী কি সুন্দরী?'

'জ্বি।'

'বেশ সুন্দরী?'

'জ্বি।'

'আপনার স্ত্রী কখন ভয় পান—রাতে না দিনে?'

'সাধারণত রাতে। তবে এক বার দুপুরে ভয় পেয়েছিল।'

'ভয়টা কী রকম সেটা বলেন।'

'মনে হয় কিছু-একটা দেখে।'

'সব বার একই জিনিস দেখেন, না একেক বার একেক রকম?'

'এটা আমি ঠিক বলতে পারছি না।'

'এই সময় কি তিনি কোনো রকম গন্ধ পান?'

'আমি ঠিক বলতে পারছি না।'

'যখন সুস্থ হয়ে ওঠেন, তখন কি তাঁর ভয়ের কথা মনে থাকে?'

'বেশির ভাগ সময়ই থাকে না, তবে মাঝে-মাঝে থাকে।'

'আপনার স্ত্রীর স্বাস্থ্য নিশ্চয়ই খারাপ।'

'জ্বি।'

'উনি প্রথম কখন ভয় পেয়েছিলেন, বলতে পারেন?'

'জ্বি-না। তবে খুব ছোটবেলায়।'

'প্রথম ভয়ের ঘটনাটা আমাকে বলুন।'

'আমি সেটা ঠিক জানি না।'

'আপনি অনেক কিছুই জানেন না মনে হচ্ছে। আপনার স্ত্রীকে একদিন নিয়ে আসুন।'

আনিস কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'আমি তাকে আনতে চাই না।'

'কেন চান না?'

'সে খুব সেনসিটিভ। সে যদি টের পায় যে, তার এই অস্বাভাবিকতা নিয়ে আমি লোকজনের সাথে আলাপ করছি, তাহলে খুব মন-খারাপ করবে।'

'দেখুন ভাই, আপনার স্ত্রীর সঙ্গে কথা না-বলে কিছুই করা যাবে না। আপনার স্ত্রী অসুস্থ এবং আমার মনে হচ্ছে এই অসুখ দ্রুত বেড়ে যাবে। আপনি তাঁকে নিয়ে আসবেন।'

আনিস উঠে দাঁড়াল। ক্ষীণ স্বরে বলল,'আপনাকে কত দেব?'

ভদ্রলোক বিস্মিত হয়ে বললেন, 'কমলেন্দুবাবু কি আপনাকে বলেন নি আমি ফিস নিই না? এই কাজটি আমি শখের খাতিরে করি, বুঝতে পারছেন?'

'জ্বি, পারছি।'

'তবে আপনি যদি ভালো গোলাপের চারা পান, তাহলে আমাকে দিতে পারেন। আমার গোলাপের খুব শখ। সব মিলিয়ে ত্রিশটি ডিফারেন্ট ভেরাইটির চারা আমার কাছে আছে। একটা আছে দারুণ ইন্টারেস্টিং, ঘাসফুলের মতো ছোট সাইজের গোলাপ।'

'তাই নাকি?'

'জ্বি। ওরা বলে মাইক্রো রোজ। হল্যাণ্ডের গোলাপ। কড়া গন্ধ। দেখবেন?'

'আরেক দিন দেখব। আজ দেরি হয়ে গেছে, আমার স্ত্রী একা থাকে।'

'ও, তাই নাকি? শোনেন, একা তাকে রাখবেন না। কখনো যেন মেয়েটি একা না থাকে। এটা খুবই জরুরি।'

রাস্তায় নেমে আনিসের মন খারাপ হয়ে গেল। খামোকা সময় নষ্ট। লোকটি তেমন কিছু জানে না। কমলেন্দুবাবু যে-সব আধ্যাত্মিক শক্তিটক্তির কথা বলেছেন, সে-সব মনে হয় নেহায়েতই গালগল্প। তবে লোকটির কথাবার্তা বেশ ফোর্সফুল। রানুকে বুঝিয়েসুঝিয়ে এক বার এনে দেখালে হয়। ক্ষতি তো কিছু নেই।

তা ছাড়া ভদ্রলোক খুব সম্ভব ফ্যালনাও নন। ক্লিনিক্যাল সাইকিয়াট্রির টীচার। একেবারে কিছু না-জেনে তো কেউ মাস্টারি করে না। কিছু নিশ্চয়ই জানেন। মানুষের চেহারা দেখে কিছু অনুমান করাটাও ঠিক না।

৩

আনিস অফিসে চলে গেলে রানুর খুব একলা লাগে। কিছুই করার থাকে না। গোছানো আলনা আবার নতুন করে গোছায়। বসার ঘরের বেতের সোফা ঝাড়ন দিয়ে ঝাড়ে। শোবার মেঝে ভেজা ন্যাকড়া দিয়ে মুছতে-মুছতে চকচকে করে ফেলে, তবু সময় কাটে না। এক সময় তেতলার বারান্দায় গিয়ে বসে। এ-বাড়ির ছোট বারান্দাটি তার খুব পছন্দ। গ্রিল দেওয়া বারান্দাটি গোলাকার। এখানে বসে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। সামনেই একটা মেয়েদের স্কুল। টিফিন টাইমে মেয়েগুলোর কাণ্ডকারখানা দেখতে এমন মজা লাগে! রানু প্রায় সারা দুপুর বারান্দাতেই বসে থাকে। একা-একা ঘরে বসে থাকতে ভালো লাগে না। কেমন যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। একটু যেন ভয়ভয়ও লাগে।

অবশ্য যখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল নামতে থাকে, তখন ভয়ভয় ভাবটা কমে যায়। বিকেলবেলা বাড়িঅলার মেয়ে দু'টি তাদের ভেতরের দিকের বাগানে বসে মজা করে চা খায়। চা খেতে-খেতে দু' জনেই খুব হাসাহাসি করে। একেক দিন ওদের বাবাও সঙ্গে বসেন, রানুর দেখতে বেশ লাগে।

ছোট মেয়েটির সঙ্গে রানুর কিছু দিন আগে আলাপ হয়েছিল। বেশ মেয়েটি! খুব স্মার্ট। দেখতেও সুন্দর। এক দিন দুপুরে রানু বারান্দায় এসে বসেছে, মেয়েটি এসে উপস্থিত। মুখে চাপা হাসি। হাতে কী–একটা বই। এসেই বলল, 'আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছি।'

'কি কথা?'

'আপনি সারা দিন বারান্দায় বসে থাকেন কেন?'

'সারা দিন কোথায়? দুপুরবেলায় বসি। কিছু করার নেই তো, একা–একা লাগে।'

'তা ঠিক। বসব আপনার এখানে? আজ আমি কলেজে যাই নি। বোটানি প্র্যাকটিক্যাল ছিল আজকে।'

মেয়েটি খুব সহজভাবে বলল। ঘন্টাখানেকের মধ্যে একগাদা কথা বলল। তারপর যাবার সময় হঠাৎ বলল, 'আরেকটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'কর।'

'আপনি এত সুন্দর কেন? যে আমার চেয়েও সুন্দরী, তাকে আমার ভালো লাগে না।'

রানু কী বলবে ভেবে পেল না। মেয়েটি হাসতে–হাসতে বলল, 'আমাদের ক্লাসের মেয়েদের কী ধারণা, জানেন? তাদের ধারণা, আমি হচ্ছি বাংলাদেশের সবচে সুন্দরী মহিলা। ওদের এক দিন এনে আপনাকে দেখিয়ে দেব।'

'ঠিক আছে, দিও। আরেকটু বস। চা খাবে?'

'না, চা আমি বেশি খাই না। বেশি চা খেলে গায়ের রঙ ময়লা হয়ে যায়।'

মেয়েটি যেমন হুট করে এসেছিল, তেমনি হুট করে নিচে নেমে গেল। বেশ লাগল রানুর। নতুন বাসাটা তার ভালোই লাগছে। পুরোনো ঢাকায় হলেও বেশ নিরিবিলি। মালিবাগের বাসাটার মতো নয়। নিঃশ্বাস নেবার জায়গা ছিল না সেখানে। পাশ দিয়ে রাতদিন রিকশা যাচ্ছে, গাড়ি যাচ্ছে। জঘন্য! এই বাসাটা ভেতরের দিকে। বাড়িঅলা ভদ্রলোকও বেশ ভালোমানুষ। প্রথম দিনেই আনিসকে বলেছেন, 'আমার বাড়ি ভাড়া দেবার দরকার নেই। টাকার জন্যেই তো বাড়ি ভাড়া। টাকা যথেষ্ট আছে। তবু দু' ঘর ভাড়াটে রাখি। কারণ এত বড় বাড়িতে মানুষ না–থাকলে ভালো লাগে না। কবরখানা–কবরখানা ভাব চলে আসে। তবে সবাইকে আমি বাড়ি ভাড়া দিই না। আপনাকে দিচ্ছি, কারণ আপনাকে পছন্দ হয়েছে।'

ভাড়াও খুব কম। মাত্র ছয় শ' টাকা। তিন–রুমের এত বড় একটা বাড়ি ছয় শ' টাকায় পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। রানু এখানে এসে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। তার সবচেয়ে পছন্দ হয়েছে বাথরুম। বড় ঝকঝকে একটা বাথরুম। বাসাটা রানুর খুব পছন্দ হয়েছিল। আনিস যখন বলল, 'কি, নেব? পছন্দ হয়?'

'হয়।'

'ভালো করে ভেবে বল নেব কি না। দু' দিন পর যদি বল পছন্দ না, তাহলে মুশকিলে পড়ব। মালিবাগের বাসাটা ভালো ছিল। শুধু–শুধু বদলালাম।'

'এই বাসাটাও ভালো।'

রানু খুব খুশি মনে নতুন বাসা সাজাল। নিজেই পরদা কিনে আনল, সারা রাত

জেগে সেলাই করল। তার উৎসাহের সীমা নেই।

'বুঝলে রানু, সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকবে। অন্যদের বাসায় যাবে-টাবে। একা-একা থাকার অভ্যেসটা ভালো না। যাবে তো?'

'যাব।'

'একা থাকলেই মানুষের মধ্যে নানান রকম প্রবলেম দেখা যায়, বুঝলে? সব ভাড়াটেদের সঙ্গে খাতির রাখবে।'

'ভাড়াটে তো মাত্র এক জন।'

'ঐ ওনার বাসাতেই যাবে। বাড়িঅলার বাসায়ও যাবে।'

'আচ্ছা, যাব।'

রানু অবশ্যি যায় নি কোথাও। তার ভালো লাগে না। অন্যদের মতো সে কারো সঙ্গে সহজভাবে মিশতে পারে না। অন্যদের সামনে কেমন যেন আড়ষ্ট লাগে। বারান্দার বেতের চেয়ারটাতে বসে থাকতেই বেশি ভালো লাগে। দুপুরটাই যা কষ্টের। দুপুরটা কেটে গেলেই অন্যরকম একটা শান্তি লাগে।

কিন্তু আজকের দুপুরটা দীর্ঘ। কিছুতেই আর কাটছে না। বারান্দায় বসে থাকতেও ভালো লাগছে না। মেয়েদের স্কুলটাও কী কারণে যেন বন্ধ। চারদিক চুপচাপ। বড্ড ফাঁকা। কিছুক্ষণ শুয়ে থাকলে কেমন হয়?

ঘরের ভেতরটা কেমন যেন অন্যরকম। রানু ভেতরে ঢুকে জানালার পর্দা ফেলে দিল। অনেকখানি অন্ধকার হয়ে গেল। অন্ধকার ও চুপচাপ। আর তখন স্পষ্ট গলায় কেউ ডাকল, 'রানু, রানু।' কয়েক মুহূর্ত রানু নড়ল না। অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু যে ডেকে উঠেছে, সে দ্বিতীয় বার আর ডাকল না।

রানুর এ-রকম চারদিকের নিস্তব্ধতার মধ্যে একজন অশরীরী কেউ ডেকে ওঠে। অসংখ্যবার শুনেছে এই ডাক। কে সে! কোথেকে আসে সে! রানু ফিসফিস করে বলল, 'কে?' কোনো জবাব পাওয়া গেল না।

'কে তুমি?'

জানালার পরদাটা শুধু কাঁপছে। বিকেল হয়ে আসছে। রানু ছোট একটি নিঃশ্বাস ফেলে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। নিচের বাগানে বাড়িঅলার বড় মেয়েটি হাঁটছে। নীলু বোধহয় ওর নাম। এই মেয়েটি তার বোনের মতো নয়। গম্ভীর। কথাবার্তা প্রায় বলেই না। তবুও ওকে দেখলেই রানুর মনে হয়—মেয়েটি বড় ভালো। মায়াবতী মেয়ে।

রানু দেখল—বিষণ্ন ভঙ্গিতে মেয়েটি একা-একা বসে আছে। তার ইচ্ছা হল নিচে নেমে ওর সঙ্গে কথা বলে। কিন্তু সে গেল না।

৪

নীলু দু' বার বিজ্ঞাপনটা পড়ল। বেশ একটা মজার বিজ্ঞাপন।

কেউ কি আসবেন?

আমি একজন নিঃসঙ্গ মানুষ। স্ত্রীর মৃত্যুর পর একা জীবন-যাপন করছি। সময় আর কাটে না। আমার দীর্ঘ দিবস ও দীর্ঘ রজনীর নিঃসঙ্গতা কাটাতে কেউ আমাকে দু' লাইন লিখবেন?

জিপিও বক্স নাম্বার ৭৩

দৈনিক পত্রিকায় এ-রকম বিজ্ঞাপন দেবার মানে কী? সাপ্তাহিক কাগজগুলিতে এইসব থাকে; ছেলেছোকরাদের কাণ্ড। এই লোকটি নিশ্চয় ছেলেছোকরা নয়। বুড়ো-হাবড়াদের একজন।

'বাবা, এটা পড়েছ?'

নীলু জাহিদ সাহেবের হাতে কাগজটা গুঁজে দিল।

'বাবা, এই বিজ্ঞাপনটি পড় তো!'

জাহিদ সাহেব নিজেও ভ্রূ কুঞ্চিত করে দু' বার পড়লেন। তাঁর মুখের ভঙ্গি দেখে মনে হল বেশ বিরক্ত হয়েছেন।

'পড়েছ?'

'হুঁ, পড়লাম।'

'কী মনে হয় বাবা?'

'কী আবার মনে হবে? কিছুই মনে হয় না। দেশটা রসাতলে যাচ্ছে। খবরের কাগজঅলারা এইসব ছাপে কীভাবে!'

নীলু হাসিমুখে বলল, 'ছাপাবে না কেন?'

'দেশটা বিলাত-আমেরিকা নয়, বুঝলি? আর ভালো করে পড়লেই বোঝা যায়, লোকটার একটা বদ মতলব আছে।'

'কই, আমি তো বদ মতলব কিছু বুঝছি না।'

জাহিদ সাহেব গম্ভীর হয়ে বললেন, 'দেখিস, তুই আবার চিঠি লিখে বসবি না।'

নীলু মুখ নিচু করে হাসল।

'হাসছিস কেন?'

'এমনি হাসছি।'

'চিঠি লিখবার কথা ভাবছিস না তো মনে-মনে?'

'উঁহু।'

নীলু মুখে উঁহু বললেও মনে-মনে ঠিক করে ফেলল, গুছিয়ে একটা চিঠি লিখবে। দেখা যাক না কী হয়। কী লেখে লোকটি।

রাতে ঘুমুতে যাওয়ার আগে সে সত্যি একটা চিঠি লিখে ফেলল। মোটামুটি বেশ দীর্ঘ চিঠি।

জনাব,

আপনার বিজ্ঞাপনটি পড়লাম। লিখলাম কয়েক লাইন। এতে কি আপনার নিঃসঙ্গতা কাটবে? আমার বয়স আঠার। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। আমরা দু' বোন। আমার ছোট বোনটির নাম বিলু। সে হলিক্রস কলেজে পড়ে।

আমরা দু' বোনই খুব সুন্দরী। এই যা, এটা আপনাকে লেখা ঠিক হল না। তাই না? নাকি সুন্দরী মেয়েদের চিঠি পেলে আপনার নিঃসঙ্গতা আরো দ্রুত কাটবে?

নীলু

চিঠিটি লিখেই তার মনে হল যে, এ-রকম লেখাটা ঠিক হচ্ছে না। চিঠির মধ্যে একটা বড় মিথ্যা আছে। সে সুন্দরী নয়। বিলুর জন্যে কথাটা ঠিক, তার জন্যে নয়।নীলু ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলে দ্বিতীয় চিঠিটি লিখল।

জনাব,

আমার নাম নীলু। আমার বয়স কুড়ি। আপনার নিঃসঙ্গতা কাটাবার জন্যে আপনাকে লিখছি। কিন্তু চিঠিতে কি কারো নিঃসঙ্গতা কাটে? আপনার বয়স কত, এটা দয়া করে জানাবেন।

নীলু

দ্বিতীয় চিঠিটিও তার পছন্দ হল না। তার মনে হল, সে যেন কিছুতেই গুছিয়ে আসল জিনিসটি লিখতে পারছে না। রাতে শুয়ে-শুয়ে তার মনে হল, হঠাৎ করে সে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে কেন? চিঠি লেখারই-বা কী দরকার? সে নিজেও কি খুব নিঃসঙ্গ? হয়তো-বা। এ-বাড়িতে আর দু'টিমাত্র প্রাণী। বিলু আর বাবা। বাবা দিন-রাত নিজের ঘরেই থাকেন। মাসের প্রথম দিকের কয়েকটা দিন বাড়িভাড়ার টাকা আদায়ের জন্যে অল্প যা নড়াচড়া করেন। তারপর আবার নিজের ঘরেই বন্দি। আর বিলু তো আছে তার অসংখ্য বন্ধুবান্ধব নিয়ে। শুধু মেয়েবন্ধু নয়, তার আবার অনেক ছেলেবন্ধুও আছে।

মহানন্দে আছে বিলু। তবে সে একটু বাড়াবাড়ি করছে। কাল তার কাছে একটি ছেলে এসেছিল, সে রাত আটটা পর্যন্ত ছিল। এ-সব ভালো নয়। নীলু উঁকি দিয়ে দেখেছে, ছেলেটি ফরফর করে সিগারেট টানছে। হাত নেড়ে-নেড়ে খুব কথা বলছে। আর বীলু হাসতে-হাসতে ভেঙে পড়ছে। ভাত খাওয়ার সময় নীলু কিছু বলবে না বলবে না করেও বলল, 'ছেলেটা কে রে?'

'কোন ছেলে?'

'ঐ যে রাত আটটা পর্যন্ত গল্প করলি?'

'ও, সে তো রুবির ভাই। মহা চালবাজ। নিজেকে খুব বুদ্ধিমান ভাবে, আসলে মহা গাধা।'

বলতে-বলতে খিলখিল করে হাসে বিলু।

'মহা গাধা হলে এতক্ষণ বসিয়ে রাখলি কেন?'

'যেতে চাচ্ছিল না তো কী করব?'

বলতে-বলতে বিলু আবার হাসল। বিলু এমন মেয়ে, যার ওপর কখনো রাগ করা যায় না। নীলু কখনো রাগ করতে পারে না। মাঝে-মাঝে বাবা দু'-একটা কড়া কথা বলেন। তখন বিলু রাগ করে খাওয়া বন্ধ করে দেয়। সে এক মহা যন্ত্রণা। একবার রাগ করে সে পুরো দু' দিন দরজা বন্ধ করে বসে ছিল। কত সাধাসাধি, কত অনুরোধ। শেষ পর্যন্ত মগবাজারের ছোটমামাকে আনতে হল। ছোটমামা বিলুর খুব খাতিরের মানুষ।

তাঁর সব কথা সে শোনে। তিনি এসে যখন বললেন, 'দরজা না খুললে মা আমি কিন্তু আর আসব না। এই আমার শেষ আসা—' তখন দরজা খুলল। এ-রকম জেদী মেয়ে।

নীলুর কোনো জেদ-টেদ নেই। কালো এবং অসুন্দরী মেয়েদের জেদ কখনো থাকে না। এদের জীবন কাটাতে হয় একাকী।

নীলু বাতি নিভিয়ে ঘুমুতে চেষ্টা করল। ছোটবেলায় বাতি নেভানোর সঙ্গে সঙ্গে তার ঘুম আসত, এখন আর আসে না। অনেক রাত পর্যন্ত এপাশ-ওপাশ করতে হয়।

পাশের খাটে টেবিল-ল্যাম্প জ্বালিয়ে চোখের ওপর একটা গল্পের বই ধরে আছে বিলু। অনেক রাত পর্যন্ত সে পড়বে। পড়তে-পড়তে হঠাৎ এক সময় ঘুমিয়ে পড়বে, বাতি নেভাবে না। মশারি ফেলবে না। নীলুকেই উঠে এসে বাতি নেভাতে হবে, মশারি ফেলতে হবে।

'বিলু ঘুমো, বাতি নেভা।'

'একটু পরে ঘুমাব।'

'কী পড়ছিস?'

'শীর্ষেন্দুর একটা বই। দারুণ!'

'দিনে পড়িস। আলো চোখে লাগছে।'

'দিনে আমার সময় কোথায়? তুমি ঘুমাও-না!'

নীলু ঘুমাতে পারল না। শুয়ে-শুয়ে তাকিয়ে রইল বিলুর দিকে। দিনে-দিনে কী যে সুন্দর হচ্ছে মেয়েটা! একই বাবা-মার দু' মেয়ে—এক জন এত সুন্দর আর অন্য জন এত অসুন্দর কেন? নীলু ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল।

'আপা?'

'কী?'

'দারুণ বই, তুমি পড়ে দেখ।'

'প্রেমের?'

'হ্যাঁ। প্রেমের হলেও খুব সিরিয়াস জিনিস। দারুণ!'

'তাই নাকি?'

'হুঁ, এক জন খুব রূপবতী মেয়ের গল্প।'

'তোর মতো একজন?'

'দূর, আমি আবার সুন্দর নাকি? আমাদের তিনতলার ভাড়াটের বৌটির মতো বলতে পার। রানু নাম, দেখেছ?'

'না তো, খুব সুন্দরী?'

'ওরে ব্বাপ, দারুণ! হেমা মালিনীর চেয়েও সুন্দরী।'

'তুই মেয়েটিকে এক বার আসতে বলিস তো আমাদের বাড়িতে! দেখব।'

'বলব। তুমি নিজে এক বার গেলেই পার। মেয়েটা ভালো। কথাবার্তায় খুব ভদ্র। ওর বরকে দেখেছ, আনিস সাহেব?'

'হুঁ।'

'ঐ লোকটা বোকা ধরনের। বোকার মতো কথাবার্তা। আমাকে আপনি-আপনি করে বলে।'

'কলেজে পড়িস, তোকে আপনি বলবে না?'

'ফ্রক-পরা কাউকে এ-রকম এক জন বুড়ো মানুষ আপনি বলবে নাকি?'

'বুড়ো নাকি?'

'চল্লিশের ওপর বয়স হবে।'

'মেয়েটার বয়স কত?'

'খুব কম। চোদ্দ-পনের হবে।'

বিলু বাতি নিভিয়ে দিল এবং নিমিষেই ঘুমিয়ে পড়ল। নীলু জেগে রইল অনেক রাত পর্যন্ত। কিছুতেই তার ঘুম এল না। ইদানীং তার ঘুম খুব কমে গেছে। রোজই মাঝরাত না হওয়া অবধি ঘুম আসে না।

রানু চুলায় ভাত চড়িয়ে বসার ঘরে এসে দেখে বাড়িঅলার বড় মেয়েটি ঘরের ভেতর।

'না জিজ্ঞেস করেই ঢুকে পড়লাম ভাই। আমার নাম নীলু।'

'আসুন, আসুন। আপনাকে আমি চিনি। আপনি বাড়িঅলার বড় মেয়ে। আজ ইউনিভার্সিটি যান নি?'

'উঁহু। আজ ক্লাস নেই। আপনার সঙ্গে গল্প করতে এলাম। কী করছিলেন?'

'ভাত রান্না করছি।'

'চলুন, রান্নাঘরে গিয়ে বসি। বিলুর কাছ থেকে আপনার খুব প্রশংসা শুনি। বিলুর ধারণা, আপনি হচ্ছেন হেমা মালিনী।'

রানু অবাক হয়ে বলল, 'হেমা মালিনীটি কে?'

'আছে একজন। সিনেমা করে। সবাই বলে খুব সুন্দর। আমার কাছে সুন্দর লাগে না। চেহারাটা অহঙ্কারী।'

রানু মুখ টিপে হাসতে-হাসতে বলল, 'সুন্দরী মেয়েরা তো অহঙ্কারীই হয়।'

'আপনিও অহঙ্কারী?'

রানু হাসতে-হাসতে বলল, 'হ্যাঁ। কিন্তু আমাকে আপনি-আপনি বলতে পারবেন না। তুমি করে বলতে হবে।'

নীলু লক্ষ করল মেয়েটি বেশ রোগা, কিন্তু সত্যিই রূপসী। সচরাচর দেখা যায় না। চোখ দু'টি কপালের দিকে ওঠান বলে—দেবী-প্রতিমার চোখের মতো লাগে। সমগ্র চেহারায় খুব সূক্ষ্ম হলেও কোথাও যেন একটি মূর্তি-মূর্তি ভাব আছে।

'কী দেখছেন?'

'তোমাকে দেখছি ভাই। তোমার চেহারায় একটা মূর্তি-মূর্তি ভাব আছে।'

রানু মুখ কালো করে ফেলল। নীলু অবাক হয়ে বলল, 'ও কী! তুমি মনে হয় মন-খারাপ করলে?'

'না, মন-খারাপ করব কেন?'

'কিন্তু এমন মুখ কালো করলে কেন? আমি কিন্তু কমপ্লিমেন্ট হিসেবে তোমাকে বলেছি। তোমার মতো সুন্দরী মেয়ে আমি খুব বেশি দেখি নি। তবে এক বার একটি বিহারি মেয়েকে দেখেছিলাম। আমার ছোটমামার বিয়েতে। অবশ্যি সে-মেয়েটি তোমার মতো রোগা ছিল না। ওর স্বাস্থ্য বেশ ভালো ছিল।'

'আপনি কি একটু চা খাবেন?'

'তুমি আমাকে আপনি করে বলছ কেন? তোমার কি মনে হয় আমার বয়স

অনেক বেশি?'

'না, তা মনে হয় না।'

'তুমিও আমাকে তুমি বলবে। আর তোমার যদি আপত্তি না থাকে, তাহলে আমি মাঝে-মাঝে তোমার কাছে আসব।'

রানু চায়ের কাপ সাজাতে-সাজাতে মৃদু স্বরে বলল, 'আমাকে মূর্তি-মূর্তি লাগে, এটা বললে কেন?'

নীলু অবাক হয়ে বলল, 'এমনি বলেছি। টানাটানা চোখ তো, সে জন্যে। তুমি দেখি ভাই রাগ করেছ।'

'একটা কারণ আছে নীলু। তোমাকে আমি এক দিন সব বলব, তাহলেই বুঝবে। চায়ে কতটুকু চিনি খাও?'

'তিন চামচ।'

নীলু অনেকক্ষণ বসল, কিন্তু কথাবার্তা আর তেমন জমল না। রানু কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। কিছুতেই মন লাগাতে পারছে না। সহজ হতে পারছে না। নীলু বেশ কয়েক বার অন্য প্রসঙ্গ আনতে চেষ্টা করল। ভাসা-ভাসা জবাব দিল রানু। এবং একসময় হালকা স্বরে বলল, 'আমার একটা অসুখ আছে নীলু।'

'কি অসুখ?'

'মাঝে-মাঝে আমি ভয় পাই।'

'ভয় পাই মানে?'

রানু মাথা নিচু করে বলল, 'ছোটবেলায় এক বার নদীতে গোসল করতে গিয়েছিলাম, তার পর থেকে এ-রকম হয়েছে।'

'কী হয়েছে?'

রানু জবাব দিল না।

'বল, কী হয়েছে?'

'অন্য এক দিন বলব। আজ তুমি তোমার কথা বল।'

'আমার তো বলার মতো কোনো কথা নেই।'

'তোমার বন্ধুদের কথা বল।'

'আমার তেমন কোনো বন্ধুও নেই। আমি বলতে গেলে একা-একা থাকি। অসুন্দরী মেয়েদের বন্ধুটন্ধু থাকে না।'

'রঙ খারাপ হলে মানুষ অসুন্দর হয় না নীলু।'

'আমি নিজে কী, সেটা আমি ভালোই জানি।'

নীলু উঠে পড়ল। রানু বলল, 'আবার আসবে তো?'

'আসব। তুমি তোমার ভয়ের কথাটথা কি বলছিলে, সেই সব বলবে।'

'বলব।'

নীলু পাঠাবে না পাঠাবে না করেও চিঠিটি পাঠিয়ে দিল। কিন্তু তার পরপরই দুশ্চিন্তার সীমা রইল না। কে জানে, বুড়ো-হাবড়া লোকটি এক দিন হয়তো বাসায় এসে হাজির হবে। দারুণ লজ্জার ব্যাপার হবে সেটা। নিতান্তই ছেলেমানুষি কাজ করা হয়েছে। চার-পাঁচ দিন নীলুর খুব খারাপ কাটল। দারুণ অস্বস্তি। বুড়োমতো কোনো মানুষকে আসতে

দেখলেই চমকে উঠত, এটিই সেই লোক নাকি? যদি সত্যি-সত্যি কেউ এসে পড়ে, তাহলে সে ভেবে রেখেছে বলবে—এই চিঠি তো আমার নয়। অন্য কেউ তামাশা করে এই ঠিকানা দিয়েছে। আমি এ-রকম অজানা-অচেনা কাউকে চিঠি লিখি না।

কেউ অবশ্যি এল না। দেখতে-দেখতে এক সপ্তাহ কেটে গেল। চিঠিরও কোনো উত্তর নেই। লোকটি হয়তো চিঠি পায় নি। ডাকবিভাগের কল্যাণে আজকাল তো বেশির ভাগ চিঠিই প্রাপকের হাতে পৌঁছায় না। এতে ক্ষতি যেমন হয়, লাভও তেমনি হয়। কিংবা হয়তো এমন হয়েছে, ঐ লোক অসংখ্য চিঠি পেয়ে পছন্দমতো চিঠিগুলোর উত্তর দিয়েছে। নীলুর তিন লাইনের চিঠি তার পছন্দ হয় নি। সে হয়তো লম্বা-লম্বা চমৎকার সব চিঠি পেয়েছে। ইনিয়ে-বিনিয়ে অনেক কিছু লেখা সব চিঠিতে।

দশ দিনের মাথায় নীলুর কাছে চিঠি এসে পড়ল। খুবই দামী একটা খামে চমৎকার প্যাডের কাগজে চিঠি। গোটা-গোটা হাতের লেখা। কালির রঙ ঘন কালো। মাখন-রাঙা সে কাগজে লেখাগুলো মুক্তার মতো ফুটে আছে। এত সুন্দর হাতের লেখাও মানুষের হয়! চিঠিটি খুবই সংক্ষিপ্ত।

কল্যাণীয়াসু
তোমার চমৎকার চিঠি গভীর আগ্রহ নিয়ে পড়েছি। একজন ব্যথিত মানুষের আবেদনে তুমি সাড়া দিয়েছ—তোমাকে ধন্যবাদ। খুব সামান্য একটি উপহার পাঠালাম। প্লীজ, নাও।

আহমেদ সাবেত

উপহারটি সামান্য নয়। অত্যন্ত দামী একটি পিওর পারফিউমের শিশি।

নীলু ভেবে পেল না, এই লোকটি কি সবাইকে এ-রকম একটি উপহার পাঠিয়েছে? যারাই চিঠির জবাব দিয়েছে তারাই পেয়েছে? কিন্তু তাও কি সম্ভব? নাকি নীলু একাই চিঠির জবাব দিয়েছে? নীলুর বড় লজ্জা করতে লাগল। সে পারফিউমের শিশিটি লুকিয়ে রাখল, এবং খুব চেষ্টা করতে লাগল সমস্ত ব্যাপার ভুলে যেতে। সে চিঠিটি কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দিল জানালা দিয়ে। কেন এমন একটা বাজে ঝামেলায় জড়াল?

কিন্তু দিন সাতেক পর নীলু আবার একটি চিঠি লিখল। একটি বেশ দীর্ঘ চিঠি। সেখানে শেষের দিকে লেখা—আপনি কে, কী করেন—কিছুই তো জানান নি। আপনার বিজ্ঞাপনটিও দেখছি না। তার মানে কি এই যে আপনার নিঃসঙ্গতা এখন দূর হয়েছে?

নীলু বেশ কিছু দিন অপেক্ষা করল চিঠির জবাবের জন্যে। কিন্তু কোনো জবাব এল না। কেন জানি নীলুর বেশ মন-খারাপ হল। আরেকটি চিঠি লেখার ইচ্ছা হতে লাগল। কিন্তু তাও কি হয়? একা-একা সে শুধু চিঠি লিখবে? তার এত কী গরজ পড়েছে?

৫

দুপুর-রাতে আনিসের ঘুম ভেঙে গেল। হাত বাড়াল অভ্যেসমতো। পাশে কেউ নেই।

আনিস ডাকল, 'রানু, রানু।' কোনো সাড়া নেই। বাথরুম থেকে একটানা পানি পড়ার শব্দ হচ্ছে। বাথরুমে নাকি? আনিস উঁকি দিল বাথরুমে—কেউ নেই। কোথায় গেল। আনিস গলা উঁচিয়ে ডাকল, 'রানু'। বসার ঘর থেকে ক্ষীণ হাসির শব্দ এল। বসার ঘর অন্ধকার। রানু কি সেখানে একা-একা বসে আছে নাকি?

আনিস বসার ঘরে ঢুকে বাতি জ্বেলেই সঙ্গে-সঙ্গে বাতি নিভিয়ে ফেলল। রানু বসার ঘরের ছোট টেবিলে চুপচাপ বসে আছে। তার গায়ে কোনো কাপড় নেই।

'এই রানু।'

'উঁ।'

'কী হয়েছে? তোমার কাপড় কোথায়?'

'খুলে ফেলেছি। বড্ড গরম লাগছে।'

আনিস এসে রানুর হাত ধরল। হিমশীতল হাত। একটু-একটু যেন কাঁপছে।

'এস রানু, ঘুমুতে যাই।'

'আমার ঘুমুতে ইচ্ছে করছে না। তুমি যাও।'

'কাল আমরা একজন ডাক্তারের কাছে যাব, কেমন?'

'কেন?'

'তোমার শরীর ভালো না রানু।'

'আমার শরীর ভালোই আছে।'

'না, তুমি খুব অসুস্থ। এস আমার সঙ্গে। কাপড় পরে ঘুমুতে এস।'

রানু কোনো আপত্তি করল না। সঙ্গে-সঙ্গেই উঠে এল। কাপড় পরল এবং বাধ্য মেয়ের মতো বিছানায় শুয়ে প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল। জেগে রইল আনিস। রানুর শরীর দ্রুত খারাপ হচ্ছে। আগে তো এ-রকম কখনো হয় নি। মিসির আলি-টালি নয়, বড় কোনো ডাক্তারকে দেখানো দরকার।

খুটখুট করে শব্দ হচ্ছে রান্নাঘরে। ইঁদুরের উপদ্রব। তবু কেন জানি শব্দটা অন্য রকম মনে হচ্ছে। যেন কেউ হাঁটছে রান্নাঘরে। থপ্‌থপ্ শব্দও হল কয়েক বার। আনিস বলল, 'কে?' রান্নাঘরের শব্দটা হঠাৎ থেমে গেল। আনিস বলল, 'কে? কে?' মনের ভুল নাকি? আনিস যেন স্পষ্ট শুনল, রান্নাঘর থেকে কেউ-একজন বলল, 'আমি'। স্পষ্ট এবং তীক্ষ্ণ আওয়াজ। মেয়েলি স্বর। নাকি রানুই বলছে ঘুমের ঘোরে? এটাই হয়েছে। রানুরই গলা।

আনিস হাত বাড়িয়ে রানুকে কাছে টানল। রানু বলল, 'হাতটা সরিয়ে নাও, গরম লাগছে।' তার মানে কি রানু জেগে ছিল এতক্ষণ?

'রানু।'

'উঁ।'

'তুমি কি জেগে ছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'আমি যখন বললাম কে কে, তখন কি তুমি বলেছ, আমি?'

রানু চুপ করে রইল। আনিস বলল, 'বল,বলেছ এ-রকম কিছু?'

'হ্যাঁ, বলেছি।'

'কিন্তু তুমি জবাব দিলে কেন? তোমাকে তো কিছু জিজ্ঞেস করি নি। আমি

জানতে চাচ্ছিলাম রান্নাঘরে কেউ আছে কি না।'

রানু ফিসফিস করে বলল, 'আমি তো রান্নাঘরেই ছিলাম। আমি রান্নাঘর থেকেই জবাব দিয়েছি।'

আনিস চুপ করে গেল। বিছানায় উঠে বসে পরপর দু'টি সিগারেট শেষ করল। বাথরুমে গিয়ে বাতি জ্বালিয়ে রেখে এল। রান্নাঘরের বাতিও জ্বালিয়ে দিয়ে এল। থাকুক, সারা রাত বাতি জ্বালানো থাকুক।

'রানু।'

'কি?'

'কাল তুমি আমার সঙ্গে একজন ডাক্তারের কাছে যাবে, কেমন?'

'ঠিক আছে, যাব।'

'ডাক্তার সাহেব যা-যা জানতে চান, সব বলবে।'

রানু জবাব দিল না। মনে হল সে ঘুমিয়ে পড়েছে। শান্ত নির্বিঘ্ন ঘুম। কিন্তু রান্নাঘরে আবার শব্দ হচ্ছে। আনিসের মনে হল সে স্পষ্ট চুড়ির টুনটুন শব্দ শুনছে। কাঁচের চুড়ির আওয়াজ। আনিস কয়েক বার ডাকল, 'কে, কে ওখানে?' কেউ কোনো জবাব দিল না। বাথরুম থেকে একটানা জল পড়ার শব্দ আসছে। বাড়িঅলাকে বলতে হবে কল ঠিক করে দিতে। এক জন কাজের মানুষ রাখতে হবে। পুরুষমানুষ নয়, মেয়েমানুষ—যে [illegible]ত-দিন থাকবে। আত্মীয়স্বজন কাউকে এনে রাখলে ভালো হত। কিন্তু আনিসের তেমন কোনো আত্মীয়স্বজন নেই, যারা এখানে এসে থাকবে। আনিসের ঘুম এল শেষরাতের দিকে।

মিসির সাহেবের সঙ্গে তারা প্রায় দু' ঘন্টা সময় কাটাল।

রানু খুব সহজ-স্বাভাবিক আচরণ করল। এর প্রধান কৃতিত্ব সম্ভবত মিসির সাহেবের। তিনি খুব আন্তরিক ভঙ্গিতে কথাবার্তা বললেন। এক পর্যায়ে রানু বলল, 'আপনি আমাকে তুমি করে বলবেন, আমি আপনার মেয়ের বয়সী।'

'মেয়ের বয়সী হলে কী, আমার তো মেয়ে নেই। বিয়েই করি নি।'

রানু কিছু-একটা বলতে গিয়েও বলল না। ভদ্রলোক সেটি লক্ষ করলেন।

'তুমি কিছু বলতে চাচ্ছিলে?'

'জ্বি-না।'

'কিছু বলতে চাইলে বলতে পার।'

'না, আমি কিছু বলব না।'

মিসির সাহেব চায়ের ব্যবস্থা করলেন। চা খেতে-খেতে নিতান্তই সহজ ভঙ্গিতে বললেন, 'আনিস সাহেব বলেছিলেন, তুমি যা স্বপ্নে দেখ তা-ই সত্যি হয়।'

'হুঁ।'

'যা স্বপ্নে দেখ তা-ই হয়?'

'শুধু স্বপ্ন না, যা আমার মনে আসে তা-ই হয়।'

'বল কী!'

'আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না, না?'

'বিশ্বাস হবে না কেন? পৃথিবীতে অনেক অদ্ভুত ব্যাপার আছে। পৃথিবীটা বড়

অদ্ভুত।'

বলতে–বলতে মিসির আলি ড্রয়ার খুলে চৌকা ধরনের চারটি কার্ড বের করলেন। হাসিমুখে বললেন, 'রানু, এই কার্ডগুলিতে ডিজাইন আঁকা আছে। আমি একেকটি টেবিলের ওপর রাখব, ডিজাইনগুলি থাকবে নিচে। তুমি না দেখে বলতে চেষ্টা করবে।'

রানু অবাক হয়ে বলল, 'না দেখে বলব কীভাবে?'

'চেষ্টা করে দেখ। পারতেও তো পার। বল দেখি এই কার্ডটিতে কী আঁকা আছে?'

'কী আশ্চর্য, কী করে বলব?'

'আন্দাজ কর। যা মনে আসে তা–ই বল।'

'একটা ক্রস চিহ্ন আছে। ঠিক হয়েছে?'

'তা বলব না। এবার বল এটিতে কী আছে?'

'খুব ছোট–ছোট সার্কেল।'

'ক'টি, বলতে পারবে?'

'মনে হচ্ছে তিনটি। চারটিও হতে পারে।'

মিসির সাহেব কার্ডগুলি ড্রয়ারে রেখে সিগারেট ধরালেন। তাঁকে কেমন যেন চিন্তিত মনে হতে লাগল। আনিস বলল, 'ও কি বলতে পেরেছে?' মিসির সাহেব তার জবাব না–দিয়ে বললেন, 'রানু, এবার তুমি বল, প্রথম ভয়টা তুমি কীভাবে পেলে। সবকিছু বলবে, কিছুই বাদ দেবে না। আমি তোমাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করছি।'

রানু চুপ করে রইল।

'তুমি নিশ্চয়ই চাও, তোমার অসুখটা সেরে যাক। চাও না?'

'চাই।'

'তাহলে বল। কোনোকিছু বাদ দেবে না।'

রানু তাকাল আনিসের দিকে। মিসির আলি বললেন, 'আনিস সাহেব, আপনি না–হয় পাশের ঘরে গিয়ে বসেন। ঐ ঘরে অনেক বইপত্র আছে, বসে-বসে পড়তে থাকুন। ন্যাশনাল জিওগ্রাফির কারেন্ট ইস্যুটা আছে, গতকালই এসেছে।'

রানু বলতে শুরু করল। মিসির আলি শুনতে লাগলেন চোখ বন্ধ করে। একটি প্রশ্নও জিজ্ঞেস করলেন না। মাঝখানে এক বার শুধু বললেন, 'পানি খাবে? তৃষ্ণা পেয়েছে?' রানু মাথা নাড়ল। তিনি পানির জগ এবং গ্লাস নিয়ে এলেন। শান্ত স্বরে বললেন, 'চোখে–মুখে পানি দিয়ে নাও, ভালো লাগবে।' রানু সে–সব কিছুই করল না। শান্ত ভঙ্গিতে বসে রইল। কথা বলতে লাগল স্পষ্ট স্বরে।

রানুর প্রথম গল্প

আমার বয়স তখন এগার–বার বৎসর। আমি মধুপুরে আমার এক চাচার বাড়িতে বেড়াতে গেছি। চাচাতো বোনের বিয়েতে। চাচাতো বোনটির নাম হচ্ছে অনুফা। খুবই ভালো মেয়ে। কিন্তু চাচা বিয়ে ঠিক করেছেন একটা বাজে ছেলের সঙ্গে। ছেলের প্রচুর জায়গাটায়গা আছে, কিন্তু কিছুই করে না। দেখতেও বাজে, দাঁত উঁচু, মুখে বসন্তের দাগ। দারুণ বেঁটে। অনুফা আপার এই নিয়ে খুব মন–খারাপ। প্রায়ই এই নিয়ে কাঁদে। আমি তাকে সান্ত্বনাটান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করি। কিন্তু আমি নিজে একটি বাচ্চা মেয়ে, তাকে কী সান্ত্বনা দেব? তবে আমার সঙ্গে অনুফা আপার খুব ভাব ছিল। আমাকে অনেক

গোপন কথাটথা বলত।

যাই হোক, গায়ে-হলুদের দিন খুব রঙ খেলা হল। আমাদের ওদিকে রঙ খেলা হচ্ছে—উঠোনে কাদা ফেলে তাতে গড়াগড়ি খাওয়া। সারা দিন রঙ খেলে কাদা মেখে সবাই ভূত হয়ে গেছি। ঠিক করা হল সবাই মিলে নদীতে গোসল সেরে আসবে। চাচা অবশ্যি আপত্তি করলেন—মেয়েছেলেরা নদীতে যাবে কী?

চাচার আপত্তি অবশ্যি টিকল না। আমরা মেয়েরা সবাই দল বেঁধে নদীতে গোসল করতে গেলাম। বাড়ি থেকে অল্প কিছু দূরেই নদী। আমরা প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ জন মেয়ে, খুব হৈচৈ হচ্ছে। সবাই মিলে মহানন্দে পানিতে ঝাঁপাঝাঁপি করছি। সেখানেও খুব কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি শুরু হল। ঠিক তখন একটা কাণ্ড হল, মনে হল একজন কে যেন আমার পা জড়িয়ে ধরেছে। নির্ঘাত কেউ তামাশা করছে। আমি হাসতে-হাসতে বললাম—এ্যাই, ভালো হবে না। ছাড় বলছি, ছাড়। কিন্তু যে পা ধরেছে সে ছাড়ল না, হঠাৎ মনে হল সে টেনে আমার পায়জামাটা খুলে ফেলতে চেষ্টা করছে। তখন আমি চিৎকার দিলাম। সবাই মনে করল কোনো-একটা তামাশা হচ্ছে। কেউ কাছে এল না। কিন্তু ততক্ষণে আমার পায়জামাটা খুলে ফেলেছে আর, আর....। [এই সময় মিসির সাহেব বললেন, 'বুঝতে পারছি তারপর কী হল।']

সবার প্রথম অনুফা আপা ছুটে এসে আমাকে ধরলেন, তারপর অন্যরা ছুটে এল। যে আমার পা জড়িয়ে ধরেছিল, সে আমাকে শক্ত করে চেপে ধরে গভীর জলের দিকে টেনে নিতে লাগল। তারপর আমার আর কিছু মনে নেই।

জ্ঞান হবার পর শুনেছি ওরা আমাকে বহু কষ্টে টেনে পাড়ে তুলেছে এবং দেখেছে একটা মরা মানুষ আমাকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে। ঐ মরা মানুষটাকে গ্রামের লোকেরা নদীর পাড়ে মাটি চাপা দিয়েছিল। সেইসব কিছুই অবশ্যি আমি দেখি নি, শুনেছি। কারণ আমার কোনো জ্ঞান ছিল না। চাচা আমার চিকিৎসার জন্যে আমাকে ঢাকা নিয়ে এসেছিলেন। সবাই ধরে নিয়েছিল আমি বাঁচব না। কিন্তু বেঁচে গেলাম। এইটুকু আমার প্রথম ভয়ের গল্প।

রানু গল্প শেষ করে পুরো এক গ্লাস পানি খেল। মিসির আলি সাহেব বললেন, 'ঐ লোককে তুমি দেখ নি?'

'জ্বি-না।'

'গ্রামের অন্যরা তো দেখেছে, কী রকম ছিল দেখতে?'

'আমি জানি না, কাউকে জিজ্ঞেস করি নি। কেউ আমাকে কিছু বলে নি।'

'এর পর কি তুমি কখনো তোমার চাচার বাড়ি গিয়েছিলে?'

'জ্বি-না, কখনো যাই নি।'

'আরেকটা কথা তুমি বলছিলে। ঐ লোকটি তোমার পায়জামা টেনে খুলে ফেলতে চেষ্টা করছিল। তোমাকে যখন টেনে তোলা হল তখন কি পায়জামা পরনে ছিল?'

'জ্বি-না, ছিল না।'

মিসির আলি সাহেব সিগারেট ধরিয়ে নিচু গলায় বললেন, 'আমার কেন জানি মনে হচ্ছে কোনো একটি জিনিস তুমি আমাকে বল নি। কিছু-একটা বাদ দিয়ে গেছ।'

রানু জবাব দিল না।

'যে-জিনিসটা বাদ দিয়েছ, সেটা আমার শোনা দরকার। সেটা কী, বলবে?'

'অন্য আরেক দিন বলব।'

'ঠিক আছে, অন্য এক দিন শুনব। তোমাকে আসতে হবে না, আমি গিয়ে শুনে আসব।'

রানু কিছু বলল না। মিসির আলি সাহেব কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে থেকে হঠাৎ বললেন, 'যখন তুমি একা থাক, তখন কি কেউ তোমার সঙ্গে কথা বলে?'

'হ্যাঁ।'

মিসির আলি খুব উৎসাহ বোধ করলেন।

'ব্যাপারটা গুছিয়ে বল।'

'মাঝে-মাঝে কে যেন আমাকে নাম ধরে ডাকে।'

'পুরুষদের গলায়?'

'জ্বি-না। মেয়েদের গলায়।'

'শুধু ডাকে, অন্য কিছু বলে না?'

'জ্বি-না।'

'এবং যে ডাকে তাকে কখনো দেখা যায় না।'

'জ্বি-না।'

'এটা প্রথম কখন হয়? অর্থাৎ প্রথম কখন শুনলে? নদীর ব্যাপারটা ঘটার আগেই?'

'হুঁ।'

'কত দিন আগে?'

'আমার ঠিক মনে নেই।'

'আচ্ছা ঠিক আছে, আজ এই পর্যন্তই।'

রানুরা উঠে দাঁড়াল। মিসির আলি ভারি গলায় বললেন, 'আবার দেখা হবে।' রানু কিছু বলল না। আনিস বলল, 'আমরা তাহলে যাই?'

'আচ্ছা, ঠিক আছে।'

মিসির আলি ওদের রিকশা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এলেন। ওরা রিকশায় উঠবার সময় তিনি হঠাৎ বললেন, 'রানু, যে তোমার পা জড়িয়ে ধরেছিল, ওর নাম কী?'

'ওর নাম জালালউদ্দিন।'

'কি করে জানলে, ওর নাম জালালউদ্দিন?'

রানু তাকিয়ে রইল, কিছু বলল না। মিসির আলি সাহেব বললেন, 'ঠিক আছে, পরে কথা হবে।'

রিকশায় ওরা দু' জনে কোনো কথা বলল না। আনিসের এক বার মনে হল, রানু কাঁদছে। সে সিগারেট ধরিয়ে সহজ স্বরে বলল, 'ভদ্রলোককে তোমার কেমন লাগল রানু?'

'ভালো। বেশ ভালো লোক। উনি আসলে কী করেন?'

'উনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পার্ট-টাইম টীচার। ক্লিনিক্যাল সাইকিয়াট্রি পড়ান। খুব জ্ঞানী লোক।'

'ইউনিভার্সিটির টীচাররা এমন রোগা হয়, তা তো জানতাম না! আমার ধারণা ছিল তাঁরা খুব মোটাসোটা হন।'

রানু শব্দ করে হাসল। আনিস বলল, 'আজ বাইরে খাওয়াদাওয়া করলে কেমন হয়?'

'শুধু-শুধু টাকা খরচ।'

'তোমার গিয়ে রান্না চড়াতে হবে না। চল না, কিছু পয়সা খরচ হোক।'

'কোথায় খাবে?'

'আছে আমার একটা চেনা জায়গা। নানরুটি আর কাবাব। কি বল?'

৬

মিসির আলি সাহেব দেখলেন তাঁর ঘরের সামনে চারটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোনো টিউটোরিয়েল ক্লাস আছে নাকি? আজ বুধবার, টিউটোরিয়েল ক্লাস থাকার কথা নয়। তবে কে জানে হয়তো নতুন রুটিন দিয়েছে। তিনি এখনো নোটিস পান নি।

'এই, তোমাদের কী ব্যাপার?'

মেয়েগুলি জড়সড় হয়ে গেল।

'কি, তোমাদের সঙ্গে কোনো ক্লাস আছে?'

'জ্বি-না স্যার।'

'তাহলে কি? কিছু বলবে?'

'স্যার, নোটিস-বোর্ডে আপনি একটা নোটিস দিয়েছিলেন, সেই জন্যে এসেছি।'

'কিসের নোটিস?'

তিনি ভুরু কোঁচকালেন। মেয়েগুলো মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল।

'কী নোটিস দিয়েছিলাম?'

'স্যার, আপনি লিখেছেন--কারো এক্সট্রাসেন্সরি পারসেপশনের ক্ষমতা আছে কি না আপনি পরীক্ষা করে বলে দেবেন।'

মিসির আলি সাহেবের সমস্ত ব্যাপারটা মনে পড়ল। মাস দুয়েক আগে এ-রকম একটা নোটিস দিয়েছিলেন ঠিকই। কিন্তু এই প্রথম চার জনকে পাওয়া গেল, যারা উৎসাহী। এবং সব ক'টি মেয়ে। মেয়েগুলো রোগা। তার মানে কি অকল্টের ব্যাপারে রোগা মেয়েরাই বেশি উৎসাহী? তিনি মনে-মনে একটা নোট তৈরি করলেন, এবং তৎক্ষণাৎ তাঁর মনে হল বিষয়টি ইন্টারেস্টিং। একটা সার্ভে করা যেতে পারে।

'এস তোমরা। ঘরে এস। তোমরা তাহলে জানতে চাও তোমাদের ইএসপি আছে কি না?'

মেয়েগুলি কথা বলল না। যেন একটু ভয় পাচ্ছে। মুখ সবারই শুকনো।

'বস তোমরা। চেয়ারে আরাম করে বস।'

ওরা বসল। মিসির আলি সাহেব একটা সিগারেট ধরালেন। নিচু গলায় বললেন, 'সব মানুষের মধ্যেই ইএসপি কিছু পরিমাণ থাকে। টেলিপ্যাথির কথাই ধর। তোমাদের নিজেদেরই হয়তো এ-বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে। সহজ উদাহরণ হচ্ছে, ধর, এক দিন তোমাদের কারো মনে হল আজ অমুকের সাথে দেখা হবে। যার সঙ্গে দেখা হবার কথা মনে হচ্ছে, সে কিন্তু এখানে থাকে না। থাকে চিটাগাং। কিন্তু সত্যি-সত্যি দেখা হয়ে

গেল। কি, হয় না এ-রকম?

মেয়েগুলো কথা বলল না। এর মধ্যে এক জন রুমাল দিয়ে কপাল মুছতে লাগল। মেয়েটি ঘামছে। নার্ভাস হয়ে পড়ছে মনে হয়। নিশ্চয়ই ব্লাড-প্রেশার বেড়ে গেছে। মিসির আলি বিস্মিত হলেন। নার্ভাস মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই বিষয়ের চর্চা এখনো বিজ্ঞানের পর্যায়ে পড়ে না। বেশির ভাগ সিদ্ধান্তই অনুমানের ওপর। তবে আমেরিকায় একটি ইউনিভার্সিটি আছে—ডিউক ইউনিভার্সিটি। ওরা কিছু-কিছু এক্সপেরিমেন্টাল কাজ শুরু করেছে। মুশকিল হচ্ছে, ফলাফল সবসময় রিপ্রডিউসিবল্ নয়।'

মিসির আলি সাহেব ড্রয়ার খুলে দশটি চৌকো কার্ড টেবিলে বিছালেন। হাসিমুখে বললেন, 'পরীক্ষাটি খুব সহজ। এই কার্ডগুলোতে বিভিন্ন রকম চিহ্ন আছে। যেমন ধর ক্রস, স্কয়ার, ত্রিভুজ, বিন্দু। কোনটিতে কী আছে সেটা অনুমান করতে চেষ্টা করবে। দু'-এক বার কাকতালীয়ভাবে মিলে যাবে। তবে ফলাফল যদি স্ট্যাটিসটিক্যালি সিগনিফিকেন্ট হয়, তাহলে বুঝতে হবে তোমাদের ইএসপি আছে। এখন এস দেখি, কে প্রথম বলবে? তোমার কী নাম?'

'নীলুফার।'

'হ্যাঁ নীলুফার, তুমিই প্রথম চেষ্টা কর। যা মনে আসে তা-ই বল।'

'আমার কিছু মনে আসছে না।'

'তাহলে অনুমান করে বল।'

মেয়েটি ঠিকমতো বলতে পারল না। তার সঙ্গীরাও না। মিসির আলি হাসতে-হাসতে বললেন, 'নাহ্, তোমাদের কারো কোনো ইএসপি নেই।' ওরা যেন তাতে খুশিই হল। মিসির আলি গম্ভীর গলায় বললেন, 'না থাকাই ভালো। আধুনিক মানুষদের এ-সব থাকতে নেই। এতে অনেক রকম জটিলতা হয়।'

'কী জটিলতা?'

'আছে, আছে।'

'বলুন না স্যার।'

মিসির আলি লক্ষ করলেন, নীলুফার নামের মেয়েটিই কথা বলছে। স্পষ্ট সতেজ গলা।

'অন্য আরেক দিন বলব। আজ তোমরা যাও।'

নীলুফার বলল, 'এমন কিছু কি স্যার আছে, যা করলে ইএসপি হয়?'

'লোকজন বলে, প্রেমে পড়লেও এই ক্ষমতাটা অসম্ভব বেড়ে যায়। আমি ঠিক জানি না। তোমরা যদি কেউ কখনো প্রেমে পড়, তাহলে এস, পরীক্ষা করে দেখব।'

কথাটা বলেই মিসির আলি অপ্রস্তুত বোধ করলেন। ছাত্রীদের এটা বলা ঠিক হয় নি। কথাবার্তায় তাঁর আরো সাবধান হওয়া উচিত। এ-রকম হালকা ভঙ্গিতে কথা বলা ঠিক হচ্ছে না।

'স্যার, আমরা যাই?'

'আচ্ছা ঠিক আছে, দেখা হবে।'

মিসির আলি নিচের টীচার্স লাউঞ্জে চা খেতে এলেন। বেলা প্রায় তিনটা। লাউঞ্জে লোকজন নেই। পলিটিক্যাল সায়েন্সের রশিদ সাহেব এক কোণায় বসে ছিলেন। তিনি

অস্পষ্ট স্বরে ডাকলেন, 'এই যে মিসির সাহেব, অনেক দিন পর মনে হয় এলেন এদিকে। চা খাবেন?'

'হুঁ।'

'কে যেন বলছিল, আপনি নাকি ভূতে-ধরা সারাতে পারেন। ঠিক নাকি?'

'জ্বি-না। আমি ওঝা নই।'

'রাগ করলেন নাকি? আমি কথার কথা বললাম।'

'না, রাগ করব কেন?'

'আচ্ছা মিসির আলি সাহেব, আপনি ভূত বিশ্বাস করেন?'

'না।'

রশিদ সাহেব উৎসাহিত হয়ে উঠলেন।

'আত্মা, আত্মায় বিশ্বাস করেন?'

'না ভাই, আমি একজন নাস্তিক।'

'আত্মা নেই—এই জিনিসটা কি প্রমাণ করতে পারবেন? কী কী যুক্তি আছে আপনার হাতে?'

মিসির আলি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। রশিদ সাহেব বললেন, 'আত্মা যে আছে, এর পক্ষে বিজ্ঞানীদের কিছু চমৎকার যুক্তি আছে।'

'থাকলে তো ভালোই। বিজ্ঞানীরা জড়জগৎ বাদ দিয়ে আত্মাটাত্মা নিয়ে উৎসাহী হলেই কিন্তু ঝামেলা। রশিদ সাহেব, আমার মাথা ধরেছে। এ নিয়ে আর কথা বলতে চাই না। কিছু মনে করবেন না।'

মিসির আলি চা না-খেয়েই উঠে পড়লেন। তাঁর সত্যি-সত্যি মাথা ধরেছে। প্রচণ্ড ব্যথা। বড় রকমের কোনো অসুখের এটা পূর্বলক্ষণ।

৭

নীলু ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরে এসে দেখে তার বিছানার উপর চমৎকার একটি প্যাকেট পড়ে আছে। ব্রাউন কাগজে মোড়া প্যাকেটে গোটা-গোটা করে তার নাম লেখা। নীলুর বুক কেঁপে উঠল, বিলুর চোখে পড়ে নি তো? বিলুর খুব খারাপ অভ্যাস আছে, অন্যের চিঠি খুলে-খুলে পড়বে। হাসাহাসি করবে।

নীলু দরজা বন্ধ করেই প্যাকেটটি খুলল। ছোট্ট চিঠি, কিন্তু কী চমৎকার করেই-না লেখা:

কল্যাণীয়াসু,

ইচ্ছা করেই তোমাকে আমি কম লিখি। তোমার চিঠি পড়ে-পড়ে খুব মায়া জন্মে যায়। এ বয়সে আমার আর মায়া বাড়াতে ইচ্ছা করে না। মায়া বাড়ালেই কষ্ট পেতে হয়। আরেকটি সামান্য উপহার পাঠালাম। গ্রহণ করলে খুব খুশি হব।

আহমেদ সাবেত

উপহারটি বড় সুন্দর! নীল রঙের একটি ডায়েরি। অসম্ভব নরম প্লাস্টিকের কভার, যেখানে ছোট্ট একটি শিশুর ছবি। পাতাগুলো হালকা গোলাপী। প্রতিটি পাতায় সুন্দর–সুন্দর দু' লাইনের কবিতা। ডায়েরিটির প্রথম পাতায় ইংরেজিতে লেখা ঃ

'I wish I could be eighteen again'

A. S.

পড়তে গিয়ে কেন জানি নীলুর চোখে জল এল। এক জন সম্পূর্ণ অজানা–অচেনা মানুষের জন্যে মন কেমন করতে লাগল। লোকটি দেখতে কেমন কে জানে? সুন্দর না নিশ্চয়ই। বয়স্ক মানুষ, হয়তো চুলটুল পেকে গেছে। তাতে কিছু যায় আসে না। মানুষের বয়স হচ্ছে তার মনে। মন যত দিন কাঁচা থাকে, তত দিন মানুষের বয়স বাড়ে না। এই লোকটির মন অসম্ভব নরম। শিশুর মতো নরম। নীলুর মনে হল এই লোকটি স্বামী হিসেবে অসাধারণ ছিল। তার স্ত্রীকে সে নিশ্চয়ই সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালবেসেছে।

নীলু রাতের বেলা দরজা বন্ধ করে দীর্ঘ একটা চিঠি লিখল—আপনি এমন কেন? নিজের কথা তো কিছুই লেখেন নি। অথচ আমি আমার সমস্ত কথা লিখে বসে আছি। তবু মনে হয় সব বুঝি লেখা হল না। অনেক কিছু বুঝি বাকি রয়ে গেল। আপনি আমাকে এত সুন্দর–সুন্দর উপহার দিয়েছেন, কিন্তু আমি তো আপনাকে কিছুই দিই নি। আমার কিছু–একটা দিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু আমি তো জানি না আপনি কী পছন্দ করেন। আচ্ছা, আপনি কি টাই পরেন? তাহলে লাল টকটকে একটা টাই আপনাকে দিতে পারি। জানেন, পুরুষমানুষের এই একটি জিনিসই আমি পছন্দ করি। কিন্তু হয়তো আপনি টাই পরেন না, ঢিলেঢালা ধরনের মানুষদের মতো চাদর গায়ে দেন। আপনার সম্পর্কে আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে। এক দিন আসুন–না আমাদের বাসায়, এক কাপ চা খেয়ে যাবেন। জানেন, আমি খুব ভালো চা বানাতে পারি। অন্য কেউ চা বানিয়ে দিলে আমার বাবা খেতে পারেন না। সব সময় আমাকে বানাতে হয়। গত রোববারে কী হল, জানেন? রাত তিনটেয় বাবা আমাকে ডেকে তুলে বললেন—মা, এক কাপ চা বানা তো, বড্ড চায়ের তৃষ্ণা পেয়েছে।

'আপা, দরজা বন্ধ করে কী করছ?'

নীলু অপ্রস্তত হয়ে দরজা খুলল। বিলু দাঁড়িয়ে আছে। সন্দেহজনকভাবে তাকাচ্ছে।

'কী করছিলে?'

'কিছু করছিলাম না।'

বিলু বিছানায় এসে বসল, 'আপা, তোমার মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ করছি।'

'কী পরিবর্তন?'

'অস্থির–অস্থির ভাব। লক্ষণ ভালো না আপা। বল তো কী হয়েছে?'

'কী আবার হবে? তোর শুধু উল্টোপাল্টা কথা।'

'কিছু–একটা হয়েছে আপা। আমি জানি।'

'কী যে বলিস!'

'আমার কাছে লুকোতে পারবে না আপা। আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া মুশকিল।'

'যা ভাগ, পাকামো করিস না।'

বিলু গেল না। কাপড় ছাড়তে-ছাড়তে বলল, 'রানু আপাকেও আমি বললাম তোমার পরিবর্তনের কথা। তারও ধারণা, তুমি কারো প্রেমে পড়েছ।'

'হুঁ, আমার তো খেয়েদেয়ে কাজ নেই। তা ছাড়া প্রেমটা আমার সঙ্গে করবে কে? চেহারার এই তো অবস্থা।'

'খারাপ অবস্থাটা কী? রঙটা একটু ময়লা। এ ছাড়া আর কি?'

নীলু ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলল।

'নিঃশ্বাস ফেলছ কেন আপা? নিজের চেহারা সম্পর্কে তোমার এমন খারাপ ধারণা থাকা উচিত না। সবাই তো আর রানু আপার মতো হয় না, হওয়া উচিত নয়।'

'উচিত নয় কেন?'

'সুন্দরী মেয়েদের অনেক রকম প্রবলেম থাকে।'

'কী প্রবলেম?'

'রানু আপার মাথা খারাপ—সেটা তুমি জান?'

'কী বলছিস এ-সব!'

'ঠিকই বলছি। আকবরের মা একদিন দুপুরে কি জন্যে যেন গিয়েছিল, শোনে রানু আপা নিজের মনে হাসছে এবং কথা বলছে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। কথাগুলো বলছে আবার দু' রকম গলায়। আকবরের মা প্রথম ভেবেছিল কেউ বোধহয় বেড়াতে এসেছে। শেষে ঘরে ঢুকে দেখে কেউ নেই।'

'সত্যি?'

'হুঁ। রহমান সাহেবের স্ত্রী বললেন, একদিন নাকি আনিস সাহেব গভীর রাতে রহমান সাহেবকে ডেকে নিয়ে গেলেন তাঁর স্ত্রীর খুব অসুখ, এই কথা বলে। রহমান সাহেব গিয়ে দেখেন অসুখটসুখ কিচ্ছু নেই, দিব্যি ভালো মানুষ।'

নীলু মৃদু স্বরে বলল, 'রানুর মতো সুন্দরী হলে আমি পাগল হতেও রাজি।'

বিলু হেসে ফেলল। হাসতে-হাসতে বলল, 'কথাটা ঠিক বলেছ আপা।'

রানু প্রসঙ্গে পাওয়া সব তথ্য লিখে রাখবার জন্যে মিসির আলি সাহেব মোটা একটা খাতা কিনে এনেছেন। খাতাটির প্রথম পাতায় লেখা—

'এক জন মানসিক রুগীর পর্যায়ক্রমিক মনোবিশ্লেষণ।' দ্বিতীয় পাতায় কিছু ব্যক্তিগত তথ্য। যেমন—

নাম : রানু আহমেদ।

বয়স : সতের বৎসর (রূপবতী)।

বৈবাহিক অবস্থা : বিবাহিতা। (তের মাস আগে বিয়ে হয়)।

স্বাস্থ্য : রুগ্ণা।

ওজন : আশি পাউণ্ড।

স্বামী : আনিস আহমেদ। দি জেনিথ ইন্টারন্যাশনালের ডিউটি অফিসার। বয়স ৩৭। স্বাস্থ্য ভালো।

তৃতীয় পাতার হেডিংটি হচ্ছে—'অডিটরি হেলুসিনেশন।' এর নিচে লাল কালি দিয়ে একটা বড় প্রশ্নবোধক চিহ্ন আঁকা। এই পাতায় অনেক কিছুই লেখা হয়েছে, আবার কাটাকুটি করা হয়েছে। যেন মিসির আলি সাহেব মনস্থির করতে পারছেন না কী লিখবেন। দু'টি লাইন শুধু পড়া যায়। লাইন দু'টির নিচে লাল কালি দিয়ে দাগ

দেওয়া।

'মেয়েটি অডিটরি হেলুসিনেশন হচ্ছে : সে একা থাকাকালীন শুনতে পায় কেউ যেন তাকে ডাকছে।'

পরের কয়েকটি পাতায় রানুর সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের খুঁটিনাটি প্রতিটি বিষয় লেখা। এ পাতাগুলি পড়লেই বোঝা যায়, মিসির আলি নামের এই লোকটির স্মৃতিশক্তি অসাধারণ। অতি তুচ্ছ ব্যাপারগুলিও লেখা আছে। যেমন, এক জায়গায় লেখা—মেয়েটি বেশ কয়েক বার শাড়ির আঁচল টেনেছে। দু' বার শব্দ করে আঙুল ফুটিয়েছে। আমি লক্ষ করলাম মেয়েটি পানি খেল মাথা নিচু করে। বেশ খানিকটা নিচু করে। যেন পানি পান করার ব্যাপারটি সে আড়াল করতে চায়।

নদীতে গোসলের গল্পটি লেখা আছে। গল্পের শেষে বেশ কিছু প্রশ্ন করা আছে। যেমন—

* এক জন মৃত মানুষ পানিতে ভেসে থাকবে। ডুবে থাকবে না। গল্পে মৃত মানুষটির ডুবে-ডুবে চলার কথা আছে। এ-রকম থাকার কথা নয়।

* পাজামা খুলে ফেলার কথা আছে। কিশোরীরা সাধারণত শক্ত গিঁট দিয়ে পাজামা পরে। গিঁট খুলতে হলে ফিতা টানতে হবে। ঐ মানুষটি কি ফিতা টেনেছিল, না পাজামাটাই টেনে নামিয়েছে?

* মৃত লোকটির কি কোনো পোস্ট মর্টেম হয়েছিল?

* তার আনুমানিক বয়স কত ছিল?

* প্রথম অসুস্থতার সময় কি মেয়েটি ঘুমের মধ্যে কোনো কথাবার্তা বলত? কী বলত?

*মেয়েটি বলল লোকটির নাম জালালউদ্দিন। কীভাবে বলল? লোকটির নাম তো জানার কথা নয়। নাকি পরে শুনেছে?

* জালালউদ্দিন-জাতীয় নামের কারো সঙ্গে কি এই মেয়েটির পূর্বপরিচয় ছিল?

প্রশ্নের শেষে তিনটি মন্তব্য লেখা আছে। মন্তব্যগুলি সংক্ষিপ্ত। প্রথম মন্তব্য—মেয়েটি যে-ঘটনার কথা বলেছে, তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। দ্বিতীয় মন্তব্য—এই ঘটনা অন্য যে-সব ব্যক্তি প্রত্যক্ষ করেছে তাদের সঙ্গে প্রথমে আলাপ করতে হবে। দ্বিতীয় মন্তব্যটি লাল কালি দিয়ে আন্ডারলাইন করা ও পাশে লেখা—অত্যন্ত জরুরি। তৃতীয় মন্তব্য—মেয়েটির অবশ্যই কিছু পরিমাণ এক্সট্রাসেন্সরি পারসেপশন আছে। সে কার্ডের সব ক'টি চিহ্ন সঠিকভাবে বলতে পেরেছে। আমি এ-রকম আগে কখনো দেখি নি। এই বিষয়ে আমার ধারণা হচ্ছে, মানসিকভাবে অসুস্থ রুগীদের এই দিকটি উন্নত হয়ে থাকে। আমি এর আগেও যে ক'টি অসুস্থ মানুষ দেখেছি, তাদের সবার মধ্যেই এই ক্ষমতাটি কিছু পরিমাণে লক্ষ করেছি। দি জার্নাল অব প্যারাসাইকোলজির তৃতীয় ভল্যুমে (১৯৭৩) এই প্রসঙ্গে রিভিউ পেপার আছে। অথর জন নান এবং এফ টলম্যান।

৮

সোহাগী হাইস্কুলের হেডমাস্টার সাহেব দারুণ অবাক হলেন। রানুর ব্যাপারে খোঁজখবর করার জন্যে এক ভদ্রলোক এসেছেন—এর মানে কী? অতি দিন আগে কী হয়েছিল, না-হয়েছিল, তা কি এখন আর কারো মনে আছে? আর মনে থাকলেও এইসব ব্যাপার নিয়ে এখন ঘাঁটাঘাঁটি করাটা বোধহয় ঠিক নয়। কিন্তু যে-ভদ্রলোক এসেছেন, তাঁকে মুখের ওপর না বলতেও বাধছে। ভদ্রলোক হাজার হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জন শিক্ষক। মানী লোক। তা ছাড়া এত দূর এসেছেন, নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। মুখে বলছেন রানু অসুস্থ এবং তিনি রানুর এক জন চিকিৎসক। কিন্তু এটা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না। কারণ মাসখানেক আগেই রানুকে তিনি দেখে এসেছেন। কিছুমাত্র অসুস্থ মনে হয় নি। আজ হঠাৎ এমন কী হয়েছে যে ঢাকা থেকে এই ভদ্রলোককে আসতে হল?

'রানুর কী হয়েছে বললেন?'

'মানসিকভাবে অসুস্থ।'

'আমি তো সেদিনই তাকে দেখে এলাম।'

'যখন দেখেছেন তখন হয়তো সুস্থই ছিল।'

'কী জানতে চান আপনি, বলেন।'

'নদীতে গোসলের সময় কী ঘটেছিল, সেটা বলেন।'

'সে-সব কি আর এখন মনে আছে?'

'ঘটনাটা বেশ সিরিয়াস এবং নিশ্চয়ই আপনাদের মধ্যে বহু বার আলোচিত হয়েছে, কাজেই মনে থাকার কথা। আপনার যা মনে আসে তাই বলেন।'

হেডমাস্টার গম্ভীর স্বরে ঘটনাটা বললেন। রানুর গল্পের সঙ্গে তাঁর গল্পের কোনো অমিল লক্ষ করা গেল না। শুধু ভদ্রলোক বললেন, 'মেয়েরা গোসল করতে গিয়েছিল দুপুরে, সন্ধ্যায় নয়।'

'পায়জামা খোলার ব্যাপারটি বলেন। পায়জামাটা কি পাওয়া গিয়েছিল?'

'আপনি কী বলছেন বুঝতে পারছি না।'

'রানু বলছিল, নদীতে গোসল করবার সময় সেই মরা মানুষটি তার পায়জামা খুলে ফেলে।'

'আরে না না, কী বলেন!'

'ওর পরনে পায়জামা ছিল?'

'হ্যাঁ, থাকবে না কেন?'

'আপনার ঠিক মনে আছে তো?'

'মনে থাকবে না কেন? পরিষ্কার মনে আছে। আপনি অন্য সবাইকেও জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন।'

'ঐ মরা মানুষটি সম্পর্কে কী জানেন?'

'কিছুই জানি না রে ভাই। থানায় খবর দিয়েছিলাম। থানা হচ্ছে এখান থেকে দশ মাইল। সেই সময় যোগাযোগব্যবস্থা ভালো ছিল না। থানাঅলারা আসে দু' দিন পরে। লাশ তখন পচে-গলে গিয়েছে। শিয়াল-কুকুর কামড়াকামড়ি করছে। থানাঅলারা এসে

আমাদের লাশ পুঁতে ফেলতে বলে। আমরা নদীর ধারেই গর্ত করে পুঁতে ফেলি।'

'আচ্ছা, ঐ লাশটি তো উলঙ্গ ছিল, ঠিক না?'

'জ্বি–না, ঠিক না। হলুদ রঙের একটা প্যান্ট ছিল আর গায়ে গেঞ্জি ছিল।'

মিসির সাহেবের ভুরু কুঞ্চিত হল।

'আপনার ঠিক মনে আছে তো ভাই?'

'আরে, এটা মনে না–থাকার কোনো কারণ আছে? পরিষ্কার মনে আছে।'

'লাশটি কি বুড়ো মানুষের ছিল?'

'জ্বি–না, জোয়ান মানুষের লাশ।'

'আর কিছু মনে পড়ে?'

'আর কিছু তো নেই মনে পড়ার।'

'আপনার ঐ মেয়েটির সঙ্গে কথা বলতে চাই, অনুফা যার নাম। শুনেছি ওর শ্বশুরবাড়ি কাছেই।'

'হরিণঘাটায়। আপনি যেতে চান হরিণঘাটা?'

'জ্বি।'

'কখন যাবেন?'

'আজকেই যেতে পারি। কত দূর এখান থেকে?'

'পনের মাইল। বেবিট্যাক্সি করে যেতে পারেন।'

'রাতে ফিরে আসতে পারব?'

'তা পারবেন।'

'বেশ, তাহলে আপনি আমাকে ঠিকানা দিন।'

'দেব। বাড়িতে চলেন, খাওয়াদাওয়া করেন।'

'আমি হোটেল থেকে খেয়েদেয়ে এসেছি।'

'তা কি হয়, অতিথি–মানুষ! আসুন আসুন।'

ভদ্রলোক বাড়িতে নিয়ে গেলেন ঠিকই, কিন্তু বড়ই গম্ভীর হয়ে রইলেন। মাথার ওপর হঠাৎ এসে পড়া উপদ্রবে তাঁকে যথেষ্ট বিরক্ত মনে হল। ভালো করে কোনো কথাই বললেন না। অকারণে বাড়ির এক জন কামলার ওপর প্রচণ্ড হম্বিতম্বি শুরু করলেন।

কিন্তু অনুফার বাড়িতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার ঘটল। মেয়েটি আদর–যত্নের একটি মেলা বাধিয়ে ফেলল। মিসির আলি অবাক হয়ে দেখলেন, মেয়েটির স্বামী সন্ধ্যাবেলাতেই জাল নিয়ে পুকুরে নেমে গেছে। অনুফা পরিচিত মানুষের মতো আদুরে গলায় বলল, 'রাতে ফিরবেন কি—কাল সকালে যাবেন।' লোকজন মিসির আলিকে দেখতে এল। এরা বেশ সম্পন্ন গৃহস্থ। মেয়েটিও মনে হয় বেশ ক্ষমতা নিয়ে আছে। সবাই তার কথা শুনছে।

ঘন্টাখানেকের মধ্যে তাঁকে গোসলের জন্যে গরম পানি করে দেওয়া হল। একটা বাটিতে নতুন একটা গায়ে মাখার সাবান। মোড়কটি পর্যন্ত ছেঁড়া হয় নি। বাংলাঘরে নতুন চাদর বিছিয়ে বিছানা করা হল। মেয়েটির বৃদ্ধ শ্বশুর একটি ফর্সী হুক্কাও এনে দিলেন এবং বারবার বলতে লাগলেন, খবর না–দিয়ে আসার জন্যে ঠিকমতো খাতির–যত্ন করতে না পেরে তিনি বড়ই শরমিন্দা। তবে যদি কালকের দিনটা থাকেন, তবে

তিনি হরিণঘাটার বিখ্যাত মাগুর মাছ খাওয়াবেন। খাওয়াতে না-পারলে তিনি বাপের ব্যাটা না—ইত্যাদি ইত্যাদি।

মিসির আলির বিস্ময়ের সীমা রইল না। তিনি সত্যি-সত্যি এক দিন থেকে গেলেন। মিসির আলি সাহেব এ-রকম কখনো করেন না।

৯

রানু মৃদু স্বরে বলল, 'ভেতরে আসব?'

'এস রানু, এস।'

'গল্প করতে এলাম।'

'খুব ভালো করেছ।'

নীলু উঠে গিয়ে রানুর হাত ধরল। রানু বলল, 'তুমি কাঁদছিলে নাকি, চোখ ভেজা।' নীলু কিছু বলল না। রানু বলল, 'এত কিসের দুঃখ তোমার যে দুপুরবেলায় কাঁদতে হয়?'

'তোমার বুঝি কোনো দুঃখটুঃখ নেই?'

'উঁহু। আমি খুব সুখী।'

রানু হাসতে লাগল। নীলু হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, 'তুমি বলেছিলে, একটা খুব অদ্ভুত কথা আমাকে বলবে।'

'বলেছিলাম নাকি?'

'হ্যাঁ। আজ সেটা বলতে হবে। তারপর আমি আমার একটা অদ্ভুত কথা বলব।'

রানু হাসতে লাগল।

'হাসছ কেন রানু?'

'তোমার অদ্ভুত কথাটা আমি জানি, এই জন্যে হাসছি।'

'কী আবোলতাবোল বলছ! তুমি জানবে কী?'

'জানি কিন্তু।'

নীলু গম্ভীর হয়ে বলল, 'জানলে বল তো।'

'তোমার এক জন প্রিয় মানুষ তোমার সঙ্গে দেখা করতে রাজি হয়েছে। ঠিক না?'

নীলু দীর্ঘ সময় কোনো কথাবার্তা বলল না। রানু বলল, 'কি ভাই, বলতে পারলাম তো?'

'হ্যাঁ, পেরেছ।'

'ও কি বাসায় আসবে?'

'বলব তোমাকে। তার আগে তুমি বল, তুমি কী করে জানলে? বিলু তোমাকে বলেছে? কিন্তু বিলু তো কিছু জানে না!'

'আমাকে কেউ কিছু বলে নি।'

'তাহলে তুমি জানলে কী করে?'

'আমি স্বপ্ন দেখেছি?'

'স্বপ্ন দেখেছি মানে?'

'নীলু, মাঝে–মাঝে আমি স্বপ্ন দেখি। সেগুলি ঠিক স্বপ্নও নয়। তবে অনেকটা স্বপ্নের মতো। সেগুলি সব সত্যি। গত রাতে স্বপ্নে দেখলাম, তুমি একটি চিঠি পেয়ে খুব খুশি। সেই চিঠিতে একটি লাইন লেখা আছে, যার মানে হচ্ছে—তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে বা এই রকম কিছু।'

'এসব কি তুমি সত্যি–সত্যি বলছ রানু?'

'হ্যাঁ। কবে তাঁর সঙ্গে তোমার দেখা হবে?'

'আজ বিকেলে। আমি নিউ মার্কেটের বইয়ের দোকানের সামনে একটা সবুজ রুমাল হাতে দাঁড়িয়ে থাকব। তিনি আমাকে খুঁজে বের করবেন।'

'বাহ্, খুব মজার ব্যাপার তো!'

রানু হাসতে লাগল। এক সময় হাসি থামিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, 'শুধু গল্প–উপন্যাসেই এসব হয়। বাস্তবে এই প্রথম দেখছি। তোমার ভয় করছে না?'

'ভয় করবে কেন?'

'তোমার কিন্তু নীলু ভয় করছে। আমি বুঝতে পারছি। বেশ ভয় করছে। করছে না?'

'নাহ্।'

রানু ইতস্তত করে বলল, 'ইচ্ছা করলে তুমি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেত পার। আমি দূরে থাকব।'

'থাক, দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না।'

মনে হল নীলু রানুর কথাবার্তা সহজভাবে নিতে পারছে না। তার চোখ–মুখ গম্ভীর। রানু বলল, 'কি, নেবে?'

'না। আমার একা যাবার কথা, একাই যাব।'

'আর যদি গিয়ে দেখ, খুব বাজে ধরনের একটা লোক। তখন কী করবে?'

'বাজে ধরনের লোক মানে?'

'অর্থাৎ যদি গিয়ে দেখ দাঁত পড়া, চুল পাকা এক বুড়ো?'

'তোমার কি সে–রকম মনে হচ্ছে?'

রানু মাথা দুলিয়ে হাসল, কিছু বলল না। নীলুকে দেখে মনে হল রানুর ব্যবহারে সে বেশ বিরক্ত হচ্ছে। দুটো বাজতেই সে বলল, 'এবার তুমি যাও, আমি সাজগোজ করব।'

'এখনই? চারটা বাজতে তো দেরি আছে।'

'তোমার মতো সুন্দরী তো আমি না। আমাকে সময় নিয়ে সাজতে হবে।'

রানু উঠে পড়ল। নীলু সত্যি সাজতে বসল। কিন্তু কী যে হয়েছে তার, চোখে পানি এসে কাজল ধুয়ে যাচ্ছে। আইল্যাশ পরার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু একা–একা পরা সম্ভব নয়। অনেক বেছেটেছে একটা শাড়ি পছন্দ করল। সাদার ওপর নীলের একটা প্রিন্ট। আগে সে কখনো পরে নি।

'নীলু মা, কোথাও যাচ্ছ নাকি?'

নীলু তাকিয়ে দেখল—বাবা।

'কোথায় যাচ্ছ গো মা?'

'এক জন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। তোমার কি চা লাগবে?'

'হলে ভালো হত। থাক, তুই ব্যস্ত।'

'চা বানাতে আর কয় মিনিট লাগবে! তুমি বস, আমি বানিয়ে আনছি।'

নীলুর বাবা চেয়ার টেনে নীলুর ঘরেই বসলেন।

'চা কি চিনি ছাড়া আনব বাবা?'

'না, এক চামচ চিনি দিস। একটু-আধটু চিনি খেলে কিছু হবে না।'

নীলু চা নিয়ে এসে দেখে বাবা ঝিমুচ্ছেন। ঝিমুনিরও বেশি, প্রায় ঘুমাচ্ছেন বলা চলে। বাবা যেন বড় বেশি দ্রুত বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন। বড় মায়া লাগল নীলুর।

'বাবা, তোমার চা।'

'কোন বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছিস মা?'

নীলু খানিক ইতস্তত করে বলল, 'তোমাকে আমি পরে বলব বাবা।'

'সন্ধ্যার আগেই আসবি তো?'

'হ্যাঁ, বাবা।'

'গাড়ি নিয়ে যাবি?'

'না, গাড়ি নেব না।'

'নিয়ে যা না। ড্রাইভার তো দিনরাত বসে-বসেই মায়না খায়।'

'বাবা, আমি গাড়ি নেব না।'

নীলুর সাজ শেষ হল ঠিক সাড়ে তিনটায়। আয়নায় তাকিয়ে নিজেকে তার পছন্দই হল। যে-মেয়েটিকে দেখা যাচ্ছে, সে বেশ রূপসী। তার মায়া-কাড়া দু'টি চমৎকার চোখ আছে। কিশোরীদের মতো ছোট একটি চিবুক। ভালোই তো! এ-রকম একটি মেয়েকে পুরুষরা কি ভালবাসে না? নাকের কাছে মুক্তোর মতো কিছু ঘামের বিন্দু। নীলু তার সবুজ রুমাল দিয়ে সাবধানে ঘাম মুছে ফেলল। তারপর উঠে এল তিনতলায়।

'রানু, রানু।'

রানু যেন তৈরি হয়েই ছিল। সে বেরিয়ে এল সঙ্গে-সঙ্গে।

'তুমি যাবে বলেছিলে আমার সঙ্গে। চল।'

'চল।'

রানু তালা লাগাল। নীলু মৃদু স্বরে বলল, 'তুমি জানতে আমি আসব?'

'হ্যাঁ, জানতাম।'

সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করল। কারো দেখা পাওয়া গেল না। এক সময় নীলু বলল, 'এখন চলে যেতে চাও রানু?'

'আরো খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি। তোমার তো এখনো যেতে ইচ্ছা করছে না।'

'এক জায়গায় দাঁড়িয়ে না থেকে চল হাঁটি।'

তারা বেশ কয়েক বার নিউ মার্কেট চক্কর দিয়ে ফেলল। কেউ এগিয়ে এসে বলল না, 'তোমাদের মধ্যে নীলু কে?'

'রানু, তোমার কি হাঁটতে টায়ার্ড লাগছে?'

'না।'

'রানু, তুমি তো অনেক কিছু বুঝতে পার, তাই না?'

'মাঝে-মাঝে পারি।'

'লোকটি এসেছে কি না বুঝতে পারছ না?'

'না নীলু, পারছি না। আমি সব সময় পারি না।'

রানু লক্ষ করল, নীলুর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। সে তার সবুজ রুমাল দিয়ে চোখ চেপে ধরল। রানু গাঢ় স্বরে বলল, 'কাঁদে না নীলু।'

'কান্না এলে কী করব?'

'মনটা শক্ত কর ভাই। পৃথিবীটা খুব ভালো জায়গা নয়।'

লোকজন তাকাচ্ছে ওদের দিকে। রানু নীলুর হাত ধরে বাইরে নিয়ে এল। বেশ অস্বস্তিকর অবস্থা।

তার প্রায় চার দিন পর নীলু একটি চিঠি পেল।

প্রিয় নীলু,

ঐদিন তোমাকে দেখলাম। তুমি তো ভারি মিথ্যুক! কেন বললে তুমি দেখতে সুন্দর নও? তোমাকে বর্ষার জলভারে নত আকাশের মতো লাগছিল। আমি ছুটে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তোমার বান্ধবীকে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছি। কথা ছিল একা আসবে। তাই নয় কি?

শুধু আমরা দু' জন থাকব। আমাকে দেখে যদি তোমার কথা বলতে ইচ্ছে করে, তাহলে কোনো একটি রেস্টুরেন্টে বসে দু' জনে চা খেতে-খেতে গল্প করব। আর যদি তোমার আমাকে পছন্দ না-হয়, তাহলে তুমি তোমার সবুজ রুমালটি তোমার হ্যান্ডব্যাগে লুকিয়ে ফেলবে।

তোমাকে কিছুই বলতে হবে না। আমি মন-খারাপ করব ঠিকই, কিন্তু বিদায় নেব হাসিমুখে, এবং আর কোনো দিনই তুমি আমাকে দেখবে না। তবে নীলু,আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, আমাকে তুমি অপছন্দ করবে না। এ-রকম মনে করার কোনোই কারণ নেই, তবু মনে হচ্ছে। খুব সম্ভব উইশফুল থিংকিং। না মেয়ে?

নীলু চিঠিটি সমস্ত দিনে প্রায় এক শ' বার পড়ল এবং প্রতি বারই তার কাছে নতুন মনে হল। রাতে সে অদ্ভুত সুন্দর একটি স্বপ্ন দেখল—যেন পুরোনো আমলের একটি পালতোলা জাহাজে সে বসে আছে। জাহাজের পালটি গাঢ় সবুজ রঙের। প্রচণ্ড বাতাস দিচ্ছে। বাতাসে জাহাজ ছুটে চলেছে বিদ্যুৎগতিতে। নীলুর একটু ভয়ভয় লাগছে, কারণ জাহাজে আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না। নীলু এক সময় বলল, 'আমার ভয় লাগছে এই জাহাজে। আর কেউ কি আছে?' সঙ্গে-সঙ্গে একটি ভারি পুরুষালি গলা শোনা গেল, 'ভয় নেই নীলু। আমি আছি।' স্বপ্ন এত সুন্দর হয়!

নীলুর ঘুম ভেঙে গেল। বাকি রাত সে আর ঘুমোতে পারল না। বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। বিলু জেগে উঠে বলল, 'কী হয়েছে রে আপা?'

নীলু ভেজা গলায় বলল, 'পেট ব্যথা করছে। এখন একটু কম। তুই ঘুমো।'

১০

অনুফার কাছ থেকে নতুন কিছু জানা গেল না। সেও খুব জোর দিয়ে বলল, রানুর পরনে পায়জামা ছিল, এবং মৃত লোকটির পরনেও কাপড় ছিল।

'আপনি লোকটিকে দেখেছেন?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আপনি করে বলছেন কেন? মুরুব্বি মানুষ আপনি। আমি আপনার মেয়ের বয়েসী।'

'লোকটিকে কেমন দেখলে বল তো।'

'চাচা, আমার কিছু মনে নেই। সেই সময় আমি ঘোরের মধ্যে ছিলাম। পরদিন আমার বিয়ে।'

'হ্যাঁ, তা আমি জানি। লোকটিকে নদীর পারে পুঁতে রাখা হয়, তাই না?'

'জ্বি। তারপর অনেক দিন কেউ ওদিকে যেত না। সবাই বলাবলি করত, রাতে কী জানি দেখতে পায়।'

'কী দেখতে পায়?'

'ছায়া-ছায়া কী নাকি দেখে। তবে এইসব সত্যি না চাচা। সব মনগড়া।'

'তাই নাকি?'

'জ্বি। ভূতপ্রেত বলে কিছু নেই।'

মিসির আলি বড়ই অবাক হলেন। গ্রামের কোনো মেয়ে এইভাবে চিন্তা করে না। এতটা মুক্তচিন্তা তাদের থাকার কথা নয়। মিসির আলি বললেন, 'তুমি পড়াশোনা কত দূর করেছ?'

'চাচা, আমি আই.এ. পড়ার সময় আমার বিয়ে হয়। তারপর আর পড়াশোনা হয় নি। গ্রামে বিয়ে হয়েছে তো! পড়াশোনা করার আমার খুব শখ ছিল।'

'মানুষের সব শখ মেটা উচিত নয়। একটা কোনো ডিসস্যাটিসফেকশন থাকা দরকার।'

'কেন?'

'তাহলে বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে। সব শখ মিটে গেলে বেঁচে থাকার প্রেরণা নষ্ট হয়ে যায়। যে-সব মানুষের শখ মিটে গেছে, তারা খুব অসুখী মানুষ।'

অনুফা চুপ করে রইল। মিসির আলি মৃদু স্বরে বললেন, 'এবার রানুর কথা বল।'

'কী কথা জানতে চান?'

'সব কথা।'

'ও খুব অদ্ভুত মেয়ে। ও মানুষের ভবিষ্যৎ বলতে পারে।'

'কীভাবে বলে?'

'তা জানি না, তবে বলতে পারে। একবার কী হয়েছে, শোনেন। আমি আর ও গল্প করছি, সে হঠাৎ গল্প থামিয়ে বলল—কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের বাড়িতে শ্রীপুরের খালারা বেড়াতে আসবেন। আর সত্যি-সত্যি তাঁরা এলেন।'

'এটা তো এমনিতেও হতে পারে। মানুষ বেড়াতে আসে না?'

'তা আসে। কিন্তু শ্রীপুরের খালা পাঁচ বছর পর প্রথম এসেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আমাদের কী-একটা ঝগড়া চলছিল।

'ও, তাই নাকি?'

'জ্বি। আরেক গল্প বলি শোনেন, তখন আমি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে রানুদের ওখানে বেড়াতে গিয়েছি—না, এটা আপনাকে বলা যাবে না।'

'বলা যাবে না কেন?'

'গল্পটা ভালো না।'

'থাক, তাহলে অন্য গল্প বল।'

অনুফার স্বামীকেও মিসির আলি সাহেবের বেশ লাগল। গোঁয়ারগোবিন্দ ধরনের লোক। স্ত্রীর খুবই অনুগত। সে মিসির আলিকে নিয়ে প্রচুর ঘুরল। লোকটির যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তিও দেখা গেল। মধুপুর থানার ওসি সাহেব ওর কথাতেই পুরোনো ফাইলপত্র ঘেঁটে দেখালেন যে, একটি মরা লাশ পাওয়ার খবরে এফআইআর করা হয়েছিল। তখন ওসি ছিলেন ব্রজগোপাল হালদার, তাঁর নোটে লেখা—

> *একটি কলেরায় মৃত মানুষের লাশ (৩০/৩৫) মধুপুরের নিমশাসা গ্রামে পাওয়া যায়। লাশটির পচন ধরিয়া গিয়াছিল। প্রাথমিক পরীক্ষার পর আমি লাশটি পুঁতিয়া ফেলিবার নির্দেশ দেই। লাশটির কোনো পরিচয় জানা যায় নাই।*

মিসির আলি বললেন, 'কলেরায় মৃত, এটা বোঝা গেল কী করে?'

ওসি সাহেব বিরক্ত হয়ে বললেন, 'সেটা আমি কী করে বলব? রিপোর্ট তো আমার লেখা না। ব্রজগোপাল বাবুকে জিজ্ঞেস করেন। তিনি জানবেন।'

'তাঁকে কোথায় পাওয়া যাবে?'

'পুলিশ ডাইরেক্টরেটে খোঁজ করেন। তবে এই সব খোঁজাখুঁজির কোনো অর্থ নেই। দশ বৎসর আগের ঘটনা মনে করে বসে আছেন নাকি? পুলিশকে আপনার কী মনে করেন বলেন তো?'

'ঘটনাটা অস্বাভাবিক। সে-জন্যই হয়তো তাঁর মনে থাকবে।'

'একটা ডেড বডি পাওয়া গেছে পানিতে, এর মধ্যে আপনি অস্বাভাবিক কী দেখলেন? বাংলাদেশে প্রতি দিন কয়টা ডেড বডি পাওয়া যায় জানেন?'

'জ্বি-না, জানি না।'

'পুলিশের লাইনে ডেড বডি পাওয়াটা খুব স্বাভাবিক ঘটনা, বুঝলেন?'

মিসির আলি মধুপুরে আরো এক দিন থাকলেন। দেখে এলেন, যে-জায়গায় লোকটিকে পোঁতা হয়েছিল সেই জায়গা। দেখার মতো কিছু নয়। ঘন কাঁটাবন হয়েছে, যার মানে হচ্ছে এই জায়গাটিকে বেশ কিছু দিন লোকজন ভয়ের চোখে দেখেছে। হাঁটাচলা বন্ধ করে দিয়েছে নিশ্চয়ই।

মিসির আলি অনেকের সঙ্গেই কথা বললেন—যদি নতুন কিছু পাওয়া যায়। নতুন কোনো তথ্য, যা কাজে লাগবে। কিন্তু কিছুই জানা গেল না। দশ বৎসর দীর্ঘ সময়। এই সময়ে মানুষ অনেক কিছু ভুলে যায়।

মধুপুর থেকে তিনি গেলেন রানুদের আদি বাড়িতে। সেখানে যাবার তাঁর একটি উদ্দেশ্য, খুঁজে দেখা—জালালউদ্দিন নামে কাউকে পাওয়া যায় কি না। এই লোকটিকে পাওয়া খুবই প্রয়োজন।

আনিস লক্ষ করল, রানু ইদানীং বেশ স্বাভাবিক। এর প্রধান কারণ বোধহয় বাড়িঅলার দু'টি মেয়ে। ওদের সঙ্গে সে বেশ মিলেমিশে আছে। গল্পের বই আনছে। ভালোমন্দ কিছু রান্না হলেই আগ্রহ করে নিচে নিয়ে যাচ্ছে। বাড়িঅলাদের সঙ্গে বেশি মেলামেশা আনিসের পছন্দ নয়। বাড়িঅলাদের সে সব সময় শত্রুপক্ষ বলেই মনে করে। কয়েক বার ভেবেছিল বলবে মেলামেশাটা কমাতে। না-বলে ভালোই হয়েছে, এতে যদি অসুখটা চাপা পড়ে তো ভালোই।

কাজের একটি ছেলে পাওয়া গেছে—জিতু মিয়া। এই ছেলেটিও রানুকে বেশ ব্যস্ত রাখছে। ছেলেটির বয়স দশ-এগার, তবে মহাবোকা। কোনো কাজই করতে পারে না। করার আগ্রহও নেই। রানু ক্রমাগত বকাঝকা করেও কিছু করাতে পারে না। তবে তার সময় বেশ কেটে যায়।

সন্ধ্যাবেলা সে আবার জিতু মিয়াকে নিয়ে পড়াতে বসে। জিতু ঘুমঘুম চোখে পড়ে 'স্বরে অ স্বরে আ'। এই পড়াটি গত এক সপ্তাহ ধরে চলছে। জিতু মিয়া কিছুই মনে রাখতে পারছে না। কিন্তু তাতে রানুর উৎসাহে ভাটা পড়ছে না।

আনিস এক দিন ঠাট্টা করে বলেছে, 'তুমি দেখি একে বিদ্যাসাগর বানিয়ে ফেলছ!' রানু তাতে বেশ রাগ করেছে। গম্ভীর হয়ে বলেছে, 'ঠাট্টা করছ কেন? বিদ্যাসাগর তো এক দিন হতেও পারে।'

অবশ্য অদূর-ভবিষ্যতে তেমন কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। ভবিষ্যৎ-বিদ্যাসাগর রোজ রাতেই পড়তে-পড়তে ঘুমিয়ে পড়ছে, এবং রানু প্লেটে খাবার বেড়ে প্রতি রাতেই প্রাণান্ত চেষ্টা চালাচ্ছে। এতটা বাড়াবাড়ি আনিসের ভালো লাগে না। কিন্তু সে কিছু বলে না। থাকুক একটা কিছু নিয়ে ব্যস্ত।

এর মধ্যে এক দিন আনিস গিয়েছিল মিসির আলি সাহেবের কাছে। ভদ্রলোক বেশ কিছু দিন ঢাকায় ছিলেন না। সবে ফিরেছেন। তাঁর চোখ হলুদ, গা হলুদ। আনিস অবাক হয়ে বলেছে, 'হয়েছে কী আপনার?'

'জন্ডিস। জন্ডিস বাধিয়ে বসেছি।'

'বলেন কী!'

'ইনফেকটাস হেপাটাইটিস। লিভারের অবস্থা কাহিল রে ভাই! আপনার স্ত্রী কেমন আছেন?'

'ভালো।'

'আর ভয়টয় পাচ্ছেন না?'

'জ্বি-না।'

'খুব ভালো খবর। আমি একটু সুস্থ হলেই যাব আপনার বাসায়।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'আমি কিছু খোঁজখবর পেয়েছি। মনে হয় আপনার স্ত্রীর সমস্যাটি ধরতে পেরেছি।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, একটু ভালো হলেই এ নিয়ে কথা বলব।'

রানু মিসির আলি সাহেবের জন্ডিসের খবরে খুবই মন-খারাপ করল।

'আহা, বেচারা একা-একা কষ্ট করছে। চল এক দিন দেখে আসি। যাবে?'

'ঠিক আছে, যাব একদিন।'

'কবে যাবে? কাল যাবে?'

'এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? জন্ডিস যখন হয়েছে, তখন বেশ কিছু দিন থাকবে। এক দিন দেখে এলেই হবে।'

'আমি এই অসুখের ভালো অষুধ জানি। অড়হড়ের পাতার রস। সকালবেলা এক গ্লাস করে খেলে তিন দিনে অসুখ সেরে যাবে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। আমার দাদা এই অষুধটা দিতেন। তুমি কিছু অড়হড়ের পাতা ঐ লোকটিকে দিয়ে এস না।'

'ঢাকা শহরে আমি অড়হড়ের পাতা কোথায় পাব? কী যে বল!'

'খুঁজলেই পাবে। জংলা গাছ সব জায়গায় হয়।'

আনিস যথেষ্ট বিরক্ত হল। রানুর এই একটা প্রবলেম—কোনো-একটা জিনিস মাথায় ঢুকলে ওটা নিয়েই থাকবে। আনিস বলল, 'আচ্ছা, দেখি।'

'দেখাদেখি না, তুমি খুঁজবে। আর শোন, কাল তো তোমার অফিস নেই, চল ওনাকে দেখে আসি।'

'এত ব্যস্ত কেন? ভদ্রলোক তো আর পালিয়ে যাচ্ছেন না।'

রানু থেমে-থেমে বলল, 'আমি অন্য একটা কারণে যেতে চাই।'

'কি কারণ?'

'ভদ্রলোক আমার সম্পর্কে খোঁজখবর করার জন্যে মধুপুর গিয়েছিলেন, কী খোঁজ পেলেন জানতে ইচ্ছা করছে।'

'মধুপুরের খবর পেলে কীভাবে? স্বপ্নে?'

'না, স্বপ্নটপ্ন না। অনুফা চিঠি দিয়েছে।'

'কবে চিঠি পেয়েছ?'

'গতকাল।'

আনিস চুপ করে গেল। রানু তার নিজের চিঠিপত্রের কথা আনিসকে কখনো বলে না। বিয়ের পর রানু তার আত্মীয়স্বজনের যত চিঠিপত্র পেয়েছে তার কোনোটিই সে আনিসকে পড়তে দেয় নি। এ নিয়ে আনিসের গোপন ক্ষোভ আছে।

'কি, আমাকে নিয়ে যাবে?'

'আমি আগে গিয়ে দেখি ভদ্রলোকের অবস্থা কেমন।'

মিসির আলিকে পাওয়া গেল না। বাড়িতে তাঁর এক ছোট ভাই ছিল, সে বলল, 'ভাইয়াকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অবস্থা বেশি ভালো না। বিলরুবিন নাইন পয়েন্ট ফাইভ। লিভার খুবই ড্যামেজ্‌ড্‌।'

১১

মিসির আলি হাসপাতালে এসেছেন একগাদা বই নিয়ে। তাঁর ধারণা ছিল বই পড়ে

সময়টা খুব খারাপ কাটবে না। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সে-রকম হয় নি। ডাক্তাররা বই পড়তে নিষেধ করেন নি, কিন্তু দেখা গেল বই পড়া যাচ্ছে না। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেই মাথার ভেতর ভোঁতা এক ধরনের যন্ত্রণা হয়। যন্ত্রণা নিয়ে বই পড়ার কোনো মানে হয় না। তবু তিনি মৃত্যু-বিষয়ক একটি বই পড়ে ফেললেন, এবং মৃত্যু ব্যাপারটিতে যথেষ্ট উৎসাহ বোধ করতে লাগলেন। তাঁর স্বভাবই হচ্ছে কোনো বিষয় একবার মনে ধরে গেলে সে-বিষয় সম্পর্কে চূড়ান্ত পড়াশোনা করতে চেষ্টা করেন।

মৃত্যু সাবজেক্টটি তাঁর পছন্দ হয়েছে, কিন্তু এ-বিষয়ে পড়াশোনা করতে পারছেন না। বইপত্র নেই। ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরিতে কিছু থাকার কথা, কিন্তু আনাবেন কাকে দিয়ে? তাঁকে কেউ দেখতে আসছে না। তিনি এমন কোনো জনপ্রিয় ব্যক্তি নন যে তাঁর অসুস্থতার খবরে মানুষের ঢল নামবে। তা ছাড়া অসুখের খবর তিনি কাউকে জানান নি। হাসপাতালে ভর্তি হবার ইচ্ছাও ছিল না। কিন্তু ঘরে দেখাশোনার লোক নেই। কাজের মেয়েটি তিনি মধুপুর থাকাকালীন বেশ কিছু জিনিসপত্র নিয়ে ভেগে গেছে। এমন অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হওয়া ছাড়া উপায় কী?

বিকালবেলা তাঁর কাছে কেউ আসে না। সবারই আত্মীয়স্বজন আসে দেখতে, তাঁর কাছে কেউ আসে না। এই সময়টা তিনি চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকেন এবং এখনো মানুষের সঙ্গ পাবার জন্যে তাঁর মন কাঁদে দেখে নিজের কাছেই লজ্জিত বোধ করেন।

আজ সারা দিন মিসির আলির খুব খারাপ কেটেছে। তাঁর রুমমেট ছাব্বিশ বছরের ছেলেটি সকাল ন'টায় বিনা নোটিসে মারা গেছে। মৃত্যু যে এত দ্রুত মানুষকে ছুঁয়ে দিতে পারে তা তাঁর ধারণাতেও ছিল না। ছেলেটা ভোরবেলায় নাশতা চেয়েছে, তার সঙ্গে খানিকক্ষণ কথাবার্তাও বলেছে। তিনি জিজ্ঞেস করেছেন, 'আজ কেমন আছ?'

'আজ বেশ ভালো।'

'লিভার ব্যথা করছে না?'

'নাহ্, তবে তলপেটের দিকে একটা চাপা ব্যথা আছে।'

'খুব বেশি?'

'না, খুব বেশি না। আপনি এটা কী বই পড়ছেন?'

'এটা একটা সায়েন্স ফিকশন—"ফ্রাইডে দি থার্টিন্থ"। বেশ ভালো বই। তুমি পড়বে?'

'জ্বি-না। ইংরেজি বই আমার ভালো লাগে না। বাংলা উপন্যাস পড়ি।'

'কার লেখা ভালো লাগে? এ-দেশের—মানে বাংলায়, কার লেখা তোমার পছন্দ?'

'নিমাই ভট্টাচার্য।'

'তাই নাকি?'

ছেলেটি আর জবাব না-দিয়ে কাৎরাতে থাকে। সকাল সাড়ে আটটায় বলল, 'এক জন ডাক্তার পাওয়া যায় কি না দেখবেন?' তিনি অনেকক্ষণ বোতাম টিপলেন, কেউ এল না। শেষ পর্যন্ত নিজেই গেলেন ডিউটি রুমে। ফিরে এসে দেখেন ছেলেটি মরে পড়ে আছে।

মৃত্যুর সময় পাশে কেউ থাকবে না, এর চেয়ে ভয়াবহ বোধহয় আর কিছু নেই। শেষ বিদায় নেবার সময় অন্তত কোনো-একজন মানুষকে বলে যাওয়া দরকার।

নিঃসঙ্গ ঘর থেকে একা-একা চলে যাওয়া যায় না। যাওয়া উচিত নয়। এটা হৃদয়হীন ব্যাপার।

এত দিন যে-ছেলেটি ছিল, এখন আর সে নেই। ঘন্টাখানেকের মধ্যেই তার সমস্ত চিহ্ন এ-ঘর থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। বিছানায় নতুন বালিশ ও চাদর দিয়ে গেছে—হয়তো সন্ধ্যার মধ্যে কোনো নতুন পেশেন্ট এসে পড়বে।

মিসির আলি সমস্ত দিন কিছু খেতে পারলেন না। বিকেলের দিকে তাঁর গায়ে বেশ টেম্পারেচার হল। প্রথম বারের মতো মনে হল একজন-কেউ তাঁকে দেখতে এলে খারাপ লাগবে না। ভালোই লাগবে। কেউ না-এলে এক জন রোগী হলেও আসুক, একা-একা এই কেবিনে রাত কাটানো যাবে না। ঠিক এই সময় ইতস্তত ভঙ্গিতে রানু এসে ঢুকল।

'আপনি ভালো আছেন?'

'না, ভালো না। তুমি কোত্থেকে?'

'বাসা থেকে। ইস্! আপনার এ কী অবস্থা!'

'অবস্থা খারাপ ঠিকই। আনিস সাহেব কোথায়?'

'ও আসে নি, আমি একাই এলাম। ওর কাছ থেকে ঠিকানা নিয়েছি।'

'বস তুমি। ঐ চেয়ারটায় বস। ফ্লাস্কে চা আছে। খেতে চাইলে খেতে পার।'

'উঁহু, চা-টা খাব না। আপনার কাছে একটা খবর জানতে এসেছি।'

'কোন খবরটি?'

'মধুপুরে গিয়ে আপনি কী জানলেন?'

'তেমন কিছু জানতে পারি নি।'

'তবু যা জেনেছেন তা-ই বলুন। আমার খুব জানতে ইচ্ছা করছে। অনুফা লিখেছে, আপনি নাকি হাজার-হাজার মানুষকে নানা রকম প্রশ্ন করেছেন।'

মিসির আলি হাসলেন।

'হাসলে হবে না, আমাকে বলতে হবে।'

'প্রথম যে-জিনিসটি জানলাম—সেটি হচ্ছে, তুমি অনেকগুলো ভুল তথ্য দিয়েছ।'

'আমি কোনো তথ্য দিই নি।'

'তুমি নিজে হয়তো জান না সেগুলো ভুল। যেমন পায়জামা খোলার ব্যাপারটি— এ-রকম কোনো কিছু ঘটে নি।

রানু চোখ লাল করে বলল, 'ঘটেছে।'

'না রানু, ঘটে নি। এটা তোমার কল্পনা। তা ছাড়া তুমি উলঙ্গ একটি ডেড বডির কথা বলেছ—সেটাও ঠিক না।'

'কিন্তু আমি জানি, এগুলো ঠিক।'

'না রানু। এইসব তুমি নিজে ভেবেছ এবং আমার ধারণা এ-জাতীয় স্বপ্ন তুমি মাঝে-মাঝে দেখ। দেখ না?'

'কী রকম স্বপ্নের কথা বলছেন?'

মিসির আলি কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করলেন। স্পষ্ট গলায় বললেন, 'তুমি প্রায়ই স্বপ্ন দেখ না—এক জন নগ্ন মানুষ তোমার কাপড় খোলার চেষ্টা করছে?'

রানু উত্তর দিল না। মাথা নিচু করে থাকল।

'বল রানু। জবাব দাও।'

'হ্যাঁ, দেখি।'

'কখনো কি ভেবে দেখেছ এ-রকম স্বপ্ন কেন দেখ?'

'না, ভাবি নি।'

'আমি ভেবেছি। এবং কারণটাও খুঁজে বের করেছি। আজ সেটা বলতে চাই না, অন্য এক দিন বলব।'

'না, আপনি আমাকে আজই বলেন।'

মিসির আলি ফ্লাস্ক থেকে চা ঢাললেন। শান্ত স্বরে বললেন, 'চা খেতে-খেতে শোন। চায়ে ক্যাফিন আছে। ক্যাফিন তোমার নার্ভগুলোকে অ্যাকটিভ রাখবে।'

রানু চায়ের পেয়ালা নিল, কিন্তু চুমুক দিল না। মাথা নিচু করে বসে রইল। মিসির আলি ঠাণ্ডা গলায় বলতে লাগলেন, 'রানু, তোমাকে নিয়ে এই গল্পটি আমি তৈরি করেছি। তুমি মন দিয়ে শোন। তুমি যখন বেশ ছোট—নয়, দশ বা এগার বছর বয়স, তখন এক জন বয়স্ক লোক তোমাকে ভুলিয়েভালিয়ে নির্জন কোনো জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল। তোমাদের গ্রামে এ-রকম একটা নির্জন জায়গার খোঁজে আমি গিয়েছিলাম। সেখানে জঙ্গলের কাছে একটা ভাঙা বিষ্ণুমন্দির দেখেছি। মনে হয় ঐ জায়গাটাই হবে। কারণ সাপের ভয়ে ওখানে কেউ যেত না। রানু, তুমি কি আমার কথা শুনছ?'

'শুনছি।'

'তারপর সেই বয়স্ক মানুষটি মন্দিরে তোমাকে নিয়ে গেল।'

'আমাকে কেউ নিয়ে যায় নি। আমি নিজেই গিয়েছিলাম। ঐ মন্দিরে খুব সুন্দর একটি দেবীমূর্তি আছে। আমি ঐ মূর্তি দেখার জন্যে যেতাম।'

'তারপর কী হয়েছে, বল।'

রানু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তীব্র স্বরে বলল,'আমি বলব না, আপনি বলুন।'

মিসির আলি শান্ত স্বরে বললেন, 'ঐ লোকটি তখন টেনে তোমার পায়জামা খুলে ফেলল।'

রানুর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

'ঐ লোকটির নাম ছিল জালালউদ্দিন।'

রানু কিছু বলল না। মিসির আলি বললেন, 'তোমার অসুখ শুরু হল সেদিন থেকে। তোমার মনের মধ্যে ব্যাপারটি গেঁথে গেল, পরবর্তী সময়ে গোসলের সময় যখন মরা মানুষটি তোমার পায়ে লেগে গেল, তখন তোমার মনে পড়ল মন্দিরের দৃশ্য। বুঝতে পারছ?'

রানু জবাব দিল না।

'অসুখের মূল কারণটি আলোয় নিয়ে এলেই অসুখ সেরে যায়; এ-জন্যেই আমি এটা তোমাকে বললাম। তুমি নিজেও এখন গোড়া থেকে সমস্ত ব্যাপারটি নিয়ে চিন্তা করবে। তোমার অসুখ সেরে যাবে।'

রানু মৃদু স্বরে বলল, 'আপনি কি ঐ লোকটির সঙ্গে কথা বলেছেন?'

'বলেছি।'

'ও কী বলেছে?'

'তেমন কিছু বলে নি।'

'না, বলেছে, আপনি আমাকে বলতে চাচ্ছেন না। এতটা যখন বলেছেন, তখন বাকিটাও বলুন।'

রানু তীব্র চোখে তাকাল। মিসির আলি বললেন, 'দেখ রানু, আমি খুবই যুক্তিবাদী মানুষ। অলৌকিক কোনো কিছুতে বিশ্বাস করি না। আমি বিশ্বাস করি সব কিছুরই একটি ব্যাখ্যা আছে। জালালউদ্দিন যা বলেছে, তাও নিশ্চয়ই ব্যাখ্যা করা যায়।'

'ব্যাখ্যা পরে করবেন। আগে বলুন, সে কী বলেছে।'

'সে বলেছে, হঠাৎ সে দেখে মূর্তিটি ছুটে এসে তোমার মধ্যে মিলিয়ে গেছে। তোমার গা থেকে আগুনের হল্‌কা বেরুচ্ছে। জালালউদ্দিন তখন ছুটে পালিয়ে যায়।'

'আপনি জালালউদ্দিনের কথা বিশ্বাস করেন না?'

'না। ওর মনে পাপবোধ ছিল। মন্দিরটন্দির নিয়ে মূর্খ মানুষদের মনে অনেক রকম ভয়-ভীতি আছে। তা থেকেই সে একটা হেলুসিনেশন দেখেছে। তুমি নিজে তো কিছু দেখ নি।'

'না।'

'তাহলেই হল। জালালউদ্দিন কী দেখেছে না-দেখেছে, সেটা তার প্রবলেম, তোমার নয়।'

রানু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, 'কিন্তু একটা জিনিস কি জানেন? ঐ ঘটনার পর থেকে আমি অসম্ভব সুন্দর হয়ে গেলাম।'

মিসির আলি শব্দ করে হাসলেন। হাসতে-হাসতে বললেন,'সুন্দর তুমি সব সময়ই ছিলে। ঘটনাটি ঘটেছে তোমার বয়ঃসন্ধিতে। বয়ঃসন্ধির পর মেয়েদের রূপ খুলতে শুরু করে। এখানেও তাই হয়েছে।'

'কিন্তু ঐ দেবীমূর্তিটিকে এর পর আর খুঁজে পাওয়া যায় নি।'

'তুমি কিন্তু খুব ছেলেমানুষের মতো কথা বলছ রানু। মূর্তিটি চুরি গেছে, কেউ নিয়ে পালিয়ে গেছে, ব্যস।'

'মূর্তিটি চুরি যায় নি।'

'তুমি নিশ্চয়ই বিশ্বাস কর না—একটা পাথরের মূর্তি তোমার মধ্যে ঢুকে আছে? কি, কর?'

রানু তীব্র কণ্ঠে বলল, 'আমার দিকে ভালো করে তাকিয়ে বলুন, আমাকে কি অনেকটা মূর্তির মতো দেখায় না?'

'না রানু, মূর্তির মতো দেখাবে কেন? অসম্ভব রূপবতী একটি তরুণী—এর বেশি কিছু না। তোমার মতো রূপবতী মেয়ে এ-দেশেই আছে এবং তারা সবাই রক্ত-মাংসের মানুষ।'

রানু উঠে দাঁড়াল। মিসির আলি বললেন, 'চলে যাচ্ছ রানু?'

'হ্যাঁ।'

'অসুখ সারলে তোমাদের ওখানে একবার যাব।'

'না, আপনি আসবেন না। আপনার আসার কোনো দরকার নেই।'

রানু ঘর ছেড়ে চলে গেল। মিসির আলি ক্ষীণস্বরে বললেন, 'ভেরি ইন্টারেস্টিং।' তাঁর ভ্রূ কুঞ্চিত হল। তিনি ব্যাপারটি ঠিক বুঝতে পারছেন না। যতটা সহজ মনে

হয়েছিল এখন ততটা মনে হচ্ছে না। তিনি মৃত্যু-বিষয়ক বইটি আবার পড়তে শুরু করলেন। সাবজেক্টটি তাঁকে বেশ আকর্ষণ করেছে। ফ্যাসিনেটিং টপিক।

১২

গভীর রাতে আনিস জেগে উঠল। শুনশান নীরবতা চারদিকে। রানু হাত-পা ছড়িয়ে বাচ্চা মেয়ের মতো ঘুমোচ্ছে। জানালার আলো এসে পড়েছে তার মুখে। অদ্ভুত সুন্দর একটি মুখ। শুধু তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে হয়। আনিস ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলে উঠে পড়ল। বাথরুমে যেতে হবে।

বাথরুমে পানি জমে আছে। পাইপ জ্যাম হয়ে গেছে। বাড়িঅলাকে বলতে হবে। আনিস নোংরা পানি বাঁচিয়ে সাবধানে ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করেই শুনল ঝুমঝুম করে শব্দ হচ্ছে। নূপুর বাজছে যেন। এর মানে কী? মনের ভুল কি? মনের ভুল হবার কথা নয়। বেশ বোঝা যাচ্ছে নূপুর পায়ে দিয়ে ঝমঝম করতে-করতে কেউ-একজন এঘর-ওঘর করছে। শব্দটা অনেকক্ষণ ধরেই হচ্ছে। মনের ভুল হবার কথা নয়।

বাথরুমের দরজা খুলতেই শব্দটা চট করে থেমে গেল। শুধু একটা তীব্র ফুলের গন্ধ আনিসকে অভিভূত করে ফেলল। একটু আগেও তো এ-রকম সৌরভ ছিল না। আনিসের মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। বিস্ময়ের ঘোর অবশ্যি বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। আনিসের মনে পড়ল একতলার বাগানে হাস্নাহেনার প্রকাণ্ড একটা ঝাড় আছে। বাতাসের ঝাপটায় ফুলের গন্ধই উড়ে এসেছে বারান্দায়। আনিস কিছুক্ষণ একা-একা বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল—নূপুরের শব্দ আবার যদি পাওয়া যায়।

দোতলার একটা বাচ্চা ছেলে শুধু কাঁদছে। তার মা তাকে শান্ত করবার চেষ্টা করছে। একটা রিকশা গেল টুনটুন করে। ব্যস, আর কিছু শোনা গেল না।

শোবার ঘরে রানু ঘুমোচ্ছে। মড়ার মতো। জানালা খোলা। ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে ঘরে। আনিস জানালা বন্ধ করতে গিয়ে শুনল, রান্নাঘর থেকে জিতু মিয়া সাড়াশব্দ দিচ্ছে। কান্না চাপার আওয়াজ।

'জিতু মিয়া।'

জিতু ফুঁপিয়ে উঠল। আনিস রান্নাঘরে ঢুকে বাতি জ্বালাল। জিতু মশারির ভেতর জবুথবু হয়ে বসে আছে।

'জিতু, কি হয়েছে রে?'

'কিছু হয় নাই।'

'বসে আছিস কেন?'

'ঘুম আহে না।'

'স্বপ্ন দেখেছিস?'

জিতু মাথা নাড়ল।

'কী স্বপ্ন?'

'এক জন মাইয়া মানুষ পাকের ঘরে হাঁটতে আছিল।'

'এই দেখেছিস স্বপ্নে?'

'স্বপ্নে দেখি নাই। নিজের চোখে দেখলাম।'

'দূর ব্যাটা, অন্ধকারে তুই মানুষ দেখলি কীভাবে? যা, ঘুমো।'

জিতু শুয়ে পড়ল। আনিস বলল, 'ভয়ের কিছু নেই, আমি জেগে আছি, ঘুমো তুই।'

'আচ্ছা।'

'আর শোন, রান্নাঘরে বাতি জ্বালানো থাকুক।'

'আচ্ছা।'

জিতু শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার নিঃশ্বাস ভারি হয়ে এল। আনিস একটি সিগারেট ধরাল। ঘুম চটে গেছে। তাকে এখন দীর্ঘ সময় জেগে থাকতে হবে। এক পেয়ালা চা খেতে পারলে মন্দ হত না। রাত তো বাজে প্রায় সাড়ে তিনটা। বাকি রাতটা তার জেগেই কাটবে মনে হয়। সিগারেট টানতে ভালো লাগছে না। পেটের ভেতর পাক দিয়ে উঠছে।

ঘুমের মধ্যে রানু শব্দ করে হাসল। আনিস মৃদু স্বরে ডাকল, 'এই রানু।'

রানু খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলল, 'কি?'

'জেগে আছ নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'কী আশ্চর্য, কখন জাগলে?'

'অনেকক্ষণ। তুমি বাথরুমে গেলে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকলে।'

আমাকে ডাকলে না কেন?'

'শুধু-শুধু ডাকব কেন?'

আনিস সিগারেট টানতে লাগল। রানু বলল, 'বড্ড গরম লাগছে। জানালা বন্ধ করলে কেন?'

'গরম কোথায়? বেশ ঠাণ্ডা তো!'

'আমার গরম লাগছে। ফ্যানটা ছাড় না।'

'এই ঠাণ্ডার মধ্যে ফ্যান ছাড়ব কি, কী যে বল!'

রানু ছোট একটি নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'তুমি যখন বাথরুমে ছিলে তখন কি নূপুরের শব্দ শুনেছ?'

আনিস ঠাণ্ডা স্বরে বলল, 'না তো, কেন?'

'না, এমনি। আমি শুয়ে-শুয়ে শুনছিলাম।'

'ঘুমাও রানু।'

'আমার ঘুম আসছে না।'

'ঘুম না এলে উঠে বস, গল্প করি। চা খাওয়া যেতে পারে, কি বল?'

রানু উঠে বসল কিন্তু জবাব দিল না। আনিস দেখল রানু কোন ফাঁকে গায়ের কাপড় খুলে ফেলেছে। ক্লান্ত স্বরে বলল, 'বড্ড গরম লাগছে। তুমি আমার দিকে তাকিও না, প্লীজ!'

'এইসব কী রানু? ঘরে একটা বাচ্চা ছেলে আছে।'

'কী করব, বড্ড গরম লাগছে। তুমি বরং রান্নাঘরের বাতি নিভিয়ে সব অন্ধকার করে দাও।'

'না, বাতি জ্বালানো থাক।'

আনিস দ্বিতীয় সিগারেট ধরাল। রানু বলল, 'আমাদের গ্রামে একটা মন্দির আছে, তার গল্প এখন শুনবে না?'

'আহ্, মন্দির-ফন্দিরের গল্প এখন শুনব না।'

'আহ্, শোন না! আমার বলতে ইচ্ছে করছে। আমি যখন খুব ছোট, তখন একা-একা যেতাম সেখানে।'

'কি মন্দির? কালীমন্দির?'

'নাহ্, বিষ্ণুমন্দির বলত ওরা। তবে কোনো বিষ্ণুমূর্তি ছিল না। একটি দেবী ছিল। হিন্দুরা বলত রুকমিনী দেবী।'

'তুমি মন্দিরে যেতে কী জন্যে?'

'এমনি যেতাম। ছোট বাচ্চা পুতুল খেলে না?'

'কী করতে সেখানে?'

'দেবীমূর্তির সাথে গল্পগুজব করতাম। ছেলেমানুষি খেলা আর কি!'

বলতে-বলতে রানু খিলখিল করে হেসে উঠল। আনিস স্পষ্ট শুনল সঙ্গে-সঙ্গে ঝমঝম করে কোথাও নূপুর বাজছে। রানু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, 'শুনতে পাচ্ছ?'

'কী শুনব?'

'নূপুরের শব্দ শুনছ না?'

আনিস দৃঢ় স্বরে বলল, 'না। তুমি ঘুমাও রানু।'

'আমার ঘুম আসছে না।'

'শুয়ে থাক। তুমি অসুস্থ।'

রানু ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, 'হ্যাঁ, আমি অসুস্থ।'

'তোমাকে খুব বড় ডাক্তার দেখাব আমি।'

'আচ্ছা।'

'এখন শুয়ে থাক।'

রানু মৃদু স্বরে বলল, 'আমি ঐ দেবীকে গান গেয়ে শোনাতাম।'

'ঐ সব অন্য দিন শুনব।'

'আজ রাতে আমার বলতে ইচ্ছে করছে।'

আনিস এসে রানুর হাত ধরল। গা পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে। আনিস অবাক হয়ে বলল, 'তোমার গা তো পুড়ে যাচ্ছে!'

'হুঁ, বড্ড গরম লাগছে। ফ্যানটা ছাড়বে?'

আনিস উঠে গিয়ে জানালা খুলে দিল। ঘর ভর্তি হয়ে গেল ফুলের গন্ধে। আর তখনি রানু অত্যন্ত নিচু গলায় গুনগুন করে কী যেন গাইতে লাগল। অদ্ভুত অপার্থিব কোনো-একটা সুর—যা এ-জগতের কিছু নয়। অন্য কোনো ভুবনের। রান্নাঘর থেকে জিতু ডাকতে লাগল, 'ও ভাইজান, ভাইজান।'

আনিস রানুকে জোর করে বিছানায় শুইয়ে গায়ের চাদর টেনে দিল। জিতুকে বলল, এ ঘরে যেন না আসে। তারপর নেমে গেল নিচে, বাড়িঅলার মেয়েটিকে খবর দিয়ে নিয়ে আসতে।

নীলু এল সঙ্গে সঙ্গে। আনিস দেখল রানু শিশুর মতো ঘুমাচ্ছে। জিতু মিয়া শুধু

জেগে আছে। কাঁদছে ব্যাকুল হয়ে। নীলুর সঙ্গে তার বাবাও আসছেন। তিনি অবাক হয়ে বললেন, 'হয়েছেটা কী?' আনিস ভাঙা গলায় বলল, 'বুঝতে পারছি না, কেমন যেন করছে।'

'কী করছে?'

আনিস জবাব দিল না। নীলু বলল, 'বাবা, তুমি শুয়ে থাক গিয়ে, আমি এখানে থাকি। রাত তো বেশি নেই।' ভদ্রলোক কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে নিচে নেমে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন, 'হাসপাতালে নিতে হলে বলবেন, ড্রাইভারকে ডেকে তুলব।'

'জ্বি আচ্ছা।'

রানু বাকি রাতটা ঘুমিয়ে কাটাল। এক বারও জাগল না। নীলু সারাক্ষণ তার পাশে রইল। আনিসের সঙ্গে তার কথাবার্তা কিছু হল না। আনিস বসার ঘরের সোফায় বসে ঝিমুতে লাগল।

১৩

মিসির আলি লোকটির ধৈর্য প্রায় সীমাহীন। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েই তিনি দ্বিতীয় দফায় রানুদের গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁর সঙ্গে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের এক ভদ্রলোক, জয়নাল সাহেব। উদ্দেশ্য রুকমিনী দেবীর মন্দির সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা।

জয়নাল সাহেব মন্দির দেখে বিশেষ উল্লসিত হলেন না। তিন শ' বৎসরের বেশি এর বয়স হবে না। এ রকম ভগ্নস্তূপ এ-দেশে অসংখ্য আছে। মিসির আলি বললেন, 'তেমন পুরোনো নয় বলছেন?'

'না রে ভাই। ইটের সাইজ দেখলেই বুঝবেন। ভেঙেটেঙে কী অবস্থা হয়েছে দেখেন।'

'যত্ন হয় নি। মন্দির যিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি হয়তো মারা গেছেন কিংবা তাঁর উৎসাহ মিইয়ে গেছে।'

গ্রামের লোকজনের কাছ থেকে অল্প কিছু তথ্য পাওয়া গেল—পালবাবুদের প্রতিষ্ঠিত মন্দির। পালরা স্বপ্নে আদিষ্ট হয়ে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তার পরপরই তাদের ভাগ্য-বিপর্যয় শুরু হয়। তিন-চার বছরের মধ্যে পালরা নির্বংশ হয়ে পড়ে। দেবীকে তুষ্ট করার জন্যে তখন এক রাতে কুমারী বলির আয়োজন করা হয়। বার বছরের একটা কুমারীকন্যাকে অমাবস্যার রাত্রিতে মন্দিরের সামনে বলি দেওয়া হয়। দেবীর তুষ্টি হয় না তাতেও। পাথরের মূর্তি এত সহজে বোধহয় তুষ্ট হয় না। তবে গ্রামের মানুষেরা নাকি বলি দেওয়া মেয়েটিকে এর পর থেকে গ্রামময় ছুটোছুটি করতে দেখে। ময়মনসিংহ থেকে ইংরেজ পুলিশ সুপার এসে মন্দির তালাবন্ধ করে পালদের দুই ভাইকে গ্রেফতার করে নিয়ে যান।

পালরা অত্যন্ত ক্ষমতাবান ছিল। কাজেই ছাড়া পেয়ে এক সময় আবার গ্রামে ফিরে আসে। কিন্তু মন্দির তালাবন্ধই পড়ে থাকে।

ইতিহাস এইটুকুই। মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত মূর্তি সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা গেল না।

দু–এক ঘর নিম্নবর্ণের হিন্দু যারা ছিল, তারা বিশেষ কিছু বলতে পারে না। হরিশ মণ্ডল বলল, 'বাবু, আমরা কেউ ঐ দিকে যাই না। ঐ মন্দিরে গেলে নির্বংশ হতে হয়, কে যাবে বলেন?'

'আপনি তো শিক্ষিত লোক, এইসব বিশ্বাস করেন?'

'করি না, কিন্তু যাইও না।'

'মূর্তিটা আপনি দেখেছেন?'

'আমি দেখি নাই, তবে আমার জ্যাঠা দেখেছে।'

'তিনি কি নির্বংশ হয়েছেন?'

'না, তাঁর তিন ছেলে। এক ছেলে নান্দিনা হাইস্কুলের হেড মাস্টার।'

'মূর্তিটা কেমন ছিল বলতে পারেন?'

'শ্বেতপাথরের মূর্তি। কৃষ্ণনগরের কারিগরের তৈরি। একটা হাত ভাঙা ছিল।'

'মূর্তি নাকি হঠাৎ উধাও হয়েছে?'

'কেউ চুরিটুরি করে নিয়ে বিক্রি করে ফেলেছে। গ্রামে চোরের তো অভাব নাই। এ–রকম একটা মূর্তিতে হাজারখানিক টাকা হেসেখেলে আসবে। সাহেবরা নগদ দাম দিয়ে কিনবে।'

'আচ্ছা, একটা বাচ্চা মেয়েকে যে বলি দেওয়া হয়েছিল, সে নাকি অমাবস্যার রাত্রে ঘুরে বেড়ায়?'

'বলে তো সবাই। চিৎকার করে কাঁদে। আমি শুনি নাই। অনেকে শুনেছে।'

অমাবস্যার জন্যে মিসির আলিকে তিন দিন অপেক্ষা করতে হল। তিনি অমাবস্যার রাত্রে একটা পাঁচ–ব্যাটারির টর্চ আর একটা মোটা বাঁশের লাঠি নিয়ে মন্দিরের চাতালে বসে রইলেন। তিনি কিছুই শুনলেন না। শেয়ালের ডাক শোনা গেল অবশ্যি। শেষ রাত্রের দিকে প্রচণ্ড বাতাস বইতে লাগল। বাতাসে শিস দেবার মতো শব্দ হল। সে–সব নিতান্তই লৌকিক শব্দ। অন্য জগতের কিছু নয়। রাত শেষ হবার আগে–আগে বর্ষণ শুরু হল। ছাতা নিয়ে যান নি। মন্দিরের ছাদ ভাঙা। আশ্রয় নেবার জায়গা নেই। মিসির আলি কাকভেজা হয়ে গেলেন।

ঢাকায় ফিরলেন প্রচণ্ড জ্বর নিয়ে। ডাক্তার পরীক্ষা করে শুকনো মুখে বললেন, 'মনে হচ্ছে নিউমোনিয়া। একটা লাংস এফেকটেড, ভোগাবে।'

মিসির আলিকে সত্যি–সত্যি ভোগাল। তিনি দীর্ঘ দিন শয্যাশায়ী হয়ে রইলেন।

১৪

বইপাড়াতে এ–সময় লোকজন তেমন থাকে না। আজ যেন আরো নির্জন। নীলু একা–একা কিছুক্ষণ হাঁটল। তার খুব ঘাম হচ্ছে। বারবার সবুজ রুমালটি বের করতে হচ্ছে। চারটা দশ বাজে। চিঠিতে লিখেছে সে চারটার মধ্যেই আসবে, কিন্তু আশেপাশে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। নীলু অবশ্যি কারো মুখের দিকে তাকাতেও পারছে না। কাউকে তাকাতে দেখলেই বুকের মধ্যে ধক করে উঠছে।

নীলু একটা বইয়ের দোকানে ঢুকে পড়ল। গল্পের বই তার তেমন ভালো লাগে

না। ভালো লাগে বিলুর। বিলুর জন্যে একটা কিছু কিনলে হয়। কিন্তু কী কিনবে? সবই হয়তো ওর পড়া। ঐ দিন শীর্ষেন্দুর কী-একটা বইয়ের কথা বলছিল। নামটা মনে নেই।

'আচ্ছা, আপনাদের কাছে শীর্ষেন্দুর কোনো বই আছে?'

'জ্বি–না। আমরা বিদেশি বই রাখি না।'

নীলু অন্য একটা ঘরে ঢুকল। শুধু–শুধু দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। সে একটা কবিতার বই কিনে ফেলল। অপরিচিত কবি, তবে প্রচ্ছদটি সুন্দর। একটি মেয়ের ছবি। সুন্দর ছবি। নামটি সুন্দর—'প্রেম নেই'। কেমন অদ্ভুত নাম। 'প্রেম নেই' আবার কী? প্রেম থাকবে না কেন?

দাড়িঅলা এক জন রোগা ভদ্রলোক তখন থেকেই তার দিকে তাকাচ্ছে। লোকটির কাঁধে একটি ব্যাগ। এই কি সে। নীলুর মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেল। নীলু বইয়ের দাম দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে এল। তার পেছনে ফেরারও সাহস নেই। পেছনে ফিরলেই সে হয়তো দেখবে বুড়ো দাড়িঅলা গুটিগুটি আসছে।

না, লোকটি আসছে না। নীলুর মনে হল, ভয়ানক মোটা এবং বেঁটে একজন কে যেন তাকে অনুসরণ করছে। তার দিকে তাকাচ্ছে না, কিন্তু আসছে তার পিছুপিছু। নীলুর তৃষ্ণা পেয়ে গেল। বড্ড টেনশান। বাড়ি ফিরে গেলে কেমন হয়? কিন্তু বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে না। নীলু ঘড়ি দেখল, পাঁচটা পাঁচ। তার মানে কি যে সে আসবে না? কথা ছিল নীলু থাকবে ঠিক এক ঘন্টা।

সে ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল। ভালোই হয়েছে। দেখা না–হওয়াটাই বোধহয় ভালো। দেখা হবার মধ্যে একটা আশাভঙ্গের ব্যাপার আছে। না-দেখার রহস্যময়তাটাই না হয় থাকুক। নীলু ক্লান্ত ভঙ্গিতে হাঁটতে শুরু করল।

'নীলু।'

নীলু দাঁড়িয়ে পড়ল।

'একটু দেরি হয়ে গেল। তুমি ভালো আছ নীলু?'

চকচকে লাল টাই–পরা যে–ছেলেটি হাসছে, সে কে? লম্বা স্বাস্থ্যবান একটি তরুণ। ঝলমল করছে। তার লাল টাই উড়ছে। বাতাসে মিষ্টি ঘ্রাণ আসছে। সেন্টের গন্ধ। পুরুষ মানুষের গা থেকে আসা সেন্টের গন্ধ নীলুর পছন্দ নয়। কিন্তু আজ এত ভালো লাগছে কেন?

'চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছ কেন? কিছু বল।'

'আপনি বলেছিলেন আপনি বুড়ো।'

'আমরা সবাই কিছু–কিছু মিথ্যা বলি। আমাকে নীলু নামের একটি মেয়ে লিখেছিল, সে দেখতে কুৎসিত।'

লোকটি হাসছে হা হা করে। এত সুন্দর করেও মানুষ হাসতে পারে। নীলুর এক ধরনের কষ্ট হতে লাগল। মনে হতে লাগল সমস্তটাই একটা সুন্দর স্বপ্ন, খুবই ক্ষণস্থায়ী। যেন এক্ষুণি স্বপ্ন ভেঙে যাবে। নীলু দেখবে সে জেগে উঠেছে, পাশের বিছানায় বিলু ঘুমাচ্ছে মশারি না–ফেলে। কিন্তু সে–রকম কিছু হল না। ছেলেটি হাসিমুখে বলল, 'কোথাও বসে এক কাপ চা খেলে কেমন হয়? খাবে?'

নীলু মাথা নাড়ল—সে খাবে।

'তুমি কিন্তু সবুজ রুমালটি ব্যাগে ভরে ফেলছ। আমি যেতে ঠিক সাহস পাচ্ছি না।'

নীলু অস্বাভাবিক ব্যস্ত হয়ে রুমাল বের করতে গেল। একটা লিপস্টিক, একটা ছোট চিরুনি, কিছু খুচরো পয়সা গড়িয়ে পড়ল নিচে। ছেলেটি হাসিমুখে সেগুলি কুড়োচ্ছে। নীলু মনে-মনে বলল—যেন এটা স্বপ্ন না হয়। আর স্বপ্ন হলেও যেন স্বপ্নটা অনেকক্ষণ থাকে। নীলুর খুব কান্না পেতে লাগল।

নিউ মার্কেটের ভেতর চা খাওয়ার তেমন ভালো জায়গা নেই। ওরা বলাকা বিল্‌ডিংয়ের দোতলায় গেল। চমৎকার জায়গা! অন্ধকার-অন্ধকার চারদিক। পরিচ্ছন্ন টেবিল। সুন্দর একটি মিউজিক হচ্ছে।

'চায়ের সঙ্গে কিছু খাবে নীলু?'

'নাহ্।'

'এরা ভালো সমুচা করে। সমুচা দিতে বলি? আমার খিদে পেয়েছে। কি, বলব?'

'বলুন।'

ছেলেটি হাসল। নীলুর খুব ইচ্ছা করছিল, জিজ্ঞেস করে—হাসছ কেন তুমি? আমি কি হাস্যকর কিছু করেছি? কিন্তু নীলু কিছু বলল না। ছেলেটি হাসতে-হাসতে বলল, 'আসলে আমি বিজ্ঞাপনটা মজা করবার জন্যে দিয়েছিলাম, কেউ জবাব দেবে ভাবি নি।'

'আমি ছাড়া কেউ কি লিখেছিল?'

'তা লিখেছে। মনে হচ্ছে এ-দেশের মেয়েদের কাজকর্ম বিশেষ নেই। সুযোগ পেলেই ওরা চিঠি লেখে। এই কথা বললাম বলে তুমি আবার রাগ করলে না তো?'

'নাহ্।'

'গুড। আমি কিন্তু শুধু তোমার চিঠির জবাব দিয়েছি। অন্য কারোর চিঠির জবাব দিই নি। আমার কথা বিশ্বাস করছ তো?'

'করছি।'

বেয়ারা চায়ের পট দিয়ে গেল। ছেলেটি বলল, 'দাও, আমি চা বানিয়ে দিচ্ছি। ঘরে বানাবে মেয়েরা, কিন্তু বাইরে পুরুষেরা—এ-ই নিয়ম।'

নীলু লক্ষ করল, ছেলেটি তার কাপে তিন চামচ চিনি দিয়েছে। নীলু এক বার লিখেছে সে চায়ে তিন চামচ চিনি খায়। ছেলেটি সেটা মনে রেখেছে। কী আশ্চর্য।

'চায়ে এত চিনি খাওয়া কিন্তু ভালো না।'

নীলু কিছু বলল না।

'এর পর থেকে চিনি কম খাবে।'

নীলু ঘাড় নাড়ল।

তারা সন্ধ্যা পর্যন্ত বসে রইল। নীলু একবার বলল, 'সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে, উঠি?'

ছেলেটি বলল, 'আরেকটু বস, আমি বাসায় পৌঁছে দেব, আমার সঙ্গে গাড়ি আছে।' নীলু আর কিছু বলল না।

'একটু দেরি হলে তোমাকে আবার বাসায় বকবে না তো?'

'নাহ্, বকবে না। আমি মাঝে-মাঝে অনেক রাত করে বাসায় ফিরি।'

'সেটা ঠিক না নীলু। শহর বড় হচ্ছে, ক্রাইম বাড়ছে। ঠিক না?'

'হ্যাঁ, ঠিক।'

'ঐ দিন কী হল জান—আমার পরিচিত এক মহিলার কান থেকে টেনে দুল নিয়ে গেছে, রক্তারক্তি কাণ্ড!'

'আমি বাইরে গেলে গয়নাটয়না পরি না।'

'না-পরাই উচিত। আচ্ছা নীলু, তুমি কি আজ তোমার বাবার সঙ্গে আমাকে আলাপ করিয়ে দেবে?'

'আপনি যদি চান, দেব।'

'আমি নিশ্চয়ই চাই। তুমি কি চাও?'

'চাই' বলতে গিয়ে নীলুর চোখ ভিজে উঠল। ছেলেটিকে এখন কত-না পরিচিত মনে হচ্ছে। সে যদি এখন হাত বাড়িয়ে নীলুর হাত স্পর্শ করে, তাহলে কেমন লাগবে নীলুর? ভালোই লাগবে। কিন্তু ছেলেটি অত্যন্ত ভদ্র। সে এমন কিছুই করবে না।

'নীলু, আমি তোমার জন্যে একটা উপহার এনেছিলাম। কিন্তু তার আগে বল, তুমি কী এনেছ? তুমি বলেছিলে লাল টাই আনবে। ভুলে গেছ, না?'

'না, ভুলব কেন?'

'আমি তোমার জন্যেই লাল টাই পরে এসেছি। যদিও লাল রং আমার পছন্দ নয়। আমার পছন্দ হচ্ছে—নীল।'

'নীল আমারও পছন্দ।'

'তবে হাল্‌কা নীল, কড়া নীল নয়।'

নীলু এই প্রথম অল্প হাসল। হাল্‌কা নীল তার নিজেরও পছন্দ। ছেলেটি হাসতে-হাসতে বলল, 'আমার সবচে অপছন্দ হচ্ছে সবুজ রং। কিন্তু দেখ, আজ সবুজ রংটাও খারাপ লাগছে না।'

তারা উঠে দাঁড়াল সাড়ে আটটার দিকে। হেঁটে-হেঁটে এল নিউ মার্কেটের গেটে। ছোট্ট একটা হোণ্ডা সিভিক সেখানে পার্ক করা। ছেলেটি ঘড়ি দেখে বলল, 'রাত কি বেশি হয়ে গেল নীলু?'

'না, বেশি হয় নি।'

'তোমার বাবা দুশ্চিন্তা না-করলে হয়। আমি চাই না আমার জন্যে কেউ বকা খাক। অবশ্যি এক-আধ দিন বকা খেলে কিছু যায়-আসে না, কি বল?'

নীলু হাসল। ছেলেটিও হাসল। মার্জিত হাসি।

'সরাসরি বাসায় যাবে, নাকি যাবার আগে আইসক্রীম খাবে? ধানমণ্ডিতে একটা ভালো আইসক্রীমের দোকান দিয়েছে।'

'আজ আর যাব না।'

'ঠিক আছে, চল বাসায় পৌঁছে দিই।'

ছেলেটি নীলুকে তাদের গেটের কাছে নামিয়ে দিল। নীলুর খুব ইচ্ছে করছিল তাকে বসতে বলে, কিন্তু তার বড্ড লজ্জা করল। বিলু নানান প্রশ্ন শুরু করবে।

১৫

'স্যার, ভেতরে আসব?'

'এস। কী ব্যাপার?'

মিসির আলি মেয়েটিকে ঠিক চিনতে পারলেন না। তিনি কখনো তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের চিনতে পারেন না।

'স্যার, আমার নাম নীলু, নীলুফার।'

'ও, আচ্ছা।'

মিসির আলি পরিচিত ভঙ্গিতে হাসলেন। কিন্তু নামটি তাঁর কাছে অপরিচিত লাগছে। এও এক সমস্যা। কারো নাম তিনি মনে রাখতে পারেন না। তাঁর ভ্রূ কুঞ্চিত হল। নাম মনে না-করতে পারার একটিই কারণ—মানুষের প্রতি তাঁর আগ্রহ নেই। আগ্রহ থাকলে নাম মনে থাকত।

'স্যার, আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন? আমি সেকেণ্ড ইয়ারের। এক দিন এসেছিলাম আমরা চার বন্ধু।'

'ও হ্যাঁ। এসেছিলে তোমরা। মনে পড়েছে। আজ কী ব্যাপার?'

মেয়েটি ইতস্তত করতে লাগল। তার মানে কী? কমবয়েসী মেয়েদের তিনি এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করেন। তরলমতি মেয়েরা মাঝে-মাঝে অনেক অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা করে বসে।

'তোমার কী ব্যাপার, বল।'

'স্যার, আমি ঐ ইএসপির টেস্টটা আবার দিতে চাই।'

'এক বার তো দিয়েছ। আবার কেন?'

মিসির আলি বিস্মিত হলেন। এই মেয়েটির মতিগতি তিনি বুঝতে পারছেন না।

'স্যার, আমার মনে হয়, এবার পরীক্ষা করলে দেখা যাবে—আমার ইএসপি আছে।'

'এ-রকম মনে হবার কারণ কী?'

মেয়েটি উত্তর না-দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। লক্ষণ ভালো নয়। মিসির আলি গম্ভীর গলায় বললেন, 'এখন আমি একটু ব্যস্ত আছি। অন্য এক দিন এস।'

মেয়েটি তবুও কিছু সময় দাঁড়িয়ে রইল।

'তুমি কি অন্য কিছু বলতে চাও?'

'জ্বি-না স্যার। আমি যাই। স্লামালিকুম।'

মিসির আলি গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন। এ-মেয়েটিকে প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক হবে না। এরা সহজেই একটা ঝামেলা বাধিয়ে দিতে পারে। এ-রকম সুযোগ দেওয়া ঠিক না।

বারটায় একটা ক্লাস ছিল। মিসির আলি গিয়ে দেখলেন কোনো ছাত্র-ছাত্রী নেই। কোনো স্ট্রাইক হচ্ছে কি? এ-রকম কিছু শোনেন নি। সামনে হয়তো টার্ম পরীক্ষা আছে। টার্ম পরীক্ষা থাকলে ছাত্ররা দল বেঁধে আসা বন্ধ করে দেয়। মিসির আলি ভ্রূ কুঁচকে খালি ক্লাসে মিনিট পাঁচেক বসে রইলেন। গত রাতে অসুস্থ শরীরে এই ক্লাসটির জন্যে পড়াশোনা করেছেন। এ-অবস্থা হবে জানলে সকাল-সকাল শুয়ে পড়তে পারতেন। ছাত্রশূন্য একটি ক্লাসে তিনি খাতাপত্র নিয়ে গম্ভীর হয়ে বসে আছেন—হাস্যকর দৃশ্য। অনেকেই করিডোর দিয়ে হাঁটবার সময় তাঁকে কৌতূহলী হয়ে দেখল। পাগলটাগল ভাবছে বোধহয়। মিসির আলি উঠে পড়লেন।

আজকের দিনটিই শুরু হয়েছে খারাপভাবে। একটি কাজও ঠিকমতো হচ্ছে না। মিসির আলি ক্রমেই বিরক্ত হয়ে উঠতে লাগলেন। তাঁর কপালের মাঝখানে ব্যথা শুরু হল। এই উপসর্গটি নতুন। ব্লাড-প্রেশারট্রেশার হয়েছে বোধহয়। ডাক্তার দেখাতে হবে।

তিনি বাড়ি ফিরলেন তিনটার দিকে। এই অসময়েও বসার ঘরে কে যেন বসে আছে। সমস্ত দিনটিই যে খারাপ যাবে, এটা হচ্ছে তার প্রমাণ। গ্রামের বাড়ি থেকে টাকাপয়সা চাইতে কেউ এসেছে নির্ঘাত।

'কে?'

'জ্বি, আমি আনিস।'

'আনিস সাহেব, আপনি এই সময়ে! অফিস নেই?'

'ছুটি নিয়ে এলাম।'

'ব্যাপার কী?'

'রানুর শরীরটা বেশি খারাপ। ভাবলাম, আপনার সঙ্গে দেখা করে যাই।'

'ভালোই করেছেন। বসেন, চা-টা দিয়েছে?'

'জ্বি, চা খেয়েছি। আপনার ভাই ছিলেন এতক্ষণ।'

'বসুন, আমি কাপড় ছেড়ে আসি।'

লোকটি জড়সড় হয়ে বসে আছে। মিসির আলি লক্ষ করলেন, তার চোখের নিচে কালি পড়েছে। তার মানে রাতে ঘুমাতে পারছে না। এ রকম হওয়ার কথা নয়। মিসির আলি চিন্তিত মুখে ভেতরে ঢুকলেন। তাঁর ফিরে আসতে অনেক সময় লাগল।

'এখন বলেন, ব্যাপারটা কী?'

আনিস ইতস্তত করে বলল, 'ভূতপ্রেত বলে সত্যি কিছু আছে?'

'এই কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?'

আনিস মুখ কালো করে বলল, 'অনেক রকম কাণ্ডকারখানা হচ্ছে। আমি কনফিউজড হয়ে গেছি।'

'অর্থাৎ এখন ভূতপ্রেত বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন?'

আনিস চুপ করে রইল।

'এর কারণটা বলেন, শুনি।'

'নানারকম শব্দ হয় ঘরে।'

'তাই নাকি? আপনি নিজে শোনেন?'

'জ্বি, শুনি। গন্ধও পাই, ফুলের গন্ধ।'

'আপনি পান, না আপনার স্ত্রী পান?'

'রানু প্রথম পায়, তারপর আমি পাই।'

মিসির আলি চুরুট ধরালেন। আনিস বলল, 'গত রাতে ঘরের মধ্যে কেউ যেন নূপুর পায়ে হাঁটছিল।'

'এই নূপুরের শব্দ প্রথম কে শোনে? আপনার স্ত্রী?'

'জ্বি।'

'তারপর আপনাকে বলার পর আপনি শুনতে পান।'

'জ্বি।'

'আনিস সাহেব, এটাকে বলা হয় ইনডিউসড অডিটরি হেলুসিনেশন। আপনার মন

দুর্বল। আপনার স্ত্রী যখন বলেন শব্দ শুনতে পাচ্ছেন, তখন আপনিও তা শুনতে থাকেন। ব্যাপারটি আপনার মনোজগতে। আসলে কোনো শব্দ হচ্ছে না।'

আনিস দীর্ঘ সময় চুপ করে থেকে বলল, 'আপনি যদি একবার আসেন আমাদের বাসায়, আপনি নিজেও শুনবেন।'

'না ভাই, আমি শুনব না। আমি খুব শক্ত ধরনের মানুষ। খুবই যুক্তিবাদী লোক আমি।'

'আপনি আসেন–না এক বার।'

'ঠিক আছে, যাব।'

'কবে আসবেন? আজ আসতে পারবেন?'

'আমি কাল–পরশুর মধ্যে একবার যাব।'

'আমাদের বাড়িঅলার খুব সুন্দর ফুলের বাগান আছে। প্রচুর গোলাপও আছে। বিকেলের দিকে গেলে সেটাও দেখতে পারবেন।'

মিসির আলি কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'বড় ফুলের বাগান?'

'জ্বি।'

'আনিস সাহেব, এমন কি হতে পারে না, বাতাসে নিচের বাগান থেকে ফুলের সৌরভ ভেসে আসে? সেই সৌরভকে আপনি একটি আধ্যাত্মিক রূপ দেন। হতে পারে?'

'পারে, কিন্তু শব্দটা?'

'কোনো একটা ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই আছে। মস্তিষ্ক খুব অদ্ভুত জিনিস, আনিস সাহেব। সে আপনাকে এমন সব জিনিস দেখাতে বা শোনাতে পারে, যার আসলে কোনো অস্তিত্ব নেই। আপনি কি উঠছেন?'

'জ্বি।'

'আচ্ছা ঠিক আছে, যান। আমার নিজেরও মাথা ধরেছে। দুটো পেরাসিটামল খেয়েছি, লাভ হচ্ছে না। জ্বরও আসছে বলে মনে হয়। শরীরটা গেছে। বেশি দিন বাঁচব না।'

১৬

পত্রিকা খুলে নীলু অবাক হল। সেই বিজ্ঞাপনটি আবার ছাপা হয়েছে। কথাগুলি এক। জিপিও বক্স নাম্বারও ৭৩। শিরোনামটিও আগের মতো—কেউ কি আসবেন?' এর মানে কী? নীলুর ধারণা ছিল, এই বিজ্ঞাপনটি আর কোনো দিন ছাপা হবে না। এর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু এখন তা মনে হচ্ছে না। নীলুর ইচ্ছা হল দরজা বন্ধ করে কিছুক্ষণ কাঁদার। সে মুখ কালো করে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। বারান্দায় তার জন্যে একটা বড় ধরনের চমক অপেক্ষা করছিল। মিসির আলি সাহেব দাঁড়িয়ে। তিনি বললেন, 'এখানে কি আনিস সাহেব থাকেন?'

'স্যার আপনি? আমাকে চিনতে পেরেছেন?'

'ও ইয়ে, তুমি। আমার ছাত্রী? কোন ইয়ার?'

'থার্ড ইয়ার স্যার। নীলু আমার নাম। নীলুফার।'

'ও, আচ্ছা। নীলুফার—তোমাদের তেতলায় আনিস সাহেব থাকেন নাকি?'

'জ্বি।'

'তাঁর কাছে এসেছি। উঠবার রাস্তা কোন দিকে?'

নীলু তাঁকে সঙ্গে করে তিনতলায় নিয়ে গেল।

'ফেরবার পথে আমাদের বাসা হয়ে যাবেন স্যার। যেতেই হবে।'

'আচ্ছা, দেখি।'

'দেখাদেখি না স্যার, আপনি আসবেন।'

আনিস ঘরে ছিল না। রানু তাঁকে নিয়ে বসাল। সে খুবই অবাক হয়েছে। মিসির আলি বললেন, 'খুব অবাক হয়েছেন মনে হচ্ছে?'

'আপনি–আপনি করে বলছেন কেন?'

'ও আচ্ছা, তুমি-তুমি করে বলতাম, তাই না? ঠিক আছে। এখন বল, আমাকে দেখে অবাক হয়েছ?'

'হ্যাঁ।'

'খুব অবাক হয়েছ?'

'জ্বি। আপনি আসবেন ভাবতেই পারি নি।'

মিসির আলি সিগারেট ধরিয়ে হাসিমুখে বললেন, 'তুমি তো শুনেছি সব কিছু আগে বলে দিতে পার, এটি তো পারার কথা ছিল।'

রানু থেমে–থেমে বলল, 'আপনি লোকটি বেশ অদ্ভুত!'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। আপনার যুক্তিও খুব ভালো, বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়।'

'বিশ্বাস করলেই পার। আনিস সাহেব কখন আসবেন?'

'এসে পড়বে।'

'আমাকে একটু চা খাওয়াও। আর শোন, তোমাদের একটা কাজের ছেলে আছে নাকি? ওকে পাঠাও তো আমার কাছে।'

'ওকে কী জন্যে?'

'কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করব।'

মিসির আলি ঃ কি নাম?

জিতু : জিতু মিয়া।

মিসির আলি : দেশ কোথায়?

জিতু : টাঙ্গাইল।

মিসির আলি : শুনলাম দু'–এক দিন আগে তুমি নাকি রাতের বেলা কি–একটা দেখে ভয় পেয়েছ?

জিতু : জ্বি, পাইছি।

মিসির আলি : কী দেখেছ?

জিতু : পাকের ঘরে এক জন মেয়েমানুষ। হাঁটাচলা করতাছে।

মিসির আলি : সুন্দরী?
জিতু : জ্বি, খুব সুন্দর।
মিসির আলি : রান্নাঘরে তো বাতি জ্বালানো ছিল?
জিতু : জ্বি–না।
মিসির আলি : অন্ধকারে তুমি মানুষ কীভাবে দেখলে?
জিতু : নিশ্চুপ।
মিসির আলি ঃ আমার মনে হয় জিনিসটা তুমি স্বপ্নে দেখেছ।
জিতু : নিশ্চুপ।
মিসির আলি : আচ্ছা জিতু মিয়া, তুমি যাও। শোন, এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে এস আমার জন্যে। ক্যাপস্টান। নাও, টাকাটা নাও।

জিতু মিয়া চলে গেল। রানু ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'ইউনিভার্সিটির সব মাস্টাররাই কি আপনার মতো বুদ্ধিমান?'

'না। আমার নিজের বুদ্ধি একটু বেশি। আচ্ছা, এখন যে খুটখাট শব্দ শোনা যাচ্ছে, এই শব্দটার কথাই কি আনিস সাহেব আমাকে বলেন?'

রানু জবাব দিল না। মিসির আলি কান পেতে শুনলেন।

'শব্দটা তো বেশ স্পষ্ট। রান্নাঘর থেকে আসছে না?'

'হুঁ।'

'এই শব্দটার কথাই আনিস সাহেব বলেন, তাই না?'

'বোধহয়। আপনি রান্নাঘর দেখবেন? আপনি যাওয়ামাত্রই শব্দ থেমে যাবে।'

'শব্দটা বেশির ভাগই রান্নাঘরে হয়?'

'জ্বি।'

'ইঁদুর–মারা কিছু বিষ ছড়িয়ে দিও, আর শব্দ হবে না। ওটা ইঁদুরের শব্দ। রান্নাঘরে খাবারের লোভে ঘোরাঘুরি করে। সেজন্যেই শব্দটা বেশি হয় রান্নাঘরে। বুঝলে?'

'হুঁ।'

'যুক্তিটা পছন্দ হচ্ছে না মনে হয়।'

'যুক্তি ভালোই। আরেক কাপ চা খাবেন?'

'নাহ্, এখন উঠব। আনিস সাহেব মনে হয় আজ আর আসবেন না।'

'না, আপনি আরেকটু বসুন। আপনাকে একটা গল্প বলব।'

'আজ আর না, রানু। মাথা ধরেছে।'

'মাথা ধরলেও আপনাকে শুনতে হবে।. বসুন, আমি চা আনছি। প্যারাসিটামল খাবেন?'

'ঠিক আছে।'

চা আসবার আগেই আনিস এসে পড়ল। তার অফিসে নাকি কী-একটা ঝামেলা হয়েছে। দশ হাজার টাকার একটা চেকের হিসেবে গণ্ডগোল। চেকটা ইস্যু হয়েছে আনিসের অফিস থেকে। আনিসের চোখে–মুখে ক্লান্তি। মিসির আলি বললেন, 'আপনি বিশ্রামটিশ্রাম করেন। আমার জন্যে ব্যস্ত হবেন না। আমি রানুর কাছ থেকে একটা গল্প শুনব।'

'কী গল্প?'

'জানি না কী গল্প। ভয়ের কিছু হবে।'

রানু বলল, 'না, ভয়ের না। তুমি গোসলটোসল সেরে এসে চা খাও।'

'আমি গল্পটা শুনতে পারব না?'

'নাহ্। সব গল্প সবার জন্যে না।'

আনিসের কপালে সূক্ষ্ম ভাঁজ পড়ল। সে কিছু বলল না। বাথরুমে ঢুকে পড়ল। রানু তার গল্প শুরু করল খুব শান্ত গলায়। মিসির আলি তাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করতে লাগলেন।

রানুর দ্বিতীয় গল্প

আমার তখন মাত্র বিয়ে হয়েছে। সপ্তাহখানেকও হয় নি। সেই সময় এক কাণ্ড হল।

আমার বিয়ে হয়েছিল শ্রাবণ মাসের ছ' তারিখে। ঘটনাটা ঘটল শ্রাবণ মাসের চোদ্দ তারিখ। সকালবেলা আমার এক মামাশ্বশুর এসে ওকে নিয়ে গেলেন মাছ মারতে। নৌকায় করে মাছ মারা হবে। নৌকা বড় গাঙ দিয়ে যাবে সোনাপোতার বিলে। বঁড়শি ফেললেই সেখানে বড়-বড় বোয়াল মাছ পাওয়া যায়। বর্ষাকালের বোয়ালের কোনো স্বাদ নেই জানেন তো? কিন্তু সোনাপোতার বোয়ালে বর্ষাকালেই নাকি সবচেয়ে বেশি তেল হয়।

দুপুরের পর থেকেই হঠাৎ করে খুব দিন-খারাপ হল। বিকেল থেকে বাতাস বইতে লাগল। আমরা সবাই চিন্তিত হয়ে পড়লাম। ওরা আর ফেরে না। সন্ধ্যার পর থেকে শুরু হল প্রচণ্ড ঝড়। বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেল।

আমাদের বাড়িটা হচ্ছে কাঠের। কাঠের দোতলা। আমি একা-একা দোতলায় উঠে গেলাম। দোতলার কোণার দিকের একটা ঘরে আজেবাজে জিনিস রাখা হয়। স্টোররুমের মতো। কেউ সেখানে যায়টায় না। আমি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে কাঁদতে শুরু করলাম। তখন হঠাৎ একটি মেয়ের কথা শুনতে পেলাম। মেয়েটি খুব নিচুস্বরে বলল—সোনাপোতার বিলে ওদের নৌকা ডুবে গেছে। কিছুক্ষণ আগেই ডুবেছে। এটা শোনার পর আমি অজ্ঞান হয়ে যাই।

মিসির আলি বললেন, 'এইটুকুই গল্প?'

'হাঁ।'

'গল্পের কোনো বিশেষত্ব লক্ষ করলাম না।'

'বিশেষত্ব হচ্ছে, সেদিন সন্ধ্যায় ওদের সত্যি-সত্যি নৌকাডুবি হয়েছিল। এর কোনো ব্যাখ্যা আছে আপনার কাছে?'

'আছে। ঝড়বৃষ্টি হচ্ছিল, কাজেই তোমার মনে ছিল অমঙ্গলের আশঙ্কা। অবচেতন মনে ছিল নৌকাডুবির কথা। অবচেতন মনই কথা বলেছে তোমার সঙ্গে। মানুষের মন খুব বিচিত্র রানু। আমি উঠলাম।'

মিসির আলি উঠে দাঁড়ালেন। রানু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, 'একতলার নীলু নামের যে-মেয়েটি আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছে, সে আপনার জন্যে বারান্দায় অপেক্ষা করছে। যাবার সময় ওর সঙ্গে আপনার দেখা হবে।'

মিসির আলি বিস্মিত হয়ে বললেন, 'তাতে কি?'

রানু বলল, 'নীলু এই মুহূর্তে কী ভাবছে তা আমি বলতে পারব। ওকে জিজ্ঞেস

করলেই দেখবেন আমি ঠিকই বলেছি। আমি অনেক কিছুই বলতে পারি।'

'নীলু কী ভাবছে?'

'নীলু ভাবছে এক জন অত্যন্ত সুপুরুষ যুবকের কথা।'

'সেটাই তো স্বাভাবিক। এক জন অবিবাহিত যুবতী এক জন সুপুরুষ যুবকের কথাই ভাবে। এটা বলার জন্যে কোনো অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার দরকার হয় না, রানু।'

মিসির আলি নেমে গেলেন। নীলু সত্যি-সত্যি বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। সে খুব অনুরোধ করল যাতে স্যার এক কাপ চা খেয়ে যান। কিন্তু মিসির আলি বসলেন না। তাঁর প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। প্যারাসিটামল কাজ করছে না। সারা জীবন তিনি এত অষুধ খেয়েছেন যে অষুধ তাঁর ওপর এখন আর কাজ করে না। খুব খারাপ লক্ষণ।

১৭

নীলুর বাবা বারান্দায় বসে ছিলেন। নীলুকে বেরুতে দেখে তিনি ডাকলেন, 'নীলু, কোথায় যাচ্ছ মা?'

'একটু বাইরে যাচ্ছি।'

কিন্তু এইটুকু বলতেই নীলুর গলা কেঁপে গেল। গাল লাল হল। তিনি তা লক্ষ করলেন। বিস্মিত গলায় বললেন, 'বাইরে কোথায়?' নীলু জবাব দিল না।

'কখন ফিরবে মা?'

'আটটা বাজার আগেই ফিরব।'

'গাড়ি নিয়ে যাও।'

'গাড়ি লাগবে না। তোমার কিছু লাগবে বাবা, চা বানিয়ে দিয়ে যাব?'

'না, চা লাগবে না। একটু সকাল-সকাল ফিরিস মা। শরীরটা ভালো না।'

'সকাল-সকালই ফিরব।'

বিকেলের আলো নরম হয়ে এসেছে। সব কিছু দেখতে অন্য রকম লাগল নীলুর চোখে। নিউ মার্কেটের পরিচিত ঘরগুলিও যেন অচেনা। যেন ওদের এক ধরনের রহস্যময়তা ঘিরে আছে।

'কেমন আছ নীলু?'

নীলু তৎক্ষণাৎ তাকাতে পারল না। তার লজ্জা করতে লাগল। তার ভয় ছিল আজ হয়তো সে আসবে না। প্রিয়জনদের দেখা তো এত সহজে পাওয়া যায় না।

'আজ তুমি দেরি করে এসেছ। পাঁচ মিনিট দেরি। তোমার তার জন্যে শাস্তি হওয়া দরকার।'

'কী শাস্তি?'

'সেটা আমরা চা খেতে-খেতে ঠিক করব। খুব চায়ের পিপাসা হয়েছে।'

'কোথায় চা খাবেন?'

'এইখানে কোথাও। আর শোন নীলু, চা খেতে-খেতে তোমাকে আমি একটা কথা বলতে চাই। খুব জরুরি কথা।'

'এখন বলুন। হাঁটতে-হাঁটতে বলুন।

'নাহ্। এই কথা হাঁটতে-হাঁটতে বলা যায় না। বলতে হয় মুখোমুখি বসে। চোখের দিকে তাকিয়ে।'

নীলুর কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম জমল। নিঃশ্বাস ভারি হয়ে এল। সে কোনোমতে বলল, 'ঠিক আছে, চলুন কোথাও বসি।'

'কি বলতে চাই তা কি বুঝতে পারছ?'

'নাহ্।'

'বুঝতে পারছ, নীলু। মেয়েরা এইসব জিনিস খুব ভালো বুঝতে পারে।'

নীলুর গা কাঁপতে লাগল। অন্য এক ধরনের আনন্দ হচ্ছে। অন্য এক ধরনের সুখ। মনে হচ্ছে পৃথিবীতে এখন আর কেউ নেই। চারিদিকে সীমাহীন শূন্যতা। শুধু তারা দু' জন হাঁটছে। হেঁটেই চলেছে। কেমন যেন এক ধরনের কষ্টও হচ্ছে বুকের মধ্যে।

ওরা একটি রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসল।

'চায়ের সঙ্গে আর কিছু খাবে?'

'না।'

'খাও না! কিছু খাও।'

সে বয়কে ডেকে কী যেন বলল। নীলু শুনতে পেল না। কোনো কিছুতেই তার মন বসছে না। সব তার কাছে অস্পষ্ট লাগছে।

'কি নীলু, কিছু বল। চুপ করে আছ কেন?'

'কী বলব?'

'যা ইচ্ছা বল।'

নীলু ইতস্তত করে বলল, 'আপনি ঐ বিজ্ঞাপনটা আবার দিয়েছেন কেন?'

সে হাসল শব্দ করে।

'দেখেছ বিজ্ঞাপনটা?'

'হ্যাঁ।'

'মন-খারাপ হয়েছে?'

নীলু কিছু বলল না।

'বল, মন-খারাপ হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

সে আবার শব্দ করে হাসল। তার পর ফুর্তিবাজের ভঙ্গিতে বলল, 'আমি পত্রিকার অফিসে টাকা দিয়ে রেখেছিলাম। কথা ছিল প্রতি মাসে দু' বার করে ছাপবে। তোমার সঙ্গে দেখা হবার পর তার আর প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু সেটা বলা হয় নি। আগামী কাল বন্ধ করে দেব। এখন খুশি তো?'

নীলু জবাব দিল না।

'বল, এখন তুমি খুশি? এইভাবে চুপ করে থাকলে হবে না, কথা বলতে হবে। বল, তুমি খুশি?'

'হুঁ।'

সে আরেক দফা চায়ের অর্ডার দিয়ে একটা সিগারেট ধরাল। খানিকক্ষণ দু' জনেই কোনো কথা বলল না। বাইরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। পৃথিবী বড় সুন্দর গ্রহ। এতে বেঁচে

থাকতে সুখ আছে।

'নীলু।'

'হুঁ।'

'তোমাকে যে-কথাটি আমি বলতে চাচ্ছিলাম সেটি বলি?'

'বলুন।'

'দেখ নীলু, সারা জীবন পাশাপাশি থেকেও এক সময় একজন অন্যজনকে চিনতে পারে না। আবার এমনও হয়, এক পলকের দেখায় একে অন্যকে চিনে ফেলে। ঠিক না?'

নীলু জবাব দিল না।

'বল, ঠিক না?'

'হ্যাঁ।'

'তোমাকে প্রথম দিন দেখেই . . .'

সে চুপ করে গেল। নীলুর চোখে জল এল।

'নীলু,আজ যদি তোমাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই, তাহলে তোমার আপত্তি আছে?'

নীলু ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলল। জবাব দিল না। সে মুখ ঘুরিয়ে বসে ছিল। সে তার চোখের জল তাকে দেখাতে চায় না।

'বল নীলু, আপত্তি আছে?'

'আমাকে আটটার মধ্যে বাড়ি ফিরতে হবে।'

'আটটার আগেই আমরা বাড়ি ফিরব। এস উঠি।'

সে নীলুর হাত ধরল। ভালবাসার স্পর্শ, যার জন্যে তরুণীরা সারা জীবন প্রতীক্ষা করে থাকে।

১৮

রানু আজ অসময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম যখন ভাঙল তখন দিন প্রায় শেষ। আকাশ লালচে হতে শুরু করেছে। সে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। নিচের বারান্দায় বিলু হাঁটছে একা-একা। রানুর কেমন জানি অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। যেন কোথাও কিছু-একটা অস্বাভাবিকতা আছে, সে ধরতে পারছে না। নিচে থেকে বিলু ডাকল, 'রানু ভাবী, চা খেলে নেমে এস, চা হচ্ছে।'

'চা খাব না।'

'আস না বাবা! ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার বলব। কুইক।'

রানু নেমে গেল। তার মাথায় সূক্ষ্ম একটা যন্ত্রণা হচ্ছে। কিছুই ভালো লাগছে না। বমিবমি ভাব হচ্ছে।

বারান্দায় নীলুর বাবাও ছিলেন। ওপর থেকে তাঁকে দেখা যায় নি। তিনি নরম স্বরে বললেন, 'এখন তুমি কেমন আছ মা?'

'জ্বি, ভালো।'

'আমি আনিস সাহেবকে বলেছি বড় একজন ডাক্তার দেখাতে। পিজির একজন প্রফেসর আছেন, আমার আত্মীয়, তাঁকে আমি বলে দেখতে পারি। তুমি আলাপ করো আনিসের সাথে, কেমন?'

'জ্বি, করব।'

বিলু বলল, 'বাবা, ঘরে গিয়ে তুমি চা খাও। তোমার ঠাণ্ডা লেগে যাবে। আমরা দু' জন বাগানে বসি।' ভদ্রলোক চলে গেলেন সঙ্গে-সঙ্গে।

রানু বলল, 'নীলু কোথায়?'

'ওর এক বন্ধুর বাড়ি গেছে।'

বন্ধুর বাড়ি যাওয়া এমন কোনো ব্যাপার নয়, তবু কেন জানি রানুর বুকে ধক করে একটা ধাক্কা লাগল। ভোঁতা এক ধরনের যন্ত্রণা হতে লাগল মাথায়। বিলু বলল, 'রানু ভাবী, তোমাকে একটা গোপন কথা বলছি। টপ সিক্রেট, কাউকে বলবে না।'

'না, বলব না।'

'ইভেন নীলু আপাকেও নয়। কারণ কথাটা তাকে নিয়েই।'

'ঠিক আছে, কাউকে বলব না।'

'নীলু আপা ডুবে-ডুবে জল খাচ্ছে। আজকে সকালে টের পেয়েছি।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। নীলু আপার ট্রাঙ্ক ঘাঁটতে গিয়ে আবিষ্কার করেছি। জনৈক ভদ্রলোক দারুণ সব রোমান্টিক চিঠি লিখেছে নীলু আপাকে। খুব লদকালদকি।'

বিলু হাসল। রানু কিছু বলল না। তার মাথার যন্ত্রণাটা ক্রমেই বাড়ছে।

'দু'-একটা চিঠি পড়ে দেখতে চাও?'

'না, না। অন্যের চিঠি।'

'আহ্, পড় না, কেউ তো জানতে পারছে না। আমরা ব্যাপারটা টপ সিক্রেট রাখব, তাহলেই তো হল।'

'না বিলু, আমি চিঠি পড়ব না।'

'পড়ব না বললে হবে না। পড়তেই হবে। দাঁড়াও আমি নিয়ে আসছি। যে-আলো আছে তাতে দিব্যি পড়তে পারবে।'

বিলু ঘর থেকে চিঠি নিয়ে এল। রানু চিঠিটি হাতে নিয়ে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বিলু অবাক হয়ে বলল, 'কী হয়েছে?'

'না, কিছু হয় নি।'

'এ-রকম করছ কেন?'

'মাথা ধরেছে। বড্ড মাথা ধরেছে।'

'প্যারাসিটামল এনে দেব? তুমি চিঠিটা পড়ে আমাকে বল ভদ্রলোক সম্পর্কে তোমার কী ধারণা।'

রানু চিঠি পড়ল। বিলু বলল, 'বল, তোমার কী মনে হয়?'

রানু কিছু বলল না। এক হাতে মাথার চুল টেনে ধরল।

'তোমার কী হয়েছে?'

'বড্ড শরীর খারাপ লাগছে। আমি এখন যাই।'

'চা খাবে না?'

'না। বিলু, নীলু কখন ফিরবে—বলে গেছে?'

'না। সন্ধ্যার আগে-আগেই ফিরবে বোধহয়। তোমার কি শরীর বেশি খারাপ লাগছে?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে যাও, শুয়ে থাক গিয়ে।'

রানু উপরে উঠে এল। ঘর অন্ধকার। বাতি জ্বালাতে ইচ্ছে হল না। শুয়ে পড়ল বিছানায়। আনিস আজ ফিরতে দেরি করবে। তার অফিসে কী-সব নাকি ঝামেলা হচ্ছে। রানু ডাকল, 'জিতু—জিতু মিয়া।' কেউ সাড়া দিল না। জিতু কি বাসায় নেই? 'জিতু—জিতু।' কোনো উত্তর নেই। জিতু মিয়া ইদানীং বেশ লায়েক হয়েছে। রানু কিছু বলে না বলেই হয়তো বিকেলে খেলতে গিয়ে সন্ধ্যা পার করে বাড়ি ফেরে। বকাঝকা তার গায়ে লাগে না।

রান্নাঘরে খুটখুট শব্দ হচ্ছে। ইঁদুর। নিশ্চয়ই ইঁদুর। তবু রানু বলল, 'কে?' খুটখুট শব্দ থেমে গেল। ইঁদুর ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু সেই গন্ধটা আবার পাওয়া যাচ্ছে। কড়া ফুলের গন্ধ। রানুর ইচ্ছে হল ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। রানু দুর্বল গলায় ডাকল, 'জিতু, জিতু মিয়া।' আর ঠিক তখন কে-একজন ডাকল, 'রানু—রানু।' এই ডাক রানুর চেনা। এই জীবনে সে অনেক বার শুনেছে। তবে এটা কিছু নয়। প্রফেসর সাহেব বলছেন 'অডিটরি হেলুসিনেশন'। আসলেই তাই। এ ছাড়া আর কিছু নয়।

'রানু—রানু।'

'কে? তুমি কে?'

রানুর মনে হল কেউ-একজন যেন এগিয়ে আসছে। তার পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। ছোট্ট-ছোট্ট পা নিশ্চয়ই। হালকা শব্দ। পায়ে কি নূপুর আছে? নূপুর বাজছে?

'রানু।'

রানু চোখ বন্ধ করে ফেলল। এ-সব সত্যি নয়, চোখের ভুল। রানু দুর্বল গলায় বলল, 'তুমি কে?'

'আমাকে তুমি চিনতে পারছ না?'

'না।'

কিশোরীর গলায় মৃদু হাসি শোনা গেল।

'তাকাও রানু। তাকালেই চিনবে।'

'আমি চিনতে চাই না।'

'তোমার বন্ধু নীলুর খুব বিপদ, রানু। এক দিন তোমার যে বিপদ ঘটতে যাচ্ছিল, তার চেয়েও অনেক বড় বিপদ।'

দরজায় ধাক্কা পড়ছে। জিতু এসেছে বোধহয়। রানু তাকাল, কোথাও কেউ নেই। ফুলের গন্ধ কমে আসছে। জিতু মিয়া বাইরে থেকে ডাকল, 'আম্মা, আম্মা।' রানু উঠে দরজা খুলল।

'আপনের কী হইছে?'

'কিছু হয় নি।'

রানু এসে শুয়ে পড়ল। তার গায়ে প্রচণ্ড জ্বর। সে বিছানায় ছটফট করতে লাগল। কখন আসবে আনিস? কখন আসবে?

'জিতু।'

'জ্বি।'

'নিচে গিয়ে দেখে আয় তো—নীলু ফিরেছে নাকি।'

জিতু ফিরে এসে জানাল, এখনও আসে নি। রানু একটি নিঃশ্বাস ফেলে ঘড়ি দেখল, আটটা বাজতে চার মিনিট বাকি। কখন আসবে আনিস?

১৯

সারাটা পথ নীলু চুপ করে রইল। এক বার সে বলল, 'কী ব্যাপার, এত চুপচাপ যে?' নীলু তারও জবাব দিল না। তার কথা বলতে ইচ্ছা হচ্ছে না। সে আছে একটা ঘোরের মধ্যে।

'গান শুনবে? গান দেব?'

নীলু মাথা নাড়ল। সেটা হাঁ কি না, তাও স্পষ্ট হল না।

'কী গান শুনবে? কান্ট্রি মিউজিক? কান্ট্রি মিউজিকে কার গান তোমার পছন্দ?'

নীলু জবাব দিল না।

'আমার ফেবারিট হচ্ছে জন ডেনভার। জন ডেনভারের রকি মাউন্টেন হাই গানটা শুনেছ?'

'না।'

'খুব সুন্দর! অপূর্ব মেলোডি!'

সে ক্যাসেট টিপে দিতেই জন ডেনবারের অপূর্ব কণ্ঠ শোনা গেল, 'ক্যালিফোর্নিয়া রকি মাউন্টেন হাই।'

'কেমন লাগছে নীলু?'

'ভালো।'

'শুধু ভালো না। বেশ ভালো।'

সেও জন ডেনভারের সঙ্গে গুনগুন করতে লাগল। নীলুর মনে হল, ওর গানের গলাও তো চমৎকার! একবার ইচ্ছে হল জিজ্ঞেস করে—গান জানেন কি না। কিন্তু সে কিছু জিজ্ঞেস করল না। তার কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে না। গাড়ি কোন দিক দিয়ে কোথায় যাচ্ছে তাও সে লক্ষ করছে না। এক বার শুধু ট্রাফিক সিগনালে গাড়ি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। এক জন ভিখিরি এসে ভিক্ষা চাইল। সে ধমকে উঠল কড়া গলায়। তারপর আবার গাড়ি চলল। নীলু ফিসফিস করে বলল, 'কটা বাজে?'

'সাতটা পঁয়ত্রিশ। তোমাকে আটটার আগেই পৌঁছে দেব।'

'আপনার বাড়ি মনে হয় অনেক দূর?'

'শহর থেকে একটু দূরে বাড়ি করেছি। কোলাহল ভালো লাগে না। ফার ফ্রম দি ম্যাডিং ক্রাউড কার লেখা জান?'

'নাহ্।'

'টমাস হার্ডির। পড়ে দেখবে, চমৎকার! অথচ ট্র্যাজেডি হচ্ছে, টমাস হার্ডিকেই নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় নি। তুমি তাঁর কোনো বই পড়েছ?'

'না।'

'পড়ে দেখবে। খুব রোমান্টিক ধরনের রাইটিং।'

গাড়ি ছুটে চলেছে মীরপুর রোড ধরে। হঠাৎ নীলু বলল, 'আমার ভালো লাগছে না।'

'কী বললে?'

'আমার ভালো লাগছে না, আমি বাসায় যাব।'

সে তাকাল নীলুর দিক। একটি হাত বাড়িয়ে ক্যাসেটের ভল্যুম বাড়িয়ে দিল। গাড়ির গতি কমল না।

'আমি বাসায় যাব।'

'আটটার সময় আমি তোমাকে বাসায় পৌঁছে দেব।'

'না, আজ আমি কোথাও যাব না। প্লীজ গাড়িটা থামান, আমি নেমে পড়ব।'

'কেন?'

'আমার ভালো লাগছে না। প্লীজ।'

সে তাকাল নীলুর দিকে। নীলু শিউরে উঠল। এ কেমন চাউনি! যেন মানুষ নয়, অন্য কিছু।

'প্লীজ, গাড়িটা একটু থামান।'

'কোনো রকম ঝামেলা না-করে চুপচাপ বসে থাক। কোনো রকম শব্দ করবে না।'

'আপনি এ-রকম করে কথা বলছেন কেন?'

গাড়ির গতি ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। ঝড়ের গতিতে পাশ দিয়ে দুটো ট্রাক গেল। লোকটি তার একটি হাত রাখল নীলুর উরুতে। নীলু শিউরে উঠে দরজার দিকে সরে গেল। লোকটি হাসল। এ কেমন হাসি!

'গাড়ি থামান। আমি চিৎকার করব।'

'কেউ এখন তোমার চিৎকার শুনবে না।'

'আপনি কেন আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন?'

'আমি ভয় দেখাচ্ছি না।'

'আমি আপনাকে বিশ্বাস করে গাড়িতে উঠেছি।'

'আরো কিছুক্ষণ থাক। বেশিক্ষণ নয়, এসে পড়েছি বলে।'

'কী করবেন আপনি?'

'তেমন কিছু না।'

নীলু এক হাতে দরজা খুলতে চেষ্টা করল। লোকটি তাকিয়ে দেখল কিন্তু বাধা দিল না। দরজা খোলা গেল না। নীলু প্রাণপণে বলতে চেষ্টা করল, আমাকে বাঁচাও। কিন্তু বলতে পারল না। প্রচুর ঘামতে লাগল। প্রচণ্ড তৃষ্ণা বোধ হল।

২০

আনিস এল রাত সাড়ে আটটায়। ঘর অন্ধকার। কারো কোনো সাড়াশব্দ নেই। রানু

বাতিটাতি নিভিয়ে অন্ধকারে বসে আছে। জিতু মিয়া মশারি খাটিয়ে শুয়ে পড়েছে।

'রানু, কী হয়েছে?'

রানু ফোঁপাতে-ফোঁপাতে বলল, 'তুমি এত দেরি করলে!'

'কেন, কী হয়েছে?'

'নীলুর বড় বিপদ।'

আনিস কিছু বুঝতে পারল না। অবাক হয়ে তাকাল। রানু থেমে-থেমে বলল, 'নীলুর খুব বিপদ।'

'কিসের বিপদ? কী বলছ তুমি?'

রানুর কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। সে গুছিয়ে কিছু বলতে পারছে না।

'রানু, তুমি শান্ত হয়ে বস। তারপর ধীরেসুস্থে বল—কী ব্যাপার। কী হয়েছে নীলুর?'

'ও একজন খারাপ লোকের পাল্লায় পড়েছে। লোকটা ওকে মেরে ফেলবে।'

রানু ফোঁপাতে লাগল। আনিস কিছুই বুঝতে পারল না। নীলুর বাবার সঙ্গে কিছুক্ষণ আগেই তার কথা হয়েছে। ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করেছেন, 'কি, এত দেরি যে?' যার মেয়ের এত বড় বিপদ, সে এ-রকম স্বাভাবিক থাকবে কী করে?

আনিস বলল, 'ওরা তো কিছু বলল না!'

'ওরা কিচ্ছু জানে না। আমি জানি, বিশ্বাস কর—আমি জানি।'

'আমাকে কী করতে বল?'

'আমি বুঝতে পারছি না। আমি কিছু বুঝতে পারছি না।'

'জিনিসটা কি তুমি স্বপ্নে দেখেছ?'

'না। কিন্তু আমি দেখেছি।'

'কী দেখেছ?'

'আমি সেটা তোমাকে বলতে পারব না।'

'তুমি যদি চাও আমি নিচে গিয়ে ওদের বলতে পারি। কিন্তু ওরা বিশ্বাস করবেন না।'

রানু চোখ বড়-বড় করে তাকিয়ে রইল। ওর শরীর অল্প-অল্প করে কাঁপছে। আনিস বলল, 'নাকি মিসির আলি সাহেবের কাছে যাবে? উনি কোনো-একটা বুদ্ধি দিতে পারেন। যাবে?'

রানু কাঁপা গলায় বলল, 'তুমি নিজে কি আমার কথা বিশ্বাস করছ?'

'হ্যাঁ, করছি।'

একতলার বারান্দায় বিলু বসে ছিল। ওদের নামতে দেখেই বিলু বলল, 'ভাবী, নীলু আপা এখনো ফিরছে না। বাবা খুব দুশ্চিন্তা করছেন।'

রানু কিছু বলল না।

'তোমরা কোথায় যাচ্ছ ভাবী?'

রানু তারও কোনো জবাব দিল না। রিকশায় উঠেই সে বলল, 'আমাকে ধরে রাখ, খুব ভালো লাগছে।'

আনিস তার কোমর জড়িয়ে বসে রইল। রানুর গা শীতল। রানু খুব ঘামছে। জ্বর নেমে গেছে।

২১

রানু চোখ বড়-বড় করে বলল, 'আপনি আমার কথা বিশ্বাস করছেন না, তাই না?'

মিসির আলি চুপ করে রইলেন।

'আগে আপনি বলুন—আপনি কি আমার কথা বিশ্বাস করছেন?'

'বিশ্বাসও করছি না, আবার অবিশ্বাসও করছি না। তুমি নিজে যা সত্যি বলে মনে করছ, তা-ই বলছ। তবে আমি এত সহজে কোনো কিছু বিশ্বাস করি না।'

'কিন্তু যদি সত্যি হয়, তখন?'

মিসির আলি সিগারেট ধরিয়ে কাশতে লাগলেন।

'বলুন, যদি আমার কথা সত্যি হয়—যদি মেয়েটা মারা যায়?'

মিসির আলি শান্ত স্বরে বললেন, 'ঠিক এই মুহূর্তে কী করা যায়, তা তো বুঝতে পারছি না। মেয়েটি কোথায় আছে, তা তো তুমি জান না। নাকি জান?'

'না, জানি না।'

'ছেলেটির নামধামও জান না?'

'ছেলেটি দেখতে খুব সুন্দর। আমার এ-রকম মনে হচ্ছে।'

'এই শহরে খুব কম করে হলেও দশ হাজার সুন্দর ছেলে আছে।'

'আমরা কিছুই করব না?'

'পুলিশের কাছে গিয়ে বলতে পারি একটি মেয়ে হারিয়ে গেছে এবং আশঙ্কা করা যাচ্ছে দুষ্ট লোকের খপ্পরে পড়েছে। কিন্তু তাতেও একটা মুশকিল আছে, ২৪ ঘন্টা পার না-হলে পুলিশ কাউকে মিসিং পারসন হিসাবে গণ্য করে না।'

রানু আবার বলল, 'কিছুই করা যাবে না?'

মিসির আলি গম্ভীর মুখে সিগারেট টানতে লাগলেন। তিনি লক্ষ করলেন রানুর চোখ-মুখ শক্ত হয়ে উঠেছে। সে ঘনঘন নিঃশ্বাস ফেলছে।

'রানু, তুমি যদি ঐ লোকটির কোনো ঠিকানা কোনোভাবে এনে দিতে পার, তাহলে একটা চেষ্টা চালানো যেতে পারে।'

'ঠিকানা কোথায় পাব?'

'তা তো রানু আমি জানি না। যেভাবে খবরটি পেয়েছ, সেইভাবেই যদি পাও।'

রানু উঠে দাঁড়াল। মিসির আলি সাহেব বললেন, 'যাচ্ছ নাকি?'

'হ্যাঁ, বসে থেকে কী করব?'

নীলুদের সব ক'টি ঘরে আলো জ্বলছে। রাত প্রায় এগারটা বাজে। নীলুর বাবা পাথরের মূর্তির মতো বাগানের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। রানুদের ঢুকতে দেখে এগিয়ে এলেন। কিন্তু কিছু বললেন না। রানু মাথা নিচু করে তিনতলায় উঠে গেল। নীলুদের ঘরে ঘনঘন টেলিফোন বাজছে। দু'টি গাড়ি এসে থামল। মনে হয় ওঁরা খুঁজতে শুরু করেছেন। পুলিশের কাছে নিশ্চয়ই লোক গিয়েছে। নীলুর বাবা অস্থির ভঙ্গিতে বাগানে হাঁটছেন।

২২

ছোট্ট একটি ঘর। কিন্তু দু' শ' পাওয়ারের একটি বাতি জ্বলছে ঘরে। চারদিক ঝলমল করছে। লোকটি একটি চেয়ারে বসে আছে। নীলু লোকটির মুখ দেখতে পাচ্ছে না, কারণ লোকটি বসে আছে তার পেছনে। ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাবার কোনো উপায় নেই নীলুর। নাইলনের চিকন দড়ি তার গা কেটে বসে গেছে। চারদিকে কোনো সাড়াশব্দ নেই। মাঝে-মাঝে দূরের রাস্তা দিয়ে দ্রুতগামী ট্রাকের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। নীলু থেমে-থেমে বলল, 'আপনি কি আমাকে মেরে ফেলবেন?'

কেউ কোনো জবাব দিল না।

'আমি আপনার কোনো ক্ষতি করি নি। কেন আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন? প্লীজ, আমাকে যেতে দিন। আমি কাউকে কিছু বলব না। কেউ আপনার কথা জানবে না।'

পেছনের চেয়ার একটু নড়ে উঠল। ভারি গলায় লোকটি কথা বলল, 'কেউ জানলেও আমার কিছু যায়-আসে না।'

'কেন আপনি এ-রকম করছেন?'

'আমি একজন অসুস্থ মানুষ। মাঝে-মাঝে আমাকে এ-রকম করতে হয়।'

'আপনি কি আমাকে মেরে ফেলবেন?'

কোনো জবাব পাওয়া গেল না। লোকটি হাত বাড়িয়ে বাতি নিভিয়ে দিল। চারদিকে ঘন অন্ধকার। নীলু চাপা স্বরে ডাকল, 'মা, মাগো!'

'চুপ করে থাক, কথা বলবে না।'

'কেন এ-রকম করছেন আপনি?'

'আমি একজন অসুস্থ মানুষ। পৃথিবীতে কিছু অসুস্থ মানুষ থাকে।'

'আপনি কি আমার মতো আরো অনেক মেয়েকে এইভাবে ফাঁদ পেতে এনেছেন?'

কোনো জবাব পাওয়া গেল না। লোকটি এগিয়ে এসে নীলুর গায়ে হাত রাখল। এই কি সেই ভালবাসার স্পর্শ? নীলু ডাকল, 'মা, মাগো!'

'চুপ করে থাক।'

'আপনি মানুষ, না অন্য কিছু?'

'বেশির ভাগ সময়ই আমি মানুষ থাকি, মাঝে-মাঝে অন্য রকম হয়ে যাই।'

লোকটি শব্দ করে হাসল। কী কুৎসিত হাসি! ঘরে একটুও বাতাস নেই। দম বন্ধ হয়ে আসছে। নীলু প্রাণপণে তার একটা হাত ছুটিয়ে আনতে চেষ্টা করছে। যতই চেষ্টা করছে দড়িগুলো ততই যেন কেটে-কেটে বসে যাচ্ছে।

'কেন, কেন আপনি এ-রকম করছেন?'

'বলেছি তো নীলু! অনেক বার বললাম তোমাকে। আমি অসুস্থ।'

'কী করবেন আপনি?'

'অন্যদের যা করেছি তা-ই করব।'

'কী করেছেন অন্যদের?'

লোকটি হেসে উঠল। নীলু কাতর স্বরে বলল, 'আপনি দয়া করুন, আমি আপনার পায়ে পড়ি। প্লীজ। আমি আপনার কথা কাউকে বলব না।'

'তা কি হয়?'

'বিশ্বাস করুন। আমি আমার কথা রাখি। কাউকে আমি আপনার কথা বলব না।'

লোকটি ফিরে যাচ্ছে। নীলু কি বেঁচে যাবে? লোকটি কি তাকে ছেড়ে দেবে? নীলু গুছিয়ে চিন্তা করতে পারছে না। সব কেমন যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। লোকটি একটি ড্রয়ার খুলল। ঘর অন্ধকার, নীলু কিছু দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু সে নিশ্চিত জানে, তার হাতে ধারাল কিছু–একটা আছে। ক্ষুরজাতীয় কিছু। লোকটি সেটি বাঁ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। আসবে, সে এক সময় এগিয়ে আসবে তার কাছে। খুব কাছে কোথাও রিকশার টুনটুন শোনা গেল। নীলু প্রাণপণে চেঁচাল, 'বাঁচাও। আমাকে বাঁচাও।' কিন্তু গলা দিয়ে কোনো শব্দ বেরুল না।

২৩

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রানুর অবস্থা খারাপ হতে লাগল। বারবার বলতে লাগল—উফ্‌, বড্ড গরম লাগছে। আনিস সমস্ত দরজা–জানালা খুলে দিল, ফ্যান ছেড়ে দিল, তবু তার গরম কমল না। রানু কাতর স্বরে বলল, 'তুমি আমাকে ধরে থাক, আমার বড্ড ভয় লাগছে।'

'এই তো আমি তোমাকে ধরে আছি। কিসের এত ভয়, রানু?'

'আমার সামনে ঐ লোকটি বসে আছে—আমি স্পষ্ট দেখছি। ওর হাতে একটা ক্ষুর।'

রানু ফোঁপাতে শুরু করল। ওকে ডাক্তারের কাছে নেওয়া উচিত। যত তাড়াতাড়ি নেওয়া যায় ততই ভালো। আনিস ডাকল, 'জিতু—জিতু মিয়া।' কিন্তু জিতু মিয়ার ঘুম ভাঙল না। রানু বলল, 'তুমি আমাকে একা রেখে কোথাও যেতে পারবে না। আমার বড় ভয় লাগছে।'

'কোনো ভয় নেই রানু।'

'লোকটি ক্ষুর হাতে বসে আছে। তবু তুমি বলছ ভয় নেই?'

'এই সব তোমার কল্পনা। এস, তোমার মাথায় একটু পানি দিই?'

'তুমি কোথাও যেতে পারবে না। ঐ লোকটি এখন উঠে দাঁড়িয়েছে। তুমি আমাকে শক্ত করে ধরে থাক। আরও শক্ত করে ধর।'

আনিস তাকে জড়িয়ে ধরে বসে রইল। রানু ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, 'আমি তোমাকে একটি কথা কখনো বলি নি। একবার একজন লোক আমাকে মন্দিরে নিয়ে গিয়েছিল।'

'রানু, এখন তোমাকে কিছুই বলতে হবে না। দয়া করে চুপ করে থাক।'

'না, আমি বলতে চাই।'

'সকাল হোক। সকাল হলেই শুনব।'

'মাঝে–মাঝে আমার মনে হয় একজন–কেউ আমার সঙ্গে থাকে।'

'রানু, চুপ করে থাক।'

'না, আমি চুপ করে থাকব না। আমার বলতে ইচ্ছে করছে। যে আমার সঙ্গে

থাকে, তার সঙ্গে আমি অনেক বার কথা বলেছি। কিন্তু আজ সে কিছুতেই আসছে না।'

'তার আসার কোনো দরকার নেই।'

'তুমি বুঝতে পারছ না, তার আসার খুব দরকার।'

রাত দেড়টার দিকে নিচ থেকে বিলুর কান্না শোনা যেতে লাগল। অনেক লোকজনের ভিড়। কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। রানু বলল, 'বিলু কাঁদছে। বড় খারাপ লাগছে আমার।'

'রানু, তুমি একটু শুয়ে থাক। আমি জিতুকে ডেকে দিচ্ছি।'

'তুমি কোথায় যাবে?'

'আমি একজন ডাক্তার নিয়ে আসব। আমার মোটেই ভালো লাগছে না।'

'তুমি আমাকে ফেলে রেখে কোথাও যেতে পারবে না।'

রানুর কথা জড়িয়ে যেতে লাগল। এক সময় বিছানায় নেতিয়ে পড়ল। আনিস ছুটে গেল ডাক্তার আনতে। বড় রাস্তার মোড়ে একজন ডাক্তারের বাসা আছে। ডাক্তার সাহেবকে পাওয়া গেল না। আনিস ফিরে এসে ঘরে ঢোকবার মুখেই তীব্র ফুলের গন্ধ পেল। ঘরের বাতি নেভানো। কে নিভিয়েছে বাতি? আনিস ঢুকতেই রানু বলল, 'ও এসেছে।'

'কে? কে এসেছে?'

'তুমি গন্ধ পাচ্ছ না?'

আনিস এগিয়ে এসে রানুর হাত ধরল। গা ভীষণ গরম। রানু বলল, 'ও নীলুর কাছে যাবে।'

'রানু, শুয়ে থাক।'

'উঁহু, শোব কীভাবে? ও একা যেতে ভয় পাচ্ছে। আমিও যাব ওর সঙ্গে। ও আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।'

বলতে–বলতে রানু খিলখিল করে হাসল।

আনিস বারান্দায় দাঁড়িয়ে ডাকল, 'রহমান সাহেব, রহমান সাহেব। ভাই, একটু আসুন, আমার বড় বিপদ।'

রহমান সাহেব ঘরে ছিলেন না। তাঁর স্ত্রী বেরিয়ে এলেন। তিনি অবাক হয়ে বললেন, 'কী হয়েছে?'

'আপনি একটু আসুন, আমার স্ত্রী কেমন যেন করছে।'

ভদ্রমহিলা সঙ্গে–সঙ্গে এলেন। এবং ঘরে ঢুকেই অবাক হয়ে বললেন, 'নূপুরের শব্দ না?' রানু কিশোরী মেয়ের গলায় খিলখিল করে হাসল।

'কী হয়েছে ওনার?'

'আপনি একটু বসুন ওর পাশে। আমি ডাক্তার নিয়ে আসি।'

আনিস ছুটে বেরিয়ে গেল। ফুলের সৌরভ তীব্র থেকে তীব্রতর হতে লাগল। রানু হাসিমুখে বলল, 'আমার সময় বেশি নেই, ঐ লোকটি এগিয়ে আসছে।'

'কোন লোক?'

'আপনি চিনবেন না। না–চেনাই ভালো।'

ভদ্রমহিলা রানুর হাত ধরলেন। উত্তাপে গা পুড়ে যাচ্ছে। তিনি কী করবেন ভেবে পেলেন না।

আনিস ডাক্তার নিয়ে ফেরার আগেই রানু মারা গেল।

২৪

ঘর অন্ধকার। কিন্তু চোখে অন্ধকার সয়ে আসছে। আবছামতো সব কিছু দেখা যায়। বাড়িটা কোথায়? শহর থেকে অনেক দূরে কি? কোনো শব্দ নেই। কত রাত এখন? বাড়িতে এখন ওরা কী করছে? বিলু কি ঘুমিয়েছে মশারি ফেলে? না, না—আজ কেউ ঘুমায় নি, আজ সবাই ছোটাছুটি করছে। সবাই খুঁজছে নীলুকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো পুলিশের গাড়ির শব্দ শোনা যাবে। বাবা এসে বলবেন—কোনো ভয় নেই মা-মণি।

চেয়ার নড়ার শব্দ হল। লোকটি কি উঠে দাঁড়িয়েছে? তার হাতে ওটা কী? নীলু মনে-মনে বলল, 'বাবা, আমি একজন অসুস্থ লোকের হাতে আটকা পড়েছি, আমাকে তোমরা বাঁচাও। আমার আর মোটেও সময় নেই বাবা। তোমাদের খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে।'

লোকটি এগিয়ে আসছে। পেছন থেকে সে খুব ধীর গতিতে এগিয়ে এল সামনে। এখন নীলু আবছাভাবে লোকটির মুখ দেখতে পাচ্ছে। কী সুন্দর একটি মুখ! নীলু বিড়বিড় করে বলল,'প্লীজ, দয়া করুন।' লোকটি অদ্ভুত শব্দ করল। এটি কি হাসির শব্দ? নীলুর গা গোলাচ্ছে। নীলু চিৎ হয়ে থাকা অবস্থাতেই মুখ ভর্তি করে বমি করল। দুঃস্বপ্ন, সমস্তটাই একটা দুঃস্বপ্ন। এক্ষুণি ঘুম ভেঙে যাবে। আর নীলু দেখবে—বিলু বাতি জ্বালিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে। তার বুকের ওপর একটা গল্পের বই। এখানে যা ঘটছে, তা সত্যি হতেই পারে না।

লোকটি তার পাশে দাঁড়িয়ে হাত বাড়াল। নীলু চাপা গলায় বলল, 'আমার গায়ে হাত দেবেন না, প্লীজ।' লোকটি হেসে উঠছে শব্দ করে। আর ঠিক তখনই নূপুরের শব্দ শোনা গেল। যেন কেউ-একজন এসে ঢুকেছে এ-ঘরে।

লোকটি ভারি গলায় বলল, 'কে, কে ওখানে?' তার উত্তরে অল্পবয়সী একটি মেয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল। লোকটি চেঁচাল, 'কে, কে?' কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। শুধু ঘরের শেষ প্রান্তের একটা জানালা খুলে ভয়ানক শীতল একটা হাওয়া এসে ঢুকল ঘরে। সে-হাওয়ায় ভেসে এল অদ্ভুত মিষ্টি একটা গন্ধ।

নীলুর মনে হল একটি মেয়ে যেন নূপুর পায়ে দিয়ে তার চারপাশ দিয়ে ঘুরতে শুরু করেছে। ঘুরতে-ঘুরতে এক বার মেয়েটি তাকে স্পর্শ করল, আর তক্ষুণি নীলুর মনে হল—আর কোনো ভয় নেই।

নীলু দেখল, লোকটি ক্রমেই দেয়ালের দিকে সরে যাচ্ছে। এক বার সে চাপা স্বরে বলল, 'তুমি কে?' মিষ্টি একটি হাসি শোনা গেল তখন। ফুলের গন্ধ আরো তীব্র হল। অন্য কোনো ভুবন থেকে ভেসে এল নূপুরের ধ্বনি। লোকটি গা ঠেকিয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'এসব কী হচ্ছে! কে, এখানে কে?' কেউ তার কথার জবাব দিল না। একটি দুষ্টু মেয়ে শুধু হাসতে লাগল। ভীষণ দুষ্টু একটি মেয়ে। তার পায়ে নূপুর। তার গায়ে অপার্থিব এক ফুলের গন্ধ। মেয়েটি এবার দু' হাত বাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছে লোকটির

দিকে। লোকটির কর্কশ কণ্ঠ শোনা গেল, 'এইসব কী? কে, কে?' তার উত্তরে সমস্ত ঘরময় মিষ্টি খিলখিল হাসি ঝমঝম করতে লাগল। লোকটি চাপা গলায় বলে উঠল, 'আমাকে বাঁচাও। বাঁচাও।' দুষ্টু মেয়েটি আবার হাসল, যেন খুব একটা মজার কথা।

পরিশিষ্ট

থার্ড ইয়ার অনার্সের এই ক্লাসটি মিসির আলি সাহেবকে দেওয়া হয়েছে। সাইকোলজি ফিফ্থ পেপার। মিসির আলি হাসিমুখে ক্লাসে ঢুকলেন। তাঁর মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। রানু বসে আছে সেকেন্ড বেঞ্চে। তাঁর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হল। তিনি মেয়েটির দিকে তাকালেন এবং তাকিয়ে রইলেন। মনে হল, মেয়েটির ঠোঁটের কোণায় হাসি লেগে আছে। মিসির আলি কাঁপা গলায় বললেন, 'তোমার নাম কি?'

মেয়েটি উঠে দাঁড়াল। স্পষ্ট স্বরে বলল, 'আমার নাম নীলু। নীলুফার। রোল নাম্বার থার্টি টু।'

'আমি একটি মেয়েকে চিনতাম। তুমি দেখতে অবিকল তার মতো।'

নীলুফার শান্ত স্বরে বলল, 'আমি জানি।'

মিসির আলি সাহেব কপালের ঘাম মুছলেন। সমস্ত ব্যাপারটি ভুলে যাবার প্রাণপণ চেষ্টা করতে-করতে বললেন, 'আমি তোমাদের পড়াব ফিফ্থ্ পেপার। খুব ইন্টারেস্টিং একটি টপিক—'

রানুর মতো দেখতে মেয়েটি তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। মেয়েটির মুখে মৃদু হাসি।

নিশীথিনী

১

মিসির আলির ধারণা ছিল, তিনি সহজে বিরক্ত হন না। এই ধারণাটা আজ ভেঙে যেতে শুরু করেছে। ঠিক এই মুহূর্তে তিনি অসম্ভব বিরক্ত। যে-রিকশায় তিনি উঠেছেন, তার সীটটা ঢালু। বসে থাকা কষ্টের ব্যাপার। তার চেয়েও বড় কথা, দু' মিনিট পরপর রিকশার চেইন পড়ে যাচ্ছে।

এখন বাজছে দশটা তেইশ। সাড়ে দশটায় থার্ড ইয়ার অনার্সের সঙ্গে তাঁর একটা টিউটরিআল আছে। এটা কোনোক্রমেই ধরা যাবে না। যে-হারে রিকশা এগুচ্ছে, তাতে ইউনিভার্সিটিতে পৌঁছতে তাঁর আরো পনের মিনিট লাগবে। এ-কালের ছাত্ররা এতক্ষণ তাদের টীচারদের জন্যে অপেক্ষা করে না।

মিসির আলি তাঁর বিরক্তি ঢাকবার জন্যে একটা সিগারেট ধরালেন। ঠিক তখন পঞ্চম বারের মতো রিকশার চেইন পড়ে গেল। রিকশাওয়ালার ভাব-ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে চেইন পড়ার ব্যাপারটায় সে আনন্দিত। গদাইলশকরী চালে সে নামল এবং সামনের চাকাটা তুলে ঝাঁকাঝাঁকি করতে লাগল।

চেইন পড়ে গেলে কেউ চাকা তুলে ঝাঁকাঝাঁকি করে বলে তাঁর জানা ছিল না। রুক্ষ গলায় বললেন, 'এ রকম করছ কেন?'

রিকশাওয়ালা জবাব দিল না। গরম চোখে তাকাল এবং মিসির আলিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে একটা বিড়ি ধরাল। মিসির আলি রাগ সামলাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কুড়ি থেকে এক পর্যন্ত উল্টো দিকে গুনলেন। জীবনানন্দ দাশের 'মনে হয় একদিন' কবিতার প্রথম চার লাইন মৃদু স্বরে আওড়ালেন। মিসির আলির ধারণা, কিছু-কিছু কবিতা মানুষের অস্থিরতা কমিয়ে দেয়। 'মনে হয় একদিন' এমন একটি কবিতা।

কিন্তু আজ তাঁর রাগ কমছে না। রিকশাওয়ালা কঠিন মুখ করে নির্বিকার ভঙ্গিতে বিড়ি টানছে। মিসির আলির দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না।

মিসির আলি নিজেকে সামলাবার জন্যেই ভাবতে লাগলেন—তিনি নিজে যদি

সিগারেট ধরাতে পারেন, তাহলে এই লোকটি পারবে না কেন? জুন মাসের প্রচণ্ড গরমে বেচারা ক্লান্ত ও বিরক্ত। এক জন ক্লান্ত ও বিরক্ত মানুষের নিশ্চয়ই বিশ্রাম করার অধিকার আছে। তিনি হালকা গলায় বললেন, 'নাম কি তোমার?'

'সামসু।'

'বাড়ি কোথায় তোমার সামসু?'

'বাড়ি–ঘর নাই।'

'দেরি হয়ে যাচ্ছে আমার। সামসু, রিকশা চালাও। ক্লাস মিস হবে।'

সামসু কোনো পাত্তাই দিল না। রাস্তার পাশে পেচ্ছাব করতে বসে গেল। তার বসার ভঙ্গি থেকেই বোঝা যাচ্ছে সে সহজে উঠবে না, বসেই থাকবে। এই লোকটি কি কোনো–একটি অজ্ঞাত কারণে তাঁর সঙ্গে ঝগড়া বাধাবার চেষ্টা করছে?

মিসির আলি রিকশা থেকে নেমে পড়লেন। পাঁচ টাকা ভাড়া ঠিক করা ছিল, তিনি ছ'টাকা দিলেন। সহজ স্বরে বললেন, 'নাও, ভাড়া নাও। আমি হেঁটে চলে যাব।'

সাধারণত রিকশাওয়ালাদের সবচেয়ে ময়লা ন্যাতন্যাতে নোটগুলো দেয়া হয়। মিসির আলি তাকে দিয়েছেন কচকচে নতুন নোট। এটা তিনি করলেন এই আশায়, যাতে সামসু নামের এই উদ্ধত যুবকটি তাঁর আচরণের জন্যে লজ্জিত বোধ করে।

এ–রকম কাণ্ডকারখানা মিসির আলি সাহেব করে থাকেন। একবার বাসে তাঁর পাশে সুখী–সুখী চেহারার এক বুড়ো বসল। দু' জনের সীট। কিন্তু বুড়ো অকারণে পা ফাঁক করে তাঁকে চাপ দিতে লাগল। বিশ্রী কাণ্ড! মিসির আলি খানিকক্ষণ চাপ সহ্য করলেন, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে বললেন, 'আপনার বোধহয় অল্প জায়গায় বসার অভ্যেস নেই, আপনি বরং একাই এখানে আরাম করে বসুন।'

মিসির আলি ভেবেছিলেন, লোকটি এতে লজ্জিত ও বিব্রত হবে। সে–রকম কিছু হল না। লোকটি নির্বিকার ভঙ্গিতে দু' জনের জায়গা দখল করে পা দোলাতে লাগল। এরা অসুখী মানুষ। নিজেদের ব্যক্তিগত যন্ত্রণা এরা––অন্যদের ওপর চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করে। ঢাকা শহরে অসুখী মানুষের সংখ্যা এত দ্রুত বাড়ছে কেন ভাবতে ভাবতে মিসির আলি দ্রুত হাঁটতে লাগলেন। মাথার ওপর জুন মাসের গনগনে আকাশ। রাস্তাঘাট তেতে উঠেছে। বাতাসের লেশমাত্রও নেই। এ–বছর অসম্ভব গরম পড়েছে। এই অসহ্য গরমে রিকশাওয়ালারা মানুষ টানে কীভাবে কে জানে! মিসির আলি সামসু নামের উদ্ধত যুবকটির জন্যে এক ধরনের মায়া অনুভব করলেন।

ক্লাস ফাঁকা। আসমানী রঙের জামদানি শাড়ি পরা একটি মেয়ে শুধু সেকেন্ড বেঞ্চে বসে আছে। মেয়েটির মাথায় ঘোমটা। এটা একটা নতুন ব্যাপার। ইউনিভার্সিটির মেয়েরা মাথায় ঘোমটা দেয় শুধু আজানের সময়।

মিসির আলি ঢুকতেই মেয়েটি উঠে দাঁড়াল। তিনি অপ্রস্তুত স্বরে বললেন, 'দেরি করে ফেললাম। সবাই চলে গেছে নাকি?'

'জ্বি স্যার।'

'তুমি বসে আছ কেন? তুমি কেন ওদের সঙ্গে গেলে না?'

মেয়েটি মৃদু স্বরে বলল, 'স্যার, আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন না?'

'হ্যাঁ, চিনতে পারছি। তোমার নাম নীলু।'

'জ্বি।'

'তুমি তো এই ক্লাসের নও।'

'জ্বি–না।'

'তাহলে?'

'আমি স্যার আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বসে আছি। আমি রুটিনে দেখেছি, আজ আপনার এখানে ক্লাস।'

মিসির আলি ভুরু কুঁচকে বললেন, 'তোমার কি বিয়ে হয়েছে? মাথায় ঘোমটা, তাই বললাম। নতুন বিয়ে–হওয়া মেয়েরা প্রথম দিকে ঘোমটা পরে।'

'আমার বিয়ে হয় নি।'

'ও, আচ্ছা।'

'আপনার সঙ্গে আমার খুব একটা জরুরি কথা আছে স্যার।'

'বল।'

'আমি স্যার অনেকটা সময় নিয়ে কথাটা আপনাকে বলতে চাই। আমি কি স্যার আপনার বাসায় যেতে পারি?'

'বাসায় আমার কিছু ঝামেলা আছে।'

'তাহলে স্যার, আপনি কি আমাদের বাসায় একটু আসবেন? আমার খুব দরকার।'

'ঠিক আছে, যাব।'

'আমাদের বাসার ঠিকানা কি আপনার মনে আছে? এক বার গিয়েছিলেন আমাদের বাসায়। আমাদের বাসার দোতলায় আপনার এক জন পরিচিত মহিলা থাকতেন। রানু নাম।'

'আমার মনে আছে।'

'স্যার, আপনি কি আজই আসবেন? আমার খুব দরকার।'

মিসির আলি তাকিয়ে রইলেন মেয়েটার দিকে। এই মেয়ের নাম নীলু, কিন্তু কোনো–এক বিচিত্র কারণে তাকে অবিকল রানুর মতো দেখাচ্ছে।

'স্যার, আপনি কি আজই যাবেন?'

'ঠিক আছে রানু।'

'আমার নাম কিন্তু স্যার নীলু।'

মিসির আলি লক্ষ করলেন, মেয়েটা হাসছে। যেন তাকে রানু বলায় সে খুশি। এটাই যেন আশা করছিল।

'আমাদের বাসার ঠিকানা কি লিখে দেব?'

'লিখে দিতে হবে না। আমার মনে আছে।'

'আসবেন কিন্তু স্যার।'

'আসব। আমি আসব।'

'যাই স্যার, স্লামালিকুম।'

নীলু উঠে দাঁড়াল। এত সুন্দর মেয়েটি! শ্যামলা গায়ের রঙ। চোখে–মুখে তেমন কোনো বিশেষত্ব নেই। কিন্তু তবু এমন মায়া জাগিয়ে তুলছে কেন? মিসির আলি লজ্জিত বোধ করলেন। তাঁর বয়স একচল্লিশ। এই বয়সের এক জন মানুষের মনে এ–জাতীয় তরল ভাব থাকা উচিত নয়। তা ছাড়া এই মেয়েটি তাঁর ছাত্রী।

মিসির আলি শূন্য ক্লাসে দীর্ঘ সময় বসে রইলেন। একসঙ্গে বেশ কয়েকটা জিনিস

নিয়ে তিনি ভাবছেন। মেয়েটির মাথায় ঘোমটা কেন? এই মেয়েটি দীর্ঘদিন ধরেই ক্লাসে আসছে না কেন? মেয়েটি চলে যাবার সময়ও একটা অস্বাভাবিক আচরণ করেছে। সোজাসুজি হেঁটে গেছে, এক বারও পেছনে ফিরে তাকায় নি। মেয়েরা সাধারণত পেছন ফিরে তাকায়।

সবচেয়ে রহস্যময় ব্যাপারটি হচ্ছে, একটি মৃতা মেয়ের ছাপ আছে নীলুর মধ্যে। যেভাবেই হোক আছে। কিন্তু তা সম্ভব নয়। প্রকৃতি রহস্য পছন্দ করে না।

তিনি সিগারেট ধরালেন।

প্রকৃতি রহস্য পছন্দ করে না--কথাটা কি সত্যি? তাঁর মনে হল, সত্যি নয়। প্রকৃতির কাজই হচ্ছে নানান রকম রহস্য সৃষ্টি করা--মানুষের কাজ হচ্ছে সেই রহস্যের কুয়াশা সরিয়ে দেয়া। এমন একদিন কি আসবে, যখন কেউ বলবে না--দেয়ার আর মেনি থিংকস ইন হেভেন্ অ্যাণ্ড আর্থ ···।

'আরে, মিসির আলি সাহেব না? এখানে কী করছেন? একা-একা ক্লাসে বসে আছেন কেন?'

তিনি দাড়িওয়ালা এই লোকটাকে চিনতে পারলেন না। হাতে রেজিস্ট্রি খাতা, কাজেই অধ্যাপক হবেন। মুখখানা হাসি-হাসি। পান খেয়ে দাঁত লাল করে ফেলেছেন। পান-খাওয়া লোকজন কি কিছুটা নম্র স্বভাবের হয়? মিসির আলির মনে হল, পান এবং স্বভাবের ভেতর কোনো-একটা সম্পর্ক আছে। তিনি যে ক' জন পানবিলাসী লোককে চেনেন, তাদের সবাই সদালাপী।

'কি, কথা বলছেন না কেন? কিছু ভাবছেন নাকি?'

মিসির আলি উঠে দাঁড়ালেন। শান্ত ও নরম স্বরে বললেন, 'জ্বি-না, কিছু ভাবছি না।'

'আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন না?'

'জ্বি-না।'

দাড়িওয়ালা অধ্যাপক অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। মিসির আলি বিব্রত বোধ করলেন। কাউকে চিনতে পারছি না বলা--তাকে প্রায় অপমান করার শামিল। বিশেষ করে অধ্যাপক শ্রেণীর মানুষরা এ ব্যাপারে খুব স্পর্শকাতর।

'সত্যি চিনতে পারছেন না?'

'জ্বি না। আমার একটা প্রবলেম আছে, কিছুই মনে থাকে না।'

'মাসখানেক আগে আমি আপনার কাছে এক জন রোগী নিয়ে গিয়েছিলাম--ফিরোজ নাম। ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র।'

'ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আপনি ফিরোজের দুলাভাই।'

'হ্যাঁ দুলাভাই।'

'এবং আপনার নাম হচ্ছে নাজিমুদ্দিন। হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট।'

'এই তো চিনতে পারছেন।'

'চিনতে পারছি এসোসিয়েশন থেকে। একটা মনে পড়লে, অন্যগুলো মনে পড়তে থাকে। এসোসিয়েশন অব আইডিয়াস।'

'ফিরোজ তো অনেকখানি ইমপ্রুভ করেছে। এত অল্প সময়ে যে আপনি এতটা করবেন, আমরা কেউ কল্পনাও করি নি। দারুণ ব্যাপার!'

মিসির আলি কিছু বললেন না। ফিরোজ আজ বিকেলে তাঁর কাছে আসবে। প্রতি সোমবার ফিরোজের সঙ্গে তাঁর একটি সেশন হয়। অথচ নীলুকে বলে রেখেছেন, আজ যাবেন তাদের বাসায়। তাঁর কাজকর্ম ইদানীং এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে কেন? বয়স বাড়ছে।

'মিসির আলি সাহেব।'

'জ্বি?'

'চলুন, লাউঞ্জে বসে চা খাওয়া যাক।'

'চলুন।'

'আপনি এত গম্ভীর হয়ে আছেন কেন? কী ভাবছেন এত?'

'কিছু ভাবছি না।'

তিনি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। দীর্ঘনিঃশ্বাসটি কেন ফেললেন, এই নিয়ে ভাবতে চেষ্টা করলেন। অকারণে তো কেউ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে না। সবকিছুর পেছনেই কারণ থাকে। এই জগতে কার্যকারণ ছাড়া কিছুই হয় না, সবই লজিক। জটিল লজিক। জটিল কিন্তু অভ্রান্ত। লজিকের বাইরে এক চুলও কারোর যাবার ক্ষমতা নেই।

২

গত দু' মাস ধরে ফিরোজ প্রতি সোমবারে মিসির আলির কাছে আসে। পাঁচটার সময় আসে, থাকে সাতটা পর্যন্ত। আজ কী মনে করে তিনটার সময় চলে এসেছে। মিসির আলি তখনো ইউনিভার্সিটি থেকে ফেরেন নি। তাঁর কাজের মেয়ে হানিফা দরজা খুলে দিল। সে দরজা খুলল ভয়ে-ভয়ে। ফিরোজের দিকে তাকালেই তার বুক টিপটিপ করে। বড় ভয় লাগে।

'স্যার কি আছেন, হানিফা?'

'জ্বি-না।'

'আজ একটু সকাল-সকাল এসে পড়েছি। আমি বসি, কেমন?'

'জ্বি আইচ্ছা।'

'তুমি আমাকে এক গ্লাস লেবুর শরবত খাওয়াতে পার? প্রচণ্ড গরম।'

হানিফার বয়স দশ। কিন্তু সে খুবই চটপটে। মিসির আলি সাহেব তাকে অল্পদিনের মধ্যেই বর্ণপরিচয় করিয়েছেন। পড়াশোনার ব্যাপারে তার অসম্ভব আগ্রহ। মেয়েটি এমনিতেও চটপটে। সে বড় এক গ্লাস শরবত বানাল। তিন টুকরা বরফ ছেড়ে দিল। ট্রেতে করে শরবতের গ্লাস এবং আরেক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি নিয়ে গেল। সে দেখেছে শরবত খাবার পরপরই সবাই পানি খেতে চায়।

ফিরোজ অবশ্যি উল্টোটা করল। পানি খেল প্রথমে। তারপর বেশ সহজ স্বাভাবিক গলায় বলল, 'তুমি আমাকে ভয় পাও কেন হানিফা?'

'ভয় পাই না তো।'

'পাও, খুবই ভয় পাও। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমি এখন সেরে গেছি। পুরোপুরি না-সারলেও অসুখটা আর নেই। চেঁচামেচি হৈচৈ কিছুই করি না। ঠিক না?'

'জ্বি, ঠিক।'

'এখন দেখ না--সবাই একা-একা ছেড়ে দেয়। আগে ছাড়ত না।'

হানিফা কিছু বলল না।

'ফ্যানটা ছেড়ে দাও।'

হানিফা ফ্যান ছেড়ে দিল। ফিরোজ ভারি গলায় বলল, 'এই গরমে সুস্থ মানুষই পাগল হয়ে যায়, আর আমি তো এমনিতেই পাগল।'

হানিফার বুকের ভেতর ধক করে উঠল। বলে কী এই লোক! বাড়িতে আর কেউ নেই। শুনশান নীরবতা। হানিফার ইচ্ছা করতে লাগল, বাড়ির বাইরে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে।

'হানিফা।'

'জ্বি?'

'আমাকে ভয় লাগছে?'

'জ্বি।'

'ভয়ের কিছু নেই। আমি সেরে গেছি। ঠিক আছে--তুমি যাও। আমি বসে থাকব চুপচাপ।'

হানিফা রান্নাঘরে চলে গেল। কি মনে করে সে রান্নাঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। কেন জানি দারুণ ভয় করতে লাগল তার।

ফিরোজ বসে আছে চুপচাপ। তার চোখ ঈষৎ লাল। খুব সূক্ষ্মভাবে হলেও তার মধ্যে এক ধরনের অস্থিরতা লক্ষ করা যায়। ছেলেটির বয়স বাইশ, অত্যন্ত সুপুরুষ। চিবুক এবং ঠোঁট কিশোরীদের মতো। বড়-বড় চোখ, পাতলা নাক। তাকে দেখলে মনে হয়, মেয়ে বানাতে গিয়ে প্রকৃতি কী মনে করে শেষ মুহূর্তে তাকে পুরুষ বানিয়েছে, এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের কিছু কাঠিন্য ঢেলে দিয়েছে।

ফিরোজের সমস্যাটা শুরু হয় এইভাবে--সে দু' বছর আগে জানুয়ারি মাসে তার এক বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিল। যাবার উদ্দেশ্য ছিল একটাই--গ্রাম দেখা। ফিরোজ কখনো গ্রাম দেখে নি।

বন্ধুর বাড়ি ময়মনসিংহের মোহনগঞ্জে। চমৎকার একটা জায়গা। ভোরবেলায় আকাশের গায়ে নীলাভ গারো পাহাড় দেখা যায়। চারদিকে ধু-ধু প্রান্তর, বর্ষা আসামাত্র যা পানিতে ডুবে যায়। সেই পানি সমুদ্রের মতো গর্জন করতে থাকে। অল্প বাতাসেই সমুদ্রের মতো বিশাল ঢেউ ওঠে।

এখন অবশ্যি শুকনো খটখট করছে চারদিকে। তবু ফিরোজ মুগ্ধ হয়ে গেল। সবচেয়ে মুগ্ধ হল বন্ধুর বাড়ি দেখে--বিশাল এক দালান। সিনেমাতে পুরনো আমলের জমিদার বাড়ির মতো বাড়ি। একেকটি ঘর এত উঁচু এবং এত বিশাল যে, কথা বললেই প্রতিধ্বনি হয়।

ফিরোজের বন্ধুর নাম আজমল চৌধুরী। সে তাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাড়ি দেখাল। অতিথিদের থাকবার জায়গা। নায়রীদের থাকবার জায়গা। কুয়োতলা। বাড়ির পেছনের সারদেয়াল, যেখানে পূর্বপুরুষদের কবর আছে। ফিরোজের বিস্ময়ের সীমা রইল না। কী কাণ্ড। সে মুগ্ধ কণ্ঠে বলল, 'এ তো হুলস্থূল ব্যাপার রে আজমল! তোরা রাজা-মহারাজা

ছিলি--তা তো কোনোদিন বলিস নি।'

'এখন কিছুই নেই। দালানটাই আছে, আর কিছুই নেই। সেই দালানই ভেঙে ভেঙে পড়ছে। আরেকটা ভূমিকম্প হলে গোটা দালানই ভেঙে পড়ে যাবে। তা ছাড়া খুব সাপের উপদ্রব।'

'বলিস কী!'

'এখন ভয় নেই কোনো। সব সাপ হাইবারনেশনে চলে গেছে। গরমের সময় ভয়াবহ কাণ্ড হয়।'

'কোনো ব্যবস্থা করতে পারিস না?'

আজমল কঠিন স্বরে বলল, 'এর একটামাত্র ব্যবস্থাই আছে, সব ছেড়েছুড়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়া।'

'এত চমৎকার ঘর-বাড়ি ছেড়ে চলে যাবি, বলিস কী!'

'চলে যাব। এখানে থাকলে মারা পড়তে হবে। তিনটামাত্র মানুষ আমরা। আমি, মা আর আমার ছোটবোন। এত বড় বাড়ি দিয়ে আমি করব কী? জঙ্গল হয়ে গেছে চারদিকে, দেখছিস না?'

দু' দিন থাকার পরিকল্পনা নিয়ে ফিরোজ গিয়েছিল, কিন্তু পঞ্চম দিনেও সে ফেরার কথা কিছু বলল না।

বড় আনন্দে সময় কাটতে লাগল। গ্রাম যে এত ইন্টারেস্টিং হবে, তা তার ধারণার বাইরে ছিল। শুধু একটি খটকা লেগে থাকল তার মনে। আজমলের বোনের সঙ্গে তার দেখা হল না, যদিও মেয়েটি এই বাড়িতেই থাকে। মেয়েটির নাম--নাজ। আজমলের মা প্রায়ই তাঁর মেয়েকে চিকন গলায় ডাকেন, 'ও নাজ, ও নাজ।' তার উত্তরে মেয়েটি ক্ষীণ স্বরে সাড়া দেয়। মেয়েটির সাড়াশব্দ এইটুকুই। ফিরোজ এক বার ভেবেছিল, আজমলকে তার বোনের কথা জিজ্ঞেস করে। শেষ পর্যন্ত তা করা হয় নি। প্রাচীনপন্থী একটি পরিবার, হয়তো কিছু মনে করে বসবে। এদের হয়তো কঠিন পর্দার ব্যাপার আছে।

ষষ্ঠ দিন সন্ধ্যায় মেয়েটির সঙ্গে ফিরোজের দেখা হয়ে গেল। ফিরোজ অবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম ভাঙল সন্ধ্যাবেলা। চারদিক অন্ধকার। ঘরে আলো দিয়ে যায় নি। ফিরোজ সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমেই হকচকিয়ে গেল। সতের-আঠার বছরের একটি মেয়ে দেয়াল ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তার এক হাতে একটি হারিকেন। হারিকেনের আলো পড়েছে মেয়েটির মুখে। এই মুখ কি কোনো মানবীর মুখ? অসম্ভব। পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য, সমস্ত রূপ কি এই মুখে আঁকা নয়? ফিরোজ চোখ ফিরিয়ে নিতে চাইল--পারল না। সে তাকিয়েই রইল।

মেয়েটি বলল, 'আমি নাজনীন।'

কিছু-একটা বলতে হয়। ফিরোজ বলতে পারল না। কোনো কথা তার মনে এল না। এই অসম্ভব রূপবতী মেয়েটিকে সে কী বলবে?

'ভাইয়া বাজারে গেছে, এসে পড়বে। আপনি বড় ঘরে বসুন--চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

ফিরোজ বড় ঘরের দিকে রওনা হল আচ্ছন্নের মতো, এবং সে মনে করতে পারল না মেয়েটির গায়ে শাড়ি ছিল, না সালোয়ার-কামিজ ছিল। মেয়েটির চুল কি বেণী-

বাঁধা ছিল, না খোলা ছিল। তার মুখটি কি গোলাকার, না লম্বাটে। কিছুই মনে নেই। শুধু মনে আছে একটি তুলি দিয়ে আঁকা মুখ সে দেখে এসেছে। যে-শিল্পী ছবিটি এঁকেছেন তাঁর বাস এ পৃথিবীতে নয়--অন্য কোনো ভুবনে।

রাতে খাবার সময় আজমল সহজ স্বরে বলল, 'নাজের সঙ্গে তোর দেখা হয়েছে, তাই না? নাজ বলছিল।'

ফিরোজ কিছু বলল না। আজমল বলল, 'ও কিছুতেই তোর সামনে আসতে চাচ্ছিল না। দেখাটা সে-জন্যেই এমন হঠাৎ হয়েছে।'

'আসতে চাচ্ছিল না কেন?'

'লজ্জা। ওর পোলিওতে একটা পা নষ্ট। এই লজ্জায় সে কারো সামনে পড়তে চায় না।'

আজমলের মুখ কঠিন হয়ে গেল। সে রুক্ষ স্বরে বলল, 'পৃথিবীর সমস্ত লজ্জা তার মধ্যে। শুধু তোর সামনে কেন, কারো সামনেই সে যায় না।'

সমস্ত রাত ফিরোজ এক ফোঁটা ঘুমতে পারল না। এত কষ্টের রাত তার জীবনে আসে নি। এবং ভয়াবহ ঘটনাটি ঘটল পরদিন দুপুরে।

সে একা-একা শিয়ালজানি খালের পাড় ধরে হাঁটতে গেল। এবং তার এক ঘন্টার মধ্যেই চার-পাঁচ জন লোক তাকে ধরাধরি করে নিয়ে এল। তার চোখ লাল টকটক করছে। দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত। মুখ দিয়ে ফেনা ভাঙছে। কথাবার্তা অসংলগ্ন। মাঝে-মাঝে বিকট স্বরে চেঁচিয়ে উঠছে এবং দৌড়ে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করছে।

আজমল এবং তার মা হতভম্ব। নাজনীন সমস্ত ব্যাপার দেখে অনবরত কাঁদছে। বাড়ি ভর্তি হয়ে গেছে মানুষে। নানান জল্পনা-কল্পনা। খারাপ বাতাস লেগেছে। জিনে ধরেছে। কালীর আছর হয়েছে।

ফিরোজকে নিয়ে আসা হল ঢাকায়। সারিয়ে তুললেন মিসির আলি সাহেব। সেই সারানোর ব্যাপারটা সাময়িক। কিছুদিন সুস্থ থাকে, আবার অসুস্থ হয়ে পড়ে। লোকজনদের গলা টিপে ধরতে চায়। জিনিসপত্র ভেঙে একাকার করে।

তবে এখন অবস্থা অনেক ভালো। অসুস্থতার সময় আগের মতো ভায়োলেন্ট হয় না। চুপ করে থাকে। কারো সঙ্গে কথাবার্তা বলে না। খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে অন্ধকার ঘরে বসে থাকে। ঘর থেকে শুধু বিড়বিড় শব্দ শোনা যায়। যেন সে কারো সঙ্গে কথা বলছে।

যখন সে সুস্থ থাকে, তখন তার অসুস্থ অবস্থার কথা বিশেষ মনে থাকে না। মিসির আলি সাহেব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যা বের করেছেন, তা খাতায় লিখে রেখেছেন। লেখা হয়েছে ফিরোজের জবানিতে।

অসুস্থতার বিবরণ

সারা রাত নানান কারণে আমার ঘুম হয় নি। শেষরাতের দিকে একটু ঘুম এল। তাও অল্প কিছুক্ষণের জন্যে। ছ'টার সময় বিছানা ছেড়ে বাইরে এসে দেখি, আজমল একটা চাদর গায়ে দিয়ে আমবাগানে রোদের জন্যে অপেক্ষা করছে। চট করে রোদ উঠবে মনে

হল না। কারণ খুব কুয়াশা। আমি লক্ষ করেছি, আটটা–ন'টার আগে এ অঞ্চলে সূর্যের দেখা পাওয়া যায় না।

আজমল আমাকে দেখে বলল, 'আজ এত সকাল–সকাল উঠলি যে? চোখ লাল কেন? রাতে ঘুম হয় নি।?'

'হয়েছে।'

'চা খাবি এক কাপ? নাশতা হতে দেরি হবে। চাল কোটা হচ্ছে, পিঠা হবে। সময় লাগবে।'

'চা এক কাপ খাওয়া যায়।'

চা খেতে–খেতে পাখি শিকার নিয়ে কথা হল। এখান থেকে প্রায় মাইল চারেক দূরে পুকইরা বিলে নাকি খুব হাঁস নামছে। শেষ রাতে উঠে গেলে প্রচুর পাওয়া যাবে।

আমি হাঁস মারার ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহ দেখালাম, কিন্তু আজমলের কাছ থেকে কোনোরকম সাড়া পাওয়া গেল না। অথচ এখানে যার সঙ্গেই দেখা হয়, সেই জিজ্ঞেস করে পাখি শিকার করতে এসেছি কি না। আজমলের এ রকম অনাগ্রহের কারণ নাশতা খাবার সময় টের পাওয়া গেল। এদের পাখি মারার কোনো বন্দুক বর্তমানে নেই। একটা দোনলা উইনস্টন গান ছিল। অর্থনৈতিক কারণে বিক্রি করে ফেলতে হয়েছে। শিকারের প্রসঙ্গ উঠতেই এই কারণেই আজমল মন খারাপ করেছে। আমার নিজেরও তখন একটু খারাপ লাগল। শিকারের প্রসঙ্গটা না–তুললেই হত।

রোদ উঠল দশটার দিকে। আমি ভেবেছিলাম, আজমলের সঙ্গে বাজারের দিকে যাব। কিন্তু আজমল বলল, 'তুই থাক, আমি দেখি একটা বন্দুকের ব্যবস্থা করা যায় কি না।'

আমি বললাম, 'বন্দুকের ব্যবস্থা করার কোনো দরকার নেই। শিকারের দিকে আমার কোনো ঝোঁক নেই।'

আজমল আমার কোনো কথা শুনল না। সে অসম্ভব জেদি। আমাকে রেখে চলে গেল। আমার তেমন–কিছু করার নেই। শিয়ালজানি খাল ধরে ধরে উত্তর দিকে হাঁটতে শুরু করলাম।

এ–অঞ্চলে হিন্দু বসতি খুব বেশি। এদের ঘর–দুয়ার খুব পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন। দেখতে ভালো লাগে। তবে অনেক বাড়ি–ঘর দেখলাম ফাঁকা। আজমলের কাছে শুনেছি, অনেক হিন্দু পরিবার একাত্তুরের যুদ্ধে কলকাতা গিয়ে আর ফিরে আসে নি। বেশ কিছু মারা পড়েছে পাকিস্তানি আর্মির হাতে। এদের ঘর–বাড়ি ফাঁকা। বড় বড় ঘাস জন্মেছে। জনমানবশূন্য বাড়ি–ঘর দেখতে কেমন যেন ভয়ভয় লাগে। গা ছমছম করে।

আমি ঠিক করলাম বাড়ি ফিরে যাব। চড়চড় করে রোদ উঠছে। পানির তৃষ্ণা হচ্ছে। হাঁটতে–হাঁটতে অনেক দুর চলে এসেছি। যে–জায়গাটায় আছি, তা অসম্ভব নির্জন। আমি বিশাল একটা বকুলগাছের নিচে দাঁড়ালাম খানিকক্ষণ। তখনই ব্যাপারটা ঘটল। গরগর একটা শব্দ শুনলাম গাছে। যেন কেউ গাছের ডাল নাড়াচ্ছে। আমি চমকে গাছের দিকে তাকাতেই রক্ত হিম হয়ে গেল।

দেখলাম, গাছের ডালে এক জন মানুষ বসে আছে। খালি গা। পরনে একটা প্যান্ট। চোখে গোল্ড রিম একটা চশমা। লোকটি রোগা এবং দারুণ ফর্সা। মুখের ভাব অত্যন্ত

রুক্ষ। সে সাপের মতো সরসর করে নেমে এল। এক জন মানুষ গাছ থেকে নেমে আসার মধ্যে তেমন অস্বাভাবিক কিছু নেই। কিন্তু আমার শরীর কাঁপতে লাগল। ঘামে গা চটচটে হয়ে গেল। লোকটির দৃষ্টি অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ। চশমার কাঁচের আড়ালেও তার চোখ চকচক করছে। সে এক পা এক পা করে এগিয়ে এল আমার দিকে। আমার প্রচণ্ড ইচ্ছা করছিল ছুটে পালিয়ে যেতে। কিন্তু আমার পা যেন মাটিতে লেগে গেছে। নড়বার সামর্থ্য নেই। লোকটির কাছ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবারও ক্ষমতা নেই। সে এগিয়ে এল আমার দিকে, তারপর একটা চড় বসিয়ে দিল। এর পরের ঘটনা আমার আর কিছুই জানা নেই।

মিসির আলি সাহেব তাঁর ছোট-ছোট অক্ষরে প্রচুর নোট লিখেছেন। প্রায় পঁচিশ পৃষ্ঠার একটি বিশ্লেষণী প্রবন্ধও আছে ইংরেজিতে লেখা। কিছু পয়েন্টস আছে আন্ডারলাইন করা। দু'-একটি পয়েন্ট এ রকম :

১। ফিরোজের গল্পে বেশ কিছু মজার ব্যাপার আছে। সে চশমা-পরা একটি লোককে নেমে আসতে দেখল খালিগায়ে। কিন্তু তার পরনে আছে প্যান্ট। যে-লোকটি চশমা এবং প্যান্ট পরে, সে খালিগায়ে থাকে না। লুঙ্গি-পরা একটি লোক খালিগায়ে নেমে এলে বাস্তব চিত্র হত। ফিরোজ দেখেছে একটি অবাস্তব চিত্র। অবাস্তব চিত্রগুলো আমরা দেখি স্বপ্নে। ফিরোজ কি একটি স্বপ্নদৃশ্যের বর্ণনা করছে?

২। ফিরোজ বলছে লোকটির পরনে ছিল প্যান্ট। কিন্তু প্যান্টের রঙ কী, তা সে বলতে পারছে না। তার মানে কি এই যে, প্যান্টের কোনো রঙ ছিল না। স্বপ্নদৃশ্য সবসময় হয় সাদা-কালো। স্বপ্ন বর্ণহীন। অবশ্যি সে একটি রঙ স্পষ্ট উল্লেখ করছে। সেটি হচ্ছে চশমার ফ্রেমের রঙ। সে বলছে গোল্ড রিম চশমা। অর্থাৎ সে সোনালি রঙ দেখতে পাচ্ছে, স্বপ্ন দৃশ্যে যা সম্ভব নয়।

৩। তার গল্পের কোথাও সে নাজনীন প্রসঙ্গ উল্লেখ করে নি। আমার মনে হচ্ছে, ফিরোজের সমস্ত ব্যাপারটায় নাজনীনের একটি ভূমিকা আছে। অসুস্থ হবার আগের রাত সে অনিদ্রায় কাটিয়েছে। অনিদ্রার মূল কারণ রূপবতী একটি মেয়ে। আমি লক্ষ করেছি, আমার সঙ্গে কথাবার্তার সময়ও সে এই প্রসঙ্গটি এড়িয়ে যায়। কেন যায়?

৪। সে তার গল্পে বলেছে, সে একটি বকুলগাছের নিচে দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু যে-গাছের নিচে সে দাঁড়িয়ে ছিল, সেটা একটা বটগাছ। ফিরোজ বকুলগাছ এবং বট গাছের পার্থক্য জানবে না, এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। সে গাছের নিচে আসার আগেই একটি ঘোরের ভেতর ছিল বলে আমার ধারণা। এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস বকুলগাছ প্রসঙ্গে তার কোনো একটি পীড়াদায়ক স্মৃতি আছে। (পরে বকুলগাছ প্রসঙ্গে আরো তথ্যাদি আছে)।

৫। ফিরোজের চশমাপরা লোকটি ছিল ফর্সা, রোগা ও লম্বা, যার চোখের দৃষ্টি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই বর্ণনা আজমলের বেলায়ও খাটে। এই ছেলেটি অসম্ভব ফর্সা, রোগা এবং লম্বা। সে অবশ্যি চশমা পরে না, মেডিকেল কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়বার সময় তার চশমা ছিল। এবং সেটা ছিল গোল্ড রিম চশমা। সেই সময় ফিরোজ এবং আজমল ছিল রুমমেট।

ফিরোজ প্রসঙ্গে ইংরেজিতে কিছু নোট আছে। নোটগুলোর বঙ্গানুবাদ দেয়া হল :

বকুলগাছ বিষয়ে কয়েকটি কথা

আমার প্রাথমিক অনুমান ছিল বকুলগাছ প্রসঙ্গে ফিরোজের একটি পীড়াদায়ক স্মৃতি আছে। অনুমান মিথ্যা নয়। আমি খোঁজ নিয়ে জানতে পারি ফিরোজরা একসময় সিলেটের মীরবাজারে থাকত। তার বাসা থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে একটি বকুলগাছ ছিল। ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা খুব ভোরবেলায় বকুল ফুল কুড়াতে যেত।

ফিরোজের বয়স তখন আট বছর। সে তার বড় বোনের সঙ্গে এক ভোরবেলায় ফুল কুড়াতে গিয়ে একটি অস্বাভাবিক দৃশ্য দেখল। একটি নগ্ন যুবতীর মৃতদেহ দড়িতে ঝুলছে। এটি একটি হত্যাকাণ্ড। মেয়েটিকে মেরে দড়িতে ঝুলিয়ে দিয়েছে।

অল্পবয়স্ক একটি শিশুর কাছে নগ্ন নারীদেহ এমনিতেই যথেষ্ট অস্বাভাবিক। সেই দেহটি যদি প্রাণহীন হয়, তাহলে তা সহ্য করা মুশকিল।

ফিরোজ অসুস্থ হয়ে পড়ল। প্রবল জ্বর এবং ডেলিরিয়াম। শৈশবের এই দৃশ্য ফিরোজের মস্তিষ্কের নিউরোনে জমা আছে, তা বলাই বাহুল্য।

মিসির আলি সাহেব বাড়ি ফিরলেন পাঁচটা বাজার কিছু পরে। আকাশে মেঘের ঘনঘটা। ক্ষণেক্ষণে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। অন্ধকার হয়ে গেছে চারদিক। ঝাঁকে-ঝাঁকে কাক উড়ছে আকাশে। ঝড় হবে সম্ভবত। পশু-পাখিরা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের খবর আগে-আগে পায়।

ঘরে ঢুকে যে-দৃশ্যটি দেখলেন, তার জন্যে মিসির আলির মানসিক প্রস্তুতি ছিল না। ফিরোজ বসে আছে মূর্তির মতো। তার হাতে একটা লোহার রড। সে শক্ত হাতে রড চেপে ধরে আছে। এত শক্ত করে চেপে ধরে আছে যে, তার হাতের আঙুল সাদা হয়ে আছে। চামড়ার নিচের শিরা নীল হয়ে ফুলে উঠেছে।

রড সে পেল কোথায়? এই প্রশ্নটির উত্তর পরে ভাবলেও হবে। ঠিক এই মুহূর্তে তাঁকে বুঝতে হবে, ফিরোজ এ-রকম আচরণ কেন করছে। তিনি সহজ স্বরে বললেন, 'একটু দেরি করে ফেললাম। তুমি কি অনেকক্ষণ হয়েছে এসেছ নাকি?'

ফিরোজ জবাব দিল না। তার চোখ টকটকে লাল। নিঃশ্বাস ভারি। কী সর্বনাশের কথা! মিসির আলি প্রাণপণে চেষ্টা করলেন স্বাভাবিক থাকতে।

'বুঝলে ফিরোজ, খুব ঝড়-বৃষ্টি হবে। আকাশ অন্ধকার হয়েছে মেঘে। তোমার হাতে ওটা কি লোহার রড নাকি?'

'হুঁ।'

'লোহার রড নিয়ে কী করছ? দাও, রেখে দিই।'

'না।'

'চা-টা কিছু খেয়েছ?'

ফিরোজ কোনো জবাব দিল না। তার দৃষ্টি তীব্র ও তীক্ষ্ণ।

'সিগারেট খাবে? নাও, একটা সিগারেট ধরাও।'

আশ্চর্যের ব্যাপার, ফিরোজ রড ছেড়ে দিয়ে হাত বাড়িয়ে সিগারেট নিল। মনে হচ্ছে একটা ভয়াবহ বিপর্যয় এড়ানো গেছে। সিগারেট শেষ না-হওয়া পর্যন্ত সে এটা নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। সিগারেট শেষ হতে লাগবে তিন মিনিট। তিন মিনিট যথেষ্ট দীর্ঘ সময়।

'তোমার জ্বর নাকি ফিরোজ?'

ফিরোজ জবাব দিল না। মিসির আলি তার কপালে হাত দিলেন। গা ঠাণ্ডা হয়ে আছে। মিসির আলি বললেন, ''হুঁ, বেশ জ্বর তো। একটা ট্যাবলেট খেয়ে নাও, জ্বরটা কমবে।'

তিনি ড্রয়ার খুলে এক শ' মিলিগ্রাম লিব্রিয়ামের ট্যাবলেট বের করলেন। অত্যন্ত কড়া ঘুমের অষুধ। কোনোরকমে খাইয়ে দিতে পারলে সঙ্গে-সঙ্গে কাজ করবে। সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে গিয়ে ধরবে। মস্তিষ্কে রক্তপ্রবাহের পরিমাণ কমে আসবে। উত্তেজিত অংশগুলোর উত্তেজনা দ্রুত হ্রাস পাবে। লিব্রিয়াম একটি চমৎকার অষুধ।

'নাও ফিরোজ, খেয়ে নাও।'

ফিরোজ কোনোরকম আপত্তি ছাড়াই অষুধ খেয়ে ফেলল। রক্তে অষুধ মেশবার জন্যে সময় দিতে হবে। বেশি নয়, অল্প কিছু সময়। এই সময়টা গল্পগুজবে আটকে রাখতে হবে।

'চা খেলে কেমন হয় ফিরোজ? বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে চা-টা জমবে মনে হয়। খাবে?'

'হুঁ, খাব।'

'বস, আমি চা নিয়ে আসছি। কিংবা এক কাজ কর। শুয়ে পড় সোফায়--আরাম কর।'

মিসির আলি বেরিয়ে এলেন। শোবার ঘরের দরজা লাগিয়ে এলেন বারান্দায়। এখন তিনি নিশ্চিন্ত বোধ করছেন। ফিরোজকে বারান্দায় এলে দরজা ভেঙে আসতে হবে। এটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। এর মধ্যেই লিব্রিয়াম তার কাজ করতে শুরু করবে।

মিসির আলি ডাকলেন, 'হানিফা, হানিফা।'

হানিফা রান্নাঘরের দরজা খুলে বের হয়ে এল। ভয়ে আতঙ্কে তার মুখ সাদা হয়ে গেছে। সে কাঁপছে থরথর করে।

'কী হয়েছিল হানিফা?'

হানিফা কিছু বলতে পারল না। আতঙ্ক এখনো তাকে ঘিরে আছে। মিসির আলি সাহস দেবার জন্যে হানিফার মাথায় হাত রাখলেন। হানিফা ক্ষীণ স্বরে বলল, 'এই লোকটা একটা লোহার শিক লইয়া আমারে মারতে আইছিল।'

'তারপর?'

'আমি দরজা বন্ধ কইরা বইসা ছিলাম। তারপর শুনি সে কার সাথে যেন কথা কইতেছে।'

'কার সাথে কথা বলছে?'

'অন্য একটা মানুষ।'

'তুমি দেখেছ অন্য কোনো মানুষ?'

'জ্বি না, কিন্তু কথা শুনছি। মোটা গলা।'

'ঠিক আছে এখন যাও, ভালো করে এক কাপ চা বানাও। ভয়ের কিছু নেই।'

হানিফা চা বানাতে গেল। মিসির আলি লক্ষ করলেন, মেয়েটির পা এখনো কাঁপছে। চা বানাতে-বানাতে ঠিক হয়ে যাবে। ভয় থেকে মুক্তি পাওয়ার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে, কোনো-এ[illegible]াজ [illegible] ব্যস্ত থাকা।

মিসির আলি ঘড়ি দেখলেন। দশ মিনিট পার হয়েছে। লিব্রিয়াম নিশ্চয়ই তার কাজ শুরু করেছে। বসার ঘর থেকে কোনো সাড়াশব্দ আসছে না। এখন নিশ্চিন্তে সেখানে যাওয়া যায়।

তিনি বসার ঘরে ঢুকলেন। ফিরোজ লোহার রড হাতে বসে আছে। অসুখের কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। তাঁর শিরদাঁড়া দিয়ে একটা শীতল স্রোত বয়ে গেল। তিনি শুকনো গলায় বললেন, 'চা বানাতে বলে এসেছি। চা চলে আসবে।'

ফিরোজ চাপা গলায় বলল, 'আজ আপনার একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা করবার কথা।'

মিসির আলির চমকে ওঠা উচিত, কিন্তু তিনি চমকে উঠলেন না। তিনি জানেন, বিশেষ-বিশেষ অবস্থায় মানুষের টেলিপ্যাথিক সেন্স প্রবল হয়ে ওঠে। ফিরোজের এখন সেই অবস্থা। সে ব্যাখ্যার অতীত কোনো-একটি উপায়ে তাঁর মস্তিষ্কের বায়ো-কারেন্ট থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করছে।

'একটি মেয়ের সঙ্গে আপনার দেখা করবার কথা না?'

'হ্যাঁ, কথা আছে।'

'তার কাছে গেলে আপনার বিপদ হবে।'

'কী করে বুঝলে?'

'আমাকে বলে গেছে।'

'কে বলে গেছে? ঐ চশমাপরা লোক?'

'হ্যাঁ।'

মিসির আলি লক্ষ করলেন, ফিরোজের চোখের পাতা ঘনঘন পড়তে শুরু করেছে। REM--র‍্যাপিড আই মুভমেন্ট। লিব্রিয়াম কাজ করতে শুরু করেছে।

তিনি সহজ স্বরে বললেন, 'শোন ফিরোজ, আমি আমার সারা জীবনে আমার নিজের লাভ-ক্ষতির দিকে তাকাই নি। আমি ঐ মেয়েটির কাছে যাব।'

ফিরোজ ঘুমিয়ে পড়ল।

বাইরে গাড়ি হর্ন দিচ্ছে। ফিরোজকে যাবার জন্যে গাড়ি পাঠিয়েছেন তার বাবা-মা।

মিসির আলি ড্রাইভারকে নিয়ে ধরাধরি করে ঘুমন্ত ফিরোজকে গাড়িতে তুলে দিলেন। ড্রাইভারকে বললেন, 'ও অসুস্থ। আজ রাতটা ওকে তালাবন্ধ করে রাখতে হবে। সকালবেলা আমি ওকে দেখতে যাব। আর শোন, ও রাতে বিড়বিড় করে কথাটথা বলবে। একটা ক্যাসেট রেকর্ডারের ব্যবস্থা করতে বলবে, যাতে ওর সমস্ত কথাবার্তা রেকর্ড হয়ে যায়। এটা খুব দরকার।'

ড্রাইভার শুকনো মুখে তাকিয়ে রইল। মিসির আলি ঘরে পা দিতেই মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হল। সেই সঙ্গে বাতাস। এ-রকম দুর্যোগের রাতে নীলুর কাছে যাওয়ার কোনো অর্থ হয় না। মিসির আলি ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেললেন।

ফিরোজের ব্যাপারে তাঁর মনটা খারাপ হয়ে গেছে। হঠাৎ এ-রকম হবে কেন?

৩

বহু খোঁজাখুঁজি করেও মিসির আলি নীলুদের বাড়ি বের করতে পারলেন না। তাঁর কাছে কোনো ঠিকানা নেই। তিনি ইচ্ছা করেই ঠিকানা রাখেন নি। না-রাখাটা বোকামি হয়েছে। কাঁঠালবাগানের যে-অঞ্চলে লাল রঙের দোতলা বাড়ি থাকার কথা, সেখানে লাল রঙের কোনো বাড়িই নেই।

কয়েকটি পান-বিড়ির দোকানদারকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন--লাল রঙের দোতলা বাড়ি, ভেতরে ফুলের বাগান আছে। ওরা যখন শুনল, তিনি ঠিকানা জানেন না এবং বাড়ির মালিকের নামও জানেন না, তখন খুবই অবাক হয়ে গেল।

'ঢাকা শহরে ঠিকানা দিয়াও বাড়ি পাওন যায় না, আফনে আইছেন ঠিকানা ছাড়া! কেমুন লোক আফনে!'

মিসির আলির নিজেরও মনে হল, কাজটা বুদ্ধিমানের মতো হয় নি। স্মৃতির উপর বিশ্বাস করতে নেই। স্মৃতি হচ্ছে প্রতারক। নানানভাবে সে মানুষকে প্রতারণা করে।

অন্য কোনো মানুষ হলে এতক্ষণ খোঁজাখুঁজি বন্ধ করে বাড়ি চলে যেত। কিন্তু তিনি ভিন্ন ধরনের মানুষ। কোনো-একটি বিষয় শেষ না-দেখে তিনি ছাড়েন না। কাজেই সকাল দশটার সময় তাঁকে দেখা গেল একটা রিকশা ঠিক করতে। ঘন্টা হিসাবে চুক্তি। এক ঘন্টা সে মিসির আলিকে নিয়ে কাঁঠালবাগানের বিভিন্ন রাস্তায় ঘুরবে। তিনি বাড়ি বের করতে চেষ্টা করবেন।

মিসির আলির কোলে রসমালাইয়ের একটা হাঁড়ি। কি মনে করে যেন তিনি এক সের রসমালাই কিনে ফেলেছেন। ছাত্রীর বাড়িতে খালি হাতে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু এখন মিষ্টির হাঁড়িটা একটা উপদ্রবের মতো লাগছে। মিসির আলির কেন যেন মনে হচ্ছে, যে-কোনো মুহূর্তে হাঁড়ি ভেঙে তার সমস্ত শরীর মাখামাখি হয়ে যাবে।

রিকশাওয়ালাটা বুড়ো এবং চালাক। খুব কম পরিশ্রমে সে এক ঘন্টা পার করতে চায়। রিকশা চলছে হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে। মিসির আলি বললেন, 'বুড়ো মিয়া, আপনি এই যে আস্তে আস্তে রিকশা চালাচ্ছেন, এতে কিন্তু আপনার কষ্ট বেশি হচ্ছে। প্রতিবারই নতুন করে মোমেনটাম দিতে হচ্ছে। কিন্তু আপনি যদি জোরে চালাতেন, তাহলে মোমেনটামের জন্যে বল দিতে হত এক বার। বাকি সময়টা শুধু ফ্রিকশন কাটানোর জন্যে অল্প কিছু বল লাগত।

বুড়ো রিকশওয়ালাকে এই জটিল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব কিছুমাত্র অনুপ্রাণিত করতে পারল না। তার রিকশার গতি আরো শ্লথ হয়ে গেল।

মিসির আলি ভাবতে চেষ্টা করলেন, যে-বাড়িতে আগে এক বার এসেছেন, সে-বাড়িটি এখন খুঁজে না-পাওয়ার পেছনে কী কী কারণ থাকতে পারে। অনেকগুলো কারণ হতে পারে। পরবর্তী সময়ে হয়তো লাল রঙের দালানটিকে সাদা রঙ করা হয়েছে। দোতলা ছিল, তিনতলা করা হয়েছে। ফুলের বাগান নষ্ট করে ঘর তোলা হয়েছে। কিংবা এ-ও হতে পারে যে, মস্তিষ্কের যে-অংশ বস্তুজগতের আবস্থানিক বিষয়গুলোর বিশ্লেষণ করে নিউরোন স্মৃতিকক্ষে জমা রাখে--তাঁর সেই অংশ কাজ করছে না।

মিসির আলি হঠাৎ লক্ষ করলেন, তাঁর রসমালাইয়ের হাঁড়ি দু'খণ্ড হয়েছে। সমস্ত

গায়ে, রিকশার সীটে এবং নিচে রসে মাখামাখি। এই অবস্থায় নীলুর বাসা খোঁজার কোনো মানে হয় না। অথচ এক ঘন্টা পার হতে এখনো পনের মিনিট বাকি। পনের মিনিট আগে রিকশা ছেড়ে দেবারও প্রশ্ন ওঠে না। তিনি রিকশওয়ালাকে ছায়ায় নিয়ে রিকশা দাঁড় করাতে বললেন।

রসে মাখামাখি হয়ে তিনি পনের মিনিট রিকশার সীটে বসে রইলেন। মিষ্টির লোভে তাঁর মাথার ওপর কাক ডাকতে লাগল। দু'-একটা সাহসী কাক ছোঁ মেরে মেরে রসগোল্লার টুকরা ঠোঁটে নিয়ে উড়ে যাচ্ছে। বুড়ো রিকশাওয়ালা অবাক হয়ে তাঁকে দেখছে। সে তার জীবনে এমন বিচিত্র যাত্রী খুব বেশি পায় নি। মিসির আলি বললেন, 'পনের মিনিট পার হলেই আমি চলে যাব, বুঝলেন?'

রিকশাওয়ালা মাথা নাড়ল--সে বুঝেছে।

আজ গরম সে-রকম নেই। কাল রাতে প্রচুর বৃষ্টি হওয়ায় আজ একটা শীতল ভাব আছে। তা ছাড়া রাস্তাঘাট ঝকঝক করছে। গাছপালায় সতেজ ভাব। কচুরিপানার মতো হালকা বেগুনি ফুল ফুটে আছে জারুল গাছে। কী চমৎকার যে লাগছে দেখতে! এই ফুলগুলোর জন্যেই চারদিকে একটা কোমল ভাব চলে এসেছে।

মিসির আলি বাসায় ফিরলেন এগারটার সময়। বাসায় এক ফোঁটা পানি নেই। একটার দিকে বাড়িওয়ালা কল ছাড়বে। তার আগে গোসলের কোনো সম্ভাবনা নেই। রসমালাইয়ের রস সারা গায়ে মেখে বসে থাকতে হবে।

তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। হানিফাকে চা বানাতে বলে ফিরোজের ফাইল খুলে বসলেন। এই ফাইলটিতে লেখা: ফিরোজ/মোহনগঞ্জ। মোহনগঞ্জে ফিরোজের অভিজ্ঞতা এবং মোহনগঞ্জ প্রসঙ্গে যাবতীয় খবরাখবর এখানে আছে। তিনি মোহনগঞ্জের বিভিন্ন লোকজনের কাছে যে-সব চিঠিপত্র লিখেছেন, তার কপি এবং সেইসব চিঠিপত্রের জবাবও এখানে আছে।

মিসির আলি পাতা ওল্টাতে লাগলেন। প্রথম চিঠিটি নাজনীনকে লেখা। তারিখ দেয়া আছে ১৭-৬-৮৫, প্রায় এক বছর আগে লেখা চিঠি। আজ হচ্ছে ১০-৬-৮৬। মিসির আলি নিজের লেখা চিঠির উপর চোখ বোলাতে লাগলেন।

নাজনীন,

কল্যাণীয়াসু, আমার ভালবাসা নাও। পরিচয় দিয়ে নিচ্ছিঃ আমি মিসির আলি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিষয়ের এক জন অধ্যাপক। ফিরোজ খান নামের এক জন মানসিক রোগীর চিকিৎসার দায়িত্বে নিয়োজিত। তাকে চিকিৎসা করা হচ্ছে মেডিস্টিক সাইকোথেরাপি পদ্ধতিতে। এই রোগীকে তুমি চেন। ও তোমাদের বাড়িতে গিয়েছিল এবং সে অসুস্থ হয়ে পড়ে তোমাদের বাড়িতেই। শোন নাজনীন--মানসিক রোগের উৎপত্তি মনে। মানুষের মন বিচিত্র জিনিস। সমগ্র নক্ষত্রপুঞ্জে যে-রহস্য ও জটিলতা আছে, তার চেয়েও অনেক বেশি রহস্যময় মানুষের মন। আমরা আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান দিয়ে সেই রহস্যের জট খুলতে চেষ্টা করি। প্রায় সময়ই তা সম্ভব হয় না। ফিরোজের বর্তমান যে-অবস্থা, তার কারণ অনুসন্ধান করতে তোমার সাহায্য প্রয়োজন। একটি অসুস্থ ছেলের সাহায্যে তুমি কি এগিয়ে আসবে না? আমি যা জানতে চাই, তা

হচ্ছে--ফিরোজের সঙ্গে তোমার ক' বার দেখা হয়েছে এবং কী কী কথা হয়েছে। কোনো কিছু বাদ না দিয়ে আমাকে জানাবে। আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন তথ্যও অর্থবহ হতে পারে। আমার শরীরটা বিশেষ ভালো না। শরীর একটু ভালো হলে তোমাদের বাড়িটা দেখতে যাব। এই ব্যাপারে তোমারই বড় ভাই আজমলের সাথে কথা হয়েছে। আদর ও ভালবাসা নাও।

মিসির আলি

চিঠির উত্তর তিনি এক সপ্তাহের ভেতর পেয়ে গেলেন। তিনি মুগ্ধ হলেন চিঠি পড়ে। সহজ এবং আন্তরিক ভঙ্গিতে লেখা চিঠি। হাতের লেখা বড় সুন্দর। তার চিঠির অংশবিশেষ এ রকম--

'ভাইয়া যে তার বন্ধুকে নিয়ে বেড়াতে আসবে, তা আমি জানতাম। গরমের ছুটির সময় এসে বলে গিয়েছিল। ভাইয়া সেই কলেজে পড়ার সময় থেকে তার বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে বেড়াতে আসে। আমাদের বাড়িটা বিশাল। ভাইয়া তার বন্ধুদের এই বাড়ি দেখিয়ে মুগ্ধ করতে চায় বলেই আমার ধারণা।

যাই হোক, ভাইয়ার বন্ধুরা এলে আমার খুব ভালো লাগে। বাড়িতে একটা উৎসব-উৎসব ভাব থাকে। ভাইয়ার মেজাজ থাকে খুব খারাপ (আপনি বোধহয় জানেন না, ভাইয়া খুব রাগী)।

এবার যখন ফিরোজ ভাই বেড়াতে এল--আমার মোটেও ভালো লাগে নি। কারণ, ভাইয়ার এই বন্ধুকে এখানে নিয়ে আসার পেছনে একটি উদ্দেশ্য ছিল, যা আমার পছন্দ হয় নি। ভাইয়া চাচ্ছিল, আমি তার বন্ধুর সঙ্গে গল্পটল্প করি, চা-টা বানিয়ে দিই। এবং তা করলেই তার বন্ধু আমাকে পছন্দ করে ফেলবে। আমার শারীরিক ত্রুটি তার চোখে পড়বে না। আমার একটি ভালো বিয়ে হবে। ভাইয়ার ধারণা, তার এই বন্ধু পৃথিবীর সেরা মানুষদের এক জন।

মার কাছ থেকে এসব শুনে আমার খুব মন খারাপ হল। একটি ছেলেক ভুলিয়ে-ভালিয়ে বিয়ে করতে হবে কেন? বিয়েটা কি এতই জরুরি? আমি ভাইয়াকে ডেকে নিয়ে বললাম, 'আমি কখনো, কোনো অবস্থাতেই তোমার এই বন্ধুর সামনে যাব না।' ভাইয়া চোখ লাল করে বলল, 'যেতেই হবে।' আমি শান্ত গলায় বললাম, 'এটা নিয়ে তুমি যদি জোর খাটাও, আমি তাহলে মরে যাব।' ভাইয়া চুপ করে গেল। আমি শান্ত ধরনের মেয়ে। কিন্তু ছোটবেলা থেকেই ভয়ঙ্কর জেদি। ভাইয়া তা খুব ভালোই জানে। সে আমাকে ঘাঁটাল না। আমি ভেতরের বাড়িতে থাকতে লাগলাম। ভুলেও বাইরে পা বাড়াই না। তবু এক দিন সন্ধ্যায় দেখা হয়ে গেল। ফিরোজ ভাইকে দেখে মনে হল, তিনি খুব অবাক হয়েছেন। আমি হকচকিয়ে গিয়েছি। নিজেকে সামলে নিয়ে কোনোমতে বললাম, 'বড় ঘরে গিয়ে বসুন, সেখানে চা দেয়া হবে।'

এই বলে আমি চলে যাওয়ার জন্যে পা বাড়িয়েছি। পোলিওর জন্যে আমার এক পায়ে কোনো জোর নেই, কাজেই উল্টে পড়ে গেলাম। ফিরোজ ভাই আমাকে টেনে তুললেন। এটাই স্বাভাবিক। এতে লজ্জা বা অপমানের কিছুই নেই। কিন্তু রেগে গেলাম এবং কঠিন গলায় বললাম, 'হাত ছাড়ুন।'

তিনি পাংশুবর্ণ হয়ে গেলেন। আমার হাত ছেড়ে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে

গেলেন।'

মিসির আলি এই চিঠিটা বেশ অনেক বার পড়েছেন এবং প্রতিবারই তাঁর মনে হয়েছে, চমৎকার একটি চিঠি। আন্তরিক এবং কোনো ভান নেই। এক জন মানুষ সবচেয়ে বেশি ভান করে তার চিঠিতে। যে এই ভানের ওপরে উঠে আসতে পারে, তাকে তার প্রাপ্য সম্মান দিতে হয়।

সুন্দরী একটি মেয়ের মনটাও বোধহয় সুন্দর হয়।

মিসির আলি অন্যমনস্কভাবে খাতার পাতা ওল্টাতে লাগলেন। এখনো পানি আসে নি। আজ কি বাড়িওয়ালা তার পানির পাম্পটি খুলবে না? ওদের নিজেদের কি পানির দরকার হয় না? দুপুরের খাওয়াদাওয়ারও একটা ব্যবস্থা করতে হয়। রান্নাবান্না কিছু হয় নি। হানিফা জ্বরে কাতর। কালকের ঘটনায় বেচারি বেশ ভয় পেয়েছে। সকালে এক শ' এক জ্বর ছিল, এখন এক শ' দুই। দুটি প্যারাসিটামল কিছুক্ষণ আগেই খাওয়ানো হয়েছে। জ্বর কমে যাওয়া উচিত, কিন্তু কমছে না। বিকেল নাগাদ না-কমলে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে।

তিনি খাতাপত্র গুছিয়ে উঠলেন। উঁকি দিলেন হানিফার ঘরে। হানিফার জন্যে তিনি একটি ঘর দিয়েছেন। এই ঘরে ছোট্ট একটি খাট আছে, পড়ার চেয়ার-টেবিল আছে, একটি আলনা আছে। এই মেয়েটি কোনোদিন কল্পনাও করে নি, কোনোদিন এতগুলো জিনিস তার হবে।

'হানিফা, তোর জ্বর কেমন রে?'

'ভালো।'

মিসির আলি কপালে হাত দিয়ে চমকে উঠলেন।

'ভালো কোথায়? অনেকখানি জ্বর তো! মাথায় পানি ঢালতে হবে।'

হানিফা জ্বরতপ্ত চোখে তাকিয়ে রইল। এই লোকটিকে সে বুঝতে পারছে না। এক জন কাজের মেয়ের জন্যে কেউ এতটা দরদ দেখায়, না দেখান উচিত?

'হানিফা।'

'জ্বি?'

'জ্বর খুব বেশি। জ্বর নামাতে হবে। পানি তো বোধহয় এক ফোঁটাও নেই।'

'জ্বি-না।'

'যাই, বাড়িওয়ালাকে পাম্প ছাড়তে বলি।'

'বলেন।'

'ফিরোজদের বাড়ি থেকে কেউ এসেছিল?'

'জ্বি-না।'

'টেলিফোন করে একটা খোঁজ নিতে হয়। কী বলিস হানিফা?'

'জ্বি, নেন।'

হানিফা চোখ বন্ধ করে ফেলল। তার জ্বর বোধহয় বাড়ছে। চোখ ছোট-ছোট হয়ে এসেছে। চোখের সাদা অংশ কেমন ঘোলাটে দেখাচ্ছে। মিসির আলি চিন্তিত মুখে বাড়িওয়ালার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

বাড়িওয়ালা করিম সাহেব বাসাতেই ছিলেন। পানি এখনো ছাড়া হয় নি শুনে তিনি

খুব হৈচৈ করতে লাগলেন। বারবার বললেন, 'এই সামান্য কাজের জন্যে আপনি নিজে আসলেন প্রফেসর সাহেব--বড় লজ্জায় ফেললেন আমাকে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ।'

মিসির আলি সাহেব বললেন, 'একটা টেলিফোন করা যাবে করিম সাহেব?'

'একটা কেন, এক শ'টা করা যাবে। যখন ইচ্ছা তখন করা যাবে। দরকার হলে ট্রাংকল করবেন--খুলনা ময়মনসিংহ বরিশাল। টেলিফোনের বিল আবদুল করিমকে কিছু করতে পারবে না, বুঝলেন প্রফেসর সাহেব? ওরে, টেলিফোনটা প্রফেসর সাহেবকে এনে দে। আর দেখ, ঠাণ্ডা পেপসি বা সেভেন আপ কিছু আছে কি না।'

'কিছু লাগবে না।'

'আপনি না বললেই হবে নাকি? আপনার একটা ইজ্জত আছে না? ছয় মাসে এক বছরে একবার আসেন। আমি বলতে গেলে রোজই বসে থাকি আপনার ওখানে। আপনি ফ্যানটার নিচে ঠাণ্ডা হয়ে বসেন তো দেখি।'

মিসির আলি বসলেন। বাড়িওয়ালা করিম সাহেব মিসির আলিকে একটু বিশেষ রকম স্নেহ করেন। গত দু'বছরে তিনি প্রতিটি ফ্ল্যাটের ভাড়া তিন দফায় বাড়িয়েছেন, শুধু প্রফেসর সাহেবের ভাড়া এক পয়সাও বাড়ে নি। কেন বাড়ে নি কে জানে?

ফিরোজের মাকে টেলিফোনে পাওয়া গেল। তাঁর কাছ থেকে যে-সমস্ত তথ্য জানা গেল, সেগুলো হচ্ছে--ফিরোজ ভালো আছে, সুস্থ এবং স্বাভাবিক। তার ঘরে একটি মাইক্রোফোন বসিয়ে ঘরের যাবতীয় শব্দ টেপ করা হয়েছে। টেপগুলো তিনি সন্ধ্যাবেলা পাঠাবেন।

ফিরোজের মা চিন্তিত স্বরে বললেন, 'আপনি অসুস্থ বলেছিলেন কেন? আমরা খুব ভয়ে-ভয়ে রাতটা কাটালাম। আপনার ওখানে সে কিছু করেছিল নাকি?'

'না, তেমন কিছু করে নি। একটু উদ্‌ভ্রান্ত মনে হচ্ছিল। ফিরোজ কি আছে ঘরে?'

'হ্যাঁ, আছে। কথা বলবেন?'

'বলব। দিন ওকে।'

ফিরোজের গলা শান্ত ও স্বাভাবিক।

'কেমন আছ ফিরোজ?'

'ভালো।'

'কী করছিলে?'

'কিছু করছিলাম না। একটা উপন্যাস নিয়ে বসেছিলাম।'

'কার উপন্যাস?'

'জন স্টেইনবেক। নাম হচ্ছে গিয়ে আপনার, সুইট থার্সডে। স্যার, আপনি পড়েছেন এটা?'

'গল্প-উপন্যাস আমি পড়িটড়ি না। এক জন লেখকের বানানো দুঃখ-কষ্টের বিবরণ পড়ে কী হয় বল? এমনিতেই আমাদের চারদিকে প্রচুর দুঃখ-কষ্ট আছে।'

'স্যার, আপনাকে বইটা পড়তেই হবে। আমার পড়া শেষ হলেই আপনাকে দিয়ে আসব।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে। শোন ফিরোজ।'

'বলুন।'

'কাল রাতে তোমার কেমন ঘুম হয়েছিল?'
'ভালো।'
'কী রকম ভালো?'
'খুব ভালো। এক ঘুমে রাত পার করেছি। কি জন্যে জিজ্ঞেস করছেন স্যার?'
'এমনি জানতে চাচ্ছি। কোনো স্পেসিফিক কারণ নেই। তুমি কি কাল রাতে কোনো স্বপ্ন দেখেছ?'
'জ্বি-না স্যার।'
'চট করে না বলে দিও না। চিন্তা করে তারপর বল।'
'এবার ও সময় নিল জবাব দেয়ার আগে।'
'একটা স্বপ্ন দেখেছি। আর ওটা তো আমি প্রায়ই দেখি।'
'কোনটা?'
'ঐ যে, ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিচ্ছি, তারপর দেখি কোনো প্রশ্নের উত্তর জানি না।'
'এটা ছাড়া আর কোনো স্বপ্ন দেখ নি?'
'জ্বি-না।'
'শোন ফিরোজ, এ ছাড়াও যদি অন্য কোনো স্বপ্নের কথা মনে পড়ে, আমাকে জানিও।'
'জ্বি আচ্ছা।'
'তুমি কি আজ সন্ধ্যার দিকে এক বার আসবে?'
'না স্যার, আজ আসব না। বইটা শেষ করব।'
'প্রেমের উপন্যাস নাকি?'
ফিরোজ লাজুক স্বরে বলল, 'হুঁ।'

টেপগুলো পরীক্ষা করতে-করতে রাত তিনটা বেজে গেল। প্রথম চারটি টেপে তেমন কিছু নেই। এক বার শুধু কিছুক্ষণের জন্যে আহ্ উহ্ শব্দ। সেটা স্বপ্ন দেখার জন্যে, কিংবা বেকায়দা অবস্থায় শোয়ার জন্যে। তবে শেষ টেপটিতে মিসির আলির জন্যে বড় ধরনের বিস্ময় অপেক্ষা করছিল।

তিনি বিচিত্র একটি কণ্ঠস্বর শুনলেন সেখানে। তীক্ষ্ণ তীব্র। হাই ফ্রিকোয়েন্সি-- কথাগুলো এ-রকম :

অপরিচিত কণ্ঠস্বর : 'হুঁ হুঁ ফিরোজ! ফিরোজ ··· (অস্পষ্ট)
ফিরোজের কণ্ঠস্বর : 'না। না। উঁহু না।
অপরিচিত : লোহার রডটা কোথায়?
ফিরোজ : জানি না, আমি জানি না।
অপরিচিত : (অস্পষ্টভাবে কিছু বলল)। নিঃশ্বাসের শব্দ।
ফিরোজ : না। না। না।
অপরিচিত : লোহার রড। রড।
ফিরোজ : না। না।
অপরিচিত : (অস্পষ্টভাবে কিছু কথা)। হাসির শব্দ।

মিসির আলি অসংখ্যবার এই অংশটি বাজিয়ে-বাজিয়ে শুনলেন। অস্পষ্ট অংশগুলো

উদ্ধার করতে পারলেন না। অপরিচিত যে-কণ্ঠস্বর শুনছেন, তা ফিরোজেরই কণ্ঠস্বর। এটি তার একটি দ্বিতীয় সত্তা। সেকেণ্ড পারসোনালিটি। ফিরোজকে পুরোপুরি সুস্থ করতে হলে তার দ্বিতীয় সত্তাটিকে ভালোভাবে বুঝতে হবে।

হানিফা ছটফট করছে। তার জ্বর কমে নি। এখন এক শ' দুইয়েরও কিছু বেশি। মিসির আলি চিন্তিত বোধ করলেন। রাত দশটার দিকে জ্বর অনেক কম ছিল। নিরানব্বুই পয়েন্ট পাঁচ। এখন এত বাড়ল কেন?

হানিফা জেগে আছে। কিন্তু কোনোরকম সাড়াশব্দ করছে না। মিসির আলি কোমল গলায় বললেন, 'খারাপ লাগছে নাকি রে বেটি?'

'না।'

'মাথার যন্ত্রণা আছে?'

'আছে।'

'বেশি?'

'জ্বি।'

'মাথা টিপে দেব?'

হানিফা লজ্জিত স্বরে বলল, 'জ্বি-না।'

'না কেন? আরাম লাগবে। তার আগে মাথায় পানি ঢেলে জ্বরটা কমাতে হবে।'

তিনি বাথরুমে ঢুকলেন পানির বালতির খোঁজে। তাঁর নিজের শরীরটাও ভালো যাচ্ছে না। মাথা ভার ভার লাগছে। বমি-বমি লাগছে। শুয়ে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু একটি বাচ্চা মেয়ে জ্বরে ছটফট করবে, আর তিনি শুয়ে থাকবেন--এটা হয় না।

হানিফার এ-বাড়িতে আসার ইতিহাস বেশ বিচিত্র। গত বছর জুলাই মাসের দিকে এক বার বেশ বড় একটা ঝড় হল। রাত একটায় জেগে উঠে দেখেন, দড়ামদুড়ুম শব্দে জানালার পাট আছড়ে পড়ছে। বৃষ্টির ছাটে ঘর ভেসে যাচ্ছে। ইলেকট্রিসিটি নেই। চারদিক অন্ধকার। মোটামুটি একটি ভয়াবহ অবস্থা। তিনি জানালা বন্ধ করতে গিয়ে দেখলেন, আট ন' বছরের একটা বাচ্চা মেয়ে একা-একা দেয়াল ঘেঁষে বসে আছে।

'কে রে তুই?'

মেয়েটি ভয়-পাওয়া স্বরে বলল, 'আমি।'

'এখানে কী করছিস?'

'ঘুমাইতাছি।'

'জেগে জেগে ঘুমাচ্ছিস নাকি?'

মেয়েটি জবাব দিল না।

'বাপ-মা কোথায়?'

মেয়েটি নিরুত্তর।

'তোর বাবা-মা নেই।'

'না।'

'আত্মীয়স্বজন কেউ নেই?'

'না।'

'তুই কি এ-রকম একা-একা মানুষের বারান্দায় ঘুমোস নাকি?'

'মেয়েটি জবাব দিল না। মিসির আলি বললেন, 'ভয় লাগছে না তোর?'

'না।'

'বলিস কী! নাম কি তোর?'

'হানিফা।'

'আয়, ভেতরে আয়। ইস্, ভিজে জবজবে হয়ে গেছিস তো!'

'মিসির আলি হারিকেন জ্বালিয়ে তাকালেন মেয়েটির দিকে। ছেলেদের মতো ছোট-ছোট করে কাটা চুল। আদুরে একটা মুখ।

'তোর বাপের নাম কি?'

'জানি না।'

'বলিস কী! মা'র নাম?'

'জানি না।'

'তোর হাতে কী? মুঠোর ভেতর কী আছে?'

হানিফা মুঠি খুলল। ভাংতি পয়সা।

'ভিক্ষা করে পেয়েছিস?'

'হুঁ।'

মিসির আলি গুনলেন। দু' টাকা ত্রিশ পয়সা। এই বিশাল পৃথিবীতে আগামীকাল এই মেয়েটি যাত্রা শুরু করবে--দু' টাকা ত্রিশ পয়সা, একটা নোংরা ফ্রক এবং একটা তালি দেয়া প্যান্ট নিয়ে। কোনো মানে হয়?

তিনি একটি শুকনো লুঙ্গি বের করলেন। গম্ভীর গলায় বললেন, 'কাপড় বদলে এটা পরে ফেল্। নিউমোনিয়া বাধাবি তো! ঐ ঘরে একটা বিছানা আছে, ওখানে গিয়ে শুয়ে থাক্।

মিসির আলি ভেবেছিলেন, সকাল হলেই সে চলে যেতে ব্যস্ত হয়ে যাবে। এক বার যাযাবর জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে গেলে বন্ধন আর ভালো লাগে না। কিন্তু হানিফা সকালবেলা চলে যাবার কোনো রকম লক্ষণ দেখাল না। এমনভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল, যেন এইটি তার ঘরবাড়ি।

হানিফার প্রতি সমাজের যে দায়িত্ব ছিল, মিসির আলি তা পালন করেছেন। নিজেই তাকে পড়তে শিখেয়েছেন। যোগ ভাগ গুণ শিখিয়ে নিয়ে গেছেন স্কুলে ভর্তি করাবার জন্যে। কেউ ভর্তি করাতে রাজি হয় নি। এত বড় মেয়েকে ক্লাস ওয়ানে অ্যাডমিশন দেয়ানো সম্ভব নয়। তিনি হানিফাকে বলেছেন, 'ঠিক আছে, তুই ঘরে বসেই পড়াশোনা চালিয়ে যা। যথাসময়ে প্রাইভেটে তোকে দিয়ে ম্যাট্রিক দেওয়াব। আমি নিজে তো সব সময় দেখতে পারি না। এক জন মাস্টার রেখে দেব।'

শেষরাতের দিকে হানিফার জ্বর কমে এল। শরীর ঘামতে লাগল। সে বিড়বিড় করে নানান কথা বলতে লাগল। মেয়েটির বিড়বিড় করে বলা কথাগুলো থেকেই মিসির আলি বড় ধরনের একটি আবিষ্কার করলেন। তাঁর বিস্ময়ের সীমা রইল না।

এই প্রসঙ্গে যথাসময়ে বলা হবে।

৪

সাইকোলজি বিভাগের সভাপতি ডঃ সাইদুর রহমানের মেজাজ সকাল থেকেই খারাপ। মেজাজ খারাপের প্রধান দুটি কারণের একটি হচ্ছে--সুইডেনে একটি কনফারেন্সে তাঁর যাবার খুব শখ ছিল, কিন্তু আমন্ত্রণ আসে নি। তিনি চেষ্টা তদবিরের তেমন কোনো ত্রুটি করেন নি। যেখানে একটা চিঠি দেয়া দরকার, সেখানে তিনটি চিঠি দিয়েছেন। প্রফেসর নোয়েল বার্গকে বাংলাদেশের হস্তশিল্পের নমুনা হিসাবে একটি চটের ব্যাগ পাঠিয়েছেন, যেটা কিনতে তাঁর তিন শ' টাকা লেগেছে। রাজশাহীতে তৈরি খুব ফ্যান্সি ধরনের ব্যাগ। প্রফেসর নোয়েল বার্গ একটি চিঠিতে ব্যাগের জন্যে ধন্যবাদ জানিয়েছেন, কিন্তু বহু প্রতীক্ষিত নিমন্ত্রণের চিঠি পাঠান নি।

সাইদুর রহমান সাহেবের মেজাজ খারাপের দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে--মিসির আলি-সংক্রান্ত সমস্যা। মিসির আলি লোকটিকে তিনি মনেপ্রাণে অপছন্দ করেন। পার্টটাইম টীচার হিসেবে মিসির আলির অ্যাপয়েন্টমেন্টের বিপক্ষে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। লাভ হয় নি। অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছে। এবং অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময় ভাইস-চ্যান্সেলর সাহেব বলেছেন, কোনো পোস্ট অ্যাডভারটাইজ হওয়ামাত্র তাঁকে নেয়া হবে। সাইদুর রহমান সাহেব গত দু' বছরে কোনো পোস্ট অ্যাডভারটাইজড হতে দেন নি। এডহক ভিত্তিতে এক জনকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছেন।

তাঁর ধারণা ছিল এডহক অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্যে মিসির আলি হৈচৈ করবেন। কিন্তু মিসির আলি কিছুই করেন নি। এটাও একটা রহস্য। এই লোকটির কি জীবনে উন্নতি করবার কোনোরকম ইচ্ছা নেই, না তার সবটাই ভান?

মিসির আলির ওপর আজ ভোরবেলায় তাঁর রাগ চরমে উঠেছে। কারণ তিনি দেখেছেন, সুইডেন থেকে মিসির আলির নামে একটি খাম এসেছে। তাঁর ধারণা, এটা কনফারেন্সের নিমন্ত্রণপত্র। কারণ, প্রেরকের নামের জায়গায় প্রফেসর নোয়েল বার্গের নাম আছে। প্রফেসর নোয়েল বার্গ হচ্ছেন কনফারেন্সের আহ্বায়ক।

সাইদুর রহমান সাহেব অফিসে খোঁজ নিলেন--মিসির আলি এসেছেন কি না। জানা গেল, তিনি এসেছেন। কাজেই সুইডেনের সেই খাম নিশ্চয়ই খোলা হয়েছে। সাইদুর রহমান সাহেব হেড ক্লার্ককে বললেন, 'মিসির আলি সাহেবের সঙ্গে যদি দেখা হয়, তাহলে বলবেন, আমি খোঁজ করছিলাম।'

'জ্বি আচ্ছা স্যার।'

'তাঁকে তো খুঁজেই পাওয়া যায় না। ডিপার্টমেন্টে আসেন না নাকি?'

'ক্লাস না থাকলে আসেন না।'

'গতকাল এসেছিলেন?'

'জ্বি, গতকাল এসেছিলেন। এক জন ছাত্রীর ঠিকানা খুঁজে বের করবার জন্যে খুব হৈচৈ করলেন।'

'তাই নাকি?'

'জ্বি স্যার। নীলুফার ইয়াসমিন। সে দেড় বছর ধরে ইউনিভার্সিটিতে আসে না, এখন তার ঠিকানা খোঁজার জন্যে যদি অফিসের সব কাজকর্ম বন্ধ রাখতে হয়, তাহলে তো মুশকিল।'

'কাজকর্ম বন্ধ রাখতে হবে কেন? এ–সব পার্সোনাল কাজের জন্যে তো অফিস না। আপনি স্ট্রেইট বলে দেবেন।'

'জ্বি আচ্ছা স্যার।'

'তা ছাড়া এক জন টীচার ছাত্রীর ঠিকানার জন্যে ব্যস্ত হবে কেন? এ–সব ঠিক না। নানান রকমের কথা উঠতে পারে।'

মিসির আলি ভেবেই পেলেন না, ইউনিভার্সিটির এক জন ছাত্রীর ঠিকানা বের করা এত সমস্যা হবে কেন? অফিসে নেই। অফিস থেকে বলা হল, সমস্ত রেকর্ডপত্র ডীন অফিসে। ডীন অফিসে গিয়ে জানলেন, রেকর্ডপত্র আছে রেজিস্ট্রার অফিসে। রেজিস্ট্রার অফিসে যে কেরানি এসব ডীল করে, দু' ঘন্টা অপেক্ষা করেও তার দেখা পাওয়া গেল না। সকালবেলা সে নাকি এসেছিল। চা খেতে গিয়েছে। মিসির আলি রেজিস্ট্রার অফিসের ক্যান্টিনেও খুঁজে এলেন। দেখা পাওয়া গেল না। আবার আসতে হবে আগামীকাল।

ডিপার্টমেন্টে ফিরে এসে শুনলেন--সাইদুর রহমান সাহেব তাঁকে খোঁজ করেছেন। মিসির আলি বিস্মিত হলেন। সাইদুর রহমান সাহেব তাঁকে পছন্দ করেন না। বড় রকমের প্রয়োজনেও তাঁর খোঁজ করেন না। আজ করছেন কেন?

'স্লামালিকুম স্যার।'

'ওয়ালাইকুম সালাম।'

'আপনি কি আমার খোঁজ করছিলেন?'

'বসুন মিসির আলি সাহেব। আছেন কেমন?'

'ভালো।'

মিসির আলি বসলেন।

'কি জন্যে ডেকেছিলেন?'

'তেমন কিছু না।'

সাইদুর রহমান সাহেব সিগারেট ধরালেন। সুইডেনের চিঠির প্রসঙ্গ তুলবেন কি না বুঝতে পারলেন না। তুললেও এমনভাবে তুলতে হবে, যাতে এই লোক বুঝতে না পারে, তিনি এই ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী।

মিসির আলি বললেন, 'স্যার, আপনি কি কিছু বলবেন?'

'তেমন ইম্পর্টেন্ট কিছু না। সুইডেনের কনফারেন্সের খবর কিছু জানেন? মানে আমার যাবার কথা ছিল। পেপারের অ্যাবস্ট্রাক্ট পাঠিয়েছিলাম প্রফেসর নোয়েলের কাছে।'

মিসির আলি সহজ গলায় বললেন, 'আমি ওদের ইনভাইটেশন পেয়েছি। পেপার দেবার জন্যে বলছে।'

'তাই নাকি?'

সাইদুর রহমান সাহেব নিভে গেলেন। টেনে–টেনে বললেন, 'যাচ্ছেন কবে নাগাদ? এক সপ্তাহের ভেতরই তো রওনা হওয়া উচিত?'

'আমি যাচ্ছি না স্যার।'

'কেন?'

'আমার কাজের মেয়েটি অসুস্থ।'

সাইদুর রহমান সাহেব নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। কাজের মেয়ে অসুস্থ, এই জন্যে সে সুইডেন যাবে না। বদ্ধ উন্মাদ নাকি!

'কাজের মেয়ে অসুস্থ, সেই কারণে যাচ্ছেন না?'

'ওটা একটা কারণ। তা ছাড়া অন্য একটি কারণ আছে।'

'জানতে পারি?'

'নিশ্চয়ই পারেন। আমি এক জন রোগীর মনোবিশ্লেষণ করছি। এই মুহূর্তে আমার পক্ষে বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়।'

'সত্যি বলছেন?'

মিসির আলি অবাক হয়ে বললেন, 'মিথ্যা বলব কেন?'

'আপনি কি আপনার ডিসিসন ওদেরকে জানিয়েছেন?'

'আজই তো মাত্র চিঠি পেলাম।'

'তবু আপনার উচিত ইমিডিয়েটলি আপনার ডিসিসন ওদের জানানো। হয়তো ওদের কোনো অলটারনেট ক্যানডিডেট আছে।'

'স্যার, আপনার কি সেখানে যাবার ইচ্ছা ? ইচ্ছা থাকলে বলেন।'

'বলব মানে, আপনি কী করবেন?'

'নোয়েল আমার বন্ধুমানুষ। ইংল্যাণ্ডে আমরা একসঙ্গে ছিলাম। আমার তিনটা পেপার আছে, যেখানে নোয়েল হচ্ছে এক জন কো-অথর। আপনার বোধহয় চোখে পড়ে নি।'

সাইদুর রহমান সাহেবের মুখ তেতো হয়ে গেল। তিনি বিরক্ত স্বরে বললেন, 'সুইডেন কি একটা যাওয়ার মতো জায়গা? আছে কি সেখানে, বলুন? দেখার কিছু আছে? কিছুই নেই। একটা ফালতু জায়গা।'

'দেখাদেখিটা তো ইম্পর্টেন্ট নয়। সেমিনারটাই প্রধান। সারা পৃথিবী থেকে জ্ঞানীগুণীরা আসবেন।'

'ঐসব কচকচানি শুনে কোনো লাভ হয়? কোনোই লাভ হয় না। শুধু বড়-বড় কথা।'

'এটা ঠিক বললেন না। সেখানে যাঁরা আসবেন, তাঁরা কথার চেয়ে কাজ অনেক বেশি করেন। বিশেষ করে এমন কিছু লোকজন আসবেন, যাঁদের দেখলে পুণ্য হয়।'

'আপনিও তো ওদের নিমন্ত্রিত, তার মানে বলতে চাচ্ছেন, আপনাকে দেখলেও পুণ্য হবে?'

মিসির আলি একটু হকচকিয়ে গেলেন। পর মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'তা হবে। আপনি অনেকক্ষণ আমাকে দেখলেন। অনেক পুণ্য করলেন। উঠি স্যার?'

ডঃ সাইদুর রহমান বহু কষ্টে রাগ সামলালেন। মনে-মনে এমন কিছু গালাগালি দিলেন, যা তাঁর মতো অবস্থার ব্যক্তিরা কখনো দিতে পারে না। এর মধ্যে একটি গালি ভয়াবহ।

৫

বছরখানেক হল নীলুর বাবা জাহিদ সাহেবের স্বাস্থ্য দ্রুত ভাঙতে শুরু করেছে। এমন কিছু অসুখ তাঁকে ধরেছে, যা শুধু কষ্টকর নয়, অত্যন্ত বিরক্তিকর। কিছুই হজম হয় না। পানি মেশান দুধ, লেবুর রস দিয়ে বার্লি, এক স্লাইস রুটি বা শিং মাছের মশলাবিহীন ঝোল--কিছুই না। ডাক্তার প্রায় সবই দেখানো হয়েছে। ডাক্তাররা বলেছেন, লিভার কাজ করছে না। ডাক্তারদের শুকনো ধরনের কথাবার্তা, ইতস্তত ভাবভঙ্গি থেকে তাঁর ধারণা হয়েছে--অসুখটা জটিল। হয়তো-বা লিভার ক্যানসার-ট্যানসার বাধিয়ে বসেছেন। ডাক্তাররা সরাসরি তাঁকে কিছু বলেন না। তিনিও জিজ্ঞাসা করতে

ঠিক সাহস পান না। নীলুর সঙ্গে এই নিয়ে আলাপ করতে ইচ্ছে করে। কিন্তু তাঁর সঙ্গে তেমন কোনো কথাবার্তা বলে না। তিনি কিছু একটা বলতে শুরু করলে মন দিয়ে শোনে, কিন্তু কথার মাঝখানে এমন একটি অপ্রাসঙ্গিক কথা বলে বসে যে, তাঁর ধারণা হয় নীলু আসলে কিছু শুনছে না। শুধু তাকিয়েই আছে।

নীলুকে ইদানীং তিনি ভয় করেন। যে-নীলু তাঁর সঙ্গে থাকে, তাকে তাঁর নিজের মেয়ে বলে কখনো মনে হয় না। এ যেন একটি অচেনা মেয়ে—যাকে কোনোদিনই ঠিক চেনা যাবে না।

অবশ্যি নীলু তাঁর সঙ্গে একেবারেই যে কথাবার্তা বলে না, তা নয়। কথাবার্তা বলে। এসে জিজ্ঞেস করে, 'চা লাগবে বাবা?' এই পর্যন্তই। তিনি যদি বলেন লাগবে, তাহলে সে উঠে গিয়ে চা বানিয়ে কাজের ছেলেটির হাতে পাঠিয়ে দেবে। যদি বলেন লাগবে না, তাহলে চুপ করে যাবে। দ্বিতীয় কোনো কথা বলবে না।

জাহিদ সাহেব আজকাল তাঁর দ্বিতীয় মেয়েটির অভাব খুব অনুভব করেন। সে পাশে থাকলে বাসার অবস্থা হয়তো আরেকটু স্বাভাবিক হত। বিলুর বিয়েটা তিনি ভালো দিতে পারেন নি। অথচ তখন মনে হয়েছিল, কী চমৎকার একটি ছেলে! তিনি বারবার জিজ্ঞেস করেছেন, 'তুমি দেশে চলে আসবে তো বাবা? বিদেশে সেট্‌ল্ করবে না তো? আমি আমার মেয়েকে দেশান্তরী করতে চাই না। আমি একা মানুষ, আমি চাই আমার দুটি মেয়ে আমার আশেপাশেই থাকবে।'

বিলুর বর হাসিমুখে বলেছে, 'বিদেশে সেট্‌ল্ করব কেন? কী আছে ওখানে? মানুষ হিসেবে কোনো দাম আছে আমাদের? আমি বছরখানেক থাকব। কিছু টাকাপয়সা জমিয়ে দেশে ফিরব। মাথা গুঁজবার মতো একটা বাড়ি তো কিনতে হবে!'

জাহিদ সাহেব ছেলের কথা বিশ্বাস করেছিলেন। কিন্তু এখন জানতে পেরেছেন, সে মনটানাতে একটা বাড়ি কিনেছে। যে-ছেলে দেশে চলে আসবে, সে নিশ্চয় বিদেশে বাড়ি কেনে না। তা ছাড়া, বিলু সুখী হয় নি বলে তাঁর ধারণা। বিলুর চিঠিপত্রে অবশ্য কিছু লেখা থাকে না। কিন্তু চিঠিগুলো প্রাণহীন। যেন লেখার জন্যেই লেখা। দায়িত্ব পালনের চিঠি। এক জন সুখী মেয়ের চিঠিতে থাকবে আনন্দের ছবি। সে তার বরের কথা ইনিয়ে-বিনিয়ে লিখবে। খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে উচ্ছ্বাস থাকবে। সে-সব কিছু থাকে না। বাবা হিসেবে তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করতে পারেন নি। সৎপাত্রে মেয়েকে বিয়ে দিতে পারেন নি। অথচ ছেলেটিকে সত্যি সত্যি তাঁর পছন্দ হয়েছিল। ভদ্র ছেলে।

চমৎকার কথাবার্তা। দারুণ শার্প। সেই সঙ্গে রসিক। খাওয়ার টেবিলে একবার সে এক গল্প শুরু করল। এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে এক ভণ্ড তর্কযুদ্ধে আহ্বান করেছে। হাজার হাজার মানুষ জড়ো হয়েছে তর্কযুদ্ধ দেখতে। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত মঞ্চে বসে আছেন-- ভণ্ড পণ্ডিত ঢুকল এবং গম্ভীর হয়ে বলল--'ফুন ফুনাফুন?' দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। তিনি তাঁর সারাজীবনে--'ফুন ফুনাফুন' বলে কিছু শোনেন নি। এর মানে কী, তা তাঁর জানা নেই।

ভারি মজার গল্প। জাহিদ সাহেব গল্প শুনে হাসতে হাসতে বিষম খেলেন। নীলুর মতো গম্ভীর মেয়েও হেসে ফেলল। এই কি সেই ছেলে?

জাহিদ সাহেব আজকাল বেশির ভাগ সময়ই বারান্দায় বসে এইসব কথা ভেবে ভেবে কাটান। দু'-তিনটে পত্রিকা তাঁর হাতের কাছে থাকে, সে-সব পড়া হয় না। পনের খণ্ড মুক্তিযুদ্ধের দলিল কিনেছেন। শখ ছিল গোড়া থেকে পড়বেন, তা পড়তে পারছেন না। ইচ্ছা করে না। মাঝে-মাঝে শুধু অষ্টম খণ্ডে চোখ বুলিয়ে যান। অষ্টম খণ্ড হচ্ছে অত্যাচার ও নির্যাতনের কাহিনী। পড়তে-পড়তে তাঁর বুক হুহু করে।

আজও তাই করছিলেন। হঠাৎ লক্ষ করলেন, নীলু তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছে। নীলু নিঃশব্দে চলাফেরা করে। হঠাৎ উপস্থিত হয়ে চমকে দেয়। জাহিদ সাহেব বললেন, 'কি খবর মা?'

'কোনো খবর নেই বাবা।'

'কোথাও বেরুচ্ছিস?'

'না।'

নীলু বসল তাঁর পাশের চেয়ারে। তিনি লক্ষ করলেন, নীলু বেশ সাজগোজ করেছে। কপালে টিপ। সুন্দর একটি শাড়ি। খোঁপায় ফুল পর্যন্ত দিয়েছে। জাহিদ সাহেব বললেন, 'তোর স্যার তো আর এলেন না।'

'উনি এসেছিলেন। বাড়ি চিনতে পারেন নি। রিকশা করে আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে দু' বার গেলেন।'

'তুই দেখছিস?'

নীলু কিছু বলল না। সে দেখে নি। না দেখেই বলেছে। খুবই অস্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু জাহিদ সাহেব জানেন, অস্বাভাবিক হলেও এটা সত্যি। নীলু না-দেখেই অনেক কিছু বলতে পারে। কেমন করে পারে, তা তিনি জানেন না। জানতে চানও না। নীলুর এই অস্বাভাবিক ক্ষমতাকে তিনি ভয় করেন।

কোনোদিন ভোরবেলায় নীলু এসে যদি বলে, 'বাবা, আজ তোমার দিনটি ভালো যাবে। আজ বিলুর চিঠি পাবে।'

তিনি হাসতে চেষ্টা করেন, কিন্তু হাসি ঠিক আসে না।

'চিঠির সঙ্গে ছবিও পাবে। সুন্দর-সুন্দর ছবি পাঠিয়েছে বিলু।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'নীলু হাসে। এই নীলু আগের নীলু নয়। এই নীলুকে তিনি চেনেন না।

জাহিদ সাহেব বললেন, 'তোর স্যার এসেছিলেন, তাঁকে ডেকে ঘরে আনলি না কেন?'

'উনি নিজেই খুঁজে বের করবেন। আমাদের এই স্যার কোনো জিনিসই মাঝপথে ছেড়ে দেন না।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। খুব মেথডিকেল মানুষ। তোমার সঙ্গে তো বাবা ওঁর সাথে এক বার দেখা হয়েছিল।'

'আমার মনে নেই।'

নীলু হাসতে-হাসতে বলল, 'স্যারটা খুব আনইমপ্রেসিভ। তাঁর কথা মনে না থাকারই কথা।'

জাহিদ সাহেব নীলুর গলায় এক ধরনের আবেগ অনুভব করলেন। এই আবেগের কারণ কী? তিনি প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্যে বললেন, 'খুব গরম পড়েছে এ-বছর।'

নীলু বলল, 'প্রতি বছর গরমের সময় তুমি এই কথাটা বল। আবার শীতের সময় বল--এ বছর মারাত্মক শীত পড়েছে। বল না বাবা?'

'বলি বোধহয়।'

'আমরা বেঁচে থাকি বর্তমানকে নিয়ে। অতীতের কথা আমাদের কিছু মনে থাকে না।'

কথাটা কি ঠিক? না, ঠিক নয়। কিছু-কিছু অতীত তার কালো সীল শক্ত করে বসিয়ে দেয়, কিছুতেই তা তুলে ফেলা যায় ন। নীলুর বিয়ের চেষ্টা করতে গিয়ে তিনি প্রথম তা লক্ষ করলেন। যে-কোনো আলাপ অল্প কিছুদূর এগোনর পরই বরপক্ষের লোকজন জানতে পেরে যায়, তাঁর এই মেয়েকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল একটি বাড়িতে। যে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, সে এক জন ভয়াবহ খুনী। কিন্তু কাউকেই তিনি বিশ্বাস করাতে পারেন নি যে, সেই খুনী নীলুকে স্পর্শ করতে পারে নি। কোনো-এক রহস্যময় কারণে তার মৃত্যু হয়েছিল। পোস্ট-মর্টেম রিপোর্টে ডাক্তার অবশ্যি লিখেছিল--মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত কারণে মৃত্যু, কিন্তু জাহিদ সাহেব তা বিশ্বাস করেন না। তিনি জানেন মৃত্যুর কারণ অমীমাংসিত এবং রহস্যময়।

সেই রহস্য তাঁর মেয়েকে এখনো ঘিরে আছে। তিনি তা চান না। তিনি তাঁর মেয়ের জন্যে একটি সহজ স্বাভাবিক জীবন চান। একটি ছোট্ট সুখী সংসার। দুটি শিশু--তিনি যাদের হাত ধরে পার্কে বেড়াতে যাবেন। বাদাম কিনে দেবেন। এক জন হঠাৎ পড়ে গিয়ে ব্যথা পাবে। তিনি কোলে নিয়ে শান্ত করতে চেষ্টা করবেন। তাই দেখে অন্যজনের হিংসা হবে। তাকেও কোলে নিতে হবে। কেউ তখন আর কোল থেকে নামতে চাইবে না। বড় ঝামেলায় পড়ে যাবেন তিনি।

তাঁর চিন্তায় বাধা পড়ল। নীলু হেসে উঠল খিলখিল করে। পুরনো দিনের নীলুর মতো। জাহিদ সাহেব অবাক হয়ে বললেন, 'হাসছিস কেন?'

'তুমি কী অদ্ভুত সব কল্পনা কর বাবা!'

নীলু হাসতে হাসতে উঠে চলে গেল। জাহিদ সাহেব স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। এ কোন নীলু? এই ভয়ঙ্কর ক্ষমতার উৎস কী?

৬

মিসির আলি হানিফাকে পিজিতে ভর্তি করিয়ে দিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, মেয়েটি একা-একা থাকতে ভয় পাবে। কিন্তু হানিফা ভয় পেল না।

'থাকতে পারবি তো?'

'হুঁ।'

'অনেক রকম পরীক্ষা-টরীক্ষা করবে ডাক্তাররা। ভয়ের কিছু নেই।'

'আমি ভয় পাই না।'

তিনি ভেবে দেখলেন, মেয়েটির ভয় না পাওয়ারই কথা। যে জীবন শুরু করেছে রাস্তায়, তার আবার ভয় কিসের?

'হানিফা।'

'জ্বি?'

'আমি দু' দিনের জন্যে ঢাকার বাইরে যাব। মোহনগঞ্জ যাব। তুই থাকতে পারবি তো?'

'পারব।'

'দু' দিন পরই এসে পড়ব। এর মধ্যে ডাক্তাররা পরীক্ষা-টরীক্ষা যা করবার করবেন। তা ছাড়া আমি আমাদের বাড়িওয়ালাকে বলে যাব, তিনি খোঁজখবর করবেন।'

'খোঁজখবরের দরকার নাই।'

'দরকার থাকবে না কেন? দরকার আছে। যাই তাহলে, কেমন?'

'জ্বি আচ্ছা।'

মিশির আলি বিমর্ষ মুখে বের হয়ে এলেন। মেয়েটির অসুখ তাঁকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছেন ডাক্তারের পরামর্শে। ডাক্তারের ধারণা, হার্টসংক্রান্ত কোনো সমস্যা। ইসিজি টিসিজি করাতে হবে। হার্ট-বিট খুবই নাকি ইরেগুলার।

তাঁর ট্রেন রাত ন'টায়। তিনি ঠিক করলেন, রওনা হবার আগে পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে কথা বলে যাবেন। পুলিশ কমিশনার সাজ্জাদ হোসেন তাঁর কলেজজীবনের বন্ধু। খুব-একটা পরিচয় তখন ছিল না। এখন হয়তো চিনতেই পারবে না। তবু পুরানো পরিচয়ের সূত্র টানা যেতে পারে—গরজটা যখন তাঁর।

সাজ্জাদ হোসেন তাঁকে চিনলেন। শুধু যে চিনলেন তাই নয়, উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। জড়িয়ে-টড়িয়ে ধরে একটা কাণ্ড করলেন। পুলিশের লোকদের মধ্যে এতটা আবেগ থাকে, তা মিসির আলি ভাবেন নি। তাঁর ধারণা ছিল, দিন-রাত ক্রাইম নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করতে করতে এরা আবেগশূন্য হয়ে পড়ে। সেটাই স্বাভাবিক।

সাজ্জাদ হোসেন বললেন, 'ফ্যানটার নিচে আগে আরাম করে বস্, তারপর বল কী দরকারে এসেছিস। পুলিশের কাছে কেউ বিনা প্রয়োজনে আসে না।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। পুলিশ এবং ডাক্তার--এই দু'ধরনের মানুষের কাছে কেউ বিনা প্রয়োজনে যায় না। এখন তুই বল, কী ব্যাপার? আত্মীয়স্বজন কাউকে পুলিশে ধরেছে?'

'না, সে-সব কিছু না।'

'নে, সিগারেট নে। নিশ্চিন্তে খা। ঘুষের পয়সায় কেনা নয়। নিজের কষ্টে উপার্জিত রোজগার থেকে কেনা। হা হা হা!'

মিসির আলি সিগারেট ধরালেন। সাজ্জাদ বললেন, 'বিয়েটিয়ে করেছিস?'

'না।'

'জানতাম করবি না। তুই হচ্ছিস একটা অড-বল। আমি বিয়ের পাট চুকিয়েছি আট বছর আগে। বাচ্চা-কাচ্চা কিছু হয় নি। হবেও না।'

সাজ্জাদ হোসেনের চোখে-মুখে ক্ষণিকের জন্য একটা ছায়া পড়ল। কিন্তু তিনি তা নিমিষেই কাটিয়ে উঠলেন। হাসিমুখে বললেন, 'জেসমিন চৌধুরী।'

মিসির আলি চিনতে পারলেন না। সাজ্জাদ হোসেন অবাক হয়ে বললেন, 'সত্যি চিনতে পারছিস না? ও তো টিভিতে অভিনয় করে। মারাত্মক! তাকে কেউ চেনে না, এটা তো আমি ভাবতেই পারি না!'

'টিভি নেই আমার বাসায়।'

'বলিস কী! বাসায় খাট-পালঙ্ক আছে তো? নাকি মেঝেতে পাটি পেতে ঘুমাস? হা হা হা। এখন বল তোর সমস্যা।'

'আমার একটি কাজের মেয়ে আছে--হানিফা।'

'জিনিসপত্র নিয়ে ভেগে গেছে?'

'না, তা না। আমি এই মেয়েটির অতীত ইতিহাস খুঁজে বের করতে চাই। সেটা কীভাবে করা সম্ভব, তাই জানার জন্যে তোর কাছে আসা।'

'পাস্ট হিস্ট্রি জানতে চাস কেন?'

'মেয়েটি জানে না, তার বাবা-মা কে। আত্মীয়স্বজন কে কোথায়, তাও বলতে পারে না। জ্ঞান হবার পর থেকেই সে দেখেছে যে, সে ভাসছে। আমি ওর বাবা-মাকে ট্রেস করতে চাই।'

সাজ্জাদ হোসেন গম্ভীর স্বরে বললেন, 'খামোকা চেষ্টা করছিস। কিছুই ট্রেস করা যাবে না। সম্ভবত জন্ম হয়েছে বেশ্যাপল্লীতে। তারপর হারিয়ে গেছে সেখান থেকে।'

'আমার তা মনে হয় না।'

'কেন মনে হয় না?'

মিসির আলি তার জবাব না-দিয়ে বললেন, 'আমার মনে হয় মেয়েটির শৈশব কেটেছে বিদেশে।'

'চোখ নীল? ব্লন্ড চুল?'

'না। মেয়েটি বাঙালিই, কিন্তু বাবা-মা হয়তো বিদেশে ছিলেন।'

'কেন বলছিস এ সব? তোর লজিক কী?'

মিসির আলি আরেকটা সিগারেট ধরালেন। এবং থেমে থেমে বললেন, 'হানিফা মেয়েটি গত পরশু রাতে খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে। প্রচণ্ড জ্বর। জ্বরের ঘোরে সে বিড়বিড় করে বলছিল--'ইট হার্টস,ইট হার্টস।'

সাজ্জাদ হোসেন তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইলেন। মিসির আলি বলে চললেন, 'আমার মনে হয়, খুব ছোটবেলায় মেয়েটি যখন অসুস্থ ছিল, তখন সে তার মাকে বলত—মামি ইট হার্টস। পরশু রাতে প্রচণ্ড জ্বরের মুখে অতীতের চাপা-পড়া

কথাগুলো বের হয়ে এসেছে। অবচেতন মন সেই সময় সক্রিয় হয়ে ওঠে। এ-জাতীয় ব্যাপারগুলো ঘটে।'

সাজ্জাদ হোসেন শুধু বললেন, 'ভেরি ইন্টারেস্টিং!'

মিসির আলি বললেন, 'হারিয়ে যাওয়া ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে বাবা-মা নিশ্চয়ই থানায় ডায়েরি করান। সেখান থেকে কোনো সাহায্য পাওয়া যাবে না? ধর্, আমি যদি জানতে চাই, পাঁচ থেকে আট বছর আগে কোন কোন বাচ্চা নিখোঁজ হয়েছিল—জানা যাবে কি?'

'না, এত পুরনো রেকর্ডপত্র কে বের করবে, বল্? এটা তো ইংল্যাণ্ড আমেরিকা না যে, সব কম্পিউটারে ঢোকানো আছে, বোতাম টিপলেই বেরিয়ে আসবে।'

'পুরনো রেকর্ড রাখার ব্যবস্থা নেই?'

'নতুন রেকর্ড রাখারই জায়গা নেই, আর পুরনো রেকর্ড! একটা মিসিং পার্সন ব্যুরো আছে, সেখানে কোনো কাজ হয় না। তা ছাড়া সেন্ট্রালি ইনফরমেশন রাখার কোনো ব্যবস্থা আছে বলে আমার মনে হয় না। প্রতিটি থানায়ও আলাদা-আলাদাভাবে খোঁজ করতে হবে। সেটা একটা বিশাল ব্যাপার।'

'বিশাল হলেও নিশ্চয়ই অসম্ভব না?'

'কিছুটা অসম্ভবও।'

'তোর পক্ষে কিছু করা সম্ভব না?'

সাজ্জাদ হোসেন গম্ভীর হয়ে রইলেন। মিসির আলি বললেন, 'আমি নিজে সমস্ত পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে পারি।'

'সেটা মন্দ না, গুড আইডিয়া।'

'না, আইডিয়াটা খুব গুড নয়।'

'নয় কেন?'

'অন্য এক সময় বলব, কেন নয়। আজ উঠতে হবে। ময়মনসিংহ যাচ্ছি একটা জরুরি কাজে। ফিরে এসে তোর সাথে যোগাযোগ করব।'

মিসির আলি উঠে পড়লেন।

৭

ফিরোজরা ধানমণ্ডির যে বাড়িটিতে থাকে, তাকে বাড়ি না বলে রাজপ্রাসাদ বলা যেতে পারে। বিশাল একটি দোতলা বাড়ি। বাড়ির চারপাশে জেলের মত উঁচু পাঁচিল। গেটে বড় বড় করে লেখা 'কুকুর হইতে সাবধান'। গেটটি চব্বিশ ঘন্টাই বন্ধ থাকে। বন্ধ গেট ডিঙিয়ে ভেতরে ঢোকা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কারণ, দারোয়ান এক জন আছে, যে প্রায় কখনোই গেটের কাছে থাকে না। আর থাকলেও ভান করে যে, কলিং বেলের শব্দ শুনতে পায় নি।

পৃথিবীর প্রায় সব জায়গাতেই বিশাল বাড়িগুলো জনশূন্য হয়ে থাকে। এ বাড়িতেও তাই। তিনটি প্রাণী এ-বাড়িতে বাস করে। ফিরোজ এবং তার বাবা ও মা। বাড়ির কাজকর্ম দেখাশোনার জন্যে দশজনের একটা বাহিনী আছে। তবে রাতে তারা এ

বাড়িতে ঘুমায় না। বাড়ির পেছনেই হোস্টেল ঘরের মতো চার-পাঁচটা রুমের একটা টিনের হাফ-বিল্ডিং আছে। এরা রাতে সেখানে থাকে। মূল বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা হচ্ছে কলিং বেল। রাতের বেলায় প্রয়োজন হলে কলিং বেল টিপে এদের ডাকা হয়। সে-প্রয়োজন সাধারণত হয় না।

ফিরোজের অসুখের পর অবস্থা খানিকটা বদলেছে। তার ঘরের সামনের বারান্দায় রহমতের শোয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। কাদেরের মাকেও মূল বাড়ির একতলায় থাকতে দেয়া হয়েছে। তবে এ-ব্যবস্থা সাময়িক।

ফিরোজের বাবা ওসমান সাহেবের বয়স প্রায় ষাট। ফিরোজ তাঁর তিন নম্বর ছেলে। ফিরোজের আগে দু'টি ছেলে যথাক্রমে ন'বছর এবং এগার বছর বয়সে মারা যায়। দু'টি মৃত্যুই অস্বাভাবিক। বড় ছেলে মারা যায় পিকনিক করতে গিয়ে। ইস্কুলের সব ছেলেরা দল বেঁধে গিয়েছিল সালনায়। পিকনিক শেষ করে সবাই ফিরে এল, কেউ লক্ষই করল না, একটি ছেলে কম। সালনার পুকুরে সে ভেসে উঠেছিল।

ওসমান সাহেবের মধ্যম ছেলেটি মারা গেছে রোড অ্যাক্সিডেন্টে। সে রাস্তা পার হবার সময় আচমকা দৌড় দেয় নি বা হঠাৎ কোনো ট্রাকের সামনে গিয়ে পড়ে নি। সে হাঁটছিল ফুটপাত ধরেই। কিন্তু সিমেন্টের বস্তা বোঝাই একটি ট্রাক সেই ছুটির দিনের সকালে ফুটপাতে উঠে গিয়েছিল।

যে-পরিবারের দু'টি ছেলে অপঘাতে মারা যায়, সেই পরিবারের বাবা-মা সাধারণত ভেঙে পড়েন। এই পরিবারটির ক্ষেত্রে সে-রকম কিছু ঘটে নি। ওসমান সাহেব অত্যন্ত শক্ত ধরনের মানুষ। কোনো কারণে বিচলিত হওয়া তাঁর স্বভাবের মধ্যেই নেই। তাঁর স্ত্রী ফরিদা স্বামীর এই গুণ কিছু পরিমাণে পেয়েছেন। বড় বড় ঝড়-ঝাপটাতে মোটামুটি স্থির থাকতে পারেন।

ফিরোজের ভয়াবহ বিপর্যয়েও তাঁরা স্বামী-স্ত্রী স্থির ছিলেন। ধৈর্য হারান নি। ফরিদা এক বার শুধু বলেছিলেন, 'আমাদের ওপর কারোর অভিশাপ আছে।' আর তাতেই ওসমান সাহেব এমন ভঙ্গিতে তাকিয়েছিলেন যে, তিনি দ্বিতীয় বার এ-জাতীয় কথা বলেন নি। স্বামীকে তিনি বেশ ভয় পান। তাঁর ইচ্ছা ছিল ফিরোজকে চিকিৎসার জন্যে বিদেশে নিয়ে যান। তাও সম্ভব হয় নি। ওসমান সাহেবের জন্যে। তিনি বারবার জোর দিয়ে বলেছেন, 'আমি আমার বদ্ধ উন্মাদ ছেলেকে বিদেশে নিয়ে যাব না। কিছুটা সুস্থ হোক, তারপর নিয়ে যাব।'

ফরিদা বলেছিলেন, 'চিকিৎসা যে করছে, সে তো ডাক্তার না। এক জন ডাক্তারকে দিয়ে চিকিৎসা করাও। ভদ্রলোক মাস্টার মানুষ, উনি কী চিকিৎসা করবেন?'

'যদি কেউ কিছু করতে পারে, উনিই পারবেন। ধৈর্য ধর।'

তিনি ধৈর্য ধরলেন। ধৈর্য ধরা বিফলে যায় নি। ফিরোজ এখন সুস্থ। ভয়াবহ একটা স্তর সে পার হয়েছে। ওসমান সাহেবের ধারণা, ফিরোজ এখন পুরোপুরি ভালো। সহজ-স্বাভাবিক মানুষ। কিছুদিনের মধ্যেই হয়তো পড়াশোনা শুরু করবে। এখন তাকে নিয়ে বাইরে যাওয়া যায়। পাহাড়ের ওপরে কোনো ঠাণ্ডা জায়গায়। হাতের কাছেই আছে নেপাল। প্লেনে যেতে তেতাল্লিশ মিনিট লাগে। ওসমান সাহেব ঠিক মনস্থির করতে পারছেন না। এখনো হয়তো ফিরোজকে নিয়ে বাইরে বেরুবার মতো অবস্থা হয় নি। মিসির আলি সে রকমই বলেছেন। মিসির আলির মতের সঙ্গে তিনি একমত নন। তবু

তাঁকে অগ্রাহ্য করার সাহস হয় না। হয়তো আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। ততক্ষণে বর্ষা শুরু হবে। তিনি শুনেছেন, বর্ষায় নেপাল দর্শনীয় নয়। দিনরাত টিপটিপ করে বৃষ্টি। হোটেলের ঘরেই বন্দি জীবন-যাপন করতে হবে।

ওসমান সাহেব একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। তিনি অধৈর্য হয়ে পড়েছেন। এটা একটা নতুন ব্যাপার। তাঁর জীবনে ধৈর্যের অভাব কোনোদিন ছিল না। তিনি সমস্ত জটিলতাকে সহজভাবে গ্রহণ করেন। এখন কি তা পারছেন না? ওসমান সাহেব চুরুট ধরিয়ে ক্লান্ত গলায় ডাকলেন, 'ফরিদা, ফরিদা।'

ফরিদা পাশের ঘরেই ছিলেন। তিনি ঘরে ঢুকলেন।

'ফিরোজ কেমন আছে আজ?'

'ভালো।'

'কি করছে?'

'ভেতরের বারান্দার ইজিচেয়ারে বসে আছে।'

'শুধু শুধু বসে আছে?'

'না, কি যেন করছে। ডাকব?'

'ডাক।'

ফরিদা ডাকতে গেলেন। এবং ফিরে এলেন কাউকে না-নিয়ে।

'ফিরোজ ঘুমাচ্ছে।'

'দুপুর এগারটায় কিসের ঘুম?'

ওসমান সাহেব অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। যদিও বিরক্ত হবার কোনোই কারণ নেই। জুন মাসের দুপুরবেলায় কারো চোখে ঘুম জড়িয়ে আসাটা অন্যায় নয়। তাঁর নিজেরই ঘুমঘুম পাচ্ছে।

ফরিদা বললেন, 'তোমার কী হয়েছে? এমন রেগে-রেগে কথা বলছ কেন?'

'রেগে রেগে কথা বলছি নাকি?'

'হুঁ। বেশ কয়েকদিন থেকেই লক্ষ করছি অল্পতেই ইউ আর লুজিং ইওর টেম্পার। তোমার ব্লাড প্রেসার কি বেড়েছে?'

'না।'

'চেক করিয়েছ?'

'না।'

'চেক না-করিয়ে কীভাবে বলছ, বাড়ে নি? আমার তো মনে হয় বেড়েছে। শম্ভুবাবুকে ডাকি?'

'কাউকে ডাকতে হবে না। তুমি তোমার নিজের কাজ কর।'

'আমার আবার কী কাজ যে করব?'

ওসমান সাহেব বুঝতে পারছেন, তাঁর মেজাজ খারাপ হতে শুরু করেছে। অসম্ভব খারাপ। এই মুহূর্তে তা চেক করা উচিত। রাগ সামলাবার কী-একটা পদ্ধতি যেন পড়েছিলেন বইয়ে। পায়ের নখের দিকে তাকিয়ে এক থেকে কুড়ি পর্যন্ত গোনা। কিন্তু তাঁর পায়ে জুতো। তিনি পায়ের নখের দিকে তাকাতে পারছেন না।

ফরিদা বললেন, 'তুমি এ-রকম করছ কেন?'

'কী রকম করছি?'

'অস্বাভাবিক আচরণ করছ।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, তাই। আজ দশটায় তোমার বোর্ড মীটিং ছিল। কোনো কারণ ছাড়াই তা ক্যানসেল করেছ। এবং--।'

'বল, কী বলতে চাও--থেমে গেলে কেন?'

'বেশ কিছুদিন থেকেই তুমি কোনো কাজকর্ম দেখছ না।'

'তাতে কিছুই আটকে নেই ফরিদা। আমি বিশ্রাম করছি। আমি ক্লান্ত। আমার মতো বয়সের একটি মানুষের ক্লান্ত হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।'

ফরিদা ওসমান সাহেবের পাশের চেয়ারে বসলেন। চেয়ারের দু' হাতলে নিজের হাত তুলে দিলেন। বসার ভঙ্গি অনেকটা সিংহাসনে বসার মতো। ওসমান সাহেব তাঁর স্ত্রীর বসার এই ভঙ্গিটির সঙ্গে পরিচিত। এভাবে বসা মানেই, ফরিদা যুক্তি দিয়ে কিছু বলবে। সে-যুক্তিগুলো কিছুতেই ফেলে দেয়া যাবে না। ওসমান সাহেব বললেন, 'বল, তুমি কী বলবে।'

ফরিদা সহজ কিন্তু দৃঢ় স্বরে বললেন, 'গত তিন-চার দিন ধরে তুমি এ-রকম আচরণ করছ এবং আমার মনে হয় ফিরোজের কোনো-একটা ব্যাপার তোমাকে এফেক্ট করেছে। সেটা কী?'

'কিছুই না। ফিরোজের কোনো ব্যাপার নয়। ফিরোজ এখন সুস্থ।'

'না, সে পুরোপুরি সুস্থ হয় নি।'

ফরিদার কণ্ঠ তীব্র ও তীক্ষ্ণ। ওসমান সাহেব কিছু বললেন না। তিনি ভালো করেই জানেন, গত তিন দিন ধরে ফিরোজ খুবই অসুস্থ। তাঁর ধারণা, এই তথ্যটি তিনি একাই জানেন। এখন বুঝতে পারছেন, এ ধারণা সত্য নয়। ফরিদাও সেটি জানে।

ওসমান সাহেব ক্লান্ত গলায় বললেন, 'আমার জন্যে এক কাপ চা দিতে বল।'

ফরিদা উঠলেন না। তিনি জানেন, ওসমান সাহেবের চায়ের পিপাসা হয় নি। আলোচনার মোড় ফেরাবার জন্যেই চায়ের প্রসঙ্গটা টেনে আনা। ওসমান সাহেব বললেন, 'আজ বোধহয় বৃষ্টি হবে। বৃষ্টি খুব দরকার।'

এই কথাটিও শুধু-শুধু বলা। মেঘ-বৃষ্টি-রোদ নিয়ে ওসমান সাহেব কখনো মাথা ঘামান না, তাঁর এত সময় নেই।

'ফরিদা।'

'বল।'

'ফিরোজের বর্তমান অবস্থাটা তুমি জান?'

'জানি।'

'কখন জানলে?'

'চার দিন আগে।'

'আমাকে বল নি কেন?'

'তুমিও তো জানতে। তুমিও তো আমাকে কিছু বল নি।'

'বাড়ির অন্যরা জানে?'

'জানি না। অন্যরা জানে কি না জিজ্ঞেস করি নি। জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করে নি।'

'মিসির আলি সাহেব জানেন? তাঁকে কিছু বলেছ?'

'না, আমি কিছু বলি নি।'

'আমার মনে হয়, তাঁকে ব্যাপারটা জানানো উচিত।'

'উচিত হলে জানাও।'

'আরো আগেই জানানো উচিত ছিল, তাই না ফরিদা?'

ফরিদা কোনো জবাব না দিয়ে উঠে গেলেন। তাঁর মাথা ধরেছে। তিনি খানিকক্ষণ শুয়ে থাকবেন। রোজ দুপুরবেলায় তাঁর মাথা ধরে। ঘর অন্ধকার করে শুয়ে থাকতে হয়।

ওসমান সাহেব বারান্দায় উঁকি দিলেন। ফিরোজ ইজিচেয়ারে ক্লান্ত ভঙ্গিতে ঘুমাচ্ছে। নিশ্চিন্ত আরামের ঘুম। কে বলবে তার এত বড় সমস্যা আছে!

সমস্যাটি ওসমান সাহেব তিন দিন আগে প্রথম লক্ষ করেন। রাত ন'টার দিকে রোজকার রুটিনমতো তিনি ফিরোজের ঘরে ঢুকলেন। ফিরোজ হাসিমুখে বলল, 'কি খবর বাবা?'

'কোনো খবর নেই। এলাম খানিকক্ষণ গল্পগুজব করতে। বেড-টাইম গসিপিং।

'বস।'

'কী করছিস?'

'কিছু করছি না। পড়ছি।'

'কী পড়ছিস?'

'গল্প উপন্যাস এইসব, সিরিয়াস কিছু নয়।'

'মাঝে মাঝে অবশ্যি গল্প-উপন্যাসও বেশ সিরিয়াস হয়।'

'তা হয়। তবে আমি পড়ি হালকা জিনিস। এখন পড়ছি রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস নৌকাডুবি।'

'রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস হালকা জিনিস! বলিস কি তুই?'

'বেচারা নোবেল প্রাইজ পেয়েছে বলেই যে তাঁকে ভারি-ভারি উপন্যাস লিখতে হবে, তেমন তো কোনো কথা নেই।'

ফিরোজ হাসতে শুরু করল। সহজ স্বাভাবিক হাসি। এক জন অসুস্থ মানুষ এ-রকম ভঙ্গিতে হাসতে পারে না। ওসমান সাহেব নিজেও হাসলেন এবং ঠিক তখনি একটা জিনিস লক্ষ করলেন।

ফিরোজের বিছানার ওপর প্রায় আড়াই হাত লম্বা একটা লোহার রড পড়ে আছে। তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, 'লোহার রডটা এখানে কেন?'

ফিরোজ তাকাল, কিন্তু কিছু বলল না।

'কে রেখেছে এটা এখানে?'

'আমি।'

'কেন?'

'এমনি।'

'এমনি মানে? বিছানার ওপর কেউ লোহার রড রাখবে কেন? ব্যাপারটা কি?'

ওসমান সাহেব লক্ষ করলেন, ফিরোজের মুখ কেমন যেন কঠিন হয়ে আসছে। চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। জ্বলজ্বল করছে।

'দে আমার কাছে, বাইরে রেখে আসি।'

'না।'

'না মানে? এটা দিয়ে তুই কি করবি?'

ফিরোজ গম্ভীর গলায় বলল, 'বাবা তুমি এখন যাও, আমি ঘুমাব।'

'তুই ঘুমাবি, ভালো কথা, কিন্তু লোহার রড পাশে নিয়ে ঘুমাতে হবে কেন?'

'ঘুমালে অসুবিধা কি?'

'অসুবিধা কিছুই নেই। কিন্তু সবকিছুর একটা কারণ আছে। তুই কারণটা আমাকে বল।'

'না, বলব না।'

ওসমান সাহেব অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। ফিরোজের চোখ লাল হয়ে উঠছে। কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম। ভারি-ভারি নিঃশ্বাস ফেলছে। ওসমান সাহেবের মনে হল--'সামথিং ইজ রং। সামথিং ইজ ভেরি রং।'

'ফিরোজ।'

'জ্বি?'

'রড পাশে নিয়ে ঘুমানোর কারণটা আমাকে বল। প্লীজ! তুই একটি বুদ্ধিমান ছেলে। কারণ নেই, এমন কিছু তোর পক্ষে করা সম্ভব নয়।'

ফিরোজ টেনে-টেনে বলল, 'ও আমাকে রাখতে বলেছে।'

'কে রাখতে বলেছে?'

'ঐ লোক।'

'কোন লোক? তার নাম কি?'

'নাম জানি না।'

'লোকটা কে?'

'খালিগায়ের একটা লোক। কালো প্যান্ট পরা, চোখে চশমা। সোনালি ফ্রেমের চশমা।'

ওসমান সাহেব কিছুই বুঝতে পারলেন না। কার কথা বলছে সে?

ফিরোজ বলল, 'মিসির আলি স্যারকে ঐ লোকের কথা আমি বলেছি। উনি চেনেন।

'আই সি।'

'সে আমাকে বলেছে, লোহার রড সবসময় সঙ্গে রাখতে। যদি না রাখি, সে রাগ করবে।'

'এই ব্যাপারগুলো কি তুমি মিসির আলি সাহেবকে বলেছ?'

'জ্বি-না।'

'বল নি কেন?'

'ঐ লোক আমাকে বলেছে এটা না বলতে।'

'আই সি।'

'বাবা, তুমি চলে যাও। আমার ঘুম পাচ্ছে।'

'মাত্র সাড়ে ন'টা বাজে। এখনিই ঘুম পাচ্ছে কি? আরেকটু বসি। গল্প করি তোর সঙ্গে।'

'গল্প করতে ইচ্ছা করছে না। তুমি এখন যাও।'

তিনি চলে এলেন, কিন্তু সারারাত তাঁর ঘুম হল না। তাঁর মনে হতে লাগল--

দরজায় একটা তালা লাগিয়ে রাখা উচিত, যাতে ফিরোজ কিছু বুঝতে না পারে। কিন্তু তালা লাগানোর সাহস তাঁর হল না। তালা লাগানোর ব্যাপারটা ফিরোজকে আরো এফেক্ট করবে। ভালোর চেয়ে মন্দ হবে বেশি।

ওসমান সাহেব ইজিচেয়ারে শুয়ে থাকা ফিরোজের দিকে তাকিয়ে আছেন। কী নিশ্চিন্তেই না ঘুমাচ্ছে সে! কে বলবে সে অসুস্থ! কত সহজ, কত স্বাভাবিক ঘুমাবার ভঙ্গি। কোলের ওপর একটা বই। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের-- স্বপ্ন লজ্জাহীন। উপন্যাসটি কেমন কে জানে? সুনীলের কোনো বই পড়েন নি। গল্প-উপন্যাস তাঁর পড়া হয়ে ওঠে না।

ফিরোজ ঘুমের মধ্যেই নড়ে উঠল। ওসমান সাহেব মৃদু স্বরে ডাকলেন, 'ফিরোজ।

ফিরোজ জবাব দিল না। তার পায়ের কাছে ভারি লোহার রডটি আছে। রডটি মাথা বেশ ধারাল। বারবার সেখানে চোখ আটকে যায়।

ওসমান সাহেব অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। তাঁর বারবার মনে হচ্ছে, এই লোহার রডটি ভয়ঙ্কর কোনোকিছুর জন্যে অপেক্ষা করছে।

মিসির আলির সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার। তিনি নাকি ঢাকায় নেই। কোথায় গিয়েছেন কেউ বলতে পারে না। কবে ফিরবেন, তাও কারো জানা নেই।

৮

মোহনগঞ্জ স্টেশনে মিসির আলি নামলেন রাত সাড়ে সাতটায়। গায়ে প্রবল জ্বর। মাথায় অসম্ভব যন্ত্রণা। চোখ মেলতে পারছেন না, এ-রকম অবস্থা। তাঁর নিজের বোকামির জন্যে এটা হয়েছে।

শ্যামগঞ্জ পর্যন্ত ট্রেনে প্রচণ্ড ভিড় ছিল। কামরায় লেখা 'পঁচিশ জন বসিবেন।'-- বসেছে পঞ্চাশ জন। আরো পঞ্চাশ জন দাঁড়িয়ে। অসম্ভব গরম। বাথরুমের খোলা দরজা দিয়ে আসছে উৎকট দুর্গন্ধ। বারবার মিসির আলির নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। নরক-যন্ত্রণা বোধ হয় একেই বলে। যাত্রীদের মধ্যে এক জন রোগী আছে, যে কিছুক্ষণ পরপর গোঁ-গোঁ শব্দ করছে। সেই শব্দ শুনে মনে হয়, এক্ষুণি বোধ হয় তার প্রাণবিয়োগ হবে। ভয়াবহ অবস্থা!

মিসির আলি শ্যামগঞ্জ নেমে পড়লেন। খোলা জায়গায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে বুক ভর্তি করে নিঃশ্বাস নেবেন, এ-আশায়। ট্রেন ছাড়ার সময় হঠাৎ মনে হল--ছাদে বসে গেলে কেমন হয়? অনেকেই তো যাচ্ছে। বাতাসের অভাব হবে না সেখানে। গ্রামের ভেতর দিয়ে ট্রেন যাবে, টাটকা বাতাস পাওয়া যাবে। তিনি ছাদে উঠে পড়লেন।

ছাদের অবস্থা বেশ ভালো। চমৎকার হাওয়া। মিসির আলি নিজেকে ধন্যবাদ দিলেন, ঠিক সময়ে ঠিক সিদ্ধান্তটি নেবার জন্যে।

সিদ্ধান্ত ঠিক ছিল না। হিরণপুর আসবার আগেই আকাশ অন্ধকার হয়ে গেল। প্রবল বাতাস বইতে শুরু করল। ধরবার মতো কোনো ব্যবস্থা নেই। তাঁর মনে হতে লাগল, যে-কোনো মুহূর্তে তাঁকে উড়িয়ে নিয়ে চষা খেতে ফেলবে। জীবনের ইতি হবে সেখানেই। বাতাসের সঙ্গে-সঙ্গে বর্ষণ। বৃষ্টির ফোঁটা সুচের মতো গায়ে বিঁধছে। আর কী ঠাণ্ডা! যেন বরফের চাঁই থেকে গলে গলে পড়ছে।

একটা ভালো অভিজ্ঞতা। কিন্তু এই অভিজ্ঞতার কথা অন্যকে বলার মতো সুযোগ কি আর হবে? মিসির আলি বাতাসের ঝাপ্টা সামলাবার চেষ্টা করছেন। ছাদের ওপরে বসা মানুষগুলোর কেউ-কেউ আজান দিতে শুরু করেছে। আল্লাহ্‌কে খুশি করার একটা চেষ্টা। আল্লাহ্ খুশি হলেন কি না বোঝা গেল না--ঝড়-বৃষ্টি কিছুই কমল না, তবে ড্রাইভার ট্রেন দাঁড় করিয়ে ফেলল। ছাদের ওপরে বসে-থাকা অসহায় মানুষগুলোর আজানের শব্দ নিশ্চয়ই তাঁর কানে গিয়েছে। আজানের ধ্বনি একেবারে বৃথা যায় নি।

ঝড় আধ ঘন্টার মতো স্থায়ী হল। এবং পরের কুড়ি মিনিটের মধ্যে মিসির আলির গায়ের তাপ হুহু করে বাড়তে লাগল! মোহনগঞ্জ স্টেশনে নেমে [illegible] মনে হল, প্লাটফরমেই শুয়ে পড়েন।

'স্যার, আপনি কি মিসির আলি?'

'হুঁ।'

'আমি চৌধুরীবাড়ি থেকে আপনাকে নিতে এসেছি স্যার।'

'ও, আচ্ছা।'

'আপনি কোন ট্রেনে আসবেন সেটা বলেন নাই, আমি সকাল থেকে সব ক'টা ট্রেন দেখছি।'

'খুব কষ্ট দিলাম—না?'

'জ্বি স্যার, তা দিলেন।'

মিসির আলি হেসে ফেললেন। বেশ ছেলেটি। বুদ্ধিমান এবং স্মার্ট। কথাবার্তায় কোনো গ্রাম্য টান নেই।

'কি কর তুমি?'

'এখানকার কলেজে স্যার বি. এ. পড়ি। চৌধুরীবাড়িতে থাকি।'

'নাম কি তোমার?'

'জহুরুল হক।'

'জহুরুল হক সাহেব, চল রওনা হওয়া যাক।'

'চলুন। আপনার মালপত্র কোথায়?'

'মালপত্র কিছুই নেই। একটা হ্যাণ্ডব্যাগ ছিল, সেটা বাতাসে উড়ে গেছে।'

'বাতাসে উড়ে গেছে মানে?'

'ছাদে বসে এসেছি তো--ঝড়ের মধ্যে পড়েছি।'

'বলেন কী। কী সর্বনাশ!'

'শোন জহুরুল--এখান থেকে যাওয়ার ব্যবস্থা কী? আমার কিন্তু হাঁটার ক্ষমতা নেই।'

'হাঁটা ছাড়া তো যাওয়ার অন্য কোনো ব্যবস্থাও নেই। নদীতে এখনো পানি হয় নি, নৌকা চলে না।'

মিসির আলি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে পথে নামলেন। সেখানে আবার তাঁকে বৃষ্টিতে ধরল।

তাঁর জ্বরের ঘোর কাটতে দু' দিন লাগল। পুরোপুরি আচ্ছন্ন অবস্থা গেল এ দু' দিন।

সবকিছু স্বপ্নদৃশ্যের মতো। যা দেখেন, তাই মনে হয় কাটা–কাটা খণ্ডচিত্র। একটির সঙ্গে অন্যটির মিল নেই।

একটি অপরূপা রূপবতী মেয়েকে প্রায়ই উদ্বিগ্ন মুখে তাঁর পাশে বসে থাকতে দেখেন। এই মেয়েটিই বোধহয় নাজনীন। মেয়েটি মাথায় পানি ঢালে। মাথার চুল টেনে দেয় এবং অত্যন্ত নরম স্বরে জিজ্ঞেস করে, 'চাচাজী, এখন কি একটু ভালো লাগছে? বলুন, ভালো লাগছে?'

তাঁর ভালো লাগে না। তবু মেয়েটিকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে বলেন, 'ভালো লাগছে মা, বেশ ভালো লাগছে।'

এক জন বয়স্কা মহিলাকেও প্রায় সর্বক্ষণই তাঁর ঘরের চেয়ারে বসে থাকতে দেখেন। ইনি বোধহয় নাজনীনের মা। এই মহিলাটি কথাটথা বলেন না।

চব্বিশ ঘন্টা থাকবার পরিকল্পনা নিয়ে এসেছিলেন, তাঁকে থাকতে হল এক সপ্তাহ। চার দিনের দিন তিনি নিজের ঘর থেকে বেরুলেন এবং খানিকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে আবার জ্বর বাঁধিয়ে ফেললেন। সেই জ্বর পুরোপুরি ছাড়ল না কখনো। তবু এর মধ্যেই যে–সব কাজ করবার কথা, সব করলেন।

প্রথম কাজ ছিল ফিরোজ এসে যে–সব জায়গায় গিয়েছে, সে–সব জায়গায় যাওয়া।

দেখা গেল, সে খুব বেশি বেড়ায় নি। বাড়ি এবং শিয়ালজানি খাল—এ দু'য়ের মধ্যেই তার গতিবিধি সীমিত ছিল। এক দিন শুধু 'উত্তরবন্ধ' বিলে গিয়েছিল মাছ ধরা দেখতে। সেখানে সে নিজেই নেমেছিল মাছ মারতে। তখন শিং মাছ কাঁটা ফুটিয়ে দেয়। সে ভয়ে অস্থির হয়ে পড়ে। তার ধারণা, সাপে কেটেছে। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। কারণ, ঘটনাটি ঘটে তার অসুস্থ হবার আগের দিন। খুব সম্ভব ঘটনাটি তার মনের ওপর ছাপ ফেলে। রাতে তার একটু জ্বরজ্বরও হয়।

যে বটগাছের নিচে চশমাপরা লোকটির সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল, সেই গাছটিও তিনি দেখতে গেলেন। এবং গাছের নিচে দাঁড়িয়ে তাঁর মনে হল, ঘটনাটি এখানে ঘটে নি। ফিরোজের বর্ণনা অনুসারে জায়গাটা নির্জন। দু' একটা পরিত্যক্ত হিন্দু ঘরবাড়ি ছাড়া কিছু নেই। কিন্তু বটগাছটা যে–অঞ্চলে, সে–জায়গাটা নির্জন নয়। পাশেই শিয়ালজানি খালের ওপর একটি বাঁশের সাঁকো, যার ওপর দিয়ে লোকজন চলাচল করছে। নদীর ওপারেই কয়েক ঘর কুমোরের বাস। তাদের বাড়িভর্তি ছেলেমেয়ে, যারা খুব হৈচৈ করে খেলে। এই অঞ্চলটিকে নির্জন বলা চলে না।

ঘটনাটি নিশ্চয়ই অন্য কোথাও ঘটেছে এবং ফিরোজ ঘোরের মধ্যে হেঁটে–হেঁটে চলে এসেছে বটগাছের নিচে, যেখানে অন্য লোকজন তাকে দেখতে পায়।

মিসির আলি শিয়ালজানি খালের দু'পার ধরে প্রচুর খোঁজাখুঁজি করলেন, কোনো বকুল গাছ পাওয়া যায় কি না। পাওয়া গেল না।

তাঁর দ্বিতীয় কাজ ছিল, এখানে আসার পর ফিরোজের সঙ্গে যাদের দেখা হয়েছে, তাদের সঙ্গে আলাপ করা। জানতে চেষ্টা করা, তারা ফিরোজের আচার ব্যবহারে কোনো অস্বাভাবিকতা লক্ষ করেছে কি না। দেখা গেল, খুব অল্পকিছু লোকজনের সঙ্গে তার কথা হয়েছে। কেউ তেমন কিছু বলে নি। মিসির আলি প্রত্যেকের সঙ্গে তাঁর ইন্টারভ্যুর খুঁটিনাটি লিখে ফেললেন। কয়েকটি নমুনাঃ

মোসাম্মাৎ সালেহা বেগম

বয়স ৫০/৫৫। আজমল চৌধুরীর মা। পর্দানশিন। কম কথা বলেন। রাতে চোখে ভালো দেখতে পান না।

প্রশ্ন : ফিরোজ ছেলেটি কেমন?

উত্তর : ভালো।

প্রশ্ন : কেমন ভালো?

উত্তর : এত বড় লোকের ছেলে, কিন্তু অহঙ্কার নাই।

প্রশ্ন : বুঝলেন কী করে অহঙ্কার নেই?

উত্তর : আমার পা ছুঁয়ে সালাম করল।

প্রশ্ন : যে দিন সে অসুস্থ হয় সে-দিন, অর্থাৎ অসুস্থ হবার আগে কি তার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল?

উত্তর : হয়েছিল, চা খাওয়ার সময়।

প্রশ্ন : কোনো কথা হয়েছিল?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : ওকে দেখে কি আপনার একটু অন্যরকম লাগছিল?

উত্তর : না। তবে চোখ-মুখ ফোলা ছিল। রাতে ঘুম হয় নি, সে-জন্য বোধহয়।

প্রশ্ন : বুঝলেন কী করে, ওর রাতে ঘুম হয় নি? কারণ আপনার সঙ্গে তো ওর কোনো কথা হয় নি।

উত্তর : সে আজমলের কাছে বলছিল, তাই শুনলাম।

প্রশ্ন : আপনি জিজ্ঞেস করেন নি, কী জন্যে ঘুম হয় নি?

উত্তর : না।

নাজনীন সুলতানা

বয়স ২০/২১। মমিনুন্নেসা কলেজ থেকে বি. এ. পাস করে বাড়িতে আছে। অপরূপ রূপবতী। মায়ের মতো স্বল্পভাষী নয়। ইনহিবিশন কেটে গেলে প্রচুর কথা বলে। লাজুক নয়। কথাবার্তায় মনে হল অত্যন্ত জেদি, তবে হাসিখুশি ধরনের মেয়ে।

প্রশ্ন : কেমন আছ নাজনীন?

উত্তর : ভালো আছি চাচা, আপনি এমন খাতা-কলম নিয়ে প্রশ্ন করছেন কেন? আমার কাছে মনে হচ্ছে, আমি কোনো পত্রিকায় ইন্টারভ্যু দিচ্ছি।

প্রশ্ন : ফিরোজকে তোমার কেমন লেগেছিল?

উত্তর : ভালো।

প্রশ্ন : কেমন ভালো?

উত্তর : বেশ ভালো! (এই পর্যায়ে মেয়েটি ঈষৎ লজ্জা পেয়ে গেল।)

প্রশ্ন : ঠিক কী কারণে তুমি বলছ, বেশ ভালো?

উত্তর : জানি না কী কারণে।

প্রশ্ন : ফিরোজ অসুস্থ হবার পেছনে কি কোনো কারণ আছে বলে মনে হয়?

উত্তর : এইসব নিয়ে আমি কখনো ভাবি নি চাচা।

প্রশ্ন : আচ্ছা, ফিরোজ অসুস্থ হয়ে তোমাদের বাড়িতে এল। সে-সময় তুমি তার সামনে গিয়েছিলে? তোমাকে কি সে চিনতে পেরেছিল?

উত্তর : চিনতে পেরেছিলেন কি না, তা তো চাচা বলতে পারব না। তবে উনি খুব হৈচৈ করছিলেন, আমাকে দেখে হৈচৈ থামিয়ে ফেলেন। রাতের বেলাও খুব চিৎকার শুরু করলেন। তখন ভাইয়া আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন। আমকে দেখে চুপ করে গেলেন।

প্রশ্ন : আচ্ছা, এখন আমি একটি ব্যক্তিগত প্রশ্ন করছি। জবাব দিতে না চাইলে জবাব দিও না। প্রশ্নটি হচ্ছে-- ধর, ফিরোজ যদি এখন পুরোপুরি সেরে যায় এবং তোমাকে বিয়ে করতে চায়, তুমি কি রাজি হবে?

উত্তর : (খুব সহজ এবং শান্ত গলায়) হ্যাঁ, হব। চাচা, আজকের মতো থাক। আপনার জন্যে এখন শরবত নিয়ে আসি--নাকি চা খাবেন? আপনি খুব ঘনঘন চা খাচ্ছেন--এটা কিন্তু চাচা ভালো না।

হরিপ্রসন্ন রায়
এম. বি. বি. এস.

স্থানীয় ডাক্তার। বয়স ৪০/৪৫। ব্যস্তবাগীশ লোক। এ অঞ্চলে তাঁর খুব পসার আছে। ইন্টারভ্যু চলাকালেই দু' জন লোক তাঁকে নিতে এল। কথা বেশি বলেন।

প্রশ্ন : আপনি কখন রুগীকে দেখতে এলেন?

উত্তর : আমাকে খবর পাঠিয়েছে পাঁচটায়। তখন যাওয়ার উপায় ছিল না। কারণ ধর্মপাশা থেকে এক জন পেসেন্ট এসেছে, এখন-তখন অবস্থা। পেটের ব্যথা। আলসার ছিল, সেই পেইন, কাজেই আমি সন্ধ্যার পরে গিয়ে উপস্থিত হই। ধরুন ছ'টা সাড়ে ছ'টা। শীতকাল তো ছ'টার সময় চারদিক অন্ধকার।

প্রশ্ন : আপনি কী দেখলেন? মানে রুগীর অবস্থার কথা বলছি।

উত্তর : গোঁ-গোঁ শব্দ করছে। মুখ দিয়ে ফেনা বের হচ্ছে। হিস্টিরিয়ার লক্ষণ মনে হল। চোখ বড়-বড় করে ঘোরাচ্ছিল। ভয়াবহ অবস্থা! আমি নাড়ি দেখলাম। হার্টবিট ছিল খুব হাই। হিস্টিরিয়াতে এ রকম হয়।

প্রশ্ন : অষুধপত্র কী দিলেন?

উত্তর : তেমন কিছু না। ঘুমের অষুধ দিয়েছি, ফেনোবারবিটন। তারপর বললাম ইমিডিয়েটলি ঢাকা নিয়ে যেতে।

প্রশ্ন : কতক্ষণ ছিলেন আপনি?

উত্তর : রাত দশটা পর্যন্ত ছিলাম। ওরা খুব ঘাবড়ে গিয়েছিল। নাজনীন কান্নাকাটি করছিল। কাজেই রুগী ঘুমিয়ে না-পড়া পর্যন্ত ছিলাম।

প্রশ্ন : ঘুমের মধ্যে রুগী কি কোনো কথাবার্তা বলছিল?

উত্তর : না, সাউণ্ড ঘুম। আমি ঘুমের মধ্যে আরে কবার নাড়ি দেখলাম। হার্টবিট বেশি ছিল, তবে আগের চেয়ে কম। কত ছিল তা মনে নেই।

প্রশ্ন : গায়ে টেম্পারেচার ছিল?

উত্তর : আমি যখন দেখি, তখন অল্প ছিল। নাইনটি নাইন পয়েন্ট ফাইভ। আমি চলে

আসার সময় বলেছিলাম, সকালবেলা আবার দেখব। কিন্তু সেটা সম্ভব হয় নি। ভোর পাঁচটার ট্রেনে রুগীকে নিয়ে তারা ঢাকা চলে যায়।

জহুরুল হক

বয়স ২০/২১। স্থানীয় কলেজের ছাত্র। বুদ্ধিমান এবং স্মার্ট। চৌধুরীদের বাড়ি লজিং থাকে। এদের সঙ্গে ক্ষীণ আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে। কথাবার্তা শুনে ধারণা হল, নাজনীন মেয়েটির প্রতি সে খানিকটা অনুরক্ত।

প্রশ্ন : ফিরোজের সঙ্গে তোমার কথা হয়েছিল?

উত্তর : জ্বি–না। আমি একটু দূরে দূরে ছিলাম।

প্রশ্ন : দূরে–দূরে ছিলে কেন?

উত্তর : আজমল ভাই সব সময় তাঁর সঙ্গে–সঙ্গে থাকতেন। আমি আজমল ভাইকে সব সময় এড়িয়ে চলি। তাঁকে ভীষণ ভয় পাই। কাজেই........।

প্রশ্ন : ভয় পাও কেন?

উত্তর : আজমল ভাই ভীষণ রাগী। চট করে রেগে যায়। ওদের ফ্যামিলির সবাই খুব রাগী। এখনো ওদের মধ্যে কিছুটা জমিদার–জমিদার ভাব আছে। সবাইকে মনে করে ছোটলোক।

প্রশ্ন : ফিরোজ কেন অসুস্থ হয়েছিল বলে তোমার ধারণা?

উত্তর : জানি না কেন হয়েছে। তবে লোকে বলে, ওরা ধুতুরার বীজ খাইয়ে পাগল করে ফেলেছে।

প্রশ্ন : বল কী তুমি!

উত্তর: না, আমি মোটেই বিশ্বাস করি না। লোকে কী বলে, সেটা বললাম।

প্রশ্ন : লোকে এ–জাতীয় কথা কেন বলছে?

উত্তর : এদের পূর্বপুরষরা খুব অত্যাচারী জমিদার ছিল। এরা মানুষের প্রাণ অতিষ্ঠ করে দিয়েছিল। এরা প্রচুর অন্যায় করেছে, সেই জন্যেই এ–সব বলে।

প্রশ্ন : তুমি মনে হয় এদের ওপর রেগে আছ?

উত্তর : না, রাগব কেন? সত্যি কথাটা আপনাকে বললাম।

মোহনগঞ্জে আসায় মিসির আলি সাহেবের তেমন কোনো লাভ হয় নি। এখন পর্যন্ত এমন কোনো তথ্য পান নি, যেটা তাঁর কোনো কাজে আসবে। চট করে অবশ্যি কোনো কিছুই পাওয়া যায় না। খুঁজতে হয়। জট খোলবার প্রথম ধাপই হচ্ছে অনুসন্ধান। অন্ধকারে হাতড়ানোর মতো কোনো আলোর ইশারা থাকতে হবে। সে–রকম কোনো আলোর সন্ধান মিসির আলি এখনো পান নি।

তবে যাবার দিন ভোরবেলায় একটি সূত্র পাওয়া গেল। অস্বস্তিকর একটি সূত্র, যাকে গ্রহণ করাও যায় না, আবার ফেলে দেয়াও যায় না। নাজনীন এসে বলল, 'চাচা, আসুন, আপনাকে একটা মজার জিনিস দেখাব।'

'কী মজার জিনিস?

'আমাদের এক পূর্বপুরুষ পিতলের একটা কলসি পেয়েছিলেন। কলসিভর্তি ছিল মোহর। সেই মোহর পেয়েই তারা জমিদার হল।'

'কলসিটায় কোনো বিশেষত্ব আছে?'

'না। সাধারণ কলসি, তবে অমাবস্যার সময়ে এটা ঝনঝন শব্দ করে।'

'তুমি নিজে শুনেছ?'

'না, তবে অনেকেই শুনেছে। আমি আর ভাইয়া এক অমাবস্যার রাতে কলসির পাশে জেগে ছিলাম। কিচ্ছু শুনতে পাই নি।'

মিসির আলি হাসিমুখে বললেন, 'প্রাচীন মোহরভর্তি কলসি--এ-জাতীয় গল্প খুব প্রচলিত। তবে এ-সবের কোনো ভিত্তি নেই।'

'চাচা, অনেকেই কিন্তু শব্দ শুনেছে।'

'হয়তো ইঁদুর ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল। ইঁদুর শব্দ করেছে।'

মিসির আলি কলসি দেখার জন্যে কোনোরকম আগ্রহ বোধ করলেন না। শুধুমাত্র নাজনীনের মনরক্ষার জন্যে সঙ্গে গেলেন। দোতলার উত্তরের সবচেয়ে শেষের ঘরটির তালা খুলল নাজনীন। মিসির আলির শিরদাঁড়া দিয়ে একটি ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল। কলসির কারণে নয়। এ-ঘরে কয়েকটি পুরনো পেইনটিং আছে। তাদের একটিতে খালি-গায়ে একটি লোক ঘোড়ার পিঠে বসে আছে। তার পরনে কালো রঙের প্যান্ট। চোখে সোনালি চশমা। শুকনো ধরনের কঠিন একটি মুখ।

'নাজনীন, এ-ছবিটা কার?'

'আমার দাদার বাবা। উনি খালিগায়ে ঘোড়ায় চড়তেন।'

'নাম কি ওঁর?'

'মাসুক চৌধুরী।'

'ওঁর সম্পর্কে আর কী জান তুমি?'

'বিশেষ কিছু জানি না। শুনেছি, খুব অত্যাচারী ছিলেন। তারপর এক দিন সন্ধ্যাবেলা ঘোড়ায় চড়ে আসছিলেন। হঠাৎ প্রজারা তাঁকে ঘিরে ফেলে।'

'তারপর?'

'তারপর আবার কি? মেরে ফেলে। লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে মারে।--চাচা, এই দেখুন কলসি। আবার কি কি যেন লেখাও আছে গায়ে। চেষ্টা করে দেখুন, পড়তে পারেন কি না। পালি ভাষায় লেখা।'

লেখা পড়ার ব্যাপারে তিনি বিন্দুমাত্র উৎসাহ বোধ করলেন না। ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'তোমার দাদার বাবাকে লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে মারে?'

'হ্যাঁ। ওঁর কথা এত জিজ্ঞেস করছেন কেন?'

'এমনি জিজ্ঞেস করছি। আচ্ছা, ফিরোজ কি এই ঘরটি দেখেছে? সে কি এই ঘরে ঢুকেছিল?'

'জ্বি না।'

'কী করে বুঝলে ঢোকে নি?'

'কারণ, ঘরটা তালা দেয়া থাকে। এই তালার একটিমাত্র চাবি। সেই চাবি থাকে আমার কাছে।'

'জানালা-টানালা দিয়ে এই ঘরে ঢোকার কোনো উপায় নেই, তাই না?'

'উঁহু, আর উপায় থাকলেই শুধু শুধু জানালা দিয়ে ঢুকতে যাবেন কেন? কী আছে এই ঘরে?'

মিসির আলি দাঁড়িয়ে রইলেন ছবির সামনে। তাঁর কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম জমছে। তিনি জট খুলতে চেষ্টা করছেন, কিন্তু জট খুলছে না। আরো পাকিয়ে যাচ্ছে। ফিরোজ যদি এক বার এই ঘরে ঢুকত, তাহলে সমস্ত ব্যাপারটাই অনেক সহজ হয়ে যেত। তিনি বলতে পারতেন--ফিরোজ এই ছবিটি দেখেছে। তার মনে ছাপ ফেলেছে এই ছবি। পরবর্তী সময়ে ছবির মানুষটিকেই সে দেখেছে। হেলুসিনেশন। কত সহজ সমাধান।

কিন্তু ফিরোজ এই ছবি দেখে নি।

মিসির আলি বললেন, 'একটিমাত্র চাবি?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি কি নিশ্চিত যে এই ঘরের দ্বিতীয় কোনো চাবি নেই?'

'হ্যা, নিশ্চিত।'

মিসির আলি আবার তাকালেন ছবির দিকে। তাঁর কেন জানি মনে হল, ছবির মানুষটি তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। বিদ্রূপের হাসি। তাচ্ছিল্যের হাসি।

৯

নীলু পত্রিকার খবরটা চারবার পড়ল।

একটা লাল কলম দিয়ে বক্স করা খবরটির প্রতিটি লাইন দাগাল, তারপর কাগজটা তার বাবাকে দিয়ে এল। খবরটা এ-রকম—

পুরানা পল্টনে আতঙ্ক
(স্টাফ রিপোর্টার)

শুক্রবার রাত একটার দিকে পুরানা পল্টন এলাকায় মধ্যযুগীয় নাটকের অবতারণা হয়েছে। লোহার রড হাতে এক যুবক অত্র অঞ্চলে ত্রাসের সৃষ্টি করেছে। প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য অনুযায়ী উক্ত যুবকটির পরনে ছিল কালো প্যান্ট। গায়ে কোনো কাপড় ছিল না। সে প্রথমে একটা রাস্তার কুকুর পিটিয়ে মেরে ফেলে এবং তার পরপরই গাড়ি বারান্দায় শুয়ে থাকা কিছু ছিন্নমূল মানুষকে আক্রমণ করে। সৌভাগ্যবশত কেউ হতাহত হয় নি। চিৎকার এবং হৈচৈ শুনে প্রচুর লোকজন জমে যায় এবং যুবকটি পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়। নীলক্ষেত পুলিশ-ফাঁড়ির সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করি। ফাঁড়ি কর্তৃপক্ষ জানান যে, এই প্রসঙ্গে তাঁরা কিছুই জানেন না।

জাহিদ সাহেব খবরটা পড়লেন। কিন্তু তাঁর কোনো ভাবান্তর হল না। পত্রিকা খুললেই এ-জাতীয় খবর থাকে। বাংলাদেশের কোথাও-না-কোথাও কেউ-না-কেউ ত্রাসের সৃষ্টি করছে। একবার খবর বেরুল, ছোট-ছোট শিশুদের পানিতে ডুবিয়ে মেরে ফেলা হচ্ছে। একবার বেরুল, রক্তচোষার আগমন ঘটেছে। এরা কাউকে একা পেলেই ধরে বেঁধে সিরিঞ্জ দিয়ে টেনে সমস্ত রক্ত নিয়ে যাচ্ছে। খলিলুল্লাহ্ বলে এক লোককে নিয়ে প্রচুর হৈচৈ হল। এই লোকটির প্রধান খাদ্য নাকি মৃত মানুষের কলিজা। অবিশ্বাস্য ব্যাপার! কতটুকু সত্যি কে জানে!

জাহিদ সাহেবের ধারণা, এ-জাতীয় খবরের বেশির ভাগই রিপোর্টাররা চা-সিগারেট খেতে খেতে তৈরি করেন। মানুষের কৌতূহল জাগিয়ে পত্রিকার কাটতি বাড়ান। এ জাতীয় খবরের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে, বেশ কয়েকটি ফলো আপ স্টোরি ছাপা হবে। এবং সবেশেষে একটি সচিত্র ফিচারের মাধ্যমে ঘটনার ইতি হবে। অতঃপর রিপোর্টাররা অন্য কোনো ভয়াবহ ঘটনা ফাঁদতে চেষ্টা করবেন—'অজ্ঞাতনামা জন্তু' বা এই জাতীয় কিছু।

কিন্তু নীলু এই খবরটি এভাবে দাগিয়েছে কেন? বর্তমানে নীলুর কিছু অস্বাভাবিক ক্ষমতা আছে। সে কি সেই ক্ষমতার কারণেই কিছু আঁচ করছে?

দুপুরবেলা খাবার সময় জাহিদ সাহেব প্রসঙ্গটা তুললেন। হালকা গলায় বললেন, 'পুরানা পল্টনে আতঙ্ক, এই খবরটা তুই দাগিয়েছিস কেন?'

নীলু জবাব দিল না। তার মুখ থমথমে। জাহিদ সাহেব বুঝলেন, নীলু এখন কোনো কথারই জবাব দেবে না। মাঝে-মাঝে সে এ রকম চুপ করে যায়। প্রয়োজনীয় কথাটাও বলে না।

জাহিদ সাহেব মেয়ের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে নিজের মনে বললেন, 'দরজা-টরজা ভালোমতো বন্ধ করে ঘুমানো উচিত। বলা তো যায় না। পল্টন আর কাঁঠালবাগান--খুব একটা দূরের ব্যাপার না।'

তাঁর এ-সব বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে মেয়েকে আলোচনায় টেনে আনা। কিন্তু নীলু একটি কথাও বলল না। খাওয়ার মাঝখানেই সে উঠে চলে গেল।

জাহিদ সাহেব যা ভেবেছিলেন, তাই। ফলো-আপ স্টোরি ছাপা হয়েছে। খবর চলে এসেছে প্রথম পাতায়। আকর্ষণীয় শিরোনাম।

নগ্নগাত্র বিভীষিকা
(স্টাফ রিপোর্টার)

পহেলা জুলাই, শনিবার, পুরানা পল্টন এলাকায় ত্রাস সৃষ্টিকারী যুবক আবার আজ গভীর রাতে দেখা দিয়েছে। যথারীতি তার হাতে ছিল লোহার রড। এবার তার রডের আঘাতে রাহেলা নাম্নী এক পতিতা গুরুতর আহত হয়। তার ডান হাত এবং পাঁজরের দুটি হাড় ভেঙে যায়। তাকে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

> রাহেলার বর্ণনা অনুযায়ী রাত আনুমানিক দুই ঘটিকার সময় নগ্নগাত্র যুবক একটি সুঁচাল লোহার রড নিয়ে উপস্থিত হয় এবং---।

নীলু আজও খবরটির চারদিকে লাল পেনসিল দিয়ে দাগ দিল। তারপর বাবাকে খবরের কাগজটি দিয়ে বলল, 'বাবা, আমাকে একটা কাজ করে দেবে?'

'নিশ্চয়ই দেব। কাজটা কী?'

'আমি মিসির আলি স্যারকে চিঠি লিখেছি। ঐটি তাঁকে পৌঁছে দেবে। তিনি অবশ্যি এখনো ঢাকায় ফেরেন নি। তুমি দরজার নিচ দিয়ে রেখে আসবে, যাতে আসামাত্র পেয়ে যান।'

জাহিদ সাহেব বিস্মিত হয়ে মেয়ের দিকে তাকালেন। নীলু বলল, 'স্যারের খুব বিপদ। খালিগায়ে ছেলেটি স্যারকে মেরে ফেলবে। তাঁকে সাবধান করা দরকার।'

'বলিস কী!'

'আমি যা বলছি, ঠিকই বলছি। তুমি এক্ষুণি যাও। খামের ওপর ঠিকানা লেখা আছে। আমি নিজেই যেতাম, কিন্তু আমার ভালো লাগছে না।'

জাহিদ সাহেব দেখলেন, খামের ওপর পুরানা পল্টনের ঠিকানা লেখা।

১০

পুলিশ কমিশনার রাত এগারটায় পুরানা পল্টন এলাকায় এলেন। থমথম করছে চারদিক। একটি ভিখিরিকেও দেখা গেল না। দোকানপাট পর্যন্ত বন্ধ। তিনি লক্ষ করলেন, একতলার বাসিন্দাদের প্রায় সবাই এই প্রচণ্ড গরমেও জানালা বন্ধ করে শুয়েছে। আতঙ্কের মতো ভয়াবহ কিছুই নেই। এবং পুলিশের শাস্ত্রে আতঙ্কগ্রস্ত মানুষের মতো ভয়াবহ কিছুই নেই। মিছিলের মানুষজন হঠাৎ ক্ষিপ্তের মতো পুলিশের গাড়িতে ঝাঁপিয়ে পড়ে, কারণ রাইফেল হাতে পুলিশকে দেখে তারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়।

সাজ্জাদ হোসেন গাড়ি থেকে নেমে সিগারেট ধরালেন। এ অঞ্চলে টহলপুলিশের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন তাদের জন্যে। কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলবেন। হঠাৎ করেই তাঁর মনে হল, গোরস্থানের ভেতর কিছু ফিক্সড পোস্ট সেন্ট্রি দেয়া দরকার। লুকিয়ে থাকার জন্যে গোরস্থান হচ্ছে আদর্শ জায়গা। কেউ কিচ্ছু টের পাবে না। একসময় আত্মগোপনকারী দেয়াল টপকে ঝাঁপিয়ে পড়বে অসতর্ক পথচারীর ওপর।

তিন জন পুলিশের একটি দল আসছে গল্প করতে করতে। সাজ্জাদ হোসেন লক্ষ করলেন, এদের সঙ্গে টর্চলাইট নেই। অথচ বলে দেয়া হয়েছিল, পাঁচ-ব্যাটারির একটি টর্চলাইট যেন সঙ্গে থাকে। পুলিশ বাহিনীতে একটি কাজও কি কখনো ঠিকমতো করা হবে না!

'হল্ট।'

তিন জন দাঁড়িয়ে পড়ল এবং স্যালুট দিল।

'তোমরা তিন জন কেন? একেকটা দলে দু' জন করে থাকতে বলেছি। তৃতীয় জন এসে জুটল কীভাবে?'

জানা গেল, এই ব্যবস্থা তারা নিজেরা করে নিয়েছে। তিন জন থাকলে নাকি মনে বেশি সাহস থাকে।

'তোমরা কি লোহার রড হাতে একটা লোকের ভয়ে আধমরা হয়ে গেছ? এক জন আনসারের সাহসও তো তোমাদের চেয়ে বেশি।'

ওরা কিছু বলল না। তিনি থমথমে গলায় বললেন, 'মেইন রোড ধরে হাঁটছ কেন? আমি বলেছি না, অলি-গলিতে থাকবে এবং কিছুক্ষণ পরপর বাঁশি বাজাবে? আমি পনের মিনিট এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি, একবারও তো তোমাদের বাঁশি শুনলাম না!'

'বাঁশি শুনলে তো স্যার ঐ ব্যাটা সাবধান হয়ে যাবে। ধরতে পারব না।'

'ঐ ব্যাটার জন্যে আমার মোটেও মাথাব্যথা নেই। বাঁশি বাজানো দরকার অন্যদের সাহস দেবার জন্যে। যাতে সবাই বুঝতে পারে, ভালো পুলিশ-পাহারার ব্যবস্থা হয়েছে। বুঝতে পারছ?'

'জ্বি স্যার।'

'আর শোন, রাত একটার পর যাকেই দেখবে, জিজ্ঞাসাবাদ করবে। খালিগায়েই হোক কিংবা কোট-প্যান্ট পরাই হোক। বুঝতে পারছ?'

'জ্বি স্যার।'

সাজ্জাদ হোসেন গোরস্থানে ঢুকলেন। সন্দেহজনক কিছুই কোথাও নেই। টুপিপরা দু'-তিন জন লোক ঘোরাফেরা করছে। এরা গোরস্থানেরই লোক। তবু তিনি তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। ওদের এক জন হাসি মুখে বলল, 'গোরস্থানে কোনো আজেবাজে লোক ঢোকে না স্যার। গোরস্থান হইল গিয়া আল্লাহ্ পাকের খাস জায়গা।'

সাজ্জাদ হোসেন প্রচণ্ড ধমক দিয়ে তাকে থামালেন। তাঁর আঠার বছরের পুলিশী জীবনে তিনি ভয়ঙ্কর সব অপরাধীদের গোরস্থান এবং মসজিদে লুকিয়ে থাকতে দেখেছেন।

'তোমরা সজাগ থাকবে এবং লক্ষ রাখবে।'

'জ্বি আচ্ছা স্যার।'

'কাল থেকে গোরস্থানের ভেতরেও আমি পুলিশ বসাব।'

'জ্বি আচ্ছা স্যার।'

'যত শুয়োরের বাচ্চা!'

ওরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। পুলিশ সাহেব গালটা কাকে দিলেন, বোঝা গেল না। এই লোকের মেজাজ খারাপ। গোরস্থানের ভেতর কেউ এ-রকম গরম দেখায় না। এত সাহস কারো নেই।

সাজ্জাদ হোসেন তাঁর জীপ নিয়ে আরো খানিকক্ষণ এই অঞ্চলে ঘুরলেন। একটা পাগল-ছাগল রড হাতে বের হয়েছে এবং সেই কারণে এ-জাতীয় পুলিশী তৎপরতার কোনো মানে হয় না। কিন্তু এটা করতে হয়েছে, কারণ এক জন মন্ত্রীর শ্বশুরবাড়ি এই অঞ্চলে। এমনিতেই মন্ত্রীদের যন্ত্রণায় প্রাণ বের হয়ে যায়, তার ওপর ইনি হচ্ছেন নন পার্লামেন্টারিয়ান মন্ত্রী। এঁদের গরমই আলাদা।

তিনি মন্ত্রীসাহেবের শ্বশুরবাড়ির সামনে জীপ থামালেন। বাড়ির সামনেই পুলিশ পাহারা আছে। সব ক' জন মন্ত্রীর শ্বশুরবাড়ির সামনে পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করতে হলে তো সর্বনাশ। বিশাল এক পুলিশবাহিনী লাগবে মন্ত্রীদের আত্মীয়স্বজনদের জন্যে।

সাজ্জাদ হোসেনের মুখ তেতো হয়ে গেল। তিনি শব্দ করে থুথু ফেললেন। মিসির আলির বাড়িও এ-অঞ্চলে। ঠিকানা সঙ্গে নেই। ঠিকানা থাকলে এক বার যাওয়া যেত। মিসির আলির কাজের মেয়েটি সম্পর্কেও তিনি কিছু খোঁজখবর নিয়েছেন। হারিয়ে-যাওয়া বেশকিছু মেয়ের সন্ধান পাওয়া গেছে। সেগুলো দিয়ে মিসির আলিকে আপাতত ঠাণ্ডা করা যাবে।

সেন্ট্রি এগিয়ে আসছে।

সাজ্জাদ হোসেন বললেন, 'কী খবর?'

'খবর স্যার ভালোই।'

'সব ঠিকঠাক?'

'জ্বি স্যার। তবে স্যার, এই বাড়ির লোকজন আমার সাথে খুব রাগারাগি করছে।'

'কেন?'

'এরা নাকি দু' জন সেন্ট্রি চেয়েছিল। এক জন দেখে রেগে গেছে।'

'দু' জন লাগবে কেন? এরা কোন দেশের মহারাজ?'

'স্যার, কী বললেন?'

'কিছু বলি নি। যাও, ডিউটি দাও।'

'এরা স্যার জিজ্ঞেস করছিল, তোমাদের ডিউটি অফিসার কে।'

'তাই নাকি?'

'জ্বি স্যার। বলছিল, ব্যাটার চাকরি খাব।'

সাজ্জাদ হোসেন আবার থুথু ফেললেন। মন্ত্রীদের আত্মীয়স্বজনেরা কথায় কথায় চাকরি খেতে চায়। চাকরি ছাড়া ওদের মুখে অন্য কিছু রোচে না। শালা।

'সেন্ট্রি।'

'জ্বি স্যার?'

'যাও, ডিউটি কর। দেখি, আমি আরেক জনকে পাঠাব।'

সাজ্জাদ হোসেন মনে মনে ভাবলেন, 'পুলিশের চাকরি করার মানেই হচ্ছে পদে-পদে অপমানিত ও অপদস্থ হওয়া।

১১

মিসির আলি ঢাকা পৌঁছলেন রবিবার ভোরে। দরজা খুলেই নীলুর চিঠিভর্তি খাম পেলেন। চিঠিতে একটিমাত্র লাইন—'স্যার, আপনার বড় বিপদ।' কিসের বিপদ—কী সমাচার, কিছুই লেখা নেই।

মেয়েদের নিয়ে এই সমস্যা। তাদের সব চিঠিতেই অপ্রয়োজনীয় কথার ছড়াছড়ি। শুধু প্রয়োজনীয় কথাগুলোর বেলায় তারা শর্টহ্যাণ্ড ভাষা ব্যবহার করে। আজ পর্যন্ত তিনি মেয়েদের এমন কোনো চিঠি পান নি, যেখানে জরুরি কথাগুলো গুছিয়ে লেখা।

তবে নীলু একটি কাজ করেছে। নিজের বাড়ির ঠিকানা দিয়েছে। এক্ষুণি চলে যাওয়া যায়। মিসির আলি গেলেন না। হাত-মুখ ধুয়ে প্ল্যান করতে বসলেন, আজ সারাদিনে কী কী করবেন।

(ক) হানিফার খোঁজ নেবেন।

(খ) ইউনিভার্সিটিতে যাবেন।

(গ) ফিরোজের খোঁজ নেবেন।

(ঘ) সাজ্জাদ হোসেনের সঙ্গে দেখা করবেন।

(ঙ) আজমলের সঙ্গে দেখা করবেন।

এই পাঁচটি কাজ শেষ করবার পর নীলুর কাছে যাওয়া যেতে পারে। তাঁর এমন কোনো বিপদ নেই যে, এক্ষুণি ছুটে যেতে হবে। তবে কেন জানি নীলুর কাছে আগে যেতে ইচ্ছা হচ্ছে। ফ্রয়েডীয়ান কোনো ব্যাখ্যা এর নিশ্চয়ই আছে।

ট্রেনে আসতে-আসতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। এবং আশ্চর্য, নীলুকে স্বপ্নে দেখলেন। স্বপ্নটি এমন ছিল, যে, জেগে উঠে তাঁর নিজেরই লজ্জা করতে লাগল। কেবলই মনে হতে লাগল, তাঁর পাশে বসে থাকা লোকগুলোও তাঁর স্বপ্নের ব্যাপারটা জেনে ফেলেছে। তিনি যে খানিকক্ষণ আগেই একটি রূপবতী মেয়ের হাত ধরে নদীর ধারে হাঁটছিলেন, এটা সবাই জানে।

হানিফা সুস্থ।

তবে অনেক রোগা হয়ে গেছে। মুখ শুকিয়ে হয়েছে এতটুকু। হানিফার কাছে তিনি ঠিক সময়েই এসেছেন। আজই তার রিলিজ-অর্ডার হবে। আর এক দিন দেরি হলে মুশকিল হয়ে যেত। মেয়েটি ঘাবড়ে যেত। কারণ এই সাত দিন কেউ তাকে দেখতে আসে নি। অথচ বাড়িওয়ালা করিম সাহেব বারবার বলেছেন, তিনি প্রতিদিন একবার এসে খোঁজ নেবেন। আমাদের দেশের মানুষদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে, যে-কাজগুলো তারা করতে পারবে না, সেই কাজগুলোর দায়িত্ব তারা সবচেয়ে আগ্রহ করে নেবে।

'চল হানিফা, বাসায় যাই।'

'চলেন।'

'তুই তো দারুণ রোগা হয়েছিস রে বেটি!'

'আপনেও রোগা হইছেন।'

'অসুখে পড়ে গিয়েছিলাম রে হানিফা। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছিল, তাতে মনে হয়েছিল নিউমোনিয়াতে ধরেছে। মরতে-মরতে বেঁচে গেছি। তুই বস্ এখানে, আমি রিলিজ-অর্ডারের ব্যবস্থা করি।'

রেসিডেন্ট ফিজিসিয়ান বললেন, 'হানিফা মেয়েটি আপাতত সুস্থ, কিন্তু আবার অসুস্থ হয়ে পড়বে।'

'কেন?'

'ওর প্রবলেমটা হার্টের একটা ভাল্বে। তার জন্মই হয়েছিল একটা ডিফেকটিভ ভাল্ব নিয়ে। তার ছোটবেলায় ডাক্তাররা চেষ্টা করেছেন ভাল্বটা রিপেয়ার করতে। ওপেন হার্ট সার্জারি হয়েছে তার।'

'কী করে বুঝলেন? মেয়েটি বলেছে?'

'না, সে কিছু বলে নি। জিজ্ঞেস করেছিলাম। তার কিছু মনেটনে নেই। তবে আমাদের বুঝতে না পারার কোনো কারণ নেই। ওর হার্ট আবার ওপেন করতে হবে।

'এখানে করা যাবে?'

'আগে যেখানে করা হয়েছিল, সেখানে করলেই ভালো হয়। আমাদের এখানে এত ছোট বাচ্চাদের ওপেন হার্ট সার্জারির সুযোগ নেই।'

'আপনার ধারণা, ওর অপারেশনটা এ দেশে হয় নি।?'

'না, এ-দেশে হয় নি। পশ্চিমা কোনো দেশে হয়েছে। কেন, আপনি জানেন না?'

'জ্বি-না, আমার জানা নেই।'

মিসির আলি চিন্তিত মুখে হানিফাকে নিয়ে ঘরে ফিরলেন। সাজ্জাদ হোসেনের সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার। সে কতদূর কি করেছে জানা দরকার, বা আদৌ কিছু করেছে কি না। কিছু না করারই কথা। এ-দেশের বেশির ভাগ লোকই কোনো কাজ করতে চায় না। 'কেন করতে চায় না'--এই নিয়ে কিছু ভালো গবেষণা হওয়া দরকার। কর্মবিমুখতার কারণটি কী? যদি একাধিক কারণ থেকে থাকে, সেগুলোই-বা কী?

সাজ্জাদ হোসেনকে টেলিফোনে পাওয়া গেল না। যতবারই টেলিফোন করা হয়, ততবারই খুব চিকন গলায় এক জন পুরুষ মানুষ বলেন, 'উনি ব্যস্ত আছেন। মীটিং চলছে।'

মিসির আলি বড় বিরক্ত হলেন। পুলিশরা এত মীটিং করে, তাঁর জানা ছিল না। ঘন্টার পর ঘন্টা এয়ার কন্ডিশন্ড ঘরে বসে মীটিং করার মতো সময় তো তাদের থাকার কথা নয়। এগুলো হচ্ছে করপোরেট অফিসগুলোর কাজ--শুধু কথা বলা, বকবক করা। কিছুক্ষণ পরপর কফি খাওয়া। সুখে সময় কাটানো যার নাম।

সাজ্জাদ হোসেনের সময়টা অবশ্যি খুব সুখে কাটছিল না। মন্ত্রীর শাশুড়ির কল্যাণে তিনি একটি বিপজ্জনক অবস্থায় আছেন। আই জি মতিয়ুর রহমান পি এস পি'র কাছে তাঁকে জবাবদিহি করতে হচ্ছে।

আই জি মতিয়ুর রহমান ছোটখাটো মানুষ, কিন্তু দারুণ কড়া অফিসার। পুলিশমহলে একটি চালু কথা আছে--মতিয়ুর রহমানের সামনে দাঁড়ালে হাতিরও বুক কাঁপে। সাজ্জাদ হোসেনের বুক কাঁপছিল।

মতিয়ুর রহমান বললেন, 'দু' জন সেন্ট্রি চেয়েছিল, দিতেন দু' জন, কেন ঝামেলা করলেন?'

'আমি স্যার দিতাম, পরে অফিসে ফিরে মনে হল খামোকা ....।'

'এক জন মন্ত্রীর শাশুড়ির ইচ্ছা-অনিচ্ছা অনেক বড় ব্যাপার, কেন বুঝতে পারেন না? তা ছাড়া যে এক জন সেন্ট্রি ছিল, সকালবেলা দেখা গেল সে ঘুমাচ্ছে।'

'সারা রাত ডিউটি দিয়েছে স্যার, কাজেই ভোরবেলা ঘুম এসে গেছে। পুলিশ হলেও তো স্যার এরা মানুষ।'

'এখন বলেন, আমি কী করি। মিনিস্টার সাহেব ভোর সাতটায় আমাকে টেলিফোন করে বলেছেন, আপনার বিরুদ্ধে অ্যাকশান নেবার জন্যে।'

সাজ্জাদ হোসেন ক্লান্ত গলায় বললেন, 'কী আর করবেন স্যার। অ্যাকশান নিতে বলেছে, অ্যাকশান নেন।'

মতিয়ুর রহমান সাহেব ফাইল থেকে একটি চিঠি বের করে বললেন, 'আমি

মিনিস্টার সাহেবকে এই চিঠিটা পাঠিয়েছি। কী লিখেছি শুনুন—'

জনাব,

পুলিশ কমিশনার সাজ্জাদ হোসেনের বিরুদ্ধে আপনি আমাকে যে-অ্যাকশান নেবার কথা বলেছেন, সেই পরিপ্রেক্ষিতে আপনাকে জানাচ্ছি যে, সাজ্জাদ হোসেন পুলিশ-বাহিনীর এক জন দক্ষ, নিষ্ঠাবান এবং সৎ অফিসার। একাত্তুরের মুক্তিযুদ্ধে অসাধারণ বীরত্বের জন্যে তাকে বীর বিক্রম উপাধিতে সম্মানিত করা হয়েছে। এ-জাতীয় এক জন অফিসারের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে লিখিত অভিযোগের প্রয়োজন আছে। আপনার অভিযোগের উপর ভিত্তি করে তদন্ত হবে। তদন্তকারী অফিসার সাজ্জাদ হোসেনকে দোষী সাব্যস্ত করবার পরই ব্যবস্থা গ্রহণের প্রশ্ন ওঠে।

বিনীত

মতিয়ুর রহমান চিঠি পড়া শেষ করে বললেন, 'ঠিক আছে?'

'থ্যাংক য়্যু ভেরি মাচ স্যার।'

'থ্যাংকস দেবার কিছু নেই। সত্যি কথাই লিখেছি। তবে, আপনার উচিত আরো ট্যাক্টফুল হওয়া।'

'যাব স্যার?'

'হ্যাঁ, যান।'

'স্যার, একটা কথা বলি?'

'বলুন।'

'স্যার, আমার ইচ্ছা হচ্ছে কালো একটা প্যান্ট পরে খালিগায়ে হাতে একটা লোহার রড নিয়ে যাই এবং ঐ শাশুড়ির মাথায় একটা বাড়ি দিয়ে আসি।'

কথাটা বলেই সাজ্জাদ হোসেনের মনে হল, একটা বড় ভুল হয়ে গেল। আই জি এমন কোনো ব্যক্তি নন, যিনি রসিকতা সহজভাবে নেবেন। কিন্তু অবাক কাণ্ড, মতিয়ুর রহমান সাহেব হেসে ফেললেন। মুচকি হাসি নয়। হা হা করে হাসি।

সাজ্জাদ হোসেনের জীবনে এটা একটা স্মরণীয় দিন। তাঁর মনের গ্লানি কেটে যেতে শুরু করেছে। তিনি অফিসে ফিরে দুটি সংবাদ শুনলেন—-দশ মিনিট পরপর কে নাকি তাঁকে খোঁজ করছে এবং গত রাতে নগ্নগাত্র ত্রাস একটি ছ' বছরের ছেলেকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। তার ডেডবডি কিছুক্ষণ আগেই রিকভার করা হয়েছে। চেনার উপায় নেই। লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে থেঁতলে ফেলা হয়েছে।

সাজ্জাদ হোসেন তক্ষুণি জীপ নিয়ে বেরুলেন।

'হ্যালো, এটা কি ফিরোজদের বাসা?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কে কথা বলছেন?'

'আপনি কে এবং আপনার কাকে দরকার, সেটা বলুন।'

'আমার নাম মিসির আলি'

'ও আচ্ছা। আমি ফিরোজের মা।'

'স্লামালিকুম আপা।'

'ওয়ালাইকুম সালাম।'

'আমি সপ্তাহখানেক বাইরে ছিলাম। আপনাদের খবর দিয়ে যেতে পারি নি।'

'ও।'

'গিয়েছিলাম চব্বিশ ঘন্টার জন্যে, ঝামেলায় পড়ে এত দেরি হল। আমি ফিরোজের ব্যাপারেই খোঁজ নিতে গিয়েছিলাম।'

'ও।'

'ফিরোজ কেমন আছে?'

'ভালো।'

'ওকে টেলিফোনটা দিন।'

'ওকে টেলিফোন দেয়া যাবে না।'

'বাসায় নেই।'

'না।'

'কোথায় গিয়েছে? বাইরে?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে আমি বরং রাতের বেলা এক বার টেলিফোন করব।'

'না, রাতের বেলা টেলিফোন করবেন না। ওকে পাওয়া যাবে না।'

'কেন, ও কি রাতে ফিরবে না?'

'না। ও ঢাকার বাইরে।'

'ঢাকার বাইরে—কোথায়?'

'ওর মামার বাড়িতে—বরিশালে।'

'কিন্তু আমি তো বলেছিলাম ওকে দীর্ঘদিন চোখে-চোখে রাখতে হবে।'

'কোনো উত্তর নেই।)

'হ্যালো।'

'বলুন।'

'কী হয়েছে ফিরোজের?'

'কী আবার হবে? কিছুই হয় নি। ও ভালো আছে।'

'কিন্তু আপনার কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে, কিছু-একটা হয়েছে। আপনি কি দয়া করে বলবেন?'

'ওর কিছু হয় নি। ও ভালো আছে। ও আছে তার মামার বাড়িতে।'

'বরিশালে?'

'হ্যাঁ, বরিশালে।'

'আপনি ঠিক কথা বলছেন না। কারণ ফিরোজের মামার বাড়ি বরিশাল নয়। ফিরোজ সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য আমার জানা। দয়া করে আপনি আমাকে বলুন, কী হয়েছে।'

'কিছু হয় নি। অনেকবার তো এই কথা বললাম। তবু কেন বিরক্ত করছেন?'

'ওসমান সাহেবকে দিন। তাঁর সঙ্গে কথা বলব।'

'উনি বাসায় নেই।'

'কখন ফিরবেন?'

'জানি না কখন ফিরবেন।'

'শুনুন আপা, আমি আসছি এই মুহূর্তে।'

মিসির আলি টেলিফোন নামিয়ে রেখে তক্ষুণি ধানমণ্ডি ছুটলেন। কিন্তু ওসমান সাহেবের বাড়ির ভেতর ঢুকতে পারলেন না। দারোয়ান গেট বন্ধ করে বসে আছে। সে কিছুতেই গেট খুলবে না। ওসমান সাহেব এবং তাঁর স্ত্রী—কেউ নাকি বাড়ি নেই। কখন ফিরবেন তারও ঠিক নেই। মিসির আলি বললেন, 'ঠিক আছে, আমি বসার ঘরে অপেক্ষা করব। গেট খোল।'

'সাহেব আর মেমসাহেব বাড়িতে না থাকলে গেট খোলা নিষেধ আছে।

মিসির আলি প্রায় দু' ঘন্টা বন্ধ গেটের ওপাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। কোনো লাভ হল না। নীলুদের বাসা কাছেই কোথাও হবে। ঝিকাতলা ধানমণ্ডি থেকে খুব-একটা দূর নয়। মিসির আলি সেদিকেই রওনা হলেন।

ফিরোজের কথা বারবার মনে আসছে। কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারছেন না। কী হল ছেলেটার? আর যদি কিছু হয়েই থাকে, সবাই মিলে এটা তাঁর কাছে গোপন করছে কেন? রহস্যটা কী? রাতে ফেরবার পথে আরেক বার খোঁজ নিতে হবে।

১২

মিসির আলি নরম স্বরে বললেন, 'আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জন অধ্যাপক। আমার এক ছাত্রী কি এ বাড়িতে---।'

বুড়ো ভদ্রলোক বললেন, 'আসুন, আমি নীলুর বাবা। আমার নাম জাহিদুল ইসলাম।'

'স্লামালিকুম।'

'ওয়ালাইকুম সালাম। বসুন আপনি, নীলু এসে পড়বে।'

'ওকে খবর দিন। আমি বেশিক্ষণ থাকব না, আকাশের অবস্থা ভালো না—ঝড়-বৃষ্টি হবে।'

জাহিদ সাহেব তাঁর মেয়েকে খবর দেয়ার জন্যে মোটেই ব্যস্ত হলেন না। খবর দেয়ার কিছু নেই। নীলু খবর পেয়ে গেছে। দশ মিনিট আগেই সে বলেছে, 'স্যার আমাদের বাসার দিকে রওনা হয়েছেন। এসে পড়বেন কিছুক্ষণের মধ্যে।'

নীলুর মুখ উজ্জ্বল এবং হাসি-হাসি। এইসব জাহিদ সাহেবের ভালো লাগছে না। এক জন মাঝবয়সী অধ্যাপকের জন্যে এত আগ্রহ নিয়ে তাঁর মেয়ে অপেক্ষা করবে কেন?

তিনি একটি সুস্থ-স্বাভাবিক মেয়েকে নিজের পাশে চান--যার কোনো অলৌকিক ক্ষমতা নেই। কী হবে না হবে, যা সে আগে থেকে বলতে পারবে না। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎকে যে গ্রহণ করবে আর দশটি মেয়ের মতো।

মিসির আলি বললেন, 'আমি আপনার এ-বাড়িতে আগে এক বার এসেছি। আনিস সাহেব বলে এক ভদ্রলোক ছিলেন, তাঁর স্ত্রীকে কিছুদিন চিকিৎসা করেছিলাম।'

'আমি জানি।'

'আনিস সাহেব কি এখনো এ–বাড়িতে থাকেন?'

'না।'

'অন্য কোনো ভাড়াটে এসেছে বুঝি?'

'না, বাড়ি ভাড়া দিই না এখন, যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে।'

'এ কথা বলছেন কেন?'

'রানু মেয়েটা এ–বাড়িতে না থাকলে, আজ আমার মেয়ের এ–অবস্থা হত না।

'এত জোর দিয়ে তা বলা কি ঠিক? অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা আমরা কেউ তো জানি না।'

জাহিদ সাহেব গম্ভীর হয়ে গেলেন। রোগা, কালো এবং কিঞ্চিৎ কুঁজো হয়ে বসে থাকা এই লোকটিকে তাঁর মোটেই পছন্দ হচ্ছে না। নীলু এই লোকটির মধ্যে কী দেখেছে? জাহিদ সাহেবের ইচ্ছা হচ্ছে উঠে চলে যেতে। কিন্তু বাইরের একটি লোককে একা বসিয়ে রেখে উঠে চলে যাওয়া যায় না। তিনি লক্ষ করলেন, ভদ্রলোক সিগারেট ধরিয়েছেন। তাঁর সামনেই অ্যাশট্রে তবু তিনি চারদিকে ছাই ফেলছেন। কী কুৎসিত স্বভাব! এরা ছাত্রদের কী শেখাবে? নিজেরাই তো কিছু শেখে নি।

মিসির আলি বললেন, 'আপনার আরেকটি মেয়ে ছিল। ওর কি বিয়ে হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় আছে সে?'

'বাইরে।'

বিলুর প্রসঙ্গ উঠলেই জাহিদ সাহেব অনেক কথা বলেন। কিন্তু আজ এই লোকটির সঙ্গে কোনো কথা বলতে ইচ্ছা হচ্ছে না। তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

'মিসির আলি সাহেব।'

'জ্বি?'

'আমার মাথা ধরেছে, আমি একটু শুয়ে থাকব। কিছু মনে করবেন না। আমি নীলুকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'জ্বি আচ্ছা।'

জাহিদ সাহেব নীলুর ঘরে উঁকি দিয়ে অবাক এবং দুঃখিত হলেন। নীলু শাড়ি বদল করেছে। সাধারণ শাড়ি বদলে বেগুনি রঙের চমৎকার একটি শাড়ি পরেছে এবং চুল বাঁধছে। এর মানেটা কী?

'নীলু।'

'জ্বি?'

'তোর স্যার বসে আছেন নিচে।'

'যাচ্ছি বাবা।'

'বেশিক্ষণ ওঁকে আটকে রাখা ঠিক না। আকাশের অবস্থা খারাপ।'

'বাবা, আমি তো ওঁকে আজ রাতে এখানে থেকে যেতে বলব।'

'সে কী! কেন?'

'আমার কথা শেষ হতে অনেক রাত হয়ে যাবে। এত রাতে আমি ওঁকে ছাড়ব না।'

'কথাটা তাহলে দিনের বেলা বল। কাল ওঁকে আসতে বলে দে।'

'বাবা, ওঁর সঙ্গে আজই আমার কথা বলা দরকার। একটা রাত উনি এখানে থাকলে, তোমার কি কোনা আপত্তি আছে?'

জাহিদ সাহেব হ্যাঁ, না--কিছুই বলতে পারলেন না। নীলু বলল, 'আমাদের গেস্টরুমটা ঠিকঠাক করে রেখেছি। উনি সেখানেই থাকবেন। তুমি এত গম্ভীর হয়ে আছ কেন বাবা? আপত্তি থাকলে বল--আমার আপত্তি আছে।'

'আমার আপত্তি আছে।'

'আপত্তিটা কেন?'

'ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে তোর এত কিসের খাতির?'

'খাতির কিছু নেই বাবা। উনি আমার টীচার এবং চমৎকার এক জন টীচার। আমি অনেক কিছু শিখেছি তাঁর কাছ থেকে। তাঁর প্রতি আমার অন্য রকম একটা শ্রদ্ধা আছে।'

'এই জন্যেই কি এত শাড়ি-গয়না পরে সাজতে শুরু করেছিস?'

'না বাবা, সে জন্যে সাজছি না এবং তুমি যা ভাবছ তাও ঠিক না। আমি এত সাজগোজ করছি, কারণ স্যার রিকশা করে আসতে আসতে ভাবছিলেন, আমাকে দেখবেন বেগুনি রঙের একটা শাড়িপরা অবস্থায়। কাজেই আমি এইভাবে সেজেছি। রহস্যময় সবকিছুতে স্যারের অবিশ্বাস আছে, আমি সেটা দূর করতে চাই। চলে যেও না বাবা, আমার কথা এখনো শেষ হয় নি। এই স্যার রানু আপার ব্যাপারটা খুব ভালো জানেন। রানু আপার রহস্যের সঙ্গে আমার রহস্যের একটা মিল আছে। সেই মিল নিয়ে স্যারের সঙ্গে আমি কথা বলব।'

নীলু দম নেয়ার জন্যে থামল। জাহিদ সাহেব কী বলবেন, ভেবে পেলেন না।

'বাবা।'

'বল।'

'স্যার যদি আজ রাতে এ বাড়ির গেস্টরুমে থাকেন, তোমার কি খুব বেশি আপত্তি হবে?'

'না।'

'আমি যখন স্যারের সঙ্গে কথা বলব, তখন তুমি ইচ্ছা করলে আমার সঙ্গে থাকতে পার।'

'না, আমি শুয়ে থাকব, আমার মাথা ধরেছে।'

'না বাবা, তোমার মাথা ধরে নি। তুমি আমার স্যারকে খুবই অপছন্দ করছ বলে এ-রকম করছ। বাবা, তোমাকে শুধু একটা কথা বলি--মানুষ হিসেবে উনি প্রথম শ্রেণীর। তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছ না, তাই না?'

'বিশ্বাস করব না কেন? করছি।'

'না, তুমি করছ না। তাতে অবশ্যি কিছু যায়-আসে না, তবে তুমি যদি বিশ্বাস করতে, তাহলে আমার ভালো লাগত। ঠিক আছে বাবা, তুমি যাও, শুয়ে থাক। রাত দশটার সময় টেবিলে ভাত দেব, তখন তোমাকে ডাকব।'

নীলু বসার ঘরে ঢুকল নিঃশব্দে। মিসির আলি চাঁপা ফুলের হালকা একটা সুবাস পেয়ে চমকে পেছনে ফিরলেন। নীলু বলল, 'কেমন আছেন স্যার?'

তিনি কোনো জবাব দিতে পারলেন না। তাঁর দারুণ অস্বস্তি ও লজ্জা লাগতে লাগল।

একটা বিব্রতকর অবস্থা। কারণ তিনি রিকশায় আসতে-আসতে নীলুকে যেভাবে দেখবেন কল্পনা করেছিলেন, সে ঠিক সেভাবেই সেজেছে। কাকতালীয় মিল বলে একে উড়িয়ে দেয়া যাবে না। দুটি কারণে এ রকম হতে পারে। হয়তো নীলু এ-রকম সেজে বসে ছিল। তিনি তাঁর ই এস পি-র মাধ্যমে তা টের পেয়েছেন। এটা সম্ভব নয়, কারণ মিসির আলি খুব ভালো করেই জানেন, তাঁর কোনো ESP ক্ষমতা নেই। দ্বিতীয় কারণটি যদি সত্যি হয়, তাহলে বড় অস্বস্তির ব্যাপার হবে। তিনি রিকশায় আসতে-আসতে যা ভাবছিলেন, নীলু তা টের পেয়েছে এবং সেইভাবে সেজেছে। এ রকম হবার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

মিসির আলি রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছলেন। তাঁর মনে নীলু সম্পর্কে যে-সব কল্পনা আছে, তা তিনি আড়াল করে রাখতে চান। বিশেষ করে ট্রেনে আসতে-আসতে যে স্বপ্নটা দেখেছেন। এটি যদি নীলু টের পায়, তাহলে বড় লজ্জার ব্যাপার হবে। তিনি মনে মনে বলতে লাগলেন, 'দেখ নীলু, স্বপ্নের ওপর আমার হাত নেই। স্বপ্ন হচ্ছে স্বপ্ন।'

কিন্তু মনোবিজ্ঞানের এক জন শিক্ষক হিসেবে তিনি জানেন, স্বপ্ন শুধু স্বপ্ন নয়। অবচেতন কামনা-বাসনার ছবি। তিনি তাকালেন নীলুর দিকে। মেয়েটির মুখে হাসি। ছোটদের দুষ্টুমি দেখে বড়রা যে-রকম হাসে, সে-রকম।

নীলু বলল, 'স্যার চলুন, আমরা বারান্দায় গিয়ে বসি।'

'আমি বেশিক্ষণ বসব না নীলু। আকাশের অবস্থা ভালো না, ঝড় হবে।'

'হলে হবে। ঝড়-বৃষ্টি নিয়ে ঠিক এই মুহূর্তে আপনাকে ভাবতে হবে না।'

বারান্দায় অন্ধকার। সেখানে পাশাপাশি দুটি বেতের চেয়ার দেয়া আছে। গ্রিল থাকা সত্ত্বেও বারান্দায় বসে অনেকখানি আকাশ দেখা যায়, যে-আকাশে অনবরত বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। মিসির আলি বললেন, 'কী বলবে তুমি, বল।'

নীলু বলল, 'আপনি একবার ক্লাসে ESP-র ওপর বলেছিলেন। আপনার মনে আছে?'

'আছে।'

'আমার এবং আমার কয়েকজন বন্ধুর ESP আছে কি না তা পরীক্ষা করলেন। মনে আছে?'

'হ্যাঁ, মনে আছে। ''জেনার কার্ড'' দিয়ে পরীক্ষা।'

'সেই পরীক্ষায় আমরা কেউ পাস করতে পারি নি। তার মানে, আমাদের কারোরই এক্সট্রা সেনসরি পারসেপশান ক্ষমতা নেই।'

'হুঁ, তা ঠিক। যাদের লজিক খুব তীক্ষ্ণ, তাদের এটা থাকে না। নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের, যাদের লজিক খুব দুর্বল--তাদের থাকে।'

'স্যার, আমি জানি না আমি এখন একটি নিম্নশ্রেণীর প্রাণী কিনা, কিন্তু আমার ESP ক্ষমতা অনেক বেশি। ঠিক এই মুহূর্তে আপনি কী ভাবছেন, আমি বলে দিতে পারি।'

নীলু বলতে-বলতে হেসে ফেলল। এবং হাসি ঢাকার জন্যে অন্যদিকে মুখ ফেরাল। মিসির আলি খুব লজ্জায় পড়ে গেলেন। কারণ, তিনি একটি আপত্তিকর ভাবনা ভাবছিলেন। তিনি ভাবছিলেন--নীলুর সঙ্গে রিকশা করে যাচ্ছেন। প্রচণ্ড বৃষ্টিতে দু'

জনেই ভিজে জবজবে। হুড তোলা এবং পর্দা ফেলা। রিকশাওয়ালা বাতাস কাটিয়ে বহু কষ্টে এগুচ্ছে। তিনি নীলুর হাত ধরে আছেন।

'স্যার।'

'বল।'

'শুধু শুধু আপনি এত লজ্জা পাচ্ছেন কেন? আমরা সবাই তো এ-রকম কত অদ্ভুত অদ্ভুত চিন্তা করি, এবং এটাই তো স্বাভাবিক।'

'হুঁ, তা ঠিক। আমার সঙ্গে কী বলতে চাচ্ছিলে বল। আমি বেশিক্ষণ থাকব না। ঝড় আসবে।'

বলতে না বলতেই বড়-বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। বাতাস বইতে শুরু করল এবং কিছুক্ষণের মধ্যে ইলেকট্রিসিটি চলে গিয়ে চারদিক অন্ধকারে ডুবে গেল। নীলু মৃদু স্বরে বলল, 'রানু আপাকে তো আপনি ভালো মতন চিনতেন, তাই না স্যার?'

'হ্যাঁ।'

'রানু আপার সঙ্গে আমার কী কী মিল আছে?'

'কোনো মিল নেই। প্রতিটি মানুষই আলাদা। এক জন মানুষের সঙ্গে অন্য এক জন মানুষের মিল থাকে সামান্যই।'

'কিন্তু রানু আপার অসম্ভব ইএসপি ক্ষমতা ছিল। ছিল না?'

'তা ছিল।'

'আমারও আছে। আছে না?'

'হ্যাঁ, আছে।'

'রানু আপা কি আপনাকে কখনো বলেছিল, তার ভেতরে এক জন দেবী বাস করেন?'

'বলেছিল।'

'আপনি বিশ্বাস করেন নি?'

'না, করি নি। এইসব ছেলেমানুষি জিনিস বিশ্বাস করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে।'

'স্যার, রানু আপা যা বলত, এখন আমি যদি তা-ই বলি--আপনি বিশ্বাস করবেন না?'

'না।'

'পৃথিবীতে অনেক রহস্যময় ব্যাপার আছে স্যার।'

'একসময় ঝড়-বৃষ্টিকেও রহস্যময় মনে করা হত, এখন করা হয় না। মানুষের জ্ঞান, মানুষের বুদ্ধি রহস্যময়তাকে সরিয়ে দিচ্ছে। এই পৃথিবীতে যত অলৌকিক ব্যাপার আছে, তার প্রতিটির পেছনে আছে একটি লৌকিক ব্যাখ্যা।'

মিসির আলি সিগারেট ধরালেন এবং বক্তৃতার ভঙ্গিতে বলতে লাগলেন--

'দেখ নীলু, তুমি বলছ, তোমার ভেতর এক জন দেবী আছেন। সেই দেবী যদি এই মুহূর্তে তোমার ভেতর থেকে বের হয়ে আসেন এবং আমাকে বলেন ''এই যে মিসির আলি সাহেব।'' তাহলেও আমি ব্যাপারটা বিশ্বাস করব না। আমি খুঁজব একটা লৌকিক ব্যাখ্যা।'

'কী হবে সেই ব্যাখ্যা?'

'আমি যা দেখব, মনোবিজ্ঞানীর ভাষায় তার নাম হেলুসিনেশন। কিছু-কিছু ড্রাগস্ আছে, যা খেলে হেলুসিনেশন হয়। যেমন এলএসডি। ইংল্যাণ্ডে আমি এক ছাত্রকে দেখেছিলাম--সে এলএসডি খেত যিশুখ্রিস্টকে দেখার জন্যে। এলএসডি খেলেই সে যিশুখ্রিস্টকে দেখতে পেত। তুমি বুঝতেই পারছ, সে যা দেখত, তা হেলুসিনেশন।'

নীলু দীর্ঘ সময় চুপ করে বসে রইল। বৃষ্টির বেগ বাড়ছে। এক-একটা বাতাসের ঝাপটা এসে গা ভিজিয়ে দিচ্ছে, তবু দু' জনের কেউ নড়ল না। চারদিকে গাঢ় অন্ধকার। শুধু মিসির আলির সিগারেটের আলো ওঠানামা করছে।

নীলু ক্ষীণ স্বরে বলল, 'স্যার।'

'বল।'

'আমি একটি খারাপ লোকের হাতে পড়েছিলাম স্যার। একটা ভয়ঙ্কর খারাপ লোক আমাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নির্জন একটা ঘরে নিয়ে গিয়েছিল। সে একটা ক্ষুর নিয়ে এসেছিল আমাকে মারতে। তখন সেই দেবী আমাকে রক্ষা করেন। সমস্ত ব্যাপারটা আমার দেখা। দেবীকেও আমি দেখেছি। একটি অপূর্ব নারীমূর্তি।'

'তুমি বলতে চাও, তারপর থেকে সেই দেবী তোমার সঙ্গে আছে?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি যা দেখেছ, তার যে একটা লৌকিক ব্যাখ্যা হতে পারে--তা কি তুমি ভেবেছ?'

'সবকিছুর ব্যাখ্যা নেই স্যার।'

'চেষ্টা করে দেখি, এর একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করানো যায় কিনা।'

'ঠিক আছে, চেষ্টা করুন।'

'রানু মেয়েটির সঙ্গে তোমার খুব ভাব ছিল। তার কাছ থেকেই দেবীর ব্যাপারটি তুমি শুনেছ। একটা নতুন ধরনের কথা। রোমান্টিক ফ্লেভার আছে দেবীর ব্যাপারটায়, কাজেই জিনিসটা তোমার মনে গেঁথে রইল। তুমি নিজে যখন বিপদে পড়লে, ঐ জিনিসটাই উঠে এল তোমার মনের ভেতর থেকে। একটা হেলুসিনেশন হল। তীব্র মানসিক চাপ এবং তীব্র হতাশা থেকে এই হেলুসিনেশনের জন্ম। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় একে বলে stress induced hallucination.

'ঐ খারাপ লোকটি মারা গেল কীভাবে?'

'তার মৃত্যু হয়েছে স্বাভাবিক কারণে। পা পিছলে উল্টে পড়ে মাথায় আঘাত পেয়েছে বা এইজাতীয় কিছু। এখানে দেবীর কোনো ভূমিকা নেই। লোকটির সুরতহাল রিপোর্ট থেকেই তার মৃত্যুর কারণ বের হয়ে আসা উচিত। কী ছিল পোস্ট মর্টেম রিপোর্টে?'

মিসির আলি প্রশ্নের জবাবের জন্যে অপেক্ষা করলেন। কোনো জবাব পাওয়া গেল না। নীলু মনে হচ্ছে গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে। অন্ধকারে পরিষ্কার কিছু দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু কেন জানি তাঁর মনে হল, মেয়েটি কাঁদছে। কাঁদবে কেন সে? কাঁদার মতো কোনো কথা কি তিনি বলেছেন?

'নীলু।'

'জ্বি।'

'আমি এখন উঠি? আমার যাওয়া দরকার। এ-বৃষ্টি কমবে না। যত রাত হবে, তত

বাড়বে। তুমি কি আমাকে আরো কিছু বলবে?'

নীলু জবাব দিল না। মিসির উঠে দাঁড়ালেন।

'তোমার বাবাকে খবর দাও, বিদেয় নিয়ে যাই।'

নীলু কঠিন কণ্ঠে বলল, 'আপনি যাচ্ছেন কোথায়?'

তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, 'বাসায় যাচ্ছি, আর কোথায় যাব?'

'না আপনার বাসায় যাওয়া হবে না। আজ রাতে আপনি এখানে থাকবেন।'

'কী বলছ তুমি!'

'আপনার জন্যে ঘর রেডি করে রেখেছি। সঙ্গে অ্যাটাচ্‌ড্‌ বাথরুম আছে। আপনার কোনো অসুবিধা হবে না।'

'আমি কিছু বুঝতে পারছি না। এখানে কেন থাকব?'

'এখানে থাকবেন, কারণ আজ রাতে লোহার রড নিয়ে একটি ছেলে আপনাকে মারতে যাবে। আমি আপনার সঙ্গে ঠাট্টা করছি না বা বানিয়েও কিছু বলছি না। আমি অনেক কিছুই বুঝতে পারি। ঐ ছেলেটির নাম যদি আপনি জানতে চান, তাও বলতে পারি। কি, জানতে চান?'

মিসির আলি ক্ষীণ স্বরে বললেন, 'ওর কী নাম?'

'ওর নাম ফিরোজ। স্যার, আপনি কি আমি যা বলছি, তা বিশ্বাস করছেন?'

'বুঝতে পারছি না। আমি একটি দ্বিধার মধ্যে পড়ে গেছি।'

'দ্বিধার মধ্যে পড়েন বা না পড়েন--আমি এখান থেকে আপনাকে যেতে দেব না, কিছুতেই ন।'

মিসির আলি লক্ষ করলেন, মেয়েটি কঠিন স্বরে কথা বলছে। তার কথা বলার ধরন থেকেই বলে দেয়া যায়, এই মেয়ে তাকে যেতে দেবে না।

'নীলু, আমার বাসায় কাজের মেয়েটি আছে একা।'

'না, ''ইমা'' আপনার ঘরে নেই। আপনার ফিরতে দেরি দেখে সে বাড়িওয়ালার ঘরে ঘুমুতে গেছে।'

'তুমি ওর কী নাম বললে?'

'যা নাম, তা-ই বললাম—ইমা।'

'ইমা?'

'হ্যাঁ, ইমা।'

'ওর বাবার নাম বলতে পারবে?'

'ইমা নাম থেকেই আপনি ওর বাবাকে বের করতে পারবেন।'

বলতে-বলতে নীলু হেসে উঠল। হাসিতে একটি ধাতব ঝঙ্কার। অন্য এক ধরনের কাঠিন্য। যেন এ নীলু নয়, অন্য একটি মেয়ে। অচেনা এক জন মেয়ে।

'স্যার আসুন, আপনাকে আপনার ঘর দেখিয়ে দিই। ড্রয়ারে মোমবাতি আছে, মোমবাতি জ্বালিয়ে বসে-বসে বৃষ্টির শোভা দেখুন। আমি যাব রান্না করতে।'

'তোমাদের টেলিফোন আছে না?'

'আছে। দিয়ে যাচ্ছি আপনার ঘরে। যত ইচ্ছা টেলিফোন করুন।'

টেলিফোনে অনেক চেষ্টা করেও ফিরোজদের বাড়ির কাউকে ধরা গেল না। হয় টেলিফোন নষ্ট, কিংবা রিং হচ্ছে, কেউ ধরছে না। আশ্চর্য ব্যাপার।

বাড়িওয়ালা করিম সাহেবকে টেলিফোন করলেন। করিম সাহেব জেগে ছিলেন এবং তিনি জানালেন হানিফা তাঁর বাসাতেই আছে। ঘুমুচ্ছে।

মিসির আলি মোমবাতি জ্বালিয়ে গেস্টরুমে বসে রইলেন একা-একা। এখনো ইলেকট্রিসিটি আসে নি। বাজ পড়ে কোনো ট্রান্সফরমার পুড়েটুড়ে গেছে হয়তো। কেউ ঠিক করবার চেষ্টা করছে না। এ দেশে কেউ কোনো কিছু ঠিক করবার জন্যে ব্যস্ত নয়। শহর অন্ধকারে ডুবে আছে তো কী হয়েছে? থাকুক ডুবে। দুষ্ট লোকেরা অন্ধকারে বেরিয়ে আসবে? আসুক বেরিয়ে। আমরা কেউ কারো জন্যে কোনো মমতা দেখাব না। মমতা এ-যুগের জিনিস নয়।

কিন্তু সত্যি কি নয়? মমতা কি কেউ-কেউ দেখাচ্ছে না? নীলু যে তাঁকে আটকে রাখল, তার পেছনে কি মমতা কাজ করছে না?

সে কেন তাঁকে এই মমতাটা দেখাচ্ছে? কেন, কেন? তাঁর ভুরু কুঞ্চিত হল। কপালের শিরা দপদপ করতে লাগল। জ্বর আসছে নাকি?

তিনি আবার সিগারেট ধরালেন। প্যাকেট শূন্য হয়ে আসছে। রাত কাটবে কী করে? এ বাড়িতে এখনও কোনো কাজের লোক তাঁর চোখে পড়ে নি, যাকে সিগারেট আনার জন্যে অনুরোধ করা যায়।

'স্যার, আপনার চা।'

নীলু এসে দাঁড়িয়েছে। মোমবাতির আলোয় কী সুন্দর লাগছে তাকে! মিসির আলি বিব্রত স্বরে বললেন, 'চা তো চাই নি।'

'রান্না হতে দেরি হবে। চা খেয়ে খিদেটা চেপে রাখার ব্যবস্থা করুন।'

তিনি চায়ের পেয়ালা হাতে নিলেন, এবং নিজের অজান্তেই বলে ফেললেন, 'তুমি আমার নিরাপত্তার জন্যে হঠাৎ এত ব্যস্ত হলে কেন?'

নীলু মৃদু হেসে বলল, 'এই প্রশ্নের জবাব এখন দেব না। একদিন নিজেই বুঝতে পারবেন। চায়ে চিনি হয়েছে কি না তাড়াতাড়ি দেখুন। আমি বেশিক্ষণ থাকতে পারব না।'

'হয়েছে।'

নীলু নিঃশব্দে চলে গেল। মিসির আলির হঠাৎ মনে হল, তিনি চাঁপা ফুলের গন্ধ পাচ্ছেন। হালকা সুবাস, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তা গাঢ় হল। তিনি ঘরের ভেতর ফিসফিস কথা শুনলেন। কে কথা বলছে? দমকা বাতাসে মোমবাতি নিভে গেল, এবং তিনি স্পষ্ট শুনলেন, মল পরে হেঁটে যাওয়ার মতো কে যেন তাঁর পাশ দিয়ে হেঁটে গেল। কে কে বলে চেঁচিয়ে উঠতে গিয়েও তিনি থেমে গেলেন। এ-সব মনের ভুল। এ জগতে কোনো রহস্য নেই। আশেপাশে নিশ্চয়ই কোনো চাঁপা ফুলের গাছ আছে। গন্ধ আসছে সেখান থেকেই।

কিন্তু তবু তাঁর মনে হচ্ছে, দরজার ওপাশে পর্দার আড়ালে কেউ-একজন দাঁড়িয়ে আছে, এবং তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। কে সে? অন্য ভুবনের কেউ? নাকি অবচেতন মনে তার জন্ম? পৃথিবীর সমস্ত অশরীরীর জন্মই কি অবচেতন মনে নয়? অবচেতন মন জিনিসটির অবস্থান কোথায়? মস্তিষ্কের নিউরোনে? নিউরোনের বৈদ্যুতিক আবেশই কি আমাদের নানান রকম মায়া দেখাচ্ছে?

তিনি ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেললেন। পর্দাটি খুব নড়ছে। যেন কেউ পর্দা নাড়িয়ে

তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করছে।

তিনি দেয়াশলাই জ্বাললেন। আলো আসুক। আলোর স্পর্শে সব মায়া কেটে যাক। তিনি যেন নিজেকে সাহস দেবার জন্যেই বললেন, 'এ পৃথিবীতে রহস্যের কোনো স্থান নেই।'

১৩

সন্ধ্যাবেলা ওসমান সাহেব নিজে গিয়ে পরীক্ষা করলেন, গেট বন্ধ করা হয়েছে কি না। তালা টেনে-টেনে দেখলেন। দারোয়ানকে বললেন, 'ভোর হবার আগে গেট খুলবে না। কেউ ঢুকতে চাইলে বলবে, বাড়িতে কেউ নেই।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'গেটের তালার চাবি কাউকে দেবে না। এমন কি ফিরোজ যদি চায়, তাকেও দেবে না।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'রাতটা মোটামুটি সজাগ কাটাবে। কোনো শব্দটব্দ হলে বের হয়ে দেখবে কী ব্যাপার।'

'জ্বি আচ্ছা।'

ওসমান সাহেব চিন্তিত মুখে ঘরে ঢুকলেন। ফরিদার সঙ্গে তাঁর দেখা হল, কিন্তু তাঁদের মধ্যে কোনো কথা হল না। দু' জন এমন ভাব করছেন, যেন কেউ কাউকে চেনেন না। অনিদ্রাজনিত কারণে ফরিদার চোখ লাল। তিনি বসে আছেন মূর্তির মতো। ওসমান সাহেব তাঁর সামনের চেয়ারটাতে দীর্ঘ সময় চুপচাপ বসে থেকে মৃদু স্বরে বললেন,'ফিরোজ কেমন আছে?'

ফরিদা জবাব দিলেন না।

ওসমান সাহেব বিরক্ত স্বরে বললেন, 'আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছি। কানে যায় নি?'

ফরিদা কোনো সাড়াশব্দ করলেন না। ঠাণ্ডা চোখে তাকালেন। ওসমান সাহেব চাপা স্বরে বললেন, 'কথার জবাব দাও। ফিরোজ কেমন আছে?'

'ভালো।'

'ভালো মানেটা কী? গুছিয়ে বল।'

'গুছিয়ে বলতে পারব না। তুমি দেখে এস। আর শোন, আমার সঙ্গে এ রকম ভঙ্গিতে কথা বলবে না।'

ফরিদা উঠে গেলেন। রওনা হলেন ফিরোজের ঘরের দিকে। ক্রুদ্ধ আওয়াজ আসছে সে-ঘর থেকে। চাপা আওয়াজ। কোনো মানুষের কণ্ঠ থেকে এ-ধরনের আওয়াজ হওয়া সম্ভব নয়। যে এমন আওয়াজ করছে, সে মানুষ হতে পারে না। ফরিদার গা কাঁপতে লাগল। কী হচ্ছে এ-সব! তিনি কি এগিয়ে যাবেন, না ফিরে আসবেন? এগিয়ে যাওয়ার কোনো ইচ্ছা করছে না, কিন্তু তিনি গেলেন।

কাছাকাছি যাওয়ামাত্র ক্রুদ্ধ গর্জন থেমে গেল। তিনি দেখলেন, ফিরোজ বেশ

ভালোমানুষের মতো চেয়ারে বসে পা দোলাচ্ছে। হাতে একটি বই। সম্পূর্ণ সুস্থ স্বাভাবিক ভাবভঙ্গি। ফরিদা বললেন, 'কেমন আছিস তুই?'

'ভালো। তুমি কেমন আছ মা?'

ফরিদার চোখে পানি এসে গেল। আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে এই প্রথম ফিরোজ এমন স্বরে কথা বলল।

'ফিরোজ, তুই আমাকে চিনতে পারছিস তো?'

'চিনতে পারব না কেন? কী বলছ তুমি!'

'গত দু' দিন তো চিনতে পারিস নি।'

'তোমারও তো আমাকে চিনতে পার নি।'

'আমরা চিনতে পারব না কেন?'

'না, চিনতে পার নি। চিনতে পারলে নিজের ছেলেকে তালাবদ্ধ করে রাখতে না। তোমরা বিশাল একটা তালা দিয়েছ। হা হা হা।'

ফরিদা কথা ঘোরাবার জন্যে বললেন, 'কিছু খাবি ফিরোজ?'

'হ্যাঁ, খাব। কিন্তু মা, টেবিলে খাবার দেবে। তালা খুলে ফেলবে। আমি খাবার ঘরে টেবিল-চেয়ারে বসে খাব।'

ফরিদা কোনো উত্তর দিলেন না। শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন। ফিরোজ যা বলছে তা সম্ভব নয়। তালা খুলে তাকে নিয়ে যাওয়া যাবে না।

'কি মা, কথা বলছ না যে? তালা খুলবে না?'

ফরিদা জবাব দিলেন না।

'কিন্তু মা তালাবন্ধ করে কাউকে আটকে রাখা ঠিক না। খুব অন্যায়। অন্যায় নয়?'

'হ্যাঁ, অন্যায়।'

'বেশ, তালা খোল।'

ফিরোজ উঠে দাঁড়াল। তার কোলের ওপর রাখা বইটি মেঝেতে পড়ে গেল, ফিরোজ সেদিকে ফিরেও তাকাল না। সে এগিয়ে এসে জানালার শিক ধরে দাঁড়াল। ফরিদা জানালার পাশ থেকে একটু দূরে সরে গেলেন।

'দূরে চলে গেলে যে মা? ভয় লাগছে? হা হা হা। খুব ভয় লাগছে, না?'

ফিরোজ জানালার শিক ধরে ঝাঁকাতে লাগল।

ফরিদা ভয়-পাওয়া গলায় বললেন, 'এ-রকম করছিস কেন?'

'লোহার শিকগুলো কেমন শক্ত, তাই দেখছি।'

'এ রকম করিস না বাবা।'

'তালা খুলে দাও, এ রকম করব না। আমি চিড়িয়াখানার জন্তু নই মা, যে, আমাকে খাঁচার মধ্যে বন্দি করে রাখবে। যাও, বাবার কাছে যাও। চাবি নিয়ে এস। বন্ধ ঘরে আমার দম আটকে আসছে। আমি খোলা মাঠে খানিকক্ষণ হাঁটব। যাও, যা করতে বলছি কর।'

ফরিদা বসার ঘরের দিকে এগুলেন। ফিরোজ জানালার শিক ধরে ঝাঁকাচ্ছে। তার মুখ হাসি-হাসি। যেন শিক ঝাঁকানো খুব-একটা মজার ব্যাপার। আনন্দের একটা খেলা। খুব ছোটবেলায় ফিরোজ এ-রকম করত। জানালায় উঠে শিক ধরে ঝাঁকাত।

ওসমান সাহেব অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। কঠিন স্বরে বললেন, 'কী পাগলের মতো

কথা বলছ। তালা খুলব মানে? কী হয়েছে, তুমি জান না?'

ফরিদা চুপ করে রইলেন।

'একটা ছেলে মারা গেছে। তার পরেও তুমি বলছ তালা খুলব।'

'তালা দিয়েই–বা লাভ কী হচ্ছে? ঐ রাতেও তো তালাবন্ধ ছিল। ছিল না?'

ওসমান সাহেব এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারলেন না। হ্যাঁ, ঐ রাতে তালাবন্ধ ছিল। এবং ভোরবেলা ঘর তালাবন্ধই পাওয়া গেছে।

ফরিদা বললেন, 'ঐ ছেলের মৃত্যুর সঙ্গে ফিরোজের কোনো সম্পর্ক নেই। ফিরোজ ঘরেই ছিল।'

'ঘরে থাকলেই ভালো।'

ফরিদা স্বামীর পাশে বসলেন। তাঁর মুখ শান্ত। তাঁর চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল ও তীক্ষ্ণ। ওসমান সাহেব বললেন, 'তুমি কিছু বলবে?'

'হ্যাঁ।'

'বলে ফেল। এভাবে তাকিয়ে থেক না।'

'ফিরোজ প্রসঙ্গে তুমি যে ডিসিসন নিয়েছ, আমার মনে হয় তা ঠিক নয়। তুমি কতদিন তাকে তালাবন্ধ করে রাখবে? ওর চিকিৎসা করাও। মিসির আলিকেই–বা আসতে দিচ্ছ না কেন?'

'ঐ ছেলেটির মৃত্যুর প্রসঙ্গ চাপা না–পড়ার আগে আমি কাউকে এ–বাড়িতে আসতে দেব না। উনি টেলিফোন করলে বলবে––ফিরোজ মামার বাড়ি গেছে।'

'এতে ফিরোজের অসুখ বাড়তেই থাকবে।'

'বাড়ুক। তুমি নিশ্চয়ই চাও না, তোমার ছেলেকে ওরা ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে দিক। চাও?'

'না, চাই না।'

'তাহলে চুপ করে থাক। একটা তালা আছে, আরেকটা তালা লাগাও।'

'ফিরোজকে তুমি শুধু–শুধু সন্দেহ করছ। তালাবন্ধ ঘর থেকে সে কীভাবে বের হবে?'

'তা জানি না। কিন্তু সে বের হয়েছে, এটা আমি যেমন জানি––তুমিও তেমন জান। এই নিয়ে আমি কোনো কথা বলতে চাই না। তুমি অন্য ঘরে যাও। আমাকে একা থাকতে দাও।'

ঝনঝন শব্দ হচ্ছে ফিরোজের ঘরে। সে প্রচণ্ড শব্দে জানালা ঝাঁকাচ্ছে।

ফরিদা নিঃশব্দে কাঁদতে শুরু করলেন। ওসমান সাহেব বের হয়ে এসে কঠিন স্বরে ফিরোজকে বললেন, 'এ–রকম করছিস কেন? স্টপ ইট।'

ফিরোজ হাসিমুখে বলল, 'রাগ করছ কেন বাবা?'

ওসমান সাহেব অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

'দরজা খুলে দাও বাবা। আমি খাবার ঘরে বসে ভাত খাব। খিদে লেগেছে। কি, খুলবে না?'

'লোহার রডটা আমার কাছে দে, আমি তালা খুলে দিচ্ছি।'

'না বাবা, ওটা সম্ভব নয়। লোহার রডটা দেয়া যাবে না।'

'কেন দেয়া যাবে না?'

'ও রাগ করবে।'

'কে রাগ করবে?'

'নাম বললে চিনবে? শুধু-শুধু জিজ্ঞেস করছ কেন? তালা খুলবে কি খুলবে না?'

ওসমান সাহেব জবাব না দিয়ে চলে এলেন। ফিরোজ জানালা ঝাঁকাতে-ঝাঁকাতে খুব হাসতে লাগল।

১৪

থার্ড ইয়ার ফাইনালের ডেট দিয়ে দিয়েছে।

মেডিকেলের ছাত্রদের কারোর দম ফেলার সময় নেই। ক্লাস এখন সাসপেণ্ডেড। আজমল ঠিক করে রেখেছে, সে এখন থেকে নাশতা খেয়ে পড়তে বসবে এবং একটানা পড়বে লাঞ্চ টাইম পর্যন্ত। এক ঘন্টার ব্রেক নেবে লাঞ্চে, তারপর আবার পড়া। তা ছাড়া পাস করার উপায় নেই। নানান দিক দিয়ে খুব ক্ষতি হয়েছে এবছর। প্রতিদিনই কোনো-না-কোনো ঝামেলায় পড়া হচ্ছে না। এ-রকম চললে পরীক্ষা দেয়া হবে না। এবার পরীক্ষায় না বসলে ডাক্তারি পড়া বন্ধ করে দিতে হবে। খরচ চালিয়ে যাবার ক্ষমতা নেই। গ্রামের বাড়ি বিক্রি করে দিলে হত, কিন্তু মা বেঁচে থাকতে তা সম্ভব নয়। তা ছাড়া বিক্রি করেও লাভ হবে না কিছু। ভাঙা রাজপ্রাসাদ কে কিনবে? কার এত গরজ?

আজমল বই নিয়ে বসেই উঠে পড়ল--জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে মিসির আলি ঢুকছেন। তার খুব ইচ্ছা হতে লাগল, বইপত্র নিয়ে অন্য কোনো ঘরে চলে যায়। কিছুক্ষণ খুঁজেটুজে তিনি চলে যাবেন। কিন্তু ভদ্রলোকের যা স্বভাব-চরিত্র, তিনি আবার আসবেন। আবার আসবেন। অসহ্য। কেন জানি আজমল তাঁকে সহ্য করতে পারে না। কেন সহ্য করতে পারে না--এ নিয়েও সে ভেবেছে, কিছু বের করতে পারে নি। লোকটি ভালোমানুষ ধরনের, তবে অসম্ভব বুদ্ধিমান। বুদ্ধিমান কেউ ভালোমানুষ হতে পারে না। ভালোমানুষেরা বোকাসোকা ধরনের হয়।

'ভেতরে আসব?'

আজমল বিরক্তি গোপন করে বলল, 'আসুন।'

'আমি পরশুও এক বার এসেছিলাম। তোমার রুমমেটকে বলে গিয়েছিলাম, আজ সকালে আসব। সে তোমাকে কিছু বলে নি?'

'জ্বি-না, বলে নি। ভুলে গেছে বোধহয়। বসুন।'

মিসির আলি বসতে-বসতে বললেন, 'অনেক দিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা। এর মধ্যে তোমাদের বাড়ি গিয়েছিলাম। জান বোধহয়।'

'জ্বি, জানি। নাজ চিঠি লিখেছিল।'

'খুব যন্ত্রণায় ফেলেছিলাম ওদের। অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম।'

আজমল কিছু বলল না।

মিসির আলি বললেন, 'বেশিক্ষণ তোমাকে বিরক্ত করব না। একটা কথা শুধু জিজ্ঞেস করতে এসেছি।'

'জিজ্ঞেস করুন।'

'তোমাদের বাড়িতে একটা ঘর আছে, যেখানে তোমাদের পূর্বপুরষদের কিছু ছবিটবি আছে। তুমি কি সেই ঘরে ফিরোজকে নিয়ে গিয়েছিলে?'

'জ্বি হ্যাঁ, নিয়ে গিয়েছিলাম।'

'কিন্তু ঐ ঘর তো তালাবন্ধ। ওর চাবি থাকে নাজনীনের কাছে। সে তো বলল, ও ঘর খোলা হয় নি।'

'আমার কাছে একটা চাবি আছে, ও জানে না।'

'খালিগায়ে এক জনের ছবি আছে। ঐ ছবিটা কি ফিরোজকে দেখিয়েছ?'

'সব ছবিই দেখিয়েছি।'

'আমি এই বিশেষ ছবিটি প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করছি। শুনেছি এঁকে ক্ষিপ্ত প্রজারা লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলে। এটা কি সত্যি?'

'জ্বি, সত্যি। শাবল দিয়ে পিটিয়ে মারে।'

'এই গল্পটি কি তুমি ফিরোজের সঙ্গে করেছ?'

'জ্বি–না, করি নি।'

'অন্য কেউ কি করেছে বলে তোমার ধারণা?'

'মনে হয় না। গল্প করে বেড়াবার মতো কোনো ঘটনা এটা না।'

মিসির আলি উঠে পড়লেন। আজমল বলল, 'আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন না?'

'না। উঠি এখন। তুমি পড়াশোনা করছিলে, কর। আর ডিসটার্ব করব না।'

আজমল তাঁকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এল। মিসির আলি বললেন, 'নাজনীন মেয়েটি বড় ভালো। ওকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে। চমৎকার মেয়ে!'

আজমল কিছু বলল না।

মিসির আলি বললেন, 'নাজনীন আমাকে বলেছে শীতের সময় একবার যেতে। আমি কথা দিয়েছি, যাব। এ–শীতেই যাব। যাই আজমল, আর আসতে হবে না।'

তিনি মাথা নিচু করে হাঁটতে লাগলেন। ফিরোজ ছবিটা দেখেছে। জট খুলতে শুরু করছে। এই ছবির ছাপ পড়েছে ফিরোজের চেতনায়। এবং মিসির আলির ধারণা, লোকটির মৃত্যুসংক্রান্ত গল্পটিও সে শুনেছে। লোহার রড নিয়ে তার খালিগায়ে বের হবার রহস্যটি হচ্ছে ছবিতে এবং গল্পটিতে।

বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। মিসির আলি গ্রাহ্য করলেন না। বরং বৃষ্টিতে ভিজতে–ভিজতে এগিয়ে যেতে তাঁর ভালোই লাগছে। ফিরোজের অসুখের পেছনের কারণগুলো দাঁড় করাতে চেষ্টা করতে লাগলেন। অনেকগুলো ঘটনাকে একসঙ্গে মেলাতে হবে। ঘটনাগুলো এ–রকম—

(১) অসম্ভব রূপবতী একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা হল। মেয়েটির পলিও। এই ঘটনাটি তাকে অভিভূত করল।

(২) মেয়েটি তাকে আহত করল, সে কড়া গলায় বলল––আমার হাত ছাড়ুন।

(৩) ফিরোজ খালিগায়ের লোকটির ছবি দেখল, এবং খুব সম্ভব তার মৃত্যুবিষয়ক গল্পটিও শুনল।

(৪) রাতে তার প্রচণ্ড জ্বর হল। জ্বরের ঘোরে ঐ লোকটির ছবি বারবার মনে হল।

(৫) সে নির্জন নদীর পাড় ধরে একা–একা হাঁটতে গেল, তখুনি একটি

হেলুসিনেশন হল।

মিসির আলি বৃষ্টিতে নেয়ে গেছেন। রাস্তার লোকজন অবাক হয়ে তাঁকে দেখছে। ঢালাও বর্ষণ উপেক্ষা করে কেউ এমন নির্বিকার ভঙ্গিতে হাঁটে না।

১৫

সাইদুর রহমান সাহেব অবাক হয়ে বললেন, 'আপনার কী হয়েছে!'

মিসির আলি বললেন, 'শরীরটা খারাপ স্যার।'

'শরীর তো আপনার সবসময়ই খারাপ। এর বাইরে কিছু হয়েছে কি না বলেন। আপনাকে হ্যাগার্ডের মতো দেখাচ্ছে!'

'গত পরশু রাতে কে যেন তালা ভেঙে আমার ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র ভেঙেচুরে তছনছ করেছে।'

'আপনি বাসায় ছিলেন না?'

'আমি তো স্যার প্রথমেই আপনাকে বলেছি তালা ভেঙে ঢুকেছে। কাজেই আমার ঘরে থাকার প্রশ্ন ওঠে না।'

সাইদুর রহমান সাহেব গম্ভীর হয়ে গেলেন।

মিসির আলি বললেন, 'আমি ছুটির অ্যাপ্লিকেশন দিয়েছি। দিন দশেকের ছুটির আমার খুব দরকার।'

সাইদুর রহমান সাহেব মুহূর্তের মধ্যে গম্ভীর হয়ে গেলেন। ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস-ট্রাস তো এমনিতেও হয় না। এর মধ্যে আপনারা ছুটি নিলে তো অচল অবস্থা। এর চেয়ে আসুন, সবাই মিলে ইউনিভার্সিটি তালাবন্ধ করে চলে যাই, কী বলেন?'

মিসির আলি সহজ স্বরে বললেন, 'আপনি কি স্যার আমার সঙ্গে রসিকতা করতে চেষ্টা করছেন?'

'রসিকতা করব কেন?'

'গত দু' বছরে আমি কোনো ছুটি নিই নি। এখন নিতান্ত প্রয়োজনে চাচ্ছি। দিতে না চাইলে দেবেন না। আপনার নিজের কী অবস্থা? এ-বছরে আপনি কি কোনো ছুটি নেন নি?'

'অন্যের সঙ্গে সবসময় একটা কমপেয়ার করার প্রবণতাটা আপনার মধ্যে খুব বেশি। এটা ঠিক না মিসির আলি সাহেব। আপনি সি. এল.-এর ফরমটা রেখে যান, আমি রিকমেন্ড করে দেব।'

মিসির আলি উঠে দাঁড়ালেন। সাইদুর রহমান বললেন, 'উঠবেন না, আপনার সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে। বসুন।'

তিনি বসলেন। জরুরি কথাটা কি আঁচ করতে চেষ্টা করলেন। সাইদুর রহমান সাহেবের মুখ হাসি-হাসি। কাজেই কথাটা মিসির আলির জন্যে নিশ্চয়ই সুখকর হবে না।

'আপনার পার্ট টাইম অ্যাপয়েন্টমেন্টের মেয়াদ তো শেষ হতে চলল। এক্সটেনশনের

জন্যে কী করছেন?'

মিসির আলি বিস্মিত হয়ে বললেন, 'আমাকে কিছু করতে হবে নাকি। আমার তো ধারণা ছিল, আমার কিছু করার নেই। ইউনিভার্সিটি যা করার করবে।'

সাইদুর রহমান সাহেব কিছু বললেন না। তাঁর চোখ-মুখ উজ্জ্বল। এর মানে কী? তাঁকে কি এক্সটেনশন দেয়া হবে না? সেটা তো সম্ভব নয়। যেখানে ফুল টাইম টীচার অ্যাপয়েন্টমেন্ট হবার কথা, সেখানে পার্ট টাইম চাকরির এক্সটেনশন হবে না? এটা কেমন কথা!

'স্যার, আপনি ঠিক করে বলেন তো ব্যাপারটা কি। আমার মেয়াদ শেষ?'

'এখনো কিছু বলা যাচ্ছে না। তবে এক জনের এডহক অ্যাপয়েন্টমেন্ট তো হয়েছে। এখন আর আমাদের টীচারের শর্টেজ নেই।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ তাই। খাজনার থেকে বাজনা বেশি। ছাত্রের চেয়ে টীচারের সংখ্যা বেশি।'

মিসির আলি ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'আমি তো আপনার কোনো ক্ষতি করি নি। আপনি কেন আমার পেছনে লেগেছেন?'

'আরে, এটা কী বলছেন! আমি আপনার পেছনে লাগব কেন? কী ধরনের কথা এ-সব?'

মিসির আলি উঠে দাঁড়ালেন। আর এখানে বসে থাকার কোনো মানে হয় না।

সাইদুর রহমান সাহেব বললেন, 'কি, চললেন?'

'হ্যাঁ, চললাম।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু কর্তাস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা করলে কেমন হয়? তাঁরা কি কিছু করতে পারবেন? পারবেন নিশ্চয়ই। কিন্তু এ-জাতীয় কারোর সঙ্গে তাঁর পরিচয় নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের খুব কমসংখ্যক অধ্যাপককেই তিনি চেনেন।

'স্যার স্লামালিকুম।'

মিসির আলি তাকিয়ে দেখলেন, দু'টি ছাত্র দাঁড়িয়ে আছে। তিনি বললেন, 'তোমরা কিছু বলবে?'

'জ্বি-না স্যার।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে।'

তিনি হাঁটছেন ক্লান্ত ভঙ্গিতে। চাকরি চলে গেলে তিনি অথই পানিতে পড়বেন। সময় ভালো না। দ্বিতীয় কোনো চাকরি চট করে জোগাড় করা মুশকিল। সঞ্চয় তেমন কিছু নেই। ইচ্ছা করলে সঞ্চয় করা যেত। ইচ্ছা করে নি। এ পৃথিবীতে কিছুই জমা করে রাখা যায় না। সব খরচ হয়ে যায়।

মিসির আলি হাঁটতে-হাঁটতে মনে মনে বললেন, I cannot and will not believe that man can be evil.'

তাঁর প্রিয় একটি লাইন। প্রায়ই নিজের মনে বলেন। কেন বলেন? এই কথাটি কি তিনি বিশ্বাস করেন না? যা আমরা বিশ্বাস করি না, অথচ বিশ্বাস করতে চাই, তা-ই আমরা বারবার বলি।

তিনি ঘড়ি দেখলেন। তিনটা বাজে। শরীর খারাপ লাগছে। বাসায় ফিরে যেতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু অনেক কাজ পড়ে আছে। আজমলের সঙ্গে দেখা করা এখনো হয়ে ওঠে

নি। ফিরোজের সঙ্গে দেখা করতে পারেন নি। তার সঙ্গে দেখা করার সব ক'টি প্রচেষ্টা বিফল হয়েছে। অথচ খুব তাড়াতাড়ি দেখা করা দরকার। সাজ্জাদ হোসেনেরই–বা খবর কি? সে কি হানিফা সম্পর্কে কোনো তথ্য পেয়েছে? না কোনো চেষ্টাই করে নি?

নীলুর সঙ্গেও আর দেখা হয় নি। এর মধ্যে দু' বার গিয়েছেন ঝিকাতলায়। দু' বারই বাসার সামনে থেকে চলে এসেছেন। কেন যে তাঁর লজ্জা লাগছিল! লজ্জার কী আছে? কিছুই নেই। তিনি যাচ্ছেন তাঁর ছাত্রীর বাসায়। এর মধ্যে লজ্জার কী?

লাইব্রেরি থেকে একটা বই ইস্যু করার কথা--'ইল্যুশন অ্যান্ড হেলুসিনেশন', ডঃ জিম ম্যাকার্থির বই। প্রচুর কেইস হিস্ট্রি আছে সেখানে। কেইস হিস্ট্রিগুলো দেখা দরকার। কোনোটার সঙ্গে কি ফিরোজের বা নীলুর ব্যাপারগুলো মেলে? পুরোপুরি না–মিললেও অনেক উদাহরণ থাকবে খুব কাছাকাছি। সেগুলো খুঁটিয়ে দেখা দরকার।

মিসির আলি লাইব্রেরিতে চলে গেলেন। সাধারণত যে–বইটি খোঁজা হয়, সে বইটিই পাওয়া যায় না। ভাগ্যক্রমে এটি ছিল। চমৎকার বই। তিন শ'র মতো কেইস হিস্ট্রি আছে। আজ রাতের মধ্যেই শেষ করে ফেলতে হবে। তিনি স্টিভিনশনের 'সমনোমবলিক প্যাটার্ন' বইটিও নিয়ে নিলেন। এটিও একটি চমৎকার বই। তাঁর নিজেরই ছিল। তাঁর কাজের ছেলেটি পুরানো বইয়ের দোকানে বিক্রি করে দিয়েছে। মহা বদমাশ ছিল। তাঁকে প্রায় ফতুর করে দিয়ে গেছে। তিনি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। মানুষ কত বিচিত্র! এই ছেলেটিকে তিনি বিশেষ স্নেহ করতেন। স্নেহ অপাত্রে পড়েছিল। মানুষের বেশির ভাগ স্নেহ–মমতাই অপাত্রে পড়ে।

'কেউ আমার খোঁজ করেছিল, হানিফা?'

'জ্বি–না।'

'চা বানিয়ে আন। দুধ–চিনি ছাড়া।'

হানিফা চলে গেল। তার শরীর বোধ হয় খানিকটা সেরেছে। মুখের শুকনো ভাবটা কম। ঘরে ওজন নেবার কোনো যন্ত্র নেই। যন্ত্র থাকলে দেখা যেত, ওজন কিছু বেড়েছে কি না।

মিসির আলি ইজি চেয়ারে শুয়ে জিম ম্যাকার্থির বইটির পাতা ওল্টাতে লাগলেন। কত বিচিত্র কেইস হিস্ট্রিই–না ভদ্রলোক জোগাড় করেছেন।

কেইস হিস্ট্রি নাম্বার সিক্সটি থ্রী
মিস কিং সিলভারস্টোন
বয়স পঁচিশ।
কম্পুটার প্রোগ্রামার।
দি এনেক্স ডিজিটাল্‌স্‌ লিমিটেড
ডোভার। ক্যালিফোর্নিয়া

মিস কিং সিলভারস্টোন থ্যাংকস গিভিংয়ের দু' দিন আগে দি এনেক্স ডিজিটাল্‌স্‌ লিমিটেডের তিনতলার একটি ঘরে কাজ করছিলেন। সন্ধ্যা মিলিয়ে গেছে। অফিসের এক জন গার্ড ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই। গার্ড একতলায় কফিরুমে। সে বলে গেছে মিস সিলভারস্টোন যেন কাজ শেষ করে যাবার সময় তাকে বলে যান।

কাজেই মিস সিলভারস্টোন রাত আটটার সময় কাজ শেষ করে কফিরুমে গেলেন। অবাক কাণ্ড, কফিরুম অন্ধকার। কেউ কোথাও নেই। তিনি ভয় পেয়ে

ডাকলেন--'মুলার।' কেউ সাড়া দিল না।

তিনি ভাবলেন, মুলার হয়তো-বা সোফায় ঘুমিয়ে পড়েছে। কাজেই তিনি ঘরে ঢুকে বাতি জ্বালিয়ে স্তম্ভিত হয়ে দেখলেন—মুলার নেই, তবে সোফায় এক জন অস্বাভাবিক লম্বা মানুষ বসে আছে। মানুষটি নগ্ন। তিনি চেঁচিয়ে ওঠার আগেই লোকটি বলল, 'ভয় পেও না। ভয় পাওয়ার কিছু নেই।'

'তুমি কে?'

'আমি এই গ্রহের মানুষ নই। আমি এসেছি সিরাস নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে। আমি পৃথিবীর একটি রমণীর গর্ভে সন্তানের সৃষ্টি করতে চাই।'

মিস সিলভারস্টোন পালিয়ে যেতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না। তাঁর পা যেন মেঝের সঙ্গে আটকে গেছে। তিনি চিৎকার করতে চেষ্টা করলেন--গলা দিয়ে কোনো শব্দ বের হল না। তিনি অবাক হয়ে লক্ষ করলেন, একে-একে তাঁর গায়ের কাপড় আপনা-আপনি খুলে যাচ্ছে। দেখতে-দেখতে তিনি সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে গেলেন। এই লোকটি তখন উঠে দাঁড়াল। তিনি লক্ষ করলেন, লোকটির গায়ের চামড়া ঈষৎ সবুজ, এবং তার গা থেকে চাপা এক ধরনের আলো বেরুচ্ছে।

লোকটি এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরল। আপনা-আপনি বাতি নিভে গেল।

এই হচ্ছে মিস কিং সিলভারস্টোনের গল্প। তিনি পরবর্তী সময়ে গর্ভবতী হয়ে পড়েন এবং ডাক্তারের কাছে জানতে চান, তাঁর বাচ্চাটির গায়ের রঙ সবুজ হবার সম্ভাবনা কতটুকু।

ম্যাকার্থির একুশ পৃষ্ঠার বিশ্লেষণ আছে কেইস হিস্ট্রির সঙ্গে। তিনি অভ্রান্ত যুক্তিতে প্রমাণ করেছেন, এটি ইলিউশনের একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। মিস সিলভারস্টোন সেখানে দেখেছেন মুলারকে। সিরাস নক্ষত্রপুঞ্জের কোনো আগন্তুককে নয়।

মিসির আলি একটির পর একটি কেইস হিস্ট্রি গভীর আগ্রহে পড়তে শুরু করলেন। তাঁর নিজেরও এ-রকম একটি বই লেখার ইচ্ছা হতে লাগল। সেখানে রানু, নীলু, ফিরোজের কেইস হিস্ট্রি এবং অ্যানালিসিস থাকবে। কিন্তু তা করতে হলে এদের সমস্ত রহস্য ভেদ করতে হবে। তা কি সম্ভব হবে? কেন হবে না? অসম্ভব আবার কী? নেপোলিয়নের কী-একটি উক্তি আছে না এ প্রসঙ্গে—Impossible is the word...? উক্তিটি কিছুতেই মনে পড়ল না।

হানিফা চা বানিয়ে এনেছে। সুন্দর লাগছে তো মেয়েটিকে। মেয়েটির ব্যাপারে খোঁজ নিতে হবে। তিনি কি অলস হয়ে যাচ্ছেন? বোধহয়। বয়স হচ্ছে। আগের কর্মদক্ষতা এখন আর নেই। মিসির আলি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

'আপনের চা।'

'হানিফা চায়ের কাপ সাবধানে নামিয়ে রাখল। তিনি লক্ষ করলেন, মেয়েটি নখে নেলপালিশ লাগিয়েছে। নেলপালিশ তিনি তাকে কিনে দেন নি। সে নিজেই তার জমানো টাকা থেকে কিনেছে। তাঁর নিজেরই কিনে দেয়া উচিত ছিল।

'হানিফা বস্। তোর সঙ্গে গল্পগুজব করি কিছুক্ষণ।'

হানিফা বসল। মিসির আলি বললেন, 'আমি তোর বাবা-মাকে খুঁজে বের করবার চেষ্টা করছি, বুঝলি?'

হানিফা কিছু বলল না। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। তিনি কি পারবেন এর

কোনো খোঁজ বের করতে? না–পারার কী আছে? এটি এমন জটিল কাজ নিশ্চয়ই নয়। সাজ্জাদ হোসেন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁকে তিনি বলেছেন, মেয়েটির নাম 'ইমা' হবার সম্ভাবনা। এই নামের কোনো নিখোঁজ মেয়ের তথ্য আছে কি না দেখতে।

সে চোখ–মুখ কুঁচকে বলেছে, 'বুঝলি কি করে , ওর নাম ইমা?' তিনি সে–প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন নি। দিতে পারেন নি বলাটা ঠিক হল না, বলা উচিত––দিতে পারতেন, কিন্তু দেন নি। সব প্রশ্নের উত্তর সবাইকে দেয়া যায় না। 'ইমা' নামটি কোথেকে পাওয়া, সেটা কাউকে না বলাই ভালো, বিশেষ করে পুলিশকে। পুলিশরা এ–জাতীয় আধিভৌতিক ব্যাপার সাধারণত বিশ্বাস করে না।

পুলিশের ওপর পুরোপুরি নির্ভরও তিনি করেন নি। তাঁর এক ছাত্রকে কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন। তার কাজ হচ্ছে প্রতিদিন পাবলিক লাইব্রেরিতে গিয়ে পুরনো পত্রিকা ঘাঁটা। দেখবে, 'ইমা' নামের নিখোঁজ মেয়ের কোনো খবর ছাপা হয়েছে কি না। এই কাজের জন্য সে ঘন্টায় পঞ্চাশ টাকা করে পাবে। দশ ঘন্টার জন্যে পাঁচ শ' টাকা তিনি তাকে আগেই দিয়ে দিয়েছেন। কাজে যাতে উৎসাহ আসে, তার জন্যে এক হাজার টাকার একটি পুরস্কারের কথাও বলেছেন। যদি সে 'ইমা' নামের কোনো নিখোঁজ বালিকার খবর বের করতে পারে, তাহলে এককালীন টাকাটা পাবে।

এই ব্যাপারে মিসির আলির মন খুঁতখুঁত করছে। 'ইমা' নামটির ওপর এতটা গুরুত্ব দেয়া ঠিক হয় নি। যে–কোনো নিখোঁজ বালিকার সংবাদ সংগ্রহ করতে বলাটাই যুক্তিযুক্ত ছিল। এক জনের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার ওপর এতটা আস্থা রাখা ঠিক নয়। তিনি নিজে এক জন যুক্তিবাদী মানুষ। তাঁর জন্যে এটা অবমাননাকর।

১৬

রাত আটটা।

সাজ্জাদ হোসেন অফিসের টেবিলেই মাথা রেখে চোখ বন্ধ করে বিশ্রাম নেবার চেষ্টা করছেন। গত রাতে এক ফোঁটাও ঘুমোন নি। দিনের বেলায়ও ঘন্টাখানেকের মতো শোবার সময় পাওয়া যায় নি। এবং খুব সম্ভব আজ রাতটাও তাঁর জেগেই কাটবে। লোহার রড হাতের সেই নগ্নগাত্র আগন্তুক তাঁর সর্বনাশ করে দিয়েছে। পুলিশ–বাহিনীর নাকের ডগায় আরেকটি খুন হয়েছে। অবিশ্বাস্য ব্যাপার!

একটি লোক রোজ রাতে লোহার রড হাতে একই জায়গায় ঘোরাঘুরি করবে, অথচ তাকে ধরা যাবে না––এটা কেমন কথা!

'স্যার, আপনার সঙ্গে এক ভদ্রলোক দেখা করতে চান।'

সাজ্জাদ হোসেন টেবিল থেকে মাথা তুললেন। তাঁর অর্ডারলি দাঁড়িয়ে আছে। এই লোকটির কি কোনো বুদ্ধিশুদ্ধি নেই? তাকে বলে দিয়ে এসেছেন, যেন কিছুতেই আগামী দু' ঘন্টার মধ্যে তাঁকে ডাকা না হয়। অথচ দশ মিনিট পার না–হতেই ব্যাটা ডাকতে এসেছে। তিনি বরফশীতল গলায় বললেন, 'বল আমি নেই।'

'স্যার, আমি বলেছি যে আপনি আছেন।'

'তাতে অসুবিধা নেই। এখন গিয়ে বল যে, আমার আগের কথাটা ঠিক না। উনি

আসলে নেই, কোথায় গিয়েছেন কেউ জানে না।'

'স্যার, উনি এক জন সাংবাদিক। পত্রিকা অফিস থেকে এসেছেন।'

সাজ্জাদ হোসেন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন। সাংবাদিকদের বিরাগভাজন হবার মতো সাহস তাঁর নেই। পত্রিকায় দীর্ঘ আর্টিকেল বের হয়ে যাবে--'পুলিশ অফিসারের দুর্ব্যবহার।'

'আসতে বল, আর শোন--দু' কাপ চা দিতে বল।'

সাংবাদিক ভদ্রলোকের নাম মীরউদ্দিন। ভদ্রলোক শুধু যে পেশায় সাংবাদিক তাই নয়--চেহারায়, পোশাকে, এমনকি হাবেভাবেও সাংবাদিক। প্রশ্নের ধরন ডিটেকটিভের মতো। প্রতিটি বাক্যের শেষে একটি খোঁচা আছে, যা ঠিক সহ্য করা মুশকিল। সাংবাদিক, কাজেই সহ্য করতে হবে। এবং কিছুতেই চটানো যাবে না। মীরউদ্দিনের কাছ থেকে জানা গেল যে, একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা 'নগ্নগাত্র বিভীষিকা'--এই শিরোনামে একটি প্রচ্ছদ কাহিনী ছাপবে। কাজেই পুলিশের বক্তব্যটি শোনবার জন্যে তিনি দয়া করে এখানে তশরিফ রেখেছেন।

'আমার প্রশ্নের জবাব দিতে আপনার কোনো আপত্তি নেই তো?'

'না, নেই। প্রশ্ন করুন।'

'নগ্নগাত্র ব্যক্তিটি প্রসঙ্গে আপনার কী ধারণা?'

'তেমন কোনো ধারণা নেই। পাগল-টাগল হবে আর কি।'

'তাকে পাগল বলার পেছনে আপনার যুক্তি কী?'

'একটাই যুক্তি—কোনো সুস্থ মাথার লোক একটা লোহার রড নিয়ে খুনখারাবি করে বেড়ায় না।'

'কেন, সুস্থ লোকও তো খুনখারাবি করে।'

'তা করে, কিন্তু তার পেছনে কোনো মোটিভ থাকে। এর কাণ্ডকারখানার পেছনে কোনো মোটিভ নেই।'

'বুঝলেন কি করে, মোটিভ নেই? হয়তো মোটিভ আছে, আপনারা ধরতে পারছেন না।'

সাজ্জাদ হোসেনের বিরুক্তির সীমা রইল না। এ তো মহা ত্যাঁদড়ের পাল্লায় পড়া গেল! জ্বালিয়ে মারবে মনে হচ্ছে।

'নগ্নগাত্রকে নিয়ে পুরানা পল্টন এলাকায় গুজব ছড়িয়ে পড়েছে। সেটা কি আপনি জানেন?'

'না, জানি না। কী গুজব?'

'সেটা আপনি নিজেই কষ্ট করে জেনে নেবেন। কারণ পুলিশের উচিত শহরের চালু গুজবগুলোর প্রতি লক্ষ রাখা। কি, উচিত না?'

সাজ্জাদ হোসেন জবাব দিলেন না। এই লোকের সঙ্গে কথা যত কম বলা যায়, ততই ভালো।

'এখন আপনি দয়া করে বলুন, লোকটিকে ধরবার ব্যাপারে পুলিশবাহিনী কি চড়ান্ত রকমের ব্যর্থতার পরিচয় দেয় নি?'

'না। ধরবার চেষ্টা হচ্ছে, শিগগিরই ধরা পড়বে। হয়তো আজ রাতেই ধরা পড়বে।'

'আচ্ছা, বিদেশে অপরাধীকে ধরবার জন্যে ট্রেণ্ড পুলিশ-কুকুর আছে, এরা গন্ধ

শুঁকে–শুঁকে অপরাধীকে বের করে ফেলে। এখানে এমন কিছু নেই?'

'না, নেই। কারণ এটা বিদেশ নয়, বাংলাদেশ।'

'কিন্তু বাংলাদেশে তো পুলিশবাহিনীর একটা মাউন্টেড রেজিমেন্ট আছে। যার প্রতিটি ঘোড়া লক্ষ–লক্ষ টাকা খরচ করে কেনা। অপ্রয়োজনীয় ঘোড়ার পেছনে এত টাকা খরচ না করে দু'–একটা শিক্ষিত কুকুর কি কেনা যায় না?'

'আমাকে এ সব বলছেন কেন ভাই? আমি সামান্য ব্যক্তি। এ সব কর্তাব্যক্তিদের বলেন।'

'আমি আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই। উচিত কি উচিত না।'

'উচিত তো বটেই।'

সাজ্জাদ হোসেন উঠে পড়লেন। শুকনো গলায় বললেন, 'আমার ডিউটি আছে। আর থাকতে পারছি না।' এই সাংবাদিকের সঙ্গে আরো কিছু সময় কাটালে প্যাঁচে পড়ে যেতে হবে। চাকরি নিয়ে টানাটানি হবে। আজকের ইন্টারভ্যু দিয়েই তাঁর ভয়ভয় লাগছে, না–জানি কী ছাপা হয়! তিনি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। চাকরি বাঁচিয়ে চলা ক্রমেই মুশকিল হয়ে পড়ছে।

সাজ্জাদ হোসেন জীপ নিয়ে খানিকক্ষণ একা–একা পুরানা পল্টন এলাকায় ঘুরলেন। তারপর খুঁজে বের করলেন মিসির আলির বাড়ি।

এটা সেই বাড়ি, যা 'নগ্নগাত্র' এসে লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেছে। তাঁর জানা ছিল না। মিসির আলির সঙ্গে এর পরেও তাঁর দেখা হয়েছে, কিন্তু মিসির আলি এ প্রসঙ্গে কোনো কথা বলেন নি। যেন এটা বলার মতো কোনো ব্যাপার নয়। অথচ মিসির আলিকে দু'–তিন বার স্টেটমেন্ট দিতে হয়েছে। এক জন ইনভেসটিগেটিং অফিসার এসে সব দেখেশুনে গিয়েছে। যথেষ্ট হৈচৈ করা হয়েছে এটা নিয়ে। অন্য যে–কেউ হলে প্রথম সুযোগেই ঘটনাটা বন্ধুবান্ধবদের বলত। মিসির আলি বলেন নি। লোকটি কি ইচ্ছে করেই নিজেকে আলাদা প্রমাণ করবার জন্যে এ–রকম করে?

সাজ্জাদ হোসেন কড়া নাড়লেন। মিসির আলি ঘরেই ছিলেন। তিনি দরজা খুললেন। সাজ্জাদ হোসেনকে দেখে বিন্দুমাত্র অবাক হলেন না। তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হল, তিনি যেন বন্ধুর জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন।

সাজ্জাদ হোসেন বললেন, 'খবর কি তোর?'

'ভালো।'

'খোঁজ নিতে এলাম টিকে আছিস, না নগ্নগাত্র এসে তোকে পিটিয়ে তক্তা বানিয়ে দিয়ে গেছে।'

'না, এখনো বানায় নি।'

'তোর 'ইমা'র পাত্তা এখনো লাগাতে পারি নি। পারলেই জানবি।'

'পারার সম্ভাবনা কী রকম?'

'কম। খুবই কম। ঠাণ্ডা পানি খাওয়াতে পারবি? খুব ঠাণ্ডা।'

'ঠাণ্ডা পানি হবে না। ঘরে ফ্রীজ নেই।'

'বাড়িওয়ালার ঘরে নিশ্চয়ই আছে। তোর ইমাকে পাঠিয়ে দে না, নিয়ে আসুক।

ঠাণ্ডা পানি খেতে ইচ্ছা হচ্ছে।'

মিসির আলি ইমাকে পাঠালেন না। নিজেই ঠাণ্ডা পানির বোতল নিয়ে এলেন। সাজ্জাদ হোসেন টেবিলে পা তুলে ক্লান্ত ভঙ্গিতে বসে আছেন। দেখলেই মায়া লাগে। লোকটির ওপর দিয়ে ঝড় যাচ্ছে। মিসির আলি বললেন, 'চা খাবি?'

'না। তোর সোফায় ঘন্টাখানিক শুয়ে থাকব।'

'সোফায় কেন? বিছানায় শুয়ে থাক।'

'সোফা হলেই চলবে, বিছানা লাগবে না। তুই কাঁটায়-কাঁটায় এক ঘন্টা পরে ডেকে তুলবি।'

'ঠিক আছে, তুলব।'

সাজ্জাদ হোসেন সোফায় লম্বা হলেন এবং দেখতে-দেখতে ঘুমিয়ে পড়লেন। তবে তাঁকে ডেকে তুলতে হল না। ঠিক এক ঘন্টা পরে নিজেনিজেই জেগে উঠলেন। প্রাণী হিসেবে মানুষের তুলনা নেই। তার অবচেতন মন সর্বক্ষণ কাজ করে। যথাসময়ে তাকে সজাগ করে দেয়। বিপদের আভাস দিতে চেষ্টা করে। মুশকিল হচ্ছে, তার কর্মপদ্ধতি আমাদের জানা নেই। সাজ্জাদ হোসেন বললেন, 'এক কাপ চা খাব। তারপর যাব। আজ সারারাত ডিউটি। যেভাবেই হোক, আজ নগ্নগাত্রকে ধরবই।'

মিসির আলি শান্ত স্বরে বললেন, 'ম্যানিয়াকদের ধরা খুব মুশকিল। এদের ইন্দ্রিয় খুব সজাগ থাকে।'

'সজাগ থাকুক আর যা-ই থাকুক, ব্যাটাকে আজ ধরবই।'

'স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের দেশ খোদ ইংল্যান্ডেও কিন্তু কিছু-কিছু ম্যানিয়াকদেরকে ধরতে তিন-চার বছর সময় লেগেছে। এক জনের নাম তুই নিশ্চয়ই জানিস—রোড-সাইড স্ট্রাংগলার। বেছে বেছে ব্লন্ড মেয়েদের খুন করত। সাড়ে ছ' বছর চেষ্টা করেও কিন্তু ওকে ধরা যায় নি।'

'আমি ধরব। আজ রাতেই ধরব।'

মিসির আলি চুপ করে গেলেন। সাজ্জাদ হোসেন বললেন, 'উঠি?'

'চা না খাবি বললি?'

'মত বদলেছি, খাব না।'

মিসির আলি বললেন, 'আমি কি তোর সঙ্গে যেতে পারি?'

'আমার সঙ্গে যাবি? কেন?'

'আমি ধানমণ্ডির একটা বাড়িতে ঢুকতে চাই। ওরা ঢুকতে দিচ্ছে না। গেট বন্ধ করে রাখছে এবং বলছে বাড়িতে কেউ নেই। কিন্তু আমি জানি, বাড়িতে লোকজন আছে। পুলিশের গাড়িতে করে গেলে দারোয়ান ভয় পেয়ে গেট খুলবে।'

'আজ রাতেই যেতে হবে?'

'হুঁ।'

'তোকে ঢুকতে দিচ্ছে না কেন?'

'আছে, অনেক ব্যাপার আছে, পরে বলব। আমাকে ও-বাড়িতে নামিয়ে দিতে তোর অসুবিধা আছে? অসুবিধা থাকলে থাক।'

'না, অসুবিধা নেই।'

রাত সাড়ে দশটার মতো বাজে।

দারোয়ান জেগেই ছিল। মিসির আলি যা ভেবেছিলেন, তা-ই হল। পুলিশ এসেছে শুনে সে গেট খুলল। মিসির আলি ভেতরে ঢুকে পড়লেন।

ওসমান সাহেব এবং তাঁর স্ত্রী দু' জনেই দোতলার বারান্দা থেকে দেখলেন, মিসির আলি গেট দিয়ে ঢুকছেন এবং বেশ সহজ ও স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হেঁটে আসছেন। ওসমান সাহেব নিচে নেমে এলেন। মিসির আলি বললেন, 'আপনি ভালো আছেন?'

ওসমান সাহেব সে প্রশ্নের জবাব দিলেন না। মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলেন।

মিসির আলি বললেন, 'অসময়ে এসেছি। উপায় ছিল না বলেই আসতে হয়েছে। আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাই।'

১৭

ওসমান সাহেবের বসার ঘর। রাত প্রায় এগারটা। একটি কম পাওয়ারের টেবিল-ল্যাম্প ছাড়া ঘরে কোনো আলো নেই। আবছা অন্ধকার। এই আবছা অন্ধকার ঘরে তিন জন মানুষ মুখোমুখি বসে ছিলেন। এক জন উঠে চলে গেলেন। ফরিদা। তিনি নিঃশব্দে কাঁদছিলেন। যে আলোচনা চলছিল, তা তাঁর সহ্য না হওয়ায় উঠে গেছেন। এখন বসে আছেন দু' জন--মিসির আলি এবং ওসমান সাহেব। কথাবার্তা এখন বিশেষ হচ্ছে না। ওসমান সাহেবের যা বলার তা বলেছেন। এখন আর তাঁর কিছু বলার নেই। তিনি বসে আছেন মূর্তির মতো। দেখে মনে হচ্ছে, তাঁর মধ্যে জীবনের ক্ষীণতম স্পর্শও নেই। যেন এক জন মরা মানুষ।

মিসির আলি বললেন, 'আপনি বলছেন, ফিরোজকে তালাবন্ধ করে রেখেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'কবে থেকে?'

'আজ নিয়ে ছ' দিন।'

'এটা তো বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না। কারণ এই ছ' দিনে বেশ ক'বার সে বের হয়ে গেছে। পুরানা পল্টন এলাকায় তাকে দেখা গেছে। পত্রিকায় নিউজ হয়েছে।'

ওসমান সাহেব ক্লান্ত গলায় বললেন, 'কী ভাবে কী হচ্ছে আমি জানি না। আমি যা করেছি, সেটা বললাম। তালা দেয়া আছে। আপনি নিজে গিয়ে দেখতে পারেন।'

'সেই তালার চাবি কার কাছে? অর্থাৎ আমি জানতে চাচ্ছি, অন্য কেউ তালা খুলে দিতে পারে কি না।'

'না, পারে না। কারণ চাবি আমার কাছে।'

'অর্থাৎ আপনি বলতে চাচ্ছেন তালাবন্ধ করে রাখা সত্ত্বেও সে বের হয়ে পড়ছে?'

'আমি কিছুই বলতে চাচ্ছি না। আপনার যা ইচ্ছা মনে করতে পারেন।'

মিসির আলি ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'আমি কোনো আধিভৌতিক ব্যাপারে বিশ্বাস করি না। এক জনকে তালাবন্ধ করে রাখা হবে, কিন্তু তবু সে বের হয়ে যাবে--এটা আর যে-ই বিশ্বাস করুক, আমি করব না।'

'বিশ্বাস করতে আমি আপনাকে বলছি না। আপনি নিজে গিয়ে দেখুন। সেটা না করে

আপনি একই কথা বারবার আমাকে বলছেন কেন?'

'সেটা বলছি, কারণ আমি আগে সমস্ত ব্যাপারটা সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা করতে চাই। ওসমান সাহেব, আমি--আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাই, আমি এই ছেলেটিকে সুস্থ করে তুলতে চাই। আপনি আমাকে শত্রুপক্ষ মনে করছেন, এটা ঠিক না। আমার কোনো পক্ষ নেই। আমি এক জন চিকিৎসক।'

মিসির আলি উঠে দাঁড়ালেন এবং সহজ স্বরে বললেন, 'চলুন, ফিরোজের ঘরটা দেখে আসি।'

'আপনি একাই যান, আমি যাব না।'

'আপনি যাবেন না কেন?'

'আমার সহ্য হয় না। আমি নিজেও পাগল হয়ে যাব।'

মিসির আলি একাই রওনা হলেন।

ফিরোজের ঘর নিঃশব্দ। সে এই গরমেও চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমাচ্ছে। তার মুখের দিকে তাকিয়ে মিসির আলি চমকে উঠলেন। মুখভর্তি খোঁচা-খোঁচা দাড়ি-গোঁফ। গালের হনু উঁচু হয়ে আছে। সেই উজ্জ্বল গৌরবর্ণের কিছুই নেই, কেমন কালি মেরে গেছে। মিসির আলি লক্ষ করলেন, ফিরোজের হাতের নখ বড় বড় হয়েছে। নখের নিচে ময়লা জমে দেখাচ্ছে শকুনের নখের মতো। ঘুমের মধ্যেই ফিরোজ পাশ ফিরল। মিসির আলি লক্ষ করলেন, সে হাঁ করে ঘুমাচ্ছে এবং মুখ দিয়ে লালা পড়ে বিছানার একটা বেশ বড় অংশ চটচটে হয়ে আছে। কুৎসিত একটা দৃশ্য!

ঘরের একটিমাত্র দরজা, সেখানে সত্যি-সত্যি বিরাট একটা তালা ঝুলছে। দু' দিকে দু'টি বিশাল জানালা। জানালায় লোহার গ্রিল। সেই গ্রিল ভেঙে বের হওয়া অসম্ভব। সুস্থ মানুষ দূরের কথা, এক জন পাগলও সেই চেষ্টা করবে না।

মিসির আলি বসার ঘরে ফিরে এলেন। ওসমান সাহেব বললেন, 'ঘর যে বন্ধ, এটা আপনার বিশ্বাস হয়েছে?'

'হ্যাঁ, হয়েছে।'

'এখন বলুন সে কীভাবে বের হয়?'

'ফিরোজের ঘরের সঙ্গে একটা এ্যাটাচড্ বাথরুম আছে। বাথরুমের ভেতরটা আমি দেখতে পাই নি। তবে আমার ধারণা, বাথরুমে বেশ বড় একটি ভেন্টিলেটার আছে, এবং ফিরোজ সেই ভেন্টিলেটার দিয়ে বের হয়।'

ওসমান সাহেব নড়েচড়ে বসলেন। সিগারেট ধরালেন। মিসির আলি লক্ষ করলেন, সিগারেট ধরাতে গিয়ে তাঁর হাত কাঁপছে। মিসির আলি বললেন, 'এক্ষুণি আপনি ভেন্টিলেটার বন্ধ করার ব্যবস্থা করুন। আজ রাতে যেন সে বের হতে না পারে।'

'হ্যাঁ, করছি।'

'আমি এখন চলে যাব। কিন্তু কাল ভোরে আবার আসব। আপনার দারোয়ানকে বলে দিন, যাতে সে আমাকে ঢুকতে দেয়।'

'হ্যাঁ, আমি বলব। মিসির আলি সাহেব।'

'বলুন।'

'আমার ছেলে কি কোনোদিন সুস্থ হয়ে উঠবে?'

'নিশ্চয়ই হবে। হতেই হবে।'

'এত রাতে আপনি বাড়ি গিয়ে কি করবেন? থেকে যান এখানে।'

'না, থাকতে পারব না। আমার সঙ্গে একটা ছোট মেয়ে থাকে, সে একা ভয় পাবে। আপনি দেরি না করে ভেন্টিলেটারটা বন্ধ করার ব্যবস্থা করুন।'

'করছি। এক্ষুণি করছি।'

ফরিদা ঘরে ঢুকলেন। তাঁকে খুব উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত মনে হল। তাঁর কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম, এবং তিনি কাঁপছেন। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছেন না। ফরিদা থেমে বললেন, 'মিসির আলি সাহেব, ফিরোজ জেগেছে। আপনাকে ডাকছে। আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়।'

'কেমন আছ ফিরোজ?'

'ভালো আছি। তুই কেমন আছিস?'

মিসির আলি চমকে উঠলেন। ভারি গম্ভীর গলায় কথা বলছে ফিরোজ। চোখে-মুখে একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি। সে পায়ের ওপর পা তুলে চেয়ারে বসে আছে।

'তুই তুই করে বলছি বলে রাগ করছিস না তো? তুই তো আবার প্রফেসর মানুষ!'

'রাগ করছি না, তবে দুঃখিত হচ্ছি। সবাইকে সবার প্রাপ্য সম্মান দেয়া উচিত।'

'তা উচিত। কিন্তু মুশকিল কি জানিস, সারা জীবন তুই ছাড়া কোনো সম্বোধন করি নি। আমাকে চিনতে পারছিস তো? তুই তো গিয়েছিলি আমাদের বাড়িতে।'

মিসির আলি চুপ করে রইলেন। যে কথা বলছে, সে ফিরোজ নয়। ফিরোজের দ্বিতীয় সত্তা। সেকেন্ড পার্সোনালিটি।

'কি রে, চুপ করে আছিস কেন? ভয় পাচ্ছিস? হা হা হা।'

'না, ভয় পাচ্ছি না।'

'খাঁচায় আটকে রেখেছিস, ভয় পাবি কেন? ছেড়ে দে, তারপর দেখি তোর কত সাহস!'

'আমার সাহস কম।'

'এই তো একটা সত্যি কথা বললি। হ্যাঁ, তোর সাহস কম--তবে তোর বুদ্ধি আছে। মাথা খুব পরিষ্কার। বোকা বন্ধুর চেয়ে বুদ্ধিমান শত্রু ভালো।'

'আমি কারো শত্রু নই।'

'বাজে কথা বলিস না। তুই আমার শত্রু, মহা শত্রু!'

'কেমন করে?'

'তুই ফিরোজকে সারিয়ে তুলতে চাচ্ছিস। ওকে সারিয়ে তুললে আমি যাব কোথায়? ডাণ্ডাপেটা করব কীভাবে? তুইই বল।'

'ডাণ্ডাপেটা করতেই হবে?'

'করব না? বলিস কী তুই! আমাকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে, আমি ছেড়ে দেব? পিটিয়ে তক্তা বানিয়ে ফেলব।'

'লাভ কী তাতে?'

'লাভ-লোকসান জানি না। ছোট চৌধুরী লাভ-লোকসানের পরোয়া করে না। তোকে আমি একটা শিক্ষা দেব। এক বাড়ি মেরে টপ করে মাথাটা ফাটিয়ে দেব। গল-

গল করে ঘিলু বের হয়ে আসবে। ছিটকে আসবে রক্ত। বড় মজার ব্যাপার হবে। তবে তুই দেখতে পাবি না। আফসোসের কথা।'

মিসির আলি তাকিয়ে দেখলেন, এ-বাড়ির প্রায় সবাই এসে জড়ো হয়েছে। চোখ বড় বড় করে শুনছে এই অস্বাভাবিক কথোপকথন। কাঁদছেন শুধু ফরিদা।

ফিরোজ হিসহিস করে উঠল, 'কি, চুপ করে আছিস যে? কথা বলছিস না কেন? ভয় পেয়েছিস? ভয় পেয়ে শেষটায় মেয়েমানুষের আঁচল ধরলি? লজ্জা করে না?'

'কার কথা বলছ?'

'ওরে হারামির বাচ্চা, তুই জানিস না কার কথা বলছি? তোর পেয়ারের নীলু বেগম। যার ইয়ে দুটি---। এবং যার ইচ্ছে হচ্ছে---।'

কুৎসিত সব কথা। সে একনাগাড়ে বলে যেত লাগল। কদর্য অশ্লীলতা। যা ছাপার অক্ষরে লেখার কোনো উপায় নেই। ফিরোজ যে-সব কথা বলতে লাগল, তার ভগ্নাংশও অশ্লীলতম পর্ণো পত্রিকায় থাকে না। ফরিদা দ্রুত ঘরে চলে গেলেন। কাজের লোকগুলি মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। ওসমান সাহেব ধৈর্য হারিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, 'শাট আপ।'

ফিরোজ হাসিমুখে তাকাল ওসমান সাহেবের দিকে। যেন খুব মজার কথা বলছে, এমন ভঙ্গিতে বলতে লাগল, 'আমাকে ইংরেজিতে গাল দিচ্ছে। বাহ্, বেশ মজা তো! কাকে তুই ইংরেজিতে গাল দিচ্ছিস? তোর নাড়ি-নক্ষত্র আমি জানি। সালেহা নামের কাজের মেয়েটির সঙ্গে তুই কী করেছিস, বলে দেব? খুব মজা পেয়ে গিয়েছিলি, তাই না? ক'দিন খুব সুখ করে নিলি। বলব কী করেছিলি? বলব? হা হা হা। কি, পালিয়ে যাচ্ছিস কেন? লজ্জা লাগছে? ফুর্তি করার সময় লজ্জা লাগে নি? একটা ঘটনা বরং বলেই ফেলি---।'

ওসমান সাহেব বললেন, 'মিসির আলি সাহেব, আপনি চলে আসুন।'

'আপনি বসার ঘরে গিয়ে বসুন। আমি আসছি।'

'তুই যাচ্ছিস না কেন? কথাগুলো শুনতে মজা লাগছে? তোর ইয়ে--- (কিছু কুৎসিত কথা)।'

মিসির আলি গম্ভীর গলায় বললেন, 'ফিরোজ, চুপ কর।'

'ঠিক আছে, চুপ করলাম। তুই আজ রাতে কোথায় থাকবি?'

'বাসাতেই থাকব।'

'তাহলে দেখা হবে।'

'না, দেখা হবে না। বাথরুমের ভেন্টিলেটার বন্ধ করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।'

ফিরোজের কয়েক সেকেণ্ড সময় লাগল ব্যাপারটা বুঝতে। তারপর লণ্ডভণ্ড কাণ্ড করল। চেয়ার ভাঙল, লাথির পর লাথি বসাতে লাগল পালঙ্কে। কাপ-বাটি ছুঁড়ে-ছুঁড়ে ফেলতে লাগল। চোখে দেখা যায় না, এমন ব্যাপার। ভয়াবহ উন্মত্ততা! মনে হয় না এ কোনো দিন শান্ত হবে। মিসির আলি একটি সিগারেট ধরালেন। ফিরোজ চাপা গলায় গর্জন করছে। ক্রুদ্ধ পশুর গর্জন। সমস্ত আবহাওয়াই দূষিত হয়ে গেছে। নরকের একটি ক্ষুদ্র অংশ নেমে এসেছে এখানে।

মিসির আলি দাঁড়িয়ে-থাকা লোকদের বললেন, 'তোমরা যাও। বারান্দার বাতি নিভিয়ে দাও। ও আপনা-আপনি শান্ত হবে।'

১৮

নাজনীন একটি ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখেছে। স্বপ্নটি দেখেছে ছাড়া-ছাড়াভাবে। তবু সব মিলিয়ে একটা অর্থ দাঁড় করানো যায়। এবং অর্থটি ভয়াবহ। নাজনীন দেখেছে--একটা ছোট ঘরের এক প্রান্তে একটি বিছানা। বিছানাটিতে সাদা চাদর মুড়ি দিয়ে এক জন লোক শুয়ে আছে। তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ আরেক জন লোক ঘরে ঢুকল। লোকটার হাতে একটা লোহার রড। লোকটি টান দিয়ে ঘুমিয়ে থাকা লোকটির ওপর থেকে চাদর সরিয়ে ফেলল। লোকটির মুখ দেখা যাচ্ছে। এবং সেটি একটি পরিচিত মুখ—মিসির আলির মুখ। স্বপ্নের মধ্যেই প্রচণ্ড একটা শব্দ হল, এবং দেখা গেল মিসির আলির মাথা ফেটে চৌচির হয়ে গেছে।

নাজনীন জেগে উঠল চিৎকার করে। স্বপ্ন এত ভয়াবহ হয়! নাজনীন বাকি রাতটা আর ঘুমুতে পারল না। ছ' রাকাত নফল নামাজ পড়ল। কোরান শরিফ পড়ল। মন শান্ত হল না। নাজনীনের মা বললেন একটা ছদকা দিয়ে দিতে। প্রাণের বদলে প্রাণ। সেই ছদকা তো ভোর না-হবার আগে দেয়া সম্ভব নয়। কিন্তু ভোর হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করাই কঠিন। নাজনীন ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে খানিকক্ষণ কাঁদল। সে জানে এটা স্বপ্ন। স্বপ্ন কখনো সত্যি হয় না। তবু এমন লাগছে কেন?

ভোর হবার সঙ্গে-সঙ্গেই সে একটি টেলিগ্রাম পাঠাল, 'সাবধান থাকবেন।' টেলিগ্রামটি পাঠিয়েই মনে হল, এর অর্থ তো উনি কিছুই বুঝবেন না। তিন ঘন্টা পর দ্বিতীয় একটি টেলিগ্রাম করল। এই টেলিগ্রামটি বেশ দীর্ঘ।

'চাচা, আপনার সম্বন্ধে খুব খারাপ স্বপ্ন দেখেছি। একটি লোক লোহার রড দিয়ে আপনার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। আপনাকে অনুরোধ করছি, সাবধানে থাকবেন। নাজনীন।'

১৯

নিজের মেয়েকে চিনতে না পারার মতো কষ্টের কি কিছু আছে? জাহিদ সাহেব বসে-বসে তাই ভাবেন। তাঁর বড় অস্থির লাগে। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে কেমন নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লেন। এ-রকম হবে, জানতেন। দুই মেয়ে বড় হবে--এদের বিয়ে হবে, আলাদা জীবন হবে। তিনি পড়ে থাকবেন একা। এ-অবস্থা তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন। পুরোপুরি সে-রকম অবশ্যি হয় নি। এক মেয়ে তাঁর সঙ্গেই আছে। কিন্তু এই মেয়েকে তিনি চেনেন না। এ এক অচেনা নীলু।

আজ দুপুরে খেতে গিয়ে দেখেন, মাংসের ভুনা তরকারি এবং খিচুড়ি করা হয়েছে। তিনি অবাক হয়ে বললেন, 'আজ খিচুড়ি যে!'

নীলু বলল, 'তুমি খেতে চেয়েছিলে, তাই।'

জাহিদ সাহেব খেতে চেয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু কাউকে সে-কথা বলেন নি। নীলুর সঙ্গে গতকাল রাত থেকেই তাঁর কোনো কথা হয় নি। অথচ সে ঠিকই জানল। শুধু আজই নয়, এ-রকম প্রায়ই হয়। বড় অস্বস্তি লাগে। শুধু অস্বস্তি নয়, একটু ভয়ভয়ও

করে। একেক রাতে ভয়টা অসম্ভব বেড়ে যায়। কেন বাড়ে, তাও তিনি জানেন না। তাঁর ইচ্ছা করে সব ছেড়েছুঁড়ে দূরে কোথাও চলে যান। যেখানে কেউ তাঁর কোনো খোঁজ পাবে না।

প্রথম এ রকম হল বিলুর বিয়ের চার দিন পর। বিলু নেই। বিয়েবাড়ির আত্মীয়-স্বজনরা সব চলে গেছে। বাড়ি একেবারেই খালি। মনটন খারাপ করে জাহিদ সাহেব নিজের ঘর ছেড়ে ঘুমাতে গেলেন নীলুর পাশের ঘরে। এক জন কেউ থাকুক আশেপাশে, যাতে ডাকলে সাড়া পাওয়া যায়।

অনেক রাত পর্যন্ত তাঁর ঘুম এল না। সামনের জীবন কেমন কাটবে, তাই নিয়ে ভাবতে লাগলেন। মৃত স্ত্রীর কথা মনে করে খানিকক্ষণ কাঁদলেন। প্রথম জীবনে একটি ছেলে হয়েছিল--দেড় বছর বয়সে মারা যায়। মিষ্টি কথা বলত। পাখিকে বলত 'বাকি।' ফুলকে বলত 'কুল'। অনেক দিন পরে মৃত ছেলের কথা মনে করেও চোখ মুছলেন। আর ঠিক তখন একা অদ্ভুত ব্যাপার হল। চাঁপা ফুলের তীব্র গন্ধে অভিভূত হয়ে গেলেন। ব্যাপার কী! ফুলের গন্ধ আসছে কোত্থেকে? তাঁর নিজের এক সময় বিরাট ফুলের বাগান ছিল। সে-সব আর কিছু নেই। বাগান জঙ্গল হয়েছে।

জাহিদ সাহেব অবাক হয়ে দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াতেই নূপুরের শব্দ শুনলেন। খুব হালকা, কিন্তু স্পষ্ট। এর মানে কী? তিনি নীলুর ঘরের সামনে দাঁড়ালেন। আশ্চর্য! নীলু যেন কার সঙ্গে কথা বলছে। গভীর রাতে কে এসেছে নীলুর ঘরে? জাহিদ সাহেব ভয়ার্ত গলায় ডাকলেন, 'নীলু, ও নীলু।'

নীলু প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই দরজা খুলল।

'কার সঙ্গে কথা বলছিস?'

'আছে এক জন। তুমি চিনবে না।'

জাহিদ সাহেব ঘরে উঁকি দিলেন। কাউকে দেখতে পেলেন না। নীলু বলল, 'ঘুমিয়ে পড় বাবা। এত রাত পর্যন্ত জেগে আছ কেন?'

জাহিদ সাহেব বললেন, 'কী হচ্ছে এ-সব! কার সঙ্গে কথা বলছিলি?'

'ও তুমি বুঝবে না বাবা।'

'বুঝব না মানে? বুঝব না মানে কী?'

'অনেক কথা বাবা। পরে তোমাকে বলব।'

'না, এখনি শুনব।'

নীলু বলল, এবং নীলুর কথা তিনি কিছুই বুঝলেন না। একজন-কেউ নীলুর সঙ্গে আছে--যে নীলুকে তার মহাবিপদ থেকে রক্ষা করেছিল। কী অদ্ভুত কথা!

জাহিদ সাহেব দারুণ দুশ্চিন্তায় দিন কাটাতে লাগলেন। তাঁর ধারণা হল, নীলুর বড় কোনো অসুখ হয়েছে। তিনি ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বললেন। দু' জন পীরের কাছ থেকে তাবিজ আনালেন। সেইসব তাবিজ পরতে নীলু কোনো আপত্তি করল না। ডাক্তারদের অষুধপত্র খেতেও তার কোনো অনীহা দেখা গেল না। কিন্তু তাতে কোনো লাভ হল না। এবং হবেও না কোনোদিন। তাঁর বাকি জীবন কাটবে অদ্ভুত এই নীলুকে সঙ্গে নিয়ে--যাকে তিনি চেনেন না, বোঝেন না। যে মনের কথা বুঝে ফেলে। যার ঘরে অপরিচিত এক রমণীকণ্ঠ শোনা যায় এবং দমকা হাওয়ার মতো চাঁপা ফুলের গাঢ় গন্ধ যাকে হঠাৎ ঘিরে ফেলে।

আজ বুধবার। আকাশে মেঘ নেই। রৌদ্রোজ্জ্বল একটি সুন্দর সকাল। জাহিদ সাহেব অনেক দিন পর উৎফুল্ল বোধ করলেন। তাঁর মনে হল, দুঃস্বপ্ন কেটে যাবে। নীলু ভালো হয়ে যাবে। তাঁর চমৎকার একটি বিয়ে হবে। ছেলেপুলে আসবে তাদের সংসারে। সেই সব ছেলেমেয়েদের নিয়ে তাঁর শেষজীবন ভালোই কাটবে। এক জন মানুষ তো সারা জীবন দুঃখী থাকতে পারে না। দুঃসময়ের পর আসে সুসময়। জীবনচক্রের এই এক কঠিন নিয়ম। তবে কারো-কারো ক্ষেত্রে দুঃসময়টা দীর্ঘ হয়, এই যা। যেমন তাঁর হয়েছে।

জাহিদ সাহেব ডাকলেন, 'নীলু, নীলু মা।' অনেক দিন পরে তাঁর কণ্ঠে আনন্দ ঝরে পড়ল।

নীলু এল না। তিনি উঁকি দিলেন নীলুর ঘরে। তার ঘর অন্ধকার। দরজা জানালা বন্ধ। পর্দা টেনে দেয়া, ঘরের বাতাস ভারি হয়ে আছে।

'কী হয়েছে নীলু?'

'কিছু হয় নি।'

'এভাবে শুয়ে আছিস কেন? শরীর ভালো না?'

তিনি নীলুর কপালে হাত দিলেন। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। নীলুর চোখ-মুখ রক্তবর্ণ।

তিনি হতভম্ব হয়ে বললেন, 'কী হয়েছে মা?'

'কিছু হয় নি।'

'কিছু হয় নি মানে? তোর গায়ে তো প্রচণ্ড জ্বর! কখন জ্বর এল? ডাক্তার ডাকা দরকার। এক্ষুণি দরকার।'

'বাবা, এই নিয়ে তুমি ভাববে না। কাউকে ডাকার দরকার নেই।'

'দরকার নেই, বললেই হল!'

'বাবা, তোমায় পায়ে পড়ি! আমাকে একা থাকতে দাও। বিরক্ত করো না। ভয় নেই, জ্বর সেরে যাবে।'

জাহিদ সাহেব লক্ষ করলেন, নীলু কাঁদছে।

'মা, কী হয়েছে তোর?'

'কিচ্ছু হয় নি বাবা। আমি সেরে যাব। আমি আবার আগের মতো হব। যে আমার সঙ্গে থাকত, সে আমাকে বলেছে।'

'সে কে?'

'আমি নিজেও জানি না, সে কে। এক মহাবিপদে সে আমাকে রক্ষা করেছিল। বাবা, তুমি যাও।'

জাহিদ সাহেব মুখ কালো করে ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। চমৎকারভাবে যে-দিনটি শুরু হয়েছিল, সেটি খানখান হয়ে ভেঙে পড়ল। তিনি খবরের কাগজ হাতে নিয়ে একা-একা বারান্দায় বসে রইলেন।

২০

বুধবার। সময় সাতটা দশ।

সন্ধ্যার ঠিক পরপর মিসির আলি নিউ ইস্কাটন রোডের যে তিনতলা দালানের সামনে এসে দাঁড়ালেন, তার নাম--'নিকুঞ্জ'। লোকজন বিশাল প্রাসাদ তৈরি করে নাম দেয়--কুটির। এ-রকম বাড়ির নাম কেউ কুটির রাখে?

বাড়ির সামনে ফুটবলের মাঠের মতো বড় লন। লনের ঘাস বড়-বড় হয়ে আছে। লনের চারদিকে একসময় ফুলের বাগান ছিল। এখন নেই। শ্বেতপাথরের একটি শিশুমূর্তি (সম্ভবত ফোয়ারা) আছে মাঝখানে, তাতে শ্যাওলা পড়েছে। চারদিকে অবহেলা ও অযত্নের ছাপ।

মিসির আলির মনে হল--এ বাড়ির মালিক দেশে থাকেন না। চাকরবাকরের হাতে বাড়ির দায়িত্ব দিয়ে তিনি থাকেন বিদেশে। হঠাৎ-হঠাৎ আসেন, আবার চলে যান। মিসির আলি খানিকটা শঙ্কিত বোধ করলেন। বাড়ির মালিক এস. আকন্দ সাহেবের সঙ্গে তাঁর দেখা হওয়া খুবই জরুরি। কারণ মিসির আলির ছাত্র শেষ পর্যন্ত 'ইমা' নামের একটি মেয়ের খবর পত্রিকায় পেয়েছে। খবরের শিরোনাম--হারিয়ে গেল ইমা। ডল হাতে তিন বছর বয়সী একটি বালিকার ছবি আছে খবরের সঙ্গে।

মেয়েটি তার বাবা-মার সঙ্গে ঢাকা থেকে খুলনা যাচ্ছিল। খুব চঞ্চল মেয়ে। সারাদিন ছোটাছুটি করেছে। স্টীমারে উঠে তার খুব ফূর্তি। এক জন আয়া তার সঙ্গে সঙ্গে। বরিশাল থেকে স্টীমার ছাড়ার কিছুক্ষণ পরই আয়া দেখল, ইমা নেই। সিঁড়ি দিয়ে দোতলা থেকে একা-একা নিচে নেমে গেছে? সে ছুটে এল নিচে। সেখানেও ইমা নেই। সে কি রেলিং টপকে নদীতে পড়ে গেছে? আয়া ভয়ে-আতঙ্কে অজ্ঞান হয়ে গেল। ইমার বাবা-মা তখনো কিছু জানেন না। তাঁরা টেলিস্কোপিক লেন্স লাগিয়ে দূরের একটি মাছধরা নৌকার ছবি তোলার চেষ্টা করছেন।

এ জাতীয় বাড়িগুলোতে সাধারণত দারোয়ান এবং কুকুর থাকে। কিন্তু এ-বাড়িতে দুটোর কোনোটাই দেখা যাচ্ছে না। মিসির আলি অনেকটা দ্বিধা নিয়েই গেটের ভেতর ঢুকলেন। কলিং-বেল থাকার কথা, তাও চোখে পড়ছে না। তবে বাড়িতে লোক আছে। আলো জ্বলছে।

আচ্ছা, এ-রকম হওয়া কি সম্ভব যে, এ-বাড়িতে এস. আকন্দ নামের কেউ থাকেন না। এক কালে ছিলেন, এখন নেই। কিংবা খবরের কাগজে যে এস. আকন্দের কথা আছে, ইনি সেই ব্যক্তি নন।

হওয়া অসম্ভব নয়। তবে সাজ্জাদ হোসেন বেশ জোর দিয়েই বলেছেন—এটিই ঠিকানা। খবরের কাগজের কাটিং থেকে ঠিকানা বের করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল সাজ্জাদ হোসেনকে। এটি মনে হচ্ছে তিনি ঠিকই করেছেন।

কলিং-বেল খুঁজে পাওয়া গেল না। মিসির আলি দরজায় ধাক্কা দিলেন। দরজা খুলে গেল প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই।

'কাকে চান?'

'এটা কি আকন্দ সাহেবের বাড়ি? এস. আকন্দ?'

'জ্বি।'

'উনি কি আছেন? তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

'উনি খুবই ব্যস্ত। আজ রাত দু'টার ফ্লাইটে লণ্ডন চলে যাচ্ছেন। আপনার কী দরকার, বলুন?'

'আমার খুবই দরকার।'

'আমাকে বলুন।'

'আমি তাঁকেই চাই। বেশি সময় লাগবে না। পাঁচ মিনিট সময় নেব।'

'ঠিক আছে, বসুন, আমি দেখি।'

মিসির আলি সাহেব বসার ঘরে একা-একা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বসে রইলেন। বসার ঘরটি সুন্দর। অসংখ্য দর্শনীয় জিনিসপত্র দিয়ে জবড়জং করা হয় নি। ঘাস রঙের একটা কার্পেট, নিচু-নিচু বসার চেয়ার। দেয়ালে একটিমাত্র পেইনটিং—চার-পাঁচ জন গ্রামের ছেলেমেয়ে পুকুরে সাঁতার কাটতে নেমেছে। অপূর্ব ছবি। ছবিটির জন্যেই বসবার ঘরে একটি মায়া-মায়া ভাব চলে এসেছে। মিসির আলি মনে-মনে ঠিক করলেন, তাঁর কোনো দিন টাকাপয়সা হলে এ-রকম করে একটি ড্রইংরুম সাজাবেন। সে-রকম টাকাপয়সা অবশ্যি তাঁর হবে না। সবার সব জিনিস হয় না।

'আপনি কি আমার কাছে এসেছেন? আমি সাবির আকন্দ।'

মিসির আলি ভদ্রলোককে দেখলেন। বেশ লম্বা। শ্যামলা গায়ের রঙ। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। মুখে একটি কঠিন ভাব আছে। তবে চোখ দু'টি বড়-বড়, যা মুখের কঠিন ভাবের সঙ্গে মানাচ্ছে না।

'আমি আপনাকে কোনো সময় দিতে পারব না। আমি আজ একটায় চলে যাচ্ছি।'

'আমি আপনার বেশি সময় নেব না। আপনি পত্রিকার এই কাটিংটি একটু দেখুন।'

আকন্দ সাহেব দেখলেন। কাটিংটি ফিরিয়ে দিয়ে মিসির আলির পাশে বসে ক্লান্ত স্বরে বললেন, 'এটা আপনি আমাকে কেন দেখাচ্ছেন? কিছু-কিছু জিনিস আমি মনে করতে চাই না। এটা হচ্ছে তার একটি।'

মিসির আলি বললেন, 'আমার সঙ্গে একটি মেয়ে থাকে। আমার ধারণা, ও ইমা।'

ভদ্রলোক কোনো কথা বললেন না। তাঁর মুখের একটি পেশিও বদলাল না।

'আপনার এই মেয়ের কি খুব ছোটবেলায় ওপেন হার্ট সার্জারি হয়েছিল?'

'হ্যাঁ, ইংল্যাণ্ডে। ওর বয়স তখন দু' বছর।' তারপর একটু থেমে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি কি আপনার পরিচয়টি জানতে পারি?'

'পারেন। আমার নাম মিসির আলি। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জন পার্ট টাইম শিক্ষক।'

আকন্দ সাহেব সিগারেট ধরিয়ে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে টানতে লাগলেন।

মিসির আলি বললেন, 'আমি বুঝতে পারছি, ঘটনার আকস্মিকতা আপনাকে কনফিউজ করে ফেলেছে এবং এটা যে আপনারই মেয়ে, তা আপনি বিশ্বাস করতে পারছেন না।'

ভদ্রলোক কিছু বললেন না।

মিসির আলি বললেন, 'একবার এই মেয়েটি খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং জ্বরের ঘোরে বলতে থাকে--মামি ইট হার্টস, মামি ইট হার্টস--তখনই আমার প্রথম মনে হল---।'

মিসির আলি কথা বন্ধ করে আকন্দ সাহেবের দিকে তাকালেন। ভদ্রলোকের মুখ রক্তশূন্য। মনে হচ্ছে এক্ষুণি অজ্ঞান হয়ে পড়বেন। তারপর আনন্দ আর যন্ত্রণা একসঙ্গে মেশান গলায় আকন্দ সাহেব থেমে-থেমে বললেন, 'খুব ছোটবেলায় হার্টের অসুখে

কষ্ট পেত, তখন বলত· · ''মামি ইট হার্টস।'' ওর নাভিতে একটি কালো জন্মদাগ আছে?'

'আমি বলতে পারছি না। তবে এই মেয়ে আপনারই মেয়ে কি না, তা বোঝার একমাত্র উপায় হচ্ছে DNA টেস্ট। আপনার এবং এই মেয়ের রক্ত পরীক্ষা করে সেটা বলে দেয়া সম্ভব। এটা একটা অভ্রান্ত পরীক্ষা।'

'জানি। তার দরকার হবে না। আমি আমার মেয়েকে দেখলেই চিনতে পারব। আমি কি এখনই যেতে পারি আপনার সঙ্গে?'

'হ্যাঁ, পারেন।'

'আমি আমার স্ত্রীকেও সঙ্গে নিতে চাই।'

'নিশ্চয়ই সঙ্গে নেবেন।'

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর সমস্ত মুখে বিন্দু-বিন্দু ঘাম। তিনি বললেন, 'আপনি কী করেন?' এই প্রশ্ন আগে একবার করা হয়েছে এবং তার জবাবও দেয়া হয়েছে। তবু মিসির আলি দ্বিতীয় বার জবাব দিলেন।

আকন্দ সাহেব কাঁপা-কাঁপা গলায় বললেন, 'আমার মেয়েটি কী করে আপনার ওখানে?'

মিসির আলি শান্ত স্বরে বললেন, 'ও আছে কাজের মেয়ে হিসেবে। ভাতটাত রেঁধে দেয়। বিনিময়ে খেতে পায় এবং থাকতে পায়।'

ভদ্রলোক চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইলেন, যেন তিনি মিসির আলির কথা বুঝতে পারছেন না। তিনি ফিসফিস করে নিজের মনেই কয়েক বার বললেন, 'কাজের মেয়ে! কাজের মেয়ে!'

২১

বুধবার। সময় রাত আটটা একুশ।

মিসির আলি ভেবেছিলেন পিতা, কন্যা এবং মাতার মিলনদৃশ্যটি চিরদিন মনে রাখার মতো একটি দৃশ্য হবে। কিন্তু বাস্তবে সে-রকম হল না। কোনো হৈচৈ, কোনো কান্নাকাটি--কিছুই না। ভদ্রলোক এবং তাঁর স্ত্রী অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইলেন হানিফার দিকে। এভাবে তাকিয়ে থাকার কিছু ছিল না। হানিফা দেখতে অবিকল তার মা'র মতো। নাকের ডগায় তার মা'র মতো একটি তিল পর্যন্ত আছে। ভদ্রলোক বললেন, 'আমরা তোমার বাবা-মা, তুমি খুব ছোটবেলায় হারিয়ে গিয়েছিল। এখন আমরা তোমাকে নিতে এসেছি।'

হানিফা ফ্যালফ্যাল করে তাকাল মিসির আলি দিকে। মিসির আলি হাসলেন। সাহস দিতে চেষ্টা করলেন। এ-রকম একটি নাটকীয় মুহূর্তের জন্যে তিনি হানিফাকে প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। তাকে বলেছিলেন যে, তার বাবা-মা'র খোঁজ করবার চেষ্টা করা হচ্ছে, এবং খোঁজ পাওয়া যাবে।

ভদ্রমহিলা এগিয়ে এসে হানিফার হাত ধরলেন। মিসির আলি ভেবেছিলেন, এই মহিলাটি হয়তো কিছুটা আবেগ দেখাবেন। মেয়েকে জড়িয়ে ধরে কাঁদবেন। কিন্তু তিনি

তা করলেন না। হয়তো আবেগকে সংযত করলেন। ভদ্রমহিলার গলার স্বর ভারি মিষ্টি। তিনি মিষ্টি গলায় বললেন, 'মা, আমার কথা কি তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না? দেখ, আয়নায় তাকিয়ে দেখ--আমি অবিকল তোমার মতো দেখতে।'

মিসির আলি ওদের সামনে থেকে সরে গেলেন। বাইরের এক জনের উপস্থিতি হয়তো এদের কাছে ভালো লাগবে না।

তাঁরা চলে গেলেন পনের মিনিটের মধ্যে। যাবার আগে মিসির আলি বললেন, 'ওর জিনিসপত্রগুলি নিয়ে যান।' ভদ্রমহিলা কঠিন স্বরে বললেন, 'কোনোকিছুই নেবার প্রয়োজন নেই।'

আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, যাবার আগে এস. আকন্দ সাহেব অত্যন্ত শুকনো গলায় এক বার শুধু বললেন, 'আমাকে কষ্ট করে খুঁজে বের করবার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ।' ব্যস, এইটুকুই।

মিসির আলি ভেবে পেলেন না, এরা তাঁর সঙ্গে এমন আচরণ কেন করলেন। তাঁদের মেয়েটি তার বাসায় গৃহভৃত্য ছিল, এইটিই কি তাঁদের মর্মপীড়ার কারণ হয়েছে? এত বিচিত্র কেন মানুষের মন!

অবশ্যি তাঁদের বিচিত্র আচরণের অন্য একটি ব্যাখ্যাও দাঁড় করানো যেতে পারে। হয়তো আজকের এই ঘটনার আকস্মিকতায় তাঁরা হকচকিয়ে গেছেন। আচার-আচরণে অস্বাভাবিকতা এসে পড়েছে এ-কারণেই।

মিসির আলি হঠাৎ লক্ষ করলেন, তাঁর চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। হানিফা নামের মেয়েটির জন্যে খারাপ লাগছে। বেশ খারাপ লাগছে। মেয়ে জাতটাই হচ্ছে মায়াবতীর জাত। কখন যে এই মেয়েটি মায়ায় জড়িয়ে ফেলেছে, নিজেই বুঝতে পারেন নি।

হানিফার সঙ্গে তাঁর আর কোনোদিন দেখা হবে না। ওঁরা নিশ্চয়ই তাঁদের মেয়েকে নিয়ে এখানে আসবেন না। তিনি নিজেও যাবেন না। কারণ তিনি কোনো পিছুটান রাখতে চান না কিংবা কে জানে, একদিন হয়তো যাবেন। দেখবেন, ঝড়ের রাতে পাওয়া ভিখিরি মেয়েটিকে রাজরানীবেশে কেমন লাগছে। সে কি মনে রাখবে তার দুঃসহ শৈশব? যদি রাখে, তবেই সে জীবনে অনেক বড় হবে। এবং তার ধারণা, এই মেয়েটি তা মনে রাখবে।

মিসির আলি চোখ মুছে নিজের ঘরে ঢুকলেন। বারবার চোখ ভিজে উঠছে কেন? তাঁর মতো এক জন শুকনো ধরনের মানুষের হৃদয়ে এত ভালবাসা কোত্থেকে এল?

দরজায় নক হচ্ছে। কে এল এত রাতে?

মিসির আলি দরজা খুলে অবাক হয়ে দেখলেন--আকন্দ সাহেব। তাদের গাড়ি দূরে দাঁড়িয়ে। তিনি শুধু একা নেমে এসেছেন। মিসির আলি অবাক হয়ে বললেন, 'কী ব্যাপার!'

'বাসার কাছাকাছি পৌঁছার পর মনে হল, আপনাকে আমি যথাযথ ধন্যবাদ দিই নি।'

'ধন্যবাদের কোনো প্রয়োজন নেই।'

'আপনার নেই। আপনি সাধারণ মানুষের উর্ধ্বে। কিন্তু আমি নিতান্তই সাধারণ মানুষ।'

ভদ্রলোক জড়িয়ে ধরলেন মিসির আলিকে এবং ছেলেমানুষের মতো চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন। ভদ্রলোকের স্ত্রী হানিফাকে নিয়ে নেমে এসেছেন গাড়ি থেকে। তিনি শক্ত করে হানিফার হাত ধরে রেখেছেন, যেন হাত ছেড়ে দিলেই মেয়েটি পালিয়ে যাবে।

মিসির আলি কোমল স্বরে বললেন, 'শান্ত হোন। আপনি শান্ত হোন। আসুন, ভেতরে গিয়ে বসি।'

ভদ্রলোক ধরা গলায় বললেন, 'প্লীজ, আরো কিছুক্ষণ আপনাকে জড়িয়ে রাখার সুযোগ দিন। প্লীজ।'

২২

বুধবার। সময় রাত দশটা চল্লিশ।

ওসমান সাহেবের ঘুমের সময় হয়ে গিয়েছে। ইদানীং তিনি সিডাকসিন না খেয়ে ঘুমাতে পারেন না। তিনি উঠলেন। একটি সিডাকসিন ট্যাবলেট খেয়ে মাথায় পানি ঢাললেন, হাত–মুখ ধুলেন। বিছানায় যাবার আগে রোজকার অভ্যেসমতো উঁকি দিলেন ফিরোজের ঘরে। গত তিন দিন তিন রাত ধরে ফিরোজ তার ঘরে আটক। দু' দিন দু' রাত সে ছটফট করেছে, জিনিসপত্র ভেঙেছে, খাবার ছড়িয়ে–ছিটিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আজ সারাদিন তেমন কিছু করে নি। ভাতটাত কিছুই খায় নি, তবে কোনো রকম চিৎকার এবং হৈচৈ করে নি। এখন সম্ভবত করবে। রাত বাড়ার সঙ্গে–সঙ্গে তার পাগলামি বাড়ে, অস্থিরতা বাড়ে।

ওসমান সাহেব ফিরোজের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে বেশ অবাক হলেন। ফিরোজ শান্ত ভঙ্গিতে বসে আছে। গায়ে একটি শার্ট। চুল আঁচড়িয়েছে। মুখভর্তি খোঁচা–খোঁচা দাড়ি নেই। শেভ করেছে। এবং সম্ভবত গোসলও করেছে। ওসমান সাহেব নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলেন না।

'কেমন আছ ফিরোজ?'

ফিরোজ ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল এবং সহজ স্বাভাবিক গলায় বলল, 'ভালো আছি। তুমি কেমন আছ বাবা?'

'ভালো, ভালো। আমি ভালো, বেশ ভালো।'

ওসমান সাহেবের বিস্ময়ের সীমা রইল না। কী অদ্ভুত কান্ড। ফিরোজ কি সুস্থ? নিশ্চয়ই সুস্থ।

'বাবা, মাকে ডাক। খিদে পেয়েছে, ভাত খাব।'

'নিশ্চয়ই খাবি, নিশ্চয়ই। কী দিয়ে খাবি?'

'যা আছে, তাই দিয়ে খাব। স্পেশাল কিছু লাগবে না।'

'লাগবে না কেন? নিশ্চয়ই লাগবে। দাঁড়া ডাকছি। তোর মাকে ডাকছি। তোর শরীরটা এখন ভালো, তাই না?'

'হ্যাঁ, ভালো। বাবা, আমার ঘরটা খুব নোংরা হয়ে আছে, একটা ঝাড়ু দিতে বল। তালা খোলার দরকার নেই। জানালা দিয়েই দাও।'

ওসমান সাহেব ঝাড়ু এনে দিলেন এবং ছুটে গেলেন স্ত্রীকে খবর দিতে। ফরিদাকে ঘুম ভাঙিয়ে তুলে এনে দেখেন, ফিরোজ ঘর মোটমুটি পরিষ্কার করে ফেলেছে। কত সহজ এবং স্বাভাবিক তার ব্যবহার! ফরিদার চোখে পানি এসে গেল।

'মা, ভাত দাও আমাকে। খুব খিদে লেগেছে।'

'দিচ্ছি বাবা, দিচ্ছি। এক্ষুণি দিচ্ছি।'

'জানালার শিকের ফাঁক দিয়ে দিও না মা। নিজেকে জন্তুর মতো লাগে। মনে হয় আমি চিড়িয়াখানার একটা পশু।'

'না না, জানালা দিয়ে খাবার দেব না। টেবিলে খাবার দিচ্ছি। তুই চেয়ার-টেবিলে বসে খাবি।'

'আর শোন মা, আমার বিছানার চাদর-টাদর বদলে দাও। ধবধবে সাদা চাদর দেবে।'

'দিচ্ছি রে বাবা, দিচ্ছি।'

আনন্দে ফরিদা বারবার মুখ মুছতে লাগলেন। সব ঠিক হয়ে গেছে। আর কোনো সমস্যা নেই, তাদের দুঃস্বপ্নের রাত শেষ হয়েছে।

খাবার টেবিলে ভাত সাজিয়ে ওসমান সাহেব ফিরোজের ঘরের চাবি খুললেন। ফিরোজ বেরিয়ে এল। তার হাতে লোহার রড। তার পরনে একটি কালো প্যান্ট, খালি গা। সে থমথমে গলায় বলল, 'কি, ভয় লাগছে? ভয়ের কিছু নেই। মিসির আলির সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। ও আমার চিকিৎসা করবে।'

ওসমান সাহেব একটি কথাও বলতে পারলেন না। ফিরোজ হেঁটে-হেঁটে গেল গেটের কাছে। দারোয়ানকে ঠাণ্ডা গলায় বলল গেট খুলে দিতে। দারোয়ান গেট খুলে দিল।

টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। আকাশে মেঘের পরে মেঘ জমতে শুরু করেছে। রাস্তায় কেন যে স্ট্রীট-লাইট নেই! ফিরোজ লম্বা-লম্বা পা ফেলে অন্ধকারে নেমে গেল।

২৩

বুধবার।

জাহিদ সাহেব রাত এগারটার দিকে এক জন ডাক্তার ডেকে আনলেন।

নীলুর আকাশ-পাতাল জ্বর। তিনি নিজে হতবুদ্ধি হয়ে গেছেন। ডাক্তারের অবস্থাও তাই। ডাক্তার মুখ শুকনো করে বলল, 'এই মেয়েকে এক্ষুণি হাসপাতালে নিতে হবে। আমি আমার ডাক্তারি জীবনে এত জ্বর কারো দেখি নি। আপনি মেয়েটির মাথায় বরফ চাপা দেবার ব্যবস্থা করুন। আগে টেম্পরেচার কমাতে হবে।'

ফ্রীজে বরফ ছিল না। তারা দু' জন ধরাধরি করে নীলুকে বাথরুমে নিয়ে ঝরনার কল খুলে দিল। পানির ধারার স্রোতে যদি গায়ের তাপ কমানো যায়।

নীলু পড়ে আছে মড়ার মতো। তার চোখ রক্তবর্ণ। সে কিছুক্ষণ পরপরই মাথা ঘুরিয়ে চারদিকে তাকাচ্ছে এবং ফিসফিস করে বলছে, 'স্যারের বড় বিপদ! তুমি কি তাকে দেখবে না? এইটুকু কি তুমি আমার জন্য করবে না?'

জাহিদ সাহেব ডাক্তারকে বললেন, 'এই সব কী বলছে ডাক্তার সাহেব?'

'প্রলাপ বকছে। ডেলিরিয়াম। আপনি মেয়ের কাছে থাকুন, আমি অ্যাম্বুলেন্সের জন্যে যাচ্ছি। টেলিফোন আছে তো?'

'জ্বি আছে। বসার ঘরে।'

ডাক্তার সাহেব দ্রুত নিচে নেমে গেলেন। নীলু কাতর স্বরে বলল, 'বাবা, তুমি খানিকক্ষণ আমাকে একা থাকতে দাও। আমি ওর সঙ্গে কথা বলি।'

'কার সঙ্গে কথা বলবি?'

'যে আমার সঙ্গে থাকে, তার সঙ্গে। ওর সাহায্য আমার ভীষণ দরকার। বাবা, প্লীজ। প্লীজ। তুমি আছ বলে সে আমার সঙ্গে কথা বলতে পারছে না। বাবা, আমি তোমার পায়ে পড়ি।'

নীলু সত্যি সত্যি হাত বাড়িয়ে বাবার পা স্পর্শ করল। জাহিদ সাহেব বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন এবং সঙ্গে-সঙ্গেই চাঁপা ফুলের তীব্র সুবাস পেলেন।

স্পষ্ট শুনলেন নূপুর পায়ে কে যেন হাঁটছে। নীলুর কথাও শোনা যাচ্ছে, 'আমার এত বড় বিপদে তুমি আমাকে দেখবে না?'

অপরিচিত একটি কণ্ঠ শোনা গেল। জাহিদ সাহেব কিছু বুঝতে পারলেন না। তিনি একমনে আয়াতুল কুরসি পড়তে লাগলেন।

২৪

বুধবার মধ্যরাত্রি।

মিসির আলির রুটিনের ঝামেলা শুরু হয়ে গেছে। ঘরে রান্না হয় নি। তাঁকে রাতে হোটেলে খেয়ে আসতে হয়েছে। ডাল-গোশত নামের যে খাদ্যটি তিনি কিছুক্ষণ আগে গলাধঃকরণ করেছেন, তা এখন জানান দিচ্ছে। মিসির আলি পেটে ব্যথা নিয়ে জেগে আছেন। ফুড পয়জনিং-এর লক্ষণ কি না কে জানে? পেটের ব্যথা ভুলে থাকবার সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে থ্রিলারজাতীয় কোনো রচনায় মনোনিবেশ করা। কিন্তু ঘরে এ জাতীয় কোনো বই নেই। তবু মিসির আলি বুকসেলফের কাছে গেলেন। সবই একাডেমিক বই। একটি সায়েন্স ফিকশন পাওয়া গেল--Horseman from the sky.' তেমন কোনো ইন্টারেস্টিং বই নয়। আগে এক বার পড়েছেন। তবুও সেই বই হাতে নিয়েই বিছানায় গেলেন এবং তখন ইলেকট্রিসিটি চলে গেল। বৃষ্টি ও বাতাস দুই-ই থেমে গেছে, তবুও। মাঝরাতে লোড শেডিং হবার কথা নয়, কিন্তু ঢাকা শহরের ইলেকট্রিসিটির কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই।

মিসির আলি অত্যন্ত বিরক্ত মুখে ড্রয়ার খুললেন। আশ্চর্যের ব্যাপার, ড্রয়ারে বড় বড় দু'টি মোমবাতি পাওয়া গেল। হানিফা নিশ্চয়ই একসময় কিনে রেখে দিয়েছে। মিসির আলি মোমবাতি জ্বালিয়ে বই খুললেন। দ্বিতীয় বার পড়বার সময় বইটি অনেক বেশি আকর্ষণীয় মনে হল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি শারীরিক ব্যথা ভুলে আগ্রহ নিয়ে বইয়ের পাতা ওল্টাতে লাগলেন। চমৎকার লেখা--এক ভোরবেলায় মস্কো শহরের প্রাণকেন্দ্রে এক ঘোড়সওয়ারের আগমন হল। লোকটির চেহারা কুৎসিত। মাথায় সার্কাসের

ক্লাউনের টুপির মতো এক টুপি। সে তার ঘোড়া নিয়ে নানান খেলা দেখাতে শুরু করল। দেখতে দেখতে তাকে ঘিরে ভিড় জমে গেল।

এত মজার একটি বই আগের বার পড়তে এত বাজে লাগছিল কেন পাঠকের জন্য মিসির আলি উঠে দাঁড়ালেন--চা বানাবেন। চা খেতে-খেতে আরাম করে পড়া যাবে। তাঁর মনে হল, মোমবাতির আলোয় বই পড়ায় আলাদা একটা আনন্দ আছে। আধো আলো আধো ছায়া। বইয়ের জগৎটিও তো তাই--অন্ধকার এবং আলোর মিশ্রণ। লেখকের কল্পনা হচ্ছে আলো, পাঠকের বিভ্রান্তি হচ্ছে অন্ধকার। নিজের তৈরি উপমা নিজের কাছেই চমৎকার লাগল তাঁর। তিনি নিজেকে বাহবা দিয়ে সিগারেটের জন্যে পাঞ্জাবির পকেটে হাত দিতেই দরজায় খুব হালকাভাবে কে যেন কড়া নাড়ল।

মিসির আলি ঘড়ি দেখলেন, রাত প্রায় একটা। এত রাতে কে আসবে তাঁর কাছে! তিনি বিস্মিত স্বরে বললেন, 'কে, কে '

কোনো জবাব পাওয়া গেল না। মিসির আলি গলা উঁচিয়ে বললেন, 'কে ওখানে '

'আমি।'

মিসির আলির বিস্ময়ের সীমা রইল না। নীলুর গলা। সে এত রাতে এখানে কী করছে পাগল নাকি!

'কি ব্যাপার নীলু '

নীলু জবাব দিল না। ছোট একটি নিঃশ্বাস ফেলল। মিসির আলি ছুটে গিয়ে দরজা খুললেন--নীলু নয়, ফিরোজ দাঁড়িয়ে আছে।

ফিরোজের দু'টি হাত পেছন দিকে। সে হাতে সে কী ধরে আছে তা মিসির আলির বুঝতে অসুবিধা হল না। তাঁর শিরদাঁড়া দিয়ে শীতল স্রোত বয়ে গেল। তিনি হাসতে চেষ্টা করলেন।

'কেমন আছ ফিরোজ নীলুর গলা তো চমৎকার ইমিটেট করলে। এস, ভেতরে এস। ইস, ভিজে গেছ দেখি!'

ফিরোজ ভেতরে ঢুকল। পলকের জন্যে মিসির আলির ইচ্ছা করল ছুটে পালিয়ে যেতে। কিন্তু তিনি পারলেন না। তাঁর পা পাথরের মতো ভারি হয়ে গেছে। অত্যন্ত সহজ এবং স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কথা বলার চেষ্টা করলেন।

'কিছু খাবে, ফিরোজ চা খাবে ঠাণ্ডায় চা-টা ভালো লাগবে। ইন ফ্যাক্ট আমি চা বানানোর জন্যেই উঠেছিলাম।

ফিরোজ দাঁড়িয়ে আছে ঘরের মাঝখানে। সে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টিতে। সে মাঝে-মাঝে ঠোঁট টিপে হাসছে।

মিসির আলি বললেন, 'বস ফিরোজ, দাঁড়িয়ে আছ কেন এতক্ষণ শুয়ে-শুয়ে বই পড়ছিলাম। একটা সায়েন্স ফিকশন। তুমি কি সায়েন্স ফিকশন পড় '

ফিরোজ এবার শব্দ করে হাসল। মিসির আলি শিউরে উঠলেন। কী অমানুষিক হাসি! এই হাসির জন্ম পৃথিবীতে নয়, অন্য কোনো ভুবনে। অচেনা ভয়ঙ্কর এক ভুবন, যার কোনো রহস্যই মিসির আলির জানা নেই। মিসির আলির সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে গেল। তিনি বহু কষ্টে বললেন, 'তুমি কি আমাকে মেরে ফেলবে ফিরোজ '

'হ্যাঁ।'

'কেন ফিরোজ আমি কি তোমার ক্ষতি করেছি

ফিরোজ তার জবাব দিল না। লোহার রডটি উঁচু করল। মিসির আলি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। চিৎকার দিতে ইচ্ছে করল, চিৎকার দিতে পারলেন না। তাঁর কাছে শুধু মনে হল, মোমবাতির আলো অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হয়ে উঠছে এবং আশ্চর্যের ব্যাপার--ছেলেবেলার একটি স্মৃতি তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরমের এক দুপুরে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছেন ব্রহ্মপুত্রের শীতল জলে। ঠাণ্ডা ও ভারি সেই পানি। মাছের চোখের মতো সেই স্বচ্ছ জলে ইচ্ছে করে তলিয়ে যেতে।

মৃত্যুর আগে গত জীবন চোখের সামনে এক বার হলেও ভেসে ওঠে, এটা কি সত্য? হয়তো সত্য। নয়তো হঠাৎ করে ভুলে-যাওয়া শৈশবের এই ছবি চোখে ভাসবে কেন?

মিসির আলি কিছু-একটা বলতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু বলতে পারলেন না। তার আগেই লোহার রড প্রচণ্ড বেগে নেমে এল তাঁর দিকে। চারদিকে সীমাহীন অন্ধকার। তীব্র ও তীক্ষ্ণ ব্যথা। এক গভীর শূন্যতা। মিসির আলি বুঝতে পারছেন, তিনি তলিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর চারদিকে সীমাহীন জলরাশি। তিনি কিছু বলতে চেষ্টা করলেন--বলতে পারলেন না।

মিসির আলি। মিসির আলি। তাকাও তুমি। তাকিয়ে দেখ।

মিসির আলি চোখ মেললেন। মোমবাতি জ্বলছে। আলো এবং আঁধার। তিনি কি বেঁচে আছেন? নাকি এটা মৃত্যুর পরের কোনো জগৎ? কোনো অদেখা ভুবন?

'মিসির। মিসির।'

কে কথা বলে? কোত্থেকে আসছে কিন্নরকণ্ঠ। ঘাড় ঘুরিয়ে কিছু দেখার উপায় নেই। সমস্ত শরীর অসহ্য ব্যথায় কুঁকড়ে যাচ্ছে। নিঃশ্বাস নিতে এত কষ্ট। এত কষ্টও আছে পৃথিবীতে? কোথায়, ফিরোজ কোথায়?

মিসির। মিসির আলি। আর কোনো ভয় নেই, সে পালিয়ে গেছে। আমি এসেছি। তাকাও, তাকাও আমার দিকে।

কে পালিয়ে গেছে? কে কথা বলছে? কার দিকে তাকাতে বলছে? মিসির আলি তাকাতে গিয়ে ব্যথায় নীল হয়ে গেলেন। মুখ ভর্তি করে বমি করলেন। টকটকে লাল রক্ত এসেছে বমিতে। ফুসফুস ফুটো হয়েছে। পাঁজরের হাড় ঢুকে গেছে ফুসফুসে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে এই কারণে।

মিসির আলির চোখে জল এসে গেল—এত কষ্ট, এত কষ্ট!

'মিসির, মিসির।'

'কে তুমি?'

'তাকিয়ে দেখ।'

মিসির আলি তাকালেন। যন্ত্রণা এবং ব্যথার জন্যেই কি তিনি এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখছেন? হেলুসিনেশন? হেলুসিনেশন।

'মিসির আলি, আমি কে বল তো।'

'জানি না, কে।'

'ভালো করে দেখ, ভালো করে দেখ। চোখ নামিয়ে নিচ্ছ কেন? আমার সঙ্গে কথা

বলতে থাক, তাতে ব্যথা ভুলে থাকবে। বল আমি কে?'

মিসির আলি আবার মুখ ভর্তি করে বমি করলেন।

'আমিই সেই দেবী। তুমি তো আমাকে বিশ্বাস কর না। নাকি এখন করছ?'

'তুমি আমার কল্পনা। উইশফুল থিংকিং। দেবী আবার কী?'

'আমিই কিন্তু তোমাকে বাঁচিয়েছি।'

দেবীমূর্তি খিলখিল করে হেসে উঠল। কী চমৎকার হাসি! কী অপূর্ব সুরধ্বনি! ঘরে চাঁপা ফুলের গন্ধ, তীব্র সৌরভ। হেলুসিনেশন। হেলুসিনেশন হচ্ছে। হেলুসিনেশন ছাড়া এ আর কিছুই নয়।

দেবী হাসল। চাঁপা ফুলের গন্ধ কি দেবীর গা থেকেই আসছে? তাকে রক্তমাংসের মানবীর মতোই লাগছে। ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু কী কষ্ট! কী কষ্ট! মিসির আলি হাঁফাতে-হাঁফাতে বললেন, 'দেবী, আমার কষ্ট কমিয়ে দাও।'

'আমাকে বিশ্বাস করছ তাহলে?'

'না।'

'কেন করছ না? এ জগতের সমস্তই কি যুক্তিগ্রাহ্য? এই আকাশ, অনন্ত নক্ষত্রপুঞ্জ? তুমি কি বলতে চাও, এর কোথাও কোনো রহস্য নেই? অসীম কী? এই সামান্য প্রশ্নের জবাব কি তোমার জানা আছে? বল, তুমি জান?'

'আজ জানি না, কিন্তু একদিন জানব। আমি না জানলেও আমার পরবর্তী বংশধর জানবে।'

'মিসির আলি, তুমি বড় অদ্ভুত লোক!'

মিসির আলি কাতর কণ্ঠে বললেন, 'আমার ব্যথা কমিয়ে দাও, আমার ব্যথা কমিয়ে দাও।'

দেবী হেসে উঠল। মৃদু স্বরে বলল, 'আমায় বিশ্বাস করছ না, অথচ ব্যথা কমিয়ে দিতে বলছ?'

'বড় কষ্ট, বড় কষ্ট!'

'তোমার বন্ধু চলে আসছে। তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে। তুমি আবার সুস্থ হয়ে উঠবে। এবং মজার ব্যাপার কি জান? নীলুর সঙ্গে বিয়ে হবে তোমার। যদি কোনোদিন হয়, আমার কথা মনে করো।'

মিসির আলি আচ্ছন্ন হয়ে পড়তে লাগলেন। তিনি দেবীর কথা এখনো শুনতে পাচ্ছেন। কী অপূর্ব কণ্ঠ! কী অলৌকিক সৌন্দর্য! কিন্তু এ সবই মায়া। অসুস্থ ব্যথা-জর্জরিত মনের সুখ-কল্পনা। প্রকৃতি চাচ্ছে নারকীয় কষ্ট থেকে তাঁর মন ফিরিয়ে নিতে। সে-জন্যেই সুখের স্বপ্ন দেখিয়ে তাঁকে ভোলাচ্ছে। হয়তো নীলুর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হবে। তাতে কিছুই প্রমাণিত হয় না। প্রমাণ বড় কঠিন জিনিস। বড় কঠিন।

মিসির আলি কাতর কণ্ঠে বললেন, 'কষ্ট কমিয়ে দাও। কষ্ট কমিয়ে দাও।'

অপরূপা নারীমূর্তি চাঁপা ফুলের গন্ধ ছড়াতে-ছড়াতে দূরে সরে যাচ্ছে। তার পায়ে ঝুমঝুম করছে নূপুর। কে যেন দরজা ধাক্কা দিচ্ছে। কে সে? সাজ্জাদ হোসেন? ওরা কি ধরে ফেলেছে ফিরোজকে? ওকে সুস্থ করে তুলতে হবে। ইসিটি দিয়ে দেখলে হয়। কিংবা কে জানে হয়তো এখন সে সুস্থ। তাঁকে একবার আঘাত করেই তার চেতনা ফিরে এসেছে।

হানিফা। হানিফা কেমন আছে? কোথায় আছে? সুখে আছে তো?

আহ্, বড় কষ্ট। কেউ আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দাও—ঘুম পাড়িয়ে দাও। আমি তলিয়ে যেতে চাই অতল অন্ধকারে। বড় কষ্ট, বড় কষ্ট।

সাজ্জাদ হোসেন দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন। টর্চের আলো ফেললেন মিসির আলির মুখে। সাজ্জাদ হোসেনের মুখে এক ধরনের প্রশান্তি লক্ষ করা গেল। কারণ, নগ্নগাত্র আগন্তুককে কিছুক্ষণ আগেই ধরা হয়েছে। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, পুলিশকে সে প্রথম যে-কথাগুলি বলে, তা হচ্ছে, 'আপনারা স্যারকে বাঁচানোর চেষ্টা করুন। এক্ষুণি হাসপাতালে নিয়ে যান। আর আমার বাবাকে টেলিফোন করে বলুন, আমি ভালো হয়ে গেছি। স্যারের বাসায় এক জনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সে আমাকে ভালো করে দিয়েছে।'

গল্পের অধিকাংশ চরিত্রই কাল্পনিক। পরিচিত কিছু চরিত্র এবং কিছু ঘটনা ব্যবহার করেছি। তবে কাউকে হেয় করবার জন্যে করা হয় নি। মানুষের প্রতি আমার মমতা মিসির আলির মতো হয়তো নয়, কিন্তু খুব কমও নয়।

নিষাদ

১

মিসির আলি আগ্রহ নিয়ে তাকে দেখছেন। রোগা লম্বা এক জন মানুষ। মুখ দেখা যাচ্ছে না, কারণ লোকটি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এই গরমেও ফুল হাতা ফ্লানেলের শার্ট, ফুলপ্যান্টটি চকচকে কাপড়ের তৈরী। ছাঁটের ধরন দেখে মনে হয় সেকেণ্ডহ্যাণ্ড মার্কেট থেকে কেনা। এ ধরনের ছাঁটের প্যান্ট ঢাকায় এখন চালু নেই। পায়ের জুতা জোড়া ঝকঝক করছে। মনে হচ্ছে এখানে আসবার আগে জুতা পালিশ করেছে। মিসির আলি লোকটির বয়স আন্দাজ করবার চেষ্টা করলেন। কুড়ি থেকে পঁচিশের মধ্যে হবার কথা। এই বয়সের যুবকদের চেহারায় এক ধরনের আভা থাকে। যৌবনের আভা। এর তা নেই। অল্প বয়সে চুলও পেকেছে বলে মনে হচ্ছে। কানের পাশে রুপোলি ছোঁয়া। মিসির আলি বললেন, 'আপনি কি আমার কাছে এসেছেন?'

সে জবাব দিতে দেরি করছে। যেন এই প্রশ্নের জবাব তার জানা নেই। মিসির আলি আবার বললেন, 'আপনি কি আমার কাছে এসেছেন?'

'জ্বি।'

'আপনি মনে হয় আগেও কয়েক বার এসেছিলেন?'

'জ্বি।'

'এক বার একটি চিঠি লিখে গিয়েছিলেন, তাই না? লিখেছিলেন—সোমবার সন্ধ্যায় আসব।'

'জ্বি স্যার।'

'আমি কিন্তু সোমবার সন্ধ্যায় আপনার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। আপনি আসেন নি।'

'একটা কাজ পড়ে গিয়েছিল স্যার।'

লোকটি খুব সহজেই স্যার বলছে। তার মানে ছোট কোনো চাকরি করে। অফিসের প্রায় সবাইকে বোধহয় স্যার বলতে হয়, যে-কারণে এটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। খারাপ অভ্যাস। মিসির আলি বললেন, 'আপনি কী করেন?'

'সামান্য একটা কাজ করি। বলার মতো কিছু না।'

'আসুন। ভেতরে আসুন।'

'আজ যাই স্যার। আরেক দিন আসব।'

মিসির আলি অত্যন্ত অবাক হলেন। এই লোকটি বারবার তাঁর খোঁজে আসছে, চিঠি লিখে যাচ্ছে। আজ দেখা হল, কিন্তু সে থাকতে চাচ্ছে না। মনের ভেতর বড় রকমের কোনো দ্বিধার ভাব আছে, যা সে কাটাতে পারছে না। মিসির আলি বললেন, 'আপনি চলে যেতে চাচ্ছেন, চলে যাবেন। কিছুক্ষণ বসে যান। আমার কাছে কেন এসেছেন, সেটা বলুন।'

'অন্য আরেক দিন আসব।'

'সেদিন হয়তো আমাকে পাবেন না। আমি বাসায় খুব কম থাকি। আমার অনেক ঝামেলা।'

লোকটি খুবই অস্বস্তি নিয়ে ভেতরে ঢুকল। জুতা জোড়া নিয়ে একটু চিন্তা করছে। খুলে ফেলবে কি ফেলবে না। মিসির আলি লক্ষ করলেন, লোকটি নিজেই বসার ঘরের দরজা বন্ধ করছে। ছিটকিনি লাগানোর চেষ্টা করছে। এটাও হয়তো তার অভ্যাস। সে খুব সম্ভব তার ঘরে ঢুকেই ছিটকিনি লাগিয়ে দেয়। তাই যদি হয়, তাহলে লোকটি থাকে একা। যে বাড়িতে অনেকগুলি মানুষ থাকে, সে-বাড়ির কেউ ঘরে ঢুকেই ছিটকিনি লাগানোর অভ্যাস করবে না।

মিসির আলি বললেন, 'এ-বাড়ির ছিটকিনি লাগানোর একটা বিশেষ কায়দা আছে। আপনি পারবেন না। আপনি বসুন, আমি লাগাচ্ছি।'

লোকটি বসল। বসার ভঙ্গি বিনীত। হাত মুঠি করে কোলের উপর রাখা। ঈষৎ কুঁজো হয়ে বসেছে। গায়ের রঙ বেশ ফর্সা। অতিরিক্ত ফর্সা হবার কারণেই বোধহয় চেহারায় খানিকটা মেয়েলি ভাব চলে এসেছে। অবশ্যি এটা জোড়া ভুরু ও পাতলা ঠোঁটের কারণেও হতে পারে। এই ধরনের ছেলেদেরকেই স্কুলে সবাই 'মেয়ে' বলে খেপায়। এবং উঁচু ক্লাসের কিছু বখা ছেলে বিশেষ কারণে এদের বন্ধুত্ব কামনা করে।

মিসির আলি বললেন, 'আপনার নাম কি?' লোকটি জবাব দিল না। ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। এখন সে তাকাচ্ছে জানালা দিয়ে। মিসির আলি অবাক হয়ে বললেন, 'নাম বলতে কি আপনার আপত্তি আছে?'

'জ্বি-না।'

'তাহলে নাম বলুন। নাম দিয়েই শুরু করা যাক।'

'আমার নাম রইসুদ্দিন।'

'শুধু রইসুদ্দিন। নাকি রইসুদ্দিনের সঙ্গে অন্য কিছু আছে?'

'মোঃ রইসুদ্দিন।'

'দেখুন ভাই, আপনি কিন্তু ঠিক নামটা বলছেন না। মিথ্যা কথা বলায় যারা অভ্যস্ত নয়, তারা যখন মিথ্যা বলে, তখন তাদের গলা কেঁপে যায়। খুব দ্রুত চোখের পাতা পড়ে এবং খানিকটা ব্লাশ করে। আপনার বেলায় এর সব ক'টি হয়েছে।'

'আমার ভালো নাম মুনির। ডাক নাম টুনু।'

'চা খাবেন?'

'জ্বি স্যার, খাব।'

'আপনি আরাম করে বসুন, আমি চা বানিয়ে আনছি। ঘরে কাজের কোনো লোক নেই। সব আমাকেই করতে হবে। আপনি আমার কাছে কি জন্যে এসেছেন তা এখন বলবেন? না চা খেয়ে বলবেন?'

'স্যার আমি খুব বিপদে পড়েছি।'

'বিপদে পড়লে লোকজন যায় পুলিশের কাছে। আমার কাছে কেন? আমি তো পুলিশ নই।'

'অন্য রকম বিপদ। আপনি না শুনলে বুঝবেন না। আগে শুনতে হবে।'

'বেশ শুনছি, তাতে লাভ হবে কি?'

'আপনি অনেকের অনেক সমস্যার সমাধান করেছেন--আমি অনেক কিছু আপনার সম্পর্কে শুনেছি।'

'শুনেছেন, খুব ভালো কথা। কী শুনেছেন, জানি না। তবে আপনাকে আগেভাগেই বলে রাখি, আমার দৌড় খুব সামান্য। আমি অ্যাবনরমেল সাইকোলজি নিয়ে কিছু পড়াশোনা করেছি--এই পর্যন্তই।'

মুনির মাথা নিচু করে বসে আছে। কোনো কথা সে শুনছে বলে মনে হচ্ছে না। মিসির আলি বললেন, 'আপনার বাসা কোথায়?'

মুনির তার জবাব দিল না। মাথা নিচু করে ফেলল। অর্থাৎ সে তার ঠিকানা জানাতে ইচ্ছুক নয়। মিসির আলি চা বানাতে গেলেন। ঘরে কোনো খাবার নেই। বিস্কিট-টিস্কিটজাতীয় কিছু দিতে পারলে ভালো হত। লোকটি ক্ষুধার্ত। হয়তো অফিস শেষ করে সরাসরি চলে এসেছে। কিছু খাওয়া হয় নি। কিংবা বিকেলে কিছু খাবার মতো সামর্থ্য নেই। এটি হওয়াই স্বাভাবিক। নিম্ন আয়ের মানুষরা এ-দেশে পশুর জীবন-যাপন করে।

মিসির আলি চা নিয়ে বসার ঘরে ঢুকে চমকে উঠলেন। কেউ নেই। দরজা ভেজানো। লোকটি এক ফাঁকে উঠে চলে গিয়েছে। নিঃশব্দ প্রস্থান যাকে বলে। মিসির আলি হেসে ফেললেন। এ-জীবনে তিনি অনেক বিচিত্র মানুষ দেখেছেন। তাদের অদ্ভুত আচার-আচরণের সঙ্গে তিনি পরিচিত। এই লোকটির প্রস্থান ঘটনা হিসেবে তেমন অদ্ভুত নয়, তবু বেশ মজার। তবে নিঃশব্দ প্রস্থানের এই ঘটনার ব্যাখ্যা বেশ সরল। লোকটি যে-বিপদের কথা বলতে এসেছিল, শেষ মুহূর্তে ঠিক করেছে তা সে বলবে না। এ-রকম মনে করারও অনেকগুলি কারণ হতে পারে। প্রথম কারণ-- সম্ভবত মিসির আলিকে দেখে তার আশাভঙ্গ হয়েছে। মনে হয়েছে, এই লোকটিকে দিয়ে কাজ হবে না। দ্বিতীয় কারণ--বিপদটা এমন শ্রেণীর যা বলার মতো মনের জোর তার নেই।

'স্যার, আসব?'

মিসির আলি চমকে উঠলেন। লোকটি ফিরে এসেছে। তার চোখে-মুখে অপ্রস্তুত ভঙ্গি। যেন সে বড় ধরনের অপরাধ করে এসেছে। এই অপরাধের জন্যে সে লজ্জিত, অনুতপ্ত।

'কোথায় গিয়েছিলেন?'

'আপনার জন্যে এক প্যাকেট সিগারেট আনতে গিয়েছিলাম। বেশি কিছু দেবার সামর্থ্য স্যার আমার নেই। আমি দরিদ্র মানুষ।'

তিনি হাত বাড়িয়ে সিগারেটের প্যাকেট নিলেন। বেনসন এণ্ড হেজেস, নির্ঘাৎ পঞ্চাশ টাকার মতো খরচ হয়েছে। লোকটি আগের মতো মাথা নিচু করে বসে আছে। চোখের পাতা পর্যন্ত ফেলছে না।

'আমাকে কী বলতে এসেছেন, বলুন।'

লোকটি কিছু বলল না। মিসির আলি সিগারেট ধরিয়ে হালকা স্বরে বললেন, 'যদি বলতে না-চান বলার দরকার নেই। আসুন অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আলাপ করি। গরম কেমন পড়েছে বলুন।'

'খুব গরম পড়েছে স্যার।'

'এই প্রচণ্ড গরমে ফ্লানেলের শার্ট গায়ে দিয়েছেন কেন? আপনার গরম লাগছে না?'

'আমার আর কোনো ভালো শার্ট নেই। আমি দরিদ্র।'

'দরিদ্র হওয়াতে লজ্জাবোধ করার কিছু নেই। ধনী ব্যক্তিদের বরং লজ্জিত হওয়া উচিত। আপনার চা-টা মনে হচ্ছে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। গরম করে আনব?'

'জ্বি-না।'

লোকটি ঠাণ্ডা চায়ের কাপে চুমুক দিতে লাগল। যেন সে একটি অপ্রিয় দায়িত্ব পালন করছে।

'আপনি কি আমাকে সত্যি সত্যি কিছু বলবেন?'

'জ্বি স্যার, বলব।'

'বলুন।'

মুনির চুপ করে আছে। ইনহিবিশন বলে একটা ব্যাপার আছে। এটা হচ্ছে তাই। প্রথম বাধাটি সে কাটিয়ে উঠতে পারছে না। মিসির আলির মনে হল, লোকটি নিঃসঙ্গ প্রকৃতির। একা-একা থাকে। মানুষের সঙ্গে কথা বলার অভ্যেস নেই। যা সে বলতে চায়, তা বলার জন্যে তাকে প্রচুর সাহস সঞ্চয় করতে হবে। মিসির আলি তাকে সময় দিলেন।

বাইরে সন্ধ্যা নামতে শুরু করেছে। আকাশ থমথমে। দূরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ঝড় আসবে সম্ভবত। আসুক। এই গরম আর সহ্য করা যাচ্ছে না। ইচ্ছা করছে কোনো একটা পুকুরে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে বসে থাকতে।

ঘর অন্ধকার। বাতি জ্বালান দরকার। মিসির আলি বাতি জ্বালালেন না। ইনহিবিশন কাটানোর জন্যে অন্ধকার একটা চমৎকার জিনিস।

মুনির মূর্তির মতো বসে আছে। সে এবার ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলে মৃদু স্বরে কথা বলা শুরু করল। তার গলার স্বর মিষ্টি। শুনতে ভালো লাগে। গলার স্বরে কোথাও যেন একটি ধাতব চরিত্র আছে। মেয়েদের গলার স্বরে তা মানিয়ে যায়। পুরুষদের সঙ্গে ঠিক মানায় না।

২

'আমার ডাক নাম টুনু। আমার একটা ছোট্ট বোন ছিল, ওর নাম ছিল নুটু। টুনু উল্টো

করলে হয় নুটু। বাবা এই নাম রাখলেন। কারণ ওর স্বভাব ছিল আমার একেবারে উল্টো। আমি ছোটবেলা থেকেই খুব শান্ত প্রকৃতির। কারো সঙ্গে তেমন কথাবার্তা বলতাম না। কেউ ধমক দিয়ে কিছু বললে সঙ্গে-সঙ্গে কেঁদে ফেলতাম। আর নুটু ছোটবেলা থেকেই হৈচৈ স্বভাবের মেয়ে। আমাদের বাড়ির সঙ্গে লাগোয়া একটা জামগাছ ছিল। নুটু ঐ জামগাছ বেয়ে ছাদে উঠে যেতে পারত। আমাদের বাড়িটা ছিল পুরনো ধরনের, ছাদে ওঠার কোনো সিঁড়ি ছিল না। ছাদে কোনো রেলিং ছিল না। বর্ষাকালের ভেজা ছাদে সে দৌড়াত, লাফালাফি করত। কারো কোনো কথা শুনত না। আমার মা এই জন্যে তাকে খুব মারধোর করতেন। তাতে কোনো লাভ হত না। শেষ পর্যন্ত এক বর্ষাকালে আমার মা কাঠমিস্ত্রি লাগিয়ে জামগাছটা কেটে ফেললেন।'

এই পর্যন্ত বলতেই মিসির আলি তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'আপনি তো নিতান্তই পারিবারিক গল্প শুরু করেছেন। আপনার যে-সমস্যা, তা তো আমার মনে হচ্ছে বর্তমান সময়ের সমস্যা। শৈশব থেকে শুরু করেছেন কেন বুঝতে পারছি না। এর কি দরকার আছে?'

'জ্বি স্যার, আছে।'

'বেশ, বলুন।'

আমাদের বাসা ছিল নেত্রকোণায়। বাবা ছিলেন নেত্রকোণা কোর্টের উকিল। তাঁর খুব পসার ছিল। সকালবেলা এবং সন্ধ্যাবেলায় আমাদের বাংলাঘরে মক্কেল বসে থাকত। কেউ-কেউ রাতে থাকত। তাদের জন্যে আলাদা থালাবাটি ছিল, গামছা ছিল, খড়ম ছিল। মামলা করতে মহিলারাও আসতেন। তাঁদের জায়গা হত ভেতরের বাড়িতে। ভেতরের বাড়িতে তাঁদের জন্যেও আলাদা ঘর ছিল।····

'আমরা ভাইবোন বাবার দেখা পেতাম না বললেই হয়। আমাদের সঙ্গে কথা বলার মতো অবসর তাঁর ছিল না। তবে রাতে ঘুমুবার সময় আমাদের দুই ভাইবোনকে দু'পাশে নিয়ে ঘুমুতেন। অর্ডার দিয়ে বিশাল একটা খাট বানিয়েছিলেন। রেলিংঘেরা খাট। আমরা যাতে গড়িয়ে পড়ে যেতে না পারি সেই ব্যবস্থা। বাবা আমাদের দু' জনের পা তাঁর গায়ের উপর তুলে দিয়ে ঘুমুতেন। তাঁর ঘুমও ছিল খুব সজাগ। আমরা কেউ পা নামিয়ে ফেললে তিনি সেই পা আবার তুলে দিতেন।····

'বাবা খুব খরচে স্বভাবের মানুষ ছিলেন। আমার মনে আছে, আমাদের দু' ভাইবোনের একসঙ্গে আকিকা হয়। আমার বয়স তখন নয়, নুটুর সাত।

'আকিকা উপলক্ষে নেত্রকোণা শহরের প্রায় সবাইকে তিনি নিমন্ত্রণ করেন। দুপুর বারটা থেকে খাওয়া শুরু হল, চলল রাত বারটা পর্যন্ত। রান্নার জন্য ডেকচি আর বাবুর্চি আনা হয়েছিল ময়মনসিং থেকে। শম্ভুগঞ্জ থেকে এসেছিল হালুইকার। আমার মনে আছে, সারাদিন বাবা অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে ছোটাছুটি করলেন। নিমন্ত্রিত অতিথিদের বললেন, মাঘ মাসে গ্রামের বাড়িতেও একটা অনুষ্ঠান করবেন। গ্রামের লোকদের বঞ্চিত করার কোনো মানে হয় না। ওরা মনে কষ্ট পাবে। টাকাপয়সা তো খরচের জন্যেই।····

আকিকা উপলক্ষে আমাদের নাম বদলে গেল। আমার নাম হল মনিরুল ইসলাম চৌধুরী। আর নুটুর নাম হল ফুলেশ্বরী। নাম নিয়ে খুব আপত্তি উঠল। মৌলানা সাহেব বললেন--এটা হিন্দু নাম। হিন্দু নাম রাখা যাবে না।

'বাবা বললেন, ''নামের আবার হিন্দু-মুসলমান কি? এইটা আমার খুব পছন্দের নাম। এই নামই রাখতে হবে। আপনি আপত্তি করলে অন্য কাউকে ডাকি।'' ···

মৌলানা সাহেব আপত্তি করলেন না। আমরা অসংখ্য বিচিত্র ধরনের উপহারের সঙ্গে নতুন নাম পেলাম। উপহার দিয়ে বাংলাঘরের একটা বিশাল চৌকি ভর্তি হয়ে গেল। পেতলের কলসি, ছাতা, কাঁসার বাসন, গায়ের চাদর--এইসব ছিল উপহার। বাবা আকিকার পরপর ঘোষণা করলেন, ''এখন থেকে এদের ডাকনামে কেউ ডাকবে না। যদি কেউ ডাকে কঠিন শাস্তি হবে।'' ···

'আমি ক্লাস নাইনে পড়বার সময় বাবা মারা গেলেন। স্কুল থেকে এসে শুনি বাবা অসুস্থ। সকাল-সকাল কোর্ট থেকে চলে এসেছেন। শুয়ে আছেন তাঁর বিশাল খাটে। মশারি ফেলা। বাবা উহ্ আহ্ করছেন। বাবার মাথার পাশে ঘোমটা দিয়ে মা বসে আছেন। বাবার বন্ধু ইদরিস চাচা বসে আছেন চেয়ারে। তাঁর হাতে পানের বাটা। তিনি একটু পরপর পান মুখে দিচ্ছেন। ইদরিস চাচা বললেন, ''পেটের নিচে বালিশ দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে থাক। এটা হচ্ছে অম্বলের ব্যথা। বদহজম থেকে হয়েছে। নিবারণকে খবর দিয়েছি, এসেই ব্যথা নামিয়ে ফেলবে।'' ···

'নিবারণ হচ্ছেন তখনকার নেত্রকোণার খুব নামী কবিরাজ। তাঁর পসার ছিল সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার সাহেবের চেয়েও অনেক বেশি। নিবারণ কাকা এসে এক চামচ 'আনন্দভৈরব রস' খাইয়ে দিলেন। আনন্দভৈরব রস তাৎক্ষণিকভাবে তৈরি করতে হয়। বিস্তর আয়োজন করে জিনিসপত্র জোগাড় করা হল। হিঙ্গুল এক তোলা, গোলমরিচ এক তোলা, সোহাগা এক তোলা, পিপুল চূর্ণ এক তোলা, জীরকচূর্ণ এক তোলা এবং শোধিত মিঠা বিষ এক তোলা। ···

'আনন্দভৈরব রস' খাওয়াবার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বাবার পেটব্যথা অনেকখানি কমে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লেন। ···

'রাত এগারটার দিকে তাঁর ঘুম ভাঙল। তীব্র ব্যথায় তাঁর শরীর কাঁপছে। তিনি কয়েক বার বমিও করলেন। ফুলেশ্বরীকে ডেকে বললেন, ''ওরে বেটি, মরে যাচ্ছি রে। আমার সময় শেষ।'' ···

'এক জন এমবিবিএস ডাক্তারকে ডেকে আনা হল। ডাক্তার গম্ভীর হয়ে বললেন, ''এটা তো অ্যাপেণ্ডিসাইটিস। খুবই খারাপ অবস্থায় আছে। এই মুহূর্তে অপারেশন দরকার।'' ···

'অপারেশন করতে পারেন সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার। তাও হাসপাতালে সব ব্যবস্থা আছে কি না কে জানে। সরকারি ডাক্তারের খোঁজে লোকজন ছুটে গেল। তারা ফিরে এল মুখ শুকনো করে। সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার সাহেব এক ঘন্টা আগে ময়মনসিং রওনা হয়ে গেছেন। ···

বাবা মারা গেলেন রাত একটা পঁচিশ মিনিটে।" ···

মুনির থামল। পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছল। ক্লান্ত গলায় বলল, 'স্যার, এক গ্লাস পানি দিতে পারেন?'

মিসির আলি পানি এনে দিলেন। তাঁর ধারণা ছিল, মুনির তৃষ্ণার্তের মতো পানির গ্লাসটি শেষ করবে। তা সে করল না। দুই চুমুক দিয়ে রেখে দিল। মুখ বিকৃত করল, যেন তিক্ত স্বাদের কিছু মুখে চলে গিয়েছে।

'স্যার, আমি উঠি?'

'আপনার যা বলার তা কি বলেছেন?'

'জ্বি–না স্যার, ভূমিকাটা বলেছি। এখন মূল জিনিসটা বলতে পারব, তবে আজ না। আজ আর কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। অন্য এক দিন এসে বাকিটা বলব।'

'ঠিক আছে। এখনি উঠবেন?'

'জ্বি।'

'বৃষ্টি পড়ছে কিন্তু।'

'অসুবিধা হবে না। আমি খুব কাছেই থাকি।'

'আপনি যাবার আগে একটা প্রশ্ন করতে চাই। আপনি যে–গল্প বললেন, তার এক জায়গায় আমার একটু খটকা লেগেছে। এই খটকার কারণে আমার ধারণা হচ্ছে গল্পটা বানানো।'

মুনির বিস্মিত হয়ে তাকাল। শীতল গলায় বলল, 'কোথায় খটকা লেগেছে?'

'আপনি যখন ক্লাস নাইনের ছাত্র তখন আপনার বাবা মারা যান। তার মানে আপনি নিতান্তই বাচ্চা একটি ছেলে। ঘটনাগুলি আপনি ঘটতে দেখেছেন এই পর্যন্তই। অথচ কবিরাজ নিবারণের 'আনন্দভৈরব রস' কিভাবে তৈরি হল তার নিখুঁত বর্ণনা দিলেন। হিন্টুল এক তোলা, গোল মরিচ এক তোলা, সোহাগা এক তোলা ···· ইত্যাদি। এসব তো আপনার জানার কথা নয়। এক জন কবিরাজ তাঁর ওষুধ তৈরিতে কি কি অনুপান ব্যবহার করেন তা বলেন না। আর বললেও ক্লাস নাইনের একটি ছেলে তা মুখস্থ করে রাখে না। কাজেই আমার ধারণা, গল্পের এই অংশটি বানানো। একটা অংশ যদি বানান হয়, অন্য অংশগুলিও কেন হবে না?'

মুনির ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'বাবার মৃত্যুর পর সবার ধারণা হয়েছিল, কবিরাজ নিবারণ কাকুর অষুধ খেয়ে এটা হয়েছে। সবাই নিবারণ কাকুকে চেপে ধরল। তিনি অসংখ্যবার বললেন কোন কোন অনুপান দিয়ে তাঁর এই অষুধটি তৈরি হয়েছে। সেই জন্যেই নামগুলি মনে গেঁথে আছে। এখন কি আপনার কাছে মনে হচ্ছে আমি সত্যি কথা বলছি?'

'হ্যাঁ, মনে হচ্ছে।'

'তা ছাড়া মিথ্যা কথা বললে আমার গলার স্বর কেঁপে যেত। চোখের পাতা দ্রুত পড়তে থাকত। কিছুটা ব্লাশ করতাম। তা কি করেছি?'

মিসির আলি হেসে ফেললেন। হাসতে–হাসতেই বললেন, 'আপনার কথা শুনেছি অন্ধকারে। কাজেই চোখের পাতা দ্রুত পড়ছে কি না, ব্লাশ করছেন কি না—তা বোঝার কোনো উপায় ছিল না। তবে গলার স্বর কেঁপে যাচ্ছিল বারবার। তা হচ্ছিল আবেগজনিত কারণে।'

মুনির বলল, 'আপনি স্যার আমাকে তুমি করে বলবেন। আপনি আমার বাবার বয়েসী। আমাকে ''আপনি'' করে বললে খুব খারাপ লাগবে।'

'বেশ, এখন থেকে তাই বলব। তুমি একটা ছাতা নিয়ে নাও। ভালোই বৃষ্টি হচ্ছে।'

'ছাতা লাগবে না।'

মুনির বৃষ্টির মধ্যেই নেমে গেল। একবারও পেছনে ফিরে তাকাল না। বৃষ্টির মধ্যে সবাই সাধারণত একটু দ্রুত হাঁটে। সে তাও করছে না। স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হাঁটছে।

মিসির আলি ছেলেটির প্রতি তীব্র কৌতূহল অনুভব করলেন।

৩

মিসির আলি ভেবেছিলেন পরদিনই আবার আসবে। সন্ধ্যাবেলা তাঁর একটা বিয়ের দাওয়াত ছিল। সেখানে গেলেন না। কিছু খাবার আনিয়ে রাখলেন। অভুক্ত একটি মানুষকে শুধু এক কাপ চা যেন দিতে না হয়।

সে এল না। তার পরদিনও না। দেখতে-দেখতে এক সপ্তাহ পার হয়ে গেল। মিসির আলির বিস্ময়ের সীমা রইল না। ছেলেটির তাঁর কাছে না আসার কোনো কারণ নেই। সে জরুরি কিছু বলতে চায়। তাঁর এক জন ভালো শ্রোতা দরকার। ভালো শ্রোতার দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন, এবং প্রমাণও করেছেন যে তিনি অত্যন্ত মনোযোগী শ্রোতা। তাহলে সমস্যাটা কোথায়?

তিনি ছেলেটির গল্প নিয়েও বেশ চিন্তা-ভাবনা করেছেন। ছেলেটি বেশ চমৎকার ভঙ্গিতে স্মৃতিচারণা করেছে। কিন্তু এক জনকে বাদ দিয়ে। সে তার মা সম্পর্কে কিছুই বলে নি। ভদ্রমহিলা জামগাছটা কাটিয়ে ফেলেছেন, এইটুকুই শুধু বলা হয়েছে। এর বেশি নয়।

মা সম্পর্কে তার অস্বাভাবিক নীরবতার কারণ কী হতে পারে? একমাত্র কারণ, মাকে সে পছন্দ করেছে। না। স্মৃতিকথা বলবার সময় যাকে আমরা পছন্দ করি না, তার সম্পর্কে কটু কথা বলি। এই ছেলে তাও করছে না। কারণ মাকে সে এককালে পছন্দ করত, এখন করছে না। কেন করছে না, সেই সম্পর্কেও মিসির আলি অনেক ভাবলেন। মোটামুটিভাবে একটা ঘটনা সাজালেন। ঘটনা এ-রকম দাঁড়াল--

উকিল সাহেবের মৃত্যুর পর খুব সম্ভব এই পরিবারটি গভীর সমুদ্রে পড়ল। দেখা গেল উকিল সাহেব তাঁর জীবনে আয়ের চেয়ে ব্যয়ই বেশি করেছেন। শহরে তাঁর প্রচুর দেনা। তাঁর আত্মীয়স্বজন, যারা তিনি জীবিত থাকা অবস্থায় বিশেষ পাত্তা পায় নি তারা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। সম্পত্তির বিলি-ব্যবস্থা নিয়ে তাদেরকে বিশেষ চিন্তাযুক্ত মনে হতে লাগল।

উকিল সাহেবের স্ত্রী ছিলেন অত্যন্ত রূপবতী। এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে, কারণ ছেলেটি সুন্দর। মেয়েটি নিশ্চয়ই সুন্দরী, কারণ তার বাবা খুব আগ্রহ করে মেয়ের নাম রেখেছে ফুলেশ্বরী। যাই হোক, অত্যন্ত রূপবতী এক জন মহিলার জন্যে অনেকেরই আগ্রহ দেখা গেল। তেমনই এক জনকে ভদ্রমহিলা বিয়ে করে ফেললেন।

ছেলেটি এ কারণেই মায়ের সম্পর্কে নীরব। জিজ্ঞেস না করলে সে হয়তো তার মার দ্বিতীয় বিবাহ সম্পর্কে কিছুই বলবে না।

মিসির আলি ছেলেটিকে নিয়েও ভাবলেন। একটা নিঃসঙ্গ ভাবুক ধরনের ছেলে, যার উপর অনেক ঝড়ঝাপ্টা গিয়েছে এবং এখনো যাচ্ছে। ছেলেটি বুদ্ধিমান। বিচার বিশ্লেষণ করতে পারে। তবে তিনি তাঁর মূল সমস্যা সম্পর্কে কোনো ধারণা করতে পারলেন না। পারিবারিক জটিলতা নিশ্চয়ই তার সমস্যা নয়। সমস্যার ধরন এবং

প্রকৃতি নিশ্চয়ই ভিন্ন। সেটা কী হতে পারে? মিসির আলি কোনো কিনারা করতে পারলেন না। একমাত্র পথ হচ্ছে ছেলেটির সঙ্গে কথা বলা। সেই সুযোগ হচ্ছে না। মুনির আসছে না।

মিসির আলি আশেপাশে খানিকটা খোঁজখবরও করলেন। মেসজাতীয় বাড়ি আছে কি না। ছেলেটি নিশ্চয়ই বাড়ি ভাড়া করে থাকে না। মেসেটেসেই থাকে। একটা মেস পাওয়া গেল--স্টার মেস। সেখানে মুনির নামের কেউ থাকে না। দুটো সস্তার হোটেলেও তিনি খোঁজ করলেন। মুনির নামের কোনো ছেলের সন্ধান কেউ দিতে পারল না।

ইস্টার্ন মার্কেন্টাইলের ঠিকানা জোগাড় করে টেলিফোনে মুনিরের খবর জানতে চেষ্টা করলেন। তারা বলল, মুনির নামের কেউ এখানে কাজ করে না। মুনির কি মিথ্যা ঠিকানা দিল?

প্রতিটি কথাই কি তার মিথ্যা? পুরোপুরি সত্যি বলা যেমন কঠিন, আবার পুরোপুরি মিথ্যা বলাও কঠিন। এই কঠিন কর্ম মুনির, মনে হচ্ছে, বেশ সহজভাবেই করছে।

মিসির আলি বিরক্তি-মেশান কৌতূহল নিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করতে শুরু করলেন। মুনির আর এল না। বেশ ক'টা মাস কেটে গেল।

৪

আষাঢ় মাস। জলবায়ুর নিয়মকানুন পাল্টে গেছে। এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই। সারাদিন ঝাঁঝা রোদ থাকে। রাতে ভ্যাপসা গরম। জীবন অতিষ্ঠ।

আজ এই প্রথম বৃষ্টি-বৃষ্টি ভাব দেখা দিয়েছে। আকাশ মেঘলা। রাজ্যের ব্যাঙ গলা ফুলিয়ে ডাকাডাকি করছে--তাদের উৎসাহ দেখে মনে হয় বৃষ্টি নামতে দেরি নেই।

মিসির আলি কমলাপুরে তাঁর ভাগ্নীর বাড়িতে যাবেন বলে তৈরি হয়ে বসে আছেন। ব্যাঙের ডাক শুনে বেরুতে ভরসা পাচ্ছেন না। সঙ্গে ছাতা নেই--বৃষ্টি নামলে যন্ত্রণার মধ্যে পড়তে হবে।

অবশ্যি বৃষ্টি যে হবেই, এ-রকম মনে করারও কোনো কারণ নেই। নিম্নশ্রেণীর কীট-পতঙ্গ আবহাওয়ার খোঁজখবর ভালো রাখলেও আজকাল তারাও ভুল করছে।

তবে আজ বোধহয় ভুল করে নি। আকাশ ক্রমেই কালিবর্ণ হচ্ছে। বাতাস ছাড়তে শুরু করেছে। একমাত্র ভয়, বাতাস বোধহয় মেঘ উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

'স্যার, আসব?'

মিসির আলি চমকে তাকালেন। মুনির এসেছে। নিঃশব্দে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়েছে। তার চেহারার কোনো পরিবর্তন হয় নি। তবে খানিকটা রোগা হয়েছে। চুল ছোট-ছোট করে ছাঁটা। চোখের নিচে কালি পড়েছে। ঘুমের অসুবিধা হলে এ-রকম হয়। ছেলেটি আবার বলল, 'স্যার, আসব?'

'এসেই তো পড়েছ, আবার জিজ্ঞেস করছ কেন?'

'আমাকে চিনতে পারছেন?'

'না পারার তো কোনো কারণ দেখছি না। তোমার নাম মুনির। ডাকনাম টুনু।

তোমার ছোট বোনের নাম নুটু, ভালো নাম ফুলেশ্বরী।'

মুনির হেসে ফেলল। মিসির আলি বললেন, 'আমি ধরে নিয়েছিলাম তুমি আর আসবে না। প্রথম এসেছিলে চৈত্র মাসের কুড়ি তারিখে, আজ আষাঢ়ের তৃতীয় দিন। মাঝখানে ক'টা মাস চলে গেছে।'

মুনির জবাব দিল না। টেবিলের উপর সিগারেটের প্যাকেটটা রাখল। আজও সে বিদেশি এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে এসেছে। মিসির আলি প্যাকেট খুলে সিগারেট ধরালেন। সিগারেট কেন আনা হল? কী প্রয়োজন ছিল এ-জাতীয় সৌজন্যমূলক কথাবার্তায় গেলেন না। তাঁর ভঙ্গি দেখে মনে হল এতক্ষণ তিনি মুনিরের জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন।

'আজও অন্ধকারে কথা বলবে, না বাতি জ্বালানো থাকবে?'

'বাতি থাকুক।'

'এতদিন আস নি কেন?'

'ইচ্ছে হয় নি।'

'আজ আবার ইচ্ছে হল?'

'জ্বি স্যার।'

'খুব ভালো। চা খাবে?'

'জ্বি-না।'

'শুরু কর তাহলে।'

ছেলেটিকে আজ বেশ সুন্দর লাগছে। কেন লাগছে, তা মিসির আলি ধরতে চেষ্টা করছেন। পারছেন না। ফ্লানেলের শার্টের বদলে আজ তার গায়ে হালকা নীল রঙের একটা হাওয়াই শার্ট। শার্টটায় ছেলেটিকে খুব মানিয়েছে। এবং যে-কোনো কারণেই হোক, আজ তার মধ্যে দ্বিধার ভাব একেবারেই নেই। আচার-আচরণ অত্যন্ত সহজ।

'মুনির।'

'জ্বি।'

'বসে আছ কেন? আরম্ভ কর।'

মুনির সঙ্গে-সঙ্গে শুরু করল না। প্রথম দিনের মতো মাথা নিচু করে বসে রইল। মিসির আলি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। ছেলেটির মধ্যে দ্বিধার কোনো ভাব নেই, তবু সে দেরি করছে। তার বক্তব্য হয়তো গুছিয়ে নিচ্ছে। এর অর্থ একটাই। ছেলেটির বক্তব্য খুব জোরাল নয়। গুছিয়ে নেবার প্রয়োজন আছে।

মুনির নিচু গলায় কথা বলা শুরু করল।

'প্রথম রাতে আপনাকে আমার বাবার মৃত্যুর কথা বলেছি। সেটা বার বছর আগেকার কথা। এই বার বছরে অনেক কিছুই হল। বাবার সংসার পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেল। বাবার মৃত্যুর পর দেখা গেল, তাঁর প্রচুর দেনা। যে-জমির উপর বাড়ি বানিয়েছিলেন, সেই জমির দামও তিনি পুরো দেন নি।

'আমাদের আত্মীয়স্বজনরা প্রথম দিকে আমাদের দেখাশোনার জন্যে অতিরিক্ত রকমের ব্যস্ততা দেখালেন। ফুলেশ্বরীর বিয়ে দিয়ে দিলেন মাত্র তের বছর বয়সে। যুক্তি দিলেন--ফুলেশ্বরীর বর সংসারের দায়-দায়িত্ব কাঁধে নেবে। ঝড়ঝাপ্টা সামাল দেবে।

ফুলেশ্বরী খুব কাঁদল। কেউ তার কোনো কথা শুনল না। এক ধনী ব্যবসায়ীর

অপদার্থ জড়বুদ্ধি ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে হল।'

মুনির দম নেবার জন্যে থামতেই মিসির আলি বললেন, 'তোমার মার প্রসঙ্গে তো তুমি কিছু বলছ না। উনি কি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছিলেন?'

'জ্বি–না। বাবার মৃত্যুর দু' বছরের মাথায় মা মারা যান।'

'ও, আচ্ছা।'

'আপনি মার দ্বিতীয় বার বিয়ের কথা কেন জিজ্ঞেস করলেন?'

'এম্নি জিজ্ঞেস করছি। কোনো কারণ নেই।'

বলেই মিসির আলি একটু লজ্জা পেলেন। কারণ ছাড়া এই পৃথিবীতে কিছুই ঘটে না। অথচ তিনি কারণের ব্যাপারটি অস্বীকার করলেন।

'তারপর কি হল বল।'

'এই সময় আমার বাড়ি–পালানর রোগ হল। টাকাপয়সা কিছু জোগাড় করতে পারলেই বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতাম। টাকাপয়সা শেষ হলে আবার ফিরে আসতাম।—

'বাড়ি–পালানর কারণে নানান ধরনের মানুষের সঙ্গে মেশবার আমার সুযোগ হয়েছে। কিছু–কিছু অভিজ্ঞতা খুবই সুন্দর, আবার কিছু অভিজ্ঞতা ভয়ংকর কুৎসিত। কিছুদিন একটা যাত্রাদলের সঙ্গে ছিলাম। আমার চেহারা তখন খুব সুন্দর ছিল। এই চেহারা সম্বল করে একটি নারী–চরিত্রে অভিনয় করতাম, যদিও সেই যাত্রাদলে অনেকগুলি মেয়ে ছিল। অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার—মেয়েদের সাজপোশাক পরা আমার অভ্যাস হয়ে গেল। যখন অভিনয় থাকত না, তখনও শাড়ি–ব্লাউজ পরে থাকতাম। ঠোঁটে লিপস্টিক দিতাম। রাতে ঘুমুতাম ঐ মেয়েগুলির সঙ্গে এক ঘরে। তাতে ঐ মেয়েরা বেশ মজা পেত। ···

'যাত্রাদলের পুরুষদের অনেকেই এইসব মেয়েদের সঙ্গে রাত্রিযাপন করত। মজার ব্যাপার হচ্ছে, ওরা আমাকেও কামনা করত।'

'তুমি ক' দিন ছিলে ওদের সঙ্গে?'

'প্রায় দু' বছর।'

'চলে এলে কেন?'

'একটা ভুল তো মানুষ দীর্ঘদিন করতে পারে না। এক সময়–না–এক সময় তার জ্ঞান হয়। সে বুঝতে পারে।'

'তা ঠিক। তারপর বল।'

'ভূমিকা আমি প্রায় শেষ করে এনেছি। এখন আমি বর্তমান অবস্থাটা একটু বলেই কি জন্যে আপনার কাছে এসেছি তা বলব। ···

'আমি আগেই আপনাকে বলেছিলাম যে ইস্টার্ন মার্কেন্টাইলে টাইপিস্টের চাকরি করি। থাকি একটা বাসায়। বিনিময়ে এদের কিছু কাজকর্ম করে দিই। ওদের ছোট বাচ্চাদের রাতের বেলা পড়াই। থাকা এবং খাওয়া আমার এইভাবেই চলে। ঘুমাই তিনতলার একটি খুপরি ঘরে। তিনতলা পুরোপুরি তৈরি হয় নি। দুটো ঘর ওঠার পর বাড়িওয়ালা কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন। ঘর দুটোতে ছাদ নেই। কারণ পুরোটা তৈরি হলে ছাদ ঢালাই হবে। উপরে টিন দিয়ে ছাদের কাজ চলছে। একটি ঘরে আমি থাকি, অন্য ঘরটিতে বাড়ি তৈরির সরঞ্জাম, সিমেন্টের বস্তা, রড এইসব। এই ঘরটি থাকে

তালাবন্ধ। ···

'ছাদের ঘর দুটোতে বাথরুমের কোনো ব্যবস্থা নেই। কাজেই বাথরুমের প্রয়োজন হলে আমাকে যেতে হয় একতলার সার্ভেন্টস বাথরুমে। ঐ বাড়িতে এই সামান্য সমস্যা ছাড়া অন্য কোনো সমস্যা আমার ছিল না। বলা যেতে পারে আমি খুব সুখেই ছিলাম। ···

'বেতনের টাকার কিছুটা জমাই, কিছু পাঠাই আমার বোন ফুলেশ্বরীকে। বিএ ক্লাসের বইপত্র জোগাড় করেছি। এখন একটা কলেজে নাম লিখিয়েছি, যেখানে ক্লাস না করলে অসুবিধা হবে না। যথাসময়ে বিএ পরীক্ষার্থী হিসেবে নিয়মিত পরীক্ষায় বসা যাবে।'

'তুমি তা হলে আইএ পর্যন্ত পড়াশোনা করেছ?'

'জ্বি স্যার। যাত্রাদল থেকে বের হয়ে এসে আমার বড়চাচার বাড়িতে চলে যাই। ম্যাট্রিক এবং আইএ তাঁর কাছে থেকেই পাস করি। উনি খুবই দরিদ্র মানুষ। আমাকে আর পড়ানর সামর্থ্য তাঁর ছিল না।'

'তোমার রেজাল্ট কেমন হয়েছিল?'

'খুবই ভালো। চারটা লেটার নিয়ে ম্যাট্রিক পাস করি। আইএতে মেরিট স্কলারশিপ পাই। ইষ্টার্ন মার্কেন্টাইলে আমার চাকরি হয় আমার রেজাল্টের জন্যে। তখন আমি টাইপিং জানতাম না। অথচ আমাকে টাইপিস্টের পোস্টে নেয়া হয়। অন্য পোস্ট খালি ছিল না।'

'তারপর বল।'

মুনির চুপ করে রইল। মিসির আলি বললেন, 'একটা ইন্টারভ্যাল হলে কেমন হয়। এস, এক কাপ চা খেয়ে তারপর শুরু করি।

'জ্বি আচ্ছা।'

'চায়ের সঙ্গে আর কিছু খাবে? ভালো কেক আছে।'

'আমি শুধু চা-ই খাব।'

মিসির আলি চা নিয়ে এসে দেখলেন ঘরের বাতি নেভান। মুনির অন্ধকারে বসে আছে। মিসির আলি কিছু বললেন না। চায়ের কাপ এগিয়ে দিলেন।

মুনির নিঃশব্দে চায়ের কাপ শেষ করে কথা বলতে শুরু করল—

'ঘটনাটা ঘটল এক বছর আগে ভাদ্র মাসে। আমার অনিদ্রা রোগ আছে, বিছানায় শোয়ামাত্র ঘুমুতে পারি না। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকতে হয়। যে-রাতের কথা বলছি, সে-রাতে অসহ্য গরম পড়েছিল। আমি অনেকক্ষণ ছাদে হাঁটাহাঁটি করলাম। ছাদও তেতে আছে। এক ফোঁটা বাতাস নেই। একটা ভেজা গামছা গায়ে জড়িয়ে রাত একটা পর্যন্ত ছাদের রেলিং-এ বসে রইলাম। তখন একটু ঝিমুনির মতো ধরল। বিছানায় এসে শুয়েছি। হাতপাখা দিয়ে হাওয়া করছি, হঠাৎ পাশের ঘরে শব্দ হতে লাগল। আমি বেশ অবাকই হলাম, কারণ পাশের ঘর তালাবন্ধ। আমার ঘর থেকে পাশের ঘরে যাওয়ার একটা দরজা আছে, কিন্তু সেই দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। প্রথম ভাবলাম ইঁদুর কিংবা বেড়াল। কিন্তু শব্দ শুনে মনে হচ্ছে না ইঁদুর-বেড়ালের শব্দ। যেন অনেক মানুষ ঘরের মধ্যে আটক। তাদের ফিসফাস কথা কিছু-কিছু শোনা যাচ্ছে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। মৃদু হাসিও শুনলাম। যেন অনেকে দরজায় আড়ি পেতেছে।

দরজার ফাঁক দিয়ে আমাকে দেখছে। আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। আমি বললাম-- কে? সঙ্গে-সঙ্গে সব শব্দ থেমে গেল। চারদিক আগের মতো নীরব। আমি উঠে বসলাম। ঘর অন্ধকার। আমি কৌতূহল মেটাবার জন্যেই পাশের ঘরের দরজায় হাত রাখলাম। দরজা খুলে গেল। ঘরের ভেতরে আবছা আলো। সেই আলোয় ঝাপসাভাবে সবকিছু চোখে পড়ে, আবার অনেক কিছু চোখেও পড়ে না। আমি ঘরের ভেতর ঢুকলাম, তখনি নিচে নামার একটা সিঁড়ি চোখে পড়ল। খুবই অস্বাভাবিক ব্যাপার, ঘরের ভেতর সিঁড়ি আসবে কেন! অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, আমি পরিষ্কার কিছু চিন্তা করতে পারছি না। সব কেমন জট পাকিয়ে গেছে। যেমন আমি একটা ঘোরের মধ্যে আছি। গা কাঁপিয়ে প্রচণ্ড জ্বর আসার আগে যেমন ঘোর লেগে থাকে, ঠিক সে-রকম। নিজেই বুঝতে পারছি না যে, আমি সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করে দিয়েছি। সব-শেষ সিঁড়িটা পার হবার পর আমার ঘোর কেটে গেল। আমি পুরোপুরি এক জন সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষ। তবে এই সময়ের মধ্যে কিছু একটা ঘটে গেছে, কারণ আমি আর সেই আমি নই। আমি ঢাকা শহরেও নেই। আমি আছি আমাদের নেত্রকোণার ঐ বাড়িটিতে। সবে স্কুল থেকে ফিরছি। ফুলেশ্বরী আমাকে বলছে' 'টুনু, বাবার শরীর খুব খারাপ। কোর্ট থেকে সকাল-সকাল চলে এসেছেন। বাবার পেটে ব্যথা। · · ·

'আমার গা ঝনঝন করতে লাগল। চোখের সামনে যে-দৃশ্য দেখছি--সে দৃশ্য আমার অতীত জীবনের। আবার তা ফিরে এসেছে কী করে? তাহলে কি আমার বয়স বাড়ে নি? এতদিন যা ঘটেছে সবই কল্পনা কিংবা দীর্ঘ কোনো স্বপ্ন! · · ·

'আমি শোবার ঘরে উঁকি দিলাম। বাবা রেলিং-দেয়া খাটে শুয়ে আছেন, মশারি ফেলা। মা বসে আছেন বাবার মাথার পাশে।· · ·

'ইদরিস চাচা পানের বাটা হাতে বসে আছেন। আমি অবাক হয়ে দৃশ্যটি দেখছি। কারণ এরপর কি হবে আমি জানি। ইদরিস চাচা বলবেন' ''পেটের নিচে বালিশ দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে থাক। এটা হচ্ছে অম্বলের ব্যথা। নিবারণকে খবর দিয়েছি, এসেই ব্যথা নামিয়ে ফেলবে।'' · · ·

'সত্যি-সত্যি ইদরিস চাচা এই কথাগুলিই বললেন। আমি চমকে উঠলাম। পরবর্তী প্রতিটি ঘটনা কি হবে আমি জানি। আমি যেহেতু জানি, সেহেতু এই ঘটনাগুলি ঘটতে দেয়া যাবে না। নিবারণ কাকু আসবার আগেই নিয়ে আসতে হবে সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার সাহেবকে, যেন তিনি আজ কিছুতেই রাত দশটার ট্রেনে ময়মনসিং যেতে না পারেন।' · · ·

'আমি কাউকে কিছু না বলে সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার সাহেবের বাসার দিকে ছুটলাম। ডাক্তার সাহেবকে বাবার অসুখের কথা বলাতেই তিনি সঙ্গে-সঙ্গে এলেন। বাসায় এসে দেখি নিবারণ কাকু এসেছেন। হামানদিস্তায় কিছু যেন গুঁড়ো করা হচ্ছে। · · ·

'ডাক্তার সাহেবকে দেখে বাবা অবাক হয়ে বললেন, 'আপনাকে আবার কে খবর দিল?'' · · ·

''আপনার ছেলে। বাবার অসুখের কথা বলতে-বলতে ছেলের চোখে দেখি পানি। আপনার ছেলে বোধহয় আপনাকে খুব ভালোবাসে। দেখি, আপনার পেটটা দেখি।'' · ·

''কিচ্ছু দেখতে হবে না। বদহজম থেকে হয়েছে। নিবারণদা এসেছেন, অষুধ তৈরি

হচ্ছে। খাওয়ামাত্র আরাম না হলে নিবারণদা নাকি তার কবিরাজী ছেড়ে দেবেন।'' · ·

'ডাক্তার সাহেব বাবার কথায় কোনোই কান দিলেন না। টিপেটুপে বাবার পেট দেখলেন। অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বললেন, ''আপনার অ্যাপেণ্ডিসাইটিস তো পেকে টসটস করছে। এক্ষণি কেটে ফেলতে হবে।'' · · ·

'বাবা অবাক হয়ে বললেন, 'কি বলছেন এ-সব!'· · ·

''যেটা সত্যি সেটাই বলছি। আশা করি আপনি বেঁচে থাকতে চান? বেঁচে থাকতে না চাইলে ভিন্ন কথা।'' · · ·

''সত্যি বলছেন অ্যাপেণ্ডিসাইটিস?'' · · ·

''হ্যাঁ, সত্যি। রাত দশটার ট্রেনে ময়মনসিং যাবার কথা ছিল, সেটা আর হতে দিলেন না।'' · · ·

'ডাক্তার সাহেব খসখস করে একটা কাগজে কী সব লিখলেন। আমার দিকে কাগজটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, ''খোকা তুমি এই চিঠিটা ডাক্তার মিহিরবাবুকে দিয়ে এস। তাঁরও হেল্প লাগবে। মিহিরবাবুর বাসা চেন তো? মেয়েদের স্কুলের সামনে একতলা বাড়ি। যাও ছুটে যাও। এই তো গুড বয়!'' · · ·

'আমি কাগজ হাতে নিয়ে উল্কার মতো ছুটলাম। ঘর থেকে বেরুতেই কিসের সঙ্গে যেন ধাক্কা খেলাম। মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। মুহূর্তের জন্যে চারদিক অন্ধকার। অন্ধকার কিছুটা কাটতেই দেখি আমি আবার আগের জায়গায় ঢাকা শহরের তিনতলার আমার ছোট্ট খুপরিতে। ভাদ্র মাসের অসহ্য গরমে আমার গা ঘামছে। ঘর অন্ধকার হলেও রাস্তার কিছু আলো এসেছে। সেই আলোয় দেখলাম পাশের ঘরের দরজা আগের মতোই বন্ধ।'

মুনির চুপ করল। মিসির আলি সিগারেট ধরাতে-ধরাতে বললেন, 'এটাই তোমার সেই বিশেষ কথা?'

'জ্বি স্যার।'

'আর কিছু বলতে চাও না?'

'আর কিছু বলার নেই।'

'তুমি যা দেখেছ, তার ব্যাখ্যা কি খুবই সহজ নয়?'

'জ্বি, সহজ। আমি স্বপ্ন দেখছিলাম।'

'হ্যাঁ--স্বপ্ন।'

'স্বপ্নের স্থায়িত্বকাল খুব অল্প হয়। কিন্তু অল্প সময়েই অনেক কিছু বলে। আইনস্টাইনের টাইম ডাইলেশনের ব্যাপার। থিওরি অব রিলেটিভিটির অন্য এক ধরনের প্রয়োগ। তাই না?'

'হতে পারে, থিওরি অব রিলেটিভিটি আমার জানা নেই।'

'আমিও জানি না। ভাসা-ভাসা যা শুনি তাই বললাম।'

'তুমি যে-স্বপ্ন দেখেছ এটা হচ্ছে এক ধরনের ইচ্ছাপূরণ স্বপ্ন। তোমার অবচেতন মনে আছে তোমার বাবাকে বাঁচিয়ে তোলবার আকাঙ্ক্ষা। অবচেতন মনের ইচ্ছাগুলিও স্বপ্নে ধরা দিয়েছে। সব সময় তা হয়। এ-জীবনে যে-সব জিনিস আমরা পাই না, অথচ যে-সব জিনিসের জন্যে গভীর কামনা বোধ করি--স্বপ্নে তাদের পাই। তাই না?'

'জ্বি স্যার, তাই।'

বলেই মুনির উঠে দাঁড়াল।

'রাত হয়ে গেছে, আজ উঠি স্যার।'

মিসির আলি লক্ষ করলেন, মুনিরের মুখ থমথম করছে। চোখের দৃষ্টি অন্য রকম। যেন এই মুহূর্তে সে কোনো–একটা ঘোরের মধ্যে আছে।

'মুনির।'

'জ্বি?'

'তোমার বোধহয় আরো কিছু বলার ছিল। শুধু স্বপ্নের কথা বলার জন্যে আমার কাছে আস নি।'

মুনির শীতল গলায় বলল, 'আপনি ঠিকই ধরেছেন। এতটা নির্বোধ আমি না। সামান্য একটা স্বপ্ন নিয়ে আপনাকে বিরক্ত করব কেন?'

'বল সেটা কি?'

'আপনাকে তো বলেছি সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার সাহেব আমার হাতে একটা চিঠি লিখে দিলেন মিহির বাবুর কাছে পৌঁছে দেবার জন্যে। ঐ চিঠি নিয়ে বেরুবার সময় আমি ধাক্কা খেয়ে পড়ে যাই।'

'হ্যাঁ, তখন তোমার স্বপ্ন ভেঙে যায়।'

'জ্বি স্যার। এবং আমি দেখি চিঠিটা আমার হাতে তখনো আছে।'

'কী বলছ তুমি!'

'আমি চিঠিটা আপনার জন্যে নিয়ে এসেছি।'

মিসির আলি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। মুনির চিঠিটা টেবিলের উপর রাখল। মৃদু স্বরে বলল, 'রাত হয়ে যাচ্ছে, আমি যাই।'

'তুমি যে কত বড় একটা অসম্ভব কথা বলছ, তা কি তুমি জান?'

'জানি স্যার।'

মুনির বেরিয়ে গেল। মিসির আলি চিঠি হাতে নিলেন। তাঁর কপালে বিন্দু–বিন্দু ঘাম।

ছেলেটি যা বলছে, সবই কি বিশ্বাসযোগ্য? নিশ্চয়ই না। সে চমৎকার গুছিয়ে মিথ্যা বলতে পারে। ইস্টার্ন মার্কেন্টাইলে চাকরির ব্যাপারটা মিথ্যা। তিনি খোঁজ নিয়েছেন। এই মিথ্যাটা সে হয়তো নিজেকে আড়াল করবার জন্যে বলছে। মূল ঘটনা হয়তো সত্যি। কিন্তু তা কী করে হয়।

৫

প্যাডে ডাক্তার সাহেবের নাম লেখা। এ মল্লিক এমবিবিএস (আপার) মেডিকেল অফিসার, নেত্রকোণা সদর। কোনো তারিখ নেই। চিঠি লেখা হয়েছে ইংরেজি ও বাংলা মিশিয়ে। মিহিরবাবুর নাম ইংরেজিতে। বাকি অংশ বাংলায়।

মিহিরবাবু,

জরুরিভিত্তিতে একটা অপারেশন করতে হচ্ছে। কামরুদ্দিন সাহেবের অ্যাপনডিক্স।

প্রায় র‍্যাপচারের পর্যায়ে। আপনার সাহায্য প্রয়োজন। হাসপাতালে চলে আসুন। হাসপাতালে অপারেশনের সরঞ্জাম অপ্রতুল। তবু করতে হবে। এই উকিল সাহেবের কাছে আমি নানান বিষয়ে ঋণী।

বিনীত
এ মল্লিক

এই চিঠি মিসির আলি খুব কম করেও পঞ্চাশ বার পড়েছেন। তাতে নতুন কোনো তথ্য বের হয়ে আসে নি। যিনি এই চিঠি লিখেছেন, তাঁর চরিত্র সম্পর্কেও কোনো তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না।

তবে মনে হচ্ছে, ভদ্রলোকের বেশি কথা বলার অভ্যাস আছে। জরুরি অবস্থায় তিনি চিঠি লিখছেন, তবু সেখানেও কিছু ফালতু কথা আছে, যেমন--"এই উকিল সাহেবের কাছে আমি নানান বিষয়ে ঋণী।" সঙ্কটের সময়ে আমরা শুধু প্রয়োজনীয় তথ্যই দিই, অপ্রয়োজনীয় তথ্য দিই না। ইনি দিচ্ছেন। যে-জন্যে ক্ষীণ সন্দেহ হয়, চিঠিটা হয়তো ডাক্তার সাহেবের লেখা নয়।

মুনির একটা প্যাড জোগাড় করে নিজেই লিখেছে কিংবা অন্য কাউকে দিয়ে লিখিয়েছে। এখন কথা হল, এটা সে কেন করবে? তার মোটিভ কি?

ঘটনাটা যদি বিদেশে ঘটত, তাহলে একটা মোটিভ খুঁজে পাওয়া যেত। পাবলিসিটি। পত্রিকায় ছাপা হত। টিভি প্রোগ্রাম হত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিয়ে, তদন্তকারী টীম বসত। এক দল বলত পুরোটাই ভাঁওতা, অন্য দল বলত, না, ভাঁওতা নয়--ব্যাপারটার মধ্যে কিছু-একটা আছে।

আমেরিকায় কানসাস সিটির এক মহিলাকে নিয়ে এ-রকম হল। ভদ্রমহিলা সেইন্ট পল স্কুলের গেম টীচার। একবার এক সপ্তাহ স্কুলে এলেন না। এক সপ্তাহ পার করে যখন এলেন তখন তাঁর চোখ-মুখ শুকিয়ে আমসি। দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত। ডাকলে সাড়া দেন না। দু' বার-তিন বার ডাকতে হয়। ভদ্রমহিলা এক অদ্ভুত গল্প বললেন। তার মৃতা মা নাকি এক দুপুরবেলা হঠাৎ তাঁর বাসায় উপস্থিত। স্বাভাবিক মানুষের মতো গল্প শুরু করলেন। লাঞ্চে কি আছে জিজ্ঞেস করে শাওয়ার নিতে গেলেন। তিনি দু' দিন থাকলেন। স্বাভাবিক মানুষের মতো খাওয়াদাওয়া করলেন। ঘুমুলেন। প্রচুর গল্প করলেন। তবে বাড়ি থেকে বেরুলেন না এবং নিজের মেয়েকেও বেরুতে দিলেন না। বেশির ভাগ গল্পই পরকালসংক্রান্ত। কিছু-কিছু উপদেশও দিলেন। বিশেষ কোনো উপদেশ নয়। ধর্মগ্রন্থে যে-ধরনের উপদেশ থাকে, সে-ধরনের উপদেশ। তারপর এক দিন ভরদুপুরে যেভাবে এসেছিলেন ঠিক সেভাবেই চলে গেলেন।

স্কুল শিক্ষিকার এই ঘটনা নিয়ে সারা আমেরিকায় হৈচৈ পড়ে গেল। ভদ্রমহিলা লাই ডিটেকটর টেস্ট দিলেন। দেখা গেল তিনি সত্যি কথাই বলছেন। এক দল বলা শুরু করল—লাই ডিটেকটর টেস্ট মানসিক ব্যাধিগ্রস্তদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। ভদ্রমহিলা মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত। ভদ্রমহিলা মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত নাকি ব্যাধিগ্রস্ত নন তা বের করার জন্যে আবার বিশেষজ্ঞদের টীম বসল। হুলস্থূল ব্যাপার!

৬

মুনিরের ক্ষেত্রে এই সম্ভাবনা একেবারেই নেই। তবে ব্যক্তিগত বিদ্রোহের কারণেও সে এটা করতে পারে। হয়ত সমাজের প্রচলিত বিশ্বাসগুলো তার পছন্দ নয়। তার অপছন্দের ব্যাপারগুলো সে অন্যদের জানাতে চায়। মিসির আলিকে দিয়ে তার শুরু। পরে অন্যদের কাছে যাবে।

মিসির আলি ঠিক করলেন, যে করেই হোক, ডাক্তার এ মল্লিককে খুঁজে বের করবেন। তাঁকে এই চিঠিটি দেখাবেন। এতে রহস্যের অনেকটা সমাধান হবার কথা। ডাক্তার এ মল্লিককে খুঁজে বের করতে কোনো সমস্যা হবার কথা নয়। যেহেতু সরকারি ডাক্তার, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলতে পারবে উনি কোথায় আছেন, কোন পোস্টে আছেন। নিশ্চয়ই তাদের ডাইরেক্টরেট আছে।

বাংলাদেশে কোনো কাজই সহজে হয় না। ডাক্তার এ মল্লিকের খোঁজ বের করতে তাঁকে বিস্তর ঝামেলা করতে হল। এ বলে ওর কাছে যান, ও বলে আজ না, সোমবারে আসুন। সোমবারে গিয়ে দেখেন, যিনি খবর দেবেন তিনি শালার বিয়েতে চিটাগাং চলে গেছেন। শেষ পর্যন্ত খোঁজ পাওয়া গেল। ডাক্তার এ মল্লিক বর্তমানে খুলনার সিভিল সার্জন। তাঁর চাকরির মেয়াদ প্রায় শেষ। কিছুদিনের মধ্যেই এলপিআরে চলে যাবেন।

খুলনা যাবার ব্যবস্থাও মিসির আলি চট করে করতে পারলেন না। দুটো কোর্স ঝুলছে মাথার উপর। সেশন জট সামলাবার জন্যে স্পেশাল ক্লাস হচ্ছে। মিডটার্ম পরীক্ষা। প্রচুর খাতা জমা হয়ে আছে। খাতা দেখতে হবে। খুলনা জায়গাটাও এমন নয় যে দিনে দিনে গিয়ে চলে আসা যায়।

তিনি মনে-মনে একটা পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন, মুনিরকে সঙ্গে নিয়েই খুলনা যাবেন। সেই পরিকল্পনাও কার্যকর করা যাচ্ছে না। মুনিরের দেখা নেই। সেই যে ডুব দিয়েছে, ডুবই দিয়েছে। আর উদয় হচ্ছে না। তার ঠিকানা জানা নেই বলে যোগাযোগ করা হচ্ছে না। সে কোথায় থাকে তা একবার মনে হয় বলেছিল--এখন মনে পড়ছে না। মানুষের মস্তিষ্কের একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে, অপ্রয়োজনীয় তথ্যগুলো সে খুব যত্ন করে মনে করে রাখে, প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো মুছে ফেলে। যে-টেলিফোন নাম্বারটি মনে করা দরকার সেটি মনে পড়ে না, অথচ প্রয়োজন নেই এমন টেলিফোন নাম্বারগুলো একের পর এক মনে পড়তে থাকে।

ডাক্তার এ মল্লিক। মানুষটি ছোটখাট। চেহারায় বয়সের তেমন ছাপ নেই, তবে মাথার সমস্ত চুল পাকা। যেন শরতের সাদা মেঘের একটা টুকরো মাথায় নিয়ে হাসিখুশি ধরনের এক জন মানুষ বসে আছেন। ডাক্তার এ মল্লিক বললেন, 'আমি কি আপনাকে চিনি?'

'জ্বি--না। আমার নাম মিসির আলি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক।'

'ও, আচ্ছা আচ্ছা, আগে বলবেন তো।'

'আগে বললে কি হত?'

'না, মানে আরো খাতির করে বসাতাম।'

মিসির আলি হেসে ফেললেন। হাসি থামিয়ে বললেন, 'আপনি যথেষ্ট খাতির

করেছেন। ছুটির দিন, কোথায় যেন বেরুচ্ছিলেন। আমাকে দেখে বাতিল করলেন।'

'বাতিল করি নি। বাতিল করলে উপায় আছে? মহিলারা সেজেগুজে বসে আছে। তারা আমাকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে। হা হা হা। কি ব্যাপার বলুন।'

'আমি না–হয় বিকেলে আসি?'

'পাগল হয়েছেন? বিকেলে দুটো প্রোগ্রাম। একটা জন্মদিন, একটা বিয়ে। যা বলবার এক্ষুণি বলুন। আমার নিজের কোথাও বেরুতে ইচ্ছা করছে না। আপনি আসায় একটা অজুহাত তৈরি হল। বাড়ির মেয়েদের বলতে পারব কাজে আটকা পড়েছি। হা হা হা। আসুন, আমার একটা ব্যক্তিগত ঘর আছে, সেখানে যাই।'

ডাক্তার সাহেবের ব্যক্তিগত ঘর দেখার মতো। মেঝেতে কার্পেট। বসার জন্যে চমৎকার কিছু রকিং চেয়ার। দেয়ালে অরিজিন্যাল পেইন্টিং। ঘরটিতে এয়ারকুলারও বসান।

'এটা হচ্ছে আমার নিজস্ব ড্রয়িং রুম। খুব নির্বাচিত কিছু অতিথির জন্যে।'

'আমি কি খুব নির্বাচিত কেউ?'

'কি জন্যে আপনি এসেছেন তা জানার পর বোঝা যাবে। তবে একটা অনুমান অবশ্যি করছি। ঢাকা থেকে শুধু আমার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছেন, সেই থেকেই অনুমানটা করছি। হা হা হা। একটু বসুন। ঠাণ্ডা কিছু দিতে বলি।'

মিসির আলি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। উনিশ কুড়ি বছরের একটি মেয়ে খুব বিনীত ভঙ্গিতে মিষ্টির প্লেট নামিয়ে লাজুক হাসি হাসল। মিসির আলির অস্বস্তি আরো বাড়ল। তাঁর মন বলছে, এই মেয়েটির বিয়ের কোনো কথাবার্তা হচ্ছে। এবং তারা ধরেই নিয়েছে তিনি ঢাকা থেকে এই ব্যাপারেই এসেছেন।

মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে, যাচ্ছে না। তার উপর এই বোধহয় নির্দেশ।

'কি নাম তোমার খুকি?'

'আমার নাম মীরা।'

'বাহ্, খুব সুন্দর নাম। কী পড়?'

'বরিশাল মেডিক্যাল কলেজে পড়ি।'

'বাহ্, ডাক্তারের মেয়ে ডাক্তার! এখন কি কলেজ ছুটি?'

'জ্বি–না। বাবা হঠাৎ আসতে লিখলেন· · · ।'

মেয়েটি কথা শেষ করল না। হঠাৎ অস্বাভাবিক লজ্জা পেয়ে গেল। মিসির আলি মনে–মনে ভাবলেন, চমৎকার একটি মেয়ে। এই মেয়ের বিয়ের সঙ্গে কোনো–না–কোনোভাবে যুক্ত থাকা একটা ভাগ্যের ব্যাপার।

'মীরা, তুমি এখন যাও। তোমার বাবাকে পাঠিয়ে দাও।'

ডাক্তার সাহেব ঘরে ঢুকলেন হাসিমুখে, 'কেমন দেখলেন আমার মেয়েকে?'

খুব ভালো মেয়ে। চমৎকার মেয়ে। আমি কিন্তু আপনার মেয়ের বিয়ের কোনো ব্যাপারে আসি নি। অন্য ব্যাপারে এসেছি। তবে মীরার বিয়ের ব্যাপারে কোনো সাহায্য করতে পারলে অত্যন্ত খুশি হব।

ডাক্তার সাহেব নিভে গেলেন। মিসির আলির বেশ খারাপ লাগল।

'ঢাকা থেকে কি কারোর আসার কথা ছিল?'

'জ্বি, ছিল। গত পরশু আসার কথা। সেই জন্যেই মেয়েটাকে বরিশাল থেকে

আনালাম। আমার বড় মেয়ে থাকে রাজশাহী, সেও এসেছে। মোটামুটি একটা বেইজ্জতি অবস্থা?'

'নিশ্চয়ই কোনো-একটা ঝামেলা হয়েছে, যে জন্যে আসতে পারছে না।'

'তা তো হতেই পারে। কিন্তু খবর তো দেবে?'

'আপনি যদি চান তাহলে তৃতীয় পক্ষ হয়ে ঢাকায় ফিরে গিয়ে খোঁজ নিয়ে আপনাকে জানাতে পারি।'

ডাক্তার সাহেব হ্যাঁ-না কিছুই বললেন না। তাঁর ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে প্রস্তাবটি তাঁর পছন্দ হয়েছে, তবে সরাসরি হ্যাঁ বলতে তাঁর বাধছে। সম্ভবত স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম আলাপ করবেন। তারপর বলবেন।

মিসির আলি বললেন, 'আমি কি জন্যে এসেছি সেটা কি আপনাকে বলব?'

'হ্যাঁ, বলুন।'

'আপনি কি অনেকদিন নেত্রকোণায় ছিলেন?'

'হ্যাঁ, ছিলাম। পাঁচ বছর ছিলাম নেত্রকোণা সদর হাসপাতালে। সে তো অনেক দিন আগের কথা।'

'কামরুদ্দিন সাহেব নামে কাউকে চিনতেন? উকিল? বেশ নামকরা উকিল।'

'খুব ভালো করে চিনতাম। অত্যন্ত মেজাজি লোক ছিলেন। অসম্ভব দিল-দরিয়া। টাকা রোজগার করতো দুই হাতে, খরচ করতো চার হাতে। কী-একটা অনুষ্ঠান একবার করলেন—ছেলের আকিকা কিংবা মেয়ের জন্মদিনে। সে এক দেখার মতো দৃশ্য!'

'ভদ্রলোক মারা গেলেন কীভাবে?'

'অ্যাপেনডিসাইটিস। মফস্বল শহরের অবস্থা তো বুঝতেই পারছেন। অপারেশনের সে রকম সুবিধা নেই। আমিও ছিলাম না। থাকলে একটা কিছু অবশ্যই করতাম। ঐ দিনই রাত দশটার ট্রেনে ময়মনসিং চলে আসি। আপনি এইসব জিজ্ঞেস করছেন কেন?'

'একটা কারণ আছে। কারণটা এই মুহূর্তে বলতে চাই না। পরে বলব।'

'আপনি কি ওদের কোনো আত্মীয়?'

'জ্বি-না। কামরুদ্দিন সাহেবের স্ত্রী সম্পর্কে কি আপনি কিছু জানেন?'

'কোন বিষয়ে বলুন তো?'

'উনি কেমন ছিলেন, কীভাবে মারা গেলেন, এইসব।'

'খুব রূপবতী মহিলা ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর কোনো মানসিক পরিবর্তন ওঁর হয়েছিল কি না জানি না, তবে নানান রকম গুজব শহরে ছড়িয়ে পড়ে।'

'কি রকম গুজব?'

'অভিভাবকহীন রূপবতী মেয়েদের নিয়ে যেসব গুজব সাধারণত ছড়ায়, সেইসব আর কি। সহজলভ্য মেয়ে—এই সব কথাবার্তা। পুরুষদের খুব আনাগোনাও নাকি ছিল।'

'মারা যান কীভাবে?'

'সেই সম্পর্কেও নানান গল্প আছে। কুৎসিত গল্প। পেটে বাচ্চা এসে গিয়েছিল, গ্রাম্য উপায়ে খালাস করতে গিয়ে কি সব হয়েছে· · · · আমি এর বেশি কিছু জানি

না। গুজবের ব্যাপারে আমার উৎসাহ কিছু কম। তবে এইসব গুজবের পেছনে কিছু সত্যি সাধারণত থাকে।'

মিসির আলি পকেট থেকে প্যাডের কাগজটি বের করে বললেন, 'ভালো করে দেখুন তো এই কাগজের লেখাটি আপনার?'

'আমার তো বটেই।'

'আপনার নিজের হাতে লেখা।'

'নিশ্চয়ই।'

'লেখাটা দয়া করে পড়ে দেখুন।'

মল্লিক সাহেব লেখা পড়ে দীর্ঘ সময় চুপ করে বসে রইলেন। একটি কথাও বললেন না।

'আপনি লিখেছেন এ লেখা?'

'না।'

'হয়তো অন্য কোনো কামরুদ্দিন সম্পর্কে লিখেছেন।'

'এই নামে নেত্রকোণায় অন্য কোনো উকিল ছিল না, এবং আমি অপারেশনের ব্যাপারে সাহায্য চেয়েও চিঠি লিখি নি।'

'হয়তো আপনার মনে নেই।'

'দেখুন প্রফেসর সাহেব, আমার স্মৃতিশক্তি ভালো। আপনার ব্যাপারটা আমি কিছু বুঝতে পারছি না। আপনি কি কোনোভাবে আমাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করছেন?'

'ছি ডাক্তার সাহেব, ভুলেও এ-রকম কিছু ভাববেন না। আমি একটা জটিল রহস্যের জট ছাড়াবার চেষ্টা করছি। এর বেশি কিছু না। আমি আজ উঠি?'

'আমার লেখা এই চিঠি আপনাকে কে দিল?'

'অন্য এক দিন আপনাকে বলব।'

'অন্য কোনোদিন আপনাকে আমি পাব কোথায়?'

'আমি আমার ঠিকানা দিয়ে যাচ্ছি।'

মিসির আলি ঠিকানা লিখলেন। মল্লিক সাহেব অবাক হয়ে বললেন, 'আপনি জিগাতলায় থাকেন?'

'জ্বি।'

'রহমান সাহেবের বাসা চেনেন? ২২/১৩, তিনতলা বাড়ি। আই স্পেশালিস্ট টি রহমান?'

'জ্বি-না। তবে আপনি যদি তাঁদের কাছে কোনো খবর পাঠাতে চান, আমি ঠিকানা বের করে খবর পৌঁছে দেব।'

'কোনো খবর দিতে হবে না।'

'ও-বাড়ি থেকেই কি কারো আসার কথা ছিল?'

'আপনি কী করে বুঝলেন?'

'অনুমান করছিলাম।'

ডাক্তার এ মল্লিক অপ্রসন্ন চোখে তাকিয়ে আছেন। তিনি চিন্তিত ও বিরক্ত। তাঁর আজকের ছুটির দিনটি নষ্ট হয়েছে।

'যাই ডাক্তার সাহেব?'

তিনি জবাব দিলেন না।

৭

মতিঝিল পাড়ার অফিস। নাম আলফা ট্রান্সপোর্ট। নাম থেকে কিছু বোঝা যাচ্ছে না, তবে কাজকর্ম পাঁচমিশালি--অটোমোবাইল ইন্স্যুরেন্স, ট্রাভেল এজেন্সি এবং ইণ্ডেনটিং।

বৃহস্পতিবার অর্ধেক দিন অফিস। মুনিরের হাতে তেমন কাজ নেই। সে বসেছে এ্যাসিসটেন্ট ক্যাশিয়ার নিজামুদ্দিন সাহেবের পাশে। নিজামুদ্দিন সাহেবের ব্যালেন্স শীটে সতের টাকার গণ্ডগোল। হিসাব মিলছে না। তিনি মুনিরকে ডেকে নিয়ে গেছেন, যাতে সে ঠাণ্ডা মাথায় ফিগারগুলি চেক করতে পারে।

নিজামুদ্দিন সাহেবের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। এল ডি ক্লার্ক হয়ে ঢুকেছিলেন। দুটো প্রমোশন পেয়ে এ্যাসিস্ট্যান্ট ক্যাশিয়ার হয়েছেন। গত বছর একটা গুজব উঠেছিল, তিনি অফিসার্স গ্রেড পাচ্ছেন। তা পান নি। তাঁর পাঁচ বছরের জুনিয়র শমসের সাহেব পেয়েছেন। এই নিয়ে নিজামুদ্দিন সাহেবের মনে কোনো ক্ষোভ নেই। দিনের শেষে ক্যাশের হিসাব পুরোপুরি মিটে গেলেই তিনি মহাসুখী। এই হিসাব তাঁর প্রায়ই মেলে না। তখন তাঁকে দেখে মনে হয়, তাঁর মাথা-খারাপ হতে বেশি বাকি নেই।

এই মানুষটিকে মুনিরের খুব পছন্দ। ভদ্রলোক সব কিছুই অত্যন্ত দ্রুত করেন। দ্রুত কথা বলেন। দ্রুত লেখেন এবং দ্রুত রেগে যান। অতি দ্রুত রাগ চলেও যায়। তখন ধরা গলায় বলেন, ''মিসটেক'' হয়েছে। মনের মধ্যে কিছু রাখবেন না, তাহলে কষ্ট পাব। ''এক্সকিউজ'' করে দেন।'

জুনিয়র কর্মচারীদের কেউ তাঁকে স্যার বললে তিনি শীতল গলায় বলেন, 'আমাকে স্যার ডাকবেন না। স্যার ডাকলে নিজেকে মাস্টার-মাস্টার মনে হয়। বরং ভাই ডাকবেন। ''ব্রাদারের'' উপর কোনো ডাক হয় না।'

মুনির নিজেও সতের টাকার কোনো সমাধান করতে পারল না। দেখা যাচ্ছে ক্যাশে সতের টাকা আসলেই কম। নিজামুদ্দিন সাহেবের মুখ অন্ধকার। নিঃশ্বাস পড়ছে ঘন-ঘন।

মুনির বলল, 'নিজাম ভাই, আপনি আজ চলে যান। শনিবার না হয় আরেক বার দেখব।'

'শনিবার দেখলে তো হবে না। দিনের হিসাব মেটাতে হয় দিনে।'

তিনি নিজের পকেট থেকে সতেরো টাকা রাখলেন আয়রন সেফে। কাগজপত্র সই করলেন। মুনিরের খুব মন-খারাপ হল।

বেচারার সতের টাকা চলে গেল, এই জন্যে নয়, যে-হিসাবের জন্য ভদ্রলোকের এত মমতা সেই হিসাব মিলছে না দেখে। মুনিরের মনে হচ্ছে এই সরল-সহজ মানুষটা হয়তো কেঁদে ফেলবে।

'নিজাম ভাই।'

'কি?'

'আসুন, আরেক বার আমরা দু' জন মিলে বসি। চেক এবং কাউন্টার চেক। ভাউচারগুলিও দেখেন। কোনোটা হয়তো ইংরেজিতে লেখা, তুলেছেন বাংলায়।

নিজামুদ্দিন সাহেবের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি অত্যন্ত উৎসাহে কাগজপত্র বের করলেন। মুনির কাগজপত্র নিয়ে বসতে পারল না। এজিএম কাদের সাহেব ডেকে পাঠালেন। নরম গলায় বললেন, 'আমাকে কয়েকটা জিনিস টাইপ করে দিতে পারবে?'

প্রশ্ন থেকেই বোঝা যায় অফিসের কোনো কাজ নয়। অফিসের কাজ হলে বলতেন, 'খুব জরুরি। টাইপ রাইটার নিয়ে বসে যাও। মিসটেক যেন না-হয়। স্পেসিং ঠিক রাখবে।'

এখন তা বলছেন না। নরম স্বরে কথা বলছেন। এজিএম ধরনের কেউ নরম স্বরে কথা বলে--এটাও এক অভিজ্ঞতা।

'একটু এক্সট্রা টাইম কাজ করতে হবে, পারবে?'

'পারব স্যার।'

'গুড।'

কাদের সাহেব মানিব্যাগ খুলে অনেক চিন্তা-ভাবনা করে একটা দশ টাকার নোট বের করলেন।

'নাও দুপুরে কিছু খেয়ে নিও।'

'কিছু লাগবে না স্যার।'

'আরে নাও নাও।'

মুনির হাত বাড়িয়ে টাকা নিল। নিজেকে তার ভিখিরির মতো মনে হচ্ছে। অথচ না নিয়েও উপায় নেই। কাদের সাহেব টাকা না নেয়ার অন্য অর্থ করে বসতে পারেন।

'কতক্ষণ লাগবে?'

'ঘন্টাখানিক।'

'গুড। আমি একটু বেরুচ্ছি। একঘন্টা পরে এসে নিয়ে যাব। ঠিক আছে?'

'জ্বি আচ্ছা স্যার।'

একটার মধ্যেই কাজ শেষ--এজিএম সাহেবের দেখা নেই। অফিস খালি হয়ে গেল দেড়টার মধ্যে। দারোয়ান তালাচাবি লাগিয়ে দিল। নিজাম সাহেব বললেন,'তুমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি?'

'এ ছাড়া আর কি করব?'

'একা একা কতক্ষণ দাঁড়াবে? আমিও অপেক্ষা করি?'

'আপনি চলে যান নিজাম ভাই। স্যার এসে পড়বেন। জরুরি কাজ।'

'জরুরি কাজ না হাতি। জরুরি কাজ হলে চলে যেত না। পাশে বসে থাকত।'

'আপনি চলে যান নিজাম ভাই।'

'একা তোমাকে রেখে চলে যেতে খারাপ লাগছে।'

'আমি বেশিক্ষণ থাকব না। এই ঘন্টাখানিক।'

ঘন্টাখানিক নয়, মুনির সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করল। কাগজগুলো হয়তো জরুরি। আগামীকাল ছুটি। কাদের সাহেব এই ছুটির মধ্যে তাকে খুঁজে পাবেন না। সেও কাদের সাহেবের বাসার ঠিকানা জানে না।

মুনিরের রীতিমতো কান্না পেতে লাগল। বারান্দায় ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকা খুবই কষ্টের। সময় কাটতেই চায় না। দুপুরে কিছু খাওয়া হয় নি। প্রচণ্ড খিদে লেগেছে। অফিসের পাশেই চায়ের দোকান আছে একটা। টোস্ট, কলা এইসব পাওয়া যায়। কিন্তু যেতে ইচ্ছে করছে না। বরং নিজেকে কোনো–না–কোনোভাবে কষ্ট দিতে ইচ্ছে করছে। মুনির ঠিক করল, রাতেও সে কিছু খাবে না। দু'গ্লাস পানি খেয়ে শুয়ে থাকবে। মাঝে–মাঝে সে এ–রকম করে।

সন্ধ্যা মেলাবার আগেই আকাশ অন্ধকার করে বৃষ্টি নামল।

শ্রাবণ মাসের বৃষ্টি একবার শুরু হলে থামবে না। বৃষ্টির ছাঁট গায়ে লাগছে। তা লাগুক। কাগজগুলো না–ভিজলেই হয়। মুনির সদর দরজা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। পা টাটাচ্ছে। বসে পড়তে ইচ্ছে করছে। বৃষ্টির জন্যেই বেশ কয়েকজন ভিখিরিণী আশ্রয় নিয়েছে। খুব অল্প সময়েই এরা কেমন গুছিয়ে নিয়েছে। পা ছড়িয়ে গল্পগুজব করছে। এক জন আবার রাস্তা আড়াল করে বসে বিড়ি ধরিয়েছে। মুনিরকে দেখে একটু লজ্জা–লজ্জা পাচ্ছে। অন্য এক জনের কোলে ছোট্ট একটা বাচ্চা। সে বাচ্চাটির সঙ্গে নিচুগলায় কী সব গল্প করছে। এ–রকম ছোট তিন–চার বছরের শিশুর কোনো গল্প বোঝার কথা নয়। কিন্তু শিশুটি মনে হয় বুঝতে পারছে।

বৃষ্টি কমার কোনো লক্ষণ নেই। রাস্তায় একহাঁটু পানি। এই পানি ভেঙে এজিএম সাহেবের গাড়ি আসবে না। তিনি নতুন গাড়ি কিনেছেন। গাড়ির গায়ে এক ফোঁটা পানি পড়লে আঁৎকে ওঠেন।

বৃষ্টির বেগ ক্রমেই বাড়ছে। শ্রাবণ মাসে ঝড় হবার কথা শোনা যায় না, বাতাসের গতিক দেখে মনে হচ্ছে ঝড় হবে। পাশের চায়ের দোকান ঝাঁপ বন্ধ করছে।

'মুনির, এই মুনির।'

মুনির চমকে উঠল। নিজামুদ্দিন সাহেব। পায়জামা হাঁটু পর্যন্ত তোলা। মাথায় ছাতা থাকা সত্ত্বেও ভিজে জবজব করছেন। পাঞ্জাবি লেপ্টে গায়ের সঙ্গে মিশে আছে।

'আমার তাই সন্দেহ হচ্ছিল। এই জন্যই এলাম, তুমি আছ এখনো?'

'বৃষ্টিতে আটকা পড়েছি।'

'বৃষ্টি তো শুরু হল সন্ধ্যাবেলায়। কোন আক্কেলে তুমি সন্ধ্যা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইলে! তুমি কি বায়েজিদ বোস্তামী? আবার হাসছ? এর মধ্যে হাসির কী হল!'

'আপনি আমার খোঁজে আবার এলেন?'

'আসব না তো কী করব? বৃষ্টি নামার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হল তুমি এখনো আছ। এর নাম হচ্ছে ইনট্যুশন। এখন চল আমার সঙ্গে। নাকি সারারাত দাঁড়িয়ে থাকবে?'

'কোথায় যাব?

'আমার বাসায়। আমার সঙ্গে আজ খাবে। তুমি মহা মূর্খ। মহা–মহা মূর্খ।'

নিজাম সাহেবের বাসা ভূতের গলিতে। দু'–কামরার টিনের ঘর। কাঁচা রাস্তা পার হয়ে যেতে হয়। জায়গায়–জায়গায় খানাখন্দ। স্ট্রীট লাইট নেই। ইলেকট্রিসিটি না থাকায় সমস্ত অঞ্চলটাই অন্ধকারে ডুবে আছে। নিজাম সাহেব হাত ধরে–ধরে মুনিরকে নিয়ে যাচ্ছেন। কাদায় পানিতে দু' জনই মাখামাখি। নিজাম সাহেব সারা পথ গালাগালি

করতে-করতে আসছেন। কিছুক্ষণ পর-পর বলছেন, 'তুমি মহা মূর্খ।'

মুনিরের বড় ভালো লাগছে। অনেক দিন পর সে কোনো মানুষের মধ্যে এমন গাঢ় মমতার পরিচয় পেল। এই ঝড়-বৃষ্টির রাতে ভদ্রলোক একা-একা গিয়েছেন খোঁজ নিতে।

বাড়ি পৌঁছামাত্র গরম পানির ব্যবস্থা হল। নিজাম সাহেব ঠেলে তাকে বাথরুমে ঢুকিয়ে দিলেন। বাথরুম অন্ধকার। সারা বাড়িতে একটামাত্র হারিকেন।

'মুনির।'

'জ্বি?'

'তাকে সাবান আছে।'

'কিছু তো দেখতে পাচ্ছি না।'

'দরজা বন্ধ করার দরকার কী? খোলা রাখ।'

মুনির দরজা অল্প একটু ফাঁক করল। ভেতরবাড়ির সবটা দেখা যাচ্ছে। ফ্রক-পরা কিশোরী একটি মেয়ে বারান্দায় কেরোসিন কুকারে রান্না চড়িয়েছে। মেয়েটির পাশে ভেজা-কাপড়ে নিজাম সাহেব। কি যেন বলছেন মেয়েকে, আর মেয়ে বারবার হেসে উঠছে। অন্ধকারে এই হাসির শব্দ এত মধুর লাগছে!

বাড়িতে আর কোনো লোকজন নেই। নিজাম সাহেবের স্ত্রী মারা গেছেন অল্প কিছুদিন আগে। দেশের বাড়িতে গিয়ে জ্বরে পড়েছিলেন। জ্বরের সঙ্গে ধীরে-ধীরে আরো সব উপসর্গ যুক্ত হল। খবর পেয়ে নিজাম সাহেব গেলেন দেশে। তিন দিনের আর্নড লীভ নিয়ে গিয়েছিলেন। দু' দিনের দিন ফিরে এসে যথারীতি হিসাবের খাতা নিয়ে বসলেন। বিকেলে অফিসের ছুটির পরও বসে রইলেন। মুনির এসে বলল, 'নিজাম ভাই বাসায় যাবেন না? নাকি আজও হিসাবের গণ্ডগোল আছে?'

নিজাম সাহেব শান্ত গলায় বললেন, 'অন্যের হিসাব মিলিয়ে দিয়েছি। নিজেরটা মেলে না। আমার স্ত্রী মারা গেছে। বাড়ি গিয়ে দেখি দশ মিনিট আগে ডেডবডি কবর দিয়ে ফেলেছে। অনেকেই বলেছিল কবর থেকে আবার তোলা হোক। শেষ দেখা। আমি নিষেধ করলাম।'

নিজাম সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। তার চেহারায় বা আচার-আচরণে শোকের কোনো ছাপ নেই। অফিসের হিসাব না-মিললে এই মানুষটি অনেক বেশি বিচলিত হয়।

পাটি বিছিয়ে খাওয়ার আয়োজন। উচ্ছে ভাজা, চিংড়ি মাছ, ডাল এবং একটা শব্জি। কিশোরী মেয়েটি খাবার তুলে তুলে দিচ্ছে। মেয়েটির মুখ গোলাকার, নাক ঈষৎ চাপা তবু ভারি মিষ্টি লাগছে মেয়েটিকে। মেয়েটির কথাবার্তায় কোনো আড়ষ্টতা নেই, যেন মুনিরকে সে অনেক দিন থেকে চেনে। মেয়েটি মিষ্টি রিনরিনে গলায় কথা বলছে এবং খুব কৌতূহলী চোখে মুনিরকে দেখছে।

'বাবা প্রায়ই বাসায় এসে বলেন, আপনি নাকি বাবার হিসাব মিলিয়ে দিয়েছেন। প্রতি বৃহস্পতিবার অফিসে যাবার সময় বলেন--ছেলেটিকে দাওয়াত করব। আপনাকে বোধহয় আর বলেন না। নাকি বলেন, আপনি আসেন না?'

মুনিরের কেন জানি লজ্জা করছে। চোদ্দ-পনের বছরের বাচ্চা একটি মেয়ে, তবু

কেন মুনির সহজ হতে পারছে না।

'নিজাম ভাই, আপনার কি একটিই মেয়ে?'

'হ্যাঁ, বিনুর বড় একটা ভাই ছিল। জন্মের পরপর মারা গেছে।'

'আপনার মেয়ে কী পড়ে?'

বিনু হেসে ফেলে বলল, 'আপনি বাবাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন? আমাকে জিজ্ঞেস করুন। আপনি এত লজ্জা পাচ্ছেন কেন?'

'কী পড় তুমি?'

'আইএ পড়ি।'

নিজাম সাহেব বললেন, 'আর পড়াশোনা হবে না। বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। এ দেশে বিয়ের পর মেয়েদের পড়াশোনা হয় না।'

মুনির বিনুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'কোথায় বিয়ে ঠিক হয়েছে?'

বিনু আবার হেসে ফেলল। হাসিমুখে বলল, 'যে-সব প্রশ্ন বাবাকে করা দরকার, সে-সব প্রশ্ন আপনি করছেন আমাকে। আর যে-সব প্রশ্ন আমাকে করা দরকার, সে-সব করছেন বাবাকে। আপনি মানুষ এত অদ্ভুত কেন?'

'তুমি কিছু মনে করো না।'

'না, কিছু মনে করছি না। আপনার কি গরম লাগছে?'

'গরম লাগবে কেন? গরম লাগছে না।'

'ঘামছেন কেন?'

বিনুর প্রশ্নের সঙ্গে-সঙ্গেই ব্যাপারটা ঘটল। চোখের সামনের জগৎ হঠাৎ কেমন ঘোলাটে হয়ে গেল। শব্দ অস্পষ্ট। ঘোলাটে আলোর তীব্রতা দ্রুত কমছে—কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না। মুনির তলিয়ে যাচ্ছে শব্দহীন আলোহীন এক জগতে। শরীরের কোনো ইন্দ্রিয় কাজ করছে না। এই অবস্থা কতক্ষণ ছিল মুনিরের মনে নেই। ঘোর কাটল। কিছু-কিছু আলো সে দেখতে পাচ্ছে। দু'একটা শব্দ কানে আসছে। মুনির ক্লান্ত গলায় বলল, 'পানি খাব।'

'এইমাত্র না পানি খেলে! আবার পানি কেন? সত্যি খেতে চাও?'

মুনির স্পষ্ট করে তাকাল। সে একটা অচেনা বাড়ির অচেনা বারান্দায় বসে আছে। তার সামনে বিনু। তার গায়ে ঘরোয়া ভঙ্গিতে পরা হালকা নীল রঙের একটা সুতির শাড়ি। বারান্দায় একটা পাটি পাতা। বিনু বসেছে পাটিতে। সে একটা চেয়ারে বসে আছে। রাত। বারান্দায় চাঁদের আলো আছে।

'এই, সত্যি সত্যি পানি চাও?'

'চাই।'

বিনু উঠে গেল। এই বাড়ি কার? এই মেয়েটির সঙ্গে তার কী সম্পর্ক, জায়গাটা কোথায়? সে কিছুই জানে না। বছরখানিক আগে প্রথম যা হয়েছিল, এও কি তাই? তার কি দুটো জীবন? এই দুটো জীবন কি পাশাপাশি চলছে?

'নাও, পানি নাও।'

মুনির যন্ত্রের মতো হাত বাড়াল। ঠাণ্ডা কনকনে পানি।

'ও কি, গ্লাস হাতে বসে আছ কেন?'

'এটা কোন জায়গা?'

'এ আবার কি রকম কথা? কোন জায়গা মানে?'

'এন্নি বললাম।'

'চল, শুয়ে পড়ি। আর কতক্ষণ বারান্দায় বসে থাকবে?'

মুনির যন্ত্রের মতোই একটা ঘরে ঢুকল। এটাই বোধহয় শোবার ঘর। বেশ বড়লোকের বাড়ি মনে হচ্ছে। সুন্দর করে সাজান। দেয়ালে তিন–চার বছরের একটা ফুটফুটে শিশুর ছবি। মেয়েটি বলল, 'শোন, চট করে ঘুমিয়ে পড়বে না। বাবার চিঠির জবাব দিয়ে তারপর ঘুমুবে। আমার তো মনে হয় তুমি তাঁর চিঠি পড় নি এখনো। নাকি পড়েছ?'

'না।'

'পড়ে শোনাব?'

'শোনাও।'

মেয়েটি ড্রয়ার খুলে চিঠি বের করল--গলার স্বর বুড়ো মানুষের মতো করে পড়তে শুরু করল—টুনু, তুমি দীর্ঘদিন যাবত আমার পত্রের জবাব দিতেছ না। ইহার কারণ বুঝিতে আমি অক্ষম। এক জন বৃদ্ধ মানুষের পত্রের জবাব দেওয়া সাধারণ ভদ্রতা। চাকরি এবং সংসার নিয়া তুমি ব্যস্ত আমি জানি। দুনিয়ার সকলেই ব্যস্ত। কেহ বসিয়া নাই। তোমার মা বাতে আক্রান্ত। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা চলিতেছে। তবে আমার ইচ্ছা তাহাকে ঢাকায় আনিয়া কোনো বড় ডাক্তারকে দিয়া দেখান। ঢাকায় বাত রোগের জন্য নামী ডাক্তারদের সন্ধান লইও।

বৌমাকে আদর ও স্নেহচুম্বন দিবে। তাহাকে অতি শীঘ্রই পৃথক পত্র দিব। ইতি

চিঠি পড়া শেষ করে মেয়েটি বলল, 'দেখলে, তোমার ওপর কি রকম রাগ করেছেন? একটা চিঠি লিখতে কতক্ষণ লাগে বল তো? কাগজ–কলম এনে দিই।'

মুনির সেই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে দেয়ালে টাঙান ছবিটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'এটা কার ছবি?'

মেয়েটি দীর্ঘ সময় মুনিরের দিকে তাকিয়ে রইল। তার চোখ ছলছল করছে। এই শিশুটি সম্ভবত তাদেরই। এবং খুব সম্ভব শিশুটি বেঁচে নেই। তার জন্যে মুনিরের কোনো দুঃখ বোধ হচ্ছে না। কারণ এই শিশুটিকে সে চেনে না। অতীতের কিছুই তার মনে পড়ছে না। সে দেখছে শুধু বর্তমান। এবং অদ্ভুত কোনো বর্তমান। এই বর্তমানের কোনো ব্যাখ্যা নেই। মুনির আবার বলল, 'ছবিটা কার?'

মেয়েটি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, 'তোমার কী হয়েছে! ছবি কার জিজ্ঞেস করছ কেন? তুমি জান না ছবি কার?'

বলতে–বলতে মেয়েটি ফুঁপিয়ে উঠল। মুনিরের ঘোর কেটে গেল। সে আগের জায়গাতেই আছে। ভাত–মাছ খাচ্ছে। বিনু মেয়েটি পাতে এক চামচ ডাল দিল। নিজাম সাহেব বললেন, 'দৈ আছে। টক দৈ। ডালের সঙ্গে মিশিয়ে খাও। ভালো লাগবে।'

বিনু বলল, 'দৈ কিন্তু বাবা নেই। বেড়াল মুখ দিয়েছিল, ফেলে দিয়েছি। ইস্, আপনার বোধহয় খাওয়ায় খুব কষ্ট হল।'

'না, কষ্ট হয় নি।'

'এমন দিনে বাবা আপনাকে নিয়ে এসেছে যে, কোনো বাজার নেই। একটা যে ডিম ভেজে দেব সে উপায়ও নেই। ঘরে ডিমও ছিল না।'

'আমার কিচ্ছু লাগবে না।'

'আরেকদিন কিন্তু আপনি আসবেন। আসবেন তো?'

'হ্যাঁ, আসব।'

'খবর দিয়ে আসবেন।'

'আচ্ছা, খবর দিয়ে আসব।'

'আপনি কি পান খান?'

'না।'

মুনির বারান্দায় হাত ধুতে গেল। বিনু সঙ্গে করে পানি নিয়ে এসেছে। এখন আর বৃষ্টি নেই। মেঘ কাটতে শুরু করেছে। হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যেই চাঁদ উঠবে। শ্রাবণ মাসের চাঁদ অপূর্ব হয়, কে জানে আজ কেমন হবে?

৮

মিসির আলি হাসিমুখে বললেন, 'কি ব্যাপার, আজ খালি হাতে যে। আমার সিগারেট কোথায়?'

মুনির লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসল। মিসির আলি বললেন, 'আজকালের মধ্যে না এলে আমি নিজেই উপস্থিত হতাম তোমার ওখানে।'

'আমি কোথায় থাকি তা তো আপনি জানেন না।'

'আগে জানতাম না। এখন জানি। শার্লক হোমসের মতো বুদ্ধি খাটিয়ে বের করেছি। শুনতে চাও?'

'চাই।'

'প্রথমে খোঁজ করলাম ইস্টার্ন মার্কেন্টাইলে। দেখা গেল এই নামে কোনো অফিস নেই। তুমি ভুল ইনফরমেশন দিয়েছিলে।'

'ভুল দিই নি। আগে এই নাম ছিল। এখন নাম বদলেছে।'

'যখন দেখলাম অফিস থেকে কোনো সাহায্য পাওয়া যাবে না, তখন পাড়ার ছোট-ছোট পান-বিড়ির দোকানগুলোতে খোঁজ করতে লাগলাম। কারণ তুমি সিগারেট খাও। এইসব দোকানগুলোতে তোমাকে একাধিকবার যেতে হবে।'

'সিগারেট খাই, কী করে বুঝলেন! আপনার সামনে তো কখনো খাই নি।'

'তোমার পকেটে দেশলাই দেখেছি। তা ছাড়া যে সিগারেট খায়, সে-ই সাধারণত অন্যকে সিগারেট উপহার দেবার কথা ভাবে।'

'দোকান থেকেই আমার খোঁজ পেলেন?'

'হ্যাঁ। মুনির, তুমি চা খাবে?'

'হ্যাঁ, খাব।'

'তুমি কথায়-কথায় স্যার বল, আজ এখন পর্যন্ত একবারও বল নি। কারণটা কী?'

'স্যার, আমি চা খাব।'

মিসির আলি উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন। তার মনে হল, ছেলেটি বেশ রসিক। এবং

সে সহজ হতে শুরু করেছে। যত সহজ হবে, ততই তাঁর জন্যে ভালো। প্রচুর তথ্য তাঁর দরকার। তথ্য ছাড়া এগুবার কোনো পথ নেই। তিনি নিজে কোনো তথ্য সংগ্রহ করতে পারছেন না। ছেলেটির উপরই তাঁকে নির্ভর করতে হবে।

'আজ আমাকে কিছু বলবে মনে হচ্ছে?'

'জ্বি, বলব।'

'বাতি নেভাতে হবে?'

'না।'

মুনির খুব সহজ ভঙ্গিতে নিজাম সাহেবের বাড়ির ঘটনার কথা বলল। কেমন করে হঠাৎ পট পরিবর্তন হল, সে-সময় তার অনুভূতি কী ছিল, সবই সুন্দর করে গুছিয়ে বলল। শিশুটির দেয়ালে টাঙান ছবিটির কথা, তার পানি চাইবার কথা—কিছুই বাদ দিল না। মিসির আলি একটি প্রশ্নও করলেন না। সমস্ত বর্ণনাটা শুনলেন চোখ বন্ধ করে। এক বারও তাকালেন না।

'তোমার বলা শেষ হয়েছে?'

'জ্বি।'

'তোমার বর্ণনা থেকেই মনে হচ্ছিল, বিনু মেয়েটি তোমাকে অভিভূত করেছে। রূপবতী কিশোরী মেয়ে। তার সহজ সরল ব্যবহার, তার যত্ন—এইসব তোমাকে মুগ্ধ করেছে। তাই না?'

'জ্বি।'

'তুমি প্রবলভাবে মেয়েটিকে কামনা করেছ। সেই সঙ্গে তার প্রতি তীব্র আকর্ষণ বোধ করেছ। এই প্রচণ্ড কামনা বা প্রবল আকর্ষণের কারণে তোমার মধ্যে বিভ্রম সৃষ্টি হয়েছে। যার জন্যে মেয়েটিকে তুমি দেখেছ তোমার স্ত্রী হিসেবে। পুরোটাই তোমার কল্পনা। ডে-ড্রীমিং। এক ধরনের ইচ্ছেপূরণ স্বপ্ন।'

'হতে পারে।'

'আগের বার তুমি একটি চিঠি নিয়ে এসেছিলে। এবার কিছু আন নি?'

'না।'

আবার যদি কখনো এ-রকম হয়, একটা জিনিস মনে রাখবে--কিছু একটা হাতে নেবে। খবরের কাগজ হলে খুব ভালো হয়।'

'খবরের কাগজ দিয়ে কী করবেন?'

'খবরের কাগজে একটা তারিখ থাকে। এই তারিখটা দেখব। তুমি তোমার অন্য একটা জীবনের কথা বলছ। মনে হচ্ছে দুটো জীবন পাশাপাশি চলছে। সেই জীবনের সময় এবং এই জীবনের সময়ও কি পাশাপাশি?'

'তার মানে আপনি কি আমার কথা বিশ্বাস করছেন?'

'না, করছি না। আবার পুরোপুরি অবিশ্বাসও করতে পারছি না। কিছু একটা দাঁড় করাতে হলে আমার প্রচুর তথ্য দরকার। সেইসব তথ্য আমার হাতে নেই। তবে তুমি যে-গল্প বলছ, তার কাছাকাছি গল্প বিভিন্ন উপকথায় চালু আছে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। একটা শুধু তোমাকে বলি। এক লোক পুকুরে গোসল করতে নেমেছে। প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত, গোসল শেষ করে বাসায় গিয়ে খাবে। পানিতে ডুব দিয়ে যেই উঠল ওমনি

সে দেখে, সব কিছু কেমন অন্য রকম লাগছে। সব অচেনা। সে নিজের দিকে তাকিয়ে দেখল সে নিজেও বদলে গেছে। সে এখন আর পুরুষ নয়। রূপবতী এক যুবতী। সে কাঁপতে কাঁপতে পানি ছেড়ে উঠে এল। এক সওদাগর তখন তাকে দেখতে পেয়ে সঙ্গে নিয়ে গেল। সওদাগরের সঙ্গে তার বিয়ে হল। চারটি ছেলেমেয়ে হল। তারপর একদিন দুপুরে সে সবাইকে নিয়ে গোসল করতে এসেছে। পানিতে ডুব দিয়ে ওঠামাত্র দেখল, সে তার পরিচিত জগতে উঠে এসেছে। আবার সে পুরুষ। সে দ্রুত তার বাড়িতে গেল। স্ত্রী ভাত বেড়ে অপেক্ষা করছে। লোকটির মন গভীর বিষাদে আচ্ছন্ন। বারবার চারটি পুত্র-কন্যার কথা তার মনে পড়ছে। ওরা কোথায় আছে, কী করছে, কে জানে? হয়তো ব্যাকুল হয়ে মাকে খুঁজছে।'

মুনির বলল, 'এটা তো উপকথা। সত্যি নয়।'

'তা ঠিক। তবে সব গল্পের পেছনেই এক ধরনের ''সত্যি'' ব্যাপার থাকে। এর পেছনেও কিছু-না-কিছু থাকতে পারে। আমি এইজাতীয় সব গল্প জোগাড় করছি। প্যারালাল ওয়ার্ল্ডজাতীয় যত বই পাচ্ছি পড়ছি।

মুনির ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলল। মিসির আলি বললেন, 'তুমি তোমার স্ত্রী হিসেবে যে-মেয়েটিকে দেখেছ, তার বয়স কি ফ্রক-পরা মেয়েটির চেয়ে বেশি মনে হচ্ছিল?'

'হ্যাঁ, হচ্ছিল।'

'তোমার শোবার ঘরে জানালায় পর্দা ছিল?'

'হ্যাঁ, ছিল।'

'পর্দার রঙ মনে আছে?'

'জ্বি-না।'

'ঘরের বিছানায় যে-চাদর ছিল, তার রঙ কী?'

'আমার মনে নেই।'

'তাহলে ব্যাপারটা স্বপ্ন হবারই সম্ভাবনা। কারণ, শুধু স্বপ্নদৃশ্যগুলোই হয় সাদাকালো।'

'আমি কিন্তু দেখেছি, ঐ মেয়েটির পরনে নীল রঙের শাড়ি।'

'নিজাম সাহেবের মেয়েটির পরনে নিশ্চয়ই কিছু ছিল। যে-কারণে তুমি ভাবছ তোমার স্বপ্নে দেখা স্ত্রীর গায়ের শাড়িটি নীল।'

মুনির চুপ করে রইল। মিসির আলি বললেন, 'নিজাম সাহেবের মেয়েটির গায়ে কী ছিল?'

'ফ্রক বা কামিজজাতীয় কিছু।'

'তার রঙ কী ছিল?'

'নীল।'

মিসির আলি অল্প হাসলেন। পরমুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে বললেন, 'তোমার এই নিয়ে দু' বার বিচিত্র অভিজ্ঞতা হল। দু' বারই তুমি ছিলে ক্লান্ত, বিরক্ত, হতাশ। তাই না?'

'জ্বি।'

'এখন থেকে মাঝে-মাঝে চেষ্টা করে দেখবে, নিজ থেকে ঐ জগতে যেতে পার

কি না। যখন একা-একা থাকবে তখন চেষ্টা করবে। ঐ জগতে যেতে চাইবে। ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করবে।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'কোনো এক জন ভালো নিউরোলজিস্টকে দিয়েও তোমার ব্রেইন ওয়েভগুলো পরীক্ষা করাতে চাই। আমি প্রফেসর আসগর নামে এক নিউরোলজিস্টের সঙ্গে কথাও বলে রেখেছি। তুমি কি কাল বিকেল পাঁচটায় একবার আমার কাছে আসতে পারবে?'

'পারব। কিন্তু স্যার, নিউরোলজিস্ট তো অনেক টাকা নেবে!'

'সেটা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।'

মিসির আলির সে-রাতে ভালো ঘুম হল না। ভয়ংকর একটা স্বপ্ন দেখে রাত তিনটায় ঘুম ভেঙে গেল। বাকি রাতটা জেগে কাটাতে হল। স্বপ্নদৃশ্য নিয়েও প্রচুর চিন্তা করলেন। অবদমিত কামনাই স্বপ্নে উপস্থিত হয়। ব্যাখ্যা সহজ এবং চমৎকার, কিন্তু তবু কোথাও যেন একটা ফাঁকি আছে। কিছু-একটা বাকি থেকে যায়। সেই কিছুর রহস্য কি কোনো দিন ভেদ হবে?

আচ্ছা, পশু-পাখি এরাও কি স্বপ্ন দেখে? অবদমিত কামনা কি তাদের নেই? পশুদের স্বপ্ন কেমন হয়? স্বপ্ন দেখার সময় মানুষের চোখের পাতা কাঁপতে থাকে--বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় তাকে বলে Rapid eye movement (REM). ঐ জাতীয় কম্পন তিনি একটি ঘুমন্ত কুকুরের চোখের পাতায় দেখেছিলেন। সেই কুকুরটি কি তখন স্বপ্ন দেখছিল? জানার কোনো উপায় নেই।

মিসির আলির খানিকটা মন খারাপ হল। এক দিন না এক দিন এইসব রহস্যের সমাধান হবে, কিন্তু তিনি জেনে যেতে পারবেন না। মানুষ স্বল্পায়ু প্রাণী--এটাও একটা গভীর বেদনার ব্যাপার। এত বুদ্ধি নিয়ে সৌরজগতে যে-প্রাণীটি এসেছে, তার কর্মকাল সীমাবদ্ধ।

তিনি বাতি নিভিয়ে ঘুমের চেষ্টা করছেন--লাভ হচ্ছে না। বিচিত্র সব চিন্তা মাথায় আসছে। একটির সঙ্গে অন্যটির কোনো মিল নেই। আবার মিল আছেও। অদৃশ্য যে সুতোয় মিলগুলো গাঁথা, সে-সুতোটির নাম অনন্ত মহাকাল--The eternity.

৯

নিউরোলজিস্ট প্রফেসর আসগর বিশালদেহী মানুষ। গোলগাল মুখ। মাথাভর্তি টাক--তীক্ষ্ণ চোখ। শিশুরা ভয় পেয়ে যাবার মতো চেহারা, কিন্তু মানুষটি হাসিখুশি। কারণে অকারণে রোগীকে ধমক দেয়ার বাজে অভ্যাসটি এখনো অর্জন করেন নি।

ভদ্রলোক অনেক ঝামেলা করলেন। প্রথম বারের স্ক্যানিং ভালো হয় নি, দ্বিতীয় বার করলেন। কিন্তু কিছুই খুঁজে পেলেন না। চোখে পড়ার মতো কোনো অস্বাভাবিকতা ব্রেইন ওয়েভে নেই। তিনি হেসে বললেন, 'আপনি এক জন খুবই সুস্থ মানুষ। শুধু শুধু আমার কাছে এসেছেন। আপনার অসুবিধা কী?'

'কোনো অসুবিধা নেই। মাঝে মাঝে আজেবাজে স্বপ্ন দেখি, এই অসুবিধা।'

'আজেবাজে স্বপ্ন তো সবাই দেখে। আমিও দেখি। একবার কী দেখলাম জানেন? বাংলা একাডেমিতে গ্রন্থমেলা হচ্ছে, আমি শুধু একটা আণ্ডারওয়্যার পরে সেই গ্রন্থমেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। হা হা হা।'

মুনির হেসে ফেলল।

মিসির আলি বললেন, 'বাংলাদেশে ক্যাট স্কেনের কোনো ব্যবস্থা আছে? আমি এই ছেলের ব্রেইনের একটা ক্যাট স্কেন করাতে চাই।'

'শুধু-শুধু ক্যাট স্কেন কেন করাবেন?'

'পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হতে চাই যে, ওর মস্তিষ্কে কোনো সমস্যা নেই।'

'বাংলাদেশে ক্যাট স্কেনার নেই। মাদ্রাজে নিয়ে যেতে পারেন। সেখানে আছে।'

ডাক্তারের চেম্বার থেকে বের হয়ে মিসির আলি বললেন, 'তোমার নিশ্চয়ই পাসপোর্ট নেই।'

'জ্বি-না।'

'কাল সকাল দশটার দিকে এসো, পাসপোর্ট অফিসে গিয়ে একটা দরখাস্ত করে দিই।'

'পাগল হয়েছেন নাকি স্যার?'

'আমি পাগল হব কেন? পাগল হচ্ছ তুমি। তা পুরোপুরি হবার আগেই একটা ব্যবস্থা করা দরকার।'

'অনেক টাকার ব্যাপার স্যার।'

'তা তো বটেই। আমার কাছেও এত টাকা নেই। একটা ব্যবস্থা করতে হবে। পাসপোর্টটা তো করা থাকুক। চা খাবে নাকি? এস, চা খাওয়া যাক।'

দু' জন চা খেল নিঃশব্দে। চায়ের দোকানে রেডিও বাজছে। মিসির আলি অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে রেডিও শুনছেন। তাঁর চোখ ছায়াচ্ছন্ন। গানের বিষাদ তাঁকে স্পর্শ করেছে।

'যখন মইরা যাইবারে হাছন
মাটি হৈব বাসা।
কোথায় রইবো লক্ষণ ছিরি,
রঙ্গের রামপাশা।'

মুনির অবাক হয়ে লক্ষ করল, মিসির আলির চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। এই মানুষটির প্রতি গভীর মমতা ও ভালবাসায় মুনিরের হৃদয় আর্দ্র হল। পৃথিবীতে ভালো-মানুষের সংখ্যা কম। কিন্তু এই অল্প ক'জনের হৃদয় এত বিশাল, যে, সমস্ত মন্দ মানুষ তাঁরা তাঁদের হৃদয়ে ধারণ করতে পারেন।

মিসির আলি রুমাল বের করে চোখ মুছে অপ্রস্তুতের হাসি হাসলেন। থেমে-থেমে বললেন, 'মানুষের মন বড় বিচিত্র। এই গান আগে কতবার শুনেছি, কখনো এরকম হয় নি। আজ হঠাৎ চোখে পানিটানি এসে এক কাণ্ড! চল, ওঠা যাক।'

মুনির বলল, 'একটু বসুন স্যার, আপনাকে একটা কথা বলি।'

'বল।'

'ঐদিন আপনি আমাকে বলেছিলেন চেষ্টা করতে, নিজে-নিজে ঐ জগতে যেতে পারি কি না।'

'চেষ্টা করেছিলে?'

'জ্বি। আমি যেতে পারি। ইচ্ছে করলেই পারি।'

'বল কী!'

'হ্যাঁ স্যার। গত তিন দিনে আমি চার বার গিয়েছি। যাওয়াটা খুবই সহজ।'

মিসির আলি চুপ করে রইলেন। মুনির বলল, 'আমি আপনার জন্যে দুটো জিনিস ওখান থেকে নিয়ে এসেছি।'

'কী জিনিস?'

'দুটো ছবি।'

'বল কী তুমি! দেখি!'

মুনির একটা খাম এগিয়ে দিল। মৃদু গলায় বলল, 'বাসায় গিয়ে দেখবেন স্যার। প্লীজ।'

মিসির আলি কৌতূহল সামলাতে পারলেন না। ছবি দুটো দেখলেন। একটি বিয়ের ছবি--বর এবং কনে পাশাপাশি বসে আছে। তাদের ঘিরে আছে আত্মীয়স্বজন। বর মুনির। কনে নিশ্চয়ই বিনু নামের মেয়েটি।

অন্যটি স্বামী-স্ত্রীর ছবি। ওদের কোলে ফুটফুটে একটি শিশু। ছবির উল্টো পিঠে লেখা--

'আমাদের টগরমণি। বয়স এক বছর।'

মুনির বলল, 'এ আমাদের ছেলে। চার বছর বয়সে মারা যায়। নিউমোনিয়া হয়েছিল। ডাক্তাররা উল্টাপাল্টা চিকিৎসা করেছেন।'

বলতে-বলতে মুনিরের গলা আর্দ্র হয়ে গেল। মিসির আলি দীর্ঘ সময় মুনিরের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'কোনো খবরের কাগজ আন নি?'

'জ্বি-না স্যার। কিছু আনার কথা তখন মনে থাকে না। ছবিগুলো কেমন করে চলে এসেছে, আমি জানি না। ছবিগুলো হাতে নিয়ে দেখছিলাম, হঠাৎ ঘোর কেটে গেল--দেখি আমি আমার ঘরে বসে আছি। আমার হাতে দুটো ছবি।'

'চল, রাস্তায় কিছুক্ষণ হাঁটি।'

'চলুন।'

তারা দু' জন উদ্দেশ্যহীন ভঙ্গিতে সন্ধ্যা নামার আগ পর্যন্ত হেঁটে বেড়াল। কারো মুখে কোনো কথা নেই। মিসির আলির মুখ চিন্তাক্লিষ্ট। একসময় তিনি বললেন, 'তুমি কি এর পরেও নিজাম সাহেবের বাসায় গিয়েছিলে?'

'জ্বি-না স্যার।'

'চল, আজ যাওয়া যাক।'

'কেন?'

'এম্নি যাব। দেখব। কথা বলব। ভয় নেই, ছবির কথা কিছু বলব না।'

'আমার স্যার যেতে ইচ্ছে করছে না।'

'বেশ, তুমি না গেলে। কীভাবে যেতে হয় আমাকে বল। আমি একাই যাব।'

'স্যার, আমি চাই না ঐ মেয়েটি ছবি সম্পর্কে কিছু জানুক।'

'ও কিচ্ছুই জানবে না।'

মুনির খুব অনিচ্ছার সঙ্গে ঠিকানা বলল। তাকে দেখে মনে হচ্ছে, সে খুব অস্বস্তি বোধ করছে।

'স্যার, যাই?'

'আচ্ছা, দেখা হবে।'

মুনির ঘর থেকে বের হয়েও বেশ কিছু সময় বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল, যেন চলে যাবার ব্যাপারটায় তার মন ঠিক সায় দিচ্ছে না, আবার না-যাওয়াটাও মনঃপূত নয়।

মিসির আলি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন--মনে-মনে বললেন, অদ্ভুত মানবজীবন। মানুষকে আমৃত্যু দ্বিধা এবং দ্বন্দ্বের মধ্যে বাস করতে হয়।

তিনি নিজেও তাঁর জীবন দ্বিধার মধ্যে পার করে দিচ্ছেন। সমাজ-সংসার থেকে আলাদা হয়ে বাস করতে তাঁর ভালো লাগে, আবার লাগে না। মানুষের মঙ্গলের জন্যে তীব্র বাসনা অনুভব করেন। এক জন মমতাময়ী স্ত্রী, কয়েকটি হাসিখুশি শিশুর মাঝখানে নিজেকে কল্পনা করতে ভালো লাগে। আবার পর মুহূর্তেই মনে হয়--এই তো বেশ আছি। বন্ধনহীন মুক্ত জীবনের মতো আনন্দের আর কী হতে পারে? পুরোপুরি নিঃসঙ্গও তো নন তিনি। তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরির দিকে তাকালে মন অন্য রকম হয়ে যায়। সারি-সারি বই। কত বিচিত্র চিন্তা, কত বিচিত্র কল্পনার কী অপূর্ব সমাবেশ। এদের মাঝখানে থেকে নিঃসঙ্গ হবার কোনো উপায় নেই।

মিসির আলি বইয়ের তাকের দিকে চোখ বন্ধ করে হাত বাড়ালেন। যে-বই হাতে উঠে আসে, সে বইটিই খানিকক্ষণ পড়বেন। এটা তাঁর এক ধরনের খেলা। সব সময়ই এমন একটা বই উঠে আসে, যা পড়তে ইচ্ছে করে না। আবার পড়তে শুরু করলে ভালো লাগে।

আজও তাই হল। কবিতার বই হাতে। এই একটি বিষয়ে পড়াশোনা তাঁর ভালো লাগে না। কবিতার বই সজ্ঞানে কখনো কেনেন নি, এখানে যা আছে সবই নীলু নামের তাঁর এক ছাত্রীর দেয়া উপহার। মেয়েদের এই এক অদ্ভুত সাইকোলজি, উপহার দেবার বেলায় কবিতার বই খোঁজে।

মিসির আলি বইটির পাতা ওল্টাতে লাগলেন। ইংরেজি কবিতা। কার লেখা কে জানে? অবশ্য নামে কিছু যায়-আসে না। তিনি ভ্রূ কুঁচকে কয়েক লাইন পড়তে চেষ্টা করলেন--

I can not see what flowers are at my feet,
Nor what soft incense hangs upon the boughs,

এর কোনো মানে হয়!

কোনো মানে হয় না, তবু পড়তে এত ভালো লাগে! মিসির আলি পড়তে শুরু করলেন।

১০

অনেকক্ষণ ধরে কে যেন কড়া নাড়ছে।

কড়া নাড়ার ধরনটা অদ্ভুত। দু'টি টোকা দিয়ে থেমে যাচ্ছে, আবার দু'টি টোকা

দিচ্ছে। জানালার পর্দা সরিয়ে বিনু উঁকি দিল। অপরিচিত এক জন মানুষ। রোগা, মুখভর্তি দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল। এর মাঝে দু'টি চোখ জ্বলজ্বল করছে।

বিনু ভয় পাওয়া গলায় বলল, 'কে?'

লোকটি খুবই কোমল স্বরে বলল, 'আমাকে তুমি চিনবে না। আমার নাম মিসির আলি।'

কোমল স্বর খুবই সন্দেহজনক। এ-রকম মিষ্টি গলায় একটা অপরিচিত লোক কথা বলবে কেন?

বিনু বলল, 'বাবা তো একটু বাজার করতে গিয়েছে। আপনি আধ ঘন্টা পরে আসুন না।'

'বাসায় বুঝি তুমি ছাড়া আর কেউ নেই?'

'জ্বি-না।'

'আচ্ছা ঠিক আছে, দরজা খুলতে হবে না। আমি এখানেই আধ ঘন্টা অপেক্ষা করি।'

বিনু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। মিসির আলি বললেন, 'একটা কাজ কর, জানালা দিয়ে আমাকে একটা দেশলাই দাও।'

'আসুন, আপনি ভেতরে এসে বসুন।'

মিসির আলি হেসে বললেন, 'এখন বুঝি আমাকে আর দুষ্টু লোক মনে হচ্ছে না?'

'না।'

'নৌকায় যখন ডাকাতি হয়, তখন ডাকাতরা কী করে, জান? আগুন চায়।'

'এটা তো আর নৌকা না।'

মিসির আলি হেসে ফেললেন। মুনির যা বলেছে, তাই--এ মেয়েটির আচার-আচরণে খুব স্বাভাবিক একটি ভঙ্গি আছে। ঠিক সুন্দরী তাকে বলা যাবে না, তবে চেহারা খুব মায়াকাড়া। তার চেয়েও বড় কথা, ছবিতে এই মেয়েটিই কনে হয়ে বসে আছে। এই মেয়েটির বাঁ গালের কাটা দাগটাও ছবিতে নিখুঁত এসেছে।

'বিনু, তুমি বস, তোমার সঙ্গে গল্প করি।'

'আপনি আমার নাম জানলেন কীভাবে?'

'মুনির বলেছে। মুনিরকে চেন তো? তোমার আব্বার সঙ্গে কাজ করে।'

'খুব ভালো করে চিনি। আপনি কি ওঁর আত্মীয়?'

'ঠিক আত্মীয় না হলেও খুব চেনা। মাঝে মাঝে অনাত্মীয় লোকজনকেও খুব চেনা মনে হয় না? মুনিরও সে-রকম।'

'আপনি তো খুব সুন্দর করে কথা বলেন।'

'তুমিও খুব সুন্দর করে কথা বল।'

'বাবার কাছে কী জন্যে এসেছেন?'

'ঠিক তোমার বাবার কাছে আমি আসি নি। আমি এসেছি তোমার কাছে।'

বিনু বিস্মিত হয়ে তাকাল। মিসির আলি একটা ছবির উল্টো পিঠ দেখিয়ে বললেন, 'এখানে লেখা আছে, ''আমাদের টগরমনি। বয়স এক বছর।'' এই হাতের লেখাটা কি তোমার?"

বিনু খুবই অবাক হয়ে লেখাটার দিকে তাকিয়ে রইল।

'বল, তোমার হাতের লেখা?'

'জ্বি। কিন্তু আমি এ-রকম কিছু কখনো লিখি নি।'

'তা আমি জানি।'

'ছবিটা দেখি।'

'উঁহু, ছবিটা এখন দেখাব না। পরে দেখাব। এখন অন্য একটা ছবি দেখ, বিয়ের ছবি। বর-কনে বসে আছে। তাদের ঘিরে আত্মীয়স্বজনরা দাঁড়িয়ে আছে। বর এবং কনের ছবি আমি কাগজ দিয়ে ঢেকে রাখব। তুমি শুধু অন্যদের ছবিগুলো দেখবে এবং বলবে এদের চেন কি না।'

'তার আগে বলুন, আপনি কে?'

'আমি আমার নাম তো আগেই বলেছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাইকোলজি পড়াই। একটা ছোট্ট গবেষণা করছি। গবেষণাটা মুনিরকে নিয়ে।'

'ওকে নিয়ে গবেষণা করছেন, কিন্তু আমাকে এ-সব দেখাচ্ছেন কেন?'

'পরে তোমাকে বলব। তুমি এখন ছবিটা একটু দেখ তো। চিনতে পার এদের?'

'হাঁ, দু' জনকে বাদ দিয়ে সবাইকে চিনি। এরা সবাই আমার আত্মীয়। আমার খালা, আমার ফুপু। এটা হচ্ছে আমার বান্ধবী লিজা। এটা আমার বড় খালার মেয়ে কনক। ইনি আমার ছোট মামা।'

মিসির আলি ছবিটি পকেটে রেখে দিলেন।

বিনু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। কিছু বলতে গিয়ে সে বলল না। নিজেকে সামলে নিল। মিসির আলি বললেন, 'তুমি কি কিছু বলবে?'

'না।'

'মনে হচ্ছিল কি জানি বলতে চাইছিলে?'

'আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, এটা আমার বিয়ের ছবি। কিন্তু আমার বিয়ে হয় নি। আপনি এই ছবি কোথায় পেলেন?'

মিসির আলি চুপ করে রইলেন। বিনু কড়া গলায় বলল, 'আপনি এখন যান। আমি দরজা বন্ধ করে দেব।'

মিসির আলি নিঃশব্দে উঠে এলেন। বিনু জানালার পর্দা ফাঁক করে তাকিয়ে আছে--তার মুখ বিষণ্ন। চোখে গাঢ় বিষাদের ছায়া। এই বিষাদের উৎস কী, কে জানে?

১১

এখন রাত প্রায় একটা।

আন্দাজে বলছি, কারণ আমার ঘড়ি নেই। রাতের বেলা আন্দাজে সময় ঠিক করি। দিনের বেলা এই অসুবিধা হয় না। বেশির ভাগ মানুষের হাতেই ঘড়ি থাকে। জিজ্ঞেস করলেই সময় জানা যায়।

যে আমার এই লেখা পড়বে, সে বুদ্ধিমান হলে ধরে ফেলবে যে আমি আজেবাজে

কথা লিখে সময় নষ্ট করছি। আসলে তা না। কিভাবে শুরু করব বুঝতে পারছি না।

মিসির আলি সাহেব আমাকে চমৎকার বাঁধান খাতা দিয়েছেন। শুধু তাই না, সঙ্গে খুব দামী একটা কলম। বল পয়েন্ট না, ফাউনটেন পেন। কালির দোয়াতও কিনেছেন। দোয়াতটার দামই সত্তর টাকা। কলমটার দাম কত কে জানে। দুই তিন শ' টাকা তো হবেই। এত দামী কলম, কিন্তু লেখা ভালো না। অর্থাৎ আমি লিখে আরাম পাচ্ছি না।

মিসির আলি সাহেব বলেছেন, আমি যেন রোজ লিখি। প্রতিটি খুঁটিনাটি যেন লিখি। কিছুই যেন বাদ না দিই। ভ্রমণের ব্যাপারটাই যেন লিখি। ভ্রমণ বলতে তিনি অন্য জগতে যাবার ব্যাপারটা বোঝাচ্ছেন। তিনি নিজে এই ব্যাপারটা বিশ্বাস করেন কি করেন না, তা আমি এখনো বুঝতে পারছি না। মাঝে মাঝে মনে হয় বিশ্বাস করেন, আবার মাঝে-মাঝে মনে হয় করেন না। পুরো ব্যাপারটাই এক জন নিঃসঙ্গ যুবকের কল্পনা ধরে নিয়েছেন।

আমি তাঁকে একটি চিঠি এবং দুটি ছবি এনে দিয়েছি। এই প্রসঙ্গে তিনি একটি কথাও বলছেন না। আমি একবার ছবিটা চাইলাম। তিনি বললেন, 'পরে পাবে।'

তিনি যে চুপচাপ বসে আছেন তাও মনে হয় না। আমার ব্যাপারে তিনি খুলনা গিয়েছিলেন, এটা হঠাৎ জানতে পারি। সেখান থেকে তিনি কী জানলেন, আমি জানি না।

ফুলেশ্বরীর শ্বশুরবাড়িতেও তিনি গিয়েছিলেন। আমার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করছেন বলে মনে হয়। আমি নিজে যা জানি, সবই তাঁকে বলেছি। এর বেশি তিনি কী জানতে চান কে জানে। লোকটির ধৈর্য অসীম। মমতাও অসীম। তাঁর মমতার নানান পরিচয় পেয়েছি। কঠিন ঋণে তিনি আমাকে আবদ্ধ করেছেন। আমার পক্ষে ঋণমুক্ত হবার কোনো পথ আছে কি না আমি জানি না। ঋণমুক্ত হতে চাইও না। কিছু কিছু মানুষের কাছে ঋণী থাকতে ভালো লাগে। মিসির আলি তেমন এক জন মানুষ।

আবারো আজেবাজে কথা বলছি। কি করব, আমি তো আর লেখক নই, যে, গুছিয়ে ঘটনার পর ঘটনা সাজাব। আমি তা পারি না। লেখক ছাড়া অন্য কেউই বোধ-হয় পারেন না।

যাই হোক, মূল ব্যাপারে ফিরে আসি। আমি এখন প্রায় এক শ' ভাগ নিশ্চিত যে, আমার পাশাপাশি দু'টি জীবন চলছে। এক জীবনে আমার বাবা শৈশবে মারা গেছেন। প্রবল দুঃখ কষ্ট ভোগ করে বর্তমানে এই অবস্থায় আছি। অসহায় নিঃসঙ্গ এক জন মানুষ।

অন্য জীবনটি চমৎকার। এই জীবনে বাবা বেঁচে আছেন। আমি বড় কোনো চাকরি কিংবা ব্যবসা করছি, এখনো ঠিক জানি না। বিয়ে করেছি। জীবনটা বেশ সুখের বলেই মনে হচ্ছে। এই জীবনটাকে আমি স্বপ্নজীবন নাম দিচ্ছি বোঝার সুবিধের জন্যে। স্বপ্ন-জীবনটাও পৃথিবীর মধ্যেই। কারণ, সেখানেও আমি আকাশে চাঁদ দেখছি। দুটি পাশাপাশি জীবন কিভাবে চলছে? দুটি কি সম্পূর্ণ ভিন্ন জগৎ? দুটি পৃথিবী দুটি চাঁদ? সব মানুষই দু' জন করে? এইসব প্রশ্নের আমি কোনো কূল-কিনারা পাই না। কাজেই খুব বেশি ভাবিও না। চিন্তা-ভাবনার দায়িত্ব আমি মিসির আলি সাহেবের ওপর ছেড়ে দিয়েছি।

আমি লক্ষ করেছি যে, এখন আমি এ জগৎ থেকে স্বপ্ন-জগতে খুব সহজেই

যেতে পারি। নিয়মটা খুব সহজ। নিজেকে প্রথমে খুব ক্লান্ত করে নিতে হয়। উপবাস এবং পরিশ্রম এই দুটি জিনিস একত্রে চালিয়ে যাবার পর চোখ বন্ধ করে স্বপ্ন-জগৎটির কথা ভাবলেই হয়।

একবার স্বপ্ন-জগতে চলে যাবার পর সেই জগৎটাকে সত্যি মনে হয়। বর্তমানে যে জীবন যাপন করছি, তাকে মনে হয় মিথ্যা জীবন। কোনটি সত্যি কে জানে? প্রাচীনকালের মুনি-ঋষিরা বলতেন--জীবনটাই একটা মায়া। আসলেই বোধহয় তাই। সবটাই বোধহয় মায়া। আমার এখন এ-সব জানতে ইচ্ছে করে না। যে-কোনো একটি জীবনে আমি স্থায়ী হতে চাই।

যদি এটা এক ধরনের অসুখ হয়, তাহলে আমি চাই যেন অসুখটা সেরে যায়। সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষের মতো জীবনযাপন করতে চাই। মুক্তি চাই। পরিপূর্ণ মুক্তি।

আজ এর বেশি কিছু লিখতে ইচ্ছে করছে না। এখন তৈরি হব ভ্রমণের জন্যে। অদ্ভুত এক ভ্রমণ। এই জীবন ছেড়ে অন্য এক জীবনে।

মুনির খাতা বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল। বাতি নিভিয়ে সিগারেট ধরাল। মনে-মনে বলল--ভ্রমণের প্রস্তুতি। যাত্রা হবে শুরু। এ-রকম যদি হত—ওয়ান ওয়ে জার্নি, আর ফিরে আসতে হবে না--তাহলে কেমন হত? স্বপ্ন-জীবনটি কি খুবই সুখের? মৃত্যু ঐ জীবনেও হানা দিয়েছে। টগরের মৃত্যু হল। বাবা-মার কাছে কত তীব্রই না ছিল সেই শোক! সে এখন বুঝতে পারছে না, কিন্তু ঐ জীবনের মুনির কী গভীর শোক পেয়েছে, তা সে রক্তের মধ্যে অনুভব করে। শোক এবং শোক, চারদিকেই শোক। জাপানি একটি কবিতায় আছে না?

'বল দেখি কোথা যাই
কোথা গেলে শান্তি পাই?
ভাবিলাম বনে যাব
তাপিত হিয়া জুড়াব
সেখানেও অর্ধ-রাত্রে
কাঁদে মৃগী কম্প গাত্রে।।'

মুনির সিগারেট ফেলে নিজেকে তৈরি করল। মুহূর্তে ঘরের চেহারা পাল্টে গেল। সে দাঁড়িয়ে আছে সিঁড়ির মাথায়, তারা কোথায় যেন বেরুচ্ছে। ঐ তো বিনু। আশ্চর্য, কী সুন্দর লাগছে বিনুকে। অসম্ভব সুন্দর। বিনুর চুলগুলো পিঠময় ছড়ান। এ-রকম খোলা চুলে সে কোথায় যাচ্ছে। নাকি বিনু যাচ্ছে না, সে একাই যাচ্ছে? একটি কাজের লোক বড়-বড় দুটি স্যুটকেস নিয়ে নামছে। তারা নিশ্চয়ই দূরে কোথাও যাচ্ছে। ঘরে দিনের আলো। ক'টা বাজছে কে জানে। মুনির হাতের ঘড়ির দিকে তাকাল--দশটা পনের। ঘড়ির ডায়াল সবুজ রঙের। বাহ্, ইন্টারেস্টিং তো। এটা তো স্বপ্ন। স্বপ্নে তো রঙ দেখার কথা নয়। সে রঙ দেখছে কেন? কে বলেছিল, স্বপ্নে রঙ দেখার কথা নয়? মনে পড়ছে না। নামটা মনে পড়ছে না। ম দিয়ে শুরু। মিহির? মুনির? না না, মিসির। মিসির আলি। মিসির আলি বলেছেন--ভ্রমণের সময় খবরের কাগজ হাতে নেবে। খবরের কাগজ হাতে নিতে হবে কেন? মিসির আলি বলেছেন, একটা খবরের কাগজ হাতে নেবে। কিছুতেই হাতছাড়া করবে না। কেন বললেন এ-রকম কথা। বিনু কেমন যেন বিরক্ত মুখে তাকাচ্ছে।

'টগর। টগর।'

মুনির চমকে উঠল। টগরকে কেন ডাকছে? টগর চার বছর বয়সে মারা গেল না? বিনু কি ভুলে গেছে? এত বড় একটা ঘটনা কি ভোলার কথা! অবশ্যি ভোলাটা অস্বাভাবিকও নয়। এই তো সে নিজেই অনেক কিছু ভুলে যাচ্ছে। কি কি যেন তাকে বলেছিলেন মিসির আলি। এখন আর কিছুই মনে পড়ছে না।

'টগর। আমি কিন্তু খুব রাগ করছি। আর এক বার মাত্র ডাকব। এর মধ্যে তুমি যদি আস ভালো কথা, না এলে তোমাকে ছাড়াই রওনা হব।'

মুনির অবাক হয়ে দেখল, টগর এসেছে। আট-ন' বছর বয়সের চশমাপরা একটা ছেলে। টগর বলল, 'আমি যাব না, মা।'

বিনু বলল, 'খুব ভালো কথা, থাক তুমি।'

বিনু তরতর করে নেমে যাচ্ছে। টগর হাসিমুখে মুনিরের দিকে তাকিয়ে আছে।

তার মানে কি টগর বেঁচে আছে? চার বছর বয়সে ও তাহলে মারা যায় নি? এটা কোন জীবন? অন্য আরেকটা? এর মানে কী?

মুনিরের নিঃশ্বাস ভারি হয়ে এল। সঙ্গে-সঙ্গে ঘোর কেটে গেল। সে আছে তার পরিচিত জায়গায়। ভ্রমণ শেষ হয়েছে।

মুনির বাতি জ্বালাল। খাতা খুলে লিখল, 'মানুষের জীবন দুটি নয়। অনেক। হয়তো-বা অসংখ্য।'

ক্লান্তিতে খাতার ওপরই মাথা রেখে সে ঘুমিয়ে পড়ল। সারারাত সেই ঘুম ভাঙল না। কত বিচিত্র স্বপ্ন দেখল ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে! কখনো মনে হচ্ছে সে মেঘে-মেঘে ভেসে বেড়াচ্ছে, আবার কখনো-বা তলিয়ে যাচ্ছে গভীর অতলে। কী গাঢ় নীল সেই পানি! চারদিকে শব্দহীন সময়। কী অসহ্য নীরব। এই নীরবতার মধ্যেও কে যেন নিচু গলায় তাকে ডাকছে। বিনু ডাকছে নাকি? এটা কি বিনুর গলা? আহ্! কী সুন্দর করেই না সে ডাকছে! আবার সব চুপচাপ। অসহ্য নীরবতা। মুনির স্বপ্নের মধ্যেই কাঁদছে। চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে বলছে--আমাকে মুক্তি দাও। কিন্তু তার চিৎকারেও কোনো শব্দ হচ্ছে না। কী অদ্ভুত অবস্থা!

তার ঘুম ভাঙল ভোরবেলা। প্রথম খানিকক্ষণ বুঝতেই পারল না, সে কোথায় আছে। কোন জগতে। সে ঠিক করল, আজ অফিসে যাবে না। সারাদিন রাস্তায় রাস্তায় হাঁটবে। দুপুরবেলার দিকে যাবে মিসির আলির কাছে। এমনি খানিকক্ষণ গল্প করবে। দুপুরবেলা বা দিনের আলোয় তাঁর কাছে কখনো যাওয়া হয় নি। দিনের আলোয় লোকটিকে দেখতে কেমন দেখায় কে জানে! তবে দুপুরবেলা ওঁকে হয়তো পাওয়া যাবে না। ক্লাসে থাকবেন কিংবা লাইব্রেরিতে থাকবেন।

মিসির আলি ঘরেই ছিলেন, অবাক হয়ে বললেন, 'অসময়ে তুমি, ব্যাপার কি বল তো? অফিসে যাও নি?'

'জ্বি-না। আপনি ইউনিভার্সিটিতে যান নি?'

'না। আজ বৃহস্পতিবার না? বৃহস্পতিবারে ইউনিভার্সিটি বন্ধ থাকে।'

'কী করছেন স্যার?'

'রান্না করছি। রোজ-রোজ হোটেলে খাওয়া ভালো লাগে না।'

'কী রান্না করছেন?'

'নতুন ধরনের রান্না, আমিই তার আবিষ্কারক। নাম হচ্ছে মিসির মিকচার। চাল, ডাল এবং আলু একসঙ্গে মিশিয়ে দু' চামচ ভিনিগার, এক চামচ সয়া সস, একটুখানি লবণ, দুটো কাঁচা লঙ্কা এবং আধা চামচ সরিষা বাটা দিয়ে সেদ্ধ করতে হয়। সেদ্ধ হয়ে যাবার পর এক চামচ বাটারওয়েল দিয়ে দমে দিতে হয়--অপূর্ব একটা জিনিস নামে। খেয়ে দেখ।'

জিনিস যেটা নামল, তার চেহারা দেখলে খেতে ইচ্ছে করে না, কিন্তু স্বাদ সত্যি চমৎকার। মুনির অবাক হয়ে গেল।

'কি, কেমন লাগছে?'

'জ্বি স্যার, ভালো।'

'আরো কিছু বিশেষণ দিয়ে বল। শুধু ভালো, এর বেশি কিছু না?'

'চমৎকার স্যার!'

'এখন বল, তুমি যে ভ্রমণে যাচ্ছ, সেখানে কখনো খাওয়াদাওয়া করেছ? চট করে বলতে হবে, না-ভেবে বল।'

'পানি খেয়েছি।'

'পানিতে হবে না, স্বাদ আছে এমন কিছু।'

'মনে পড়ছে না স্যার।'

'এই জিনিসটা খুব ভালো করে খেয়াল করবে।'

'কেন?'

'স্বপ্নে আমরা প্রায়ই প্রচুর খাওয়াদাওয়া করি। তাতে কিন্তু কোনো স্বাদ থাকে না।'

'আপনি এখনো স্বপ্ন ভাবছেন?'

'হ্যাঁ, ভাবছি। তবে তুচ্ছ স্বপ্ন ভাবছি না।'

'সব স্বপ্নই তো তুচ্ছ।'

'না, তা না। তা ছাড়া স্বপ্নকে তুচ্ছ করাও খুব মুশকিল। ফ্রয়েড সাহেব ইন্টারপ্রিটেশন অব ড্রীম লিখে স্বপ্নের মহিমাকে খর্ব করেছেন, কিন্তু তাঁর শিষ্য ''জাং'' পরবর্তী সময়ে ভিন্ন কথা বলেছেন।'

'কি বলেছেন?'

'ঐ সব থিওরি তোমার ভালো লাগবে না। তারচে বরং তোমার কথা শুনি। যা যা করতে বলেছিলাম, করেছ তো? সব কিছু লিখছ তো?'

'লিখছি।'

'খুব খুঁটিয়ে লিখবে। কোনো কিছু বাদ দেবে না।'

'কি হবে স্যার এসব দিয়ে?'

'হয়তো কিছু হবে না। তাতে কি? কই, আমার সিগারেট এনেছ?'

মুনির পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল। মিসির আলি হেসে ফেললেন।

১২

বিনু বলল, 'বাবা, তুমি ঐ ভদ্রলোককে আর তো আনলে না।'

নিজাম সাহেব বললেন, 'মুনিরের কথা বলছিস?'

'হ্যাঁ। তাঁর সঙ্গে দেখা হয় না?'

'হবে না কেন? রোজই তো হচ্ছে।'

'আজ একবার তাঁকে নিয়ে আসতে পারবে?'

'কেন?'

'একটা দরকার আছে বাবা।'

'কি দরকার?'

'আছে একটা দরকার। তুমি অবশ্যি আজ তাঁকে সঙ্গে করে আনবে।'

'রাতে খেতে বলব?'

'হঁ, বলতে পার।'

বিনুর ভাবভঙ্গি নিজাম সাহেব ঠিক বুঝতে পারলেন না। ক' দিন আগেই সে একটা অদ্ভুত কাণ্ড করেছে। রাতে ঘুমুতে যাবার আগে-আগে বিনু তাঁর ঘরে এল। মশারি গুঁজে দিল। বাতাস যাতে ঢুকতে পারে সে জন্যে জানালার পর্দা উঠিয়ে দিল। নিজাম সাহেব বললেন, 'কিছু বলবি?'

'না বাবা, কিছু বলব না।'

'তোকে দেখে মনে হচ্ছে কিছু বলতে চাস।'

'না, চাই না। তুমি যদি কিছু বলতে চাও, বল। আমি শুনব।'

'আমি আবার কী বলব? ঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে আসছে।'

'তাহলে ঘুমাও। বাতি নিভিয়ে দিই?'

'দে।'

বিনু বাতি নিভিয়ে দিল। ঘর অন্ধকার হয়ে যেতেই সে মৃদু স্বরে বলল, 'আমার যে বিয়ে তুমি ঠিক করেছ, ওতে আমার মত নেই। বিয়ে ভেঙে দাও।'

'কি বললি!'

বিনু উত্তর দেবার জন্যে দাঁড়াল না, ঘর ছেড়ে নিজের ঘরে চলে এল। নিজাম সাহেব পেছনে-পেছনে উঠে এলেন। বিনু ততক্ষণে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়েছে। তিনি বেশ ক' বার ডাকলেন। বিনু সাড়া দিল না।

ভোরবেলায় তিনি বিনুকে খুব স্বাভাবিক দেখলেন। যেন কিছুই হয় নি। আগের মতো হাসিখুশি। তাঁর বুক থেকে পাথর নেমে গেল। তাঁর মনে হল বিনু যা করেছে, তা সাময়িক অস্থিরতার কারণে। অস্থিরতা কেটে গেছে।

বিয়ের কথাবার্তা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। বরপক্ষীয় লোকজন বিয়ের কার্ড ছাপাতে দিয়েছে। এ সময় নতুন কোনো ঝামেলা সৃষ্টি না-হলেই ভালো। বিনু তেমন মেয়ে নয়। অবুঝের মতো কিছু করবে বলে মনে হয় না। তবু নিজাম সাহেবের ভয় কাটে না। চমৎকার ছেলে পাওয়া গেছে। ডাক্তার। স্বভাব-চরিত্র ভালো--নম্র-ভদ্র ছেলে। এই বিয়ে ভেঙে গেলে এ-রকম আরেকটি ছেলে পাওয়া মুশকিল হবে।

সন্ধ্যাবেলা নিজাম সাহেব একা-একা ফিরলেন। বিনু কিছু বলল না। নিজাম

সাহেব জামা খুলতে–খুলতে নিজ থেকেই বললেন, 'মুনির আজ আসেনিরে মা। দেখি, আগামীকাল যদি আসে, নিয়ে আসব।'

বিনু চুপ করে রইল। রাতে খেতে বসে নিজাম সাহেব দেখলেন, অনেক আয়োজন। তিনি শুধু মাছ কিনে দিয়ে গিয়েছিলেন। এখন দেখা যাচ্ছে মুরগিও আছে।

'মুরগি কোথায় পেলি রে?'

'আকবরের মা'কে দিয়ে আনিয়েছি।'

'ও এসেছে নাকি?'

'হুঁ।'

'যাক, ভালো হয়েছে, এখন আর একা–একা থাকতে হবে না।'

'হ্যাঁ, ভালোই হয়েছে।'

'অবশ্যি কয়েকটা দিন। তোর খালারাও তো চলে আসবে। বিয়েশাদির ব্যাপার, ওদেরই তো এখন দায়িত্ব।'

কথাটা বলে নিজাম সাহেব আড়চোখে তাকালেন। মেয়ের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করলেন। তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা গেল না।

'তুইও বসে যা। একসঙ্গে খাই।'

'আমার খিদে নেই বাবা, তুমি খাও।'

'খিদে নেই কেন? শরীর খারাপ নাকি?'

'না, শরীর ঠিকই আছে।'

রাতে বিনু বাবার মশারি খাটাতে এসে শান্ত গলায় বলল, 'কাল যদি ঐ ভদ্রলোক আসেন, তাহলে তাকে মনে করে নিয়ে এসো।'

নিজাম সাহেব বিস্ময় গোপন করে বললেন, 'কোনো দরকার আছে?'

'না, এন্নি।'

'আচ্ছা, বলব।'

পরদিনও মুনির অফিসে এল না। নিজাম সাহেব একা–একা ফিরলেন। বিনু বলল, 'উনি আজও অফিসে আসেন নি, তাই না?'

'হুঁ, তাই।'

'ওঁর ঠিকানা জানা আছে?'

'না।'

বিনু আর কিছু বলল না। নিজাম সাহেব রাতে খেতে বসে দেখলেন, আজও অনেক আয়োজন। খাবার শেষে পায়েসও আছে। তিনি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। ছেলেটাকে এ বাড়িতে আনা বোধহয় ঠিক হয় নি। ভুল হয়েছে। ভুলটা কোথায়, তা তিনি ধরতে পারছেন না।

'বিনু।'

'বল বাবা।'

'আমাদেরও তো কার্ডটার্ড ছাপাতে হয়।'

'ছাপাতে হলে ছাপাও।'

'না, মানে · · · ওই দিন তুই হঠাৎ বললি––মানে ওই বিয়ের ব্যাপারটা, মানে· · ·'

'পায়েস নাও বাবা। পায়েসটা ভালো হবার কথা।'

'খাওয়া বেশি হয়ে গেছে। রোজ এ-রকম খাওয়া হলে ব্লাডপ্রেসার হয়ে যাবে।'

'তোমার কিছুই হবে না। নিশ্চিন্ত হয়ে খাও তো!'

নিজাম সাহেবের বুকের পাথর নেমে গেল। তিনি তার পুরনো, পরিচিত মেয়েকে খুঁজে পেলেন। এই লক্ষ্মী মেয়ে সারাজীবন কাউকে যন্ত্রণা দেয় নি, এখনো দেবে না।

রাতে মশারি গুঁজতে এসে বিনু চেয়ার টেনে পাশে বসল। নিজাম সাহেব নিদারুণ আতঙ্ক বোধ করলেন। একবার ভাবলেন--ঘুমিয়ে পড়েছেন এমন ভাব করবেন, ডাকলে সাড়া দেবেন না।

'বাবা।'

'কি?'

'আগামীকাল তুমি যে করেই হোক, ভদ্রলোকের ঠিকানা বের করবে।'

'কেন?'

'আমি মিসির আলি নামে এক জন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে চাই!'

'সে আবার কে?'

'তুমি চিনবে না, উনি এক বার এ-বাড়িতে এসেছিলেন। মুনির সাহেবকে চেনেন।'

'তুই কি বলছিস, আমি তো কিছুই বুঝছি না।'

'আমিও বুঝতে পারছি না বাবা। উনি একটা অদ্ভুত ছবি নিয়ে এসেছিলেন। মনে হয় আমার বিয়ের ছবি।'

'কি আবোল-তাবোল বকছিস! তোর বিয়ের ছবি মানে? তোর বিয়েটা হল কবে?'

নিজাম সাহেব উত্তেজনায় মশারি থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁর ভ্রূ কুঞ্চিত। কপালের চামড়ায় গভীর ভাঁজ।

'ব্যাপারটা কী, আমাকে গুছিয়ে বল।'

'আমি জানলে তো গুছিয়ে বলব। আমাকে জানতে হবে না? আমার মনে হয় উনি জানেন।'

'কি বারবার উনি-উনি করছিস, উনিটা কে?'

'মিসির আলি সাহেব।'

'কী মুশকিল, মিসির আলিটা কে?'

'একবার তো বলেছি বাবা, মুনির সাহেবের বন্ধু।'

সে-রাতে নিজাম সাহেবের ভালো ঘুম হল না। বারবার জেগে উঠলেন। শেষরাতের দিকে ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখলেন। যেন প্রকাণ্ড একটা মাকড়সার পেটের সঙ্গে তিনি সেঁটে রয়েছেন। মাকড়সাটা তাঁকে পেটে নিয়ে দ্রুত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাচ্ছে। ঐ মাকড়সার পেছনে-পেছনে আরো কয়েকটা মাকড়সা তাঁর দখল নেবার চেষ্টা করছে। বড় মাকড়সাটার সঙ্গে পারছে না। মাকড়সাটার গা থেকে পিচ্ছিল কি একটা বের হচ্ছে। তাঁর গা মাখামাখি হয়ে যাচ্ছে। তিনি ঘুমের মধ্যেই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। কী ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন!

১৩

দরজায় খুব আলতো করে কে যেন হাত রাখল। মিসির আলি কেরোসিনের চুলোয় চা বসিয়েছেন। সেখান থেকেই বললেন, 'কে?' কোনো রকম জবাব পাওয়া গেল না। কেউ দরজার কড়াও নাড়ছে না। মিসির আলি উঠে এলেন। দরজার ও-পাশে একজন-কেউ আছে। কড়া না-নাড়লেও তা বোঝা যাচ্ছে। মানুষের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় খুব দুর্বল নয়, অনেক কিছুই সে ধরতে পারে।

হয়তো কোনো ভিখিরি। কড়া নাড়তে সঙ্কোচ বোধ করছে, কিংবা এমন কেউ, যে ঠিকানা গুলিয়ে ফেলেছে। মিসির আলি দরজা খুলে চমকে উঠলেন--নীলু দাঁড়িয়ে আছে। হালকা বেগুনি রঙের শাড়ি। কাঁধে চামড়ার ব্যাগ। বোধহয় অনেকক্ষণ ধরেই সে নানান জায়গায় ঘুরছে। তার শান্তমুখে শ্রান্তির ছায়া।

'কেমন আছ নীলু?'

'ভালো। ভেতরে আসব?'

'কী আশ্চর্য! কেন আসবে না?'

'আমি ভাবছিলাম, আপনি আমাকে ঘরেই ঢুকতে দেবেন না।'

'এ-রকম মনে করার কোনো কারণ আছে?'

'হ্যাঁ, আছে। আপনি আমার হাত থেকে বাঁচার জন্যে ঠিকানা বদল করেছেন। ইউনিভার্সিটিতেও যান না।'

'ইউনিভার্সিটিতে যাই না, কারণ আমি এক বছরের ছুটি নিয়েছি। এস, ভেতরে এসে বস।'

নীলু ভেতরে এসে দাঁড়াল। ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল। নিচু গলায় বলল, 'আর কেউ নেই?'

'আর কে থাকবে? তুমি কি ভেবেছিলে বিয়ে করে, সংসার পেতে বসেছি?'

'না, তা ভাবি নি। আপনি গৃহী মানুষ নন।'

'তাহলে আমি কি সন্ন্যাসী?'

'না, তাও না।'

'নীলু, তুমি আরাম করে বস--আমি চা বানাচ্ছিলাম। চা শেষ করে তোমার সঙ্গে কথা বলব।'

'চা-টা আমি বানিয়ে দিই?'

'দাও। সব হাতের কাছেই আছে--হাত বাড়ালেই পাবে।'

নীলু শীতল গলায় বলল, 'হাতের কাছে থাকলেই হাত বাড়ালে সব কিছু পাওয়া যায় না।'

মিসির আলি এই মেয়েটির সঙ্গে কথা বলার সময় কথার পিঠে কথা গুছিয়ে বলতে পারেন না। কিছুতেই সহজ হতে পারেন না, অথচ তার সঙ্গেই সম্পর্কটা সবচে সহজ হওয়া উচিত ছিল।

নীলু চায়ের কাপ নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল, 'আপনি আমাকে কিছু না বলে বাড়িটা বদলালেন কেন?'

'নানান ঝামেলায় বলা হয়ে ওঠে নি।'

'বাজে কথা বলবেন না। আপনি ইচ্ছে করেই এটা করেছেন। এবং কেন করেছেন তাও জানি।'

'কেন করেছি?'

'লোকলজ্জার ভয়ে। আমার মতো একটা অল্পবয়সী মেয়ে আপনার মতো আধবুড়োর পেছনে দিন–রাত ঘুরঘুর করে, এটা আপনার ভালো লাগে নি। সারাক্ষণ ভেবেছেন, লোকে না–জানি কি বলছে।'

'লোকে কি বলছে না–বলছে, তা নিয়ে আমি কখনো মাথা ঘামাই না।'

'তাও অবশ্যি ঠিক। আপনি মাথা ঘামান বড়–বড় বিষয় নিয়ে।'

মিসির আলি আলোচনার মোড় ঘোরাবার জন্যে বললেন, 'ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করছি, বুঝলে নীলু। একটা মানুষের অনেক ক'টা জীবন থাকার একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।' নীলু বলল, 'এসব শুনতে আমার ভালো লাগছে না।'

'ভালো না লাগলেও শোন--এই যে তুমি এসেছ আমার কাছে, এটা ঘটছে এই জীবনে। অন্য এক জীবনে আমি হয়তো গিয়েছি তোমার কাছে। সেই জীবনে আমি হয়তো তোমার পেছনে–পেছনে ঘুরছি, আর তুমি পালিয়ে বেড়াচ্ছ।'

'আপনি কি পালিয়ে বেড়াচ্ছেন?'

'আমি কথার কথা বলছি নীলু।'

নীলু থমথমে গলায় বলল, 'আপনার ঠিকানা বের করার জন্যে আমি যে কী কষ্ট করেছি, তা যদি আপনি জানতেন·····।'

'জানলে কী হত?'

'না--কী আর হত? কিছুই হত না।'

নীলুর চোখ ছলছল করছে। মিসির আলি ভয় করছেন, হয়তো কেঁদে ফেলবে। তবে এই মেয়েটি শক্ত মেয়ে, সহজে কাঁদবে না। নিজেকে সামলে নেবে।

হ্যাঁ, তাই হচ্ছে। নীলু নিজেকে সামলে নিচ্ছে। সে সহজ গলায় বলল, 'চায়ে চিনি হয়েছে তো?'

মিসির আলি হাসলেন। কী সুন্দর লাগছে মেয়েটিকে।

১৪

বিনু অবাক হয়ে বলল, 'আপনি!'

মুনির অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে হাসল। নিচু গলায় বলল, 'স্যার কি বাসায় নেই?'

'বাসায় থাকবেন কেন? এখন তো ওঁর অফিসে থাকবার কথা। তাই না?'

'ও, আচ্ছা--হ্যাঁ।'

'আপনি অফিসে যান নি?'

'না। আমি তাহলে যাই।'

'বসতে চাইলে বসুন।'

মুনির বারান্দায় চেয়ারটায় বসে পড়ে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছল। টানা টানা গলায় বলল, 'পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম···।'

'চা খাবেন, না লেবু দিয়ে সরবত বানিয়ে দেব? আপনি খুব ক্লান্ত, সেই জন্যে বলছি।'

'না, কিছু লাগবে না।'

বিনু ভেতরে চলে গেল। আবার ফিরে এল লেবুর সরবতের গ্লাস হাতে নিয়ে।

'আমাদের তো ফ্রীজ নেই, এই জন্যে খুব ঠাণ্ডা হবে না। গরম সরবত।'

মুনির হেসে ফেলল। বিনু বলল, 'আমার মনে হয়, আপনি আমাকে কিছু বলতে এসেছেন। বলে ফেলুন।'

'না, এম্নি এসেছি।'

'আপনি এম্নি আসেন নি। কি বলতে চান আপনি বলুন। আমি রাগ করব না।'

মুনির ক্ষীণ স্বরে বলল, 'আমি আপনাকে চিনি।'

'তা তো চিনবেনই। না-চেনার তো কথা না। আগে এক দিন এসেছিলেন। আমার বাবাকে এত ভালো করে চেনেন, আর আমাকে চিনবেন না?'

'তার চেয়েও ভালোভাবে চিনি।'

'তাই নাকি?'

'জ্বি।'

'কীভাবে বলুন তো?'

'আপনি যখন খুব ছোট, তখন কী কী করতেন সব আমি বলতে পারব।'

'বেশ তো, দু'-একটা বলুন, আমি শুনি।'

'আমি মীনার কথা জানি। মীনা আপনার খুব বন্ধু ছিল না?'

'কে বলেছে আপনাকে মীনার কথা?'

মুনির চুপ করে রইল।

'বলুন, কে মীনার কথা আপনাকে বলেছে?'

মুনির একবার ভাবল বলে ফেলে--বিনু, ও সব কথা আমি তোমার কাছ থেকেই শুনেছি। এক সময় তুমিই আমাকে বলেছ। বিয়ের পর রাত জেগে তুমি কত গল্প করতে! কিন্তু এই মেয়েটিকে এ-সব বলা অর্থহীন। সে কিছুই বুঝবে না।

'কি ব্যাপার, চুপ করে আছেন?'

মুনির নিচু স্বরে বলল, 'আচ্ছা, সত্যি করে বলুন তো আমাকে দেখে কি আপনার খুব চেনা-চেনা মনে হয় নি?'

'না। চেনা-চেনা মনে হবে কেন? চেনা মনে হবার কি কোনো কারণ আছে?'

'জ্বি-না। আচ্ছা, আমি উঠি।'

মুনির উঠে দাঁড়াল। বিনু বলল, 'আপনি আর এ-রকম একা-একা এ বাড়িতে আসবেন না।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'যদি কখনো আসতে চান, বাবাকে সঙ্গে নিয়ে আসবেন।'

'ভয় নেই, আমি আর আসব না।'

'আপনি আপনার এক বন্ধুকে পাঠিয়েছিলেন আমার কাছে। এ-সব করবেন না।

বাবা আপনাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। আপনার কাণ্ডকারখানা শুনলে বাবা মনে খুব কষ্ট পাবেন। আমি নিজে বাবাকে এ–সব কখনো বলব না। আপনিও বলবেন না।'

মুনির হেসে ফেলল। হঠাৎ তার হাসি এসে গেল, কারণ বিনুর ভঙ্গিটা তার খুব চেনা। রাগী–রাগী গলায় অনেকক্ষণ কথা বলবার পর, হঠাৎ তার রাগ পড়ে যায়। চোখে পানি এসে যায়। এখনো বিনুর চোখে পানি আসছে। আসতেই হবে।

'আপনি হাসছেন কেন?'

'হাসছি, কারণ কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাকে এত সব কঠিন কথা বলার জন্যে আপনার খুব কষ্ট হবে। আপনি কাঁদতে শুরু করবেন।'

'আপনি বেরিয়ে যান।'

মুনির বের হয়ে এল। বিনু সত্যি–সত্যি কাঁদতে বসল। তার খুব খারাপ লাগছে।

১৫

মিসির আলি একটা থিওরি দাঁড় করিয়েছেন। তিনি গত কয়েক দিন ধরেই চেষ্টা করছেন তাঁর সেই থিওরি গুছিয়ে ফেলতে। পারছেন না। লিখতে গিয়ে সব আরো কেমন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। মনে মনে যা ভাবছেন, তা লিখতে পারছেন না। সারা দুপুর বসে বসে তিনি তাঁর থিওরির পয়েন্টগুলো লিখলেন। সেগুলো কেটে ফেলে আবার লিখলেন। সন্ধ্যাবেলা সব কাগজপত্র ফেলে দিয়ে নতুন খাতা কিনে আনলেন। কলম কিনলেন। তিনি লক্ষ করেছেন, খাতা–কলম বদলে ফেললে মাঝে–মাঝে তরতর করে লেখা এগোয়। তাই হল। রাতের বেলা বেশ কয়েকটা পৃষ্ঠা লিখে ফেললেন। রচনার নাম দিলেন--

একজীবন : বহুজীবন

একটি মানুষের কয়েকটি জীবন থাকে? তাই তো মনে হয়। এক জন শিশু জন্মায়, বড় হয়, মৃত্যু হয়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনকাল একটি ধারায় প্রবাহিত হয়। সেই ধারায় সুখ–দুঃখ আনন্দ–বেদনার নানান ঘটনা।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, জীবনের ধারা একটি না হয়ে কি অনেকগুলো হতে পারে না? ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করি। মনে করি, মুনির নামের একটি ছেলে বড় হচ্ছে। শৈশবে তার পিতৃবিয়োগ হল। সেই মুহূর্ত থেকে যদি তার জীবন দুটি ভাগে ভাগ হয়, তাহলে কেমন হয়? একটি ভাগে ছেলেটির পিতৃবিয়োগ হল, অন্য ভাগে হল না--বাবা বেঁচেই রইলেন। দুটি জীবনই সমানে প্রবাহিত হতে লাগল। তবু এক জীবনের সঙ্গে অন্য জীবনের কোনো যোগ রইল না। কারণ এই দুটি জগতের মাত্রা ভিন্ন।

দুই ভিন্ন মাত্রায় দুটি জীবন প্রবাহিত হচ্ছে। এক জীবনে ছেলেটি সুখী—অন্য জীবনে নয়।

এখন এই দুটি জীবনের ব্যাপারটাকে আরো বিস্তৃত করা যাক। ধরা যাক, জীবন দুটি নয়। অসংখ্য, সীমাহীন। 'প্রকৃতি' একটি মানুষের জীবনে যতগুলো ভেরিয়েশন হওয়া সম্ভব, সবগুলোই পরীক্ষা করে দেখছে। সবই সে চালু করেছে।

অসীম ব্যাপারটা এমনই যে, এ–পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের জন্যেই অসীম সংখ্যক

জীবনধারা চালু করতে পারে। কারণ অসীম সংখ্যাটির এমনই মাহাত্ম্য যে, সে অসীমসংখ্যক অসীমকেও ধারণ করতে পারে। বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ডেভিড হিলবার্ট অসীমের চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর 'হিলবার্ট' হোটেলের সমস্যায়। এই হোটেলটির সবচে' বড়ো গুণ হচ্ছে, হোটেলের প্রতিটি কক্ষ অতিথি দিয়ে পূর্ণ হবার পরও যত খুশি অতিথিকে ঢোকান যায়। এর জন্যে পুরনো অতিথিদের কোনো অসুবিধে হয় না। কারো কক্ষে দু' জন অতিথি ঢোকানোর প্রয়োজন হয় না। এটা সম্ভব হয় অসীম সংখ্যাটির অদ্ভুত গুণাবলীর জন্যে। মানুষ তার প্রচুর জ্ঞান সত্ত্বেও অসীমকে ব্যাখ্যা করতে পারছে না। সবচে' সহজ ব্যাখ্যাটি হচ্ছে--অসীম হচ্ছে বিরাট বই, যার শুরুর পাতা এবং শেষের পাতা বলে কিছু নেই।

এখন কথা হচ্ছে, প্রকৃতি কেন একটি মানুষের জন্যে অসংখ্য জীবনের ব্যবস্থা করবে? প্রকৃতির স্বার্থ কী?

প্রকৃতির একটি স্বার্থের কথা আমরা কল্পনা করতে পারি, সেটি হচ্ছে--কৌতূহলের সঙ্গে সে একটি পরীক্ষা চালাচ্ছে। তার চোখের সামনে মানবজীবনের, সেই সঙ্গে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরও, অসংখ্য ভেরিয়েশন। প্রতিটিই চলছে স্বাধীনভাবে, একটির সঙ্গে অন্যটির কোনো যোগ নেই, কারণ প্রতিটিই প্রবাহিত হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায়।

'প্রকৃতি' না বলে 'ঈশ্বর' শব্দটি ব্যবহার করলে ব্যাপারটা আরো সহজ হয়। ঈশ্বর নামের কোনো মহাশক্তিধর, যিনি অসীমকে ধারণ করতে পারেন, কারণ তিনি নিজেই অসীম--সেই তিনিই অসীম নিয়ে খেলছেন।

কাজেই আমরা দেখছি মুনির নামের ছেলেটির অসংখ্য জীবন। এক জীবনে সে বিনুকে বিয়ে করে, অন্য জীবনে বিনুকে বিয়ে করতে পারে না। এক জীবনে তার এবং বিনুর একটি ছেলে হয়, ছেলেটি চার বছর বয়সে মারা যায়। অন্য জীবনে ছেলেটি বেঁচে থাকে। কত বিচিত্র রকমের পরিবর্তন! এবং প্রতিটি পরিবর্তনকেই প্রকৃতি গভীর আগ্রহে এবং গভীর মমতায় দেখছে।

প্রকৃতির নিয়ম কঠিন এবং ব্যতিক্রমহীন, তবু মাঝে-মাঝে হয়তো কিছু-একটা হয়। সামান্য এদিক-ওদিক হয়। জীবনের এক ধারায় মানুষ প্রকৃতিরই কোনো-এক বিচিত্র কারণে অন্য ধারায় এসে হকচকিয়ে যায়।

এ-রকম ঘটনা অতীতে ঘটেছে। এই মুহূর্তে আমি একটি উদাহরণ দিতে পারি। খুঁজলে নিশ্চয়ই আরো প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যাবে।

উদাহরণটি আমেরিকার আরিজোনা শহরের। আঠার শ' চব্বিশ সালের ঘটনা। ঘটনাটি স্থানীয় মেথডিস্ট চার্চের নথিতে অন্তর্ভুক্ত। বেশ কিছু অনুসন্ধানী দল ঘটনাটি বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা অতীতে করেছে। এই ঘটনা বিশ্বে সংঘটিত অদ্ভুত ঘটনাগুলোর একটি বলে এখনো মনে করা হয়।

ডেভিড ল্যাংম্যান আরিজোনা শহরের এক জন সাধারণ ছুতোর মিস্ত্রী। ছুতোরের কাজ করে জীবনধারণ করেন। সরল সাধাসিধে মানুষ। তবে অতিরিক্ত মদ্যপানের বদ অভ্যাস ছিল। মাঝে-মাঝে পুরো মাতাল হয়ে ঘরে ফিরতেন। স্ত্রী এবং পুত্র-কন্যাদের ওপর অত্যাচার করতেন। নেশা কেটে গেলেই আবার ভালোমানুষ।

ভদ্রলোক চল্লিশ বছর বয়সে মারা যান। যথারীতি তাঁকে কফিনে ঢুকিয়ে গোর

দেওয়া হয়। এর প্রায় চার বছর পরের ঘটনা। এক রাতে প্রবল তুষারপাত হচ্ছে। রাস্তায় হাঁটুউঁচু বরফ। দেখা গেল, এই বরফ ভেঙে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত ডেভিড ল্যাংম্যান আসছেন। প্রথমে সবাই ভাবল চোখের ভুল। পরে দেখা গেল--না, চোখের ভুল নয়, আসলেই ডেভিড ল্যাংম্যান। সেই মানুষ, সেই আচার-আচরণ। বাঁ হাতের একটি আঙুল নেই। কপালে গভীর ক্ষতচিহ্ন, তাঁর চোখের দৃষ্টিতে দিশেহারা ভাব। লোকজন তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কে?'

তিনি বললেন, 'আমি ডেভিড ল্যাংম্যান।'

'তুমি কোত্থেকে এসেছ?'

'আসব আবার কোথা থেকে। আমি তো এখানেই ছিলাম। আমি আমার বাড়ি খুঁজে পাচ্ছি না।'

'তোমার ছেলেমেয়েদের নাম কি?'

তিনি তাঁর নিজের ছেলেমেয়েদের নাম বললেন। কাউন্টির শেরিফ তাঁকে গ্রেফতার করে হাজতখানায় রেখে দিল। খবর পেয়ে ডেভিড ল্যাংম্যানের স্ত্রী এল দেখতে। বিস্ময়ে তার বাকরোধ হল। ডেভিড ল্যাংম্যন বললেন, 'আমার কী হয়েছে বল তো, সব কেমন অচেনা লাগছে। এরা আমাকে হাজতে আটকে রেখেছে।'

'তুমি মারা যাও নি?'

'আমি মারা যাব কেন! এ-সব কী বলছ?'

'তুমি তো মারা গেছ। চার্চ ইয়ার্ডে তোমাকে গোর দেয়া হয়েছে।'

ডেভিড ল্যাংম্যানের স্ত্রী চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। ডেভিড ল্যাংম্যানকে তাঁর স্ত্রী-পুত্ররা কেউ গ্রহণ করল না। শহরের সবাই তাঁকে বর্জন করল। তিনি একা একা থাকতেন। রাতে চার্চে ঘুমাতেন। শেষের দিকে তাঁর মাথারও গণ্ডগোল হল। সারাক্ষণ বিড়বিড় করে বলতেন, 'আমার কী হয়েছে? আমার কী হয়েছে?' তাঁর এই কষ্টের জীবন দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। দু' বছর পর তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর ডেভিড ল্যাংম্যান নামেই তাঁর কবর হয়।

ঘটনাটি অবিশ্বাস্য। কোনো রকম ব্যাখ্যা এর জন্যে দেয়া যায় না। এ-জাতীয় অবিশ্বাস্য ঘটনার নজির প্রাচীন উপকথায় প্রচুর আছে। উত্তর ভারতের উপকথায় মহারাজ উরনির কথা আছে, যাঁকে বলা হয়েছে 'দানসাগর'। মহারাজ উরনি শিকার করতে গিয়ে, গণ্ডারের শিংয়ের আঘাতে নিহত হন। রাজকীয় মর্যাদায় তাঁর দাহ সম্পন্ন করার পরপরই তিনি আবার বন থেকে ফিরে আসেন এবং রাজ্য পরিচালনা করতে থাকেন। তবে তাঁর চরিত্রের বিরাট পরিবর্তন হয়। তিনি ধর্মকর্ম দানধ্যানে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। রাজভাণ্ডার দেখতে-দেখতে শূন্য হয়ে যায়।

এইজাতীয় রহস্যকে পাশ কাটিয়ে যাবার প্রবণতা আমাদের মধ্যে আছে। আমরা ভান করি যে, এ-সব কখনো ঘটে নি। তা না-করে এই ধরনের ঘটনাগুলো নিয়ে ব্যাপক বিচার-বিশ্লেষণ হওয়া প্রয়োজন। যাতে প্রকৃতির বিপুল রহস্যের কিছু জট আমরা খোলার চেষ্টা করতে পারি।

মিসির আলি তাঁর এই লেখাটি পড়তে দিলেন তাঁর বন্ধু দেওয়ান সাহেবকে। দেওয়ান সাহেব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক। পুরোপরি অ্যাকাডেমিক মানুষ।

পদার্থবিদ্যার সূত্রের মধ্যে যা পড়ে না, তা তিনি চোখ বন্ধ করে ঝুড়িতে ফেলে দেন।

দেওয়ান সাহেব মিসির আলির লেখা পড়ে গম্ভীর মুখে বললেন, 'তুমি বদ্ধ উন্মাদ।'

'তোমার তাই ধারণা?'

'ধারণা অন্য রকম ছিল। লেখা পড়ে ধারণা পাল্টেছে। তুমি এক কাজ কর। ভালো এক জন ডাক্তারকে বল তোমার চিকিৎসা করতে।'

'আমার এই লেখাটাকে তোমার পাগলের প্রলাপ বলে মনে হচ্ছে?'

'হুঁ। পদার্থবিদ্যার একটি সূত্র হচ্ছে, একই সময়ে একই স্থানে দুটি বস্তু থাকবে না। কারণ বস্তু স্থান দখল করে। আর তুমি অসীম বস্তু নিয়ে এসেছ, সবাইকে ঠেসে ধরছ এক জায়গায়।'

'মাত্রা কিন্তু ভিন্ন। এক-এক জীবন এক-এক ডাইমেনশনে প্রবাহিত।'

'মূর্খরা যখন পদার্থবিদ্যা কিছু না-জেনে কথা বলে, তখন এ-রকম কথা বলে। ডাইমেনশনের তুমি জান কী?'

'খুবই কম জানি। এইটুকু জানি যে, বস্তুর তিনটি মাত্রা : দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা। সময়কে একটি মাত্রা ধরা হলে, হয় চারটি। এ ছাড়াও মাত্রা তিনের বেশি হয়। যেমন একটি বস্তুর কথা ধরা যাক, যার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা সমান--একটি পারফেক্ট কিউব। এর মাত্রা হচ্ছে তিন। তবে চতুর্মাত্রিক কিউবও আছে, যার নাম খুব সম্ভব টেসারেক্ট। চতুর্মাত্রিক কিউব আমরা আঁকতে পারি না, তবে তার প্রজেকশন বা ছায়ার মডেল তৈরি করা হয়েছে।'

'মন্দ না। কিছু-কিছু তো জান বলেই মনে হচ্ছে।'

মিসির আলি বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তোমরা বিজ্ঞানীরা একটা সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্সে সব সময় ভোগ। সব সময় মনে কর--তোমরা ছাড়া অন্য কেউ বিজ্ঞান নিয়ে কথা বলতে পারবে না।'

'রেগে যাচ্ছ কেন?'

'রাগছি না, বিরক্ত হচ্ছি। তোমাদের বিজ্ঞানে অসংখ্য গোঁজামিল। তোমরা তা ভালো করেই জান, অথচ ভান কর যে, এটা একটা নিখুঁত জিনিস।'

'গোঁজামিল তুমি কোথায় দেখলে?'

'থার্ড ডিনামিক্সের প্রথম সূত্রে তোমরা বল--শক্তি শূন্য থেকে সৃষ্টি করা যায় না, ধ্বংসও করা যায় না। আবার এই তোমরাই বল যে, সৃষ্টির আদিতে শূন্য থেকে শক্তির সৃষ্টি।'

'সৃষ্টির আদি অবস্থা ছিল ভিন্ন।'

'প্রাকৃতিক সূত্রগুলো তাহলে কি একেক অবস্থায় একেক রকম হবে? তোমরাই তো তা অস্বীকার কর। তোমরাই তো বল, প্রাকৃতিক সূত্রের কোনো পরিবর্তন হয় নি, হবে না।'

দেওয়ান সাহেব গলার স্বর নরম করে বললেন, 'চা খাও।'

'তা খাব। তুমি আমার কথার জবাব দাও।'

'আছে। কিছু সমস্যা তো আছেই। প্রকৃতির ব্যাপারটায় রহস্য এত বেশি যে, কোনো থই পাওয়া যায় না। এবং সবচে' বড় মুশকিল কি জান? আমরা নিজেরাও এই

প্রকৃতির অংশ। প্রকৃতির অংশ হয়ে সেই প্রকৃতিকে পুরোপুরি জানা সম্ভব নয়। তার জন্য প্রকৃতির বাইরে যেতে হবে। তা যেহেতু পারছি না, প্রকৃতির অনেক রহস্যই বুঝতে পারছি না।'

মিসির আলি বললেন, 'প্লেটোর সেই বিখ্যাত গুহার উপমাটা কি তুমি জান?'

'প্লেটো পড়ার সময় কোথায়? ফিজিক্স নিয়েই কূল পাচ্ছি না।'

'মনে কর--একটা গুহায় কিছু লোককে সারা জীবন বন্দি করে রাখা হয়েছে। লোকগুলো গুহামুখের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসা বলে, গুহার বাইরে কী হচ্ছে জানে না। তাদের যে-ছায়া পড়ছে গুহার দেয়ালে, তা-ই শুধু তারা দেখছে। তার বাইরে এদের কোনো জগৎ নেই। ছায়াজগৎই তাদের কাছে একমাত্র সত্য। সত্যিকার জগৎ কী, এরা জানে না। আমাদের বেলাতেও তা-ই হতে পারে। আমরা যে-জগৎ দেখছি, এটা সম্ভবত ছায়াজগৎ। সত্যিকার জগৎ আছে আমাদের চোখের আড়ালে।'

'এ তো ফিলসফি—মায়াবাদ।'

'ফিলসফিতে অসুবিধা কোথায়?'

দেওয়ান সাহেব বললেন, 'তুমি আমাকে কনফিউজ করে দিচ্ছ। দেখি, একটা সিগারেট দাও।'

দেওয়ান সাহেব সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগলেন। তাঁকে চিন্তিত মনে হল। মিসির আলি হাসিমুখে বললেন, 'তোমাকে আরো কনফিউজ করে দিচ্ছি। তোমাদের দলের এক জন লোক বিখ্যাত পদার্থবিদ শ্রোডিনজার নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবি করেছিলেন। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের প্রবক্তাদের এক জন।

'ইরউইন শ্রোডিনজার?'

'হ্যাঁ। তিনি বলেছিলেন--

My body functions as a pure mechanism according to laws of nature and I know by direct experience that I am directing the motions. It follows that I am the one who directs the atoms of the world in motions. Hence I am God Almighty.

'এটা কি তোমার মুখস্থ ছিল?'

'না, ছিল না। তোমার কাছে আসার আগে মুখস্থ করেছি।'

'মনে হচ্ছে তৈরি হয়ে এসেছ।'

'হ্যাঁ।'

'খুব ভালো। এখন বল আর কি বলবে?'

'তোমাকে একটা ছবি দেখাব। একটা বিয়ের ছবি। খুব মন দিয়ে ছবিটা দেখবে। এবং ছবিটার মধ্যে কোনো বিশেষত্ব আছে কি না আমাকে বলবে।'

'দাও তোমার ছবি।'

মিসির আলি মুনির এবং বিনুর বিয়ের ছবিটি দিলেন। দেওয়ান সাহেব দীর্ঘ সময় ছবিটির দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'তেমন কিছু তো দেখছি না।'

'মেয়েটা শাড়ি কিভাবে পরেছে সেটা দেখেছ?'

'অন্য সবাই যেভাবে পরে, সেভাবেই পরেছে।'

'না, তা না। মেয়েরা শাড়ির আঁচল রাখে বাঁ কাঁধে। এই ছবিতে প্রতিটি মেয়ে শাড়ির আঁচল রেখেছে ডান কাঁধে। বয়স্ক মহিলারাও তাই করেছেন।'

'তাতে হয়েছেটা কী?'

'ছবিটা কোনো এক বিশেষ কারণে উল্টো হয়ে গেছে। তোমার কি তা মনে হয় না?'

'হ্যাঁ, তা তো হয়েছেই। এটা অবশ্যই স্বাভাবিক ছবি নয়।'

মিসির আলি বললেন, 'নেচার পত্রিকায় একবার পড়েছিলাম, একটা ডান হাতের গ্লাভস যদি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বাইরে দিয়ে ঘুরিয়ে আনা হয়, তবে সেই গ্লাভসটি হয়ে যাবে বাঁ হাতের গ্লাভস। আমি কি ঠিক বললাম?'

'পুরোপুরি ঠিক না-হলেও ঠিক। ডান হাতের গ্লাভস বাঁ হাতের গ্লাভস হবে। রাইট হ্যাণ্ডেড অবজেক্ট হবে লেফট হ্যাণ্ডেড অবজেক্ট।

'এই ছবির মধ্যেও কি তাই হয় নি?'

দেওয়ান সাহেব আবার ছবিটি হাতে নিলেন। মিসির আলি বললেন, 'ছবিটি এসেছে অন্য মাত্রার এক জীবন থেকে। এই জন্যে ছবির এই পরিবর্তন।'

'তুমি খুব ছোট্ট জিনিস থেকে বড় সিদ্ধান্ত নিতে চাইছ। এটা ঠিক নয়।'

'ঠিক নয়?'

'না। ছবিটির আরো সহজ ব্যাখ্যা আছে। কোনো বিশেষ কারণে মহিলারা সেদিন ডান কাঁধে শাড়ির আঁচল দিয়েছিলেন। বাঁ কাঁধেই শাড়ির আঁচল রাখতে হবে, এ-রকম কোনো আইন তো জাতীয় পরিষদে পাস হয় নি।'

'তা হয় নি।'

'অন্য একটা ব্যাখ্যাও দেয়া যায়। এটা সম্ভবত খুব সহজ কোনো ক্যামেরা-ট্রিক।'

'ট্রিকটা তারা করবে কেন?'

'তোমার মতো পাগলদের উসকে দেবার জন্যে। দেখি, আরেকটা সিগারেট দাও, তোমার সঙ্গে বেশিক্ষণ থাকলে আমিও পাগল হয়ে যাব। বিদেয় হও।'

'হচ্ছি।'

'শোন মিসির।'

'বল।'

'কাল-পরশু একবার এসো, তোমার থিওরিটা নিয়ে আলাপ করব।'

'আলাপ করবার মতো কিছু কি আছে?'

'না।'

'তা হলে আসতে বলছ কেন?'

'তোমার পাগলামি কথাবার্তা শুনতে ভালোই লাগে।'

মিসির আলি বললেন, 'তুমি আমার এই প্রশ্নটির জবাব দাও। যদি তিনটি লোক একটি ছাগলকে দেখতে পায়, তাহলে কি তুমি স্বীকার করবে ছাগলটির একটি অস্তিত্ব আছে? সে রিয়েল?'

'হ্যাঁ, স্বীকার করব।'

'তিনটি মানুষ যদি একটি স্বপ্ন দেখে বা তিনটি মানুষ যদি একই চিন্তা করে, তাহলে সেই স্বপ্ন বা সেই চিন্তাকেও কি তুমি সত্য বলে স্বীকার করবে?'

'না। চিন্তা কোনো বাস্তব বিষয় নয়। এটা হচ্ছে মাথার মধ্যে কিছু বায়োকেমিক্যাল

রিঅ্যাকশন। তুমি কাল এসো। কাল তোমার সঙ্গে আলাপ করব।'

'সপ্তাহখানিক পরে আসব। এই এক সপ্তাহ আমি পড়াশোনা করব। কোথাও বেরুব না। প্রচুর বইপত্র জোগাড় করেছি। কূর্ট গডেল-এর সেই থিওরি বোঝবার চেষ্টা করব।'

'ভালো কথা, পড়। তবে খেয়াল রাখবে, অল্পবিদ্যার অনেক সমস্যা। নাপিত ফোঁড়া কাটতে পারে, সার্জেন চাকু হাতে নিতেও ভয় পায়।'

'চাকু হাতে নিতে হলে—তোমার কাছে আসব।'

'আরেকটা কথা—তোমার বিষয় সাইকোলজি, নিজেকে সেখানে আটকে রাখলে ভালো হয়। পদার্থবিদ্যা নিয়ে চিন্তাভাবনাটা পদার্থবিদদের ওপর ছেড়ে দাও।'

মিসির আলি কঠিন একটা উত্তর দিতে গিয়েও দিলেন না। অ্যাকাডেমিক মানুষরা একচক্ষু হরিণের মতো হন। নিজের বিষয় ছাড়া অন্য কিছু বুঝতে পারেন না।

১৬

মুনির গত তিন দিন ধরে অফিসে আসছে না। আজ এক তারিখ। বেতনের ডেট। যারা অসুস্থ, তারাও এই দিনে উপস্থিত থাকে—বেতন নিয়ে চলে যায়। মুনির আজও এল না।

নিজাম সাহেব সত্যি-সত্যি চিন্তিত বোধ করলেন। আজ অফিসে আসবার পথে বিনু বলেছে, 'বাবা, ওঁকে নিয়ে আসবে? মুনির সাহেবকে।'

তিনি হ্যাঁ-সূচক মাথা নেড়েছেন। বাসায় মুনিরকে আনার তাঁর কোনো ইচ্ছে নেই, কিন্তু খোঁজ নিশ্চয়ই নেয়া যেতে পারে এবং নেয়া উচিতও। ছেলেটিকে তিনি সত্যি-সত্যি পছন্দ করেন।

অফিস থেকে ঠিকানা নিয়ে, তিনি সন্ধ্যার আগে আগে মুনিরের ঘরের দরজায় উঁকি দিলেন।

তাঁর বিস্ময়ের সীমা রইল না। একটা মরা মানুষ যেন বিছানায় পড়ে আছে। বড়-বড় করে শ্বাস নিচ্ছে।

'তোমার কী হয়েছে?'

'শরীরটা খুব খারাপ। রাতে-দিনে কখনো ঘুমাতে পারি না। ক্রমাগত নানান জায়গায় যাই।'

'তোমার কথা বুঝলাম না। নানান জায়গায় যাও মানে? কোথায় যাও?'

'না, যাই না কোথাও। শুয়ে থাকি।'

নিজাম সাহেব গায়ে হাত দিয়ে চমকে উঠলেন। অনেক জ্বর।

'ডাক্তার দেখিয়েছ?'

'জ্বি না। ডাক্তার কিছু করতে পারবে না।'

'কী করে বুঝলে ডাক্তার কিছু করতে পারবে না?'

'আমি জানি।'

'পাগলের মতো কথা বলবে না। তুমি সবজান্তা নাকি?'

'জ্বি, আমি সব কিছুই জানি।'

নিজাম সাহেব অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। কী অদ্ভুত কথাবার্তা! সত্যি সত্যি কি পাগল হয়ে যাচ্ছে নাকি? বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। গায়ে আধময়লা একটা কাঁথা। ঘরে আলো নেই। অল্প যা আলো আসছে, তাতে মুনিরের মুখ অস্বাভাবিক ফ্যাকাসে লাগছে। কিন্তু চোখ দুটি উজ্জ্বল চকচক করছে।

'বিনু কেমন আছে?'

'ভালো আছে।'

'ওকে খুব দেখতে ইচ্ছে করে।'

নিজাম সাহেব হতভম্ব হয়ে গেলেন। এই ছেলে এসব কী বলছে! বিনুকে তার দেখতে ইচ্ছে করবে কেন?

'ও আমার সঙ্গে শুধু কষ্টই করেছে। বেশির ভাগ সময়ই ওকে আমি কষ্ট দিয়েছি। এতে আমার মন-খারাপ লাগে। আমি শুধু কাঁদি। ওকে আপনি বলবেন।'

'তুমি এসব কী বলছ?'

'জ্বি?'

'এসব কী কথাবার্তা তুমি বলছ?'

'আমার ভুল হয়েছে। আর বলব না।'

'তুমি এক দিন মাত্র গিয়েছ আমার বাসায়। বিনুর সঙ্গে তোমার কোনো পরিচয় থাকার কথা নয়।'

'জ্বি—না। আমার সব কেমন গণ্ডগোল হয়ে গেছে। জট পাকিয়ে গেছে। আপনি কিছু মনে করবেন না।'

'না না, ঠিক আছে। ডাক্তার দেখানো দরকার। অবহেলা করা ঠিক হবে না। চল আমার সঙ্গে।'

'কোথায়?'

'তোমাকে আমি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব।'

'জ্বি আচ্ছা। বিনুকে আপনি কি দয়া করে একটা কথা বলতে পারবেন?'

'কী কথা?'

'বলবেন যে, তার ধারণা ঠিক নয়। আমি তার ওপর কোনো অবিচার করি নি।'

'আমি বলব। তুমি ঘুমাবার চেষ্টা কর।'

'জ্বি আচ্ছা।'

মুনির সঙ্গে-সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল। গভীর গাঢ় ঘুম। নিজাম সাহেব দীর্ঘ সময় তার পাশে রইলেন। বাড়িওয়ালার সঙ্গে কথা বলে এলেন। তারা এক জন ডাক্তার দেখিয়েছে। ডাক্তার বলেছে--প্রেসার বেশ হাই। কমপ্লিট রেস্ট নিতে হবে। নিজাম সাহেব এক জন ডাক্তার নিয়ে এলেন। সেই ডাক্তার অনেক ডাকাডাকি করেও মুনিরের ঘুম ভাঙাতে পারলেন না। অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করলে জ্বি বলে সাড়া দেয়, তারপর আর কোনো উত্তর করে না। ডাক্তার সাহেব বললেন, 'ইনি কি আপনার আত্মীয়?'

'জ্বি না। তবে আত্মীয়ের মতোই। ছেলেটিকে খুব স্নেহ করি। আমার অফিসেই কাজ করে।'

'ড্রাগস খায় কি না জানেন?'

'আপনার কথা বুঝতে পারলাম না।

'চোখের মণি খুব ছোট। আলো ফেললেও তেমন রেসপন্স করছে না। ড্রাগ এডিক্টদের এরকম হয়। ড্রাগস নেয় কি না আপনি জানেন না?'

'জ্বি–না।'

'মনে হচ্ছে নেয়। ড্রাগসটা অসম্ভব বেড়ে গেছে। এটা খুব অল্প দিনেই বিরাট সামাজিক সমস্যা হিসেবে আসবে। আপনি বরং একে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিন। দেরি করবেন না। হাসপাতালে চেনা–জানা কেউ আছে?'

'জ্বি–না।'

'হাসপাতালে ভর্তি করাটাও তো তাহলে এক সমস্যা হবে।'

নিজাম সাহেব অসাধ্য সাধন করলেন। রাত ন'টার মধ্যে মুনিরকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে ফেললেন। এক জন অল্পবয়স্ক ডাক্তারের হাত ধরে সত্যি–সত্যি কেঁদে ফেললেন।

'একটু দেখবেন ভাই। ছেলেটার কেউ নেই।'

'দেখব, নিশ্চয়ই দেখব।'

'খুবই দরিদ্র ছেলে।'

'ধনীর যে–চিকিৎসা হবে, দরিদ্রেরও সেই একই চিকিৎসা হবে।'

'ভাই, তা তো হয় না।'

'হয়। আপনারা জানেন না। আমরা ইন্টার্নি ডাক্তার। হাসপাতাল আমরাই চালাই। ধনী–দরিদ্র নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না। যখন বয়স্ক হব, প্রফেসর–ট্রফেসর হব, তখন হয়তো ঘামাব। এখনো আদর্শ বলে একটা ব্যাপার সামনে আছে।'

নিজাম সাহেব ডাক্তার ছেলেটিকে জড়িয়ে ধরলেন।

বাড়ি ফিরতে–ফিরতে তাঁর এগারটা বেজে গেল। উদ্বিগ্ন মুখে বিনু বারান্দায় দাঁড়িয়ে। তার বাবা কখনো এত দেরি করেন না। আজ কেন করছেন? অ্যাকসিডেন্ট হয় নি তো? বারবার বিনুর চোখে পানি এসে যাচ্ছে। বাবাকে দেখে সে সত্যি–সত্যি কেঁদে ফেলল, 'কোথায় ছিলে তুমি?'

'মুনিরের খোঁজে গিয়েছিলাম।'

'আমি এদিকে ভয়ে অস্থির। ওঁকে পেয়েছিলে?'

নিজাম সাহেব ইতস্তত করে বললেন, 'না।'

বিনু দীর্ঘ সময় বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে শান্ত গলায় বলল, 'মিথ্যা কথা বলছ কেন বাবা?'

নিজাম সাহেব মেয়ের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেন না। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

'বাবা, উনি কি অসুস্থ?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় আছেন?'

'হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিয়ে এসেছি।'

'কী অসুখ?'

'বুঝতে পারছি না। কী সব আবোল–তাবোল কথা বলছে।'

'আমার এখানে যখন এসেছিলেন, তখনো আবোল-তাবোল কথা বলেছিলেন। আমি খুব রাগ করেছিলাম।'

নিজাম সাহেব অবাক হয়ে বললেন, 'এখানে এসেছিল নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'কই, তুই তো আমাকে বলিস নি?'

'উনি যে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে পড়ে আছেন, এটাও তো তুমি আমাকে বল নি।' নিজাম সাহেব অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। কী বলবেন, বুঝতে পারলেন না।

'বাবা।'

'কি?'

'তুমি আমাকে একবার ওঁর কাছে নিয়ে যাবে?'

নিজাম সাহেব চুপ করে রইলেন। বিনু বলল, 'আমি তাঁকে খুব কড়া-কড়া কথা বলেছি। আমার খারাপ লাগছে। হাত মুখ ধুয়ে এস, ভাত দিচ্ছি।'

নিজাম সাহেব ক্ষুধার্ত ছিলেন। কিন্তু কোনো খাবারই মুখে রুচল না। বারবার মনে হতে লাগল, বিনুর বিয়ে নিয়ে কোনো ঝামেলা হবে না তো? সে শেষ মুহূর্তে বেঁকে বসবে না তো? গায়ে-হলুদের আর মাত্র পাঁচ দিন আছে। আত্মীয়স্বজনরা আসতে শুরু করবে। একটা কেলেঙ্কারি হবে না তো?

সারা রাত বিনু এক ফোঁটা ঘুমুতে পারল না। বারান্দায় মোড়া পেতে বসে রইল। তার কাছে সব কিছুই কেমন অর্থহীন মনে হচ্ছে। একটা জটিল রহস্যের আবর্তে সে পড়ে গেছে, এ থেকে বেরিয়ে আসার কোনো পথ নেই। বারান্দা অন্ধকার। অনেক দূরে একটা স্ট্রীটল্যাম্প জ্বলছে। তার আলো যেন চারপাশের অন্ধকারকে বাড়িয়ে দিচ্ছে।

১৭

মিসির আলির কাছে একটি চিঠি এসেছে।

এই কারণে তিনি অসম্ভব বিরক্ত। চিঠি না-খুলেই তিনি একপাশে ফেলে রেখেছেন। এখন বিরক্তি কমানোর চেষ্টায় সুন্দর কিছু কল্পনা করার চেষ্টা করছেন। সুন্দর কোনো কল্পনাও মাথায় আসছে না।

তাঁর বিরক্তির মূল কারণ হচ্ছে, জটিল একটি বিষয় নিয়ে তিনি ভাবছিলেন। পিয়ন ঠিক এই সময় চিঠি নিয়ে এল। এবং এমনভাবে কড়া নাড়তে লাগল, যেন ভূমিকম্প হচ্ছে--এক্ষুণি সবাইকে ঘর থেকে বের করতে হবে। তিনি দরজা খুলে বললেন, 'কি ব্যাপার?'

'স্যার, একটি চিঠি।'

'রেজিস্ট্রি চিঠি?'

'জ্বি-না।'

'তাহলে এত হৈচৈ করছেন কেন? দরজার ফাঁক দিয়ে ঢুকিয়ে দিলেই ঝামেলা চুকে যায়।

মিসির আলি আবার তাঁর চিন্তায় ফিরে যেতে চেষ্টা করলেন। তিনি ভাবছিলেন,

মানু ু সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক নিয়ে। ঈশ্বরের কল্পনাই তাঁর কাছে আপত্তিজনক মনে হয়, তবু তিনি ধরে নিলেন : এক জন ঈশ্বর আছেন--যিনি অসীমকে নিজের মধ্যে ধারণ করতে পারেন।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, মানুষের মতো একটি ক্ষুদ্র প্রাণীও অসীমকে ধারণ করতে পারে। সে তা ধারণ করে মস্তিষ্কে। তার কল্পনা অসীম, তার চিন্তা অসীম।

ধর্মগ্রন্থগুলোও বারবার মানুষকে ঈশ্বর বলেছে। ওল্ড টেস্টামেন্টে বলা হয়েছে--

Then Moses said to God, If I come to the people of Israel and say to them : The God has sent me to you and they ask me, what is his name? What shall I say to them? God said to Moses: I AM WHO I AM. And he said say : this to the people of Israel: I AM has sent me to you.

এই অংশটির মানে কি? মানে হচ্ছে ঈশ্বরের নাম হচ্ছে--আমি। ইসলাম ধর্মেও একই ব্যাপার। আল্লাহ্ বলেন--মানুষের মধ্যে তিনি নিজেকে ফুৎকার করেছেন। এক পয়গাম্বরের কাহিনী আছে, যিনি ঘোষণা করলেন, 'আনাল হক'--আমিই আল্লাহ্। হিন্দু ধর্মে মানুষকে বলা হয়েছে--নর-নারায়ণ।

মানুষ যদি ঈশ্বর হয়, তাহলে সর্বজগতের ওপর তার আধিপত্য থাকবে। মুনিরের কথাই ধরা যাক। তার কথামতো যদি অসংখ্য জীবন মানুষের থাকে এবং সে যদি ঈশ্বর হয়, তাহলে প্রতিটি জীবন সম্পর্কেই সে জানবে।

কিন্তু তা সে জানে না। কেন জানে না? মানুষের যে অংশ অসীমকে ধারণ করে অর্থাৎ মস্তিষ্কের সেই অংশ পুরোপুরি কাজ করে না বলেই সে জানে না। মানুষ যে তার মস্তিষ্কের অংশমাত্র ব্যবহার করে, এটা তো আজ বিজ্ঞানীদের কাছে স্বীকৃত সত্য। মস্তিষ্কের একটি বিশাল অংশের কর্মক্ষমতা সম্পর্কে মানুষের কোনো ধারণা নেই। কারণ সেই অংশটি সুপ্ত।

কারো-কারো ক্ষেত্রে সুপ্ত অংশ কিছুটা জেগে ওঠে। তার চারপাশের অসীম জগৎ সম্পর্কে সে কিছুটা ধারণা পেতে থাকে। যেমন মুনির পাচ্ছে।

থিওরি হিসেবে এটা কেমন? মোটেই সুবিধের নয়। মিসির আলি ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন। একটি থিওরি দাঁড় করাতে ধর্মগ্রন্থের সাহায্য নেয়াটাই তাঁর অপছন্দ। যে কোনো থিওরি বা হাইপোথিসিস দাঁড়ায় লজিকের ওপর--অন্য কোনো কিছুর ওপরে নয়। ধর্মগ্রন্থের ওপরে তো নয়ই।

মিসির আলির বিরক্তি আরো বাড়ল। মুনিরের সমস্যাটিকে আর কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, তিনি ভেবে পাচ্ছেন না। নিজের ওপরই কেমন যেন রাগ হচ্ছে।

তিনি অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে খাম খুলে চিঠি বের করলেন। সেখানে লেখা--

স্যার,

আমি খুব অসুস্থ। আমাকে কি আপনি দেখতে আসবেন?

আপনাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। আমি পিজিতে। ওয়ার্ড নম্বর তিন শ' ছয়।

টুনু

এই টুনু যে মুনির, এটা ধরতেও তাঁর অনেক সময় লাগল। অনেক দিন থেকেই

তিনি মুনিরের খবর রাখেন না। নিজের পড়াশোনা এবং চিন্তা নিয়েই ব্যস্ত। মুনিরও যে তাঁর কাছে আসছে না, এটা তিনি লক্ষ করেন নি। কোনো-একটা কাজ নিয়ে ডুবে থাকলে তাঁর এ-রকম হয়।

নিজের ওপর তাঁর বিরক্তি লাগছে। দরজায় কার যেন ছায়া পড়েছে। তিনি দরজার দিকে না তাকিয়েই বললেন, 'এস নীলু।'

নীলু হালকা গলায় বলল, 'আমি আসায় কি আপনি বিরক্ত হয়েছেন?'

'হ্যাঁ, হয়েছি। এখন এক জায়গায় যাচ্ছি। তুমি আসায় আটকা পড়লাম।'

'আমি আপনাকে আটকাবার জন্যে আসি নি। যেখানে যাচ্ছেন যান।'

'তুমি তাহলে অপেক্ষা কর--আমি চট করে কাপড় বদলে আসি। তোমার হাতে কি?'

'চা-পাতা। খুব ভালো চা। সিলেটে আমার এক মামা আছেন। চা বাগানে কাজ করেন। তিনি পাঠিয়েছেন।'

'থ্যাঙ্কস্‌।'

'আপনি কাপড় বদলাতে-বদলাতে কি আমি চট করে আপনার জন্যে এক কাপ চা বানাব?'

'না, দেরি হয়ে যাবে।'

মিসির আলি তৈরি হয়ে বেরুতে যাবার সময় নীলু বলল, 'আমি এখানে থাকব, আপনি ঘুরে আসুন।'

'তুমি এখানে থাকবে মানে?'

'আমি আপনার জন্যে অপেক্ষা করব।'

'আমি কখন ফিরব, তার কি কোনো ঠিক আছে?'

'যত দেরিই হোক অপেক্ষা করব।'

'একা-একা?'

'হ্যাঁ, একা-একা। আপনি একা-একা থাকতে পারলে আমি পারব না কেন?'

মিসির আলি কথা বাড়ালেন না, হাসপাতালের দিকে রওনা হলেন।

মুনিরকে দেখে তিনি হকচকিয়ে গেলেন। এ কী অবস্থা! এত দ্রুত এক জন মানুষের শরীর এত খারাপ হয় কীভাবে? জীবিত কোনো মানুষ বলে মনে হচ্ছে না।

মুনিরের বেডের পাশে এক জন ডাক্তার দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি ইশারায় মিসির আলিকে কথা বলতে নিষেধ করলেন, বারান্দায় যেতে বললেন।

মিসির আলি বললেন, 'এই অবস্থা হল কীভাবে? 'ডাক্তার সাহেব বললেন, 'বুঝতে পারছি না।'

'হয়েছেটা কী?'

'তাও তো জানা যাচ্ছে না। ড্রাগ এডিক্ট বলে গোড়ায় সন্দেহ হচ্ছিল, এখন তা মনে হচ্ছে না। ব্রেইনে কিছু বাড়তি ব্যাপার আছে। টিউমারজাতীয় কিছু হতে পারে।'

'বলেন কী!'

'নিউরোলজিস্ট সোবাহান সাহেব ভালো বলতে পারবেন। উনিই দেখছেন। আপনি বরং ওঁর সঙ্গে কথা বলুন।'

'উনি কি আছেন?'

'হ্যাঁ, আছেন।'

সোবাহান সাহেব বললেন, 'ওপেন না করে নিশ্চিত হয়ে কিছু বলা যাচ্ছে না, তবে টিউমারের ব্যাপারটা হতে পারে। স্নায়ুর সঙ্গে মস্তিষ্কের সংযোগের জায়গায় টিউমার ডেভেলপ করছে বলে মনে হচ্ছে। সিমটম মিলে যাচ্ছে।'

'যদি টিউমার হয়, তাহলে কী হবে?'

'খুবই ফেটাল হবে। অবস্থা দ্রুত খারাপ হবে। হচ্ছেও তাই। পেশেন্টের হেলুসিনেশন হচ্ছে। বলল আমাকে--বাবা-মা এদের নাকি দেখতে পাচ্ছে। আপনি এই পেশেন্টের আত্মীয়স্বজনকে খবর দিন। আমার মনে হয় না, আমাদের খুব একটা কিছু করার আছে। একটা যা পারি সিডেটিভ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা। তার প্রয়োজন হচ্ছে না। রোগী ঘুমিয়েই কাটাচ্ছে। দিন-রাত ঘুমুচ্ছে। এটাও এক দিক দিয়ে ভালো।'

মিসির আলি রোগীর কাছে ফিরে এলেন। মুনিরের ঘুম ভাঙার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। মুনিরের ঘুম খুব প্রশান্ত নয় বলে তাঁর ধারণা হল। ঘুমের মধ্যে নড়াচড়া করছে। দ্রুত চোখের পাতা পড়ছে। REM(Rapid cyc movcmcnt)—তার মানে স্বপ্ন দেখছে। ঘুরে বেড়াচ্ছে তার জগতে। কার সঙ্গে তার দেখা হচ্ছে, সে কী বলছে কে জানে?

'মুনির, তুমি কি আমাকে চিনতে পারছ?'

'পারছি।'

'আমি কে বল তো?'

'আপনি মিসির আলি।'

'এই তো পারছ--গুড বয়। তোমার যে এই অবস্থা, তা তো জানতাম না। আমি অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলাম।'

মুনির উঠে বসতে চেষ্টা করল। মিসির আলি তাকে আবার শুইয়ে দিলেন।

'কী হয়েছে তোমার?'

মুনির ক্লান্ত ভঙ্গিতে হাসল। জেনারেল ওয়ার্ডে অসংখ্য রোগী। এর মধ্যে এক জন মারা গেছে, তাকে ঘিরে ছোটখাট একটা ভিড়। ফিনাইলের গন্ধ ছাড়িয়ে বিকট এক ধরনের গন্ধ আসছে, যে-গন্ধে সঙ্গে সঙ্গে মাথা ধরে যায়। মিসির আলি বললেন, 'এখানে বেশি দিন থাকলে তো সুস্থ মানুষও অসুস্থ হয়ে যাবে।'

মুনির চাপা গলায় বলল, 'বেশিক্ষণ তো এখানে থাকি না। অন্য জীবনগুলোতে ঘুরে বেড়াই। এখন আর আমার আসতে ইচ্ছে করে না। খুব কম আসি। এই যে এসেছি, আমার ভালো লাগছে না। চলে যেতে ইচ্ছে করছে। এখানে যতক্ষণ থাকি প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণা হয়।'

'এখন হচ্ছে?'

'হ্যাঁ, হচ্ছে।'

'খুব বেশি?'

'হ্যাঁ, খুব বেশি। আমার কী হচ্ছে বলুন তো? অন্য যে-সব জীবনের কথা বলি, সে-সব কি সত্যি, না সবই স্বপ্ন?'

'বুঝতে পারছি না।'

'অন্য যে-জগতে আমি যাই, সেখানেও আপনার মতো এক জন আছেন। তাঁকেও আমি আমার সমস্যার কথা বলেছি।'

'তিনি কী বললেন?'

'তিনি আপনার সঙ্গে যোগাযোগের একটা পথ খুঁজছেন।'

'পেয়েছেন কোনো পথ?'

'হ্যাঁ। তিনি বলেছেন, পত্রিকায় তিনি বিজ্ঞাপন দেবেন। জগৎগুলো মোটামুটি একই রকম, কাজেই দু' জগতের পত্রিকাগুলোও একই রকম হবে। ঐ জগতের পত্রিকায় যে বিজ্ঞাপন ছাপা হবে, এ জগতের পত্রিকাতেও প্রায় কাছাকাছি ধরনের বিজ্ঞাপন ছাপা হবে। ঐ বিজ্ঞাপনই হবে যোগসূত্র। বুঝতে পারছেন কিছু?'

'পারছি। উনি কি বিজ্ঞাপন ছাপতে দিয়েছেন?'

'এখনো না। ভাষা কী হবে তাই নিয়ে ভাবছেন। ভাষাটা তিনি এমন করতে চান, যাতে দেখামাত্রই আপনি বুঝতে পারেন। স্যার, আমি আর থাকতে পারছি না, মাথায় অসম্ভব যন্ত্রণা হচ্ছে।'

'খুব বেশি যন্ত্রণা?'

'হ্যাঁ, খুব। আমি আর পারছি না। আপনি কি একটা কাজ করবেন?'

'বল, কী কাজ?'

'বিনুকে একটু নিয়ে আসবেন? বিনু যদি আমার পাশে এসে বসে, যদি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, তাহলে আমার যন্ত্রণাটা কমবে।'

'তোমার এরকম মনে হবার কারণ কি?'

'আমার মাথার যন্ত্রণাটা শুধু এই জগতেই হয় না। সব ক'টা জগতে হয়। বিনু তখন আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। তখন যন্ত্রণাটা কমে।'

'তুমি অতীতে যেতে পার বলে মনে হয়। অন্য জীবনের ছোটবেলার কথা তুমি বল। ভবিষ্যতে কি যেতে পার?'

'না, পারি না। সব ক'টা জীবনে দেখেছি, একটা সময়ে আমার মাথার যন্ত্রণা শুরু হয়। ঐ সময়টাতে আমি যাই না।'

'তুমি কি ইচ্ছামতো যেখানে যেতে চাও যেতে পার?'

'না, পারি না। হঠাৎ জীবনের একটা সময়ে এসে উপস্থিত হই। সেটা পছন্দ না-হলে অন্য কোথাও যাই। স্যার, আপনি বিনুকে খবর দেবেন?'

'দেব।'

বিনুকে তিনি খবর দিতে পারলেন না। সেদিন তার গায়ে হলুদ হচ্ছে। বাড়িতে আনন্দ এবং উল্লাস। বিনুর জীবন নতুন একটি খাতে প্রবাহিত হচ্ছে। তাকে বাধা দেওয়ার কোনো কারণ মিসির আলি দাঁড় করাতে পারলেন না। হয়তো বিনুরও অসংখ্য জীবন আছে, হয়তো নেই। হয়তো এই একটিই তার জীবন। এই জীবনটি জটিলতামুক্ত হোক--মিসির আলি মনে-মনে এই কামনাই করলেন।

মিসির আলি বাসায় ফিরলেন অনেক রাতে। দরজা তালাবদ্ধ। নীলু দরজা বন্ধ করে চলে গিয়েছে। তালা ভেঙে ঢুকতে হল। ঘর পরিপাটি করে গোছান। নীলু এর মধ্যে রান্না

করেছে। খাবারদাবার গুছিয়ে রেখেছে টেবিলে।

নীলু একটা চিঠিও লিখে রেখে গেছে। '--মানুষের একটাই জীবন, নাকি অসংখ্য জীবন--তা আমি জানি না। এ নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথাও নেই। আমি জানি, আমার একটাই জীবন। আপনাকে কিছুতেই তা নষ্ট করতে দেব না।'

সুন্দর গোটা গোটা হাতের লেখা। অনেক সময় নিয়ে সে লিখেছে এবং হয়তো-বা লিখতে মেয়েটির চোখ ভিজে উঠেছে। নীলু কখনো কাঁদে না, সেই জন্যেই বোধ হয় অতি অল্পতে তার চোখ ভিজে ওঠে।

১৮

মুনির মারা গেল শ্রাবণ মাসের কুড়ি তারিখে।

দিন-তারিখ মিসির আলির মনে থাকে না। এই তারিখটা মনে আছে, কারণ এর দু' দিন পরই ছিল ২২শে শ্রাবণ। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুদিন।

মৃত্যুর আগে-আগে মুনির বেশ সহজ ও স্বাভাবিক আচরণ করছিল। রসিকতা করছিল। তবে মিসির আলি বুঝতে পারছিলেন যে, সে যে-কোনো কারণেই হোক প্রচণ্ড ভয় পাচ্ছে।

মিসির আলি তার হাত ধরে বসে ছিলেন। মুনির এক সময় বলল, 'বোধহয় মারা যাচ্ছি, তাই না?'

মিসির আলি জবাব দিলেন না। মুনির বলল, 'আপনি একবার বলেছিলেন, মানুষই ঈশ্বর, তাহলে মৃত্যুকে আমরা জয় করতে পারি না কেন?'

'হয়তো পারি।'

'হ্যাঁ, হয়তো পারি।'

'তোমার কি মরতে ভয় লাগছে?'

'লাগছে।'

'তোমার তো ভয় লাগা উচিত নয়। তুমি তো অসংখ্য জীবনের কথা বল। এই জীবন গেলে কী হবে, তোমার তো আরো অযুত নিযুত লক্ষ কোটি জীবন আছে।'

'এখন মনে হচ্ছে, সবই আমার কল্পনা। স্যার, আপনি আমার মাথায় হাত রাখুন।'

মিসির আলি পরম মমতায় তাঁর হাত রাখলেন মুনিরের মাথায়। তাঁর চোখ ভিজে উঠছে। তিনি তাকিয়ে আছেন জানালার দিকে। জানালার ওপাশে আলো-আঁধারের কী এক অপূর্ব রহস্যময় জগৎ!

মিসির আলি বিড়বিড় করে বললেন—

You promise heavens free from strife,
Pure truth and perfect change of will;
But sweet, sweet is this human life,
So sweet, I fain would breathe it still;
Your chilly stars I can forgo,
This warm kind world is all I know.

অন্যভুবন

১

দুপুরবেলা কাজের মেয়েটি মিসির আলিকে ডেকে তুলল। কে নাকি দেখা করতে এসেছে। খুব জরুরি দরকার।

মিসির আলির রাগে গা কাঁপতে লাগল। কাজের মেয়েটিকে বলে দেয়া ছিল কিছুতেই যেন তাঁকে তিনটার আগে ডেকে তোলা না হয়। এখন ঘড়িতে বাজছে দু'টা দশ। যত জরুরি কাজই থাকুক, এই সময় তাঁকে ডেকে তোলার কথা নয়। মিসির আলি রাগ কমাবার জন্যে উল্টো দিকে দশ থেকে এক পর্যন্ত গুনলেন। গুন-গুন করে মনে-মনে গাইলেন—আজি এ বসন্তে এত ফুল ফোটে এত পাখি গায়—। এই গানটি গাইলে তাঁর রাগ আপনাতেই কিছুটা নেমে যায়। কিন্তু আজ নামছে না। কাজের মেয়েটির ভাবলেশহীন মুখ দেখে তা আরো বেড়ে যাচ্ছে। তিনি গম্ভীর গলায় ডাকলেন, 'রেবা।'

'জ্বি।'

'আর কোনো দিন তুমি আমাকে তিনটার আগে ডেকে তুলবে না।'

'জ্বি আইচ্ছা।'

'দুটো থেকে তিনটা এই এক ঘন্টা আমি প্রতি দিন দুপুরে ঘুমিয়ে থাকি। এর নাম হচ্ছে সিয়াস্তা। বুঝলে?'

'জ্বি।'

'ঘড়ি দেখতে জান?'

'জ্বি-না।'

মিসির আলির রাগ দপ করে নিভে গেল। যে-মেয়ে ঘড়ি দেখতে জানে না, সে তাকে তিনটার সময় ডেকে তুলবে কীভাবে? রেবা মেয়েটি নতুন কাজে এসেছে। তাকে শিখিয়ে-পড়িয়ে নিতে হবে।

'রেবা।'

'জ্বি?'

'আজ সন্ধ্যার পর তোমাকে ঘড়ি দেখা শেখাব। এক থেকে বার পর্যন্ত সংখ্যা প্রথম শিখতে হবে। ঠিক আছে?'

'জ্বি, ঠিক আছে।'

'এখন বল, যে-লোকটি দেখা করতে এসেছে, সে কেমন?'

রেবা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। মানুষ মানুষের মতোই, আবার কেমন হবে! তার এই সাহেব কী-সব অদ্ভুত কথাবার্তা যে বলে। পাগলা ধরনের কথাবার্তা।

'বল বল, চুপ করে আছ কেন?'

মিসির আলি বিরক্ত হলেন। এই মেয়েকে কাজ শেখাতে সময় লাগবে। তিনি গম্ভীর মুখে বললেন, 'মানুষকে দেখতে হবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, বুঝতে পারছ?'

মেয়েটি মাথা নাড়ল। মাথা নাড়ার ভঙ্গি থেকেই বলে দেয়া যায়, সে কিছুই বোঝে নি। বোঝার চেষ্টাও করে নি। সে শুধু ভাবছে, এই লোকটির মাথায় দোষ আছে। তবে দোষ থাকলেও লোকটা ভালো। বেশ ভালো। রেবা এ-পর্যন্ত দু'টি গ্লাস, একটা পিরিচ এবং একটা প্লেট ভেঙেছে। একটা কাপের বোঁটা আলগা করে ফেলেছে। সে তাকে কিছুই বলে নি। একটা ধমক পর্যন্ত দেয় নি। ভালো মানুষগুলি একটু পাগল-পাগলই হয়ে থাকে।

মিসির আলি হাত বাড়িয়ে সিগারেটের প্যাকেট নিলেন। একটি সিগারেট বের করে হাত দিয়ে গুঁড়ো করে ফেললেন। তিনি সিগারেট ছাড়বার চেষ্টা করছেন। যখনই খুব খেতে ইচ্ছা করে, তিনি একটি সিগারেট বের করে গুঁড়ো করে ফেলেন, এবং ভাবতে চেষ্টা করেন একটি সিগারেট টানা হল। এতে কোনো লাভ হচ্ছে না, শুধু মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে যাচ্ছে।

'রেবা।'

'জ্বি?'

'এখন আমি তোমাকে কিছু প্রশ্ন করব, তুমি উত্তর দেবে। তোমার উত্তর থেকে আমি ধারণা করতে পারব, যে-লোকটি এসেছে সে কী রকম।'

রেবা হাসল। তার বেশ মজা লাগছে।

'প্রথম প্রশ্ন, যে লোকটি এসেছে সে গ্রামে থাকে না শহরে?'

'গেরামে।'

'লোকটি বুড়ো না জোয়ান?'

'জোয়ান।'

'রোগা না মোটা?'

'রোগা।'

'কী কাপড় পরে এসেছে?'

'মনে নাই।'

'কাপড় পরিষ্কার না ময়লা?'

'ময়লা।'

'হাতে কী আছে? ব্যাগ বা ছাতা, এ-সব কিছু আছে?'

'না।'

'চোখে চশমা আছে?'

'না।'

মিসির আলি থেমে-থেমে বললেন, 'তোমাকে যে-প্রশ্নগুলি করলাম, সেগুলি মনে রাখবে। কেউ আমার কাছে এলে, আমি এইগুলি জানতে চাই। বুঝতে পারছ?'

'জ্বি।'

'এখন যাও, আমার জন্যে এক কাপ চমৎকার চা বানাও। দুধ-চিনি কিচ্ছু দেবে না। শুধু লিকার। বানানো হয়ে গেলে চায়ের কাপে এক দানা লবণ ফেলে দেবে।'

'লবণ?'

'হ্যাঁ, লবণ।'

মিসির আলি উঠে দাঁড়ালেন। বসার ঘরে যে-লোকটি এসেছে তাকে দেখা দরকার। রেবার কথামতো লোকটি হবে গ্রামের, ময়লা কাপড় পরে এসেছে। জোয়ান বয়স। হাতে কিছুই নেই। এই ধরনের এক জন লোকের তাঁর কাছে কী প্রয়োজন থাকতে পারে?

বসার ঘরে যে লোকটি বসে ছিল, সে রোগা নয়। পরনে গ্যাভার্ডিনের স্যুট। হাতে চামড়ার একটি ব্যাগ। বয়স পঞ্চাশের উপরে। চোখে চশমা। মিসির আলি মনে-মনে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। রেবা মেয়েটির পর্যবেক্ষণশক্তি মোটেই নেই। একে বেশি দিন রাখা যাবে না। মিসির আলি বসে-থাকা লোকটিকে তীক্ষ্ণ চোখে দেখতে লাগলেন।

তিনি ঘরে ঢোকার সময় লোকটি উঠে দাঁড়ায় নি। দাঁড়াবার মতো ভঙ্গি করেছে। বসে থাকার মধ্যেও একটা স্পর্ধার ভাব আছে। লোকটি তাকিয়ে আছে সরু চোখে। যেন সে কিছু একটা যাচাই করে নিচ্ছে। মিসির আলি বললেন, 'ভাই, আপনার নাম?'

'আমার নাম বরকতউল্লাহ্। আমি ময়মনসিংহ থেকে এসেছি।'

'কোনো কাজে এসেছেন কি?'

'হ্যাঁ, কাজেই এসেছি। আমি অকাজে ঘোরাঘুরি করি না।'

'আমার কাছে এসেছেন?'

'আপনার কাছে না-এলে, আপনার ঘরে বসে আছি কেন?'

'ভালোই বলেছেন। এখন বলুন, কী ব্যাপার। অল্প কথায় বলুন।'

বরকতউল্লাহ্ সাহেব থমথমে গলায় বললেন, 'আমি কথা কম বলি। আপনাকে বেশিক্ষণ বিরক্ত করব না।'

তিনি লক্ষ করলেন, লোকটি আহত হয়েছে। তার চোখ-মুখ লাল। মিসির আলি খুশি হলেন। লোকটি বড় বেশি স্পর্ধা দেখাচ্ছে।

'বরকতউল্লাহ্ সাহেব, চা খাবেন?'

'জ্বি না, আমি চা খাই না। আমার যা বলার তা আমি খুব অল্প কথায় বলে চলে যাব।'

মিসির আলি হাসতে-হাসতে বললেন, 'অল্প কথায় কিছু বলতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। আপনার অভ্যাস হচ্ছে বেশি কথা বলা। আপনি চা খাবেন কি না, তার জবাব দিতে গিয়ে একটি দীর্ঘ বাক্য বলেছেন। আপনি বলেছেন—জ্বি না, আমি চা খাই না। আমার যা বলার তা আমি খুব অল্প কথায় বলে চলে যাব। এই বাক্যটিতে

সতেরটি শব্দ আছে।'

বরকতউল্লাহ সাহেব অবাক হয়ে তাকালেন। তাঁর ভ্রু কুঞ্চিত হল। মিসির আলি মনে-মনে হাসলেন। কাউকে বুদ্ধির খেলায় হারাতে পারলে তাঁর খুব আনন্দ হয়।

'বরকতউল্লাহ্ সাহেব, আপনি কী চান?'

'আপনার সাহায্য চাই। তার জন্যে আমি আপনাকে যথাযথ সম্মানী দেব। আমি ধনাঢ্য ব্যাক্তি না-হলেও দরিদ্র নই! আমি চেকবই নিয়ে এসেছি।'

ভদ্রলোক কোটের পকেটে হাত দিলেন। মিসির আলির খানিকটা মন-খারাপ হয়ে গেল। ধনবান ব্যক্তিরা দরিদ্রের কাছে প্রথমেই নিজেদের অর্থের কথা বলে কেন ভাবতে লাগলেন।

বরকতউল্লাহ্ বললেন, 'আমি কি আমার সমস্যাটার কথা আপনাকে বলব?'

মিসির আলি বললেন, 'তার আগে জানতে চাই, আপনি আমার নাম জানলেন কী করে? আমি এমন কোনো বিখ্যাত ব্যক্তি নই যে, ময়মনসিংহের এক জন লোক আমার নাম জানবে।'

বরকতউল্লাহ্ নিচু স্বরে বললেন, 'আমি খুঁজছি এক জন ভালো সাইকিয়াট্রিস্ট, যাঁর কাছে আমি অকপটে আমার কথা বলতে পারব। যে আমার কথায় লাফিয়ে উঠবে না, আবার অবিশ্বাসের হাসিও হাসবে না। আমি জানি, আপনি সে-রকম এক জন মানুষ। কী করে জানি, তা তেমন জরুরি নয়।'

মিসির আলির মনে হল লোকটা বেশ বুদ্ধিমান, গুছিয়ে কথা বলতে জানে। যার মানে হচ্ছে, গুছিয়ে কথা বলার অভ্যেস তার আছে। লোকটি সম্ভবত এক জন ব্যবসায়ী। সফল ব্যবসায়ীদের নানান ধরনের লোকজনের সঙ্গে খুব গুছিয়ে কথা বলতে হয়।

'বরকতউল্লহ্ সাহেব, আপনি কি এক জন ব্যবসায়ী?'

'হ্যাঁ, আমি এক জন ব্যবসায়ী।'

'কত দিন ধরে ব্যবসা করছেন?'

'প্রায় দশ বছর। এখন করছি না।'

'কিসের ব্যবসা?'

'আপনি আমাকে জেরা করছেন কেন বুঝতে পারছি না।'

'আপনার সমস্যা নিয়ে আমি মাথা ঘামাব কি না, তা জানার জন্যে জেরা করছি। যদি আপনাকে আমার পছন্দ হয়, তবেই আপনার কথা শুনব। সবার সমস্যা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না।'

'যথেষ্ট পরিমাণ টাকা পেলেও না?'

'না। আমার সম্পর্কে ভালোরকম খোঁজখবর আপনি নেন নি। যদি নিতেন, তাহলে জানতেন যে, আমি টাকা নিই না।'

বরকতউল্লাহ্ সাহেব দীর্ঘ সময় চুপ করে রইলেন। তিনি তাঁর সামনে বসে থাকা রোগাটে লোকটিকে ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না। কথাবার্তা বলছে অহঙ্কারী মানুষের মতো, কিন্তু বলার ভঙ্গিটি সহজ ও স্বাভাবিক।

'আপনি টাকা নেন না কেন, জানতে পারি কি?'

'নিশ্চয়ই পারেন। টাকা নিলেই এক ধরনের বাধ্যবাধকতা এসে পড়ে। আমি তার

মধ্যে যেতে চাই না। অন্যের সমস্যা নিয়ে চিন্তা করা আমার পেশা নয়, শখ। শখের ব্যাপারে কোনোরকম বাধ্যবাধকতা থাকা উচিত নয়। কি বলেন?'

'ঠিকই বলছেন। আমি আপনার সব প্রশ্নের জবাব দেব। কী জানতে চান বলুন?'

'আপনার পড়াশোনা কতদূর?'

'এম এ পাশ করেছি। পলিটিক্যাল সায়েন্স।'

'আপনি বলছেন ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছেন, কেন?'

'এই প্রশ্নের জবাব আপনাকে পরে দেব। অন্য প্রশ্ন করুন।'

'আপনি বিবাহিত?'

'হ্যাঁ। আমার ন' বছর বয়েসী একটি মেয়ে আছে।'

'আপনার সমস্যা এই মেয়েকে নিয়েই, নয় কি?'

'জ্বি হাঁ। কী করে বুঝলেন?'

'মেয়ের কথা বলার সময় আপনার গলার স্বর পাল্টে গেল, তা থেকেই আন্দাজ করছি। আপনার স্ত্রী মারা গেছেন কত দিন হল?

'প্রায় নয় বছর হল। স্ত্রী মারা গেছেন, সেটা কী করে বলতে পারলেন?'

'বাচ্চাদের কোনো সমস্যা হলে মা নিজে আসেন। এ ক্ষেত্রে আসেন নি দেখে সন্দেহ হয়েছিল। তা ছাড়া বিপত্নীক মানুষদের দেখলেই চেনা যায়।'

'আমি কি এবার আমার ব্যাপারটা বলব?'

'বলুন।'

'সংক্ষেপে বলতে হবে?'

'না, সংক্ষেপে বলার দরকার নেই। চা দিতে বলি?'

'জ্বি–না, আমি চা খাই না। এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি দিতে বলুন, খুব ঠাণ্ডা। তৃষ্ণা হচ্ছে।'

'আমার ঘরে ফ্রীজ নেই। পানি খুব ঠাণ্ডা হবে না।'

ভদ্রলোক তৃষ্ণার্তের মতোই পানির গ্লাস শেষ করে দ্বিতীয় গ্লাস চাইলেন। মিসির আলি বললেন, 'আরেক গ্লাস দেব?'

'আর লাগবে না।'

'আপনি তাহলে শুরু করুন। আপনার মেয়ের নাম কি?'

'তিন্নি।'

'বলুন তিন্নির কথা।'

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। সম্ভবত মনে মনে গুছিয়ে নিচ্ছেন। কিংবা বুঝে উঠতে পারছেন না, ঠিক কোন জায়গা থেকে শুরু করবেন। মিসির আলি লক্ষ করলেন, ভদ্রলোকের কপালে সূক্ষ্ম ঘামের কণা জমতে শুরু করেছে। মিসির আলি ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না, ন' বছর বয়েসী একটি মেয়ের এমন কী সমস্যা থাকতে পারে যা বলতে গিয়ে এমন অস্বস্তির মধ্যে পড়তে হয়।

'বলুন, আপনার মেয়ের কথা বলুন।'

ভদ্রলোক বলতে শুরু করলেন।

'আমার মেয়ের নাম তিন্নি।...

'ওর বয়স ন' বছর। মেয়ের জন্মের সময় ওর মা মারা যায়। মেয়েটিকে আমি নিজেই মানুষ করি। আমি মোটামুটিভাবে এক জন স্বচ্ছল মানুষ। কাজেই আমার পক্ষে বেশ কিছু কাজের লোকজন রাখা কোনো সমস্যা ছিল না। তিন্নিকে দেখাশোনার জন্যে অনেকেই ছিল। কিন্তু তবু মেয়েটির বেশির ভাগ দায়িত্ব আমিই পালন করেছি। দুধ বানানো, খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো—সবই আমি করতাম। বুঝতেই পারছেন, মেয়েটি আমার খুবই আদরের। সব বাবার কাছেই তাদের ছেলেমেয়ের আদর থাকে, কিন্তু আমার মধ্যে বাড়াবাড়ি রকমের ছিল।'

মিসির আলি বললেন, 'আপনি কি বলতে চাচ্ছেন, এখন নেই?'

ভদ্রলোক এই প্রশ্নের জবাব দিলেন না। তাঁর মেয়ের কথা বলে যেতে লাগলেন। তিনি এমন একটি ভঙ্গি করলেন, যেন প্রশ্নটি শুনতে পান নি।

'তিন্নির বয়স যখন এক বৎসর, তখন লক্ষ করলাম, ও অন্যান্য শিশুদের মতো নয়। সাধারণত এক বৎসর বয়সেই শিশুরা কথা বলতে শুরু করে। তিন্নির বেলা তা হল না। সে কথা বলা শিখল না। বড়-বড় ডাক্তাররা সবাই দেখলেন। তাঁরাও কোনো কারণ বের করতে পারলেন না। মেয়েটি কানে শুনতে পায়। তার ভোকাল কর্ড ঠিক আছে। কিন্তু কথা বলে না। কেউ কিছু বললে মন দিয়ে শোনে--এই পর্যন্তই। · · ·

'ই এন টি স্পেশালিস্ট প্রফেসর আলম বললেন, অনেক বাচ্চাই দেরিতে কথা শেখে। এর বেলাও তাই হচ্ছে। দেরি হচ্ছে। আপনি আপনার মেয়ের সঙ্গে দিন-রাত কথা বলবেন। ও শুনে-শুনে শিখবে। · · ·

'আমি প্রফেসর আলমের পরামর্শমতো প্রচুর কথা বলতাম। গল্প পড়ে শোনাতাম। সিনেমায় নিয়ে যেতাম। কিন্তু কোনো লাভ হল না। মেয়েটি একটি কথাও বলল না। · ·

'ওর যখন ছ' বছর বয়স তখন একটা অদ্ভুত ব্যাপার হল। দিনটি আমার পরিষ্কার মনে আছে--জুলাই মাসের তিন তারিখ, শুক্রবার। আমি দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর ঘুমুচ্ছি। শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না। জ্বরজ্বর ভাব। হঠাৎ তিন্নি আমাকে ধাক্কা দিয়ে ঘুম থেকে জাগাল, এবং পরিষ্কার গলায় বলল, ''বাবা, অসময়ে ঘুমুচ্ছ কেন?" · · ·

'আপনি বুঝতেই পারছেন আমি স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইলাম। প্রথমে ভাবলাম স্বপ্ন দেখছি। তিন্নি কথা বলেছে। একটি দু'টি শব্দ নয়, পুরো বাক্য বলেছে। অত্যন্ত স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলেছে। কোনো রকম জড়তা নয়, অস্পষ্টতা নয়। বিস্ময় সামলাতে আমার দীর্ঘ সময় লাগল। আমি এক সময় বললাম, "তুই কথা বলা জানিস?" · · ·

'তিন্নি হাসি মুখে বলল, "হ্যাঁ। কেন জানব না?" · · ·

''এত দিন কথা বলিস নি কেন?'' · · ·

'তিন্নি তার জবাব দিল না। ঠোঁট টিপে হাসতে লাগল, যেন সে খুব মজা পাচ্ছে। এটা যেন চমৎকার একটা রসিকতা, কথা না-বলে বাবাকে বোকা বানানো।--

'মিসির আলি সাহেব, আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, নতুন এই পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে উঠতে আমার সময় লাগল। তবে আমি ঠাণ্ডা ধরনের মানুষ। আমি কোনো কিছু নিয়েই হৈচৈ শুরু করি না। প্রথমে নিজে বুঝতে চেষ্টা করি। কিন্তু তিন্নির ব্যাপারটা আমি কিছুই বুঝলাম না। হঠাৎ করে কথা বলা শুরু করা ছাড়াও তার মধ্যে অনেক বড় ধরনের অস্বাভাবিকতা ছিল।'

এই পর্যন্ত বলেই বরকতউল্লাহ্ সাহেব থামলেন। পানি খেতে চাইলেন। মিসির আলি তাকিয়ে রইলেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। বরকতউল্লাহ্ সাহেব নিচু গলায় আবার কথা শুরু করলেন।

'আমি লক্ষ করলাম, তিন্নি সব প্রশ্নের জবাব জানে।'

মিসির আলি বললেন, 'আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না। সব প্রশ্নের জবাব জানে মানে?'

'আপনাকে উদাহরণ দিলে ভালো বুঝবেন। ধরুন, আমি তিন্নিকে জিজ্ঞেস করলাম, ষোলর বর্গমূল কত? সে এক মুহূর্ত ইতস্তত না-করে বলবে ''চার''—যদিও সে অঙ্কের কিছুই জানে না। যে-মেয়ে কথা বলতে পারে না, তাকে অঙ্ক শেখানোর প্রশ্নই ওঠে না। ···

'আপনাকে আরেকটি উদাহরণ দিই। এক দিন বাসায় ফিরে তিন্নিকে জিজ্ঞেস করলাম, "বল তো মা আজ নয়াবাজারে কার সঙ্গে দেখা হয়েছে?" সে সঙ্গে-সঙ্গে বলল, "হালিম সাহেবের সঙ্গে। " ···

'হালিম আমার বাল্যবন্ধু। তিন্নি তাকে চেনে না। তার সঙ্গে আমার মেয়ের কোনো দিন দেখা হয় নি। হালিমের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, এটা তিন্নির জানার কোনো কারণ নেই। মিসির আলি সাহেব, বুঝতেই পারছেন, আমি খুব চিন্তিত হয়ে পড়লাম। তার কিছুদিন পর আরেকটি অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। ···

'রাতের বেলা তিন্নিকে নিয়ে খেতে বসেছি। হঠাৎ ইলেক্‌ট্রিসিটি চলে গেল। আমি হারিকেন জ্বালানোর জন্যে বললাম। কেউ হারিকেন খুঁজে পেল না। প্রয়োজনের সময় কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না। টর্চ আনতে বললাম--তাও কেউ পাচ্ছে না। আমি বিরক্ত হয়ে ধমকাধমকি করছি। তখন তিন্নি বলল, ''বাতি চলে গেলে সবাই এত হৈচৈ করে কেন?'' ···

আমি বললাম, ''অন্ধকার হয়ে যায়, তাই।'' ···

''অন্ধকার হলে কী অসুবিধা?'' ···

''অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না, সেটাই অসুবিধা।'' ···

''তুমি দেখতে পাও না?'' ···

''শুধু আমি কেন, কেউই পায় না। আলো ছাড়া কিছুই দেখা যায় না মা।''···

'তিন্নি খুবই অবাক হল, বিস্মিত গলায় বলল, ''কিন্তু আমি তো অন্ধকারেও দেখতে পাই। আমি তো সব কিছু দেখছি।'' ···

'প্রথম ভাবলাম, সে ঠাট্টা করেছে। কিন্তু না, ঠাট্টা নয়। সে সত্যি কথাই বলছিল। সে অন্ধকারে দেখে। খুব পরিষ্কার দেখে।'

বরকতউল্লাহ্ সাহেব থামলেন। রুমাল বের করে চশমার কাঁচ পরিষ্কার করতে লাগলেন। মিসির আলি বললেন, 'আপনার মেয়ের প্রসঙ্গে আরো কিছু কি বলবেন?' তিনি না-সূচক মাথা নাড়লেন।

'আর কিছুই বলার নেই?'

'আছে। কিন্তু এখন আপনাকে বলতে চাই না।'

'কখন বলবেন?'

'প্রথম আপনি আমার মেয়েকে দেখবেন। ওর সঙ্গে কথা বলবেন। তারপর

আপনাকে বলব।'

'ঠিক আছে। আপনার মেয়ের এখন বয়স হচ্ছে নয়। মেয়ের অস্বাভাবিকাতাগুলি তো আপনার অনেক আগেই চোখে পড়েছে। কোনো ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেছেন?'

'না। ডাক্তার এর কী করবে?'

'কোনো সাইকিয়াট্রিস্ট?'

'না। আপনিই প্রথম ব্যক্তি, যাঁর কাছে আমি এসেছি।'

'মেয়ের এই ব্যাপারগুলি আপনি মনে হচ্ছে লুকিয়ে রাখতে চান।'

'হ্যাঁ, চাই। কেন চাই, তা আপনি আমার মেয়ের সঙ্গে কথা বললেই বুঝবেন।'

'আপনি মেয়ের মা সম্পর্কে কিছু বলুন।'

'কী জানতে চান?'

'জানতে চাই তিনি কেমন মহিলা ছিলেন। তাঁর মধ্যে কোনো রকম অস্বাভাবিকতা ছিল কি না।'

'না, ছিল না। তিনি খুবই স্বাভাবিক মহিলা ছিলেন।'

'আপনি ভালোমতো জানেন?'

'হ্যাঁ, ভালোমতোই জানি। আমি এগার বছর আমার স্ত্রীর সঙ্গে কাটিয়েছি। তিন্নি আমাদের শেষ বয়সের সন্তান। এগার বছরে এক জন মানুষকে ভালোমতো জানা যায়

'তা জানা যায়। আচ্ছা, আপনার মেয়ের এই ব্যাপারগুলি কি বাইরের অন্য কাউকে বলেছেন?'

'না, কাউকেই বলি নি। আপনি বুঝতেই পারছেন, এটা জানাজানি হওয়ামাত্রই একটা হৈচৈ শুরু হবে। পত্রিকার লোক আসবে, টিভির লোক আসবে। আমি ভাবলাম, কিছুতেই এটা করতে দেওয়া উচিত হবে না। এখন মিসির আলি সাহেব, দয়া করে বলুন—আপনি কি আমার মেয়েটাকে দেখবেন?'

'হ্যাঁ, দেখব।'

'কবে যাবেন ময়মনসিংহ?'

'আপনি কবে যাবেন?'

'আমি আগামীকাল রাতে যাব। রাত দশটায় একটা ট্রেন আছে—নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস।'

মিসির আলি সহজ স্বরে বললেন, 'আমি আপনার সঙ্গেই যাব।'

বরকতউল্লাহ্ সাহেব অবাক হয়ে বললেন, 'আমার সঙ্গে যাবেন!'

'হ্যাঁ, আপনার সঙ্গে যাব। কোনো অসুবিধে হবে?'

বরকতউল্লাহ্ সাহেব মাথা নাড়লেন। কোনো অসুবিধা হবে না। এই লোকটিকে তিনি ঠিক বুঝতে পারছেন না। যে প্রথমে তাঁর কথাই শুনতে চায় নি, সে এখন—। কত বিচিত্র স্বভাবের মানুষ আছে এই পৃথিবীতে!

২

তিন্নি অবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিল।

ঘুম ভাঙল সন্ধ্যার আগে-আগে। আঁধার হয়ে আসছে। চারদিকে সুনসান নীরবতা। দোতলায় কেউ নেই। কেউ থাকে না কখনো। এ-বাড়ির সব মানুষজন থাকে একতলায়। তিন্নি যখন কাউকে ডাকে, তখনি সে আসে, তার আগে কেউ আসে না। তিন্নির কাউকে ডাকতে ইচ্ছা করছে না। সে জানালার পাশে গিয়ে বসল। এখান থেকে রাস্তা দেখা যায়। রাস্তা দিয়ে লোকজন যাওয়া-আসা করছে, নানান ধরনের মানুষ। কারোর সঙ্গে কারোর কোনো মিল নেই। কত মজার মজার কথা একেক জন ভাবছে। কিন্তু ওরা কেউ জানে না, তিন্নি সব বুঝতে পারছে। এই তো এক জন মোটা লোক যাচ্ছে। তার হাতে একটা ছাতা। শীতের সময় কেউ ছাতা নিয়ে বের হয়? ছাতাটা কেমন অদ্ভুতভাবে দোলাচ্ছে লোকটা, এবং মনে মনে ভাবছে বাড়ি পৌঁছেই গরম পানি দিয়ে গোসল করে ঘুমুবে। শীতের দিনের সন্ধ্যাবেলায় কেউ ঘুমায়? লোকটার মনে খুব আনন্দ। কারণ সে হঠাৎ করে অনেক টাকা পেয়েছে। কেউ দিয়েছে তাকে। যে দিয়েছে তার নাম রহমত মিয়া।

বুড়ো লোকটি চলে যেতেই রোগা একটা মানুষকে দেখা গেল। সে খুব রেগে আছে। কাকে যেন খুব গাল দিচ্ছে। এমন বাজে গাল যে শুনলে খুব রাগ লাগে। তিন্নি জানালা বন্ধ করে দিল।

ঘরটা এখন অন্ধকার। অন্ধকারে কেউ কিচ্ছু দেখতে পায় না, কিন্তু সে পায়। কেউ অন্ধকারে দেখতে পায় না, সে পায় কেন? সে কেন অন্য মানুষদের মতো নয়? কেন সবাই তাকে ভয় পায়? এই যে সন্ধ্যা হয়ে গেছে, কিন্তু কেউ তার কাছে আসছে না। যতক্ষণ সে না ডাকবে, ততক্ষণ আসবে না। এলেও খুব ভয়ে ভয়ে আসবে। দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বলবে--'তিন্নি আপা, তিন্নি আপা।' এমন রাগ লাগে! রাগ হলে তিন্নির সবাইকে কষ্ট দিতে ইচ্ছা করে। তখন তার কপালের বাঁ পাশে চিনচিনে ব্যথা হয়। ব্যথা হলেই রাগ আরো বেড়ে যায়। রাগ বাড়লে ব্যথা বাড়ে। কী কষ্ট! কী কষ্ট!!

তিন্নি দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়াল এবং রিনরিনে গলায় ডাকল—'নাজিম, নাজিম।' নাজিমের পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। সে ভয়ে-ভয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে। তিন্নি তাকে দেখতে পাচ্ছে না। দোতলায় ওঠার সিঁড়ি পেছনের দিকে। কিন্তু তবু তিন্নি পরিষ্কার বুঝতে পারছে, নাজিম রেলিং ধরে-ধরে উপরে আসছে, তার হাতে এক গ্লাস দুধ। নাজিম তার জন্যে দুধ আনছে। কী বিশ্রী ব্যাপার! সে দুধ চায় নি, তবু আনছে। এমন গাধা কেন লোকটা?

'তিন্নি আপা।'

তিন্নি তাকাল না। নাজিম সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আছে। ভয় পাচ্ছে খুব। ভয়ে তার পা কাঁপছে।

'দুধ এনেছেন কেন? দুধ খাব না।'

'অন্য কিছু খাবেন আপা?'

'না, কিচ্ছু খাব না।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'বাবা কবে আসবে আপনি জানেন?'

'জানি না, আপা।'

'বাবা কাল সকালে আসবে। একা আসবে না, একটা লোককে নিয়ে আসবে।'

নাজিম কিছু বলল না। তিন্নি কাটা-কাটা গলায় বলল, 'আপনি আমার কথা বিশ্বাস করছেন না, তাই না?'

'করছি আপা।'

'আমি সব কিছু বুঝতে পারি।'

'আমি জানি আপা।'

'আপনি আমাকে ভয় করেন কেন?'

'আমি ভয় করি না আপা।'

'না, করেন। আপনারা সবাই আমাকে ভয় করেন। আপনি করেন, আবুর মা করে, দারোয়ান করে, সবাই ভয় করে। যান, আপনি চলে যান।'

'দুধ খাবেন না?'

'না, খাব না। কিচ্ছু খাব না।'

'বাতি জ্বালিয়ে দিই?'

'না, বাতি জ্বালাতে হবে না।'

'জ্বি আচ্ছা, আমি যাই আপা?'

'না, আপনি যেতে পারবেন না। আপনি দাঁড়িয়ে থাকুন।'

নাজিম দাঁড়িয়ে রইল। তিন্নি তার ঘরে ঢুকে ছবি আঁকতে বসল। ঘর এখন নিকষ অন্ধকার, কিন্তু তাতে তার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। অন্ধকারেই বরং রঙগুলি পরিষ্কার দেখা যায়। তিন্নি অতি দ্রুত ব্রাশ চালাচ্ছে। ভালো লাগছে না। কিচ্ছু ভালো লাগছে না। কান্না পাচ্ছে। সে তার রঙগুলি দূরে সরিয়ে কাঁদতে শুরু করল।

নাজিম ভীত গলায় বলল, 'কী হয়েছে তিন্নি আপা?'

তিন্নি তীক্ষ্ণ স্বরে বলল, 'কিচ্ছু হয় নি, আপনি চলে যান।'

নাজিম অতি দ্রুত সিঁড়ি থেকে নেমে গেল। যেন সে পালিয়ে বেঁচেছে।

৩

তাঁরা ময়মনসিংহ এসে পৌঁছলেন ভোররাতে। তখনো চারদিক অন্ধকার। কিছুই দেখার উপায় নেই। মিসির আলির মনে হল, বিশাল একটি রাজপ্রসাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। গাছগাছালিতে চারদিক ঢাকা। বারান্দায় অল্প পাওয়ারের একটি বাতি জ্বলছে। তাতে চারদিকের অন্ধকার আরো গাঢ় হয়েছে। মিসির আলি বললেন, 'রাজবাড়ি বলে মনে হচ্ছে।'

বরকত সাহেব শীতল গলায় বললেন, 'এক সময় ছিল। সুসং দুর্গাপুরের মহারাজার বাড়ি। আমি কিনে নিয়েছি।'

দারোয়ান গেট খোলামাত্র ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেল। অনেক লোকজন বেরিয়ে এল। সবাই ভৃত্যশ্রেণীর। আজকালকার যুগেও যে এত জন কাজের লোক থাকতে পারে, তা মিসির আলি ধারণা করেন নি। তিনি লক্ষ করলেন, এরা কেউ তিন্নি মেয়েটির উল্লেখ করছে না। মেয়ের বাবাও মেয়ে সম্পর্কে কাউকে কিছু জিজ্ঞেস

করলেন না। অথচ জিজ্ঞেস করাটাই স্বাভাবিক ছিল।

বরকত সাহেব বললেন, 'আপনি যান, বিশ্রাম করুন। সকালবেলা আপনার সঙ্গে কথা হবে।'

কালোমতো লম্বা একটি ছেলে তাঁর ঘর দেখিয়ে দিল।

একতলার একটি কামরা, পুরোনো দিনের কামরাগুলি যেমন হয়--দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে বিশাল। বিরাট দক্ষিণমুখী জানালা। ঘরের আসবাবপত্র সবই দামী ও আধুনিক। খাটে ছ' ইঞ্চি ফোমের তোষক। রকিং-চেয়ার। মেঝেতে দামী স্যাগ কার্পেট। মফস্বল শহরে এ-সব জিনিস ঠিক আশা করা যায় না।

বাথরুমে ঢুকে মিসির আলি আরো অবাক হলেন। ওয়াটার হিটারের ব্যবস্থা আছে। চমৎকার বাথটাব। মিসির আলির মনে হল, অনেক দিন এ ঘরে বা বাথরুমে কেউ আসে নি। এমন চমৎকার একটি গেস্টরুম এরা শুধু-শুধু বানিয়ে রেখেছে।

প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। কিন্তু গরম পানির ব্যবস্থা যখন আছে, তখন একটা হট শাওয়ার নেয়া যেতে পারে। মিসির আলি দীর্ঘ সময় নিয়ে গোসল সারলেন। শরীর ঝরঝরে লাগছে। এক কাপ গরম চা পেলে বেশ হত।

বাথরুম থেকে বের হয়েই দেখলেন টেবিলে চায়ের আয়োজন। পটভর্তি চা, প্লেটে নোনতা বিস্কিট, কুচিকুচি করে কাটা পনির। ভৃত্যশ্রেণীর এক জন যুবক তাঁকে ঢুকতে দেখেই চা ঢালতে শুরু করল। তিনি লক্ষ করলেন, লোকটি আড়চোখে তাঁর দিকে বারবার তাকাচ্ছে। চোখে চোখ পড়ামাত্র চট করে মাথা নামিয়ে নিচ্ছে।

'তোমার নাম কি?'

'নাজিম।'

'শুধু নাজিম?'

'নাজিমুদ্দিন।'

'কত দিন ধরে এ-বাড়িতে আছ?'

'জ্বি, অনেক দিন।'

'অনেক দিন মানে কত দিন?'

'পাঁচ বছর।'

'এ-বাড়িতে ক' জন মানুষ থাকে?'

নাজিম জবাব দিল না। চায়ের কাপে চিনি ঢেলে এগিয়ে দিল। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে, সে এখন চলে যাবে। মিসির আলি দ্বিতীয় বার জিজ্ঞেস করলেন, 'বাড়িতে ক' জন মানুষ থাকে?'

'স্যার, আমি কিছু জানি না।'

'আমি কিছু জানি না মানে? তুমি পাঁচ বছর এ বাড়িতে আছ, অথচ জান না এ বাড়িতে ক' জন মানুষ থাকে?'

'জ্বি না স্যার, আমি জানি না।'

'বরকত সাহেব এবং তাঁর মেয়ে— এই দু' জন ছাড়া আর ক' জন মানুষ থাকে?'

'আমি স্যার কিছুই জানি না।'

মিসির আলি বড়ই অবাক হলেন। আর কোনো প্রশ্ন করলেন না। চায়ে চুমুক

দিলেন। সিগারেট ধরালেন। তিনি সিগারেট ছেড়ে দেবার চেষ্টা করছেন, সেটা মনে রইল না। এই লোকটি কোনো কিছু বলতে চাচ্ছে না কেন? বাধা কোথায়?

নাজিম মৃদুস্বরে বলল, 'স্যার, বিছানায় শুয়ে বেশ্রাম নিবেন?'

'না, আমি অসময়ে ঘুমুব না।'

'সকালের নাশতা দেওয়া হবে সাড়ে সাতটায়।'

'ঠিক আছে।'

'আসি স্যার, পাশের ঘরেই আছি। দরকার হলে কলিং-বেল টেপবেন। দরজার কাছে কলিং-বেল আছে।'

তিনি মাথা নাড়লেন। কিছু বললেন না। ঘড়িতে বাজছে পাঁচটা পঁয়তাল্লিশ। আকাশ ফরসা হতে শুরু করেছে। তিনি বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। ব্রহ্মপুত্র নদী নিশ্চয়ই খুব কাছে। ভোরবেলা নদীর পাড় ধরে হাঁটতে ভালো লাগবে। এই শহরে এর আগে তিনি আসেন নি। অপরিচিত শহরে ঘুরে বেড়াতে চমৎকার লাগে।

গেট বন্ধ। গেটের পাশের খুপরি-ঘরটায় দারোয়ান নিশ্চয়ই ঘুমুচ্ছে। মিসির আলি উঁচু গলায় ডাকলেন, 'দারোয়ান, দারোয়ান, গেট খুলে দাও।'

দারোয়ান বেরিয়ে এল, কিন্তু গেট খুলল না। যেন সে কথা বুঝতে পারছে না।

'গেট খুলে দাও, আমি বাইরে যাব।'

'গেট খোলা যাবে না।'

'খোলা যাবে না মানে? কেন যাবে না?'

'বড়সাহেবের হুকুম ছাড়া খোলা যাবে না।'

'তার মানে? কী বলছ তুমি? এটা কি জেলখানা নাকি?'

দারোয়ান কোনো উত্তর না-দিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে গেল। যেন মিসির আলির সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে যাবার ব্যাপারে তার কোনো আগ্রহ নেই।

তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন একা-একা। তাঁর সামনে ভারি লোহার গেট। সমস্ত বাড়িটিকে যে-পাঁচিল ঘিরে রেখেছে, তাও অনেকখানি উঁচু। সত্যি সত্যি জেলখানা-জেলখানা ভাব। মিসির আলি আবার ডাকলেন, 'দারোয়ান—দারোয়ান।' কেউ বেরিয়ে এল না। ভোর সাতটা পর্যন্ত মিসির আলি বাড়ির সামনের বাগানে চিন্তিত মুখে ঘুরে বেড়ালেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করলেন। এই বাড়িটি গাছগাছালিতে ভর্তি। কিন্তু কোনো গাছে পাখি ডাকছে না। শুধু যে ডাকছে না তাই নয়, কোনো গাছে পাখি বসে পর্যন্ত নেই! অথচ ভোরবেলার এই সময়টায় পাখির কিচিরমিচিরে কান ঝালাপালা হবার কথা। অথচ চারদিক কেমন নীরব, থমথমে।

'স্যার, আপনার নাশতা দেয়া হয়েছে।'

'কোথায়?'

'দোতলায়।'

'চল যাই।'

'আমি যাব না স্যার। আপনি একা যান। ঐ যে সিঁড়ি।'

সিঁড়িতে পা রেখেই মিসির আলি থমকে দাঁড়ালেন। সিঁড়ির মাথায় একটি বালিকা দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। মেয়েটি দারুণ রূপসী। মাথাভর্তি কোঁকড়ানো চুল। টানা টানা চোখ। দেবীমূর্তির মতো কাটা-কাটা নাক-মুখ। মেয়েটি

দাঁড়িয়েও আছে মূর্তির মতো। একটুও নড়ছে না। চোখের দৃষ্টিও ফিরিয়ে নিচ্ছে না। মিসির আলি বললেন, 'কেমন আছ তিন্নি?'

মেয়েটি মিষ্টি করে হেসে বলল, 'ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন?'

'হ্যাঁ, ভালোই আছি।'

'আপনাকে গেট খুলে দেয় নি, তাই না?'

মিসির আলি উপরে উঠতে উঠতে বললেন, 'দারোয়ান ব্যাটা বেশি সুবিধার না। কিছুতেই গেট খুলল না।'

'দারোয়ান ভালোই। বাবার জন্যে খোলে নি। বাবা গেট খুলতে নিষেধ করেছেন।

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। বাবার ধারণা, গেট খুললেই আমি চলে যাব।'

'তুমি বুঝি শুধু চলে যেতে চাও?'

'না, চাই না। কিন্তু বাবার ধারণা, আমি চলে যেতে চাই।'

মেয়েটি আবার মাথা দুলিয়ে হাসল। মেয়েটি এই দারুণ শীতেও পাতলা একটা জামা গায়ে দিয়ে আছে। খালি পা। মনে হচ্ছে সে শীতে অল্প অল্প কাঁপছে।

'তিন্নি, তোমার শীত লাগছে না?'

'না।'

'বল কী! এই প্রচণ্ড শীতে তোমার ঠাণ্ডা লাগছে না?'

'না। আপনি নাশতা খেতে যান। বাবা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে। দেরি হচ্ছে দেখে মনে-মনে রেগে যাচ্ছে।'

'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ, তাই।'

মেয়েটি হাঁটতে শুরু করল। ধবধবে সাদা রঙের ফ্রকে তাকে দেবশিশুর মতো লাগছে। মিসির আলি মেয়েটির প্রতি গাঢ় মমতা বোধ করলেন। তাঁর ইচ্ছে করল মেয়েটিকে কোলে তুলে নিতে। কিন্তু এ-মেয়ে হয়তো এ-সব পছন্দ করবে না। একে দেখেই মনে হচ্ছে, এর পছন্দ-অপছন্দ খুব তীব্র।

নাশতার আয়োজন প্রচুর।

রুটি মাখন থেকে শুরু করে চিকেন ফ্রাই, ফিস ফ্রাই সবই আছে। বিলেতি কায়দায় দু' জনের সামনেই এক বাটি করে সালাদ। লম্বা-লম্বা গ্লাসে কমলালেবুর রস। রাজকীয় ব্যাপার! শুধু খাবারদাবার এগিয়ে দেবার জন্যে কেউ নেই। বরকত সাহেব ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'বসে আছেন কেন? শুরু করুন।'

'তিন্নির জন্যে অপেক্ষা করছি।'

'ও আসবে না।'

'আসবে না কেন?'

'খেয়ে নিয়েছে। আমার মেয়ের সঙ্গে কি আপনার কথা হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'কেমন দেখলেন আমার মেয়েকে?'

'ভালো।'

বরকত সাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। নিচু গলায় বললেন,

'ওর মধ্যে কি কোনো অস্বাভাবিকতা আপনার নজরে পড়েছে?"

'না।'

'ভালো করে ভেবে বলুন।'

'ভেবেই বলছি। তবে পারিপার্শ্বিকে কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার লক্ষ করছি।'

'যেমন?'

'যেমন আপনার গাছগুলিতে কোনো পাখি নেই। একটি পাখিও আমার চোখে পড়ে নি।'

বরকত সাহেব চমকালেন না। তার মানে তিনি ব্যাপারটি আগেই লক্ষ করেছেন। আগে লক্ষ না-করলে নিশ্চয়ই চমকাতেন। অর্থাৎ মানুষটির পর্যবেক্ষণ-শক্তি ভালো। এই জিনিসটি চট করে কারোর চোখে পড়বে না। মিসির আলি বললেন, 'এ ছাড়াও অন্য একটি ব্যাপার লক্ষ করেছি।'

'বলুন শুনি।'

'আপনার বাড়ির কাজের লোকটি, যার নাম নাজিম, সে অত্যন্ত ভীত ও শঙ্কিত।'

'এটা এমন কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। এ-বাড়ির সবাই আমাকে ভয় করে।'

'কেন?'

'পৃথিবীর নিয়মই হচ্ছে ক্ষমতাবানকে ভয় করা। আমি ক্ষমতাবান।'

'ক্ষমতাটা কিসের?'

'অর্থের। অর্থের ক্ষমতাই সবচেয়ে বড় ক্ষমতা।'

'আপনার ধারণা, যেহেতু আপনার প্রচুর টাকা, সেহেতু সবাই আপনাকে ভয় করে?'

'অন্য কারণও আছে, আমি বেশ বদমেজাজি।'

'আপনার মেয়ে তিন্নি, সেও কি বদমেজাজি?'

বরকত সাহেবের ভ্রু কুঁচকে উঠল। তিনি জবাব দিতে গিয়েও দিলেন না। হালকা স্বরে বললেন, 'চা নিন। নাকি কফি খেতে চান?'

'চা খাব। আপনি বলেছিলেন ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছেন। এখন করেন কী?'

'কিছুই করি না। এখন আমি ঘরেই থাকি।'

'এবং কাউকে ঘর থেকে বেরুতে দেন না।'

'এ-কথা বলছেন কেন?'

'কারণ দারোয়ান আমাকে বেরুতে দেয় নি।'

'ওকে বলে দিয়েছি যেন গেট না খোলে।'

'কেন বলেছেন?'

'তিন্নির জন্যে বলেছি। আমার ভয়, গেট খোলা পেলেই সে চলে যাবে। আমি আর কোনোদিন তাকে ফিরে পাব না।'

'সে কি এর আগে কখনো গিয়েছে?'

'না।'

'তাহলে কী করে আপনার ধারণা হল, গেট খোলা পেলে সে চলে যাবে?'

'আমাকে আপনি এত প্রশ্ন করছেন কেন? আমাকে প্রশ্ন করবার জন্যে তো আপনাকে আনি নি। আপনাকে আনা হয়েছে আমার মেয়ের জন্যে।'

'আনা হয়েছে বলাটা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না। আমি নিজ থেকে এসেছি।'

বরকত সাহেব ক্লান্ত গলায় বললেন, 'আপনি দয়া করে আমার মেয়ের ঘরে চলে যান। ওর সঙ্গে কথা বলুন।'

'ও কি তার ঘরে একা থাকে?'

'হ্যাঁ, একাই থাকে।'

মিসির আলি উঠে দাঁড়াতেই বরকত সাহেব বললেন, 'প্লীজ, একটি কথা মন দিয়ে শুনুন। এমন কিছুই করবেন না, যাতে আমার মেয়ে রেগে যায়।'

'এ কথা বলছেন কেন?'

'ও রেগে গেলে মানুষকে কষ্ট দেয়।'

'কীভাবে কষ্ট দেয়?'

'নিজেই বুঝবেন, আমার বলার দরকার হবে না।'

তিন্নির ঘরটি বিরাট বড়। এক পাশে ছোট্ট একটি কালো রঙের খাটে সুন্দর একটি বিছানা পাতা। নানান ধরনের খেলনায় ঘর ভর্তি। বেশির ভাগ খেলনাই হচ্ছে তুলার তৈরী জীবজন্তু। শিশুদের ঘর যেমন অগোছাল থাকে, এ ঘরটি সে-রকম নয়। বেশ গোছানো ঘর। মিসির আলি দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ তিন্নিকে দেখলেন। মেয়েটি গভীর মনোযোগে ছবি আঁকছে। এক বারও তাকাচ্ছে না তাঁর দিকে। মিসির আলি বললেন, 'তিন্নি, ভেতরে আসব?'

তিন্নি ছবি থেকে মুখ না-তুলেই বলল, 'আসতে ইচ্ছে হলে আসুন।'

'ইচ্ছে না হলে আসব না?'

তিন্নি কিছু বলল না। মিসির আলি ভেতরে ঢুকলেন। হাসিমুখে বললেন, 'বসব কিছুক্ষণ তোমার ঘরে?'

'বসার ইচ্ছে হলে বসুন।'

তিনি বসলেন। হাসিমুখে বললেন, 'কিসের ছবি আঁকছ?'

'গাছের।'

'দেখি কেমন ছবি?'

'দেখতে ইচ্ছে হলে দেখুন।'

তিন্নি তার ছবি এগিয়ে দিল। মিসির আলি অবাক হয়ে দেখলেন, অদ্ভুত সব গাছের ছবি আঁকা হয়েছে। গাছগুলিতে কোনো পাতা নেই। অসংখ্য ডাল। ডালগুলি লতানো। কিছু কিছু লতা আবার চুলের বেণীর মতো পাকানো।

'সুন্দর হয়েছে তো গাছের ছবি!'

'আপনার ভালো লাগছে?'

'হ্যাঁ।'

'এ-রকম গাছ কি আপনি এর আগে কখনো দেখেছেন?'

'না, দেখি নি।'

'তাহলে আপনি কেন জিজ্ঞেস করলেন না—কী করে আমি না-দেখে এমন সুন্দর গাছের ছবি আঁকলাম?'

'শিশুরা মন থেকে অনেক জিনিস আঁকে।'

তিন্নি হাসল। তিনি প্রথম মেয়েটির মুখে হাসি দেখলেন। তিন্নি হাসতে–হাসতে ভেঙে পড়ছে। মিসির আলি বললেন, 'তুমি এত হাসছ কেন?'

'হাসতে ভালো লাগছে, তাই হাসছি।'

তিনি নিজেও হাসলেন। হাসতে–হাসতেই বললেন, 'আমি শুনেছি তুমি সব প্রশ্নের উত্তর জান।'

'কে বলেছে? বাবা?'

'হ্যাঁ। তুমি কি সত্যি–সত্যি জান?'

'জানি। পরীক্ষা করতে চান?'

'হ্যাঁ, চাই। বল তো নয়–এর বর্গমূল কত?'

'তিন।'

'পাঁচের বর্গমূল কত সেটা জান?'

তিন্নি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'আমি জানি না।'

'আচ্ছা দেখি, এটা পার কি না। পেনিসিলিন যিনি আবিষ্কার করেছেন, তাঁর নাম কি?'

'স্যার আলেকজান্ডার ফ্লেমিং।'

'হ্যাঁ, হয়েছে। এখন বল দেখি তাঁর স্ত্রীর নাম কি?'

'আমি জানি না।'

'সত্যি জান না?'

'না, আমি জানি না।'

'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত সালে নবেল প্রাইজ পেয়েছেন জান?'

'জানি। উনিশ শ' তের সালে।'

'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোট মেয়ের নাম জান?'

'জানি না।'

মিসির আলি হাসতে লাগলেন। তিন্নি ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে রইল। গম্ভীর স্বরে বলল, 'আপনি হাসছেন কেন?'

'আমি হাসছি, কারণ তুমি কীভাবে সব প্রশ্নের জবাব দাও, তা বুঝতে পারছি।'

'তাহলে বলুন, কীভাবে সব প্রশ্নের জবাব দিই।'

'আমি লক্ষ করলাম, যে–সব প্রশ্নের উত্তর আমি জানি, শুধু সে–সব প্রশ্নের উত্তরই তুমি জান। যেমন আমি জানি নয়ের বর্গমূল তিন। কাজেই তুমি বললে তিন। কিন্তু পাঁচের বর্গমূল কত তা তুমি বলতে পারলে না, কারণ আমি নিজেও তা জানি না। আলেকজান্ডার ফ্লেমিংয়ের স্ত্রীর নাম তুমি বলতে পারলে না, কারণ আমি তাঁর স্ত্রী নাম জানি না। ঠিক এইভাবে..........।'

'থাক, আর বলতে হবে না।'

তিন্নি তাকিয়ে আছে। তার মুখে কোনো হাসি নেই! সমস্ত চেহারায় কেমন একটা কঠিন ভাব চলে এসেছে, যা এত অল্পবয়সী একটি বাচ্চার চেহারার সঙ্গে ঠিক মিশ খাচ্ছে না। মিসির আলি সহজ স্বরে বললেন, 'তুমি মানুষের মনের কথা টের পাও। টের পাও বলেই জানা প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পার। এটা এক ধরনের টেলিপ্যাথিক ক্ষমতা। কেউ–কেউ এ–ধরনের ক্ষমতা নিয়ে জন্মায়।'

তিন্নি শীতল গলায় বলল, 'আপনি খুব বুদ্ধিমান।'
মিসির আলি বললেন, 'হ্যাঁ, আমি বুদ্ধিমান।'
'আপনি বুদ্ধিমান এবং অহঙ্কারী।'
'যারা বুদ্ধিমান, তারা সাধারণত অহঙ্কারী হয়। এটা দোষের নয়। যে-জিনিস তোমার নেই, তা নিয়ে তুমি যখন অহঙ্কার কর, সেটা হয় দোষের।'
'আপনি এখানে কেন এসেছেন?'
'তোমাকে সাহায্য করবার জন্যে এসেছি।'
'কিসের সাহায্য?'
'আমি এখনো ঠিক জানি না। সেটাই দেখতে এসেছি। হয়তো তোমার কোনো সাহায্যের প্রয়োজন নেই। তোমার বাবা শুধু-শুধু ভয় পাচ্ছেন।'
'আমি ডাক্তার পছন্দ করি না।'
'আমি ডাক্তার নই।'
'আপনি এখন আমার ঘর থেকে চলে যান। আমার আর আপনাকে ভালো লাগছে না।'
'আমার কিন্তু তোমাকে ভালো লাগছে। খুব ভালো লাগছে।'
'আপনি এখন যান।'
মিসির আলি উঠে দাঁড়ালেন। তিন্নি বলল, 'দাঁড়িয়ে আছেন কেন? চলে যান।'
তিন্নি কথা ক'টি বলার সঙ্গে-সঙ্গে মিসির আলি তাঁর মাথার ঠিক মাঝখানে এক ধরনের যন্ত্রণা বোধ করলেন। হঠাৎ মাথাটা ঘুরে উঠল, বমিবমি ভাব হল, আর সেই সঙ্গে তীব্র ও তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা। যেন কেউ একটি ধারাল ব্লেড দিয়ে আচমকা মাথাটা দু'ফাঁক করে ফেলেছে। মিসির আলি বুঝতে পারছেন, তিনি জ্ঞান হারাচ্ছেন। পৃথিবী তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। চোখের সামনে দেখছেন সাবানের বুদবুদের মতো বুদবুদ। জ্ঞান হারাবার ঠিক আগমুহূর্তে ব্যথাটা কমে গেল। সমস্ত শরীরে এক ধরনের অবসাদ। ঘুমে চোখ জড়িয়ে যাচ্ছে। মিসির আলি তাকালেন তিন্নির দিকে। মেয়েটির ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি। সহজ হাসি নয়, উপহাসের হাসি। মিসির আলি দীর্ঘ সময় চুপ থেকে বললেন, 'এটা তো তুমি ভালোই দেখালে।'
তিন্নি বলল, 'এর চেয়েও ভালো দেখাতে পারি।'
'তা পার। নিশ্চয়ই পার। তুমি কি রাগ হলেই এ রকম কর?'
'হ্যাঁ, করি।'
'আমি তোমাকে রাগাতে চাই না।'
'কেউ চায় না।'
'সবাই তোমাকে খুশি রাখতে চায়?'
'হ্যাঁ।'
'কিন্তু তবু তুমি প্রায়ই রেগে যাও, তাই না?'
'হ্যাঁ, যাই।'
'রাগটা সাধারণত কতক্ষণ থাকে?'
'ঠিক নেই। কখনো অনেক বেশি সময় থাকে।'
'আচ্ছা তিন্নি, মনে কর এখানে দু' জন মানুষ আছে। তুমি রাগ করলে এক জনের

উপর, তাহলে ব্যথাটা কি সেই জনই পাবে। না দু' জন একত্রে পাবে?'

'যার উপর রাগ করেছি সে-ই পাবে, অন্যে পাবে কেন? অন্য জনের উপর তো আমি রাগ করি নি।'

'তাও তো ঠিক। এখন কি আমার উপর তোমার রাগ কমেছে?'

'হ্যাঁ, কমেছে।'

'তাহলে আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাস তো, যাতে আমি বুঝতে পারি তোমার রাগ সত্যি সত্যি কমেছে!'

তিন্নি হাসল। মিসির আলি বললেন, 'আমি কি আরো খানিকক্ষণ বসব?'

'বসার ইচ্ছা হলে বসুন!'

মিসির আলি বসলেন। একটি সিগারেট ধরালেন। মেয়েটি নিজের মনে ছবি আঁকছে। সেই গাছের ছবি, লতানো ডাল, পত্রহীন বিশাল বৃক্ষ। মিসির আলি ঠিক করলেন, তিনি একটি পরীক্ষা করবেন। এই মেয়েটি যেভাবেই হোক, মস্তিষ্কের কোষে সরাসরি চাপ প্রয়োগ করতে পারে। উচ্চ পর্যায়ের একটি টেলিপ্যাথিক ক্ষমতা। ছোট্ট একটি মেয়ে, অথচ কত সহজে মানুষের মাথায় ঢুকে যাচ্ছে। এটাকে বাধা দেবার একমাত্র উপায় সম্ভবত মেয়েটিকে মাথার ভেতর ঢুকতে না-দেয়া। সেটা করা যাবে তখনই, যখন নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ফেলা যাবে। সমস্ত চিন্তা ও ভাবনা কেন্দ্রীভূত করা হবে একটি বিন্দুতে।

মিসির আলি ডাকলেন, 'তিন্নি।'

তিন্নি মুখ না তুলেই বলল, 'কি?'

'তুমি আমার মাথার ব্যথাটা আবার তৈরি কর তো!'

'কেন?'

'আমি একটা ছোট্ট পরীক্ষা করব।'

'কী পরীক্ষা?'

'আমি দেখতে চাই এই ব্যথার হাত থেকে বাঁচার কোনো উপায় আছে কি না।'

'উপায় নেই।'

'সেটাই দেখব। তবে তিন্নি একটি কথা, ব্যথাটা তুমি তৈরি করবে খুব ধীরে। এবং যখনই আমি হাত তুলব, তুমি ব্যথাটা কমিয়ে ফেলবে।'

'আপনি খুব অদ্ভুত মানুষ।'

'আমি মোটেই অদ্ভুত মানুষ নই। আমি একজন যুক্তিবাদী মানুষ। আমি এসেছি তোমাকে সাহায্য করতে।'

'আমার কোনো সাহায্য লাগবে না।'

'হয়তো লাগবে না। তবু আমি তোমার ব্যাপারটা পুরোপুরি বুঝতে চাই। এখন তুমি ব্যথা তৈরি কর তো! খুব ধীরে-ধীরে।'

তিন্নি মাথা তুলে সোজা হয়ে বসল। তার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হচ্ছে। ঠোঁট বেঁকে যাচ্ছে। বাঁকা ঠোঁট খুব হালকাভাবে কাঁপছে।

মিসির আলি চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। তিনি তাঁর সমস্ত মন-প্রাণ একটি ব্যাপারে কেন্দ্রীভূত করে ফেললেন। খুব ছোটবেলায় তিনি একটি সাপের মুখোমুখি হয়েছিলেন। এখন তিনি ভাবছেন সেই সাপটির কথা। সাপটির হলুদ গা ছিল চক্রকাটা।

বুকে ভর দিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়ে আসছিল। তাঁকে দেখেই সে থমকে গেল। ঘন-ঘন তার চেরা জিব বের করতে লাগল। মিসির আলি এখন আর কিছুই ভাবছেন না। পৃথিবীতে ঠিক এই মুহূর্তে সাপের চেরা জিব ছাড়া অন্য কিছুই নেই। তিনি জীবিত কি মৃত, সেই বোধও তাঁর নেই। তিনি কল্পনায় দেখছেন হলুদ রঙের কুৎসিত সাপের চেরা জিব বাতাসে কাঁপছে।

মিসির আলির চোখের দৃষ্টি ঘোলা হয়ে আসছে। কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম। তিনি ঘনঘন নিঃশ্বাস ফেলছেন। তিন্নি অবাক হয়ে মিসির আলিকে দেখছে। আশ্চর্য ব্যাপার, এই মানুষটিকে সে কিছু করতে পারছে না! এতক্ষণে ব্যথায় তাঁর ছটফট করা উচিত ছিল, কিন্তু লোকটি এখনো হাত তুলছে না। এর মানে কি এই যে, সে ব্যথা পাচ্ছে না? তা কী করে সম্ভব! তিন্নি ব্যথার পরিমাণ অনেক দূর বাড়িয়ে দিল। তার নিজের মাথাই এখন ঝিমঝিম করছে। মিসির আলি হাত তুললেন। তিনি পরীক্ষায় পাশ করেছেন। মিসির আলি দুর্বল গলায় বললেন, 'তিন্নি, আমি এখন যাই। তোমার সঙ্গে পরে কথা হবে।'

তিন্নি জবাব দিল না। অবাক চোখে তাঁকে দেখতে লাগল।

মিসির আলি বললেন, 'তিন্নি, আমি কি তোমার আঁকা ছবিগুলি নিয়ে যেতে পারি?'

'কেন?'

'আমি নিজের ঘরে বসে সময় নিয়ে ছবিগুলি দেখব।'

'তাতে কী হবে?'

'তোমাকে বুঝতে সুবিধা হবে।'

তিন্নি তাঁর হাতে একগাদা ছবি তুলে দিল। মিসির আলি সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলেন। ক্লান্তিতে তাঁর পা ভেঙে আসছে। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। তিনি পেছনে ফিরলেন। তিন্নি ছাদে উঠে গেছে। তার মাথার উপর চক্রাকারে কয়েকটি পাখি উড়ছে।

আশেপাশে পাখি নেই। কিন্তু এই মেয়েটির মাথার উপর পাখি উড়ছে কেন? শালিক পাখি। কিচমিচ শব্দ করছে। মেয়েটিকে দেখে মনে হল, সেও কিছু বলছে পাখিদের। এত রহস্য কেন? মিসির আলি নিজের ঘরের দিকে এগুলেন। তাঁর মন ভারাক্রান্ত। তিনি নিজের ভিতর এক ধরনের অস্থিরতা বোধ করলেন।

৪

সারাটা দিন তিন্নি ছাদে কাটাল।

এক বার এ-মাথায় যাচ্ছে, আরেক বার ও-মাথায়। মাঝে-মাঝে বিড়বিড় করে নিজের মনে কথা বলছে এবং হাসছে। শীতের দিনের রোদ দুপুরের দিকে খুব বেড়ে যায়। সারা গা চিড়বিড় করে। কিন্তু মেয়েটি নির্বিকার। হাঁটছে তো হাঁটছেই। রহিমা দুপুরে ছাদে এসে ভয়ে-ভয়ে বলেছিল, 'ভাত দিছি, খেতে আসেন।' তিন্নি কোনো কথা বলে নি। রহিমা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেছে। তিন্নি বুঝতে পারছে, সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় রহিমা মনে মনে বলছে, 'পিশাচ, পিশাচ। মানুষ না, পিশাচ।' তিন্নির

খানিকটা রাগ লাগছিল। কিন্তু সে সামলে নিল। সব সময় রাগ করতে ভালো লাগে না। তার নিজেরও কষ্ট হয়। চোখ জ্বালা করে।

রহিমা চলে যাবার পরপরই বরকত সাহেব এলেন। তিনি কোনো কথা বললেন না। চিলেকোঠার কাছে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তিন্নির মন-খারাপ হয়ে গেল। বাবা আগে তাকে ভয় পেতেন না। এখন পান। খুবই ভয় পান। অথচ সে বাবাকে এক দিনও ব্যথা দেয় নি। কোনো দিন দেবেও না।

'তিন্নি।'

'কি বাবা?'

'ভাত খেতে এস।'

'আমার খিদে নেই বাবা। যেদিন খুব রোদ ওঠে, সেদিন আমার খিদে হয় না।'

বরকত সাহেব ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেললেন। সেই নিঃশ্বাসের শব্দ শুনে তিন্নির আরো মন-খারাপ হয়ে গেল।

'তিন্নি।'

'কি বাবা?'

'যে-ভদ্রলোক এসেছেন, তাঁর সঙ্গে কি তোমার কথা হয়েছে?'

'হ্যাঁ, হয়েছে।'

'তাঁকে তোমার কেমন লেগেছে?'

'ভালো।'

'তাহলে তাঁকে ব্যথা দিলে কেন? আমি কিছুক্ষণ আগে একতলায় গিয়েছিলাম, ভদ্রলোক মড়ার মতো পড়ে আছেন।'

তিন্নি জবাব দিল না। বরকত সাহেব বললেন, 'তুমি জান, তিনি কী জন্যে এসেছেন?'

'জানি। তিনি আমাকে বলেছেন।'

'তুমি লক্ষ্মী মেয়ের মতো তোমার যত কথা আছে, সব ওঁকে বলবে। কিছুই লুকোবে না।'

'আচ্ছা।'

'তোমার স্বপ্নের কথাও বলবে।'

'তিনি বিশ্বাস করবেন না, হাসবেন।'

'না, হাসবেন না। উনি একজন অত্যন্ত বুদ্ধিমান মানুষ। তোমার সব কথা উনি বুঝবেন। আমি যা বুঝতে পারি নি, উনি তা পারবেন।'

তিন্নি বলল, 'উনি কি গাছের মতো জ্ঞানী?'

বরকত সাহেব মৃদুস্বরে বললেন, 'তোমার গাছের ব্যাপারটা আমি জানি না তিন্নি। কাজেই বলতে পারছি না গাছের মতো জ্ঞানী কি না। আমার ধারণা, গাছের জীবন থাকলেও তা খুব নিম্ন পর্যায়ের। জ্ঞান-বুদ্ধির ব্যাপার সেখানে নেই।'

'বাবা।'

'বল মা।'

'আমার স্বপ্নের ব্যাপারটা কি আজই ওঁকে বলব?'

'না, আজ না-বললেও হবে। কাল বল। আজ ভদ্রলোক ঘুমুচ্ছেন! আমার মনে হয়

সারা দিনই ঘুমুবেন! তুমি ব্যথা দেবার পর উনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।'

তিন্নি লজ্জিত হল। কিছু বলল না। বরকত সাহেব বললেন, 'তুমি কি ছাদেই থাকবে?'

'হ্যাঁ। তুমি যাও, ভাত খাও।'

বরকত সাহেব নেমে গেলেন। তিন্নি ছাদের এ–মাথা থেকে ও–মাথা পর্যন্ত আবার হাঁটতে শুরু করল। সে নেমে এল সন্ধ্যাবেলায়। তার গা ঝিমঝিম করছে। হাত–পা কাঁপছে। আজ সে আবার স্বপ্ন দেখবে। এসব লক্ষণ তার এখন চেনা হয়ে গেছে। তার ভয়ভয় করতে লাগল। স্বপ্ন এত বাজে ব্যাপার, এত কষ্টের!

ঘুমুবার আগে তিন্নি একবাটি দুধ খেল। রহিমা কমলা এনেছিল খোসা ছাড়িয়ে। তার দু'টি কোয়া মুখে দিল। রহিমা বলল, 'আমি এই ঘরে ঘুমাইব আপা?' তিন্নি কড়া গলায় বলল,—'না।' রহিমা প্রতি রাতেই এই কথা বলে। প্রতি রাতেই তিন্নি একই উত্তর দেয়। একা–থাকা তার অভ্যেস হয়ে গেছে। অথচ কেউ সেটা বুঝতে চায় না। বাবাও মাঝে মাঝে এসে বলেন, 'তুমি কি আমার সঙ্গে ঘুমুবে মা?'

একবার খুব ঝড়–বৃষ্টি হচ্ছিল। ঘন–ঘন বাজ চমকাচ্ছিল। বাবা এসে জোর করে তাকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। সে কত বার বলেছে, 'আমি কাউকেই ভয় করি না।' বাবা শোনেন নি। বাবা–মারা কোনো কথা শুনতে চায় না। মার কথা সে অবশ্যি বলতে পারে না, কারণ মার কথা তার কিছুই মনে নেই। শুধু মনে আছে মাথাভর্তি চুলের একটি গোলগাল মুখ তার মুখের উপর ঝুঁকে আছে। তিন্নি ভাবতে লাগল, মা বেঁচে থাকলে এখন কী করত? তাকে নিয়ে খুব সমস্যায় পড়ে যেত। হয়তো রোজ রাতে তার সঙ্গে ঘুমুত। কান্নাকাটি করত। আচ্ছা, সে এ রকম হল কেন? সে অন্য সব মেয়েদের মতো হল না কেন?

রহিমা এখনো দাঁড়িয়ে আছে। সরাসরি তিন্নির দিকে তাকাচ্ছে না। কিন্তু মনে–মনে চাচ্ছে তাড়াতাড়ি এ–ঘর থেকে চলে যেতে। তিন্নি ভেবে পেল না, যে চলে যেতে চাচ্ছে, সে চলে না–গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কেন?

'রহিমা।'

'জ্বি আপা?'

'তুমি আজ সকালে আমাকে পিশাচ ডাকছিলে কেন?'

রহিমার মুখ সাদা হয়ে গেল। দেখতে–দেখতে কপালে বিন্দু–বিন্দু ঘাম জমল।

'পিশাচরা কী করে রহিমা?'

রহিমা তার জবাব দিল না। তার পানির পিপাসা পেয়ে গেছে। বুক শুকিয়ে কাঠ।

'আর কোনো দিন আমাকে পিশাচ ডাকবে না।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'এখন যাও।'

আজ বোধহয় স্বপ্নটা সে দেখবেই। বিছানায় শোয়ামাত্র চোখ জড়িয়ে আসছে ঘুমে। অনেক চেষ্টা করেও চোখ মেলে রাখা যাচ্ছে না। ঘরের বাতাস হঠাৎ যেন অনেকখানি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। ঝুনঝুন শব্দ হচ্ছে দূরে। এই দূর অনেকখানি দূর। গ্রহ–নক্ষত্র ছাড়িয়ে দূরে, আরো দূরে। তিন্নি ছটফট করতে লাগল। সে ঘুমুতে চায় না, জেগে থাকতে চায়। কিন্তু ওরা তাকে জেগে থাকতে দেবে না। ঘুম পাড়িয়ে দেবে। এবং ঘুম পাড়িয়ে অদ্ভুত

সব স্বপ্ন দেখাবে।

তিন্নি সেই রাতে যে-স্বপ্ন দেখল তা অনেকটা এ রকম ঃ একটি বিশাল মাঠে সে দাঁড়িয়ে আছে। যত দূর দৃষ্টি যায় শুধু গাছ আর গাছ। বিশাল মহীরুহ। এইসব গাছের মাথা যেন আকাশ স্পর্শ করেছে। গাছগুলি অদ্ভুত। লতানো ডাল। কিছু-কিছু ডাল আবার বেণী পাকানো। তাদের গায়ের রঙ সবুজ নয়, হলুদের সঙ্গে লাল মেশানো। হালকা লাল। এইসব গাছ একসঙ্গে হঠাৎ কথা বলে উঠছে। নিজেদের মধ্যে কথা। আবার কথা বন্ধ করে দিচ্ছে। তখন চারদিকে সুনসান নীরবতা। শোনা যাচ্ছে শুধু বাতাসের শব্দ। ঝড়ের মতো শব্দে বাতাস বইছে। আবার সেই শব্দ থেমে যাচ্ছে। তখন কথা বলছে গাছেরা। কত অদ্ভুত বিষয় নিয়ে কত অদ্ভুত কথা! তার প্রায় কিছুই তিন্নি বুঝতে পারছে না। একসময় সমস্ত কথাবার্তা থেমে গেল। তিন্নি বুঝতে পারল সব ক'টি গাছ লক্ষ করছে তাকে। তাদের মধ্যে একজন বলল, 'কেমন আছ ছোট্ট মেয়ে?'

'ভালো।'

'ভয় পাচ্ছ কেন তুমি?'

'আমি ভয় পাচ্ছি না।'

'অল্প-অল্প পাচ্ছ। কোনো ভয় নেই।'

'কোনো ভয় নেই'--বলার সঙ্গে-সঙ্গে সব ক'টি গাছ একত্রে বলতে লাগল, 'ভয় নেই। কোনো ভয় নেই।'

ভয়াবহ শব্দ! কানে তালা লেগে যাবার মতো অবস্থা! তিন্নি তখন কেঁদে ফেলল, তার কান্নার সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত শব্দ থেমে গেল। কথা বলল শুধু একটি গাছ।

'ছোট্ট মেয়ে তিন্নি।'

'কি?'

'কাঁদছ কেন?'

'জানি না কেন। আমার কান্না পাচ্ছে।'

'ভয় লাগছে?'

'হ্যাঁ।'

'কোনো ভয় নেই। তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি।'

কথা শেষ হবার সঙ্গে আলো কমে এল। সব ক'টি গাছ একত্রে মাথা দুলিয়ে কী-সব গান করতে লাগল। এই গানে মনে অদ্ভুত এক আনন্দ হয়। শুধু মনে হয় কত সুখ চারদিকে। শুধু বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে। আনন্দ করতে ইচ্ছা করে।

'ঘুম আসছে ছোট্ট মেয়ে তিন্নি?'

'আসছে।'

'তাহলে ঘুমাও। আমাদের গান তোমার ভালো লাগছে?'

'লাগছে।'

'খুব ভালো?'

'হ্যাঁ, খুব ভালো।'

গাঢ় ঘুমে তিন্নির চোখ জড়িয়ে এল। স্বপ্ন শেষ হয়েছে। কিন্তু শেষ হয়েও যেন হয় নি। তার রেশ লেগে আছে তিন্নির চোখে-মুখে।

৫

মিসির আলি সারাদিন ঘুমুলেন।

দুপুরে এক বার ঘুম ভেঙেছিল। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। তিনি পরপর দু'গ্লাস ঠাণ্ডা পানি খেয়ে আবার বিছানায় গড়িয়ে পড়লেন। যখন জাগলেন, তখন বেশ রাত। বিছানার পাশে উদ্বিগ্ন মুখে বরকত সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন। এক জন বেঁটেমতো লোক আছে, হাতে স্টেথিসকোপ। নিশ্চয়ই ডাক্তার। দরজার পাশে চোখ বড়-বড় করে দাঁড়িয়ে আছে নিজাম। বোঝাই যাচ্ছে সে বেশ ভয় পেয়েছে।

বরকত সাহেব বললেন, 'এখন কেমন লাগছে?'

'ভালো।'

মিসির আলি উঠতে চেষ্টা করলেন। ডাক্তার সাহেব বললেন, 'নড়াচড়া করবেন না। চুপ করে শুয়ে থাকুন। আপনার ব্লাড প্রেশার অ্যাবনরম্যালি হাই।'

তিনি কিছু বললেন না। নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে তাঁর সময় লাগছে। ঘুমঘুম ভাবটা ঠিক কাটছে না। ডাক্তার সাহেব বললেন, 'হাই প্রেশারে কত দিন ধরে ভুগছেন?'

'প্রেশার ছিল না। হঠাৎ করে হয়েছে। যে-জিনিস হঠাৎ আসে তা হঠাৎই যায়। কি বলেন?'

'না না, খুব সাবধান থাকবেন। আমি তো ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম। বরকত সাহেবকে বলছিলাম হাসপাতালে ট্রান্সফার করবার জন্যে। সত্যি করে বলুন, এখন কি বেটার লাগছে?'

'লাগছে। আগের মতো খারাপ লাগছে না।'

ডাক্তার গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'হঠাৎ করে এ রকম হাই প্রেশার হবার তো কথা নয়। খুব আনইউজুয়েল।'

তিনি একগাদা অষুধপত্র দিলেন। যাবার সময় বারবার বললেন, 'রেস্ট দরকার। কমপ্লিট রেস্ট। কিছু খাওয়াদাওয়া করে শুয়ে পড়ুন। একটা ঘুমের অষুধ দিয়েছি। খেয়ে টানা ঘুম দিন। ভোরে এসে আমি আবার প্রেশার মাপব।'

বরকত সাহেব বললেন, 'আপনি তো সারা দিন কিছু খান নি।'

'এখন খাব। গোসল সেরে খেতে বসব। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। আপনি কি দয়া করে খাবারটা আমার ঘরে পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন?'

'নিশ্চয়ই করব। আপনার সঙ্গে আমি কিছু কথা বলতে চেয়েছিলাম।'

মিসির আলি বললেন, 'আজ না, আমি আগামীকাল কথা বলব।'

'ঠিক আছে, আগামীকাল।'

বরকত সাহেব ঘর থেকে বেরুতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালেন। নিচু গলায় বললেন, 'আপনার কষ্ট হল খুব। আমি লজ্জিত।'

'আপনার লজ্জিত হবার কিছুই নেই। আপনি এ নিয়ে ভাববেন না।'

দীর্ঘ স্নানের পর মিসির সাহেবের বেশ ভালোই লাগল। ক্লান্তির ভাব নেই। মাথায় সূক্ষ্ম যন্ত্রণা আছে, তবে তা সহনীয়। এবং মনে হচ্ছে গরম এক কাপ চা খেলে সেরে যাবে।

খাবার নিয়ে এল নিজাম। মিসির আলি লক্ষ করলেন, নিজাম তাঁকে বারবার আড়চোখে দেখছে। তার চোখে সীমাহীন কৌতূহল। সম্ভবত সে কিছু বলতে চায়, সাহস পাচ্ছে না। মিসির আলি ভারি গলায় ডাকলেন, 'নিজাম।'

'জ্বি স্যার?'

'তুমি কেমন আছ?'

'জ্বি স্যার, ভালো।'

'তিন্নি তোমাকে কখনো মাথাব্যথা দেয় নি?'

নিজাম চমকে উঠল। কিন্তু নিজেকে সামলে নিল। সহজভাবে ভাত-তরকারি এগিয়ে দিতে লাগল।

'কথা বলছ না কেন নিজাম?'

'কী বলব স্যার?'

'ঐ যে জিজ্ঞেস করলাম, তিন্নি তোমাকে মাথাব্যথা দেয় কি না। আমার ধারণা, সবাইকেই মাঝে-মাঝে দেয়। ঠিক বলছি না?'

'জ্বি স্যার, ঠিক বলছেন।'

'তোমাকেও দিয়েছে?'

'জ্বি স্যার।'

'ক' বার দিয়েছে?'

'অনেক বার।'

'তবু তুমি এ-বাড়িতে পড়ে আছ কেন? চলে যাচ্ছ না কেন?'

নিজাম জবাব দিল না। মিসির আলি বললেন, 'আমি ওর অসুখ ভালো করবার জন্যে এসেছি। কাজেই ওর সম্পর্কে সব কিছু আমার জানা দরকার। তোমরা যদি না বল, তাহলে আমি জানব কী করে?'

'কী জানতে চান স্যার?'

'মানুষকে কষ্ট দেবার এই ব্যাপারটা ও কবে থেকে শুরু করেছে?'

'তিন বছর ধরে হচ্ছে।'

'প্রথম কীভাবে এটা শুরু হল তোমার মনে আছে?'

'জ্বি, আছে। রহিমা তিন্নি আপার জন্যে দুধ নিয়ে গিয়েছিল। তিন্নি আপা খাচ্ছিল না। তখন রাগের মাথায় রহিমা তিন্নি আপাকে একটা চড় দেয়। তার পরই শুরু হয়। রহিমা চিৎকার করতে থাকে, গড়াগড়ি করতে থাকে। ভয়ংকর কষ্ট পায়।'

'রহিমা কি এখনো কাজ করে এ-বাড়িতে?'

'জ্বি।'

'এ-রকম কষ্ট কি সে আরো পেয়েছে?'

'জ্বি স্যার।'

'তবু সে এ বাড়িতে পড়ে আছে? চলে যায় না কেন?'

নিজাম জবাব দিল না। মিসির আলি লক্ষ করলেন, এই প্রশ্নটির জবাব নিজাম এড়িয়ে যাচ্ছে। এত কষ্টের পরও কাজের মানুষগুলি এখানেই আছে। তার কী কারণ হতে পারে? হয়তো অনেক বেশি বেতন দেয়া হচ্ছে, যে-কারণে থাকছে। কিন্তু এটা বলতে কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়।

'তুমি বেতন কত পাও নিজাম?'

'জ্বি, মাসে দেড়শ' টাকা আর কাপড়চোপড়।'

মিসির আলির মনে হল, এটা এমন কোনো বেশি বেতন নয়। কাজেই এরা যে এখানে পড়ে আছে, নিশ্চয়ই তার কারণ অন্য।

'নিজাম।'

'জ্বি স্যার?'

'তুমি কি আমাকে চা খাওয়াতে পার?'

'নিয়ে আসছি স্যার।'

'আর শোন, রহিমার সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই। ওকে পেলে বলবে আমার কথা।'

'জ্বি আচ্ছা।'

নিজাম চট করে চা নিয়ে এল। লোকটি করিৎকর্মা। চা-টা হয়েছেও চমৎকার। চুমুক দিতে-দিতেই মাথার যন্ত্রণা প্রায় সেরে গেল।

'চিনি লাগবে স্যার?'

'না, লাগবে না। খুব ভালো চা হয়েছে নিজাম। বস তুমি। টুলটায় বস, কথা বলি।

নিজাম বসল না। জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মিসির আলি বললেন, 'তিন্নির মধ্যে আর কি অস্বাভাবিক ব্যাপার তুমি লক্ষ করেছ?'

নিজাম মাথা চুলকাতে লাগল। মিসির সাহেব বললেন, 'ভালো করে চিন্তা করে বল। সে এমন কিছু কি করে, যা আমরা সাধারণত করি না?'

'তিন্নি আপা রোদের মধ্যে বসে থাকতে ভালবাসেন।'

'তাই নাকি?'

'জ্বি স্যার। জ্যৈষ্ঠ মাসের রোদেও তিন্নি আপা সারা দিন ছাদে বসে থাকেন।'

'এ ছাড়া আর কী করে?'

'আর কিছু না।'

'মনে করতে চেষ্টা কর। হয়তো কোনো ছোট ব্যাপার। তোমার কাছে হয়তো এর কোনো মূল্যই নেই, কিন্তু আমার কাছে তা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। বুঝতে পারছ আমার কথা?'

'জ্বি স্যার।'

রাত একটার দিকে মিসির আলি তিন্নির আঁকা ছবিগুলি নিয়ে বসলেন। সব মিলিয়ে পাঁচটি ছবি। প্রতিটি ছবিই গাছ বা গাছজাতীয় কিছুর। বেশির ভাগ গাছ লতানো। গাছের রঙ হলুদ থেকে লালের মধ্যে। সবুজের কিছুমাত্র ছোঁয়া নেই। তিন্নি হলুদ এবং লাল রঙ দিয়ে ছবি আঁকল কেন? সম্ভবত তার কাছে সবুজ রঙ ছিল না। অবশ্যি শিশুরা অদ্ভুত রঙ ব্যবহার করতে ভালবাসে। তাঁর এক ভাগনী মানুষ আঁকে আকাশি নীল রঙে। মানুষের চোখে দেয় গাঢ় লাল রঙ।

অবশ্যি এই পাঁচটি ছবি শিশুর আঁকা ছবি বলে মনে হচ্ছে না। শিশুরা এত চমৎকার আঁকে না। একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে ঝড় হচ্ছে। প্রচণ্ড ঝড়। কোনো শিশু, তা সে যত প্রতিভাবান শিশুই হোক, এ-রকম নিখুঁত ঝড়ের ছবি আঁকতে পারবে না।

ছবি দেখে মনে হয়, ঝড়ের সময়টায় এই ছবির শিল্পী উপস্থিত ছিল। হাওয়ার যে ঘূর্ণি উঠেছে, তাও সে লক্ষ করেছে। মিসির আলি সাহেব মনে মনে একটি থিওরি দাঁড় করাতে চেষ্টা করলেন। তিনি ভাবতে চেষ্টা করলেন, ছবিগুলি কোনো শিশুর মনগড়া ছবি নয়, কল্পনার ছবি নয়। এই গাছ, এই ঝড়, বাতাসের এই ঘূর্ণি ছবির শিল্পী দেখেছে।

যদি তাই হয়, তাহলে এ গাছগুলি কি পৃথিবীর? পৃথিবীর গাছে সবুজ রঙ থাকবে। ছায়াতে জন্মানো কিছু কিছু হলুদ গাছ তিনি দেখেছেন, কিন্তু এ রকম কড়া সূর্যের আলোয় হলুদ গাছ তিনি দেখেছেন বলে মনে করতে পারলেন না।

প্রতিটি ছবিতে দু'টি সূর্য। গন্‌গনে সূর্য। এর মানে কী? পৃথিবীর কোনো ছবিতে দু'টি সূর্য থাকবে না। তাহলে কি এই থিওরি দাঁড় করানো যায় যে, ছবিতে যে-দৃশ্য দেখা যাচ্ছে তা অন্য কোনো গ্রহের? তা কেমন করে হয়?

তিন্নি অন্য কোনো গ্রহের মেয়ে, এই যুক্তি হাস্যকর। তিন্নি পৃথিবীরই মেয়ে, এতে কোনো সন্দেহ থাকার অবকাশ নেই। এই গ্রহের মেয়ে হয়ে বাইরের একটি গ্রহের ছবি সে কেন আঁকছে? কীভাবে আঁকছে?

মিসির আলি গম্ভীর মুখে দ্বিতীয় সিগারেটটি ধরালেন। সব কেমন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। ছকে ফেলা যাচ্ছে না।

তিনি সিগারেট টানতে টানতে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন এবং ভাবতে চেষ্টা করলেন--এইসব অল্পবয়সী একটি মেয়ের কল্পনার ছবি, এর বেশি কিছু নয়। মেয়েটির কল্পনাশক্তি খুব উচ্চ পর্যায়ের, যার জন্যে সে এত চমৎকার কিছু ছবি আঁকতে পারছে। ভোরবেলায় তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে।

মিসির আলির ঠাণ্ডা লাগছে। হু-হু করে বইছে উত্তুরে হাওয়া। কিন্তু এই ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে থাকতে বেশ লাগছে। চারদিক খুব চুপচাপ। আকাশে চাঁদ থাকায় চমৎকার জ্যোৎস্না হয়েছে। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না ভেঙে-ভেঙে পড়ছে। কী অপূর্ব একটি দৃশ্য! মিসির আলি নিজের অজান্তেই হাঁটতে-হাঁটতে একটা ঝাঁকড়া জামগাছের নিচে গিয়ে দাঁড়ালেন। ঠিক তখন অদ্ভুত একটা ব্যাপার হল। তিনি স্পষ্ট শুনলেন, তিন্নি বলছে, 'কি, আপনার ঘুম আসছে না?' তিনি আশেপাশে কাউকেই দেখলেন না। দেখার কথাও নয়। এই নিশিরাত্রিতে তিন্নি নিশ্চয়ই নিচে নেমে আসে নি। তিনি বললেন, 'কে কথা বলল?'

মিসির আলি খিলখিল হাসির শব্দ শুনলেন। এর মানে কী? তিন্নির হাসি কোত্থেকে ভেসে আসছে? মিসির আলি বললেন, 'তুমি তিন্নি?'

'হ্যাঁ।'

'কোত্থেকে কথা বলছ?'

'আপনি এত বুদ্ধিমান, অথচ কোত্থেকে কথা বলছি, বুঝতে পারছেন না?'

'না, বুঝতে পারছি না। তুমি কোথায়?'

'আমি আমার ঘরেই আছি। কোথায় আবার থাকব?'

মিসির আলি একটা বড় ধরনের চমক পেলেন। মেয়েটি তার ঘর থেকেই কথা বলছে। সেইসব কথা তিনি পরিষ্কার শুনছেন। টেলিপ্যাথিক যোগাযোগ। অদ্ভুত তো!

মেয়েটিও নিশ্চয়ই তাঁর কথা শুনতে পাচ্ছে। মেয়েটির সঙ্গে কথা বলার জন্যে

নিশ্চয়ই চেঁচাতে হবে না। মনে-মনে ভাবলেই তিন্নি বুঝবে। মিসির আলি কথা বলা শুরু করলেন। এ-রকম অদ্ভুত কথোপকথন তিনি আগে কখনো করেন নি।

মিসির আলি : কেমন আছ তিন্নি?

তিন্নি : ভালো।

মিসির আলি : এখনো জেগে আছ?

তিন্নি : হ্যাঁ, আছি।

মিসির আলি : কেন?

তিন্নি : আমারও আপনার মতো ঘুম আসছে না।

মিসির আলি : রোজই জেগে থাক?

তিন্নি : মাঝে-মাঝে থাকি।

মিসির আলি : তোমার ছবিগুলি বসে-বসে দেখলাম।

তিন্নি : আমি জানি।

মিসির আলি : খুব সুন্দর হয়েছে।

তিন্নি : তাও জানি।

মিসির আলি : এগুলি কোথাকার ছবি?

তিন্নি : বলব না।

মিসির আলি : কেন, বলতে অসুবিধা কি?

তিন্নি : বলতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

মিসির আলি : ছবিতে দেখলাম দু'টি সূর্য।

তিন্নি : হ্যাঁ, দু'টি।

মিসির আলি : দু'টি কেন?

তিন্নি : দু'টি থাকলে আমি কী করব? একটি আঁকব?

কথাবার্তা এই পর্যন্তই। মিসির আলি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। কিন্তু আর কোনো যোগাযোগ হল না। তিনি বেশ কয়েক বার ডাকলেন, 'তিন্নি তিন্নি।' কোনো জবাব নেই।

মিসির আলি নিজের বিছানায় ফিরে এলেন। ঘুম চটে গিয়েছে। শুয়ে থাকার কোনো মানে হয় না। তিনি আবার ছবি নিয়ে বসলেন। যদি নতুন কিছু বের হয়ে আসে। যে-মাটির উপর গাছগুলি দাঁড়িয়ে আছে, তার রঙ কী? আকাশের রঙ কী? গাছপালার ফাঁকে কোনো কীটপতঙ্গ আছে কি? যদি থাকে, তাদের রঙ কী?

'আপনি এখনো জেগে আছেন?'

তিনি চমকে উঠলেন। তিন্নি আবার কথা বলা শুরু করেছে।

'হ্যাঁ, এখনো জেগে আছি। তোমার ছবি দেখছি।'

'কেন দেখছেন? এক বার দেখাও যা এক শ' বার দেখাও তা।'

'উঁহু, তুমি ঠিক বললে না। প্রথম বার অনেক কিছু চোখে পড়ে না।'

'আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন।'

'ঘুম আসছে না।'

'আমি কিন্তু আপনাকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারি।'

'পার নাকি?'

'হ্যাঁ, পারি। দেব?'

'না, তার দরকার নেই। তোমার সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগছে।'

'তাহলে কথা বলুন।'

'আমার সঙ্গে তুমি যেভাবে কথা বলছ, অন্যদের সঙ্গেও কি সেইভাবে কথা বল।

'না।'

'কেন বল না।'

'বলতে ইচ্ছা করে না।'

মিসির আলি চেষ্টা করতে লাগলেন আজেবাজে প্রশ্নের ফাঁকে-ফাঁকে দু'-একটি জরুরি প্রশ্ন করে খবরাখবর বের করে আনতে। কিন্তু মেয়েটি খুব সাবধানী। সে অনায়াসে ফাঁদ কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে। তবু এর মধ্যে একটি হচ্ছে—তিন্নি শুধু মানুষ নয়, পশুদের সঙ্গেও (যেমন বেড়াল) যোগাযোগ করতে পারে। মিসির আলি জিজ্ঞেস করলেন, 'বেড়াল তোমার কথা বুঝতে পারে?'

'হুঁ, পারে।'

'তুমি ওর কথা বুঝতে পার?'

'বেড়াল কোনো কথা বলে না। তবে সে যা ভাবে তা বুঝতে পারি। অবশ্যি সব সময় পারি না।'

'কখন-কখন পার?'

'তা জেনে আপনি কী করবেন? আপনি কি বেড়াল?'

তিন্নি খিলখিল করে হাসতে লাগল। মিসির আলি রোমাঞ্চ বোধ করলেন। মেয়েটি নিজের ঘরে বসে হাসছে, অথচ তিনি কী স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন!

'তিন্নি।'

'বলুন।'

'এই যে তুমি কথা বলছ, আমি শুনছি। আচ্ছা, এ-বাড়িতে অন্য যারা আছে, তারা কি শুনছে?'

'তারা শুনবে কীভাবে, আমি কি তাদের সঙ্গে কথা বলছি?'

'তাও তো ঠিক। আচ্ছা ধর, কাল ভোরে আমি যদি অনেক দূর চলে যাই—তিন-চার মাইল দূরে কিংবা তার চেয়েও দূরে, তখনো কি তুমি আমার কথা শুনতে পারবে?'

তিন্নি বিরক্ত হয়ে বলল, 'আপনার সঙ্গে আর কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। আমি আর কথা বলব না।'

মিসির আলি বললেন, 'শুভরাত্রি তিন্নি।' তার কোনো জবাব তিনি শুনতে পেলেন না। মাথার যন্ত্রণাটা আবার ফিরে এসেছে। শরীরটা হালকা লাগছে। মিসির আলি ডাক্তারের দিয়ে-যাওয়া ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে ঘুমুতে গেলেন। ভালো ঘুম হল না। আজেবাজে স্বপ্ন দেখলেন, বেশ কয়েক বার ঘুম ভেঙেও গেল।

৬

শীতের ভোরবেলায় ময়মনসিংহ শহর মিসির আলির বেশ লাগল। তিনি অন্ধকার

থাকতেই জেগে উঠেছেন। একটা উলের চাদর গায়ে দিয়ে শহর দেখতে বের হয়েছেন। আজ আর দারোয়ান তাঁকে বাধা দেয় নি, গেট খুলে দিয়েছে। এবং হাসিমুখে বলেছে, 'এত সকালে কই যান?' সম্ভবত বরকত সাহেব দারোয়ানকে কিছু বলেছেন।

সব মফস্বল শহর দেখতে এক রকম, তবু এই শহরটি ব্রহ্মপুত্র নদীর জন্যেই বোধহয় একটু আলাদা। কিংবা কে জানে ভোরবেলার আলোর জন্যেই হয়তো এ-রকম লাগছে। মিসির আলি হেঁটে হেঁটে নদীর পাড়ে চলে গেলেন। নদী শুকিয়ে এতটুকু হয়েছে। চিনির দানার মতো সাদা বালির চর পড়েছে। অদ্ভুত লাগছে দেখতে। মর্নিংওয়াকে বের হয়েছে, এ রকম বেশ কয়েকটি দল পাওয়া গেল। সবই বুড়োর দল। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে হঠাৎ শরীরের জন্যে তাদের মমতা জেগে উঠেছে। এইসব অপূর্ব দৃশ্য আরো কিছুদিন দেখতে হলে শরীরটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

মিসির আলি নদীর পাড় ধরে দ্রুত হাঁটতে লাগলেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে , তাঁর মনে কোনো উদ্দেশ্য আছে। তিনি কিছু-একটা করতে চান। কিন্তু তাঁর মনে কোনো গোপন উদ্দেশ্য ছিল না। ভোরবেলায় নদীর পাড়ের একটি ছোট শহর দেখতে ভালো লাগছে, এই যা। মাইল দু'-এক হাঁটার পর খানিকটা ক্লান্তি বোধ করলেন। বয়স হয়ে যাচ্ছে। এখন আর আগের মতো পরিশ্রম করতে পারেন না।

ঘড়িতে ছ'টা বাজছে। এখন উল্টো পথে হাঁটা শুরু করা দরকার। বরকত সাহেব নিশ্চয়ই ভোরের নাশতা নিয়ে অপেক্ষা করছেন।

একটা খেয়াঘাট দেখা যাচ্ছে। খেয়াঘাটের পাশে বেঞ্চি পেতে সুন্দর একটা চায়ের দোকান। মিসির আলি বেঞ্চিতে বসে চায়ের কথা বললেন। সিগারেট খাবার ইচ্ছা হচ্ছে। কিন্তু প্যাকেট ফেলে এসেছেন। চা শেষ করবার পর লক্ষ করলেন, শুধু সিগারেট নয়, মানিব্যাগও ফেলে এসেছেন। তাঁর অস্বস্তির সীমা রইল না। তিনি প্রায় ফিসফিস করে বললেন, 'আগামীকাল ভোরবেলা চায়ের পয়সা দিয়ে যাব। আমি ভুলে মানিব্যাগ ফেলে এসেছি। আপনি কিছু মনে করবেন না।'

চায়ের দোকানি দাঁত বের করে হাসল। যেন খুব মজার একটা কথা শুনছে।

'কোনো অসুবিধা নাই। দরকার হইলে আরেক কাপ খান।'

মিসির আলি সত্যি-সত্যি আরেক কাপ চা খেলেন। অল্প অল্প রোদ উঠেছে। রোদে পা মেলে জ্বলন্ত উনুনের সামনে একটা হাত মেলে দিয়ে চা খেতে বেশ লাগছে। মিসির আলি হাসিমুখে বললেন, 'দোকান আপনার কেমন চলে? লোকজন তো দেখি না।'

'দোকান চলে না। বিকিকিনি নাই। মানুষজন নাই, চা কে খাইব কন?'

'ভালো জায়গায় গিয়ে দোকান করেন, যেখানে লোকজন আছে।'

দাড়িওয়ালা লোকটি হাসিমুখে বলল, 'মনের টানে পইড়া আছি। জায়গাটা বড় ভালো লাগে। মায়া পইড়া গেছে। একবার মায়া পড়লে যাওন মুসিবত।'

মিসির আলি চমকে উঠলেন। এই বুড়োর কথায় একটা সূত্র পাওয়া যাচ্ছে। তিনি বুঝতে পারছেন, কেন এত কষ্টের পরও নিজাম বা রহিমা ও-বাড়িতে পড়ে আছে। সেখানেও মায়া ব্যাপারটাই কাজ করছে। এই মায়া তৈরির ব্যাপারে তিন্নিরও নিশ্চয়ই একটি ভূমিকা আছে। মায়া জাগিয়ে রাখছে তিন্নি। কেউ তা বুঝতে পারছে না।

মানুষের সমস্ত আবেগ এবং অনুভূতির কেন্দ্রবিন্দু মস্তিষ্ক। মেয়েটি সেই মস্তিষ্ক

নিয়ন্ত্রণ করতে পারে অতি সহজেই। মিসির আলির মনে হল, এই মেয়েটি একই সঙ্গে দু'টি কাজ করে—আশেপাশের লোকজনদের একটু দূরে সরিয়ে রাখে, আবার টেনে রাখে নিজের দিকে।

মেয়েটি নিজের সব ক্ষমতাও সবাইকে দেখাচ্ছে না। যেমন ধরা যাক, দূর থেকে কথোপকথনের ক্ষমতা। এর খবর এ-বাড়ির অন্য কেউ জানে না। কিন্তু কেন জানে না? কেন এই মেয়েটি এইসব তথ্য গোপন রেখেছে?

আবার পুরোপুরি গোপনও রাখছে না। তাঁর কাছে প্রকাশ করেছে। কেন করেছে? আশঙ্কা কেন? এর উত্তর বের করতে হবে। একটির পর একটি তথ্যকে সাজাতে হবে। একটি ছকের মধ্যে ফেলতে হবে। মিসির আলি চিন্তিত বোধ করলেন। নিজের অজান্তেই আরেক কাপ চা চাইলেন।

চায়ের দোকানি খুশি মনেই চা ছাঁকতে বসল।

'আমি কাল সকালেই দাম দিয়ে যাব।'

'কোনো অসুবিধা নাই। তিন কাপ চায়ের লাগিন ফতুর হইতাম না। আমরা ময়মনসিং-এর লোক। আমরার কইলজা বড়।'

'নাম কি আপনার?'

'রশিদ।'

'আচ্ছা ভাই রশিদ, আপনার কছে সিগারেট আছে?'

'সিগারেট নাই, বিড়ি আছে। খাইবেন?'

'দেন দেখি একটা।'

মিসির আলি চিন্তিত মুখে বিড়ি টানতে লাগলেন। বেলা বাড়ছে, তাঁর খেয়াল নেই। অনেক কাজ পড়ে আছে সামনে। কাজ গোছাতে হবে। কীভাবে গোছাতে হবে, তা পরিষ্কার বুঝতে পারছেন না।

এ-বাড়ির প্রতিটি মানুষকে জেরা করতে হবে। এলোমেলো প্রশ্ন-উত্তর নয়। পুঙ্খানুপুঙ্খ জেরা। তিন্নির মার সম্পর্কে খোঁজ নিতে হবে, ভদ্রমহিলার চিঠিপত্র, ডায়েরি--এইসব দেখতে হবে। ভালোভাবে জানতে হবে, তিনি মেয়ে সম্পর্কে কী ভাবতেন। মায়েরা অনেক কিছু বুঝতে পারে।

'কি ভাবেন?'

মিসির আলি চমকে উঠে বললেন, 'কিছু ভাবি না ভাই। চায়ের জন্যে ধন্যবাদ। কাল সকালে আমি আবার আসব।'

'জ্বি আইচ্ছা। আপনে ময়মনসিংয়ের লোক না মনে হইতাছে।'

'জ্বি-না। আমি ঢাকা থেকে এসেছি।'

'কুটুম্ব বাড়ি?'

'জ্বি, কুটুম্ব বাড়ি।'

৭

'তোমার নাম রহিমা?'

'জ্বি।'

'ভালো আছ রহিমা?'

'জ্বি, আল্লাহ্তালা যেমুন রাখছে।'

রহিমা লম্বা একটা ঘোমটা টানল। এই লোকটি তার কাছে কী জানতে চায়, তা সে বুঝতে পারছে না। সে তো কিছুই জানে না, তাকে কিসের এত জিজ্ঞাসাবাদ! তিন্নির আব্বা বলে দিয়েছেন--উনি যা জানতে চান, সব বলবে। কিছুই গোপন করবে না। এও এক সমস্যা। গোপন করার কী আছে?

'রহিমা।'

'জ্বি?'

'দেশের বাড়িতে তোমার কে কে আছেন?'

'এক মাইয়া আছে।'

'মেয়েকে দেখতে যাও না?'

'জ্বি, যাই।'

'শেষ বার কবে গিয়েছিলে?'

'তিন বছর আগে।'

'এই তিন বছর যাও নি কেন?'

রহিমা চমকে উঠল। তাকিয়ে রইল ফ্যালফ্যাল করে। যেন সে নিজেই গভীর চিন্তায় পড়ে গেছে, কেন যায় নি।

'মেয়ে যাবার জন্যে বলে না?'

'জ্বি, বলে।'

'তবু যেতে ইচ্ছে করে না, তাই না?'

রহিমা চুপ করে রইল। মিসির আলি বললেন, 'তিন্নির মাকে তো তুমি দেখেছ, তাই না?'

'জ্বি।'

'কেমন মহিলা ছিলেন?'

'খুব ভালো। এমুন মানুষ দেখি নাই। খুব সুন্দর আছিল। কী রকম ব্যবহার! কাউরে রাগ হয়ে কথা কয় নাই।'

'ঐ ভদ্রমহিলার মধ্যে তিন্নির মতো কোনো কিছু ছিল কি?'

'জ্বি–না। বড় ভালোমানুষ ছিল। ইনার কথা মনে হইলেই চউক্ষে পানি আসে।'

রহিমা সত্যি–সত্যি চোখ মুছল। মিসির আলির আর কিছু জিজ্ঞেস করার ছিল না।

অন্যদের কাছ থেকে তেমন কিছু জানা গেল না। বাড়ির দারোয়ানের একটি কথা অবশ্যি বেশ গুরুত্বপূর্ণ, সে বলছে, তিন্নি ছোটবেলায় খুব ছোটাছুটি করত। বাগানে দৌড়াত। যতই সে বড় হচ্ছে, ততই তার ছোটাছুটি কমে যাচ্ছে। এখন বেশির ভাগ সময় সে ছাদে হাঁটাহাঁটি করে কিংবা চুপচাপ বসে থাকে।

'তুমি ক'দিন ধরে এ বাড়িতে আছ?'

'জ্বি, অনেক দিন।'

'ছুটিছাটায় দেশের বাড়িতে যাও না?'

'জ্বি, যাই।'

'শেষ কবে গিয়েছিলে?'

অনেক হিসাব-নিকাশ করে দারোয়ান বলল, 'তিন বছর আগে একবার গিয়েছিলাম।'

'গত তিন বছরে যাও নি?'

'জ্বি না।'

তিন্নির মার পুরোনো চিঠিপত্র বা ডায়েরি, কিছুই পাওয়া গেল না। বরকত সাহেব বললেন, 'এ-দেশের মেয়েদের কি আর ডায়েরি লেখার অভ্যাস আছে? এরা ঘরের কাজকর্ম শেষ করেই সময় পায় না। ডায়েরি কখন লিখবে?'

'চিঠিপত্র? পুরোনো চিঠিপত্র?'

'পুরোনো চিঠিপত্র কি কেউ জমা করে রাখে, বলুন? চিঠি আসে, চিঠি পড়ে ফেলে দিই। ব্যস। তা ছাড়া ও চিঠি লিখবে কাকে? বাপ-মা-মরা মেয়ে ছিল। মামার কাছে মানুষ হয়েছে। বিয়ের পর সেই মামা মারা গেলেন। সে একা হয়ে গেল। চিঠিপত্র লেখার বা যোগাযোগের কেউ ছিল না।'

'আপনার স্ত্রী কি খুব বিষণ্ন প্রকৃতির ছিলেন?'

'না মনে হয়। হাসিখুশিই তো ছিল।'

'কোনোরকম অসুখ-বিসুখ ছিল কি?'

'বলার মতো তেমন কিছু না, সর্দিকাশি—এইসবে খুব ভুগত। এটা নিশ্চয়ই তেমন কিছু না।'

'তিন্নি যখন তাঁর পেটে, সে-সময় কি তাঁর জার্মান মিজেলস হয়েছিল?

'এটা কেন জিজ্ঞেস করছেন?'

'জার্মান মিজেলস একটা ভাইরাসঘটিত অসুখ। এতে বাচ্চার অনেক ধরনের ক্ষতি হবার কথা বলা হয়। ''জীনে'' কিছু ওলটপালট হয়।'

'না, এ-ধরনের কোনো অসুখবিসুখ হয় নি।'

'মামস? মামস হয়েছিল কি?'

'না, তাও না।'

মিসির আলি বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'সেই সময় তিনি কি কোনো অদ্ভুত স্বপ্নটপ্ন দেখতেন?'

বরকত সাহেব ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'কেন জিজ্ঞেস করছেন?'

'মানসিক অবস্থাটা জানবার জন্যে। দেখতেন কি কোনো স্বপ্ন?'

'হ্যাঁ, দেখতেন।'

'কী ধরনের স্বপ্ন, আপনার মনে আছে?'

'ঠিক মনে নেই। প্রায়ই দেখতাম জেগে বসে আছে। কী হয়েছে জিজ্ঞেস করলে বলত, দুঃস্বপ্ন দেখেছি।'

'কী দুঃস্বপ্ন, সেটা জিজ্ঞেস করেন নি?'

'জ্বি-না, জিজ্ঞেস করি নি। স্বপ্নটপ্নর ব্যাপারে আমার তেমন উৎসাহ নেই। তবে সে নিজে থেকে কয়েক বার আমাকে বলতে চেষ্টা করেছে, আমি তেমন গুরুত্ব দিই

নি।।'

'আপনার কি কিছুই মনে নেই?'

'ও বলত, তার দুঃস্বপ্নগুলি সব গাছপালা নিয়ে। এর বেশি আমার কিছু মনে নেই।'

মিসির আলি বললেন, 'আমি আজ সন্ধ্যায় ঢাকা যাব। এখানকার কাজ আমার আপাতত শেষ হয়েছে। ঢাকায় আমি কিছু পড়াশোনা করব। খোঁজখবর করব, তারপর ফিরে আসব।'

'আজই যাবেন?'

'হ্যাঁ, আজই যাব। হাতে সময় বেশি নেই। কিছু একটা করতে হলে দ্রুত করতে হবে।'

'এ-কথা কেন বলছেন?'

'ইনসটিংক্ট থেকে বলছি। আমার মনে হচ্ছে এ-রকম।'

'আপনি কিন্তু আমার মেয়ের সঙ্গে এক বারই কথা বলেছেন। আমি চাচ্ছিলাম আপনি তার সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা করবেন।'

'আমি আবার ফিরে আসছি। তখন করব।'

'কবে ফিরবেন?'

'চেষ্টা করব খুব তাড়াতাড়ি ফিরতে।'

'আমার মেয়েটিকে কেমন দেখলেন, বলুন।'

'এখনো বলবার মতো তেমন কিছু পাচ্ছি না।'

'পাবেন কি?'

'পাব, নিশ্চয়ই পাব। কেন পাব না?'

বরকত সাহেব একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। মনে হল তিনি খুব আশাবাদী নন।

তিন্নি প্রায় সারাদিনই ছাদে বসে ছিল। মিসির আলি তার কাছ থেকে বিদায় নিতে গেলেন বিকেলে।

'তিন্নি, আমি চলে যাচ্ছি।'

মেয়েটি বলল, 'আমি জানি।'

'আমি তোমার ছবিগুলি সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি।'

'তাও জানি।'

'কিছু দিনের মধ্যে আমি আবার আসব। তখন দেখবে, সব ঝামেলা মিটে গেছে।'

তিন্নি কিছু বলল না। মিসির আলি বললেন, 'গাছপালা তুমি খুব ভালবাস, তাই না?'

'মাঝে মাঝে বাসি, মাঝে-মাঝে বাসি না।'

'তুমি কি ওদের সঙ্গে কথা বলতে পার?'

'এখানে যে-সব গাছপালা আছে, তাদের সঙ্গে পারি না।'

'তাহলে কাদের সঙ্গে পার?'

মেয়েটি জবাব দিল না। মাথা নিচু করে বসে রইল। মিসির আলি বললেন, 'তুমি আমার অনেক প্রশ্নের জবাব দাও না। কেন দাও না বল তো? কোনো বাধা আছে কি?'

তিন্নি সে-প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'আপনি আমাকে ভালো করে দিন। অসুখ সারিয়ে দিন।'

মিসির আলির খুবই মন-খারাপ হয়ে গেল। বাচ্চা একটি মেয়ে বাস করছে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি জগতে—যে-জগতের সঙ্গে আশেপাশের চেনা জগতের কোনো মিল নেই। মেয়েটি কষ্ট পাচ্ছে। তার কষ্টের ব্যাপারটি কাউকে বলতে পারছে না। সে নিজেও হয়তো জানে না পুরোপুরি।

'তিন্নি, আমি যাই?'

মেয়েটি কিছু বলল না। মিসির আলি লক্ষ করলেন, তিন্নি নিঃশব্দে কাঁদছে।

ঢাকায় ফেরার ট্রেনে উঠবার পর মিসির আলির মনে পড়ল, তিন কাপ চায়ের দাম তিনি দিয়ে আসেন নি। রশিদ নামের বুড়ো মানুষটি আগামীকাল ভোরবেলায় যখন দেখবে, কেউ আসছে না, তখন না-জানি কি ভাববে। মিসির আলির মন গ্লানিতে ভরে গেল। কিন্তু কিছুই করার নেই। ঢাকা মেইল ছুটে চলেছে। পেছনে পড়ে আছে নদীর ধারে গড়ে-ওঠা চমৎকার একটি শহর।

৮

ডঃ জাবেদ আহসান অবাক হয়ে বললেন, 'আপনি আমার কাছে ঠিক কী জানতে চান, বুঝতে পারছি না। কয়েকটি গাছপালার হাতে-আঁকা ছবি দিয়ে গিয়েছেন, আর তো কিছুই বলেন নি।'

'ছবিগুলো ভালো করে দেখেছেন?'

'ভালো করে দেখার কী আছে?'

মিসির আলি লক্ষ করলেন ডঃ জাবেদ বেশ বিরক্ত। ভদ্রলোক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানি ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসররা তেমন কোনো কাজকর্ম করেন না, কিন্তু সব সময় ব্যস্ততার একটা ভঙ্গি করেন। ডঃ জাবেদ এই মুহূর্তে এমন মুখের ভাব করেছেন, যেন তাঁর মহা মূল্যবান সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

মিসির আলি বললেন, 'এই গাছগুলি সম্পর্কে কিছু বলুন। ছবিতে আঁকা গাছগুলির কথা বলছি।'

'কী বলব, সেটাই বুঝতে পারছি না। আপনি কী জানতে চাচ্ছেন?'

'এই জাতীয় গাছ দেখেছেন কখনো?'

'না।'

'বইপত্রে এ রকম গাাছের কোনো রেফারেন্স পেয়েছেন?'

'দেখুন, পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ ধরনের গাছ আছে। সব কিছু আমার জানার কথা নয়। আমার পিএইচ.ডি.'র বিষয় ছিল প্লান্ট ব্রিডিং। সে-সম্পর্কে আপনাকে আমি কিছু বলতে পারি। আপনি একটি বাচ্চা মেয়ের আঁকা কতগুলি ছবি নিয়ে এসেছেন। সেই ছবিগুলি দেখে আমাকে গাছ সম্পর্কে বলতে বলছেন। এ-ধরনের ধাঁধার পেছনে সময় নষ্ট করার আমি কোনো অর্থ দেখছি না।'

মিসির আলি বললেন, 'আপনি বিরক্ত হচ্ছেন কেন?'

'বিরক্ত হচ্ছি, কারণ আপনি আমার সময় নষ্ট করছেন।'

মিসির আলি বললেন, 'আপনি তো বসে–বসে টিভি দেখছিলেন। তেমন কিছু তো করছিলেন না। সময় নষ্ট করার কথা উঠছে না।'

মিসির আলি ভাবলেন, এই কথায় ভদ্রলোক ভীষণ রেগে যাবেন। 'গেট আউট' জাতীয় কথাবার্তাও বলে বসতে পারেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, তেমন কিছু হল না। ডঃ জাবেদকে মনে হল, তিনি খানিকটা অপ্রস্তুত হয়েছেন। অপ্রস্তুত মানুষেরা যেমন খুব অদ্ভুত ভঙ্গিতে কাশতে থাকে, ভদ্রলোক সে–রকম কাশছেন। কাশি থামাবার পর বেশ মোলায়েম স্বরে বললেন, 'একটু চা দিতে বলি?'

'জ্বি–না, চা খাব না।'

'একটু খান, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পড়েছে। চা ভালোই লাগবে। বসুন, চায়ের কথা বলে আসি।'

চা এল। শুধু চা নয়, চায়ের সঙ্গে নানান রকমের খাবারদাবার। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বাড়ির এই একটি বিশেষত্ব আছে। এরা অতিথিকে চায়ের সঙ্গে নানান রকম খাবারদাবার দেয়, যা দেখে কেউ ধারণাও করতে পারে না যে, এই সম্প্রদায় আর্থিক দিক দিয়ে পঙ্গু।

'মিসির আলি সাহেব, চা নিন।'

তিনি চা নিলেন।

'বলুন, স্পেসিফিক্যালি আপনি কী জানতে চান।'

'পৃথিবীতে ঠিক এ–জাতীয় গাছ আছে কি না তা কে বলতে পারবে? অর্থাৎ আমি জানতে চাচ্ছি, গাছপালার ক্যাটালগজাতীয় কিছু কি আছে, যেখানে সব–জাতীয় গাছপালার ছবি আছে? তাদের সম্পর্কে তথ্য লেখা আছে?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয় আছে। এ–দেশে নেই। বোটানিক্যাল সোসাইটিগুলিতে আছে। ওদের একটি কাজই হচ্ছে গাছপালার বিভিন্ন স্পেসিসকে সিসটেমেটিকভাবে ক্যাটালগিং করা।'

'আপনি কি আমাকে কিছু লোকজনের ঠিকানা দিতে পারবেন, যাঁরা আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন?'

'হ্যাঁ, পারি। আপনি যাবার সময় আমি ঠিকানা লিখে দেব। আর কী জানতে চান?'

'মানুষ এবং গাছের মধ্যে পার্থক্য কী?'

'প্রশ্নটা আরো গুছিয়ে করুন।'

মিসির আলি থেমে–থেমে বললেন, 'আমরা তো জানি গাছের জীবন আছে। কিন্তু আমি যা জানতে চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে, গাছের জীবনের সঙ্গে মানুষের জীবনের মিলটা কোথায়?'

'চট করে উত্তর দেওয়া যাবে না। এর উত্তর দেবার আগে আমাদের জানতে হবে জীবন মানে কি? এখনো আমরা পুরোপুরি ভাবে জীবন কী তা–ই জানি না।'

'বলেন কী! জীবন কী জানেন না!'

'হ্যাঁ, তাই। বিজ্ঞান অনেক দূর আমাদেরকে নিয়ে গেছে, কিন্তু এখনো অনেক কিছু আমরা জানি না। অনেক আনসলভড্ মিস্ট্রি রয়ে গেছে। আপনাকে আরেক কাপ

চা দিতে বলি?'

'বলুন।'

ডঃ জাবেদ সিগারেট ধরিয়ে শান্ত স্বরে বললেন, 'অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, মানুষের সঙ্গে গাছের মিল অনেক বেশি।'

'বলেন কী!'

'হ্যাঁ, তাই। আসল জিনিস হচ্ছে 'জীন', যা ঠিক করে কোন প্রোটিন তৈরি করা দরকার। অনেকগুলি জীন নিয়ে হয় একটি ডিএনএ মলিক্যুল। ডিওক্সি রিবো নিউক্লিয়িক অ্যাসিড। প্রাণের আদি ব্যাপার হচ্ছে এই জটিল অণু। এই অণু থাকে জীব-কোষে। তারা ঠিক করে একটি প্রাণী মানুষ হবে, না গাছ হবে, না সাপ হবে। মাইটোকনড্রিয়া বলে একটি জিনিস মানুষেরও আছে, আবার গাছেরও আছে। মানুষের যা নেই, তা হচ্ছে ক্লোরোপ্লাসট।'

'আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'বুঝতে পারার কথাও নয়। বিষয়টি অত্যন্ত জটিল। আপনি চাইলে, আমি আপনাকে কিছু সহজ বইপত্র দিতে পারি।'

'আমি চাই। আপনি আমাকে আরো কিছু বলুন।'

'ডিএনএ প্রসঙ্গেই বলি। এই অণুগুলি হচ্ছে প্যাঁচাল সিঁড়ির মতো। মানুষের ডিএনএ এবং গাছের ডিএনএ প্রায় একই রকম। সিঁড়ির দু'-একটা ধাপ শুধু আলাদা। একটু অন্য রকম।'

মিসির আলি গভীর আগ্রহে তাকিয়ে আছেন। এক জন ভালো শিক্ষক খুব সহজেই একজন মনোযোগী শ্রোতাকে চিনতে পারেন।

ডঃ জাবেদ এই মনোযোগী শ্রোতাকে পছন্দ করে ফেললেন।

'শুধু এই দু'-একটি ধাপ অন্য রকম হওয়ায় প্রাণিজগতে মানুষ এবং গাছ আলাদা হয়ে গেছে। প্রোটিন তৈরির পদ্ধতি হয়েছে ভিন্ন। আপনি আগে বরং কয়েকটা বইপত্র পড়ুন। তারপর আবার আপনার সঙ্গে কথা বলব।'

ডঃ জাবেদ তিনটি বই দিলেন। দু'টি ঠিকানা লিখে দিলেন। একটি লন্ডনের রয়েল বোটানিক্যাল সোসাইটির, অন্যটি ডঃ লংম্যানের। ডঃ লংম্যান আমেরিকান এগ্রিকালচারাল রিসার্চের ডেপুটি ডাইরেক্টর।

মিসির আলি সাহেব তাঁর সঙ্গের ছবিগুলি দু' ভাগ করে দু' জায়গায় পাঠালেন। এবং আশ্চর্যের ব্যাপার, দশদিনের মাথায় ডঃ লংম্যান-এর চিঠির জবাব চলে এল।

টমাস লংম্যান
Ph.D. D. Sc.
US Department of Agricultural Science
ND 505837 USA

প্রিয় এম. আলি,

আপনার পাঠানো ছবি এবং চিঠি পেয়েছি। যে সমস্ত লতানো গাছের ছবি আপনি পাঠিয়েছেন, তা খুব সম্ভব কল্পনা থেকে আঁকা। আমাদের জানা মতে ও রকম গাছের কোনো অস্তিত্ব নেই। তবে পেরুর গহীন অরণ্যে এবং আমেরিকার রেইন

ফরেস্টে কিছু লতানো গাছ আছে, যার সঙ্গে আপনার পাঠানো গাছের সামান্য মিল আছে। আমি আপনাকে কিছু ফটোগ্রাফ পাঠালাম, আপনি নিজেই মিলিয়ে দেখতে পারেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করছি, রেইন ফরেস্ট এবং পেরুর গাছগুলির রঙ সবুজ, কিন্তু আপনার পাঠানো ছবির গাছের বর্ণ হলুদ এবং লালের মিশ্রণ। এর বেশি আপনাকে আর কোনো তথ্য দিতে পারছি না।

আপনার বিশ্বস্ত
টি. লংম্যান।

পুনশ্চ : আপনি যদি আপনার ছবির মতো গাছের কিছু নমুনা পাঠান, তাহলে আমরা তা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে পরীক্ষা করব।

রয়েল বোটানিক্যাল সোসাইটি চিঠির জবাব দিতে কুড়ি দিনের মতো দেরি করল। তাদের জবাবটি ছিল এক লাইনের।

প্রিয় ডঃ এম. আলি,
আপনার পাঠানো ছবির মতো দেখতে কোনো গাছের কথা আমাদের জানা নেই।

আপনার বিশ্বস্ত,
এ. সুরনসেন।

মিসির আলি সাহেব এই ক'দিনে জীবনের উৎপত্তি এবং বিকাশের উপর গোটা চারেক বই পড়ে ফেললেন। ডিএনএ এবং আরএনএ মলিক্যুল সম্পর্কে পড়তে গিয়ে লক্ষ করলেন, প্রচুর কেমিষ্ট্রি জানা ছাড়া কিছু স্পষ্ট হচ্ছে না। বারবার এ্যামিনো অ্যাসিডের কথা আসছে। এ্যামিনো অ্যাসিড কী জিনিস তা তিনি জানেন না। অথচ বুঝতে পারছেন, প্রাণের রহস্যের সঙ্গে এ্যামিনো অ্যাসিডের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। মিসির আলি নাইন টেনের পাঠ্য কেমিষ্ট্রি বই কিনে এনে পড়া শুরু করলেন। কোমর বেঁধে পড়াশোনা যাকে বলে। এই ফাঁকে চিঠি লিখলেন তিন্নির বাবাকে। তিন্নির বাবা তার জবাব দিলেন না। তবে তিন্নি একটি চিঠি লিখল। কোনো রকম সম্বোধন চিঠিতে নেই। হাতের লেখা অপরিচ্ছন্ন। প্রচুর ভুল বানান। কিন্তু ভাষা এবং বক্তব্য বেশ পরিষ্কার। খুবই গুছিয়ে লেখা চিঠি, বাচ্চা একটি মেয়ের জন্যে যা বেশ আশ্চর্যজনক। চিঠির অংশবিশেষ এ–রকম---

আপনি আব্বাকে একটি লম্বা চিঠি লিখেছেন। আব্বা সেই চিঠি না–পড়েই ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। আব্বা এখন আর আপনাকে পছন্দ করছেন না। তিনি চান না, আপনি আমার ব্যাপারে আর কোনো চিন্তাভাবনা করেন। কিন্তু আমি জানি, আপনি করছেন। যদিও আপনি অনেক দূরে থাকেন, তবু আমি বুঝতে পারি। আপনি যে আমাকে পছন্দ করেন, তাও বুঝতে পারি। কেউ আমাকে পছন্দ করে না, কিন্তু আপনি করেন। কেন

করেন? আমি তো ভালো মেয়ে না। আমি সবাইকে কষ্ট দিই। সবার মাথায় যন্ত্রণা দিই। কাউকে আমার ভালো লাগে না। আমার শুধু গাছ ভালো লাগে। আমার ইচ্ছা করে, একটা খুব গভীর জঙ্গলের মাঝখানে গিয়ে বসে থাকি। গাছের সঙ্গে কথা বলি। গাছেরা কত ভালো। এরা কখনো এক জন অন্য জনের সঙ্গে ঝগড়া করে না, মারামারি করে না। নিজের জায়গায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে, এবং ভাবে। কত বিচিত্র জিনিস নিয়ে তারা ভাবে। এবং মাঝে-মাঝে এক জনের সঙ্গে অন্য জন কথা বলে। কী সুন্দর সেই সব কথা। এখন আমি মাঝে-মাঝে ওদের কথা শুনতে পাই।

চিঠি এই পর্যন্তই। মিসির আলি এই চিঠিটি কম হলেও দশ বার পড়লেন। চিঠির কিছু অংশ লাল কালি দিয়ে দাগ দিলেন। যেমন একটি লাইন-- 'এখন আমি মাঝে-মাঝে ওদের কথা শুনতে পাই।' স্পষ্টতই মেয়েটি গাছের কথা বলছে। পুরো ব্যাপারটাই সম্ভবত শিশুর কল্পনা। শিশুদের কল্পনার মতো বিশুদ্ধ জিনিস আর কিছুই নেই। মিসির আলির নিজের এক ভাগনী অমিতা গাছের সাথে কথা বলত। ওদের বাড়ির সামনে ছিল একটা খাটো কদমগাছ। অমিতাকে দেখা যেত গাছের সামনে উবু হয়ে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা আলাপ করছে। মিসির আলি এক দিন আড়ালে বসে কথাবার্তা শুনলেন।

'কিরে, আজ তুই এমন মুখ কালো করে রেখেছিস কেন? রাগ করেছিস? তুই এমন কথায়-কথায় রাগ করিস কেন? কেউ বকেছে? কী হয়েছে বল তো ভাই শুনি।'

অমিতা অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। যেন সে সত্যি-সত্যি শুনতে পাচ্ছে গাছের কথা। মাঝে-মাঝে মাথা নাড়ছে। এক সময় সে উঠে দাঁড়াল এবং বিকট চিৎকার করে বলল, 'কে কদমগাছকে ব্যথা দিয়েছে? কে পাতাসুদ্ধ তার ডাল ছিঁড়েছে?' কান্নাকাটি আর চিৎকার। জানা গেল আগের রাতে সত্যি-সত্যি কদমগাছের একটি ডাল ভাঙা হয়েছে। ব্যাপারটা বেশ রহস্যজনক। কিছুদিন পর গাছটি আপনা-আপনি মরে যায়। অমিতা নাওয়া-খাওয়া বন্ধ করে বড় অসুখে পড়ে যায়। জীবন-মরণ অসুখ। মাসখানিক ভুগে সেরে ওঠে। গাছপ্রসঙ্গ চাপা পড়ে যায়।

মিসির আলি ঠিক করলেন, অমিতার সঙ্গে দেখা করবেন। ছোটবেলার কথা জিজ্ঞেস করবেন। যদিও এটা খুবই সম্ভব যে, অমিতার শৈশবের কথা কিছু মনে নেই। সে এখন থাকে কুমিল্লার ঠাকুরপাড়ায়। তার স্বামী পুলিশের ডিএসপি। সে নিজে কোনো এক মেয়ে-স্কুলে পড়ায়। মিসির আলি ঠিক করলেন, অমিতার সঙ্গে দেখা করেই চলে যাবেন ময়মনসিংহ। তিন্নির সঙ্গে কথা বলবেন। দু'-একটা ছোটখাটো পরীক্ষাটরীক্ষা করবেন। তিন্নির মার আত্মীয়স্বজনের খোঁজ বের করতে চেষ্টা করবেন। তিন্নিকে দিয়ে আরো কিছু ছবি আঁকিয়ে পাঠাবেন ডঃ লংম্যানের কাছে। অনেক কাজ সামনে। মিসির আলি দু'মাসের অর্জিত ছুটির জন্যে দরখাস্ত করলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর চাকরির পদটি হচ্ছে অস্থায়ী। পার্ট টাইম শিক্ষকতার পদ। দু' মাসের ছুটি বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে দেবে না। হয়তো চাকরি চলে যাবে। কিন্তু উপায় কী? এই রহস্য তাঁকে ভেদ করতেই হবে। ছোট্ট একটি মেয়ে কষ্ট পাবে, তা হতেই পারে না।

৯

অমিতা অবাক হয়ে বলল, 'আরে মামা, তুমি!'

মিসির আলি বললেন, 'চিনতে পারছিস রে বেটি?'

'কী আশ্চর্য মামা, তোমাকে চিনব না! তোমাকে নিয়ে কত গল্প করি মানুষের সাথে।'

তিনি হাসলেন। অমিতা বলল, 'বিনা কারণে তুমি আমার কাছে আস নি। তুমি সেই মানুষই না। কি জন্যে এসেছ বল।'

'এখনি বলব?'

'না, এখন না। আমি স্কুলে যাচ্ছি। আজ আর ক্লাস নেব না, ছুটি নিয়ে চলে আসব। তুমি ততক্ষণে গোসলটোসল করে বিশ্রাম নাও। আমার ঘর-সংসার দেখ। ঘন-ঘন চা খাওয়ার অভ্যাস এখনো আছে?'

'হুঁ, আছে।'

'কাজের ছেলেটাকে বলে যাচ্ছি, সে প্রতি পনের মিনিট পরপর চা দেবে।'

'তোর ছেলেপুলে কই?'

অমিতা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'আমার ছেলেপুলে নেই মামা, হবেও না কোনো দিন। তুমি তো খোঁজখবর রাখ না, কাজেই কিছু জান না। যদি জানতে, তাহলে আর.......'

সে কথা শেষ করল না। মিসির আলি লক্ষ করলেন, মেয়েটির গলা ভারি হয়ে এসেছে। কত রকম দুঃখ-কষ্ট মানুষের থাকে! তাঁর মন খারাপ হয়ে গেল।

'তোর বর কোথায়?'

'ও টুরে গেছে—চৌদ্দগ্রামে। সন্ধ্যাবেলায় ফিরবে। তুমি কি থাকবে সন্ধ্যা পর্যন্ত?'

'না, আমার একটা জরুরি কাজ আছে।'

'তা তো থাকবেই। তোমাকে যে আমি কত ভালবাসি মামা, অথচ তুমি--'

অমিতার গলা আবার ভারি হয়ে গেল। এই মেয়েটার মনটা অসম্ভব নরম।

মিসির আলি গোসল সেরে ঘুরে-ঘুরে অমিতার ঘর-সংসার দেখলেন। বিরাট দোতলা বাড়ি। প্রতিটি ঘর চমৎকার করে সাজানো। লাইব্রেরি-ঘরটি দেখে তাঁর মন ভরে গেল। বই বই আর বই। তাকিয়ে থাকতে ভালো লাগে।

কাজের ছেলেটির নাম চেরাগ মিয়া। সে সত্যি-সত্যি পনের মিনিট পরপর চা নিয়ে আসে। দু' কাপ চা খেয়ে মিসির আলি ধমক দিলেন 'আর লাগবে না। দরকার হলে আমি চাইব।' লাভ হল না। পনের মিনিট পর আবার সে এক কাপ চা নিয়ে এল।

দুপুরে খেতে বসে অমিতার সঙ্গে তিনি গাছের সঙ্গে কথা বলার প্রসঙ্গটা তুললেন। অমিতা অবাক হয়ে বলল, 'এইটি জানবার জন্যে তুমি এসেছ আমার কাছে?'

'হুঁ।'

'তুমি কি পাগল হয়ে গেলে নাকি মামা? পাগলরাই শুধু এইসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে ছোটাছুটি করে।'

'পাগল হই আর যা-ই হই, যা জানতে চাচ্ছি সেটা বল। তুই যে ছোটবেলায় গাছের সঙ্গে কথা বলতি, সেটা মনে আছে?'

'হ্যাঁ, আছে।'

'আচ্ছা, গাছ কি তোর সঙ্গে কথা বলত?'

অমিতা হাসিমুখে বলল, 'গাছ আমার সঙ্গে কথা বলবে কি? গাছ আবার কথা বলা শিখল কবে?'

'তার মানে, গাছের কোনো কথা তুই শুনতে পেতি না?'

'কীভাবে শুনব মামা? তুমি শুনতে পাও? এইসব ছোটবেলার খেয়াল। এটা নিয়ে তুমি মাথা ঘামাচ্ছ কেন?'

'এমনি।'

'উঁহু। এমনি–এমনি মাথা ঘামাবার মানুষ তুমি না। নিশ্চয়ই কিছু–একটা আছে, যা তুমি আমাকে বলতে চাচ্ছ না। ও কি মামা, তোমার কি খাওয়া হয়ে গেল?'

'হ্যাঁ।'

'অসম্ভব। এগার পদ রান্না করেছি। তুমি খেয়েছ মাত্র পাঁচ পদ। এখনো ছ'টা পদ বাকি আছে।'

'মরে যাব অমিতা।'

'মরে যাও আর যাই কর-- খেতে হবে। জোর করে আমি মুখে তুলে খাইয়ে দেব। আমাকে তুমি চেন না মামা।'

মিসির আলি হাসলেন। অমিতা গম্ভীর মুখে বসে আছে। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে, সে সত্যি–সত্যি জোর করে মুখে তুলে দেবে। মিসির আলি মৃদু স্বরে বললেন, 'গাছ তাহলে তোর সঙ্গে কোনো কথা বলত না?'

অমিতা বিরক্ত স্বরে বলল, 'না। গাছ আমার সঙ্গে কেন কথা বলবে বল তো? আমি কি গাছ? ভালো করে তাকিয়ে দেখ তো আমার দিকে, আমাকে কি গাছ বলে মনে হয়?'

মিসির আলি কিছু বললেন না। তাকিয়ে রইলেন মেয়েটির দিকে। তাঁর এই ভাগনীটি ভারি সুন্দর। দেবীর মতো মুখ। ঘন কালো তরল চোখ। মুখের ভাবটি বড় স্নিগ্ধ।

অমিতা বলল, 'মামা, তুমি মানুষের দুঃখ–কষ্ট দূর করবার জন্যে ছোটাছুটি কর, অথচ তোমার আশেপাশে যারা আছে, তাদের কথা কিছুই ভাব না।'

'ভাবি না কে বলল?'

'না, ভাব না। ভাবলে এই ছ' বছরে একবার হলেও আসতে আমার কাছে।'

মিসির আলি দেখলেন, অমিতার চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়ছে। তিনি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। মেয়েগুলি এত নরম স্বভাবের হয় কেন, এই নিয়ে অন্যমনস্কভাবে তিনি খানিকক্ষণ ভাবলেন। একটি মেয়ের ডিএনএ এবং একটি পুরুষের ডিএনএ–র মধ্যে তফাৎ কী, তাঁর জানতে ইচ্ছে হল। পড়াশোনা করতে হবে, প্রচুর পড়াশোনা। জীবন এত ছোট, অথচ কত কি আছে জানার!

১০

তিন্নি আজ সারা দিন ছাদে বসে আছে। সে ছাদে গিয়েছে সূর্য ওঠার আগে। এখন প্রায় সন্ধ্যা, কিছুক্ষণের মধ্যেই সূর্য ডুবে যাবে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এক বারও সে নিজের জায়গা থেকে নড়ে নি। তার ছোট্ট শরীরটি পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে আছে। মাঝে-মাঝে বাতাসে তার চুল উড়ছে। এ থেকেই মনে হয়—এটি পাথরের মূর্তি নয়, জীবন্ত একজন মানুষ। সকালে কাজের মেয়ে নাশতা নিয়ে ছাদে এসে ক্ষীণ গলায় বলেছিল, 'আপা, নাশতা আনছি।'

তিন্নি কোনো জবাব দেয় নি। কাজের মেয়েটি আধ ঘন্টার মতো অপেক্ষা করল। এর মধ্যে কয়েক বার নাশতা খাবার কথা বলল। তিন্নির কোনো ভাবান্তর হল না।

দুপুরবেলা বরকত সাহেব নিজেই এলেন। শান্ত গলায় বললেন, 'খেতে এস মা।'

তিন্নি নিশ্চুপ। বরকত সাহেব তার হাত ধরলেন। হাত গরম হয়ে আছে। বেশ গরম। যেন মেয়েটির এক শ' তিন বা চার জ্বর উঠেছে। তিনি গাঢ় স্বরে বললেন, 'তোমার কি শরীরটা খারাপ মা?'

তিন্নি না-সূচক মাথা নাড়ল।

'এস, ভাত দেওয়া হয়েছে। দু' জনে মিলে খাই।'

সে আবার না-সূচক মাথা নাড়ল। বরকত সাহেব মেয়েকে নিজের দিকে টানতেই হঠাৎ তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করলেন। যেন হাজার ভোল্টের ইলেক্‌ট্রিসিটি চলে গেল কপালের মাঝখান দিয়ে। তিনি মেয়ের হাত ছেড়ে দিয়ে অনেকক্ষণ হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। তিন্নি তখন খুব সহজ গলায় বলল, 'বাবা, তুমি চলে যাও।'

'চলে যাব?'

'হুঁ।'

'তুমি আসবে না?'

'না।'

'কিছু খাবে না?'

'খিদে নেই।'

'এক গ্লাস দুধ খাও। দুধ পাঠিয়ে দিই?'

'না।'

বরকত সাহেব নিচে গেলেন। এ কী গভীর পরীক্ষায় তিনি পড়লেন। মেয়ের এই বিচিত্র অসুখের সত্যি কি কোনো সমাধান আছে? তাঁর মনে হতে লাগল, সমাধান নেই। এই অসুখ বাড়তেই থাকবে, কমবে না। মিসির আলি নামের মানুষটির কিছুই করার ক্ষমতা নেই। মেয়েটিকে নিয়ে বিদেশে চলে গেলে কেমন হয়? ইউরোপ-আমেরিকার বড়-বড় ডাক্তাররা আছেন। তাঁরা দিনকে রাত করতে পারেন--এই সামান্য কাজটা পারবেন না? খুব পারবেন। তিনি নিজে দুপুরে কিছু খেতে পারলেন না। মাথায় ভোঁতা যন্ত্রণা হতে লাগল। বিকেলের দিকে সেই যন্ত্রণাা খুব বাড়ল। তিনি কয়েক বার বমি করলেন। অসম্ভব রাগে তাঁর শরীর কাঁপতে লাগল। কার উপর রাগ? সম্ভবত নিজের ভাগ্যের উপর। এত খারাপ ভাগ্যও মানুষের হয়?

তিন্নি সন্ধ্যা মেলাবার পর নিজের ঘরে ঢুকল। আজ অনেক দিন পর তার আবার

ছবি আঁকতে ইচ্ছা হচ্ছে। রঙ-তুলি সাজিয়ে সে উবু হয়ে মেঝেতে বসল। তার সামনে বড় একটি কাগজ বিছানো। সে খানিকক্ষণ চুপ করে বসে, অতি দ্রুত তুলি বোলাতে শুরু করল। প্রথমে মনে হচ্ছিল, কিছু লাইন এলোমেলোভাবে টানা হচ্ছে। এখন আর তা মনে হচ্ছে না। এখন কাগজে লতানো গাছের ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আকাশে দু'টি সূর্য। তার আলো তেরছাভাবে গাছগুলির উপর পড়েছে।

তিন্নি মৃদুস্বরে বলল, 'তোমরা কেমন আছ?'

ছবির গাছগুলি যেন উত্তরে কিছু বলল। তিন্নি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'আমার কিছু ভালো লাগছে না। আমার খুব কষ্ট হচ্ছে, খুব কষ্ট।'

গাছগুলি যেন তার উত্তরেও কিছু বলল। খুব কঠিন কোনো কথা। কারণ তিন্নিকে দেখা গেল দু' হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠেছে। সেই কান্না দীর্ঘস্থায়ী হল না। সে ছবিটি কুচিকুচি করে দিয়ে শান্ত হয়ে নিচে নেমে গেল। কারণ সে বুঝতে পারছে, তার বাবা ঠিক এই মুহূর্তে তাকে নিয়ে ভাবছেন। সেই ভাবনাগুলি ভালো নয়। তার বাবা সমস্যার কাছ থেকে মুক্তি চান। কিন্তু যে-পথ তিনি বেছে নিতে চাচ্ছেন তাতে কোনো লাভ হবে না।

'বাবা।'

বরকত সাহেব চমকে ফিরলেন। তাঁর ঘর অন্ধকার। তিনি ইজিচেয়ারে মাথা নিচু করে বসে আছেন। তিন্নি তাঁর সামনের খাটে পা ঝুলিয়ে বসল। বরকত সাহেব অস্বস্তির সঙ্গে তাঁর মেয়ের দিকে তাকাতে লাগলেন।

'কিছু বলবে?'

'বলব।'

'বল শুনি। চেয়ারে বস। বসে বল।'

তিন্নি খুব নরম গলায় বলল, 'তুমি আমাকে বাইরে নিয়ে যেতে চাও?'

'হুঁ। বড় ডাক্তার দেখাব। পৃথিবীর সেরা ডাক্তার।'

'ডাক্তার কিছু করতে পারবে না।'

'কী করে বুঝলে?'

'আমি জানি। আমার কোনো অসুখ করে নি। আমি তোমাদের মতো না, আমি অন্য রকম।'

'সেটা আমি জানি।'

'না, তুমি জান না। সবটা জান না।'

'ঠিক আছে, না জানলে জানি না। এত কিছু জানার আমার দরকার নেই। আমার টাকার অভাব নেই। তোমাকে আমি বড়-বড় ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব। ইউরোপ। আমেরিকা।'

'আমি এইখানেই থাকব। আমি কোথাও যাব না।'

বরকত সাহেব কড়া চোখে তাকালেন। তাঁর নিঃশ্বাস ভারি হয়ে এল। কপালে ঘাম জমতে লাগল। তিন্নি বলল, 'তোমরা কিছুতেই আমাকে এখান থেকে নিতে পারবে না। তোমাদের সেই শক্তি নেই।'

বরকত সাহেব কিছু বললেন না। তিন্নি শান্ত সুরে বলল, 'এই বাড়িটাতে আমি একা থাকতে চাই বাবা।'

'একা থাকতে চাই মানে?'

'আমি একা থাকব। আর কেউ না।'

'কী বলছ এসব!'

তিন্নি জবাব না-দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বরকত সাহেব কড়া গলায় বললেন, 'পরিষ্কার করে বল, তুমি কী বলতে চাও।'

'এই বাড়িটাতে আমি একা থাকব। আর কেউ থাকবে না। কাজের লোক, দারোয়ান, মালী, এদের সবাইকে বিদায় করে দাও। তুমিও চলে যাও। তুমিও থাকবে না।'

'আমিও চলে যাব!'

'হ্যাঁ।'

বরকত সাহেব উঠে এসে মেয়ের গালে প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে দিলেন। তিন্নি কিছুই বলল না। শান্ত পায়ে উঠে চলে গেল। বরকত সাহেব লক্ষ করলেন, তিন্নি বাগানে চলে যাচ্ছে। বাগান এখন ঘন অন্ধকার। বর্ষার পানি পেয়ে ঝোপঝাড় বড় হয়ে উঠেছে। সাপখোপ নিশ্চয়ই আছে। এই মেয়ে এখন এই সাপখোপের মধ্যে একা-একা হাঁটবে। অসহ্য, অসহ্য! কিন্তু করার কিছুই নেই। তাঁর মনে হল, মেয়েটি মরে গেলে তিনি মুক্তি পান। জন্মের পরপর তিন্নির জন্ডিস হয়েছিল। গা হলুদ হয়ে মরমর অবস্থা। মেয়েকে ঢাকা পিজিতে নিয়ে যেতে হয়েছিল। বহু কষ্টে তাকে সারিয়ে তোলা হয়েছে। সেই সময় কিছু-একটা হয়ে গেলে, আজ এই ভয়াবহ কষ্ট সহ্য করতে হত না।

তিনি কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে ঘরের ভেতর পায়চারি করলেন। এক বার ভাবলেন বাগানে যাবেন। কিন্তু সেই চিন্তা দীর্ঘস্থায়ী হল না। কী হবে বাগানে গিয়ে? তিনি কি পারবেন এই মেয়েকে ফেরাতে? পারবেন না। সেই ক্ষমতাই তাঁর নেই। হয়তো কারোরই নেই। পীর-ফকির ধরলে কেমন হয়? তিনি নিজে এইসব বিশ্বাস করেন না। সারা জীবন তিনি ভেবেছেন, অস্বাভাবিক কোনো ক্ষমতা মানুষের নেই, থাকতে পারে না। কিন্তু এখন দেখছেন, তাঁর ধারণা সত্যি নয়। অস্বাভাবিক ক্ষমতা মানুষের থাকতে পারে। তিন্নিরই আছে। কাজেই পীর-ফকিরের কাছে বা সাধু-সন্ন্যাসীর কাছে যাওয়া যেতে পারে।

'স্যার।'

'কে?'

তিনি দেখলেন, চায়ের পেয়ালা হাতে নিজাম দাঁড়িয়ে আছে। তিনি চায়ের পেয়ালা হাতে নিলেন। নিজাম বলল, 'ঐ লোকটা আসছে।'

'কোন লোক?'

'আগে যে ছিলেন।'

'ও, মিসির আলি?'

'জ্বি। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

বরকত সাহেব বিরক্ত স্বরে বললেন, 'দেখা করার কোনো দরকার নেই। আমি এখন ঘর থেকে বেরুব না। ভদ্রলোককে তাঁর ঘর দেখিয়ে দাও। খাবারদাবারের ব্যবস্থা কর। আর তিনি যদি তিন্নির সঙ্গে দেখা করতে চান, তাহলে তিন্নিকে খবর দাও। তিন্নি বাগানে গিয়েছে।'

নিজাম চলে গেল। আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ঝড়বৃষ্টি হবে বোধহয়। বাতাস ভারি হয়ে আছে। চারদিকে অসহ্য গুমট।

মিসির আলি এসেছেন সন্ধ্যাবেলায়, এখন রাত এগারটা। কিছুক্ষণ আগেই রাতের খাবার শেষ করেছেন। প্রায় চার ঘন্টার মতো হল, তিনি এ বাড়িতে আছেন। নিজাম এর মধ্যে দু' বার জিজ্ঞেস করেছে, সে তিন্নিকে খবর দেবে কি না। তিনি বলেছেন, খবর দেবার দরকার নেই। কারণ তিন্নি নিশ্চয়ই জানে যে তিনি এসেছেন। আলাদা করে বলার কোনোই প্রয়োজন নেই।

'তিন্নি আছে কোথায়?'

'বাগানে।'

'এই রাতের বেলায় বাগানে কী করছে!'

'জানি না স্যার। কয়েক দিন ধরে সন্ধ্যার পর বাগানে যায়। অনেক রাত পর্যন্ত থাকে।'

'তাই নাকি?'

'জ্বি স্যার।'

'এত রাত পর্যন্ত বাগানে সে কী করে?'

'বাড়ির পিছনের দিকে একটা বড়ই গাছ আছে। সেই বড়ই গাছের কাছে একটা গর্ত, ঐখানে চুপচাপ দাঁড়ায়ে থাকে।'

'ও, আচ্ছা।'

মিসির আলির মুখ দেখে মনে হল, তিনি এই খবরে তেমন অবাক হন নি। বেশ সহজভাবে বললেন, 'তুমি বারান্দায় আমাকে একটা চেয়ার দাও। বারান্দায় বসে আকাশের শোভা দেখি। আর শোন, ভালো করে এক কাপ চা দিও। আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, বৃষ্টি হবে বোধহয়।'

'জ্বি।'

মিসির আলি বারান্দায় এসে বসবার প্রায় সঙ্গে–সঙ্গেই টুপটুপ করে বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে শুরু করল। মিসির আলি অপেক্ষা করতে লাগলেন, কখন তিন্নি বেরিয়ে আসবে। বৃষ্টির বেগ বাড়ছে। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। এ–রকম একটি ঝড়–জলের রাতে বাচ্চা একটি মেয়ে একা–একা বাগানে। কত রকম অদ্ভুত সমস্যা আমাদের চারদিকে। মিসির আলি সিগারেট ধরালেন। ইলেকট্রিসিটি চলে গিয়েছে। কেরোসিনের বাহারি ল্যাম্প জ্বালানো হয়েছে। নিজাম একটি ল্যাম্প বাইরে নিয়ে আসতেই হাওয়া লেগে সেটি দপ করে নিভে গেল। ঠিক তখন মিসির আলি দেখলেন, তিন্নি বের হয়ে আসছে। ভিজে চুপসে গিয়েছে মেয়েটি। তিন্নিই তাঁকে দেখেছে। সে এগিয়ে এল মিসির আলির দিকে।

'আপনি কখন এসেছেন?'

'অনেকক্ষণ হল। তুমি বুঝতে পার নি?'

'না। এখন দেখলাম।'

মিসির আলি বেশ অবাক। মেয়েটি বুঝতে পারল না কেন? টেলিপ্যাথিক ক্ষমতা কি নষ্ট হয়ে গেছে?

নিজাম হাঁ করে তাকিয়ে আছে। সে কী করবে বুঝতে পারছে না। মিসির আলি বললেন, 'তিন্নি, তুমি হাত-মুখ ধুয়ে এস, আমরা গল্প করি। ঝড়বৃষ্টির রাতে গল্প করতে বেশ ভালো লাগে। আর নিজাম, তুমি আমাদের দু' জনের জন্যে চা নিয়ে এস। তিন্নি, তুমি চায়ের সঙ্গে কিছু খাবে?'

'না।'

নিজাম ফিসফিস করে বলল, 'আপা আজ সারাদিন কিছু খায় নাই।'

মিসির আলি বললেন, 'তাহলে কিছু খাবারও নিয়ে এস। হালকা কোনো খাবার।'

'না, আমি কিছুই খাব না, খিদে নেই।'

'ঠিক আছে, না খেলে। এস, গল্প করি। যাও, হাত-মুখ ধুয়ে এস। তোমার সমস্ত পা কাদায় মাখামাখি।'

তিন্নি চলে গেল। নিজাম এক পট চা এনে রাখল সামনে। মিসির আলি অপেক্ষা করতে লাগলেন, কিন্তু মেয়েটি সে রাতে আর তাঁর কাছে এল না। খুব ঝড় হল সারা রাত। শোঁ-শোঁ করে হাওয়া বইতে থাকল। মিসির আলি অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমুতে পারলেন না। তাঁর বারবার মনে হতে লাগল, হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যেই মেয়েটি যোগাযোগ করবে তাঁর সঙ্গে। দু' জন দু' জায়গায় বসে অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করবেন। কিন্তু তা হল না।

সূর্য এখনো ওঠে নি। মিসির আলি দ্রুত পা ফেলছেন। ব্রহ্মপুত্র নদী মনে হচ্ছে এখনো ঘুমিয়ে। দিনের কর্মচাঞ্চল্য শুরু হয় নি। কাল রাতের বৃষ্টির জন্যেই বুঝি চারদিক ঝিলমিল করছে। মিসির আলি গত রাতটা প্রায় অঘুমেই কাটিয়েছেন। কিন্তু তার জন্যে খারাপ লাগছে না। শরীরে কোনো ক্লান্তি নেই, তিনি খুঁজছেন চা-ওয়ালাকে। পাওনা টাকাটা দিয়ে দেবেন। গল্পগুজব করবেন। তাঁর মনে একটা আশঙ্কা ছিল, হয়তো এই চাওয়ালা বুড়োর আর খোঁজ পাওয়া যাবে না। বাকি জীবন মনের মধ্যে এই ক্ষুদ্র ঘটনা কাঁটার মত বিঁধে থাকবে। আশঙ্কা সত্যি হল না। বুড়োকে পাওয়া গেল। কেতলিতে চায়ের পানি ফুটে উঠেছে। কেতলির নল দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। বুড়োর মুখ হাসি-হাসি।

'কেমন আছেন বুড়োমিয়া?'

'আল্লায় যেমন রাখছে। আপনের শইল বালা?'

'জ্বি, ভালো। আমাকে চিনতে পারছেন না? ঐ যে চা খেয়ে পয়সা না দিয়ে চলে গেলাম।'

বুড়ো হেসে ফেলল। মিসির আলি বললেন, 'জরুরি কাজে ঢাকায় চলে গিয়েছিলাম। কাল এসেছি। আপনার টাকা নিয়ে এসেছি। চা কি হয়েছে?'

বুড়ো চায়ের কাপে লিকার ঢালতে লাগল। মিসির আলি বললেন, 'আপনি নিশ্চয়ই মনে-মনে আমাকে খুব গালাগালি করেছেন।'

'জ্বি-না মিয়াসাব। অত অল্প কারণে কি আর গাইল দেওন যায়? আমি জানতাম আপনে আইবেন।'

'কী করে জানতেন?'

'বুঝা যায়।'

এই কথাটি ঠিক। অনেক কিছুই বোঝা যায়। রহস্যময় উপায়ে বোঝা যায়। চায়ের

কাপে চুমুক দিয়ে মিসির আলির মনে হল, তিন্নির ব্যাপার তিনি খানিকটা বুঝতে পারছেন। আবছাভাবে বুঝছেন।

'কি ভাবেন মিয়াসাব?'

'না, কিছু না। উঠি।'

মিসির আলি চায়ের দাম মিটিয়ে রওনা হবেন, ঠিক তখন মাথা ঝিম করে উঠল। তিন্নির পরিষ্কার রিনরিনে গলা, 'আপনি ভালো আছেন?' মিসির আলি আবার বেঞ্চিতে বসে পড়লেন। বুড়ো বলল, 'কি হইছে?'

'শরীরটা একটু খারাপ লাগছে। আমি খানিকক্ষণ বসি?'

'বসেন, বসেন।'

মিসির আলি মনে–মনে তিন্নির সঙ্গে কথা চালিয়ে যেতে লাগলেন।

'গত রাতে তুমি আস নি কেন?'

'ইচ্ছা করছিল না।'

'না এসেও তো কথা বলতে পারতে। তাও বল নি।'

'ইচ্ছা করছিল না।'

'এখন ইচ্ছা করছে?'

'হ্যাঁ করছে। কথা বলতে ইচ্ছা করছে।'

'বল, কথা বল। আমি শুনছি।'

'আমি এখন এখানকার গাছের কথা বুঝতে পারি।'

'বাহ্, চমৎকার তো!'

'তাই রোজ সন্ধ্যাবেলায় বাগানে যাই। ওদের কথা শুনি।'

'দিনের বেলা শুনতে পাও না?'

'না, দিনের বেলায় ওরা কোনো কথা বলে না, চুপ করে থাকে। ওরা কথা বলে শুধু সন্ধ্যার দিকে। রাতে আবার চুপ করে যায়। ওরা তো আর মানুষের মতো না, যে, সারা দিন বকবক করবে।'

'তা তো ঠিকই। ওরা কী কথা বলে তোমার সঙ্গে?'

'আমার সঙ্গে তো কোনো কথা বলে না। ওরা কথা বলে নিজেদের মধ্যে, আমি শুনি।'

'কী নিয়ে কথা বলে?'

'অদ্ভুত জিনিস নিয়ে কথা বলে। বেশির ভাগই আমি বুঝতে পারি না।'

'তবু বল। আমার শুনতে ইচ্ছা করছে।'

'জীবন কী, জীবনের মানে কী-- এইসব নিয়ে তারা কথা বলে। নিজেদের মধ্যে কথা বলে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। আর কথা বলে মানুষদের নিয়ে। পশুপাখিদের নিয়ে। এরা পৃথিবীর মানুষদের কথা জানে। এরা কী বলে, কী করে--এইসব জানে। মানুষদের নিয়ে ভাবে।'

'বাহ্, চমৎকার তো!'

'একটা গাছ যখন মারা যায়, তখন সারা জীবনে যা জানল--তা অন্য গাছদের জানিয়ে যায়। মানুষদের যখন কষ্ট হয়, তখন তাদের কষ্ট হয়। মানুষদের যখন আনন্দ

হয়, তখন তাদেরও আনন্দ হয়।'

'মানুষ যখন একটা গাছকে কেটে ফেলে বা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলে, তখন তারা মানুষদের উপর রাগ করে না?'

'না। তারা রাগ করতে পারে না। তারা তো মানুষের মতো নয়। তারা শুধু ভালবাসে। জানেন, তাদের মনে খুব কষ্ট।'

'কেন বল তো?'

'কারণ, খুব শিগগিরই পৃথিবীতে কোনো মানুষ থাকবে না। কোনো জীব থাকবে না। পৃথিবী আস্তে-আস্তে গাছে ভরে যাবে। এই জন্যেই তাদের দুঃখ।'

'মানুষ থাকবে না কেন?'

'এরা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করে শেষ হয়ে যাবে। অ্যাটম বোমা ফাটাবে। পৃথিবী ছাড়াও তো আরো অনেক গ্রহ আছে যেখানে এক সময় মানুষ ছিল, এখন নেই। এখন শুধু গাছ।'

'গাছদের জন্যে এটা তো ভালোই, তাই নয় কি তিন্নি? শুধু ওরা থাকবে, আর কেউ থাকবে না।'

তিন্নি দীর্ঘ সময় চুপ করে রইল। তারপর মৃদুস্বরে বলল, 'না, ভালো না। ওরা সবাইকে নিয়ে বাঁচতে চায়। সারা জীবনে ওরা যত জ্ঞান লাভ করেছে, এগুলি মানুষকে বলতে চায়। কিন্তু বলার আগেই মানুষ শেষ হয়ে যায়। ওরা বলতে পারে না। এই জন্যে ওদের খুব কষ্ট।'

'মানুষকে ওরা ওদের কথা বলতে পারছে না কেন?'

'বলতে পারছে না, কারণ মানুষ তো এখনো খুব উন্নত হয় নি। ওদের অনেক উন্নত হতে হবে। কিন্তু তা হবার আগেই তো ওরা শেষ হয়ে যায়।'

'এইসব কথা কি তোমার আশেপাশের গাছদের কাছ থেকে জানলে?'

'না। অন্য গাছ আমাকে বলেছে। আমি যখন ঘুমিয়ে থাকি, তখন ওরা বলে।'

'তুমি যে-সব গাছের ছবি আঁক, সেইসব গাছ?'

তিন্নি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'আমার আর কথা বলতে ইচ্ছে করছে না।'

মিসির আলি উঠে দাঁড়ালেন। বুড়ো চাওয়ালা বলল, 'শইলডা কি অখন ঠিক হইছে?'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে। যাই বুড়োমিয়া।'

'কাইল আবার আইসেন।'

'না, কাল আসতে পারব না। কাল আমি ঢাকা চলে যাব। আবার যখন আসব, তখন কথা হবে।'

বরকত সাহেবের সঙ্গে দেখা হল চায়ের টেবিলে। তাঁর মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর। ভালোমতো চোখ তুলে তাকাচ্ছেন না। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে মিসির আলির উপর বেশ বিরক্ত। মিসির আলি এই বিরক্তির কারণ ঠিক ধরতে পারলেন না। মিসির আলি বললেন, 'আপনার শরীর কেমন?'

'আমার শরীর ভালোই। আমার শরীর খারাপ হওয়ার তো কোনো কারণ ঘটে নি।

আপনি ঢাকায় এত দিন কী করলেন?'

'তেমন কিছু করতে পারি নি, খোঁজখবর করছি।'

'খোঁজখবর তো যথেষ্টই করা হল, আর কত?'

'আপনি মনে হয় আশা ছেড়ে দিয়েছেন?'

'হ্যাঁ, ছেড়ে দিয়েছি। এই সমস্যার কোনো সমাধান নেই। আপনি অনেক চেষ্টা করেছেন। সেই জন্যে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার পারিশ্রমিক হিসেবে আমি একটি চেক আপনার জন্যে তৈরি করে রেখেছি, নিজাম আপনাকে দেবে। আমি চাই না এ-ব্যাপারটি নিয়ে আপনি আর মাথা ঘামান।'

মিসির আলি অবাক হয়ে বললেন, 'আমি কিছু বুঝতে পারছি না।'

'ভাগ্যকে স্বীকার করে নেবার চেষ্টা করছি। যা ঘটেছে, এটা আমার ভাগ্য।'

'ভাগ্যটা কী জানতে পারি কি?'

'না, জানতে পারেন না। আমি ঐ সব নিয়ে আর মাথা ঘামাতে চাই না। সমস্ত ব্যাপারটা থেকে আমি হাত ধুয়ে ফেলতে চাই।'

মিসির আলি ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'গোড়া থেকেই আপনি অনেক কিছু আমার কাছ থেকে গোপন করেছেন, যেটা উচিত হয় নি।'

বরকত সাহেব ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'আমি ধারণা করেছিলাম আপনি নিজেই তা ধরতে পারবেন। এখন দেখছি আমার ধারণা ঠিক নয়। আপনি কিছুই ধরতে পারেন নি।

'একেবারেই যে ধরতে পারি নি, তা নয়। আমার ধারণা, আপনার স্ত্রী আপনাকে বলে গিয়েছিলেন, তিন্নি মেয়েটি বড় হলে কেমন হবে। অর্থাৎ আজকের এই সমস্যার ব্যাপারটি সম্পর্কে আপনার স্ত্রী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।'

'এই জাতীয় ধারণা হবার পেছনে আপনার যুক্তি কী?'

'যুক্তি অবশ্যই আছে। এবং বেশ কঠিন যুক্তি।'

'বলুন, শুনি আপনার কঠিন যুক্তি।'

মিসির আলি সিগারেট ধরালেন। বরকত সাহেবের চোখের দিকে তাকালেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। এবং শান্ত স্বরে বললেন, 'আমি প্রথমেই লক্ষ করলাম, আপনি আপনার মেয়ের অস্বাভাবিকতাগুলি মোটামুটি সহজভাবেই গ্রহণ করেছেন, তেমন বিচলিত হন নি। আমাকে ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তিকে জানান নি। এ থেকেই মনে হয়েছে, আপনার মেয়ের এইসব অস্বাভাবিকতা সম্পর্কে আপনি মানসিকভাবে প্রস্তুত। এই প্রস্তুতি কোথেকে আসতে পারে? আমার মনে হয়েছে কেউ নিশ্চয় আগেই আপনাকে বলেছে। কে বলতে পারে? আমার মনে হয়েছে আপনার স্ত্রীর কথা। কারণ আপনার স্ত্রী হচ্ছেন—'

বরকত সাহেব মিসির আলির কথা শেষ করতে দিলেন না। উঠে দাঁড়ালেন এবং কঠিন স্বরে বললেন, 'আমার প্রচণ্ড মাথা ধরেছে, আপনি এখন যান, পরে কথা বলব।'

মিসির আলি নিঃশব্দে উঠে এলেন। চলে গেলেন বাগানে। বড়ই গাছটি খুঁজে বের করবেন। তিন্নি বড়ই গাছের একটা গর্তে দাঁড়িয়ে থাকে, ঐ গর্তটিও পরীক্ষা করে দেখবেন। কিন্তু সেই সুযোগ হল না। ভয়াবহ একটি ব্যাপার ঘটল। প্রকাণ্ড একটা ময়াল সাপ হঠাৎ যেন আকাশ ফুঁড়ে নেমে এল। মিসির আলি চমকে উঠলেন। তাঁর চোখ থেকে চশমা খুলে পড়ল, আর ঠিক তখন মনে হল--এই দৃশ্যটি সত্যি নয়।

ময়মনসিংহ শহরের একটি বাড়িতে এত বড় একটি ময়াল এসে উপস্থিত হতে পারে না। তা ছাড়া কোনো সাপ পেটে ভর দিয়ে নিজের মাথাটা এত উঁচুতে তুলতে পারে না। এই দৃশ্যটি নিশ্চয়ই তিন্নির তৈরি করা। মেয়েটি এই ছবি দেখাচ্ছে। মিসির আলি চোখ বন্ধ করলেন, আর ঠিক তখন তিন্নির হাসি শোনা গেল। মেয়েটি তার ঘরে বসেই হাসছে, তিনি শুনতে পাচ্ছেন। তিন্নির হাসি থামল। সে রিনরিনে গলায় বলল, 'খুব ভয় পেয়েছেন?'

'তা পেয়েছি।'

'কিন্তু যতটা ভয় পাবেন ভেবেছিলাম, ততটা পান নি। আপনি বুঝে ফেলেছেন যে এটা মিথ্যা সাপ।'

'হ্যাঁ, তাও ঠিক।'

'আপনার এত বুদ্ধি কেন বলুন তো?'

'জানি না।'

'সব মানুষের যদি আপনার মতো বুদ্ধি হত, তাহলে খুব ভালো হত। তাই না?'

মিসির আলি হেসে ফেললেন। হাসি থামিয়ে শান্ত গলায় বললেন, 'তুমি আমাকে ভয় দেখালে কেন?'

'আপনি বলুন কেন। আপনার এত বুদ্ধি, আর এই সহজ জিনিসটা বলতে পারবেন না?'

'আন্দাজ করতে পারছি। তুমি চাও না আমি ঐ গর্তটি দেখি, যেখানে তুমি রোজ দাঁড়াও। তাই না?'

'হ্যাঁ, তাই।'

'দেখ তিন্নি, আমি তোমার ব্যাপারটা বুঝতে চাই। কিন্তু তুমি আমাকে বুঝতে দিচ্ছ না। তুমি আমাকে সাহায্য না করলে আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারছি না। আমার এত ক্ষমতা নেই।'

তিন্নি ক্লান্ত গলায় বলল, 'কোনো মানুষ আমাকে সাহায্য করতে পারবে না। যারা পারত, তারা করবে না।'

'কারা পারত?'

তিন্নি জবাব দিল না।

মিসির আলির মনে হল, মেয়েটি কাঁদছে।

১১

মিসির আলি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। দরজায় খুটখুট শব্দ শুনে জেগে উঠলেন। অনেক রাত। ঘড়ির ছোট কাঁটা একের ঘর পার হয়ে এসেছে। তিনি মৃদু স্বরে বললেন, 'কে?' কোনো জবাব এল না। কিন্তু দরজার কড়া নড়ল। মিসির আলি অবাক হয়ে দরজা খুললেন। অন্ধকারে বরকত সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন।

'সরি, আপনার ঘুম ভাঙালাম বোধহয়।'

'কোনো অসুবিধা নেই, আপনি আসুন।'

বরকত সাহেব ইতস্তত করে বললেন, 'ঘুম আসছিল না, ভাবলাম আপনার সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করি।'

'খুব ভালো করেছেন। বসুন।'

বরকত সাহেব বসলেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে, তিনি খুব অস্বস্তি বোধ করছেন। বসে আছেন মাথা নিচু করে। এক জন অহঙ্কারী লোক এভাবে কখনো বসে না। মিসির আলি বললেন, 'আমার মনে হয়, আপনি আপনার স্ত্রীর কথা কিছু বলতে চান। বলুন, আমি শুনছি।'

বরকত সাহেব চুপ করে রইলেন। তাঁর মাথা আরো একটু ঝুঁকে পড়ল। মিসির আলি বললেন, 'আমি বরং বাতি নিভিয়ে দিই, তাতে কথা বলতে আপনার সুবিধা হবে। আলোতে আমরা অনেক কথা বলতে পারি না। অন্ধকারে সহজে বলতে পারি।'

বাতি নেভাবার পর ঘর কেমন অন্য রকম হয়ে গেল। গা ছমছম করতে লাগল। যেন এই ঘরটি এত দিনের চেনা কোনো ঘর নয়। অন্য কোনো রহস্যময় অচেনা ঘর। বরকত সাহেব সিগারেট ধরিয়ে মৃদু স্বরে বলতে লাগলেন, 'আমার স্ত্রী খুবই সহজ এবং সাধারণ একজন মহিলা। বলার মতো তেমন কোনো বিশেষত্ব তার নেই। কোনো রকম অস্বাভাবিকতাও তার চরিত্রে ছিল না। তবে আমার শাশুড়ি এক জন অস্বাভাবিক মহিলা ছিলেন। বিয়ের আগে তা জানতে পারি নি। জেনেছি বিয়ের অনেক পরে।

'আমার স্ত্রীর জন্মের পরপর আমার শাশুড়ি মারা যান। আমার শাশুড়ি সম্পর্কে এখন আপনাকে যা বলছি, সবই শোনা কথা। আমার স্ত্রীর জন্মের ঠিক আগে আগে আমার শাশুড়ি অদ্ভুত আচার-আচরণ করতে থাকেন। তার ভেতর উল্লেখযোগ্য হচ্ছে খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে রোদে বসে থাকা। এখন তিন্নি যা করে, অনেকটা তাই। আমার শাশুড়ি লোকজনদের বলতে শুরু করেন, তাঁর পেটে মানুষের বাচ্চা নয়, তাঁর পেটে বড় হচ্ছে একটা গাছ। সবাই বুঝল এটা মাথা-খারাপের লক্ষণ। গ্রাম্য চিকিৎসাটিকিৎসা হতে থাকল। কোনো লাভ হল না। তিনি বলতেই থাকলেন, তাঁর পেটে বড় হচ্ছে একটা গাছ। যাই হোক, যথাসময়ে আমার স্ত্রীর জন্ম হল—ফুটফুটে একটি মেয়ে। আমার শাশুড়ি মেয়েকে কোলে নিলেন, কিন্তু বললেন, 'তোমরা বুঝতে পারছ না, এ আসলে মানুষ নয়, এ একটা গাছ।' এর কিছু দিন পর আমার শাশুড়ি মারা যান।

আপনাকে আগেই বলেছি, আমার স্ত্রী খুব স্বাভাবিক মহিলা ছিল। কিন্তু তিন্নি যখন পেটে এল, তখন তার ভেতরেও অস্বাভাবিকতা দেখা দিল। এক রাতে সে আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে বলল, 'তার পেটে যে বড় হচ্ছে, সে মানুষ নয়, সে একটা গাছ।' আমি এমন ভাব দেখালাম যে, এই খবরে মোটেও অবাক হই নি। আমি বললাম, 'তাই কি?'

সে বলল, 'হ্যাঁ।'

'কী করে বুঝলে?'

'অনেক দূরের কিছু গাছ আমাকে স্বপ্নে বলেছে। তারা বলেছে, তোমার গর্ভে যে জন্মেছে, তাকে খুব যত্নে বড় করবে। কারণ তাকে আমাদের খুব দরকার।'

'স্বপ্নে তো মানুষ অনেক কিছুই দেখে। স্বপ্নটাকে কখনো সত্যি মনে করতে নেই।'

'এটা সত্যি। এটা স্বপ্ন নয়।'

'ঠিক আছে, সত্যি হলে সত্যি। এখন ঘুমাও।'

তিন্নির জন্মের কিছু দিন পর আমার স্ত্রী মারা গেল। তার মৃত্যুর দু' দিন আগে তিন্নিকে কোলে নিয়ে আমি তার কাছে গেলাম। হাসিমুখে বললাম, 'কী সুন্দর একটি মেয়ে, তুমি বলছ গাছ?'

আমার স্ত্রী ক্লান্ত ভঙ্গিতে হাসল। শান্ত স্বরে বলল, 'তুমি বুঝতে পারছ না। কিন্তু একদিন বুঝবে।' আমি হাসতে-হাসতে বললাম, 'এক দিন সকালবেলা দেখব তিন্নির চারদিকে ডালপালা গজিয়েছে, নতুন পাতা ছেড়েছে?'

আমার স্ত্রী তার জবাব দিল না। কঠিন চোখে তাকিয়ে রইল। যেন আমার কথায় সে অসম্ভব রেগে গেছে।

বরকত সাহেব থামলেন। ঘর অন্ধকার, কিন্তু মিসির আলি পরিষ্কার বুঝতে পারছেন, ভদ্রলোকের চোখ দিয়ে পানি পড়ছে।

'আপনি আমার স্ত্রী সম্পর্কে জানতে চাচ্ছিলেন। আমি যা জানি আপনাকে বললাম। এখন আপনি আমাকে বলুন, কী হচ্ছে?'

মিসির আলি কি বলবেন ভেবে পেলেন না। বরকত সাহেব ধরা গলায় বললেন, 'কিছু দিন থেকে তিন্নি বাগানে একটি গর্তে চুপচাপ ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকে। ফিরে আসে অনেক রাতে। আমার প্রায়ই মনে হয়, একদিন সে হয়তো আর ফিরবে না। সেখানেই থেকে যাবে এবং দেখব—'

বরকত সাহেব কথা শেষ করলেন না। তাঁর গলা বন্ধ হয়ে এল। মিসির আলি বললেন, 'নিন, এক গ্লাস পানি খান।' বরকত সাহেব তৃষ্ণার্তের মতো পানির গ্লাস শেষ করলেন।

'মিসির আলি সাহেব।'

'জ্বি বলুন।'

'তিন্নি এখন আমাকে বলছে বাড়ি ছেড়ে যেতে। সে একা থাকবে এখানে। কাজের লোক থাকবে না, দারোয়ান মালী কেউ থাকবে না। থাকবে শুধু সে একা। এবং আপনি জানেন মেয়েটি যা চায়, তাই আমাকে করতে হবে। ওর অসম্ভব ক্ষমতা। আপনি তার পরিচয় ইতোমধ্যেই হয়তো পেয়েছেন।'

'হ্যাঁ, তা পেয়েছি।'

'কী হচ্ছে আপনি আমাকে বলুন, এবং আমি কী করব, সেটা আমাকে বলুন। আমার শরীরও বেশি ভালো না। ব্লাড প্রেশার আছে, ইদানীং সুগারের প্রবলেম দেখা দিয়েছে। রাতের পর রাত ঘুমুতে পারি না।'

মিসির আলি দৃঢ় গলায় বললেন, 'হাল ছেড়ে দেবার মতো এখনো কিছু হয় নি।'

'হালই তো নেই। হাল ধরবেন কীভাবে?'

বরকত সাহেব উঠে পড়লেন। বাকি রাতটা মিসির আলি জেগেই কাটালেন। অন্ধকার ঘরে শুয়ে শুয়ে সমস্ত ব্যাপারটা গোছাতে চেষ্টা করলেন। 'জিগ স পাজ্‌ল্‌' একটির সঙ্গে অন্যটি কিছুতেই মেলে না। তবু কি কিছু একটা দাঁড় করান যায় না?

একটা পর্যায়ে জীবনকে প্রকৃতি দু' ভাগে ভাগ করলেন--প্রাণী এবং উদ্ভিদ। প্রাণীরা ঘুরে বেড়াতে পারে, উদ্ভিদ পারে না। পরবর্তী সময়ে প্রাণের বিকাশ হল। ক্রমে

–ক্রমে জন্ম হল অসাধারণ মেধাসম্পন্ন প্রাণীর--মানুষ। এই বিকাশ শুধু প্রাণীর ক্ষেত্রে হবে কেন? কেন উদ্ভিদের বেলায়ও হবে না?

ধরা যাক উদ্ভিদের বেলায়ও বিকাশ হল। এক সময় জন্ম হল এমন এক শ্রেণীর উদ্ভিদ, অসাধারণ যাদের মেধা। এই পৃথিবীতে হয়তো হল না, হল অন্য কোনো গ্রহে। একটি উন্নত প্রাণী খুঁজে বেড়াবে অন্য উন্নত জীবনকে। কারণ তারা চাইবে, তাদের আহরিত জ্ঞান অন্যকে জানাতে। তখন তারা কি চেষ্টা করবে না ভিন্ জাতীয় প্রাণের সঙ্গে যোগাযোগের? সেই যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে এমন একটি 'প্রাণ' তার দরকার, যে একই সঙ্গে মানুষ এবং উদ্ভিদ। এ জাতীয় একটি প্রাণ সে তৈরি করতে চেষ্টা করবে। তার জন্যে তাকে ডিএনএ অণুর পরিবর্তন ঘটাতে হবে। প্রথম পরীক্ষাতেই সে তা পারবে না। পরীক্ষাটি তাকে করতে হবে বারবার।

তিন্নি কি এ রকম একজন কেউ? মহাজ্ঞানী উদ্ভিদগোষ্ঠীর পরীক্ষার একটি বস্তু? মানুষ যদি উদ্ভিদ নিয়ে, ইঁদুর নিয়ে ল্যাবরেটরিতে নানান ধরনের পরীক্ষা করতে পারে—ওরা কেন পারবে না?

কিন্তু তারা পরীক্ষাটা করছে কীভাবে? এক জন মানুষ ল্যাবরেটরিতে ইঁদুরের গায়ে একটি সিরিঞ্জে করে রিএজেন্ট ঢুকিয়ে দিতে পারে। কিন্তু উদ্ভিদ কি তা পারবে?

হয়তো পারবে। মাইক্রোওয়েভ রশ্মি দিয়ে আমরা দূর থেকে যন্ত্র চালু করতে পারি। ওদের হাতেও হয়তো তেমন ব্যবস্থা আছে।

মিসির আলি বিছানা ছেড়ে বারান্দায় এসে বসলেন। আকাশে চাঁদ উঠেছে। বাগানটিকে ভারি সুন্দর লাগছে। এত সুন্দর যে মন খারাপ হয়ে যায়।

'আপনি আজ আর ঘুমুলেন না, তাই না?'

মিসির আলি চমকে উঠলেন। তিন্নির গলা।

'তুমিও তো দেখছি জেগে আছ।'

'হ্যাঁ, আমি জেগেই থাকি।'

মিসির আলি কথাবার্তা চালাতে লাগলেন। এ জাতীয় কথাবার্তায় তিনি এখন অভ্যস্ত। আগের মতো অস্বস্তি বোধ হয় না। বরঞ্চ মনে হয়, এই তো স্বাভাবিক। বরঞ্চ কথা বলার এই পদ্ধতি অনেক সুন্দর। মুখোমুখি এসে বসার দরকার নেই। দু' জন দু' জায়গায় থেকে কথা বলে চমৎকার সময় কাটান।

'তিন্নি, আমি যে এতক্ষণ তোমার বাবার সঙ্গে গল্প করলাম-- সেটা কি তুমি জান?'

'হ্যাঁ, জানি। সব কথা শুনেছি।'

'আমি তোমাকে নিয়ে যা ভেবেছি, তাও নিশ্চয়ই জান?

'হ্যাঁ, তাও জানি। সব জানি।

'আমি কি ঠিক পথে এগুচ্ছি? অর্থাৎ আমার থিওরি কি ঠিক আছে?'

'কিছু-কিছু ঠিক। বেশির ভাগই ঠিক না।'

'কোন জিনিসগুলি ঠিক না, সেটা কি আমাকে বলবে?'

'না, বলব না।'

'কেন বলবে না?'

তিন্নি জবাব দিল না। মিসির আলি বললেন, 'তুমি কি চাও না, আমি তোমাকে সাহায্য করি?'

'না, চাই না।'

'এক সময় কিন্তু চেয়েছিলে।'

'তখন খুব ভয় লাগত, এখন লাগে না।'

মিসির আলি খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর খুব শান্ত ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি বুঝতে পারছ, তোমার মধ্যে একটা পরিবর্তন হচ্ছে। তুমি বদলে যাচ্ছ। শেষ পর্যন্ত কী হবে তুমি কি জান?'

'জানি।'

'তুমি কি আমাকে তা বলবে?'

'না।'

'আচ্ছা, এইটুকু বল, তুমি কি একমাত্র মানুষ, যার উপর এই পরীক্ষাটি হচ্ছে? না তুমি ছাড়াও আরো অনেককে নিয়ে এ রকম হয়েছে বা হচ্ছে?'

'অনেককে নিয়েই হয়েছে এবং হচ্ছে। এবং, এবং—'

'বল, আমি শুনছি।'

'এমন একদিন আসবে, পৃথিবীর সব মানুষ এ–রকম হয়ে যাবে।'

'তার মানে!'

'তখন কত ভালো হবে, তাই না? মানুষের কোনো খাবারের কষ্ট থাকবে না। মানুষ কত উন্নত প্রাণী, কিন্তু সে তার সবটা সময় নষ্ট করে খাবারের চিন্তায়। এই সময়টা সে নষ্ট করবে না। কত জিনিস সে জানবে। আরো কত ক্ষমতা হবে তার।'

'কী হবে এত কিছু জেনে?'

তিন্নি খিলখিল করে হেসে উঠল।

মিসির আলি বললেন, 'হাসছ কেন?'

'হাসি আসছে, তাই হাসছি। মানুষ তো এখনো কিছুই জানে না, আর আপনি বলছেন, কী হবে এত জেনে।'

'তুমি বুঝি অনেক কিছু জেনে ফেলেছ?'

'হ্যাঁ।'

'কি কি জানলে বল।'

'তা বলব না। আপনি এখন ঘুমুতে যান।'

'আমার ঘুম পাচ্ছে না, আমি আরো কিছুক্ষণ কথা বলব তোমার সঙ্গে।'

'না, আপনি আর কথা বলবেন না। আপনি এখন ঘুমুবেন এবং সকালে উঠে ঢাকা চলে যাবেন। আর কখনো আসবেন না।'

'আসব না মানে?'

'ইচ্ছা করলেও আসতে পারবেন না। আমার কথা কিছুই আপনার মনে থাকবে না।'

'কী বলছ তুমি!'

'আপনাকে আমার দরকার নেই।'

তিন্নি হাসতে লাগল। মিসির আলি সারা রাত বারান্দায় বসে রইলেন। অস্পষ্ট–

ভাবে তাঁর মনে হতে লাগল, মেয়েটি যা বলছে, তা-ই হবে।

মানুষ যখন কোনো জটিল এক্সপেরিমেন্ট করে, তার সাবধানতার সীমা থাকে না। সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে, যেন তার এক্সপেরিমেন্ট নষ্ট না হয়। কেউ এসে যেন তা ভণ্ডুল না করে দেয়। যারা এই ছোট্ট মেয়েটিকে নিয়ে এই ভয়াবহ এক্সপেরিমেন্ট করছে, তারাও তাই করবে। কে রক্ষা করবে মেয়েটিকে?

ভোররাতের দিকে মিসির আলির শরীর খারাপ লাগতে লাগল। তাঁর কেবলি মনে হল, ঢাকায় কী যেন একটা কাজ ফেলে এসেছেন। খুব জরুরি কাজ। এক্ষুণি ফিরে যাওয়া দরকার। কিন্তু কাজটি কী, তা মনে পড়ছে না। তিনি সকাল আটটায় ঢাকা রওনা হয়ে গেলেন। বরকত সাহেব বা তিন্নি--কারো কাছ থেকে বিদায় পর্যন্ত নিলেন না। তিন্নির ব্যাপারটা নিয়ে বড়-বড় খাতায় গাদাগাদা নোট করেছিলেন। সব ফেলে গেলেন, কিছুই সঙ্গে নিলেন না। ঢাকায় পৌঁছার আগেই প্রচণ্ড জ্বরে জ্ঞান হারালেন।

ট্রেনের এক জন সহযাত্রী দয়াপরবশ হয়ে তাঁকে পৌঁছে দিলেন ঢাকা মেডিকেলে। তিনি প্রায় দু' মাস অসুখে ভুগলেন, সময়টা কাটল একটা ঘোরের মধ্যে। পুরোপুরি সুস্থ হতে তাঁর আরো দু' মাস লাগল। কিন্তু পুরোপুরি বোধহয় সুস্থ হলেনও না। কিছু কিছু জিনিস তিনি মনে করতে পারেন না। যেমন এক দিন অমিতা তাঁকে দেখতে এসে বলল, 'শুধু শুধু আজেবাজে কাজে ছোটাছুটি কর, তারপর একটা অসুখ বাধাও। সেইবার হঠাৎ কুমিল্লা এসে উপস্থিত। যেভাবে হঠাৎ আসা, সেইভাবে হঠাৎ বিদায়। আমি তো ভেবেই পাই না--।'

মিসির আলি অবাক হয়ে বললেন, 'কুমিল্লা! কুমিল্লা কেন যাব!'

'সে কী, তোমার মনে নেই!'

'না তো।'

'তুমি মামা একটা বিয়েটিয়ে করে সংসারী হও।'

নিউমার্কেটে বইয়ের দোকানে এক বার এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। তিনি রাগী গলায় বললেন, 'যাক, আপনার দেখা পাওয়া গেল। বইগুলি তো ফেরত দিলেন না, কেন?'

মিসির আলি অবাক হয়ে বললেন, 'কী বই?'

'কী বই মানে! বোটানির দু'টি বই নিয়ে গেলেন না আমার কাছ থেকে?'

'তাই নাকি?'

'আবার বলছেন তাই নাকি! আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন না? আমি ডঃ জাবেদ।'

'না, আমি তো ঠিক-----।'

মিসির আলি খুবই বিব্রত বোধ করলেন, কিন্তু কিছুই করার নেই। এর প্রায় এক বৎসর পর মিসির আলি ময়মনসিংহের এক অ্যাডভোকেটের কাছ থেকে এক চিঠি পেলেন। চিঠির বিষয়বস্তু হচ্ছে বরকতউল্লাহ্ নামের এক ব্যবসায়ী ময়মনসিংহ শহরের বাড়ি মিসির আলিকে দান করেছেন। বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে কিছু টাকাও ব্যাঙ্কে জমা আছে। টাকার অঙ্কটি অবশ্য উল্লেখ করা হয় নি। মিসির আলি ভেবেই পেলেন না, অপরিচিত এক ভদ্রলোক শুধু-শুধু তাঁকে বাড়ি দেবেন কেন।

সেই বাড়ি দেখেও তাঁর বিস্ময়ের সীমা রইল না। বিশাল বাড়ি। অ্যাডভোকেট

ভদ্রলোক গম্ভীর মুখে বললেন, 'বাড়ি অনেক দিন তালাবন্ধ আছে। বাগানের অবস্থা দেখেন না, জঙ্গল হয়ে আছে!'

মিসির আলি বললেন, 'আমাকে বাড়িটা কেন দেওয়া হয়েছে, সেটাই তো বুঝতে পারছি না।'

অ্যাডভোকেট ভদ্রলোক বিরক্ত মুখভঙ্গি করলেন। মোটা গলায় বললেন, 'দিচ্ছে যখন নিন। ইচ্ছা করলে বিক্রি করে দিতে পারেন। ভালো দাম পাবেন। আমার কাছে কাস্টমার আছে--ক্যাশ টাকা দেবে।'

মিসির আলি বাড়ি বিক্রি করার ব্যাপারে তেমন কোনো আগ্রহ দেখালেন না। ক্লান্ত গলায় বললেন, 'আগে দেখি, বাড়িটা আমাকে কেন দেয়া হল। আজকালকার দিনে কেউ তো আর শুধু-শুধু এ-রকম দান খয়রাত করে না! দানপত্রে কি কিছুই লেখা নেই?'

'তেমন কিছু না, শুধু বাগানের প্রতিটি গাছের যথাসম্ভব যত্ন নেবার জন্যে অনুরোধ করা হয়েছে। উইলের কপি তো পাঠিয়েছি আমি আপনাকে।'

মিসির আলি বাড়ি তালাবন্ধ করে ঢাকা ফিরে এলেন। বরকতউল্লাহ্ লোকটি সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য জোগাড় করলেন। জানতে পারলেন যে, এর একটি অসুস্থ মেয়ে ছিল। মেয়েটির মাথার ঠিক ছিল না। মেয়েটি মারা যাবার পর ঐ বাড়ির কম্পাউন্ডের ভেতরই তার কবর হয়। ভদ্রলোক নিজেও অল্প দিন পর মারা যান। কিন্তু এর সঙ্গে তাঁর কী সম্পর্ক? মিসির আলি বড়ই অবাক হলেন। জগতে রহস্যময় ব্যাপার এখনো তাহলে ঘটে।

১২

পাঁচ বছর পরের কথা।

মিসির আলি তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে ময়মনসিংহে বেড়াতে এসেছেন। তাঁর স্ত্রীর নাম নীলু, হাসিখুশি ধরনের একটি মেয়ে। খুব সহজেই অবাক হয়, অল্পতেই মন-খারাপ করে, আবার সামান্য কারণেই মন ভালো হয়ে যায়।

ময়মনসিংহে আসার নীলুর কোনো ইচ্ছা ছিল না। আসতে হয়েছে মিসির আলির আগ্রহে। তিনি বারবার বলেছেন, 'তোমাকে মজার একটা জিনিস দেখাব।' অনেক চেষ্টা করেও সেই মজার জিনিসটি সম্পর্কে নীলু কিছু জানতে পারে নি। মিসির আলি লোকটি কথা খুব কম বলেন। তিনি প্রশ্নের উত্তরে শুধু হেসে বলেছেন, 'গেলেই দেখবে। খুব অবাক হবে।'

নীলু সত্যি অবাক হল। চোখ কপালে তুলে বলল, 'এই বাড়িটা তোমার! বল কী! কে তোমাকে এই বাড়ি দিয়েছে?'

'দিতে হবে কেন, আমি বুঝি কিনতে পারি না?'

'না, পার না। তোমার এত টাকাই নেই।'

'বরকত সাহেব বলে এক ভদ্রলোক দিয়েছেন।'

'কেন দিয়েছেন?'

'ঐটা একটা রহস্য। রহস্য ভেদ করার চেষ্টা করছি। যখন করব, তখন জানবে।'

গভীর আগ্রহে নীলু বিশাল বাড়িটি ঘুরে-ঘুরে দেখল। বহু দিন এখানে কেউ ঢোকে নি, ভ্যাপসা, পুরোনো গন্ধ। দেয়ালে ঘন ঝুল। আসবাবপত্রে ধুলোর আস্তরণ। বাগানে ঘাস হয়েছে হাঁটু-উঁচু। পেছন দিকটায় কচু গাছের জঙ্গল। মিসির আলি বললেন, 'এ তো দেখছি ভয়াবহ অবস্থা!'

নীলু বলল, 'যত ভয়াবহই হোক, আমার খুব ভালো লাগছে। বেশ কিছু দিন আমি এ বাড়িতে থাকব, কি বল?'

'কী যে বল! এ-বাড়ি এখন মানুষ-বাসের অযোগ্য। মাস দু'-এক লাগবে বাসের যোগ্য করতে।'

'তুমি দেখ না কী করি!'

কোমর বেঁধে ঘর গোছাতে লাগল নীলু। তার প্রবল উৎসাহ দেখে মিসির আলির কিছু বলতে মায়া লাগল। যেন এই মেয়েটি দীর্ঘ দিন পর নিজের ঘর-সংসার পেয়েছে। আনন্দে-উৎসাহে ঝলমল করছে। এক দিনের ভেতর মালী লাগিয়ে বাগান পরিষ্কার করল। বাজার থেকে চাল-ডাল কিনে রান্নার ব্যবস্থা করল। রাতে খাবার সময় চোখ বড়-বড় করে বলল, 'জান, এ বাড়ির ছাদ থেকে পাহাড় দেখা যায়। নীল পাহাড়ের সারি। কী যে অবাক হয়েছি পাহাড় দেখে!'

পাহাড়ের নাম হচ্ছে "গারো পাহাড়"।

'আজ অনেকক্ষণ ছাদে দাঁড়িয়ে পাহাড় দেখলাম। মালী বাগানে কাজ করছিল, আমি পাহাড় দেখছিলাম।'

'ভালো করেছ।'

'ও ভালো কথা, বাগানে খুব অদ্ভুত ধরনের একটা গাছ আছে। ভোরবেলা তোমাকে দেখাব। কোনো অর্কিড-টর্কিড হবে। হলুদ রঙের লতানো গাছ। মেয়েদের চুলে যে রকম বেণী থাকে, সে রকম বেণী-করা। নীল-নীল ফুল ফুটেছে।'

মিসির আলি তেমন কোনো উৎসাহ দেখালেন না। নীলু বলল, 'আচ্ছা, এই বাড়িতে থেকে গেলে কেমন হয়?'

'কী যে বল! ঢাকায় কাজকর্ম ছেড়ে এখানে থাকব?'

'আমি থাকি। তুমি সপ্তাহে-সপ্তাহে আসবে।'

'পাগল হয়েছ নাকি? একা-একা তুমি এখানে থাকবে?'

'আমার কোনো অসুবিধা হবে না। আমার এ-বাড়ি ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না।'

'প্রথম প্রথম এ-রকম মনে হচ্ছে। ক'দিন পর আর ভালো লাগবে না।'

'আমার কখনো এ বাড়ি খারাপ লাগবে না। যদি হাজার বছর থাকি তবুও লাগবে না।'

'আচ্ছা, দেখা যাবে।'

'দেখো তুমি।'

আসলেই তাই হল। মিসির আলি লক্ষ করলেন, এ-বাড়ি যেন প্রবল মায়ায় বেঁধে ফেলেছে নীলুকে। ছুটিছাটা হলেই সে ময়মনসিংহ আসবার জন্যে অস্থির হয়। এক বার এলে আর কিছুতেই ফিরে আসতে চায় না। রীতিমতো কান্নাকাটি করে। বিরক্ত হয়ে মাঝে-মাঝে তাকে একা রেখেও চলে এসেছেন। ভেবেছেন ক' দিন একা থাকলে আর

থাকতে চাইবে না। কিন্তু তা হয় নি। এ বিচিত্র বাড়িটির প্রতি নীলুর আকর্ষণ বাড়তেই থাকল। শেষটায় এ রকম হল যে, বৎসরের প্রায় অর্ধেক সময় তাদের কাটে এই বাড়িতে।

থাকলে আর থাকতে চাইবে না। কিন্তু তা হয় নি। এ বিচিত্র বাড়িটির প্রতি নীলুর আকর্ষণ বাড়তেই থাকল। শেষটায় এ-রকম হল যে, বৎসরের প্রায় অর্ধেক সময় তাদের কাটে এই বাড়িতে।

তাদের প্রথম ছেলেটির জন্মও হল এ-বাড়িতে। ঠিক তখন মিসির আলি লক্ষ করলেন, নীলু যেন পুরোপুরি স্বাভাবিক নয়। এক দিন কথা বলতে বলতে হঠাৎ সে বলল, 'জান আমাদের এ ছেলেটা আসলে একটা গাছ।'

মিসির আলি অবাক হয়ে বললেন, 'এ-কথা বলছ কেন?'

নীলু লজ্জিত স্বরে বলল, 'এমনি বললাম, ঠাট্টা করলাম।'

'এ কেমন অদ্ভুত ঠাট্টা!'

নীলু উঠে চলে গেল। মিসির আলি দেখলেন, সে ছাদে দাঁড়িয়ে দূরের গারো পাহাড়ের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তার চোখ ভেজা।

সেই অজানা লতানো গাছটি আরো লতা ছেড়ে অনেক বড় হয়েছে। প্রচুর ফুল ফুটিয়েছে। দিনের বেলা সে-ফুলের কোনো গন্ধ পাওয়া যায় না, কিন্তু যতই রাত বাড়ে—মিষ্টি সুবাসে বাড়ি ভরে যায়। মিসির আলির অস্বস্তি বোধ হয়। কিন্তু অস্বস্তির কারণ তিনি ধরতে পারেন না।

তিনি তাঁর ছেলেকে নিয়েও খুব দুশ্চিন্তা বোধ করেন। ছেলেটি সবে হামা দিতে শিখেছে। সে ফাঁক পেলেই হামা দিয়ে ছাদে উঠে যায়। চুপচাপ রোদে বসে থাকে। তাকে নামিয়ে আনতে গেলেই হাত-পা ছুঁড়ে বড্ড কান্নাকাটি করে।

বৃহন্নলা

১

অতিপ্রাকৃত গল্পে গল্পের চেয়ে ভূমিকা বড় হয়ে থাকে।

গাছ যত-না বড়, তার ডালপালা তার চেয়েও বড়। এই গল্পেও তাই হবে। একটা দীর্ঘ ভূমিকা দিয়ে শুরু করব। পাঠকদের অনুরোধ করছি তাঁরা যেন ভূমিকাটা পড়েন। এর প্রয়োজন আছে।

আমার মামাতো ভাইয়ের বিয়ে।

বাবা-মা'র একমাত্র ছেলে, দেখতে রাজপুত্র না হলেও বেশ সুপুরুষ। এম· এ· পাস করেছে। বাবার ব্যবসা দেখাশোনা করা এবং গ্রুপ থিয়েটার করা—এই দুইয়ে তার কর্মকাণ্ড সীমিত।

বাবা-মা'র একমাত্র ছেলে হলে যা হয়—বিয়ের জন্যে অসংখ্য মেয়ে দেখা হতে লাগল। কাউকেই পছন্দ হয় না। কেউ বেশি লম্বা, কেউ বেশি বেঁটে, কেউ বেশি ফর্সা, কেউ বেশি কথা বলে, আবার কেউ-কেউ দেখা গেল কম কথা বলে। নানান ফ্যাকড়া।

শেষ পর্যন্ত যাকে পছন্দ হল, সে-মেয়ে ঢাকা ইডেন কলেজে বি·এ· পড়ে—ইতিহাসে অনার্স। মেয়ের বাবা নেই। মা'র অন্য কোথায় বিয়ে হয়েছে। মেয়ে তার বড়চাচার বাড়িতে মানুষ। তিনিই তাকে খরচপত্র দিয়ে বিয়ে দিচ্ছেন।

আমার মামা এবং মামী দু' জনের কেউই এই বিয়ে সহজভাবে নিতে পারলেন না। যে-মেয়ের বাবা নেই, মা আবার বিয়ে করেছে—পাত্রী হিসেবে সে তেমন কিছু না। তা ছাড়া সে খুব সুন্দরীও না। মোটামুটি ধরনের চেহারা। আমার মামাতো ভাই তবু কেন জানি একবারমাত্র এই মেয়েকে দেখেই বলে দিয়েছে—এই মেয়ে ছাড়া আর কাউকে সে বিয়ে করবে না। মেয়ের বাবা নেই তো কী হয়েছে? সবার বাবা চিরকাল থাকে নাকি? মেয়ের মা'র বিয়ে হয়েছে, তাতে অসুবিধাটা কী? অল্প বয়সে বিধবা হয়েছেন, তাঁর তো বিয়ে করাই উচিত। এমন তো না যে, দেশে বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ।

মামা-মামীকে শেষ পর্যন্ত মত দিতে হল, তবে খুব খুশিমনে মত দিলেন না, কারণ মেয়ের বড়চাচাকেও তাঁদের খুবই অপছন্দ হয়েছে। লোকটা নাকি অভদ্রের চূড়ান্ত। ধরাকে সরা জ্ঞান করে। চামার টাইপ।

বিয়ের দিন তারিখ হল।

এক মঙ্গলবার কাকডাকা ভোরে আমরা একটা মাইক্রোবাস এবং সাদা রঙের টয়োটায় করে রওনা হলাম। গন্তব্য ঢাকা থেকে নব্বই মাইল দূরের এক মফস্বল শহর। মফস্বল শহরের নামটা আমি বলতে চাচ্ছি না। গল্পের জন্যে সেই নাম জানার প্রয়োজনও নেই।

তেত্রিশ জন বরযাত্রী। অধিকাংশই ছেলেছোকরা। হৈচৈয়ের চূড়ান্ত হচ্ছে। এই মাইক বাজছে, এই মাইক্রোবাসের ভেতর ব্রেক ডান্স হচ্ছে, এই পটকা ফুটছে। ফাঁকা রাস্তায় এসে মাইক্রোবাসের গিয়ারবক্সে কী যেন হল। একটু পরপর বাস থেমে যায়। সবাইকে নেমে ঠেলতে হয়। বরযাত্রীদের উৎসাহ তাতে যেন আরো বাড়ল। শুধু আমার মামা অসম্ভব গম্ভীর হয়ে পড়লেন। আমাকে ফিসফিস করে বললেন, 'এটা হচ্ছে অলক্ষণ। খুবই অলক্ষণ। রওনা হবার সময় একটা খালি জগ দেখেছি, তখনি মনে হয়েছে একটা কিছু হবে। গিয়ারবক্স গেছে, এখন দেখবি চাকা পাংচার হবে। না হয়েই পারে না।'

হলও তাই। একটা কালভার্ট পার হবার সময় চাকার হাওয়া চলে গেল। মামা বললেন, 'কি, দেখলি? বিশ্বাস হল আমার কথা? এখন বসে-বসে আঙুল চোষ।'

স্পেয়ার চাকা লাগাতেও অনেক সময় লাগল। মামা ছাড়া অন্য কাউকে বিচলিত হতে দেখলাম না।

বরযাত্রীদের উৎসাহ মনে হল আরো বেড়েছে। চিৎকার হৈচৈ হচ্ছে। একজন গান গাওয়ার চেষ্টা করছে। শুধুমাত্র বিয়েবাড়িতে পৌঁছানোর পরই সবার উৎসাহে খানিকটা ভাটা পড়ল।

মফস্বল শহরের বড় বাড়িগুলি সাধারণত যে-রকম হয়, সে-রকম একটা পুরনো ধরনের বাড়ি। এইসব বাড়িগুলি এমনিতেই খানিকটা বিষণ্ন প্রকৃতির হয়। এই বাড়ি দেখে মনে হল বিরাট একটা শোকের বাড়ি। খাঁ-খাঁ করছে চারদিক। লোকজন নেই। কলাগাছ দিয়ে একটা গেটের মতো করা হয়েছে, সেটাকে গেট না-বলে গেটের প্রহসন বলাই ভালো। একদিকে রঙিন কাগজের চেইন, অন্য দিকে খালি। হয় রঙিন কাগজ কম পড়েছে, কিংবা লোকজনের গেট প্রসঙ্গে উৎসাহ শেষ হয়ে গেছে। আমার মামা হতভম্ব। বরযাত্রীরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। ব্যাপারটা কি?

হাফশার্ট-পরা এক চ্যাংড়া ছেলে এসে বলল, 'আপনারা বসেন। বিশ্রাম করেন।'

আমি বললাম, 'আর লোকজন কোথায়? মেয়ের বড়চাচা কোথায়?' সেই ছেলে শুকনো গলায় বলল, 'আছে, সবাই আছে। আপনারা বিশ্রাম করেন।'

আমি বললাম, 'কোনো সমস্যা হয়েছে?'

সেই ছেলে ফ্যাকাসে হাসি হেসে বলল, 'জ্বি-না, সমস্যা কিসের?' এই বলেই সে বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল। আর বেরুল না।

বসার ঘরে চাদর পেতে বরযাত্রীদের বিশ্রামের ব্যবস্থা। বারান্দায় গোটা দশেক ফোল্ডিং চেয়ার। বিয়েবাড়ির সজ্জা বলতে এইটুকুই।

মামা বললেন, 'বলেছিলাম না অলক্ষণ? এখন বিশ্বাস হল? কী কাণ্ড হয়েছে কে জানে! আমার তো মনে হয় বাড়িতে মেয়েই নেই। কারোর সঙ্গে পালিয়েটালিয়ে গেছে। মুখে জুতোর বাড়ি পড়ল, স্রেফ জুতোর বাড়ি।'

মামা অল্পতেই উত্তেজিত হন। গত বছর তাঁর ছোটখাটো স্ট্রোক হয়ে গেছে। উত্তেজনার ব্যাপারগুলি তাঁর জন্যে ক্ষতির কারণ হতে পারে। আমি মামাকে সামলাতে চেষ্টা করলাম। হাসিমুখে বললাম, 'হাত-মুখ ধুয়ে একটু শুয়ে থাকুন তো মামা। আমি খোঁজ নিচ্ছি কী ব্যাপার।'

মামা তীব্র গলায় বললেন, 'হাত-মুখটা ধোব কী দিয়ে, শুনি? হাত-মুখ ধোবার পানি কেউ দিয়েছে? বুঝতে পারছিস না? এরা বেইজ্জতির চূড়ান্ত করার চেষ্টা করছে।'

'কী যে বলেন মামা!'

'কথা যখন অক্ষরে-অক্ষরে ফলবে, তখন বুঝবি কী বলছি। কাপড়চোপড় খুলে ন্যাংটো করে সবাইকে ছেড়ে দেবে। পাড়ার লোক এনে ধোলাই দেবে। আমার কথা বিশ্বাস না-হয়, লিখে রাখ।'

মামার কথা শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গেই খালিগায়ে নীল লুঙ্গি-পরা এক লোক প্লাস্টিকের বালতিতে করে এক বালতি পানি এবং একটা মগ নিয়ে ঢুকল। পাথরের মতো মুখ করে বলল, 'হাত-মুখ ধোন। চা আইতাছে।'

মামা বললেন, 'খবরদার কেউ চা মুখে দেবে না, খবরদার! দেখি ব্যাপার কী।'

ভেতরবাড়ি থেকে কান্নার শব্দ আসছে। বিয়েবাড়িতে কান্না কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। কিন্তু এই কান্না অস্বাভাবিক লাগছে। মধ্যবয়স্ক এক লোক এক বিশাল কেটলিতে করে চা নিয়ে ঢুকল।। আমি তাঁকে বললাম, 'ব্যাপার কী বলেন তো ভাই?' সেই লোক বলল, 'কিছু না।'

ভেতরবাড়ির কান্না এই সময় তীব্র হল। কান্না এবং মেয়েলি গলায় বিলাপ। কান্না যেমন হঠাৎ তুঙ্গে উঠেছিল, তেমনি হঠাৎই নেমে গেল। তার প্রায় সঙ্গে- সঙ্গেই মেয়ের বড়োচাচা ঢুকলেন। ভদ্রলোককে দেখেই মনে হল তাঁর ওপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গেছে। তিনি নিচু গলায় যা বললেন, তা শুনে আমরা স্তম্ভিত। কী সর্বনাশের কথা! জানলাম যে কিছুক্ষণ আগেই তাঁর বড়ছেলে মারা গেছে। অনেক দিন থেকেই অসুখে ভুগছিল। আজ সকাল থেকে খুব বাড়াবাড়ি হল। সব এলোমেলো হয়ে গেছে এই কারণেই। তিনি তার জন্যে লজ্জিত, দুঃখিত ও অনুতপ্ত। তবে যত অসুবিধাই হোক— বিয়ে হবে। আজ রাতে সম্ভব হবে না, পরদিন।

এই কথা বলতে-বলতে তিনি হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলেন।

আমার মামা খুবই আবেগপ্রবণ মানুষ। অল্পতে রাগতেও পারেন, আবার সেই রাগ হিমশীতল পানিতে রূপান্তরিত হতেও সময় লাগে না। তিনি মেয়ের বড়চাচাকে জড়িয়ে ধরে নিজেও কেঁদে ফেললেন। কাতর গলায় বললেন, 'আপনি আমাদের নিয়ে মোটেও চিন্তা করবেন না। আমাদের কিচ্ছু লাগবে না, আপনি বাড়ির ভেতরে যান বেয়াই সাহেব।'

অদ্ভুত একটা অবস্থা! এর চেয়ে যদি শুনতাম মেয়ে পালিয়ে গেছে, তাও ভালো ছিল। কারো ওপর রাগ ঢেলে ফেলা যেত।

আমরা বরযাত্রীরা খুবই বিব্রত বোধ করছি। স্থানীয় লোকজন এখন দেখতে পাচ্ছি।

তারা বোধহয় এতক্ষণ ভেতরের বাড়িতে ছিলেন। আমরা বসার ঘরেই আছি। খিদেয় একেক জন প্রায় মরতে বসেছি। খাবার কোনো ব্যবস্থা হচ্ছে কি না বুঝতে পারছি না। এই পরিস্থিতিতে খাবারের কথা জিজ্ঞেসও করা যায় না। একজন মামাকে কানে-কানে এই ব্যাপারে বলতেই তিনি রাগী গলায় বললেন, 'তোমাদের কি মাথাটাথা খারাপ হয়েছে—এত বড় একটা শোকের ব্যাপার, আর তোমরা খাওয়ার চিন্তায় অস্থির! ছিঃ ছিঃ ছিঃ! এক রাত না খেলে হয় কী? খবরদার, আমার সামনে কেউ খাবারের কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করবে না।'

আমরা চুপ করে গেলাম। বার-তের বছরের ফুটফুটে একটি মেয়ে এসে পানভর্তি একটা পানদান রেখে গেল। কাঁদতে-কাঁদতে মেয়েটি চোখ ফুলিয়ে ফেলেছে। এখনও কাঁদছে।

মামা মেয়েটিকে বললেন, 'লক্ষ্মী সোনা, তোমাদের মোটেই ব্যস্ত হতে হবে না। আমাদের কিছুই লাগবে না।'

রাত আটটার দিকে থাকা এবং খাওয়ার সমস্যার একটা সমাধান হল। স্থানীয় লোকজন ঠিক করলেন, প্রত্যেকেই তাঁদের বাড়িতে একজন-দু'জন করে গেস্ট নিয়ে যাবেন। বিয়ে হবে পরদিন বিকেলে।

আমাকে যিনি নিয়ে চললেন, তাঁর নাম সুধাকান্ত ভৌমিক। ভদ্রলোকের বয়স ষাটের কাছাকাছি হবে। বেঁটেখাটো মানুষ। শক্তসমর্থ চেহারা। এই বয়সেও দ্রুত হাঁটতে পারেন। ভদ্রলোক মৃদুভাষী। মাথার চুল ধবধবে সাদা। গেরুয়া রঙের একটা চাদর দিয়ে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছেন বলেই কেমন যেন ঋষি-ঋষি লাগছে।

আমি বললাম, 'সুধাকান্তবাবু, আপনার বাসা কত দূর?'

উনি বললেন, 'কাছেই।'

গ্রাম এবং মফস্বলের লোকদের দূরত্ব সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। তাদের 'কাছেই' আসলে দিল্লি হনুজ দূর অস্তের মতো। আমি হাঁটছি তো হাঁটছিই।

অগ্রহায়ণ মাস। গ্রামে এই সময়ে ভালো শীত থাকে। আমার গায়ে পাতলা একটা পাঞ্জাবি। শীত ভালোই লাগছে।

আমি আবার বললাম, 'ভাই, কত দূর?'

'কাছেই।'

আমরা একটা নদীর কাছাকাছি এসে পড়লাম। আঁতকে উঠে বললাম, 'নদী পার হতে হবে নাকি?'

'পানি নেই, জুতো খুলে হাতে নিয়ে নিন।'

রাগে আমার গা জ্বলে গেল। এই লোকের সঙ্গে আসাই উচিত হয় নি। আমি জুতো খুলে পায়জামা গুটিয়ে নিলাম। হেঁটে নদী পার হওয়ার কোনো আনন্দ থাকলেও থাকতে পারে। আমি কোনো আনন্দ পেলাম না, শুধু ভয় হচ্ছে কোনো গভীর খানাখন্দে পড়ে যাই কি না। তবে নদীর পানি বেশ গরম।

সুধাকান্তবাবু বললেন, 'আপনাকে কষ্ট দিলাম।'

ভদ্রতা করে হলেও আমার বলা উচিত, 'না, কষ্ট কিসের!' তা বললাম না। নদী পার হয়ে পায়জামা নামাচ্ছি, সুধাকান্তবাবু বললেন, 'আপনি ছেলের কে হন?'

'ফুপাতো ভাই।'

'বিয়েটা না-হলে ভালো হয়। সকালে সবাইকে বুঝিয়ে বলবেন।'

'সে কী!'

'মেয়েটার কারণে ছেলেটা মরল। এখন চট করে বিয়ে হওয়া ঠিক না। কিছুদিন যাওয়া উচিত।'

'কী বলছেন এ-সব!'

'ছেলেটা সকালবেলা বিষ খেয়েছে। ধুতরা বীজ। এই অঞ্চলে ধুতরা খুব হয়।'

'আপনি বলছেন কী ভাই?'

'ছেলের বাবা রাজি হলেই পারত। ছেলেটা বাঁচত। গোঁয়ারগোবিন্দ মানুষ। তার ''না'' মানেই না।'

'ছেলে-মেয়ের এই প্রেমের ব্যাপারটা সবাই জানে নাকি?'

'জানবে না কেন? মফস্বল শহরে এইসব চাপা থাকে না। আপনাদের শহরে অন্য কথা। আকছার হচ্ছে।'

আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। এ কী সমস্যা! বাকি পথ দু' জন নীরবে পার হলাম।

পুরোপুরি নীরব বলাটা বোধহয় ঠিক হল না। ভদ্রলোক নিজের মনেই মাঝে-মাঝে বিড়বিড় করছিলেন। মন্ত্রটন্ত্র পড়ছেন বোধহয়।

ভদ্রলোকের বাড়ি একেবারে জঙ্গলের মধ্যে। একতলা পাকা দালান। প্রশস্ত উঠোন। উঠোনের মাঝখানে তুলসী মঞ্চ। বাড়ির লাগোয়া দু'টি প্রকাণ্ড কামিনী গাছ। একপাশে কুয়া আছে। হিন্দু বাড়িগুলো যেমন থাকে, ছবির মতো পরিচ্ছন্ন। উঠোনে দাঁড়াতেই মনে শান্তি-শান্তি একটা ভাব হল। আমি বললাম, 'এত চুপচাপ কেন? বাড়িতে লোকজন নেই?'

'না।'

'আপনি একা নাকি?'

'হুঁ।'

'বলেন কী! একা-একা এত বড় বাড়িতে থাকেন!'

'আগে অনেক লোকজন ছিল। কিছু মরে গেছে। কিছু চলে গেছে ইণ্ডিয়াতে। এখন আমি একাই আছি। আপনি স্নান করে ফেলুন।'

'স্নান-ফান লাগবে না। আপনি কিছু খাবারের ব্যবস্থা করুন, তাহলেই হবে।

'একটু সময় লাগবে, রান্নার জোগাড় করতে হবে।'

'আপনি কি এখন রান্না করবেন?'

'রান্না না করলে খাবেন কী? বেশিক্ষণ লাগবে না।'

ভদ্রলোক গামছা, সাবান এবং একটা জলচৌকি এনে কুয়ার পাশে রাখলেন।

'স্নান করে ফেলুন। সারা দিন জার্নি করে এসেছেন, স্নান করলে ভালো লাগবে। কুয়ার জল খুব ভালো। দিন, আমি জল তুলে দিচ্ছি।'

'আপনাকে তুলতে হবে না। আপনি বরং রান্না শুরু করুন। খিদেয় চোখ অন্ধকার হয়ে আসছে।'

'এই লুঙ্গিটা পরুন। ধোয়া আছে। আজ সকালেই সোডা দিয়ে ধুয়েছি। আমার

আবার পরিষ্কার থাকার বাতিক আছে, নোংরা সহ্য করতে পারি না।'

ভদ্রলোক যে নোংরা সহ্য করতে পারেন না, তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। তিনি রান্না করতে বসেছেন উঠোনে। উঠোনেই পরিষ্কার ঝকঝকে দুটো মাটির চুলা। সুধাকান্তবাবু চুলার সামনে জলচৌকিতে বসেছেন। থালা, বাটি, হাঁড়ি সবই দেখি দু' বার তিন বার করে ধুচ্ছেন।

'সুধাকান্তবাবু?'

'বলুন।'

'আপনি বিয়ে করেন নি?'

'না।'

'চিরকুমার?'

'ঐ আর কি।'

'আপনি করেন কী?'

'শিক্ষকতা করি। হাই স্কুলের অঙ্কের শিক্ষক। মনোহরদি হাই স্কুল।'

'রান্নাবান্না আপনি নিজেই করেন?'

'হ্যাঁ, নিজেই করি। এক বেলা রান্না করি। এক বেলা ভাত খাই, আর সকালে চিঁড়া, ফলমূল—এ-সব খাই।'

'কাজের লোক রাখেন না কেন?'

'দরকার পড়ে না।'

'খালি বাড়ি পড়ে থাকে, চুরি হয় না?'

'না। চোর নেবে কী? আমি এক জন দরিদ্র মানুষ। আপনি স্নান করে নিন। স্নান করলে ভালো লাগবে।'

অপরিচিত জায়গায় ঠাণ্ডার মধ্যে গায়ে পানি ঢালার আমার কোনোই ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু সুধাকান্তবাবু মনে হচ্ছে আমাকে না ভিজিয়ে ছাড়বেন না। লোকটি সম্ভবত শুচিবাইগ্রস্ত।

কুয়ার পানি নদীর পানির মতো গরম নয়, খুব ঠাণ্ডা। পানি গায়ে দিতেই গা জুড়িয়ে গেল। সারা দিনের ক্লান্তি, বিয়েবাড়ির উদ্বেগ, মৃত্যুসংক্রান্ত জটিলতা—সব ধুয়ে-মুছে গেল। চমৎকার লাগতে লাগল। তা ছাড়া পরিবেশটাও বেশ অদ্ভুত। পুরনো ধরনের একটা বাড়ি। ঝকঝকে উঠোনের শেষ প্রান্তে শ্যাওলা-ধরা প্রাচীন কুয়া। আকাশে পরিষ্কার চাঁদ। কামিনী ফুলের গাছ থেকে ভেসে আসছে মিষ্টি গন্ধ। এক ঋষির মতো চেহারার চিরকুমার বৃদ্ধ রান্না বসিয়েছেন। যেন বিভূতিভূষণের উপন্যাসের কোনো দৃশ্য।

'সুধাকান্তবাবু?'

'বলুন।'

'রান্নার কত দূর?'

'দেরি হবে না।'

'একা-একা থাকতে আপনার খারাপ লাগে না?'

'না, অভ্যেস হয়ে গেছে।'

'বাসায় ফিরে আপনি করেন কী?'

‘তেমন কিছু করি না। চুপচাপ বসে থাকি।’

‘ভয় লাগে না?’

সুধাকান্তবাবু এই প্রশ্নের জবাব দিলেন না।

খাবার আয়োজন সামান্য, তবে এত চমৎকার রান্না আমি দীর্ঘদিন খাই নি। একটা কিসের যেন ভাজি, তাতে পাঁচফোড়নের গন্ধ—খেতে একটু টক-টক। বেগুন দিয়ে ডিমের তরকারি, তাতে ডালের বড়ি দেওয়া। ডালের বড়ি এর আগে আমি খাই নি। এমন একটা সুখাদ্য দেশে প্রচলিত আছে তা-ই আমার জানা ছিল না। মুগের ডাল। ডালে ঘি দেওয়াতে অপূর্ব গন্ধ!

আমি বললাম, ‘সুধাকান্তবাবু, এত চমৎকার খাবার আমি আমার জীবনে খাই নি। দীর্ঘদিন মনে থাকবে।’

সুধাকান্তবাবু বললেন, ‘আপনি ক্ষুধার্ত ছিলেন, তাই এত ভালো লেগেছে। রুচির রহস্য ক্ষুধায়। যেখানে ক্ষুধা নেই, সেখানে রুচিও নেই।’

আমি চমৎকৃত হলাম।

লোকটির চেহারাই শুধু দার্শনিকের মতো না, কথাবার্তাও দর্শনঘেঁষা।

সুধাকান্তবাবু উঠোনে পাটি পেতে দিলেন। খাওয়াদাওয়ার পর সিগারেট হাতে সেখানে বসলাম। কিছুক্ষণ গল্পগুজব করা যেতে পারে। সুধাকান্তবাবুকে অবশ্যি খুব আলাপী লোক বলে মনে হচ্ছে না। এই যে দীর্ঘ সময় তাঁর সঙ্গে আছি, তিনি এর মধ্যে আমার নাম জানতে চান নি। আমি কী করি তাও জানতে চান নি। আমি এই মানুষটির প্রতি যথেষ্ট আগ্রহ বোধ করছি, কিন্তু এই লোকটা আমার প্রতি কোনো আগ্রহ বোধ করছে না।। অথচ আমি আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি, যারা মাস্টারি করে, তারা কথা বলতে খুব পছন্দ করে। অকারণেই কথা বলে।

প্রায় মিনিট পনের আমরা চুপচাপ বসে থাকার পর সুধাকান্তবাবু আমাকে অবাক করে দিয়ে বললেন, ‘আপনি জিজ্ঞেস করছিলেন একা-একা আমি এই বাড়িতে থাকতে ভয় পাই কি না, তাই না?’

আমি বললাম, ‘হ্যাঁ, তাই।’

সুধাকান্তবাবু বললেন, ‘ভয় পাই। প্রায় রাতেই ঘুমুতে পারি না, জেগে থাকি। ঘরের ভেতর আগুন করে রাখি। হারিকেন জ্বালান থাকে। ওরা আগুন ভয় পায়। আগুন থাকলে কাছে আসে না।’

আমি অবাক হয়ে বললাম, ‘কারা?’

তিনি জবাব দিলেন না।

আমি বললাম, ‘আপনি কি ভূতপ্রেতের কথা বলছেন?’

‘হ্যাঁ।’

আমি মনে-মনে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললাম। পৃথিবী কোথায় চলে গিয়েছে—এই বৃদ্ধ তা বোধহয় জানে না। চাঁদের পিঠে মানুষের জুতোর ছাপ পড়েছে, ভাইকিং উপগ্রহ নেমেছে মঙ্গলের মরুভূমিতে, ভয়েজার ওয়ান এবং টু উড়ে গেছে বৃহস্পতির কিনারা ঘেঁষে, আর এই অঙ্কের শিক্ষক ভূতের ভয়ে ঘরে আগুন জ্বালিয়ে রাখছে। কারণ, অশরীরীরা আগুন ভয় পায়।

আমি বললাম, ‘আপনি কি ওদের দেখেছেন কখনো?’

'না।'

'ওদের পায়ের শব্দ পান?'

'তাও না।'

'তাহলে?'

'বুঝতে পারি।'

'বুঝতে পারেন?'

'জ্বি। আপনি যখন আছেন, আপনিও বুঝবেন।'

'ওদের কাণ্ডকারখানা দেখতে পাব, তাই বলছেন?'

'হুঁ, তবে ওদের না, এক জন শুধু আসে।'

'তাও ভালো যে এক জন আসে। আমি ভেবেছিলাম দলবল নিয়ে বোধহয় চলে আসে। নাচ গান হৈ-হল্লা করে।'

'আপনি আমার কথা একেবারেই বিশ্বাস করছেন না?'

'ঠিকই ধরেছেন, বিশ্বাস করছি না। অবশ্যি এই মুহূর্তে আমার গা ছমছম করছে। কারণ, আপনার পরিবেশটা ভৌতিক।'

সুধাকান্তবাবু বললেন, 'ওরা কিন্তু আছে।'

আমি চুপ করে রইলাম। এই বৃদ্ধের সঙ্গে ভূত আছে কি নেই, তা নিয়ে তর্ক করার কোনো অর্থ হয় না। থাকলে থাকুক।

'আমার কাছে যে আসে, সে একটা মেয়ে।'

'তাই নাকি?'

'জ্বি, এগার-বার বছর বয়স।'

'বুঝলেন কী করে তার বয়স এগার-বার? আপনাকে বলেছে?'

'জ্বি-না। অনুমান করে বলছি।'

'তার নাম কি? নাম জানেন?'

'জ্বি-না।'

'সে এসে কী করে?'

সুধাকান্তবাবু বললেন, 'মেয়েটি যে আসছে এই কি যথেষ্ট নয়? তার কি আর কিছু করার প্রয়োজন আছে?'

আমি চুপ করে গেলাম। আসলেই তো, অশরীরী এক বালিকার উপস্থিতিই তো যথেষ্ট। সুধাকান্তবাবু বললেন, 'আপনি নিজেও হয়তো দেখতে পারবেন।' আমি চমকে উঠলাম। ভদ্রলোক সহজ স্বরে বললেন, 'আমি ছাড়াও অনেকে দেখেছে।'

সুধাকান্তবাবু ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেললেন এবং তার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে বিকট একটা হাসি শুনলাম। উঠোন কাঁপিয়ে গাছপালা কাঁপিয়ে হো-হো করে কে যেন হেসে উঠল। সুধাকান্তবাবু পাশে না থাকলে অজ্ঞানই হয়ে যেতাম। আমি তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠলাম, 'কে, কে?'

সুধাকান্তবাবু বললেন, 'ওটা কিছু না।'

আমি ভয়-জড়ানো গলায় বললাম, 'কিছু না মানে?'

'ওটা খাটাশ। মানুষের মতো শব্দ করে হাসে।'

'বলেন কী! খাটাশের নাম তো এই প্রথম শুনলাম। এ তো ভূতের বাবা বলে মনে

হচ্ছে। এখনো আমার গা কাঁপছে।'

'জল খান। জল খেলে ভয়টা কমবে।'

সুধাকান্তবাবু কাঁসার গ্লাসে করে পানি নিয়ে এলেন। খাটাশ নামক জন্তুটি আরেক বার রক্ত হিম-করা হাসি হাসল। সুধাকান্তবাবু যদি কিছু না বলতেন তাহলে ভূতের হাসি শুনেছি, এই ধারণা সারা জীবন আমার মনের মধ্যে থাকত।

লোকটার প্রতি এই প্রথম আমার খানিকটা আস্থা হল। আজগুবি গল্প বলে ভয় দেখান এই লোকের ইচ্ছা নয় বলেই মনে হল। এ-রকম ইচ্ছা থাকলে, এই ভয়ংকর হাসির কারণ সম্পর্কে সে চুপ করে থাকত।

সুধাকান্তবাবু বললেন, 'ঐ মেয়েটার কথা শুনবেন?'

'হ্যাঁ, শোনা যেতে পারে। তবে আমি নিজে অবিশ্বাসী ধরনের মানুষ, কাজেই গল্পের মাঝখানে যদি হেসে ফেলি কিছু মনে করবেন না।'

'এই গল্পটা কাউকে বলতে ভালো লাগে না। অবশ্যি অনেককে বলেছি। এখানকার সবাই জানে।'

'আপনার গল্প এখানকার সবাই বিশ্বাস করেছে?'

সুধাকান্তবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, 'আমি যদি এখানকার কাউকে একটা মিথ্যা কথাও বলি, এরা বিশ্বাস করবে। এরা আমাকে সাধুবাবা বলে ডাকে। আমি আমার এই দীর্ঘ জীবনে কোনো মিথ্যা কথা বলেছি বলে মনে পড়ে না। আমি থাকি একা-একা। আমার প্রয়োজনও সামান্য। মানুষ মিথ্যা কথা বলে প্রয়োজন এবং স্বার্থের কারণে। আমার সেই সমস্যা নেই। এইসব থাক, আমি বরং গল্পটা বলি।'

'বলুন।'

'ভেতরে গিয়ে বসবেন? এখানে মনে হচ্ছে একটু ঠাণ্ডা লাগছে। অগ্রহায়ণ মাসে হিম পড়ে।'

'আমার অসুবিধা হচ্ছে না, এখানেই বরং ভালো লাগছে। গ্রামে তেমন আসা হয় না। আপনি শুরু করুন।'

সুধাকান্তবাবু গল্প শুরু করতে গিয়েও শুরু করলেন না। হঠাৎ যেন একটু অন্য রকম হয়ে গেলেন। যেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিছু দেখতে চেষ্টা করছেন। খসখস শব্দ হল। নতুন কাপড় পরে হাঁটলে যেমন শব্দ হয়, সে-রকম। তার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই কাঁচের চুড়ির টুং-টুং শব্দের মতো শব্দ। আমি বললাম, 'কী ব্যাপার বলুন তো?'

সুধাকান্তবাবু ফ্যাকাসে মুখে হাসলেন। আমি বললাম, 'কিসের শব্দ হল?'

তিনি নিচু গলায় বললেন, 'ও কিছু না, আপনি গল্প শুনুন। আজ ঘুমিয়ে কাজ নেই, আসুন গল্প করে রাত পার করে দিই।'

গা-ছমছমে পরিবেশ। বাড়ির লাগোয়া ঝাঁকড়া কামিনী গাছ থেকে কামিনী ফুলের নেশা-ধরান গন্ধ আসছে। কুয়ার আশেপাশে অসংখ্য জোনাকি জ্বলছে-নিভছে। উঠোনের চুলা থেকে ভেসে আসছে পোড়া কাঠের গন্ধ। আকাশ-ভরা নক্ষত্রবীথি।

সুধাকান্তবাবু গল্প শুরু করলেন।

২

'যুবক বয়স থেকেই আমাকে সবাই ডাকত সাধুবাবা। . . . .

'যদিও ঠিক সাধু বলতে যা বোঝায় আমি তা নই। তবে প্রকৃতিটা একটু ভিন্ন ছিল। সবকিছু থেকে নিজেকে দূরে–দূরে রাখার স্বভাব আমার ছিল। শ্মশান, কবরস্থান এইসব আমাকে ছোটবেলা থেকেই আকর্ষণ করত। অল্প বয়স থেকেই শ্মশান এবং কবরস্থানের আশেপাশে ঘুরঘুর করতাম। আমার বাবা শ্যামাকান্ত ভৌমিক তখন জীবিত। আমার মতিগতি দেখে অল্প বয়সেই আমার বিবাহ ঠিক করলেন। পাশের গ্রামের মেয়ে। ভবানী মিত্র মহাশয়ের প্রথমা কন্যা আরতি। খুবই রূপবতী মেয়ে। গ্রামাঞ্চলে এ–রকম মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না। আমি বিবাহ করতে রাজি হলাম। কথাবার্তা পাকাপাকি হয়ে যাবার পর একটা দুর্ঘটনায় মেয়েটা মারা যায়।'

'কী দুর্ঘটনা?'

'সাপের কামড়। আমাদের এই অঞ্চলে সাপের উপদ্রব আছে। বিশেষ করে কেউটে সাপ।'

'তারপর কী হল বলুন।'

'মেয়েটির মৃত্যুতে খুব শোক পেলাম। প্রায় মাথাখারাপের মতো হয়ে গেল। কিছুই ভালো লাগে না। রাতবিরাতে শ্মশানে গিয়ে বসে থাকি। সমাজ–সংসার কিছুতেই মন বসে না। গভীর বৈরাগ্য। কিছু দিন সাধু–সন্ন্যাসীর খোঁজ করলাম। ইচ্ছা ছিল উপযুক্ত গুরুর সন্ধান পেলে মন্ত্র নেব। তেমন কাউকে পেলাম না।····

'আমার বাবা অন্যত্র আমার বিবাহের চেষ্টা করলেন। আমি রাজি হলাম না। বাবাকে বুঝিয়ে বললাম যে, ঈশ্বরের ইচ্ছা না যে আমি সংসারের বন্ধনে আটকা পড়ি। পরিবারের অন্যরাও চেষ্টা করলেন—আমি সম্মত হলাম না। এ–সব আমার প্রথম যৌবনের কথা। না–বললে আপনি গল্পটা ঠিক বুঝতে পারবেন না। আপনি কি বিরক্ত হচ্ছেন?'

আমি বললাম, 'না, বিরক্ত হব কেন?'

সুধাকান্তবাবু বললেন, 'প্রথম যৌবনের কথা সবাই খুব আগ্রহ করে বলে। আমি বলতে পারি না।'

'আপনি তো ভালোই বলছেন। থামবেন না—বলতে থাকুন।'

সুধাকান্তবাবু আবার শুরু করলেন—

'এরপর অনেক বছর কাটল। শ্মশানে–শ্মশানে ঘুরতাম বলেই বোধহয় ঈশ্বর আমার ঘরটাকেই শ্মশান করে দিলেন। পুরোপুরি একা হয়ে গেলাম। মানুষ যে–কোনো পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নেয়। আমিও মানিয়ে নিলাম। আমার প্রকৃতির মধ্যে একধরনের একাকীত্ব ছিল, কাজেই আমার খুব অসুবিধা হল না। এখন আমি মূল ঘটনায় চলে আসব, তার আগে আপনি কি চা খাবেন?'

'জ্বি–না।'

'খান একটু চা, ভালো লাগবে।'

আমার মনে হল ভদ্রলোকের নিজেরই চা খেতে ইচ্ছে হচ্ছে। আমি বললাম, 'ঠিক আছে, বানান। একটু ঠাণ্ডা–ঠাণ্ডা লাগছে অবশ্যি।'

'ভিতরে গিয়ে বসবেন?'

'জ্বি-না, এখানেই ভালো লাগছে।'

চা শেষ করার পর দ্বিতীয় দফায় গল্প শুরু হল। এইখানে আমি একটা মজার ব্যাপার লক্ষ করলাম। আমার কাছে মনে হল ভদ্রলোকের গলার স্বর পাল্টে গেছে। আগে যে-স্বরে কথা বলছিলেন, এখন সেই স্বরে বলছেন না। একটা পরিবর্তন হয়েছে। আমার মনের ভুল হতে পারে। অনেক সময় পরিবেশের কারণে সবকিছু অন্য রকম মনে হয়।

সুধাকান্তবাবু বলতে শুরু করলেন—

'গত বৎসরের কথা। কার্তিক মাস। আমি বাড়িতে ফিরছি। রাত প্রায় দশটা কিংবা তার চেয়ে বেশিও হতে পারে। আমার ঘড়ি নেই, সময়ের হিসাব ঠিক থাকে না।'

আমি সুধাকান্তবাবুকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার স্কুল তো নিশ্চয়ই চারটা-পাঁচটার দিকে ছুটি হয়। এত রাতে ফিরছিলেন কেন?'

সুধাকান্তবাবু নিচু গলায় বললেন, 'রোজই এই সময়ে বাড়ি ফিরি। সকাল-সকাল বাড়ি ফেরার কোনো উৎসাহ বোধ করি না। পাবলিক লাইব্রেরি আছে। ঐখানে পত্রিকাটত্রিকা পড়ি, গল্পের বই পড়ি।'

'বলুন তারপর কী হল।'

'তারিখটা হচ্ছে বারই কার্তিক, সোমবার। আমি মানুষ হিসাবে বেশ সাহসী। রাতবিরাতে একা-একা ঘোরাফেরা করি। ঐ রাতে রাস্তায় নেমেই আমার ভয়ভয় করতে লাগল। কী জন্যে ভয় করছে সেটাও বুঝলাম না। তখন মনে হল—রাস্তায় একটা পাগলা কুকুর বের হয়েছে, ভয়টা বোধহয় ঐ কুকুরের কারণে। আমি একটা লাঠি হাতে নিলাম। ····

'শুক্লপক্ষের রাত। ফক্‌ফকা জ্যোৎস্না, তবু পরিষ্কার সবকিছু দেখা যাচ্ছে না। কারণ কুয়াশা। কার্তিক মাসের শেষে এদিকে বেশ কুয়াশা হয়। ····

'নদীর কাছাকাছি আসতেই কুকুরটাকে দেখলাম। গাছের নিচে শুয়ে ছিল। আমাকে দেখে উঠে দাঁড়াল এবং পিছনে-পিছনে আসতে লাগল। মাঝে-মাঝে চাপা শব্দ করছে। পাগলা কুকুর পিছনে-পিছনে আসছে, আমি এগুচ্ছি—ব্যাপারটা খুব ভয়াবহ। যে-কোনো মুহূর্তে এই কুকুর ছুটে এসে কামড়ে ধরতে পারে। আমি কুকুরটাকে তাড়াবার চেষ্টা করলাম। ঢিল ছুঁড়লাম, লাঠি দিয়ে ভয় দেখালাম। কুকুর নড়ে না, দাঁড়িয়ে থাকে। চাপা শব্দ করতে থাকে। আমি হাঁটতে শুরু কললেই সেও হাঁটতে শুরু করে। ····

'যাই হোক, আমি কোনোক্রমে নদীর পাড়ে এসে পৌছলাম। তখন আমার খানিকটা সাহস ফিরে এল। কারণ, পাগলা কুকুর পানিতে নামে না। পানি দেখলেই এরা ছুটে পালায়। ····

'অদ্ভুত কাণ্ড, কুকুর পানি দেখে ছুটে পালাল না! আমার পিছনে-পিছনে পানিতে নেমে পড়ল। আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। ····

'আমি নদীর ও-পারে উঠলাম। কুকুরটাও উঠল—আর ঠিক তখন একটা ব্যাপার ঘটল।'

সুধাকান্তবাবু থামলেন।

আমি বিরক্ত গলায় বললাম, 'আপনি জটিল জায়গাগুলিতে দয়া করে থামবেন না। গল্পের মজা নষ্ট হয়ে যায়।'

সুধাকান্তবাবু বললেন, 'এটা কোনো গল্প না। ঘটনাটা কীভাবে বলব ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না বলে থেমেছি।'

'আপনি মোটামুটিভাবে বলুন, আমি বুঝে নেব।'

'কুকুরটা আমার খুব কাছাকাছি চলে এল। পাগলা কুকুর আপনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন কিনা জানি না। ভয়ংকর দৃশ্য। সারাক্ষণ হাঁ করে থাকে। মুখ দিয়ে লালা পড়ে, চোখের দৃষ্টিটাও অন্য রকম। আমি ভয়ে কাঠ হয়ে গেছি। ছুটে পালাব বলে ঠিক করেছি, ঠিক তখন কুকুরটা কেন জানি ভয় পেয়ে গেল। অস্বাভাবিক ভয়। একবার এ-দিকে যাচ্ছে, একবার ও-দিকে যাচ্ছে। চাপা আওয়াজটা তার গলায় আর নেই। সে ঘেউঘেউ করছে। আমার কাছে মনে হল, সে কুকুরের ভাষায় আমাকে কী যেন বলার চেষ্টা করছে। এ-রকম চলল মিনিট পাঁচেক। তার পরই সে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সাঁতরে ও-পারে চলে গেল। পুরোপুরি কিন্তু গেল না, ও-পারে দাঁড়িয়ে রইল এবং ক্রমাগত ডাকতে লাগল।'

'তারপর?'

'আমি একটা সিগারেট ধরালাম। তখন আমি ধূমপান করতাম। মাস তিনেক হল ছেড়ে দিয়েছি। যাই হোক, সিগারেট ধরাবার পর ভয়টা পুরোপুরি কেটে গেল। হাত থেকে লাঠি ফেলে দিলাম। বাড়ির দিকে রওনা হব বলে ভাবছি, হঠাৎ মনে হল নদীর ধার ঘেঁষে বড়ো-হওয়া ঘাসগুলোর মাঝখান থেকে কী-একটা যেন নড়ে উঠল।'

'আপনি আবার ভয় পেলেন?'

'না, ভয় পেলাম না। একবার ভয় কেটে গেলে মানুষ চট করে আর ভয় পায় না। আমি এগিয়ে গেলাম।'

'কুকুরটা তখনো আছে?'

'হ্যাঁ, আছে।'

'তারপর বলুন।'

'কাছাকাছি এগিয়ে গিয়ে দেখলাম একটা মেয়ের ডেডবডি। এগার-বার বছর বয়স। পরনে ডোরাকাটা শাড়ি।'

'বলেন কী আপনি!'

'যা দেখলাম তাই বলছি।'

'মেয়েটা যে মরে আছে তা বুঝলেন কী করে?'

'যে-কেউ বুঝবে। মেয়েটা মরে শক্ত হয়ে আছে। হাত মুঠিবদ্ধ করা। মুখের কষে রক্ত জমে আছে।'

'কী সর্বনাশ!'

'আমি দীর্ঘ সময় মেয়েটার সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম।'

'ভয় পেলেন না?'

'না, ভয় পেলাম না। আপনাকে তো আগেই বলেছি, একবার ভয় পেলে মানুষ দ্বিতীয় বার চট করে ভয় পায় না।'

'তারপর কী হল বলুন।'

'মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। বাচ্চা একটা মেয়ে এইভাবে মরে পড়ে আছে, কেউ জানছে না। কীভাবে না জানি বেচারি মরল। ডেডবডি এখানে ফেলে রেখে যেতে ইচ্ছা করল না। ফেলে রেখে গেলে শিয়াল-কুকুরে ছিঁড়েখুঁড়ে খাবে। আমার মনে হল এই মেয়েটাকে নিয়ে যাওয়া উচিত।'

'আশ্চর্য তো!'

'আশ্চর্যের কিছু নেই। আমার অবস্থায় পড়লে আপনিও ঠিক তাই করতেন।'

'না, আমি তা করতাম না। চিৎকার করে লোক ডাকাডাকি করতাম।'

'আশেপাশে কোনো বাড়িঘর নেই। কাকে আপনি ডাকতেন?'

'তারপর কী হল বলুন।'

সুধাকান্তবাবু বললেন, 'আপনি আমাকে একটা সিগারেট দিন। সিগারেট খেতে ইচ্ছা করছে।'

আমি সিগারেট দিলাম। বৃদ্ধ সিগারেট ধরিয়ে খকখক করে কাশতে লাগলেন।

অমি বললাম, 'তারপর কী হল বলুন।'

সুধাকান্তবাবু বললেন, 'ঘটনাটা এখানে শেষ করে দিলে কেমন হয়? আমার কেন জানি আর বলতে ইচ্ছা করছে না।'

'ইচ্ছে না করলেও বলুন। এখানে গল্প শেষ করার প্রশ্নই ওঠে না।'

'এটা গল্প না।'

'গল্প না যে তা বুঝতে পারছি। তারপর বলুন আপনি কী করলেন। মেয়েটাকে তুললেন?'

'হ্যাঁ তুললাম। কেন তুললাম সেটাও আপনাকে বলি। একটা অপরিচিত মেয়ের শবদেহ কেউ চট করে কোলে তুলে নিতে পারে না। আমি এই কাজটা করলাম, কারণ এই বালিকার মুখ দেখতে অবিকল ···'

সুধাকান্তবাবু থেমে গেলেন। আমি বললাম, 'মেয়েটি দেখতে ঐ মেয়েটির মতো, যার সঙ্গে আপনার বিয়ের কথা হয়েছিল। আরতি?'

'হ্যাঁ, আরতি। আপনার স্মৃতিশক্তি তো খুব ভালো!'

'আপনি আপনার গল্পটা বলে শেষ করুন।'

'মেয়েটি দেখতে অবিকল আরতির মতো। আমি মাটি থেকে তাকে তুললাম। মরা মানুষের শরীর ভারি হয়ে যায়, লোকে বলে। আমি দেখলাম মেয়েটার শরীর খুব হালকা। একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, মেয়েটাকে তোলার সঙ্গে-সঙ্গে কুকুরটা চিৎকার বন্ধ করে দিল। আমার কাছে মনে হল চারদিক হঠাৎ যেন অস্বাভাবিক নীরব হয়ে গেছে। আমি মেয়েটাকে নিয়ে রওনা করলাম।'

'আপনার ভয় করল না?'

'না, ভয় করে নি। মেয়েটার জন্যে মমতা লাগছিল। আমার চোখে প্রায় পানি এসে গিয়েছিল। কার-না-কার মেয়ে, কোথায় এসে মরে পড়ে আছে। বাড়িতে এসে পৌঁছলাম। মনে হচ্ছে নিশুতি রাত। আমি কোলে করে একটা মৃতা বালিকা নিয়ে এসেছি, অথচ আমার মোটেও ভয় করছে না। আমি মেয়েটিকে ঘাড়ের উপর শুইয়ে রেখেই তালা খুলে ঘরে ঢুকলাম। তখন কেন জানি বুকটা কেঁপে উঠল। হাত-পা ঠাণ্ডা

হয়ে এল। আমি ভাবলাম ঘর অন্ধকার বলেই এ-রকম হচ্ছে, আলো জ্বাললেই ভয় কেটে যাবে। মেয়েটাকে আমি বিছানায় শুইয়ে দিলাম। ····

'খাটের নিচে হারিকেন থাকে। আমি হারিকেন বের করলাম। ভয়টা কেন জানি ক্রমেই বাড়তে লাগল। মনে হল ঘরের বাইরে অনেকেই দাঁড়িয়ে আছে। অবাক হয়ে আমার কাণ্ডকারখানা দেখছে। যেন আমার সমস্ত আত্মীয়স্বজনরা চলে এসেছে। আমার বাবা, আমার ঠাকুরদা, আমার ছোটপিসি—কেউ বাদ নেই। ওরা যে নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করছে, তাও আমি শুনতে পাচ্ছি।····

'হারিকেন জ্বালাতে অনেক সময় লাগল। হাত কেঁপে যায়। দেশলাইয়ের কাঠি নিভে যায়, সলতায় আগুন ধরতে চায় না। টপটপ করে আমার গা দিয়ে ঘাম ঝরছে। শেষ পর্যন্ত হারিকেন জ্বলল। আমার নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এল। আমি খাটের দিকে তাকালাম—এটা আমি কী দেখছি! এটা কি সম্ভব? এ-সব কী? আমি দেখলাম, মেয়েটা খাটের উপর বসে আছে। বড়-বড় চোখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমার পায়ের নিচের মাটি কেঁপে উঠল।। মনে হল মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছি। ····

'স্পষ্ট শুনলাম উঠোন থেকে ভয়ার্ত গলায় আমার বাবা ডাকছেন, ও সুধাকান্ত, ও সুধাকান্ত, তুই বেরিয়ে আয়। ও সুধাকান্ত, তুই বেরিয়ে আয়। ও বাপধন, বেরিয়ে আয়।····

'আমি বেরিয়ে আসতে চাইলাম, পারলাম না। পা যেন মাটির সঙ্গে গেঁথে গেছে। সমস্ত শরীর পাথর হয়ে গেছে। আমি মেয়েটির উপর থেকে চোখ সরিয়ে নিতে পারলাম না। মেয়েটি একটু যেন নড়ে উঠল। কিশোরীদের মতো নরম ও কোমল গলায় একটু টেনে-টেনে বলল, ''তুমি একা-একা থাক। বড়ো মায়া লাগে গো! কত বার ভাবি তোমারে দেখতে আসব। তুমি কি আমারে চিনতে পারছ? আমি আরতি গো, আরতি। তুমি কি আমারে চিনছ?''····

'আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো বললাম, ''হ্যাঁ''। ····

''তোমার জন্যে বড় মায়া লাগে গো, বড় মায়া লাগে। একা-একা তুমি থাক। বড় মায়া লাগে। আমি কত ভাবি তোমার কথা। তুমি ভাব না?''····

'আমি যন্ত্রের মতো বললাম, ''ভাবি''। ····

'আমার মনে হল বাড়ির উঠোনে আমার সমস্ত মৃত আত্মীয়স্বজন ভিড় করেছে। আট বছর বয়সে আমার একটা বোন পানিতে পড়ে মারা গিয়েছিল। সেও ব্যাকুল হয়ে ডাকছে—ও দাদা, তুই বেরিয়ে আয় দাদা। আমার ঠাকুরমার ভাঙা-ভাঙা গলাও শুনলাম—ও সুধাকান্ত, সুধাকান্ত। ····

'খাটের উপর বসে-থাকা মেয়েটা বলল, ''তুমি ওদের কথা শুনতেছ কেন গো? এত দিন পরে তোমার কাছে আসলাম। আমার মনটা তোমার জন্যে কান্দে। ওগো, তুমি আমার কথা ভাব না? ঠিক করে বল—ভাব না?'' ····

''ভাবি।'' ····

''আমার গায়ে হাত দিয়ে বল, ভাবি। ওগো আমার গায়ে হাত দিয়ে বল।''····

'আমি একটা ঘোরের মধ্যে আছি। সবটাই মনে হচ্ছে স্বপ্ন। স্বপ্নে সবই সম্ভব। আমি মেয়েটির গা স্পর্শ করবার জন্যে এগুলাম, তখনি আমার মৃতা মা উঠোন থেকে চেঁচালেন—খবরদার সুধাকান্ত, খবরদার! ····

'আমার ঘোর কেটে গেল। এ আমি কী করছি? এ আমি কী করছি? আমি হাতে ধরে রাখা হারিকেন ছুঁড়ে ফেলে ছুটে ঘর থেকে বেরুতে গেলাম। খাটের উপর বসে-থাকা মেয়েটি পিছন থেকে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমার ডান পায়ের গোড়ালি কামড়ে ধরল। ভয়াবহ কামড়! মনে হল পায়ের হাড়ে সে দাঁত ফুটিয়ে দিয়েছে।—

'সে হাত দিয়ে আমাকে ধরল না। কামড়ে ধরে রাখল। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করলাম বেরিয়ে যেতে। কিছুতেই পারলাম না। এতটুকু একটা মেয়ে—কী প্রচণ্ড তার শক্তি! আমি প্রাণপণে চেঁচালাম—কে কোথায় আছ, বাঁচাও। আমাকে বাঁচাও। আমাকে বাঁচাও। তখন একটা ব্যাপার ঘটল। মনে হল কালো একটা কী-যেন উঠোন থেকে ঘরের ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঝাঁপিয়ে পড়ল মেয়েটির উপর। চাপা গর্জন শোনা যেতে লাগল। মেয়েটি আমাকে ছেড়ে দিল। আমি পা টানতে-টানতে উঠোনে চলে এলাম।—

'উঠোনে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারলাম ভিতরে ধস্তাধস্তি হচ্ছে। ধস্তাধস্তি হচ্ছে ঐ পাগলা কুকুর এবং মেয়েটার মধ্যে। মেয়েটা তীব্র গলায় বলছে—ছাড়, আমাকে ছাড়।—

'কুকুরটা ক্রুদ্ধ গর্জন করছে। সেই গর্জন ঠিক কুকুরের গর্জনও নয়। অদেখা ভুবনের কোনো পশুর গর্জন। সেই গর্জন ছাপিয়েও মেয়েটির গলার স্বর শোনা যাচ্ছে—আমারে খাইয়া ফেলতাছে। ওগো তুমি কই? আমারে খাইয়া ফেলতাছে।'

সুধাকান্তবাবু থামলেন।

আমি বললাম, 'তারপর?'

তিনি জবাব দিলেন না। আমি আবার বললাম, 'তারপর কী হল সুধাকান্তবাবু?'

তিনি আমার দিকে তাকালেন। যেন আমার প্রশ্নই বুঝতে পারছেন না। আমি দেখলাম তিনি থরথর করে কাঁপছেন। আমি বললাম, 'কী হল সুধাকান্তবাবু?'

তিনি কাঁপা গলায় বললেন, 'ভয় লাগছে। দেয়াশলাইটা একটু জ্বালান তো!'

আমি দেয়াশলাই জ্বাললাম। সুধাকান্তবাবু তাঁর পা বের করে বললেন, 'দেখুন, কামড়ের দাগ দেখুন।'

আমি গভীর ক্ষতচিহ্নের দিকে তাকিয়ে রইলাম। সুধাকান্তবাবু বললেন, 'ও এখনো আসে। বাড়ির পিছনে থপথপ করে হাঁটে। নিঃশ্বাস ফেলে। জানালার পাট হঠাৎ করে বন্ধ করে দিয়ে ভয় দেখায়। হাসে। নাকী সুরে কাঁদে। একেক দিন খুব বিরক্ত করে। তখন ঐ কুকুরটাও আসে। হুটোপুটি শুরু হয়ে যায়। সাধারণত কৃষ্ণপক্ষের রাতেই বেশি হয়।'

আমি বললাম 'এটা কি কৃষ্ণপক্ষ?'

সুধাকান্তবাবু বললেন, 'না। চাঁদ দেখতে পাচ্ছেন না?'

আমি বললাম, 'আপনি তো ভাই ভয়াবহ গল্প শোনালেন। আমি তো এখন রাতে ঘুমুতে পারব না।'

'ঘুমানর দরকার নেই। কিছুক্ষণের মধ্যে সূর্য উঠবে। চাঁদ ডুবে গেছে দেখছেন না?'

আমি ঘড়ি দেখলাম। চারটা বাজতে কুড়ি মিনিট। সত্যি-সত্যি রাত শেষ হয়ে গেছে।

সুধাকান্তবাবু বললেন, 'চা খাওয়া যাক, কি বলেন?'

'হ্যাঁ, খাওয়া যাক।'

তিনি চুলা ধরিয়ে কেটলি বসিয়ে দিয়ে নিচু গলায় বললেন, 'বড়ো বিরক্ত করে। মাঝে-মাঝে ঢিল মারে টিনের চালে, থু-থু করে থুথু ফেলে। ভয় করে। রাতবিরাতে বাথরুমে যেতে হলে হাতে জ্বলন্ত আগুন নিয়ে যেতে হয়। গলায় এই দেখুন একটা অষ্টধাতুর কবচ। কোমরে সবসময় একটা লোহার চাবি বাঁধা, তবু ভয় কাটে না।'

'বাড়ি ছেড়ে চলে যান না কেন?'

'কোথায় যাব বলেন? পূর্বপুরুষের ভিটে।'

'কাউকে সঙ্গে এনে রাখেন না কেন?'

'কেউ থাকতে চায় না রে ভাই, কেউ থাকতে চায় না।'

সুধাকান্তবাবু চায়ের কাপ হাতে তুলে দিলেন। চুমুক দিতে যাব, তখনি বাড়ির একটা কপাট শব্দ করে নড়ে উঠল। আমি চমকে উঠলাম। হাওয়ার কোনো বংশও নেই—কপাটে শব্দ হয় কেন?

আমি সুধাকান্তবাবুর দিকে তাকালাম। তিনি সহজ গলায় বললেন,'ভয়ের কিছু নেই—চা খান। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভোর হবে।'

বাড়ির পিছনের বনে খচমচ শব্দ হচ্ছে। আসলে আমি অস্থির বোধ করছি। এই অবস্থা হবে জানলে কে আসত এই লোকের কাছে! আমার ইচ্ছে করছে ছুটে পালিয়ে যাই। সুধাকান্তবাবু বললেন, 'ভয় পাবেন না।'

আমি ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে আছি। তিনি একমনে মন্ত্র আওড়াতে লাগলেন।

নিশ্চয়ই ভূত-তাড়ান মন্ত্র। আমি খুব চেষ্টা করলাম ছোটবেলায় শেখা আয়াতুল কুরসি মনে করতে। কিছুতেই মনে পড়ল না। মাথা পুরোপুরি এলোমেলো হয়ে গেছে। গা দিয়ে ঘাম বেরুচ্ছে। ঠিকমতো নিঃশ্বাসও নিতে পারছি না। মনে হচ্ছে বাতাসের অক্সিজেন হঠাৎ করে অনেকখানি কমে গেছে। ভয় নামক ব্যাপারটি যে কত প্রবল এবং কী-রকম সর্বগ্রাসী, তা এই প্রথম বুঝলাম।

একসময় ভোর হল।

ভোরের পাখি ডাকতে লাগল। আকাশ ফর্সা হল। তাকিয়ে দেখি গায়ের পাঞ্জাবি ভিজে জবজব করছে।

৩

আমার মামাতো ভাইয়ের বিয়েটা শেষ পর্যন্ত হল না। মেয়ে কিছুতেই কবুল বলল না। যত বার বলা হল, 'মা, বল কবুল।'

তত বারই মেয়ে কঠিন গলায় বলল, 'না।'

আমি ছেলের পক্ষের সাক্ষীদের এক জন। বড় বিব্রত বোধ করতে লাগলাম। মেয়ের এক খালা বললেন, 'আপনারা একটু পরে আবার আসুন। বাড়িতে এত বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। মনটন খারাপ। বুঝতেই পারছেন।'

আমরা চলে এলাম। ঘন্টাখানেক পর আবার গেলাম। বলা হল,'মা, বল তো

কবুল।' মেয়েটি অস্ফুট গলায় কী-যেন বলল। মেয়ের খালা বললেন, 'এই তো বলেছে। মেয়েমানুষ চিৎকার করে বলবে নাকি? আমি শুনেছি, পরিষ্কার বলেছে। এখন যান, ছেলের কবুল নিয়ে আসুন।'

আমি দৃঢ় গলায় বললাম, 'আমি কিছু শুনতে পাই নি। পরিষ্কার করে বলতে হবে।'

উকিল বললেন, 'মা, বল কবুল।'

মেয়েটি এবার স্পষ্ট করে বলল, 'না।' বলেই তীব্র চোখে আমার দিকে তাকাল। সেই চোখে রাগ ছিল, ঘৃণা ছিল, কিঞ্চিৎ অভিমানও ছিল। যেন সে বলছে—কেন তোমরা আমাকে কষ্ট দিচ্ছ? তোমাদের পায়ে পড়ি, দয়া করে আমাকে মুক্তি দাও।

আমি বললাম, 'বিয়ের ব্যাপারটা আপাতত বন্ধ থাকুক। শোকের ধাক্কাটা কমুক, তারপর দেখা যাবে।'

আমরা চলে এলাম। মফস্বলের ঐ শহরের সাথে কোনো রকম সম্পর্ক রইল না। তবে শহরটার স্মৃতি আমার মনে কাঁটার মতো বিঁধে রইল। স্মৃতির সবটুকুই গভীর বেদনার। আমার মামা ওখান থেকে ফিরে আসার পরপরই মাইয়ো কার্ডিয়াক ইনফ্রাকশানে মারা গেলেন। ছেলের বৌ দেখার খুব শখ ছিল, সেই শখ মিটল না। মামাতো ভাইটিও বিয়ে করতে রাজি হল না। বিচিত্র কারণে সে ঐ মেয়েটির ছবি বুকে পুষতে লাগল। শুধুমাত্র তার মুখের দিকে তাকিয়েই আবার বছরখানেক পর গেলাম ঐ শহরে। শুনলাম মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেছে—ছেলে ডাক্তার।

সুধাকান্তবাবুর সঙ্গেও দেখা হল। আশ্চর্যের ব্যাপার, তিনি আমাকে চিনতে পারলেন না! যখন বললাম, 'আপনার সঙ্গে এক বার সারা রাত কাটালাম, আপনার কিছুই মনে নেই?' তিনি বললেন, 'ও আচ্ছা, মনে পড়েছে।' তাঁর চোখ-মুখ দেখেই বুঝলাম কথাগুলি তিনি ভদ্রতা করেই বললেন, আসলে কিছুই মনে পড়ে নি।

ভদ্রলোক আমাকে ভুলে গিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু আমি তাঁকে মনে রেখেছি এবং বেশ ভালোভাবেই মনে রেখেছি। তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা প্রায়ই মনে হত। সেই অভিজ্ঞতায় আমারও কিছু অংশ আছে। কপাটের শব্দ আমি নিজের কানে শুনে এসেছি। বাতাস নেই, কিছু নেই, অথচ শব্দ করে কে যেন কপাট বন্ধ করল।

কাচের চুড়ির শব্দ। বাড়ির পিছনে খচখচ আওয়াজ—সবই আমার নিজের কানে শোনা।

সুধাকান্তবাবুর এই গল্প অনেকের সঙ্গেই করেছি। খুব আগ্রহ নিয়েই করেছি। ঝড়বৃষ্টির রাতে যখনি ভূতের গল্পের আসর বসেছে, আমি এই গল্প বলেছি। তবে গল্প তেমন জমাতে পারি নি। আমি যেমন অভিভূত হয়েছিলাম, আমি লক্ষ করেছি আমার গল্পের শ্রোতারা তার এক শ' ভাগের এক ভাগও হয় না। অথচ আমি নিজে খুব ভালো গল্প বলতে পারি। হয়তো পরিবেশ একটা ব্যাপার। সুধাকান্তবাবুর বাড়িতে আধোজ্যোৎস্নায় যে-পরিবেশ তৈরি হয়েছিল, ঢাকা শহরের ড্রয়িংরুমে সেই পরিবেশ তৈরি করা সম্ভব নয়। তবু এটি আমার একটি প্রিয় গল্প। যত বার এই গল্প বলেছি, তত বার ঐ রাতের কথা মনে পড়েছে—একধরনের শিহরণ বোধ করেছি।

৪

বছর তিনেক পরের কথা।

সন্ধ্যা সাতটার মতো বাজে। একটা 'সেমিনার টক' তৈরি করছি। বিষয়– পরিবেশ দূষণে পলিমারের ভূমিকা। চারদিকে কাগজপত্র, চার্ট, গ্রাফ নিয়ে বসেছি। সব এলোমেলো অবস্থায় আছে। ঠিক করে রেখেছি, কাজ শেষ না করে উঠব না।

মার্ফি'স ল বলে একটা ব্যাপার আছে। মার্ফি'স ল বলে– Anything that can go wrong, will go wrong—আমার বেলাও তাই হল। একের পর এক সমস্যা হতে লাগল। লিখতে গিয়ে দেখি বলপয়েন্টে কালি আসছে না। কালির কলম নিয়ে দেখা গেল ঘরে কালি নেই।

একের পর এক টেলিফোন আসতে লাগল। আমার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সবাই এত দিন থাকতে আজই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য। তাঁদের কথাও দেখি অনেক জমে আছে, কিছুতেই শেষ হয় না। আমি টেলিফোন রিসিভার উঠিয়ে রাখলাম। দোকান থেকে এক ডজন বলপয়েন্ট আনিয়ে বসলাম, আর তখন আমার বড় মেয়ে বলল, 'বাবা, এক জন লোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।'

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, 'তোমাকে না বলেছি, কেউ এলে বলবে আমি বাসায় নেই?'

আমার মেয়ে বলল, 'আমি মিথ্যা বলতে পারি না, বাবা।'

'মিথ্য কথা বলতে পার না মানে? আমার তো ধারণা, তুমি সারাক্ষণই মিথ্যা কথা বল।'

'মঙ্গলবারে বলি না। মঙ্গলবার হচ্ছে সত্য–দিবস।'

অনেক কষ্টে রাগ সামলালাম। কিছু দিন আগে কী–একটা নাটকে দেখিয়েছে মঙ্গলবার সত্য-দিবস, সেদিন মিথ্যা বলা যাবে না।

আমি মনের বিরক্তি চেপে রেখে বসার ঘরে ঢুকলাম। অপরিচিত এক ভদ্রলোক বসে আছেন। অসম্ভব রোগা, লম্বা এক জন মানুষ—যাকে দেখলেই সরলরেখার কথা মনে হয়। এই গরমে গলায় একটা মাফলার। চোখে মোটা চশমা। ভদ্রলোক বসে আছেন মূর্তির মতো। মনে হচ্ছে ধ্যানে বসেছেন।

ভদ্রলোকের বয়স চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে। লম্বাটে মুখ। দাড়ি আছে। চুল লম্বা। দাড়ি, চুল, পরনের কালো কোট সবই কেমন যেন এলোমেলো। প্রথম দর্শনে মনে হয় ভবঘুরে ধরনের কেউ। তবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে এই ভাবটা চলে যায়। মনে হয় লাজুক ধরনের একজন মানুষ এসেছেন। যে–কোনো কারণেই হোক মানুষটা বিব্রত বোধ করছেন।

আমি বললাম, 'আপনি কি আমার কাছে এসেছেন?'

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'জ্বি।'

'আজ আমি একটা বিশেষ কাজে ব্যস্ত। আপনি কি অন্য একদিন আসতে পারেন?'

'জ্বি, পারি।'

'তাহলে তাই করুন।'

'জ্বি আচ্ছা।'

বলেই ভদ্রলোক আবার বসে পড়লেন। আমি বিস্মিত হয়ে তাকালাম। ভদ্রলোক বললেন, 'বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে, আপনি বোধহয় লক্ষ করেন নি। আমি সঙ্গে ছাতা আনি নি। বৃষ্টিটা কমলেই চলে যাব।'

আমি ফিরে এসে আমার কাজে মন দিলাম। তিন ঘন্টা একনাগাড়ে কাজ করলাম। অসাধ্যসাধন যাকে বলে। আর কোনো ঝামেলা হল না। মার্ফি সাহেবের আইন দেখা যাচ্ছে সবসময় কাজ করে না। আমি ভুলেই গেলাম যে বসার ঘরে একজন ভদ্রলোক বসে আছেন। কী কারণে যেন বসার ঘরে গিয়েছি, ভদ্রলোককে দেখে চমকে উঠলাম।

'আপনি আছেন এখনো?'

'জ্বি।'

'বৃষ্টি তো থেমে গেছে!'

'তা গেছে, কিন্তু কাউকে কিছু না-বলে যাই কী করে?'

আমি লজ্জিত বোধ করলাম। ভদ্রলোক দীর্ঘ সময় একা-একা বসে আছেন। বসার ঘরে কেউ আসে নি, কারণ আমার টিভি শোবার ঘরে। সবাই টিভির সামনে চোখ বড়-বড় করে বসে আছে। টিভিতে নিশ্চয়ই কোনো নাটক হচ্ছে।

আমি বললাম, 'আপনাকে কি ওরা চা দিয়েছে?'

'জ্বি-না।'

'চা খাবেন এক কাপ?'

'আরেক দিন যখন আসব, তখন খাব।'

আমি বললাম, 'আরেক দিন আসার দরকার নেই। আজই বলে ফেলুন। চট করে কি বলতে পারবেন?'

'না, পারব না। আমি আরেক দিন আসব।'

'আপনার নামটা তো জানা হল না।'

'আমার নাম মিসির আলি।'

'আমি কি আপনাকে চিনি?'

'জ্বি-না। চেনার কোনো কারণ নেই। আমি অ্যাবনর্ম্যাল সাইকোলজি বিষয়ে পড়াশোনা করি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্টটাইম শিক্ষক।'

'আমার সঙ্গে আপনার যোগাযোগের কারণটা আমি বুঝতে পারছি না।'

'আরেক দিন যখন আসব, আপনাকে বুঝিয়ে বলব। আজ যাই, রাত হয়ে গেছে।'

ভদ্রলোক চলে গেলেন। ভদ্রলোককে বেশ আত্মভোলা লোক বলেও মনে হল। একটা পলিথিনের ব্যাগ ফেলে গেছেন। ব্যাগে একটা পাউরুটি এবং ছোট-ছোট দুটো কলা। মনে হচ্ছে ভদ্রলোকের সকালবেলার নাশতা।

আমি বুঝতে পারলাম না, অ্যাবনর্ম্যাল সাইকোলজির একজন অধ্যাপক আমার কাছে ঠিক কী চান? আমার আচার-আচরণে অস্বাভাবিক কিছু তো নেই। রহস্যটা কী?

৫

এক সপ্তাহ পর ভদ্রলোক আবার এলেন।

আমিই দরজা খুললাম। ভদ্রলোক বললেন, 'আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন?'

আমি বললাম, 'পারছি। আপনার নাম মিসির আলি। আপনি অ্যাবনর্ম্যাল সাইকোলজির একজন অধ্যাপক। গত সপ্তাহে আমার এখানে এসে একটা পাউরুটি এবং দুটো কলা ফেলে গেছেন।'

ভদ্রলোক হেসে ফেললেন। হাসিটি সুন্দর। শিশুর সারল্যমাখা। আজকাল মাপা হাসি ছাড়া আমরা হাসতে পারি না।

মিসির আলি বললেন, 'আপনার মেয়েটাকে একটু ডাকবেন? তার জন্যে এক প্যাকেট চকলেট এনেছি।'

আমি খানিকটা বিরক্ত হলাম। অপরিচিত লোক দামী চকলেটের প্যাকেট নিয়ে এলে বুঝতে হবে কিছু ব্যাপার আছে।

'আবার চকলেট কেন?'

'আপনার জন্যে তো আনি নি, আপনি বিরক্ত হচ্ছেন কেন? আপনার মেয়েটিকে আমার খুবই পছন্দ হয়েছে। পছন্দের মানুষকে কিছু দিতে ইচ্ছে করে। আপনি কোনো রকম অস্বস্তি বোধ করবেন না। এই উপহারে কোনো রকম স্বার্থ জড়িত নেই। আমি আপনার কাছে কিছু চাইতে আসি নি।'

আমি খানিকটা লজ্জিত বোধ করলাম। ভদ্রলোককে ঘরে বসিয়ে চকলেটের প্যাকেট ভেতরে পাঠিয়ে দিয়ে বললাম, 'কী করতে পারি আপনার জন্যে?'

মিসির আলি বললেন, 'আপনার কাছে আমার এক কাপ চা পাওনা আছে। ঐ পাওনা চা খাওয়াতে পারেন।'

'চা আসবে। এখন আসল ব্যাপারটা বলুন।'

'আপনার কি কোনো তাড়া আছে?'

'না, তাড়া নেই।'

'আমি আপনার কাছে সুধাময়বাবু সম্পর্কে কিছু জানতে এসেছি। আপনি যদি কষ্ট করে বলেন· · ·'

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, 'সুধাময়বাবু কে?"

'আপনি এই নামে কাউকে চেনেন না?'

'জ্বি–না।'

'সুধাময়বাবুর বাড়িতে আপনি কি এক রাত কাটান নি, যেখানে আপনার একটা ভয়াবহ অভিজ্ঞতা হয়।'

'আপনি কি সুধাকান্তবাবুর কথা বলছেন?'

'নাম সুধাকান্ত হতে পারে। গল্পটা আমাকে যে বলেছে, সে সম্ভবত নামে গণ্ডগোল করেছে।'

আমি বললাম, 'আপনি কি আমাকে দয়া করে গুছিয়ে বলবেন, ব্যাপারটা কী? সুধাকান্তবাবুকে আমি ঠিকই চিনি। একটা অসাধারণ গল্প তাঁর মুখ থেকে শুনেছি।

আপনার সঙ্গে সেই গল্পের কী সম্পর্ক বুঝতে পারছি না।'

মিসির আলি বললেন, 'আমার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। তবে রহস্যময় ব্যাপারগুলোর প্রতি আমার একটা আগ্রহ আছে। পৃথিবীতে অনেক রহস্যময় ব্যাপার ঠিকই ঘটে। আবার অনেক কিছু ঘটে—যেগুলোকে আপাতদৃষ্টিতে খুব রহস্যময় মনে হলেও আসলে রহস্যময় নয়। আমি ব্যাপারটা বুঝতে চাই। সুধাকান্তবাবুর চরিত্র আমাকে খানিকটা কৌতূহলী করেছে, কারণ ওর চরিত্রে কিছু অস্বাভাবিক দিক আছে। ঐ সম্পর্কে আমি ভালোভাবে জানতে চাই। তা ছাড়া আপনার গল্পটাও বেশ মজার। এর মধ্যে এমন কিছু এলিমেন্ট আছে, যা প্রচলিত ভূতের গল্পে থাকে না।'

'আপনি কি ভূতের গল্প নিয়ে গবেষণা করছেন নাকি?'

'জ্বি-না। কিছু-কিছু গল্পের প্রতি একধরনের ফ্যাসিনেশন জন্মে যায়। ব্যাপারটা কী, ভালোমতো জানতে ইচ্ছে করে।'

'আমার গল্প আপনি কার কাছ থেকে শুনেছেন?'

'আমার এক ছাত্রের মুখে শুনেছি। সে শুনেছে আপনার কাছে। নাম হচ্ছে রুস্তম। তার কাছ থেকেই আমি আপনার ঠিকানা নিয়েছি।'

'আপনি বলছিলেন গল্পটাতে মজার কিছু এলিমেন্ট আছে, সেগুলো কী?'

'যেমন ধরুন কুকুরের ব্যাপারটা। একদল কুকুর সুধাকান্তবাবুকে ঘিরে ধরল। তারপর তাকে ঘিরে চক্রাকারে হাঁটতে লাগল এবং একটি বিশেষ দিকে নিয়ে যেতে লাগল। যেখানে নিয়ে গেল সেখানে একটা যুবতীর নগ্ন মৃতদেহ, যাকে কিছুক্ষণ আগেই হত্যা করা হয়েছে।'

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, 'এ-রকম কিছুই কিন্তু গল্পে নেই। কোনো নগ্ন যুবতীর মৃতদেহ পড়ে ছিল না। একটি বালিকার ডেডবডি ছিল। তার পরনে শাড়ি ছিল।'

মিসির আলি হাসতে-হাসতে বললেন, 'আমিও তাই ভাবছিলাম। গল্প যখন এক জনের মুখ থেকে অন্য জনের মুখে যায়, তখন ডালপালা ছড়ায়। অনেক সময় মূল গল্প খুঁজে পাওয়া যায় না। এই জন্যেই আমি এসেছি আপনার মুখ থেকে গল্পটা শোনার জন্যে। যদি আপনার কষ্ট না হয়।'

'আমার কোনো কষ্ট হবে না। আমি আগ্রহ করে গল্পটা বলব।'

মিসির আলি কোটের পকেট থেকে নোট বই এবং কলম বের করলেন। আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, 'আপনি কি নোট করছেন নাকি!'

'দু'-একটা পয়েন্ট লিখে রাখব। আমার স্মৃতিশক্তি ভালো, তবু মাঝে-মাঝে কিছু নোট রাখি। স্মৃতি মানুষকে প্রতারণা করে, লেখা করে না।'

চা চলে এল। চা খেতে-খেতে ভদ্রলোক গল্প শুনলেন। তবে গল্প বলে আমি কোনো আরাম পেলাম না। ভদ্রলোক গল্পের মাঝখানে একবারও বললেন না—অদ্ভুত তো! তারপর কী হল? কী আশ্চর্য!

তিনি পাথরের মতো মুখ করে গল্প শুনলেন এবং গল্প শেষ হওয়ামাত্র বললেন, 'আচ্ছা তাহলে যাই। আপনাকে কষ্ট দিলাম, কিছু মনে করবেন না।'

আমি বললাম, 'আপনার কাজ হয়ে গেল?'

'জ্বি।'

'গল্পটা কি আপনার কাছে অদ্ভুত মনে হয় নি?'

'জ্বি-না, ভূতের গল্প সাধরণত এ-রকমই হয়। নতুনত্ব কিছু নেই। আমার শুধু একটা প্রশ্ন, মেয়েটার ডেডবডি কি শেষ পর্যন্ত ছিল?'

'তার মানে?'

'এ-জাতীয় গল্পে ডেডবডি শেষ পর্যন্ত থাকে না। বাতাসে মিলিয়ে যায় কিংবা কুকুর খেয়ে ফেলে। আপনি জানেন, কী হয়েছিল?'

'আমি জানি না, আমি জিজ্ঞেস করি নি। আপনি গল্পটার কিছুই বিশ্বাস করেন নি, তাই না?'

'জ্বি-না।'

'কেন, দয়া করে বলবেন কি?'

'এই জাতীয় ভয়াবহ অভিজ্ঞতা যখন হয়, তখন মানুষ খুব কনফিউজড্ অবস্থায় থাকে। কোনো ঘটনাই সে পরিষ্কার দেখে না। যা দেখে তাও সে গুছিয়ে বলতে পারে না। অথচ আপনার সুধাকান্তবাবু চমৎকারভাবে সব বর্ণনা করলেন। অতি সূক্ষ্ম ডিটেলও বাদ দিলেন না। এই জিনিস পাওয়া যায় তৈরি-করা গল্পে।'

আমি বললাম,'সব মানুষ তো এক রকম নয়। কিছু-কিছু মানুষ বিপর্যয়ের সময়ও মাথা ঠাণ্ডা রাখে।'

'তা রাখে। যেমন আমি নিজেই রাখি।'

'তার পরেও আপনি বললেন এটা একটা গল্প?'

'জ্বি।'

'কেন বলুন তো?'

'সুধাকান্তবাবু আপনার কথামতো একজন ধর্মপ্রাণ মানুষ, সাধু-প্রকৃতির লোক। এই ধরনের একজন মানুষ বিপদে ঈশ্বরের নাম নেবে, গায়ত্রী মন্ত্র পড়বে। একজন নাস্তিক পর্যন্ত যে-কাজটা করবে, তিনি করেন নি। ঘটনা সত্যি-সত্যি ঘটলে তিনি তা অবশ্যই করতেন। যেহেতু ঘটনাটা বানান, কাজেই এই গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটা বাদ পড়েছে।'

আমি ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে রইলাম। লোকটার ওপর খানিকটা রাগ হচ্ছে। এককথায় সে বলে দিল গল্প বানান?

মিসির আলি বললেন, 'আপনার সঙ্গে যখন গল্প করছিলেন, তখন ভয় পেয়ে ভদ্রলোক মন্ত্রপাঠ শুরু করলেন, অথচ ঐ রাতে করলেন না। ব্যাপারটা অদ্ভুত না?'

আমি বললাম, 'সুধাকান্তবাবু শুধু-শুধু এ-রকম একটা গল্প বানাবেন কেন? এই রকম একটা গল্প তৈরির পিছনে কোনো একটা কারণ থাকবে নিশ্চয়ই।'

'তা তো থাকবেই। তাঁরও আছে।'

'কী কারণ?'

'অনেক কারণ হতে পারে। তবে আমার যা মনে হয, তা হচ্ছে উনি নিঃসঙ্গ ধরনের মানুষ, এই জাতীয় একটা গল্প তৈরি করে নিজে সবার আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছেন। এটা এক জন নিঃসঙ্গ মানুষের জন্যে কম কথা নয়।'

মিসির আলি লোকটির প্রতি আমার ভক্তি হল। লজিক বা 'যুক্তি' নামক ব্যাপারটা যে কত শক্তিশালী হতে পারে, মিসির আলি তা আমার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে

দিলেন।

আমি বললাম, 'এই গল্পটা যে সত্যি, এটা আপনি কখন স্বীকার করবেন? অর্থাৎ কোন প্রমাণ উপস্থিত করলে আপনি গল্পটা মেনে নেবেন?'

মিসির আলি হাসতে-হাসতে বললেন, 'ঐ মেয়েটির ডেডবডি যদি অন্যরা দেখে থাকে এবং কবর দেওয়া হয় বা দাহ করা হয়, তবেই আমি ঘটনাটা মেনে নেব।'

'আমি আপনাকে খবরটা এনে দেব। আমি চিঠি লিখে খবরটা জোগাড় করব। আপনি আপনার ঠিকানা লিখে রেখে যান।'

মিসির আলি তাঁর ঠিকানা লিখে রেখে চলে গেলেন। আশ্চর্য কাণ্ড, আজও তাঁর পলিথিনের ব্যাগ ফেলে গেলেন। ব্যাগের ভেতর ছোট্ট একটা পাউরুটি, একটা কলা এবং এক টুকরো মাখন। গরমে সেই মাখন গলে ব্যাগময় ছড়িয়ে পড়েছে।

৬

চিঠি লিখলাম আমার মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে যে-মেয়েটির বিয়ের কথা হয়েছিল, সেই মেয়ের বড়চাচাকে। আমার ধারণা ছিল ভদ্রলোক জবাব দেবেন না। যে-পরিচয়ের সূত্র ধরে চিঠি লিখেছি, সেই সূত্রে চিঠির জবাব দেওয়ার কথা নয়। ভদ্রলোক কিন্তু জবাব দিলেন। এবং বেশ গুছিয়েই জবাব দিলেন।

'আপনার পত্র পাইয়াছি।

এক নিতান্ত দুর্ভাগ্যজনক অবস্থায় আপনাদের সহিত পরিচয় হইয়াছিল। আপনি যে সেই পরিচয় মনে রাখিয়া পত্র দিয়াছেন তাহাতে কৃতজ্ঞ হইলাম। আপনি আমার ভাইস্তি প্রসঙ্গে জানিতে চাহিয়াছেন। দুই বৎসর আগে তাহার বিবাহ হইয়াছে। এই খবর তো আপনার জানা। সে এখন তাহার স্বামীর সহিত ইরাকে আছে। তাহার স্বামী একজন ডাক্তার। আপনাদের দোয়ায় তাহারা ভালোই আছে।

দ্বিতীয় যে-বিষয়টি আপনি জানিতে চাহিয়াছেন, তাহার সবই সত্য। কুকুরের কামড়ে ছিন্নভিন্ন বালিকাটির দেহ আমরা সবাই দেখিয়াছি। তাহার মৃতদেহ সৎকারের কোনো ব্যবস্থা হয় নাই, কারণ বালিকাটি হিন্দু কি মুসলিম তাহা জানা সম্ভব হয় নাই।

ঘটনাটি সেই সময় জনমনে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার মফস্বল পাতায় খবরও ছাপা হইয়াছিল।

অধিক আর কি? আমরা ভালো আছি। আপনার সর্বাঙ্গীণ কুশল কামনা করি।'

আমি চিঠিটি ডাকযোগে মিসির আলির ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলাম। মনে-মনে হাসলাম। অভ্রান্ত যুক্তিও মাঝে-মাঝে অচল হয়ে যায়। এই চিঠিটি হচ্ছে তার প্রমাণ।

চিঠি পাঠাবার তৃতীয় দিনের মাথায় মিসির আলি এসে উপস্থিত। আমি হেসে বললাম, 'কি, গল্পটা এখন বিশ্বাস করলেন?'

মিসির আলি শুকনো গলায় বললেন, 'হুঁ।'

তাঁকে খুব চিন্তিত মনে হল।

আমি বললাম, 'আপনাকে এত চিন্তিত মনে হচ্ছে কেন?'

মিসির আলি বললেন, 'আমি আপনার কাছ থেকে গল্পটা আবার শুনতে চাই।'

'কেন?

'প্লীজ, আরেক বার বলুন।'

'আবার কেন?'

'বলুন শুনি।'

আমি দ্বিতীয় বার গল্পটা শুরু করলাম। এক জায়গায় মিসির আলি আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'কত তারিখ বললেন?'

'বারই কার্তিক। এই তারিখে ঘটনাটা ঘটল।'

'বারই কার্তিক তারিখটা আপনার মনে আছে?'

'হ্যাঁ, আছে। প্রথম বার যখন আপনাকে গল্পটা বলি, তখনও তো বারই কার্তিক বলেছিলাম বলে আমার মনে হয়।'

'হ্যাঁ, বলেছিলেন। আজও সেই একই তারিখ বলেন কি না তাই দেখতে চেয়েছি। এই তারিখটা বেশ জরুরি।'

'জরুরি কেন?'

'বলছি কেন। তার আগে আপনি বলুন বার তারিখটা আপনার মনে রইল কেন? এ-সব দিন-তারিখ তো আমাদের মনে থাকে না।'

'বার তারিখ আমার বড়মেয়ের জন্মদিন। কাজেই সুধাকান্তবাবু বার তারিখ বলামাত্র আমার মনে গেঁথে গেল। তা ছাড়া আমার স্মৃতিশক্তি ভালো।'

'তাই তো দেখছি।'

'এখন বলুন তারিখটা এত জরুরি কেন?'

'যে-বছরে ঘটনাটা ঘটল, আমি সেই বছরের পঞ্জিকা দেখেছি। বার তারিখ হচ্ছে ২৪শে অক্টোবর। স্কুল ছুটি থাকে। ঐদিন লক্ষ্মীপূজার বন্ধ। কাজেই আপনার সুধাকান্তবাবু আপনাকে একটা মিথ্যা কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, ঐদিন স্কুল করেছেন।'

'হয়তো উনিই তারিখটা ভুল বলেছেন।'

'হ্যাঁ, তা হতে পারে। তবে আমি তাঁর নিজের মুখে ঘটনাটা শুনতে চাই।'

'আবার শুনতে চান?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারছি না।'

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, 'বিশ্বাস করতে না চাইলে করবেন না। আপনাকে বিশ্বাস করতেই হবে এমন কোনো কথা আছে?'

মিসির আলি বললেন, 'আপনি কি একটু যাবেন আমার সঙ্গে?'

'কোথায়?'

'ঐ জায়গায়।'

'কেন?'

'তাহলে জেনে আসতাম তারিখটা বার কিনা।'

'আপনি কি পাগল নাকি ভাই?'

মিসির আলি বললেন, 'ব্যাপারটা খুব জরুরি। আমাকে জানতেই হবে।'

'জানতে হলে আপনি যান। আমি আপনাকে ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছি।'

'আপনি যাবেন না?'

'জ্বি-না। আজেবাজে ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানর সময় আমার নেই।'

'এটা আজেবাজে ব্যাপার না।'

'আমার কাছে আজেবাজে। আমার যাবার প্রশ্নই ওঠে না।'

মিসির আলি মুখ কালো করে উঠে গেলেন। আমি মনে-মনে বললাম, ভালো পাগলের পাল্লায় পড়েছি। লোকটা মনে হল অ্যাবনর্ম্যাল। অ্যাবনর্ম্যাল সাইকোলজি করতে-করতে নিজেও ঐ পর্যায়ে পৌছেছে। এরা দেখি বিপজ্জনক ব্যক্তি!

মিসির আলি যে কী পরিমাণ বিপজ্জনক ব্যক্তি তা টের পেলাম দিন দশেক পর। আমার ঠিকানায় মিসির আলির এক চিঠি এসে উপস্থিত।

'ভাই,

আপনি কেমন আছেন?

আমি সুধাকান্তবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। দেখা হয় নি। উনি তাঁর দূর সম্পর্কের এক বোনের বাড়ি চলে গিয়েছেন বলে দেখা হয় নি। শুনলাম, তিনি সেখানে পুরো গরমের ছুটিটা কাটাবেন। যাই হোক, ওঁর অনুপস্থিতিতে আমি কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছি। থানায় গিয়ে থানার রেকর্ডপত্র দেখেছি। ঐখানে ঘটনার তারিখ ২৩শে অক্টোবর দিবাগত রাত। অর্থাৎ ১১ই কার্তিক। কাজেই সুধাকান্তবাবু তারিখ বলায় একটু ভুল করেছেন বলে মনে হয়। আমি স্থানীয় স্কুলের হেডমাস্টার সাহেবের সঙ্গেও কথা বলেছি। তিনি বলেছেন, ঐদিন সুধাকান্তবাবু ঠিকই সারা দিন ক্লাস করেছেন। কাজেই সুধাকান্তবাবু মিথ্যা বলেন নি। তারিখে ভুল করেছেন।

তারিখ ভুল করা খুব অস্বাভাবিক নয়। ভদ্রলোকের স্মৃতিশক্তি তেমন ভালো না। কারণ আপনার মুখেই শুনেছি দ্বিতীয় বার যখন তাঁর সঙ্গে আপনার দেখা হয়, তখন তিনি আপনাকে চিনতে পারেন নি।

থানার ওসি সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম—পোস্টমর্টেম করা হয়েছিল কি?

উনি বললেন—পোস্টমর্টেমের মতো অবস্থা ছিল না। কুকুর সব ছিঁড়েখুঁড়ে খেয়ে ফেলেছে। ছিন্নভিন্ন কিছু অংশ ছড়িয়ে ছিল। গ্রামের অন্যরাও তাই বলল।

মেয়েটি কোথাকার তাও জানা যায় নি। আমি এত দিন পর এ-সব খোঁজ করছি দেখে তারা প্রথমে একটু অবাক হলেও পরে আমাকে আগ্রহ করে সাহায্য করেছে, কারণ তাদের বলেছি আমার কাজই হচ্ছে রহস্যময় ঘটনা সংগ্রহ করা। গ্রামবাসীদের ধারণা, মেয়েটির অশরীরী আত্মা এখনো ঐ বাড়িতে ঘুরে বেড়ায়। নানান রকম শব্দ শোনা যায়। মেয়েলি কান্না, দরজা-জানালা আপনা-আপনি বন্ধ হওয়া—এইসব। আমি ব্যাপারটা পরীক্ষা করার জন্যে দু' রাত এই বাড়ির উঠোনে বসে ছিলাম। তেমন কিছু দেখি নি বা শুনি নি। তবে এক বার বাড়ির পিছনে মানুষ দৌড়ে যাবার শব্দ শুনেছি। এটা শেয়ালের দৌড়ে যাবার শব্দও হতে পারে। সারা জীবন শহরে মানুষ হয়েছি বলে এই জাতীয় শব্দের সঙ্গে আমার তেমন পরিচয়

নেই।

আপনাকে চিঠিতে সব জানাচ্ছি, কারণ আমার শরীরটা খুবই খারাপ। ওখান থেকে এসেই প্রবল জ্বরে পড়ে যাই। এক বার রক্তবমি হয় বলে ভয় পেয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছি। এখন আছি মিডফোর্ড হাসপাতালে। ওয়ার্ড দু' শ' তেত্রিশ। বেড নাম্বার সতের। আপনি যদি আসেন তাহলে খুব খুশি হব। সুধাকান্তবাবু প্রসঙ্গে একটা জরুরি আলাপ ছিল। আশা করি আপনি ভালো আছেন।'

আমি এই চিঠি ফেলে দিলাম। একটা পাগল লোককে শুরুতে খানিকটা প্রশ্রয় দিয়েছি বলে আফসোস হতে লাগল। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে এই লোক আমার পিছনে জোঁকের মতো লেগে থাকবে এবং জীবনটা অস্থির করে তুলবে।

তাকে হাসপাতালে দেখতে যাবার পিছনেও কোনো যুক্তি খুঁজে পেলাম না। দেখতে যাওয়া মানে তাকে প্রশ্রয় দেওয়া। দূরে-দূরে থাকাই ভালো। দেখা হলে বলা যাবে—চিঠি পাই নি। বাংলাদেশে চিঠি না-পাওয়া এমন কিছু অবিশ্বাস্য ব্যাপার না। খুবই স্বাভাবিক।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, হাসপাতালেই নিতান্ত কাকতালীয়ভাবে মিসির আলির সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল। টেম্পোর সঙ্গে অ্যাকসিডেন্ট করে আমার এক কলিগ পা ভেঙে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তাঁকে দেখে ফিরে আসছি, হঠাৎ শুনি পিছন থেকে চিকন গলায় কে যেন আমাকে ডাকছে, 'হুমায়ূন সাহেব। এই যে হুমায়ূন সাহেব।'

তাকিয়ে দেখি আমাদের মিসির আলি।

বিছানার সঙ্গে মিশে আছেন। গলা দিয়ে স্বর বেরুচ্ছে না। চিঁচিঁ আওয়াজ হচ্ছে। আমি বললাম, 'আপনার এ কী অবস্থা!'

'অসুখটা কাহিল করে ফেলেছে। গত কাল পর্যন্ত ধারণা ছিল মারা যাচ্ছি। আজ একটু ভালো।'

'ভালোর বুঝি এই নমুনা?'

'রক্ত পড়াটা বন্ধ হয়েছে। তবে ব্যথা সারে নি। ভাই, বসুন। আপনি আমাকে দেখতে এসেছেন, বড়ই আনন্দ হচ্ছে। আসছেন না দেখে ভাবছিলাম হয়তো চিঠি পান নি।'

আমি খানিকটা লজ্জিত বোধ করতে লাগলাম। একবার ইচ্ছা হল সত্যি কথাটা বলি। বলি যে, তাঁকে দেখতে আসি নি, ভাগ্যচক্রে দেখা হয়ে গেল। পরক্ষণেই মনে হল, সব সত্যি কথা বলতে নেই।

'হুমায়ূন সাহেব।'

'জ্বি?'

'বসুন ভাই, একটু বসুন।'

আমি বসলাম। মিসির আলি বললেন, 'আপনাকে দেখে ভালো লাগছে। একটা বিশেষ কারণে মনটা খুব খারাপ ছিল।'

'বিশেষ কারণটা কী?'

'এগার নম্বর বেডটার দিকে তাকিয়ে দেখুন। আলসারের পেশেন্ট। কিছু খেতে পারে না। হাসপাতাল থেকে যে-খাবার দেয়, সবটাই রেখে দেয়। তখন কী হয় জানেন,

তার ছোটভাই সেটা খায়। খুব তৃপ্তি করে খায়। দিন-রাত বড় ভাইয়ের কাছে সে যে বসে থাকে, ঐ খাবারের আশাতেই বসে থাকে। আজ কী হয়েছে জানেন? বড়ভাইয়ের শরীর বোধহয় একটু ভালো হয়েছে, সে তার খাবার সব খেয়ে ফেলেছে। ছোট ভাইটা অভুক্ত অবস্থায় সারা দিন বসে আছে। অসম্ভব কষ্ট হয়েছে আমার, বুঝলেন। চোখে পানি এসে গিয়েছিল। আমাদের দেশের মানুষগুলো এত গরিব কেন বলুন তো ভাই?'

আমি মিসির আলির প্রশ্নের জবাব দিতে পারলাম না। এগার নম্বর বেডের দিকে তাকালাম। ষোল-সতের বছরের এক জন যুবক অসুস্থ ভাইয়ের পাশে বসে আছে। আমি বললাম, 'ছেলেটি কি এখনো না-খেয়ে আছে?'

'হ্যাঁ। আমি নার্সের হাতে তার জন্যে পঞ্চাশটা টাকা পাঠিয়েছিলাম। সে রাখে নি। বড়ই কষ্ট হচ্ছে হুমায়ূন সাহেব।'

আমি মিসির আলির হাত ধরলাম। এই প্রথম বুঝলাম—এই মানুষটি আমাদের আর দশটি মানুষের মতো নয়। এই রোগা আধপাগলা মানুষটির হৃদয়ে সমুদ্রের ভালবাসা সঞ্চিত আছে। এদের স্পর্শ করলেও পুণ্য হয়।

'হুমায়ূন সাহেব।'

'জ্বি?'

'এই খাতাটা আপনি মনে করে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন।'

'কী খাতা?'

'সুধাকান্তবাবুর বিষয়ে এই খাতায় অনেক কিছু লিখে রেখেছি। বাসায় নিয়ে মন দিয়ে পড়বেন।'

'শরীরের এই অবস্থায়ও আপনি সুধাকান্তবাবুকে ভুলতে পারেন নি?'

'হাসপাতালে শুয়ে-শুয়ে এইটা নিয়েই শুধু ভাবতাম। কিছু করার ছিল না তো। অনেক নতুন-নতুন পয়েন্ট ভেবে বের করেছি। সব লিখে ফেলেছি।'

'ভালো করেছেন। এখন বিশ্রাম করুন। আমি খাতা নিয়ে যাচ্ছি। কাল আবার আসব।'

মিসির আলি নিচু গলায় বললেন, 'এক বার কি চেষ্টা করে দেখবেন ঐ ছেলেটিকে বাইরে নিয়ে কিছু খাওয়ান যায় কি না?'

'আমি দেখব। আপনি এই নিয়ে ব্যস্ত হবেন না।'

'আমি ব্যস্ত হচ্ছি না।'

চলে আসার আগে-আগে মিসির আলি বললেন, 'আপনি কষ্ট করে আমাকে দেখতে এসেছেন, আমি খুবই আনন্দিত।'

আমি আবার লজ্জা পেলাম।

৭

ব্যক্তিগত কাজ অনেক জমে ছিল, মিসির আলির খাতা নিয়ে বসা হল না। আমি তেমন উৎসাহও বোধ করছিলাম না। সামান্য গল্প নিয়ে এতটা বাড়াবাড়ির আমি কোনো অর্থ দেখি না। আমি লক্ষ করেছি—গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি বেশির ভাগ মানুষ সম্পূর্ণ অবহেলা

করে, মাতামাতি করে তুচ্ছ বিষয় নিয়ে। মিসির আলিও নিশ্চয় এই গোত্রের। পরিবার-পরিজনহীন মানুষদের জন্যে এর অবশ্যি প্রয়োজন আছে। কিছু একটা নিয়ে ব্যস্ত থাকা—জীবন পার করে দেওয়া।

এক রাতে শোবার আগে খাতা নিয়ে বসলাম। পাতা উল্টে আমার আক্কেলগুড়ুম। এক শ' ছিয়াশি পৃষ্ঠার ঠাসবুনোন লেখা। সুধাকান্তবাবু এবং তার গল্প নিয়ে যে এত কিছু লেখা যায় কে জানত! পরিষ্কার গোটা-গোটা লেখা। পড়তে খুব আরাম।

অবাক হয়ে লক্ষ করলাম আমাকে নিয়ে তিনি আট পৃষ্ঠা লিখেছেন। সেই অংশটিই প্রথম পড়লাম। শুরুটা এ-রকম—

'নাম : হুমায়ূন আহমেদ।

বিবাহিত, তিন কন্যার জনক। পেশা অধ্যাপনা।

বদমেজাজি। অহঙ্কারী। অধ্যাপকদের যেটা বড় ত্রুটি—অন্যদের বুদ্ধিমত্তা খাটো করে দেখা, ভদ্রলোকের তা আছে।

এই ভদ্রলোকের স্মৃতিশক্তি ভালো। তিনি গল্পটি দু' বার আমাকে বলেছেন। দু' বারই এমনভাবে বলেছেন যে, একটি শব্দ এদিক-ওদিক হয় নি। তাঁর কথাবার্তায় চিরকুমার সুধাকান্তবাবুর প্রতি গভীর মমতা টের পাওয়া যায়। এই মমতার উৎস কী?

সুধাকান্তবাবু এই ভদ্রলোককে ক্ষুধার্ত অবস্থায় চমৎকার কিছু খাবার রান্না করে খাইয়েছেন—এইটাই কি একমাত্র কারণ? আমার মনে হয় সুধাকান্তবাবুর চেহারা, কথাবার্তাও ভদ্রলোকের ওপর খানিকটা প্রভাব ফেলেছে। সুধাকান্তবাবু অতি অল্প সময়ে এই বুদ্ধিমান মানুষটিকে প্রভাবিত করেছেন। কাজেই ধরে নেওয়া যায়, মানুষকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা সুধাকান্তবাবুর আছে। আমরা তাহলে কি ধারণা করতে পারি না, সুধাকান্তবাবু তাঁর আশেপাশের মানুষদেরও প্রভাবিত করেছেন?'

সুধাকান্তবাবুকে নিয়ে তিনটি অধ্যায় আছে। প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম—পূর্বপরিচয়। এই অংশে সুধাকান্তবাবুর পরিবারের যাবতীয় বিবরণ আছে।

বাবার নাম, দাদার নাম, মার নাম। তাঁরা কে কেমন ছিলেন, কী করতেন। কে কীভাবে মারা গেলেন। দেশত্যাগ করলেন কবে। কেন করলেন। এত তথ্য ভদ্রলোক কীভাবে জোগাড় করলেন, কেনই-বা করলেন কে জানে!

দ্বিতীয় অধ্যায়টির নাম—সুধাকান্তবাবু ও তাঁর বাগদত্তা। এই অধ্যায়টি বেশ ছোট। পড়ে মনে হল মিসির আলি তেমন কোনো তথ্য জোগাড় করতে পারেন নি।

তৃতীয় অধ্যায় সুধাকান্তবাবুর চরিত্র এবং মনমানসিকতা নিয়ে। শুরুটা এমন—

ভদ্রলোক নিজেকে সাধুশ্রেণীতে ফেলেছেন। শুরুতেই তিনি বলছেন যে, সাধু-সন্ন্যাসীর জীবনযাত্রায় তাঁর আগ্রহ আছে। শ্মশানে-শ্মশানে ঘুরতেন, এবং স্থানীয় লোকজনও তাঁকে সাধুবাবা বলে। নিজের সাধু-চরিত্রটির প্রতি ভদ্রলোকের দুর্বলতা আছে। এই দুর্বলতার কারণ কী? প্রকৃত সাধুশ্রেণীর লোক শুরুতেই অন্যকে বলে না—আমি সাধু। ইনি তা বলছেন, কাজেই ধরে নেওয়া যাক ইনি আমাদের মতোই দোষগুণসম্পন্ন সাধারণ একজন মানুষ।

তিনি নিঃসঙ্গ জীবন ঠিক পছন্দ করেন বলেও মনে হল না। অনেক রাতে বাড়ি ফেরেন, যাতে একা-একা খুব অল্প সময় তাঁকে থাকতে হয়। এক জন সাধকশ্রেণীর মানুষের চরিত্রের সঙ্গেও ব্যাপারটা মিশ খায় না।—

মিসির আলির খাতা শেষ করতে-করতে রাত দুটো বেজে গেল। পরিশিষ্ট অংশে ভদ্রলোক ছ'টি প্রশ্ন তুলেছেন। এবং বলছেন—রহস্য উদ্ধারের জন্যে এই প্রশ্নগুলির জবাব জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। এই ছ'টি প্রশ্ন পড়ে আমার মাথা ঘুরতে লাগল। এ কী কাণ্ড! মিসির আলি সাহেবের খাতা আবার গোড়া থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়লাম। ছ'টা প্রশ্নের কাছে এসে আবার চমকালাম। আমার মাথা ঘুরতে লাগল। ইচ্ছে করল এক্ষুণি ছুটে যাই মিসির আলির কাছে।

৮

মিসির আলি সাহেব আজ অনেক সুস্থ। গায়ে চাদর জড়িয়ে বিছানায় বসে আছেন। হাতে শিবরাম চক্রবর্তীর বই 'জন্মদিনের উপহার'। কিছুক্ষণ পড়ছেন, তারপর গা দুলিয়ে হাসছেন। আবার পড়ছেন, আবার হাসছেন।

আশেপাশের রুগীরা ব্যাপারটায় বেশ মজা পাচ্ছে। আগ্রহ এবং কৌতূহল নিয়ে তারা দেখছে এই বিচিত্র মানুষটাকে।

আমার দিকে চোখ পড়তেই মিসির আলি বললেন, 'শিবরামের বাঘের গল্পটা পড়েছেন? অসাধারণ! সকাল থেকে এখন পর্যন্ত এগার বার গল্পটা পড়লাম।'

'তাই নাকি?'

'আমার কী মনে হয় জানেন? হাসপাতালের রুগীদের জন্যে এই জাতীয় বই অষুধপত্রের সঙ্গে দেওয়া দরকার। প্রাণখুলে কয়েক বার হাসতে পারলে যে-কোনো অসুখ অনেকটা কমে যায় বলে আমার ধারণা।'

'আপনার তাহলে কমে গেছে?'

'জ্বি।'

আমি বললাম, 'আপনার খাতাটা কাল রাতে পড়ে শেষ করেছি। আমার মনে হয়, যে-ছ'টি প্রশ্ন আপনি তুলেছেন, তার উত্তর জানা প্রয়োজন।'

'প্রয়োজন তো বটেই।'

'আমি আপনার সঙ্গে যাব এবং সুধাকান্তবাবুর সঙ্গে কথা বলব।'

মিসির আলি হাসতে-হাসতে বললেন, 'আমি জানতাম আপনি এই কথা বলবেন।'

আমি বললাম, 'কোনো-একটা ভৌতিক গল্প শুনলেই কি আপনি এ-রকম করেন, সব রহস্য উদ্ধারের জন্যে লেগে পড়েন?'

মিসির আলি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন।

আমি বললাম, 'আপনি কি আপনার শোনামতো ভৌতিক গল্পের রহস্য ভেদ করতে পেরেছেন?'

'না, পারি নি। শতকরা বিশ ভাগ ক্ষেত্রে কিছুই করতে পারি নি। আমার আরেকটা খাতা আছে। ঐ খাতার নাম রহস্য-খাতা। যে-সব সমস্যা আমি সমাধান করতে পারি নি, রহস্য-খাতায় সেইসব লিখে রেখেছি। আপনাকে একদিন পড়তে দেব।'

'ঠিক আছে। আপনার ''রহস্য-খাতা'' একদিন পড়ব।'

'কিংবা আপনি যদি চান তাহলে ঐখানকার একটা গল্প আপনাকে শোনাতেও পারি।'

'এইখানে বলবেন?'

'অসুবিধা কী? হাসপাতালে একটা ক্যান্টিন আছে। ক্যান্টিনে বসে চা খেতে-খেতে গল্পটা আপনাকে বলতে পারি। আসলে ব্যাপারটা কি জানেন—আপনার সঙ্গে কথা বলতে আমার ভালো লাগছে। একটা গল্প যদি শুরু করি, তাহলে ভদ্রতার কারণেই আপনি গল্প শেষ না-করা পর্যন্ত বসে থাকবেন। এটাই হচ্ছে আমার লাভ।'

'আপনার শরীরের এই অবস্থায় আপনি ক্যান্টিনে যেতে পারবেন?'

'পারব। আমাকে যতটা কাহিল দেখাচ্ছে, ততটা কাহিল কিন্তু না। আসুন যাই।'

আমরা ক্যান্টিনে বসলাম।

অবাক হয়ে লক্ষ করলাম হাসপাতাল নোংরা হলেও ক্যান্টিনটা বেশ পরিষ্কার। ভিড় আছে, তবে হৈচৈ নেই। দু' ধরনের চা পাওয়া যাচ্ছে—এক নম্বরী চা এবং দু' নম্বরী চা। এক নম্বরী চা এক টাকা করে, দু' নম্বরীটা তিন টাকা করে। মিসির আলি বললেন, 'একই চা দু' ধরনের কাপে দেওয়া হয় বলে দু' ধরনের দাম। এবং মজার ব্যাপার কী জানেন, সবাই কিন্তু বেশি দামের চা'টা খাচ্ছে। গতকালও চা খেতে এসেছিলাম। এক জনকে বলতে শুনলাম—'এক নম্বরী চা মুখে দেওয়া যায় না। খানিকটা পানি গরম করে এনে দিয়ে দেয়।'

আমি বললাম, 'আপনি কি নিশ্চিত যে দুটো চা-ই এক?'

'হ্যাঁ, নিশ্চিত। প্রমাণ করে দিতে পারি। করব?'

'না, প্রমাণ করতে হবে না। আপনার কথা আমি বিশ্বাস করছি। এখন আপনার গল্পটা বলুন।'

'আপনার কি তাড়া আছে?'

'না, তাড়া নেই। তবু বেশিক্ষণ হাসপাতালে থাকতে আমার ভালো লাগে না।'

মিসির আলি সঙ্গে-সঙ্গে গল্প শুরু করলেন—

'রহস্য-খাতায় এই গল্পের নম্বর হচ্ছে একুশ। অর্থাৎ এটা একুশ নম্বর গল্প। এর চেয়ে অনেক ভয়ংকর গল্প আমার স্টকে আছে, তবু এটা বলছি, কারণ এটা বলতে গেলে একটা ফার্স্ট-হ্যাণ্ড স্টোরি। আমার নিজের জীবনে ঘটে নি, তবে যার জীবনে ঘটেছে, সে আমার প্রিয় এক মানুষ। ঘটনাটার সঙ্গে আমার যোগাযোগও প্রত্যক্ষ।—

'মেয়েটি হচ্ছে আমার দূর সম্পর্কের আত্মীয়া—আমার মা'র মামাতো বোনের মেয়ে। গ্রামের মেয়ে। হোস্টেলে থেকে ময়মনসিংহ মমিনুন্নেসা কলেজে পড়ত। সেকেন্ড ইয়ারে উঠে হঠাৎ করে তার বিয়ে হয়ে যায়। খুব বড় ঘরে বিয়ে হয়। ছেলের অর্থ, বিত্ত এবং প্রতিপত্তির কোনো অভাব নেই। পরিবারটিও এ-দেশের নাম-করা পরিবার। নাম বললেই আপনি চিনবেন, তাই নাম বলছি না। শুধু ধরে নিন যে, এই দেশের রাজনীতিতে এই পরিবারটির প্রত্যক্ষ যোগ আছে।'

'আপনি গল্পটা বলুন। বিত্তবান পরিবারের ব্যাপারে আমার আগ্রহ নেই।'

'আমার নিজেরও নেই এবং আমার ঐ খালার মেয়েটিরও ছিল না। অত্যন্ত

ক্ষমতাবান একটি পরিবারে বিয়ে হবার কারণে তার জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। কিছুদিন স্বামীর সঙ্গে ইউরোপ-আমেরিকা ঘুরল। সেই বছর পরীক্ষা দেওয়া হল না। তার পরের বছরও হল না, কারণ সে তখন কনসিভ করেছে।—

'সমস্যা শুরু হল তখন, যখন মেয়েটি বিচিত্র সব স্বপ্ন দেখতে লাগল। প্রতিটি স্বপ্নের মূল বিষয় একটিই—ছোট্ট একটা ছেলে এসে তাকে বলে : মা, তোমাকে একটা কথা বলি, মন দিয়ে শোন। আমাকে এরা মেরে ফেলবে। যে-রাতে আমার জন্ম হবে সেই রাতেই ওরা আমাকে মারবে। তুমি আমাকে রক্ষা কর। ····

'বুঝতেই পারছেন, গর্ভবতী একটি মেয়ের কাছে এই জাতীয় স্বপ্ন কতটা ভয়াবহ। মেয়েটি অস্থির হয়ে পড়ল। খেতে পারে না, ঘুমুতে পারে না, এবং প্রায় রোজই এই জাতীয় স্বপ্ন দেখে। ····

'আমার সঙ্গে মেয়েটির তখন যোগাযোগ হয়। আমি তাকে নানানভাবে বুঝিয়ে বলি যে এটা কিছুই না। গর্ভবতী মেয়েদের অবচেতন মনে একটা মৃত্যুভয় থেকেই যায়। সেই ভয় নানানভাবে প্রকাশ পায়। তোমার বেলায় এইভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। ····

'মেয়েটির স্বামী বিষয়টি নিয়ে খুব বিব্রত বোধ করছিল। সে ঠিক করে রেখেছিল যে মেয়েটির মনের শান্তির জন্যে ডেলিভারির ব্যাপারটা এ-দেশে না করে বিদেশের কোনো হাসপাতালে করা হবে। ····

'সেটা সম্ভব হল না। আট মাসের শেষে হঠাৎ করে মেয়েটির ব্যথা উঠল। তাড়াহুড়ো করে তাকে নিয়ে যাওয়া হল ঢাকার নামকরা একটা ক্লিনিকে। নর্ম্যাল ডেলিভারি হল। রাত দুটোয় মেয়েটি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করল।'

মিসির আলি থামলেন। ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'অনেকের সঙ্গে আমিও ক্লিনিকে অপেক্ষা করছিলাম। মেয়েটি আমার একজন রুগী, কাজেই আমার খানিকটা দায়িত্ব আছে। ক্লিনিকের পরিচালক একজন মহিলা ডাক্তার। তিনি আমাকে ডেকে ভেতরে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, 'যে-বাচ্চাটির জন্ম হয়েছে তাকে একটু দেখুন।' ····

'আমি দেখলাম।

'একটা গামলার ভেতর বাচ্চাটিকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। জেলি ফিস আপনি দেখেছেন কি না জানি না, শিশুটির সমস্ত শরীর জেলি ফিসের মতো স্বচ্ছ, থলথলে, গাঢ় নীল রঙ। শুধু মাথাটা মানুষের। মাথাভর্তি রেশমি চুল। বড়-বড় চোখ। হাত-পা কিছু নেই। অক্টোপাসের মতো নলজাতীয় কিছু জিনিস কিলবিল করছে। ····

'আমি খুবই সাহসী মানুষ, কিন্তু এই দৃশ্য দেখে ভয়ে গা কাঁপতে লাগল।

'ডাক্তার সাহেব বললেন, "এই শিশুটিকে আপনি কী করতে বলেন?" —

'আমি বললাম, ''আমার বলায় কিছু আসে-যায় না। বাচ্চার বাবা-মা কী বলেন?''

''বাচ্চার মাকে জানান হয় নি। তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। বাচ্চার বাবা চান না বাচ্চা বেঁচে থাকুক।''····

'আমি চুপ করে রইলাম। তিনি বললেন, ''এ-রকম অ্যাবনর্ম্যাল বাচ্চা এম্নিতেই মারা যাবে। আমাদের মারতে হবে না। প্রকৃতি এত বড় ধরনের অ্যাবনর্ম্যালিটি সহ্য করবে না।''

'আমি কিছু বললাম না। বাচ্চাটিকে ফুল স্পীড ফ্যানের নিচে রেখে দেওয়া হল। প্রচণ্ড শীতের রাত, বাচ্চাটির মাথার ওপর ফ্যান ঘুরছে, এতেই তার মরে যাওয়া উচিত, কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার—ভোর পাঁচটায় দেখা গেল, বাচ্চা দিব্যি সুস্থ। বড়-বড় চোখে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, শিস দেওয়ার মতো শব্দ করছে। ভোর সাড়ে পাঁচটায় সবার সম্মতি নিয়ে বাচ্চাটিকে এক শ' সিসি ইমাডোজল ইনজেকশন দেওয়া হল। যে-কোনো পূর্ণবয়স্ক লোক এতে মারা যাবে, কিন্তু তার কিছু হল না। শুধু শিস দেওয়ার ব্যাপারটা একটু কমে গেল। ভোর ছ'টায় দেওয়া হল পঞ্চাশ সিসি এট্রোজিন সল্যুশন। বাচ্চাটা মারা গেল ছ'টা বিশে। বাচ্চার মা জানতে পারল না। সে তখনো ঘুমে অচেতন।'

মিসির আলি গল্প শেষ করলেন। আমি বললাম, 'তারপর?'

'তারপর আবার কি? গল্প শেষ।'

'বাচ্চাটির মা'র কী হল?'

'বাচ্চার মা'র কী হল তা দিয়ে তো আমাদের প্রয়োজন নেই। রহস্য তো এখানে নয়। রহস্য হচ্ছে বাচ্চার মা যে-স্বপ্নগুলি দেখত সেখানে। সেই রহস্য আমি ভেদ করতে পারি নি। সুধাকান্তবাবুর রহস্যও শেষ পর্যন্ত ভেদ করতে পারব কি না তা জানি না।'

'আমার তো মনে হয় রহস্য ভেদ করেছেন।'

'কাগজপত্রে করেছি। কাগজপত্রে রহস্য ভেদ করা এক জিনিস, বাস্তব অন্য জিনিস। যখন সুধাকান্তবাবুর মুখোমুখি বসব তখন হয়তো দেখব গুছিয়ে-আনা জিনিস সব এলোমেলো হয়ে গেছে। মজার ব্যাপার কী, জানেন ভাই? প্রকৃতি রহস্য পছন্দ করে না, সে নিজে কিন্তু খুব রহস্যময়।'

'কবে যাবেন সুধাকান্তবাবুর কাছে?'

'হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেই যাব। আপনি কি যাবেন আমার সঙ্গে?'

আমি বললাম, 'অবশ্যই।'

৯

রাত প্রায় ন'টা।

আমি এবং মিসির আলি সুধাকান্তবাবুর বাড়ির উঠোনে বসে আছি। সুধাকান্তবাবু চুলায় চায়ের পানি চড়িয়েছেন। তিনি আমাদের যথেষ্ট যত্ন করছেন। মিসির আলিকে খুব আগ্রহ নিয়ে বাড়ি ঘুরে-ঘুরে দেখালেন। নানা গল্প করলেন।

বাড়ি আগের মতোই আছে। তবে কামিনী গাছ দু'টির একটি নেই। মরে গেছে। কুয়ার কাছে সারি বেঁধে কিছু পেয়ারা গাছ লাগান হয়েছে, যা আগে দেখি নি।

সুধাকান্তবাবু বললেন, 'চা খেয়ে আপনারা বিশ্রাম করুন, আমি খিচুড়ি চড়িয়ে দিচ্ছি।'

মিসির আলি অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে বললেন, 'খিচুড়ি মন্দ হবে না। তা ছাড়া শুনেছি আপনার রান্নার হাত অপূর্ব।'

আমাদের চা দিয়ে সুধাকান্তবাবু খিচুড়ি চড়িয়ে দিলেন। মিসির আলি বললেন, 'রান্না করতে-করতে আপনি আপনার ভৌতিক অভিজ্ঞতার কথা বলুন। এটা শোনার জন্যেই এসেছি। আগেও এক বার এসেছিলাম, আপনাকে পাই নি।'

'জানি। খবর দিয়ে এলে থাকতাম। আমি বেশির ভাগ সময়ই থাকি।'

'শুরু করুন।'

সুধাকান্তবাবু গল্প শুরু করলেন। ভৌতিক গল্পের জন্যে চমৎকার একটা পরিবেশ। অন্ধকার উঠোন। আকাশে নক্ষত্রের আলো। উঠোনের ওপর দিয়ে একটু পরপর হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। একটা তক্ষক ডাকছে। তক্ষকের ডাক বন্ধ হবার সঙ্গে-সঙ্গে অসংখ্য ঝিঁঝিপোকা ডেকে উঠছে। ঝিঁঝিপোকা থামতেই তক্ষক ডেকে ওঠে। তক্ষকরা চুপ করতেই ডাকে ঝিঁঝিপোকা। অদ্ভুত কনসার্ট।

সুধাকান্ত গল্প বলে চলেছেন। মিসির আলি মাঝে-মাঝে তাঁকে থামাচ্ছেন। গভীর আগ্রহে বলছেন, 'এই জায়গাটা দয়া করে আরেক বার বলুন। অসাধারণ অংশ। গা শিউরে উঠছে।'

সুধাকান্তবাবু তাতে বিরক্ত হচ্ছেন না। সম্ভবত মিসির আলির গভীর আগ্রহ তাঁর ভালো লাগছে।

যেখানে মেয়েটি সুধাকান্তবাবরু পা কামড়ে ধরে, সেই অংশ মিসির আলি তিন বার শুনলেন। শেষ বার গভীর আগ্রহে বললেন, 'আপনি যখন পালিয়ে যাচ্ছিলেন তখন মেয়েটি পিছন থেকে আচমকা আপনাকে কামড়ে ধরল?'

'জ্বি।'

'হাত দিয়ে ধরল না, আঁচড় দিল না—শুধু কামড়ে ধরল?'

'জ্বি।'

'দেখি কামড়ের দাগটা।'

তিনি কামড়ের দাগ দেখালেন। মিসির আলি পায়ের দাগ পরীক্ষা করলেন। জড়ান গলায় বললেন, 'কী অদ্ভুত গল্প! তারপর কী হল?'

সুধাকান্তবাবু গল্পে ফিরে গেলেন।

এক সময় গল্প শেষ হল। সুধাকান্তবাবু বললেন, 'খিচুড়ি নেমে গেছে। আপনাদের কি এখন দিয়ে দেব? রাত মন্দ হয় নি কিন্তু।'

মিসির আলি বললেন, 'জ্বি, খেয়ে নেব। আপনাকে দু'-একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি।'

'জিজ্ঞেস করুন।'

'মেয়েটি শুধু কামড়ে ধরল—হাত দিয়ে আপনাকে ধরল না কেন?'

'আমি কী করে বলব বলুন। আমার পক্ষে তো জানা সম্ভব না।'

'আমার কিন্তু মনে হয় আপনি জানেন।'

সুধাকান্তবাবু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

মিসির আলি বললেন, 'আপনার গল্পের সবচেয়ে দুর্বল অংশ মেয়েটির কামড়ে-ধরা। মেয়েটি কিন্তু পেছন থেকে আপনাকে কামড়ে ধরে নি। পায়ের দাগ দেখেই বোঝা যাচ্ছে কামড়ে ধরেছে সামনে থেকে। আপনার দাগ ভালোভাবে পরীক্ষা করলেই তা বোঝা যায়। আপনাকে আক্রমণ করবার জন্যে মেয়েটি তার হাত ব্যবহার করে নি।

কারণ একটাই—সম্ভবত তার হাত পেছন থেকে বাঁধা ছিল। তাই নয় কি?'

সুধাকান্তবাবুর চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হল। একটি কথাও বললেন না।

মিসির আলি বললেন, 'আপনার গল্পে একটা কুকুর আছে। পাগলা কুকুর। হাইড্রোফোবিয়ার কুকুর কিছুই খায় না। অসহ্য যন্ত্রণায় মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করে। অথচ এই কুকুরটা আস্ত একটি মেয়েকে খেয়ে ফেলল, পাঁচটা সুস্থ কুকুরের পক্ষেও যা সম্ভব নয়। আপনি অসাধারণ একটা ভূতের গল্প তৈরি করেছেন। কিন্তু গল্পে অনেক ফাঁক রয়ে গেছে, তাই না?'

সুধাকান্ত বিড়বিড় করে কী–যেন বললেন। আমি কাঠ হয়ে বসে রইলাম। কী শুনছি এ–সব! মিসির আলি লোকটি এ–সব কী বলছে!

মিসির আলি বললেন, 'ব্যাপারটা কী হয়েছিল আমি বলি। আপনি চিরকুমার একজন মানুষ। আপনার মনে আছে অবদমিত কামনা–বাসনা। মহাপুরুষরাও কামনা–বাসনার ঊর্ধ্বে নন। কীভাবে যেন আপনি অল্পবয়সী একজন কিশোরীকে আপনার ঘরে নিয়ে এলেন। এই মেয়েটি কীভাবে এল বুঝতে পারছি না। বাড়ি থেকে পালিয়ে আসতে পারে, বা অন্য কিছুও হতে পারে। এই অংশটা আমার কাছে পরিষ্কার না। ····

'যাই হোক, মেয়েটিকে আপনার ঘরে নিয়েই আপনি তার হাত বেঁধে ফেললেন। মেয়েটির চিৎকার, কান্নাকাটি আশেপাশের কেউ শুনল না। কারণ আশেপাশে শোনার মতো কেউ নেই। মেয়েটি নিজেকে রক্ষা করবার জন্যে আপনাকে কামড়ে ধরল। এই একটি অস্ত্রই তার কাছে ছিল। ····

'অবশ্যি মেয়েটি নিজেকে রক্ষা করতে পারল না। শেষ পর্যন্ত মারা গেল।—

'আপনি তার মৃতদেহ ঘরেই ফেলে রাখলেন। দরজা–জানালা খুলে রাখলেন, যাতে শেয়াল–কুকুর শবদেহটা খেয়ে ফেলতে পারে। এক দিনে তো একটা মানুষ শেয়াল–কুকুরে খেয়ে ফেলতে পারে না। হয়তো দু' দিন বা তিন দিন লাগল। এই সময়টা আপনি নষ্ট করলেন না, ঠাণ্ডা মাথায় ভাবলেন। ভেবে–ভেবে অসাধারণ একটা গল্প তৈরি করলেন। সেই গল্পে সূত্র আছে, কুকুর আছে, অশরীরী আত্মীয়রা আছে। কি সুধাকান্তবাবু, আমি ঠিক বলি নি? দিন, এখন খাবার দিয়ে দিন—প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। খেয়ে নেব।'

আমি অবাক হয়ে দেখলাম সত্যি–সত্যি মিসির আলি খেতে বসেছেন। সুধাকান্তবাবু তাঁকে থালা এগিয়ে দিচ্ছেন। মিসির আলি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি খাবেন না?'

আমি বললাম, 'না, আমার খিদে নেই।'

মিসির আলি খেতে–খেতে বললেন, 'সুধাকান্তবাবু, আপনার বিরুদ্ধে কেস দাঁড় করাবার মতো কিছু আমার হাতে নেই। যে–সব কথা আপনাকে বলেছি, সে–সব আমি কোর্টে টেকাতে পারব না, আমি সেই চেষ্টাও করব না। কাজেই আপনার ভয়ের কিছু নেই। তবে আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, আপনি থানায় গিয়ে অপরাধ স্বীকার করবেন। আচ্ছা, মেয়েটার নাম কি ছিল?'

সুধাকান্ত গম্ভীর গলায় বললেন, 'বিন্তি। ওর নাম বিন্তি।'

'ও আচ্ছা, বিন্তি।'

মিসির আলি খুব আগ্রহ করে খাচ্ছেন। আমি দূরে থেকে তাঁকে দেখছি। সুধাকান্তবাবুও দেখছেন। তাঁর চোখে পলক পড়ছে না। সেই পলকহীন চোখে গভীর বিস্ময়।

মিসির আলি বললেন, 'খিচুড়ি তো ভাই অপূর্ব হয়েছে! আমাকে রেসিপিটা দেবেন তো! আমিও আপনার মতো একা-একা থাকি। মাঝে-মাঝে খিচুড়ি রান্না করব।' বলেই মিসির আলি বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসলেন। আমি এর আগে এত অদ্ভুতভাবে কাউকে হাসতে শুনি নি, গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

পরিশিষ্ট

আমার অধিকাংশ গল্পের শেষ থাকে না বলে পাঠক-পাঠিকারা আপত্তি তোলেন। এই গল্পের আছে। সুধাকান্তবাবু তাঁর অপরাধ স্বীকার করে থানায় ধরা দিয়েছিলেন। বিচার শুরু হবার আগেই থানা-হাজতে তাঁর মৃত্যু হয়।

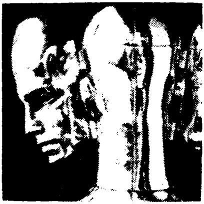

ভয়

১

ভোর ছ'টায় কেউ কলিং বেল টিপতে থাকলে মেজাজ বিগড়ে যাবার কথা। মিসির আলির মেজাজ তেমন বিগড়াল না। সকাল দশটা পর্যন্ত কেন জানি তাঁর মেজাজ বেশ ভালো থাকে। দশটা থেকে খারাপ হতে থাকে, চূড়ান্ত রকমের খারাপ হয় দু'টার দিকে। তারপর আবার ভালো হতে থাকে। সন্ধ্যার দিকে অসম্ভব ভালো থাকে, তারপর আবার খারাপ হতে শুরু করে। ব্যাপারটা শুধু তাঁর বেলায় ঘটে, না সবার বেলায়ই ঘটে, তা তিনি জানেন না। প্রায়ই ভাবেন একে-ওকে জিজ্ঞেস করবেন—শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করা হয়ে ওঠে না। তাঁর চরিত্রের বড় রকমের দুর্বল দিক হচ্ছে পরিচিত কারো সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগে না। অপরিচিত মানুষদের সঙ্গে দীর্ঘ সময় কথা বলতে পারেন, কথা বলতে ভালোও লাগে। সেদিন রিকশা করে আসতে-আসতে রিকশাওয়ালার সঙ্গে অতি উচ্চ শ্রেণীর কিছু কথাবার্তা চালিয়ে গেলেন।

রিকশাওয়ালার বক্তব্য হচ্ছে—পৃথিবীতে যত অশান্তি সবের মূলে আছে মেয়েছেলে।

মিসির আলি বললেন, 'এই রকম মনে হওয়ার কারণ কি?'

রিকশাওয়ালা অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে বলল, 'চাচামিয়া, এই দেহেন আমারে। আইজ আমি রিকশা চালাই। এর কারণ কি? এর কারণ বিবি হাওয়া। বিবি হাওয়া যদি কুবুদ্ধি দিয়া বাবা আদমরে গন্ধম ফল না খাওয়াইত, তা হইলে আইজ আমি থাকতাম বেহেশতে। বেহেশতে তো আর রিকশা চালানির কোনো বিষয় নাই, কি কন চাচামিয়া? গন্ধম ফল খাওয়ানির কারণেই তো আইজ আমি দুনিয়ায় আইসা পড়লাম।'

মিসির আলি রিকশাওয়ালার কথাবার্তায় চমৎকৃত হলেন। পরবর্তী দশ মিনিট তিনি রিকশাওয়ালাকে যা বললেন, তার মূল কথা হল—নারীর কারণে আমরা যদি

স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে থাকি তাহলে নারীই পারে আবার আমাদের স্বর্গে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।

রিকশাওয়ালা কী বুঝল কে জানে। তার শেষ বক্তব্য ছিল, 'যাই কন চাচামিয়া, মেয়েমানুষ আসলে সুবিধার জিনিস না।'

কলিং বেল আবার বাজছে।

মিসির আলি বেল টেপার ধরন থেকে অনুমান করতে চেষ্টা করলেন—কে হতে পারে।

ভিখিরি হবে না। ভিখিরিরা এত ভোরে বের হয় না। ভিক্ষাবৃত্তি যাদের পেশা তারা পরিশ্রান্ত হয়ে গভীর রাতে ঘুমুতে যায়, ঘুম ভাঙতে সেই কারণেই দেরি হয়। পরিচিত কেউ হবে না। পরিচিতরা এত ভোরে আসবে না। তাঁকে ঘুম থেকে ডেকে তুলতে পারে এমন ঘনিষ্ঠতা তাঁর কারো সঙ্গেই নেই।

যে এসেছে, সে অপরিচিত। অবশ্যই মহিলা। পুরুষরা কলিং বেলের বোতাম অনেকক্ষণ চেপে ধরে থাকে। মেয়েরা তা পারে না। মেয়েটির বয়স অল্প তাও অনুমান করা যাচ্ছে। অল্পবয়স্ক মেয়েদের মধ্যে এক ধরনের ছটফটে ভাব থাকে। তারা অল্পসময়ের মধ্যে কয়েক বার বেল টিপবে। নিজেদের অস্থিরতা ছড়িয়ে দেবে কলিং বেলে।

মিসির আলি পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে দরজা খুললেন। বিস্মিত হয়ে দেখলেন, তাঁর অনুমান সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণ করে মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। বেঁটেখাটো একজন মানুষ। গায়ে সাফারি। চোখে সানগ্লাস। এত ভোরে কেউ সানগ্লাস পরে না। এই লোকটি কেন পরেছে কে জানে।

'স্যার, স্লামালিকুম।'

'ওয়ালাইকুম সালাম।'

'আপনার নাম কি মিসির আলি?'

'জ্বি।'

'আমি কি আপনার সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলতে পারি?'

মিসির আলি কী বলবেন মনস্থির করতে পারলেন না। লোকটিকে তিনি পছন্দ করছেন না, তবে তার মধ্যে এক ধরনের আত্মবিশ্বাস লক্ষ করছেন—যা তাঁর ভালো লাগছে। আত্মবিশ্বাসের ব্যাপারটা আজকাল আর দেখাই যায় না।

লোকটি শান্ত গলায় বলল, 'আমি আপনার কিছুটা সময় নষ্ট করব ঠিকই—তবে তার জন্যে আমি পে করব।'

'পে করবেন?'

'জ্বি। প্রতি ঘন্টায় আমি আপনাকে এক হাজার করে টাকা দেব। আশা করি আপনি আপত্তি করবেন না। আমি কি ভেতরে আসতে পারি?'

'আসুন।'

লোকটি ভেতরে ঢুকতে-ঢুকতে বলল, 'মনে হচ্ছে আপনার এখনো হাত-মুখ ধোয়া হয় নি। আপনি হাত-মুখ ধুয়ে আসুন, আমি অপেক্ষা করছি।'

মিসির আলি বললেন, 'ঘন্টা হিসেবে আপনি যে আমাকে টাকা দেবেন—সেই

হিসেবে কি এখন থেকে শুরু হবে? নাকি হাত-মুখ ধুয়ে আপনার সামনে বসার পর থেকে শুরু হবে?'

লোকটি খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'টাকার কথায় আপনি কি রাগ করেছেন?'

'রাগ করি নি, মজা পেয়েছি। চা খাবেন?'

'খেতে পারি। দুধ ছাড়া।'

মিসির আলি স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বললেন, 'এক কাজ করুন—রান্নাঘরে চলে যান। কেতলি বসিয়ে দিন। দু' কাপ বানান। আমাকেও এক কাপ দেবেন।'

ভদ্রলোক হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

মিসির আলি হাসিমুখে বললেন, 'আমাকে ঘন্টা হিসেবে পে করবেন বলে যেভাবে হকচকিয়ে দিয়েছিলেন, আমিও ঠিক একইভাবে আপনাকে হকচকিয়ে দিলাম। বসুন, চা বানাতে হবে না। সাতটার সময় রাস্তার ওপাশের রেস্টুরেন্ট থেকে আমার জন্যে চা-নাশতা আসে। তখন আপনার জন্যেও চা আনিয়ে দেব।'

'থ্যাংক ইউ স্যার।'

'আপনি কথা বলার সময় বারবার বাঁ দিকে ঘুরছেন, আমার মনে হচ্ছে আপনার বাঁ চোখটা নষ্ট। এই জন্যেই কি কালো চশমা পরে আছেন?'

ভদ্রলোক সহজ গলায় বললেন, 'জ্বি। আমার বাঁ চোখটা পাথরের।'

ভদ্রলোক সোফার এক কোণে বসলেন। মিসির আলি লক্ষ করলেন, লোকটি শিরদাঁড়া সোজা করে বসে আছে। চাকরির ইন্টারভ্যু দিতে এলে ক্যান্ডিডেটরা যে-ভঙ্গিতে চেয়ারে বসে অবিকল সেই ভঙ্গি। মিসির আলি বললেন, 'আজকের খবরের কাগজ এখনো আসে নি। গত দিনের কাগজ দিতে পারি। যদি আপনি চোখ বোলাতে চান।'

'আমি খবরের কাগজ পড়ি না। একা-একা বসে থেকে আমার অভ্যাস আছে। আমার জন্যে আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না। শুরুতে টাকা দেওয়ার কথা বলে যদি আপনাকে আহত করে থাকি, তার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।'

মিসির আলি টুথব্রাশ হাতে বাথরুমে ঢুকে গেলেন। লোকটিকে তাঁর বেশ ইন্টারেস্টিং বলে মনে হচ্ছে। তবে কোনো গুরুতর সমস্যা নিয়ে এসেছে বলে মনে হয় না। আজকাল অকারণেই কিছু লোকজন এসে তাঁকে বিরক্ত করা শুরু করেছে। মাসখানেক আগে একজন এসেছিল ভূতবিশারদ। সে নাকি গবেষণাধর্মী একটি বই লিখছে—যার নাম "বাংলার ভূত।" এ-দেশে যত ধরনের ভূত-পেত্নী আছে সবার নাম, আচার-ব্যবহার বইয়ে লেখা। মেছো ভূত, গেছো ভূত, জলা ভূত, শাকচুন্নি, স্কন্ধকাটা, কুনী ভূত, কুত্তি ভূত, আঁধি ভূত সর্বমোট এক শ' ছ' রকমের ভূত।

মিসির আলি বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, 'ভাই, আমার কাছে কেন? আমি সারা জীবন ভূত নেই এটাই প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছি।'

সেই লোক মহা উৎসাহী হয়ে বলল, 'কোন কোন ভূত নেই বলে প্রমাণ করেছেন—এটা কাইন্ডলি বলুন। আমার কাছে ক্যাসেট প্লেয়ার আছে। আমি টেপ করে নেব।'

সানগ্লাস-পরা বেঁটে ভদ্রলোক সেই পদের কেউ কি না কে বলবে?

তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে-মুছতে মিসির আলি বললেন, 'ভাই, বলুন কী ব্যাপার।'

'প্রথমেই আমার নাম বলি—এখনো আমি আপনাকে আমার নাম বলি নি। আমার নাম রাশেদুল করিম। আমেরিকার টেক্সাস এম অ্যান্ড এন বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের আমি একজন অধ্যাপক। বর্তমানে এক বছরের স্যাবাটিক্যাল লীভে দেশে এসেছি। আপনার খোঁজ কীভাবে এবং কার কাছে পেয়েছি তা কি বলব?'

'তার দরকার নেই। কী জন্যে আমার খোঁজ করছেন সেটা বলুন।'

'আমি কি ধূমপান করতে পারি? সিগারেট খেতে-খেতে কথা বললে আমার জন্যে সুবিধা হবে। সিগারেটের ধোঁয়া এক ধরনের আড়াল সৃষ্টি করে।'

'আপনি সিগারেট খেতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই।'

'ছাই কোথায় ফেলব? আমি কোনো অ্যাশট্রে দেখতে পাচ্ছি না।'

'মেঝেতে ফেলুন। আমার গোটা বাড়িটাই একটা অ্যাশট্রে।'

রাশেদুল করিম সিগারেট ধরিয়েই কথা বলা শুরু করলেন। তাঁর গলার স্বর ভারি এবং স্পষ্ট। কথাবার্তা খুব গোছানো। কথা শুনে মনে হয় তিনি কী বলবেন তা আগেভাগেই জানেন। কোন বাক্যটির পর কোন বাক্য বলবেন তাও ঠিক করা। যেন ক্লাসের বক্তৃতা। আগে থেকে ঠিকঠাক করা। প্রবাসী বাঙালিরা এক-নাগাড়ে বাংলায় কথা বলতে পারেন না—ইনি তা পরছেন।

'আমার বয়স এই নভেম্বরে পঞ্চাশ হবে। সম্ভবত আমাকে দেখে তা বুঝতে পারছেন না। আমার মাথার চুল সব সাদা। কলপ ব্যবহার করছি গত চার বছর থেকে। আমার স্বাস্থ্য ভালো। নিয়মিত ব্যায়াম করি। মুখের চামড়ায় এখনো ভাঁজ পড়ে নি। বয়সজনিত অসুখবিসুখ কোনোটাই আমার নেই। আমার ধারণা, শারীরিক এবং মানসিক দিক দিয়ে আমার কর্মক্ষমতা এখনো একজন পঁয়ত্রিশ বছরের যুবকের মতো। এই কথাটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি। আজ আমার গায়ে-হলুদ। মেয়েপক্ষীয়রা সকাল ন'টায় আসবে। আমি ঠিক আটটায় এখান থেকে যাব। আটটা পর্যন্ত সময় কি আমাকে দেবেন?'

'দেব। ভালো কথা, এটা নিশ্চয়ই আপনার প্রথম বিবাহ না। এর আগেও আপনি বিয়ে করেছেন?'

'জ্বি। এর আগে এক বার বিয়ে করেছি। এটি আমার দ্বিতীয় বিবাহ। আমি আগেও বিয়ে করেছি, তা কী করে বললেন?'

'আজ আপনার গায়ে-হলুদ, তা খুব সহজভাবে বললেন দেখে অনুমান করলাম। বিয়ের তীব্র উত্তেজনা আপনার মধ্যে দেখতে পাই নি।'

'সব মানুষ তো এক রকম নয়। একেক জন একেক রকম। উত্তেজনার ব্যাপারটি আমার মধ্যে একেবারেই নেই। প্রথম বার যখন বিয়ে করি, তখনো আমার মধ্যে বিন্দুমাত্র উত্তেজনা ছিল না। সেদিনও আমি যথারীতি ক্লাসে গিয়েছি। গ্রুপ থিওরির ওপর এক ঘন্টার লেকচার দিয়েছি।'

'ঠিক আছে, আপনি বলে যান।'

রাশেদুল করিম শান্ত গলায় বললেন, 'আপনার ভেতর একটা প্রবণতা লক্ষ

করছি—আমাকে আর দশটা মানুষের দলে ফেলে বিচার করার চেষ্টা করছেন। দয়া করে তা করবেন না। আমি আর দশ জনের মতো নই।'

'আপনি শুরু করুন।'

'অঙ্কশাস্ত্রে এম.এ. ডিগ্রী নিয়ে আমি আমেরিকা যাই পিএইচ. ডি. করতে। এম.এ.-তে আমার রেজাল্ট ভালো ছিল না। টেনেটুনে সেকেণ্ড ক্লাস। প্রাইভেট কলেজে চাকরি খুঁজে বেড়াচ্ছি, তখন বন্ধুদের দেখাদেখি জি.আর.ই. পরীক্ষা দিয়ে ফেললাম। জি.আর.ই. পরীক্ষা কী, তা কি আপনি জানেন? গ্যাজুয়েট রেকর্ড একজামিনেশন। আমেরিকান ইউনিভার্সিটিতে গ্যাজুয়েট ক্লাসে ভরতি হতে হলে এই পরীক্ষা দিতে হয়।'

'আমি জানি।'

'এই পরীক্ষায় আমি আশাতীত ভালো করে ফেললাম। আমেরিকান তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমার কাছে আমন্ত্রণ চলে এল। চলে গেলাম। পিএইচ· ডি· করলাম প্রফেসর হোবলের সঙ্গে। আমার পিএইচ. ডি. ছিল গ্রুপ থিওরির একটি শাখায়—নন এবেলিয়ান ফাংশানের ওপর। পিএইচ. ডি.-র কাজ এতই ভালো হল যে আমি রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেলাম। অঙ্ক নিয়ে বর্তমানকালে যাঁরা নাড়াচাড়া করেন, তাঁরা সবাই আমার নাম জানেন। অঙ্কশাস্ত্রের একটি ফাংশান আছে, যা আমার নামে পরিচিত। আর.কে. এক্সপোনেনশিয়াল। আর.কে. হচ্ছে রাশেদুল করিম।

'পিএইচ. ডি.-র পরপরই আমি মন্টানা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনার কাজ পেয়ে গেলাম। সেই বছরই বিয়ে করলাম। মেয়েটি মন্টানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন আর্টসের ছাত্রী—স্প্যানিশ আমেরিকান। নাম জুডি বার্নার।'

'প্রেমের বিয়ে?'

'প্রেমের বিয়ে বলাটা বোধহয় ঠিক হবে না। বাছাবাছির বিয়ে বলতে পারেন। জুডি অনেক বাছাবাছির পর আমাকে পছন্দ করল।'

'আপনাকে পছন্দ করার কারণ কী?'

'আমি ঠিক অপছন্দ করার মতো মানুষ সেই সময় ছিলাম না। আমার একটি চোখ পাথরের ছিল না। চেহারা তেমন ভালো না হলেও দু'টি সুন্দর চোখ ছিল। আমার মা বলতেন—রাশেদের চোখে জন্মকাজল পরানো। সুন্দর চোখের ব্যাপারটা অবশ্য ধর্তব্য নয়। আমেরিকান তরুণীরা প্রেমিকদের সুন্দর চোখ নিয়ে মাথা ঘামায় না—তারা দেখে প্রেমিক কী পরিমাণ টাকা করেছে এবং ভবিষ্যতে কী পরিমাণ টাকা সে করতে পারবে। সেই দিক দিয়ে আমি মোটামুটি আদর্শ- স্থানীয় বলা চলে। ত্রিশ বছর বয়সে একটি আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে ফ্যাকাল্টি পজিশন পেয়ে গেছি। ট্যানিউর পেতেও কোনো সমস্যা হবে না। জুডি স্বামী হিসেবে আমাকে নির্বাচন করল। আমার দিক থেকে আপত্তির কোনো কারণ ছিল না। জুডি চমৎকার একটি মেয়ে। শত বৎসর সাধনার ধন হয়তো নয়, তবে বিনা সাধনায় পাওয়ার মতো মেয়েও নয়।

বিয়ের সাত দিনের মাথায় আমরা হানিমুন করতে চলে গেলাম সানফ্রান্সিসকো। উঠলাম হোটেল বেডফোর্ডে। দ্বিতীয় রাত্রির ঘটনা। ঘুমুচ্ছিলাম। কান্নার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। তাকিয়ে দেখি জুডি পাশে নেই, ঘড়িতে রাত তিনটা দশ বাজছে। বাথরুমের দরজা বন্ধ। সেখান থেকে ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ আসছে। আমি বিস্মিত হয়ে উঠে গেলাম। দরজা ধাক্কা দিয়ে বললাম, ''কী হয়েছে জুডি, কী হয়েছে?'' কান্না থেমে গেল। তবে

জুডি কোনো জবাব দিল না।

অনেক ধাক্কাধাক্কির পর সে দরজা খুলে হতভম্ব হয়ে আমাকে দেখতে লাগল। আমি বললাম, ''কী হয়েছে?''

সে ক্ষীণ স্বরে বলল, ''ভয় পেয়েছি।''

''কিসের ভয়?''

''জানি না কিসের ভয়।''

''ভয় পেয়েছ তো আমাকে ডেকে তোল নি কেন? বাথরুমে দরজা বন্ধ করে-ছিলে কেন?''

জুডি জবাব দিল না। একদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি বললাম, ''ব্যাপারটা কি আমাকে খুলে বল তো?''

''সকালে বলব।''

''না, এখুনি বল। কী দেখে ভয় পেয়েছ?''

জুডি অস্পষ্ট স্বরে বলল, ''তোমাকে দেখে।''

''আমাকে দেখে ভয় পেয়েছ মানে? আমি কী করেছি?''

জুডি যা বলল তা হচ্ছে—রাতে তার ঘুম ভেঙে যায়। হোটেলের ঘরে নাইট লাইট জ্বলছিল, ওই আলোয় সে দেখে, তার পাশে যে শুয়ে আছে সে কোনো জীবন্ত মানুষ নয়, মৃত মানুষ—যে-মৃত মানুষের গা থেকে শবদেহের গন্ধ বেরুচ্ছে। সে ভয়ে কাঁপতে থাকে, তবু সাহসে হাত বাড়িয়ে মানুষটাকে স্পর্শ করে। স্পর্শ করেই চমকে ওঠে, কারণ মানুষটার শরীর বরফের মতোই শীতল। সে পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে যায় যে আমি মারা গেছি। তার জন্যে এটা বড় ধরনের শক হলেও সে যথেষ্ট সাহস দেখায়—টেবিল-ল্যাম্প জ্বেলে দেয় এবং হোটেল ম্যানেজারকে টেলিফোন করবার জন্যে টেলিফোন সেট হাতে তুলে নেয়। ঠিক তখন সে লক্ষ করে, মৃতদেহের দু'টি বন্ধ চোখের একটি ধীরে-ধীরে খুলছে। সেই একটিমাত্র খোলা চোখ তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। জুডি টেলিফোন ফেলে দিয়ে ছুটে বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়। এই হল ঘটনা।'

রাশেদুল করিম কথা শেষ করে সিগারেট ধরালেন। হাতের ঘড়ি দেখলেন। মিসির আলি বললেন, 'থামলেন কেন?'

'সাতটা বেজেছে। আপনি বলেছেন, সাতটার সময় আপনার জন্যে চা আসে। আমি চায়ের জন্যে অপেক্ষা করছি। চা খেয়ে শুরু করব। আমার গল্প শুনতে আপনার কেমন লাগছে?'

'ইন্টারেস্টিং। এই গল্প কি আপনি অনেকের সঙ্গে করেছেন? আপনার গল্প বলার ধরন থেকে মনে হচ্ছে অনেকের সঙ্গেই এই গল্প করেছেন।'

'আপনার অনুমান সঠিক। ছ' থেকে সাত জনকে আমি বলেছি। এর মধ্যে সাইকিয়াট্রিস্ট আছেন। পুলিশের লোক আছে।'

'পুলিশের লোক কেন?'

'গল্প শেষ করলেই বুঝতে পারবেন পুলিশের লোক কী জন্যে।'

চা চলে এল। চায়ের সঙ্গে পরোটা-ভাজি। মিসির আলি নাশতা করলেন। রাশেদুল করিম সাহেব পরপর দু' কাপ চা খেলেন।

'আমি কি শুরু করব?'

'জ্বি, শুরু করুন।'

'আমাদের হানিমুন মাত্র তিন দিন স্থায়ী হল। জুডিকে নিয়ে পুরনো জায়গায় চলে এলাম। মনটা খুবই খারাপ। জুডির কথাবার্তা কিছুই বুঝতে পারছি না। রোজ রাতে সে ভয়ংকর চিৎকার করে ওঠে। ছুটে ঘর থেকে বের হয়ে যায়। আমি যখন জেগে উঠে তাকে সান্ত্বনা দিতে যাই, তখন এমনভাবে তাকায়, যেন আমি একটা পিশাচ কিংবা মূর্তিমান শয়তান। আমার দুঃখের কোনো সীমা রইল না। সেই সময় নন এবেলিয়ান গ্রুপের ওপর একটা জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছিলাম। আমার দরকার ঠাণ্ডামাথায় চিন্তা করার মতো পরিবেশ, মানসিক শান্তি। সব দূর হয়ে গেল। অবশ্যি দিনের বেলায় জুডি স্বাভাবিক। সে বদলাতে শুরু করে সূর্য ডোবার পর থেকে। আমি তাকে একজন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে গেলাম।

সাইকিয়াট্রিস্ট প্রথমে সন্দেহ করলেন সমস্যা ড্রাগঘটিত। হয়তো জুডি ড্রাগে অভ্যস্ত। সেই সময় বাজারে হেলুসিনেটিং ড্রাগ এল.এস.ডি. প্রথম এসেছে। শিল্পসাহিত্যের লোকজন শখ করে এই ড্রাগ খাচ্ছেন। বড়গলায় বলছেন—মাইন্ড অলটারিং ট্রিপ নিয়ে এসেছি। জুডি ফাইন আর্টস-এর ছাত্রী। ট্রিপ নেওয়া তার পক্ষে খুব অস্বাভাবিক নয়।

দেখা গেল, ড্রাগঘটিত কোনো সমস্যা তার নেই। সে কখনো ড্রাগ নেয় নি। সাইকিয়াট্রিস্টরা তার শৈশবের জীবনে কোনো সমস্যা ছিল কি না তাও বের করতে চেষ্টা করলেন। লাভ হল না। জুডি এসেছে গ্রামের কৃষক পরিবার থেকে। এ-ধরনের পরিবারে তেমন কোনো সমস্যা থাকে না। তাদের জীবনযাত্রা সহজ এবং স্বাভাবিক।

সাইকিয়াট্রিস্ট জুডিকে ঘুমের অষুধ দিলেন। কড়া ডোজের ফেনোবার্বিটন। আমাকে বললেন, আপনি সম্ভবত লেখাপড়া নিয়ে থাকেন। স্ত্রীর প্রতি, বিশেষ করে নববিবাহিত স্ত্রীর প্রতি যতটা সময় দেওয়া দরকার তা দিচ্ছেন না। আপনার প্রতি আপনার স্ত্রীর একধরনের ক্ষোভ জন্মেছে। সে যা বলছে, তা ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ।

জুডির কথা একটাই—আমি ঘুমুবার পর আমার দেহে প্রাণ থাকে না। একজন মৃত মানুষের শরীর যেমন অসাড় পড়ে থাকে, আমার শরীরও সে-রকম পড়ে থাকে। ঘুমের মধ্যে মানুষ হাত নাড়ে, পা নাড়ে—আমি তার কিছুই করি না। নিঃশ্বাস পর্যন্ত ফেলি না। গা হয়ে যায় বরফের মতো শীতল। একসময় গা থেকে মৃত মানুষের শরীরের পচা গন্ধ বেরুতে থাকে এবং তখন আচমকা আমার বাঁ চোখ খুলে যায়, সেই চোখে আমি একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকি। সেই চোখের দৃষ্টি সাপের মতো কুটিল।

জুডির কথা শুনে-শুনে আমার ধারণা হল, হতেও তো পারে। জগতে কত রহস্যময় ব্যাপারই তো ঘটে। হয়তো আমার নিজেরই কোনো সমস্যা আছে। আমিও ডাক্তারের কাছে গেলাম। স্লিপ অ্যানালিস্ট। জানার উদ্দেশ্য একটিই—ঘুমের মধ্যে আমার কোনো শারীরিক পরিবর্তন হয় কি না। ডাক্তাররা পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করলেন। একবার নয়, বারবার করলেন। দেখা গেল আমার ঘুম আর দশটা মানুষের ঘুমের চেয়ে আলাদা নয়। ঘুমের মধ্যে আমিও হাত-পা নাড়ি। অন্য মানুষদের যেমন ঘুমের তিনটি

স্তর পার হতে হয়, আমারও হয়। ঘুমের সময় আর দশটা মানুষের মতো আমার শরীরের উত্তাপও আধ ডিগ্রী হ্রাস পায়। আমিও অন্য সবার মতো স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্ন দেখি।

জুডি সব দেখেশুনে বলল, ''ডাক্তাররা জানে না। ডাক্তাররা কিছুই জানে না। আমি জানি। তুমি আসলে মানুষ না। দিনের বেলা তুমি মানুষ থাক—সূর্য ডোবার পর থাক না।''

''আমি কী হই?''

''তুমি পিশাচ বা এই জাতীয় কিছু হয়ে যাও।''

আমি বললাম, ''এইভাবে তো বাস করা সম্ভব নয়। তুমি বরং আলাদা থাক।''

খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার—জুডি তাতে রাজি হল না। অতি তুচ্ছ কারণে আমেরিকানদের বিয়ে ভাঙে। স্বামীর পছন্দ হলুদ রঙের বিছানার চাদর, স্ত্রীর পছন্দ নীল রঙ। ভেঙে গেল বিয়ে। আমাদের এত বড় সমস্যা, কিন্তু বিয়ে ভাঙল না। আমি বেশ কয়েক বার তাকে বললাম, ''জুডি, তুমি আলাদা হয়ে যাও। ভালো দেখে একটা ছেলেকে বিয়ে কর। সারা জীবন তোমার সামনে পড়ে আছে। তুমি এইভাবে জীবনটা নষ্ট করতে পার না।''

জুডি প্রতিবারই বলে, ''যাই হোক, যত সমস্যাই হোক, আমি তোমাকে ছেড়ে যাব না, I love you. I love you.''

..........আমি গল্পের প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। শেষ অংশটি বলার আগে আমি আপনাকে আমার চোখের দিকে তাকাতে অনুরোধ করব। দয়া করে আমার চোখের দিকে তাকান।'

রাশেদুল করিম সানগ্লাস খুলে ফেললেন। মিসির আলি তৎক্ষণাৎ বললেন, 'আপনার চোখ সুন্দর। সত্যি সুন্দর। আপনার মা যে বলতেন চোখে জন্মকাজল, ঠিকই বলতেন।'

রাশেদুল করিম বললেন, 'পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দর চোখ কার ছিল জানেন?'

'ক্লিওপেট্রার?'

'অধিকাংশ মানুষের তাই ধারণা। এ-ধারণা সত্যি নয়। পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দর চোখ ছিল বুদ্ধদেবের পুত্র কুনালের। ইংরেজ কবি শেলির চোখও খুব সুন্দর ছিল। আমার স্ত্রীর ধারণা, এই পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দর চোখ আমার। জুডি বলত—এই চোখের কারণেই সে কোনোদিন আমাকে ছেড়ে যেতে পারবে না।'

রাশেদুল করিম সানগ্লাস চোখে দিয়ে বললেন, 'গল্পের শেষ অংশ বলার আগে আপনাকে ক্ষুদ্র ধন্যবাদ দিতে চাচ্ছি।'

মিসির আলি বিস্মিত হয়ে বললেন, 'কী জন্যে বলুন তো?'

'কাউকে যখন আমি আমার চোখের দিকে তাকাতে বলি, সে আমার পাথরের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে। আপনি প্রথম ব্যক্তি—যিনি একবারও আমার পাথরের চোখের দিকে তাকান নি। আমার আসল চোখের দিকে তাকিয়ে-ছিলেন। Sonice of you, Sir.'

রাশেদুল করিমের গলা মুহূর্তের জন্যে হলেও ভারি হয়ে গেল। তিনি অবশ্যি চট করে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'আটটা প্রায় বাজতে চলল, গল্পের শেষটা

বলি—জুডির অবস্থা ক্রমেই খারাপ হতে লাগল। কড়া ডোজের ঘুমের অষুধ খেয়ে ঘুমুতে যায়, দু'-এক ঘন্টা ঘুম হয়, বাকি রাত জেগে বসে থাকে। মাঝে-মাঝে চিৎকার করে ছুটে ঘর থেকে বের হয়ে যায়। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদে।........

এমনি একরাতের ঘটনা। জুলাই মাস। রাত সাড়ে তিনটার মতো হবে। জুডির মাথা পুরোপুরি খারাপ হয়ে গেল—সে আমার বাঁ চোখটা গেলে দিল।....

আমি ঘুমুচ্ছিলাম, নারকীয় যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলাম। সেই ভয়াবহ কষ্টের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই।'

রাশেদুল করিম চুপ করলেন। তাঁর কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম জমতে লাগল।

মিসির আলি বললেন, 'কী দিয়ে চোখ গেলে দিলেন?'

'সুঁচালো পেনসিল দিয়ে। আমার মাথার বালিশের নিচে প্যাড এবং পেনসিল থাকে। তখন গ্রুপ থিওরি নিয়ে গভীর চিন্তায় ছিলাম। মাথায় যদি হঠাৎ কিছু আসে তা লিখে ফেলার জন্যে বালিশের নিচে প্যাড এবং পেনসিল রাখতাম।'

'আপনার স্ত্রী ঘটনা প্রসঙ্গে কী বক্তব্য দিয়েছেন?'

'তার মাথা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সে কিছুই বলে নি। শুধু চিৎকার করেছে। তার একটিই বক্তব্য—এই লোকটা পিশাচ। আমি প্রমাণ পেয়েছি। কেউ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু আমার কাছে প্রমাণ আছে।'

'কী প্রমাণ আছে তা কি কখনো জিজ্ঞেস করা হয়েছে?'

'না। একজন উন্মাদকে প্রশ্ন করে বিপর্যস্ত করার কোনো মানে হয় না। তা ছাড়া আমি তখন ছিলাম হাসপাতালে। আমি হাসপাতালে থাকতে-থাকতেই জুডির মৃত্যু হয়।'

'স্বাভাবিক মৃত্যু?'

'না। স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। সে মারা যায় ঘুমের অষুধ খেয়ে। এইটুকুই আমার গল্প। আমি আপনার কাছে একটাই অনুরোধ নিয়ে এসেছি, আপনি সমস্যাটা কী, বের করবেন। আমাকে সাহায্য করবেন। আমি যদি পিশাচ হই, তাও আমাকে বলবেন। এই ফাইলের ভেতর জুডির একটা স্কেচবুক আছে। স্কেচবুকে নানান ধরনের কমেন্টস লেখা আছে। এই কমেন্টসগুলি পড়লে জুডির মানসিক অবস্থা আঁচ করতে আপনার সুবিধা হতে পারে। আটটা বাজে, আমি তাহলে উঠি?'

'আবার কবে আসবেন?'

'আগামীকাল ভোর ছ'টায়। ভালো কথা, আমার এই গল্পে কোথাও কি প্রকাশ পেয়েছে, জুডিকে আমি কতটা ভালবাসতাম?'

'না, প্রকাশ পায় নি।'

'জুডির প্রতি আমার ভালবাসা ছিল সীমাহীন। আমি এখন উঠছি।'

'ছিল বলছেন কেন? এখন কি নেই?'

ভদ্রলোক জবাব দিলেন না।

রাশেদুল করিম চলে যাবার পর মিসির আলি ফাইল খুললেন। ফাইলের শুরুতেই একটা খাম। খামের ওপর মিসির আলির নাম লেখা।

মিসির আলি খাম খুললেন। খামের ভেতর ইংরেজিতে একটা চিঠি লেখা। সঙ্গে

চারটি এক শ' ডলারের নোট। চিঠি খুবই সংক্ষিপ্ত।

প্রিয় মহোদয়,

আপনার সার্ভিসের জন্যে সম্মানী বাবদ সামান্য কিছু দেওয়া হল। গ্রহণ করলে খুশি হব।

বিনীত
আর, করিম

২

মিসির আলি স্কেচবুকের প্রতিটি পাতা সাবধানে ওল্টালেন। চারকোল এবং পেনসিলে স্কেচ আঁকা। প্রতিটি স্কেচের নিচে আঁকার তারিখ। স্কেচের বিষয়বস্তু অতি তুচ্ছ, সবই ঘরোয়া জিনিস—এক জোড়া জুতো, মলাট-ছেঁড়া বই, টিভি, বুকশেলফ। স্কেচ বুকের শেষের দিকে শুধুই চোখের ছবি। বিড়ালের চোখ, কুকুরের চোখ, মাছের চোখ এবং মানুষের চোখ। মানুষের চোখের মডেল যে রাশেদুল করিম তা বলার অপেক্ষা রাখে না। না বললেও ছবির নিচের মন্তব্য থেকে বোঝা যাচ্ছে। মন্তব্যগুলি বেশ দীর্ঘ। যেমন একটি মন্তব্য ঃ

"আমি খুব মন দিয়ে আমার স্বামীর চোখ লক্ষ করছি। মানুষের চোখ একেক সময় একেক রকম থাকে। ভোরবেলার চোখ এবং দুপুরের চোখ এক নয়। আরো একটি জিনিস লক্ষ করলাম—চোখের আইরিশের ট্রান্সপারেন্সি মুডের ওপর বদলায়। বিষাদগ্রস্ত মানুষের চোখের আইরিশ থাকে অস্বচ্ছ। মানুষ যতই আনন্দিত হতে থাকে তার চোখের আইরিশ ততই স্বচ্ছ হতে থাকে। আমার এই অবজারভেশন কতটুকু সত্য তা বুঝতে পারছি না।"

মেয়েটি মাঝে-মাঝে তার মনের অবস্থাও লিখেছে—অনেকটা ডায়েরি লেখার ভঙ্গিতে। মনে হয় হাতের কাছে ডায়েরি না-থাকায় স্কেচবুকে লিখে রেখেছে। সব লেখাই পেনসিলে। প্রচুর কাটাকুটি আছে। কিছু লাইন রাবার ঘষে তুলেও ফেলা হয়েছে।

১৮·৪·৮২

আমি ভয়ে অস্থির হয়ে আছি। নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করছি—এই ভয় অমূলক। বোঝাতে পারছি না। আমি আমার স্বামীকে ভয় পাচ্ছি, এই তথ্য স্বভাবতই স্বামী বেচারার জন্যে সুখকর নয়। সে নানানভাবে আমাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছে। কিছু-কিছু চেষ্টা বেশ হাস্যকর। আজ আমাকে বলল, 'জুডি, আমি ঠিক করেছি—এখন থেকে রাতে ঘুমুব না। আমার অঙ্কের সমস্যা নিয়ে ভাবব। লেখালেখি করব। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমাও। আমি দিনের বেলায় ঘুমুব। একজন মানুষের জন্যে চার ঘন্টা ঘুমই যথেষ্ট। নেপোলিয়ান মাত্র তিন ঘন্টা ঘুমুতেন।

আমি এই গম্ভীর, স্বল্পভাষী লোকটিকে ভালবাসি। ভালবাসি, ভালবাসি, ভালবাসি। আমি চাই না, আমার কোনো কারণে সে কষ্ট পাক। কিন্তু সে কষ্ট পাচ্ছে, খুব কষ্ট পাচ্ছে। হে ঈশ্বর, তুমি আমার মন শান্ত কর। আমার ভয় দূর করে দাও।

২১·৪·৮২
যে-জিনিস খুব সুন্দর তা কত দ্রুত অসুন্দর হতে পারে—বিস্মিত হয়ে আমি তা-ই দেখছি। রাশেদের ধারণা আমি অসুস্থ। সত্যিই কি অসুস্থ? আমার মনে হয় না। কারণ, এখনো ছবি আঁকতে পারছি। একজন অসুস্থ মানুষ আর যা-ই পারুক—ছবি আঁকতে পারে না। গত দু' দিন ধরে ওয়াটার কালারে বাসার সামনের চেরি গাছের ফুল ধরতে চেষ্টা করছিলাম। আজ সেই ফুল কাগজে বন্দি করেছি। অনেকক্ষণ ছবিটির দিকে তাকিয়ে রইলাম। ভালো হয়েছে। রাশেদ ছবি তেমন বোঝে বলে মনে হয় না—সেও মুগ্ধ হয়ে অনেকক্ষণ দেখল। তারপর বলল, 'আমি যখন বুড়ো হয়ে যাব, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নেব, তখন তুমি আমাকে ছবি আঁকা শিখিয়ে দেবে।' এই কথাটি সে আজ প্রথম বলে নি, আগেও বলেছে। আন্তরিক ভঙ্গিতে বলেছে। কেউ যখন আন্তরিকভাবে কিছু বলে তখন তা টের পাওয়া যায়। আমার মনে হয় না সে কোনোদিন ছবি আঁকবে। তার মাথায় অঙ্ক ছাড়া কিছুই নেই।

২১·৫·৮২
আমি ছবি আঁকতে পারছি না। যেখানে নীল রঙ চড়ানো দরকার, সেখানে গাঢ় হলুদ রঙ বসাচ্ছি। ডাক্তার সিডেটিভের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছে। সারাক্ষণ মাথা ঝিম ধরে থাকে। কেন জানি খুব বমি হচ্ছে।

আজ দুপুরে অনেকক্ষণ ঘুমুলাম। মজার ব্যাপার হচ্ছে, সুন্দর একটা স্বপ্নও দেখে ফেললাম। সুন্দর স্বপ্ন আমি অনেক দিন দেখি না, অনেক দিন দেখি না, অনেক দিন দেখি না। অনেক দিন দেখি না। অনেক দিন দেখি না। আচ্ছা, আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি? শুনেছি পাগলরাই একই কথা বারবার লেখে। কারণ তাদের মাথায় একটি বাক্যই বারবার ঘুরপাক খায়।

বৃহস্পতিবার কিংবা বুধবার
আজ কত তারিখ আমি জানি না। বেশ কয়েক দিন ধরেই দিন-তারিখে গণ্ডগোল হচ্ছে। আজ কত তারিখ তা জানার কোনো রকম আগ্রহ বোধ করছি না। তবে মনের অবস্থা লেখার চেষ্টা করছি, যাতে পরবর্তী সময়ে কেউ আমার লেখা পড়ে বুঝবে যে মাথা খারাপ হবার সময় একজন মানুষ কীভাবে কী চিন্তা করে।

মাথা খারাপের প্রথম লক্ষণ হচ্ছে, আলো অসহ্য হওয়া। আমি এখন আলো সহ্য করতে পারি না। দিনের বেলায় দরজা-জানালা বন্ধ করে রাখি। ঘর অন্ধকার বলেই প্রায় অনুমানের ওপর নির্ভর করে আজকের এই লেখা লিখছি। দ্বিতীয় লক্ষণ হচ্ছে, সারাক্ষণ শরীরে একধরনের জ্বালা অনুভব করা । মনে হয়, সব কাপড় খুলে বাথটবে শুয়ে থাকতে পারলে ভালো লাগত। আমার আগে যারা পাগল হয়েছে তাদেরও কি এমন হয়েছে? জানার জন্যে পাবলিক লাইব্রেরিতে টেলিফোন করেছিলাম। আমি খুব সহজভাবে বললাম, আচ্ছা, আপনাদের এখানে পাগলের লেখা কোনো বই আছে?'

যে-মেয়েটি টেলিফোন ধরেছিল সে বিস্মিত হয়ে বলল, 'পাগলের লেখা বই বলতে কী বোঝাচ্ছেন?'

'মানসিক রুগীদের লেখা বই?'

'মানসিক রুগীরা বই লিখবে কেন?'

'কেন লিখবে না? আমি তো লিখছি, বই অবশ্যি নয়—ডায়েরির আকারে লেখা।'

'ও, আচ্ছা। ঠিক আছে, আপনার বই ছাপা হোক। ছাপা হবার পর অবশ্যই আমরা আপনার বইয়ের কপি সংগ্রহ করব।'

আমি মনে-মনে হাসলাম। মেয়েটি আমাকে উন্মাদ ভাবছে। ভাবুক। উন্মাদকে উন্মাদ ভাববে না তো কী ভাববে?

রাত দুটো দশ

আমার মা এই কিছুক্ষণ আগে টেলিফোন করলেন। দুপুররাতে তাঁর টেলিফোন করার বদঅভ্যাস আছে। আমার মা'র অনিদ্রা রোগ আছে। কাজেই তিনি মনে করেন পৃথিবীর সবাই অনিদ্রার রুগী। যাই হোক, আমি জেগে ছিলাম। মা বললেন, 'জুডি, তুই আমার কাছে চলে আয়।'

আমি বললাম, 'না, রাশেদকে ফেলে আমি যাব না।'

মা বললেন, 'আমি তো শুনলাম ওকে নিয়েই তোর সমস্যা।'

'ওকে নিয়ে আমার কোনো সমস্যা নেই মা। I love him. I love him. I love him.'

'চিৎকার করছিস কেন?'

'চিৎকার করছি না। মা, টেলিফোন রাখি। কথা বলতে ভালো লাগছে না।'

আমি টেলিফোন নামিয়ে রাখলাম। রাশেদকে ফেলে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। আমার ধারণা, রাশেদ নিজেও অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সেও এখন রাতে ঘুমায় না। গ্রুপ থিওরির যে-সমস্যাটি নিয়ে সে ভাবছিল, সেই সমস্যার সমাধান অন্য কে নাকি বের করে ফেলেছে। জার্নালে ছাপা হয়েছে। সে গত পরশু ঐ জার্নাল পেয়ে কুচিকুচি করে ছিঁড়েছে। শুধু তাই না—বারান্দার এক কোণায় বসে ছেলেমানুষের মতো কাঁদতে শুরু করেছে। আমি সান্ত্বনা দেবার জন্যে তার কাছে গিয়ে চমকে উঠলাম। সে কাঁদছে ঠিকই, কিন্তু তার বাঁ চোখ দিয়ে পানি পড়ছে, ডান চোখ শুকনো।

আমি তাকে কিছু বললাম না। কিন্তু সে আমার চাউনি থেকেই ব্যাপারটা বুঝে ফেলল। নিচু গলায় বলল, 'জুডি, ইদানীং এই ব্যাপারটা হচ্ছে—মাঝে-মাঝেই দেখছি বাঁ চোখ দিয়ে পানি পড়ে।'

কথাগুলি বলার সময় তাকে এত অসহায় লাগছিল! আমার ইচ্ছা করছিল তাকে জড়িয়ে ধরে বলি—I love you. I love you. I love you.

হে ঈশ্বর! হে পরম করুণাময় ঈশ্বর! এই ভয়াবহ সমস্যা থেকে তুমি আমাদের দু' জনকে উদ্ধার কর।

স্কেচবুকের প্রতিটি লেখা বারবার পড়ে মিসির আলি খুব বেশি তথ্য বের করতে পারলেন না, তবে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যা জানা গেল তা হচ্ছে—মেয়েটি তার স্বামীকে ভালবাসে, যে-ভালবাসায় একধরনের সারল্য আছে।

স্কেচবুকে কিছু স্প্যানিশ ভাষায় লেখা কথাবার্তাও আছে। স্প্যানিশ ভাষা না-জানার কারণে তার অর্থ উদ্ধার করা সম্ভব হল না। তবে এই লেখাগুলি যেভাবে সাজানো তাতে মনে হচ্ছে—কবিতা কিংবা গান হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মডার্ন ল্যাংগুয়েজ ইনস্টিটিউটে স্কেচবুক নিয়ে গেলেই ওরা পাঠোদ্ধারের ব্যবস্থা করে দেবে—তবে মিসির আলির মনে হল তার প্রয়োজন নেই। যা জানার তিনি জেনেছেন। এর বেশি কিছু জানার নেই।

৩

রাশেদুল করিম ঠিক ছ'টায় এসেছেন। মনে হচ্ছে বাইরে অপেক্ষা করছিলেন। ঠিক ছ'টা বাজার পর কলিং বেলে হাত রেখেছেন। মিসির আলি দরজা খুলে বললেন, 'আসুন।'

রাশেদুল করিমের জন্যে সামান্য বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। তাঁর জন্যে টেবিলে দুধছাড়া চা। মিসির আলি বললেন, 'আপনি কাঁটায়-কাঁটায় ছ'টায় আসবেন বলে ধারণা করেই চা বানিয়ে রেখেছি। লিকার কড়া হয়ে গেছে বলে-আমার ধারণা। খেয়ে দেখুন তো।'

রাশেদুল করিম চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, 'ধন্যবাদ।'

মিসির আলি নিজের কাপ হাতে নিতে-নিতে বললেন, 'আপনাকে একটা কথা শুরুতেই বলে নেওয়া দরকার। আমি মাঝে-মাঝে নিজের শখের কারণে সমস্যা নিয়ে চিন্তা করি। তার জন্যে কখনো অর্থ গ্রহণ করি না। আমি যা করি তা আমার পেশা না—নেশা বলতে পারেন। আপনার ডলার আমি নিতে পারছি না। তা ছাড়া অধিকাংশ সময়ই আমি সমস্যার কোনো সমাধানে পৌঁছতে পারি না। আমার কাছে পাঁচ শ' পৃষ্ঠার একটা নোট বই আছে। ঐ নোট বই ভর্তি এমন সব সমস্যা—যার সমাধান আমি বের করতে পারি নি।'

'আপনি কি আমার সমস্যাটার কিছু করেছেন?'

'সমস্যার পুরো সমাধান বের করতে পারি নি—আংশিক সমাধান আমার কাছে আছে। আমি মোটামুটিভাবে একটা হাইপোথিসিস দাঁড় করিয়েছি। সেই সম্পর্কে আপনাকে আমি বলব, আপনি নিজে ঠিক করবেন—আমার হাইপোথিসিসে কী কী ত্রুটি আছে। তখন আমরা দু' জন মিলে ত্রুটিগুলি ঠিক করব।'

'শুনি আপনার হাইপোথিসিস।'

'আপনার স্ত্রী বলেছেন, ঘুমুবার পর আপনি মৃত মানুষের মতো হয়ে যান। আপনার হাত-পা নড়ে না। পাথরের মূর্তির মতো বিছানায় পড়ে থাকেন। তাই না?'

'হ্যাঁ, তাই।'

'স্লিপ অ্যানালিস্টরা আপনাকে পরীক্ষা করে বলেছেন—আপনার ঘুম সাধারণ মানুষের ঘুমের মতোই। ঘুমের মধ্যে আপনি স্বাভাবিকভাবেই নড়াচড়া করেন।'

'জ্বি, কয়েকবারই পরীক্ষা করা হয়েছে।'

'আমি আমার হাইপোথিসিসে দু'জনের বক্তব্যই সত্য ধরে নিচ্ছি। সেটা কীভাবে সম্ভব? একটিমাত্র উপায়ে সম্ভব—আপনি যখন বিছানায় শুয়ে ছিলেন তখন

ঘুমুচ্ছিলেন না। জেগে ছিলেন।'

রাশেদুল করিম বিস্মিত হয়ে বললেন, 'কী বলছেন আপনি!'

মিসির আলি বললেন, 'আমি গত কালও লক্ষ করেছি, আজও লক্ষ করছি— আপনার বসে থাকার মধ্যেও একধরনের কাঠিন্য আছে। আপনি আরাম করে বসে নেই–শিরদাঁড়া সোজা করে বসে আছেন। আপনার দুটো হাত হাঁটুর ওপর রাখা। দীর্ঘ সময় চলে গেছে, আপনি একবারও হাত বা পা নাড়ান নি। অথচ স্বাভাবিকভাবেই আমরা হাত–পা নাড়ি। কেউ–কেউ পা নাচান।'

রাশেদুল করিম চুপ করে রইলেন। মিসির আলি বলল, 'ঐ রাতে আপনি বিছানায় শুয়েছেন—মূর্তির মতো শুয়েছেন। চোখ বন্ধ করে ভাবছেন আপনার অঙ্কের সমস্যা নিয়ে। গভীরভাবে ভাবছেন। মানুষ যখন গভীরভাবে কিছু ভাবে তখন একধরনের ট্রেন্স স্টেটে ভাবজগতে চলে যায়। গভীরভাবে কিছু ভাবা হচ্ছে একধরনের মেডিটেশন। রাশেদুল করিম সাহেব—'

'জ্বি।'

'অঙ্ক নিয়ে ঐ ধরনের গভীর চিন্তা কি আপনি প্রায়ই করেন না?'

'জ্বি, করি।'

'আপনি কি লক্ষ করেছেন এই সময় আশেপাশে কী ঘটছে তা আপনার খেয়াল থাকে না?'

'লক্ষ করেছি।'

'আপনি নিশ্চয়ই আরো লক্ষ করেছেন যে, এই অবস্থায় আপনি ঘন্টার পর ঘন্টা পার করে দিচ্ছেন। লক্ষ করেন নি?'

'করেছি।'

'তাহলে আমি আমার হাইপোথিসিসে ফিরে আসি। আপনি বিছানায় শুয়ে আছেন। আপনার মাথায় অঙ্কের জটিল সমস্যা। আপনি ভাবছেন, আর ভাবছেন। আপনার হাত–পা নড়ছে না। নিঃশ্বাস এত ধীরে পড়ছে যে মনে হচ্ছে আপনি মৃত।'

রাশেদুল করিম সাহেব সানগ্লাস খুলে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। মিসির আলি বললেন, 'ভালো কথা, আপনি কি লেফ্‌ট হ্যানডেড পার্সন? ন্যাটা?'

ভদ্রলোক বিস্মিত হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, কেন বলুন তো?'

'আমার হাইপোথিসিসের জন্যে আপনার লেফ্‌ট হ্যানডেড পার্সন হওয়া খুবই প্রয়োজন।'

'কেন?'

'বলছি। তার আগে—শুরুতে যা বলছিলাম সেখানে ফিরে যাই। দৃশ্যটি আপনি দয়া করে কল্পনা করুন। আপনি একধরনের ট্রেন্স অবস্থায় আছেন। আপনার স্ত্রী জেগে আছেন—ভীত চোখে আপনাকে দেখছেন। আপনার এই অবস্থার সঙ্গে তাঁর পরিচয় নেই। তিনি ভয়ে অস্থির হয়ে গেলেন। তাঁর ধারণা হল আপনি মারা গেছেন। তিনি আপনার গায়ে হাত দিয়ে আরো ভয় পেয়ে গেলেন। কারণ আপনার গা হিমশীতল।'

'গা হিমশীতল হবে কেন?'

'মানুষ যখন গভীর ট্রেন্স স্টেটে চলে যায় তখন তার হার্টবিট কমে যায়। নিঃশ্বাস–প্রশ্বাস ধীরে বয়। শরীরের টেম্পারেচার দুই থেকে তিন ডিগ্রী পর্যন্ত নেমে যায়। এইটুকু

নেমে যাওয়া মানে অনেকখানি নেমে যাওয়া। যাই হোক, আপনার স্ত্রী আপনার গায়ে হাত দেওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনি তাকালেন—তাকালেন কিন্তু এক চোখ মেলে। বাঁ চোখে। ডান চোখটি তখনো বন্ধ।'

'কেন?'

'ব্যাখ্যা করছি। রাইট হ্যানডেড পার্সন যারা আছে, তাদের এক চোখ বন্ধ করে অন্য চোখে তাকাতে বললে তারা বাঁ চোখ বন্ধ করে ডান চোখে তাকাবে। ডান চোখ বন্ধ করে বাঁ চোখে তাকানো তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এটা সম্ভব শুধু যারা ন্যাটা তাদের পক্ষেই। আপনি লেফ্‌ট হ্যানডেড পার্সন—আপনি একধরনের গভীর ট্রেন্স স্টেটে আছেন। আপনার স্ত্রী আপনার গায়ে হাত রেখেছেন। আপনি কী হচ্ছে জানতে চাচ্ছেন। চোখ মেলছেন। দু'টি চোখ মেলতে চাচ্ছেন না। গভীর আলস্যে একটা চোখ কোনোমতে মেললেন—অবশ্যই সেই চোখ হবে—বাঁ চোখ। আমার যুক্তি কি গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে?'

রাশেদুল করিম হ্যাঁ-না কিছু বললেন না।

মিসির আলি বললেন, 'আপনার স্ত্রী আরো ভয় পেলেন। সেই ভয় তাঁর রক্তে মিশে গেল। কারণ শুধুমাত্র একবার এই ব্যাপার ঘটে নি। অনেকবার ঘটেছে। আপনার কথা থেকেই আমি জেনেছি, সেই সময় অঙ্কের একটি জটিল সমাধান নিয়ে আপনি ব্যস্ত। আপনার সমগ্র চিন্তা-চেতনায় আছে—অঙ্কের সমাধান—নতুন কোনো থিওরি। নয় কি?'

'হ্যাঁ।'

'এখন আমি আমার হাইপোথিসিসের সবচেয়ে জটিল অংশে আসছি। আমার হাইপোথিসিস বলে, আপনার স্ত্রী আপনার চোখ গেলে দেন নি। তাঁর পক্ষে এটা করা সম্ভব নয়। তিনি আপনার চোখের প্রেমে পড়েছিলেন। একজন শিল্পীমানুষ কখনো সুন্দর কোনো সৃষ্টি নষ্ট করতে পারেন না। তবুও যদি ধরে নিই তাঁর মাথায় হঠাৎ রক্ত উঠে গিয়েছিল এবং তিনি এই ভয়াবহ কাণ্ড করেছেন—তাহলে তাঁকে এটা করতে হবে ঝোঁকের মাথায়, আচমকা। আপনার চোখ গেলে দেওয়া হয়েছে পেনসিলে—যে পেনসিলটি আপনার মাথার বালিশের নিচে রাখা। যিনি ঝোঁকের মাথায় একটা কাজ করবেন তিনি এত যন্ত্রণা করে বালিশের নিচে থেকে পেনসিল নেবেন না। হয়তো-বা তিনি জানতেনও না বালিশের নিচে পেনসিল ও নোটবই নিয়ে আপনি ঘুমান।'

রাশেদুল করিম বললেন, 'কাজটি তাহলে কে করেছে?'

'সেই প্রসঙ্গে আসছি—আপনি কি আরেক কাপ চা খাবেন। বানিয়ে দেব?'

'না।'

'অ্যাকসিডেন্ট কীভাবে ঘটল তা বলার আগে আপনার স্ত্রীর লেখা ডায়েরির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—এক জায়গায় তিনি লিখেছেন—আপনার বাঁ চোখ দিয়ে পানি পড়ত। কথাটা কি সত্যি?'

'হ্যাঁ, সত্যি।'

'কেন পানি পড়ত? একটি চোখ কেন কাঁদত? আপনার কী ধারণা?'

রাশেদুল করিম বললেন, 'আমার কোনো ধারণা নেই। আপনার ধারণা বলুন। আমি অবশ্যি ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। ডাক্তার বলেছেন এটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু

না। যে–গ্ল্যাণ্ড চোখের জল নিয়ন্ত্রণ করে, সেই গ্ল্যাণ্ড বাঁ চোখে বেশি কর্মক্ষম ছিল।'

মিসির আলি বললেন, 'এটা একটা মজার ব্যাপার। হঠাৎ কেন বাঁ চোখের গ্ল্যাণ্ড কর্মক্ষম হয়ে পড়ল। আপনি মনে–মনে এই চোখকে আপনার সব রকম অশান্তির মূল বলে চিহ্নিত করার জন্যেই কি এটা হল? আমি ডাক্তার নই। শারীরবিদ্যা জানি না। তবে আমি দু' জন বড় ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁরা বলেছেন এটা হতে পারে। মোটেই অস্বাভাবিক নয়। গ্ল্যাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করে মস্তিষ্ক। একটি চোখকে অপছন্দও করছে মস্তিষ্ক।'

'তাতে কী প্রমাণ হচ্ছে?'

মিসির আলি কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বললেন, 'তাতে একটি জিনিসই প্রমাণিত হচ্ছে—আপনার বাঁ চোখ আপনি নিজেই নষ্ট করেছেন।'

অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকে রাশেদুল করিম ভাঙা গলায় বললেন, 'কী বলছেন আপনি!'

'কনশ্যাস অবস্থায় আপনি এই ভয়ংকর কাজ করেন নি। করেছেন সাবকনশ্যাস অবস্থায়। কেন করেছেন তাও বলি—আপনি আপনার স্ত্রীকে অসম্ভব ভালবাসেন। সেই স্ত্রী আপনার কাছে থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন। কেন দূরে সরে যাচ্ছেন? কারণ তিনি ভয় পাচ্ছেন আপনার বাঁ চোখকে। আপনি আপনার স্ত্রীকে হারাচ্ছেন বাঁ চোখের জন্যে। আপনার ভেতর রাগ, অভিমান জমতে শুরু করেছে। সেই রাগ আপনার নিজের একটি প্রত্যঙ্গের ওপর। চোখের ওপর। এই রাগের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রচণ্ড হতাশা। আপনি যে–বিষয় নিয়ে গবেষণা করছেন সেই গবেষণা অন্য একজন করে ফেলেছেন। জার্নালে তা প্রকাশিত হয়ে গেছে। আপনার চোখ সমস্যা তৈরি না–করলে এমনটা ঘটত না। নিজেই গবেষণাটা শেষ করতে পারতেন। সবকিছুর জন্যে দায়ী হল চোখ।'

মিসির আলি আরেকটি সিগারেট ধরাতে–ধরাতে বললেন, 'আমার এই হাইপোথিসিসের পেছনে আরেকটি শক্ত যুক্তি আছে। যুক্তিটি বলেই আমি কথা শেষ করব।'

'বলুন।'

'আপনার স্ত্রী পুরোপুরি বিকৃত মস্তিস্ক হবার পরে যে–কথাটা বলতেন—তা হল, এই লোকটা পিশাচ। আমার কাছে প্রমাণ আছে। কেউ আমার কথা বিশ্বাস করবে না। কিন্তু প্রমাণ আছে। তিনি এই কথা বলতেন, কারণ—পেনসিল দিয়ে নিজের চোখ নিজে গেলে দেওয়ার দৃশ্য তিনি দেখেছেন। আমার হাইপোথিসিস আমি আপনাকে বললাম। এর বেশি আমার কিছু বলার নেই।'

রাশেদুল করিম দীর্ঘ সময় চুপ করে রইলেন। মিসির আলি আরেক বার বললেন, 'ভাই, চা করব? চা খাবেন?'

তিনি এই প্রশ্নেরও জবাব দিলেন না। উঠে দাঁড়ালেন। চোখে সানগ্লাস পরলেন। শুকনো গলায় বললেন, 'যাই?'

মিসির আলি বললেন, 'মনে হচ্ছে আমি আপনাকে আহত করেছি—কষ্ট দিয়েছি। আপনি কিছু মনে করবেন না। নিজের ওপরেও রাগ করবেন না। আপনি যা করেছেন—প্রচণ্ড ভালবাসা থেকেই করেছেন।'

রাশেদুল করিম হাত বাড়িয়ে মিসির আলির হাত ধরে ফেলে বললেন, 'আমার স্ত্রী

বেঁচে থাকলে তার সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিতাম—আপনি দেখতেন, সে কী চমৎকার একটি মেয়ে ছিল! এবং সেও দেখত—আপনি কত অসাধারণ একজন মানুষ!

ঐ দুর্ঘটনার পর জুডির প্রতি তীব্র ঘৃণা নিয়ে আমি বেঁচে ছিলাম। আপনি এই অন্যায় ঘৃণা থেকে তাকে মুক্তি দিয়েছেন। জুডির হয়ে আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

ভদ্রলোকের গলা ধরে এল। তিনি চোখ থেকে সানগ্লাস খুলে ফেলে বললেন, 'মিসির আলি সাহেব, ভাই দেখুন—আমার দু'টি চোখ থেকেই এখন পানি পড়ছে। চোখ পাথরের হলেও চোখের অশ্রুগ্রন্থি এখনো কার্যক্ষম। কুড়ি বছর পর এই ঘটনা ঘটল। আচ্ছা ভাই যাই।'

দু' মাস পর আমেরিকা থেকে বিমান-ডাকে মিসির আলি বড় একটা প্যাকেট পেলেন। সেই প্যাকেটে জলরঙে আঁকা একটা চেরি গাছের ছবি। অপূর্ব ছবি।

ছবির সঙ্গে একটি নোট। রাশেদুল করিম সাহেব লিখেছেন:

"আমার সবচেয়ে প্রিয় জিনিসটি আপনাকে দিতে চাচ্ছিলাম। এই ছবিটির চেয়ে প্রিয় কিছু এই মুহূর্তে আমার কাছে নেই। কোনোদিন হবে বলেও মনে হয় না।"

জিন-কফিল

১

জায়গাটার নাম ধুন্দুল নাড়া।

নাম যেমন অদ্ভুত, জায়গাও তেমন জঙ্গুলে। একবার গিয়ে পৌঁছলে মনে হবে সভ্যসমাজের বাইরে চলে এসেছি। সেখানে যাবার ব্যবস্থাটা বলি-প্রথমে যেতে হবে ঠাকরোকোণা। ময়মনসিংহ-মোহনগঞ্জ ব্রাঞ্চ-লাইনের ছোট্ট স্টেশন। ঠাকরোকোণা থেকে গয়নার নৌকা যায় হাতির বাজার পর্যন্ত। যেতে হবে হাতির বাজারে। ভাগ্য ভালো হলে হাতির বাজারে কেরায়া নৌকা পাওয়া যাবে। যদি পাওয়া যায় সেই নৌকায় শিয়ালজানি খাল ধরে মাইল দশেক উত্তরে যেতে হবে। বাকি পথ পায়ে হেঁটে। পেরুতে হবে মাঠ, ডোবা, জলাভূমি। জুতো খুলে হাতে নিয়ে নিতে হবে। পা কাটবে ভাঙা শামুকে। গোটা বিশেক জোঁক ধরবে। বিশ্রী অবস্থা। কতটা হাঁটতে হবে তারও অনুমান নেই। একেক জন একেক কথা বলবে। একটা সময় আসবে যখন লোকজন হাসিমুখে বলবে—ধুন্দুল নাড়া? ঐ তো দেখা যায়। তখন বুঝতে হবে আরো মাইল সাতেক বাকি।

বছর পাঁচেক আগে এই জঙ্গুলে জায়গায় আমাকে জনৈক সাধুর সন্ধানে যেতে হয়েছিল। সাধুর নাম—কালু খাঁ। মুসলমান নাম হলেও সাধু হিন্দু ব্রাহ্মণ। বাবা-মা তাঁকে শৈশবেই পরিত্যাগ করেন। তিনি মানুষ হন মুসলিম পরিবারে। কালু খাঁ নাম

তাঁর মুসলমান পালক বাবার দেওয়া। যৌবনে তিনি সংসারত্যাগী হয়ে শ্মশানে আশ্রয় নেন। তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা, বিভূতির কোনো সীমাসংখ্যা নেই। তিনি কোনোরকম খাদ্য গ্রহণ করেন না। তাঁর গা থেকে সবসময় কাঁঠালচাঁপা ফুলের তীব্র গন্ধ বের হয়। পূর্ণিমার সময় সেই গন্ধ এত তীব্র হয় যে, কাছে গেলে বমি এসে যায়। নাকে রুমাল চেপে কাছে যেতে হয়।

সাধু-সন্ন্যাসী, তাঁদের অলৌকিক ক্ষমতা এইসব নিয়ে আমি কখনো মাথা ঘামাই না। আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি—ব্যাখ্যার অতীত কোনো ক্ষমতা প্রকৃতি মানুষকে দেয় নি। কোনো সাধু যদি আমার চোখের সামনে শূন্যে ভাসতে থাকেন, আমি চমৎকৃত হব না। ধরে নেব এর পিছনে আছে ম্যাজিকের সহজ কিছু কলাকৌশল, যা এই সাধু আয়ত্ত করেছেন। কাজেই আমার পক্ষে সাধুর খোঁজে 'ধুন্দুল নাড়া' নামের অজ পাড়াগাঁয় যাবার প্রশ্নই আসে না। যেতে হয়েছিল সফিকের কারণে।

সফিক আমার বাল্যবন্ধু। সে বিশ্বাস করে না এমন জিনিস নেই। ভূত-প্রেত থেকে সাধু-সন্ন্যাসী সবকিছুতেই তার অসীম বিশ্বাস। বিংশ শতাব্দীর মানুষ হয়েও সে বিশ্বাস করে যে, সাপের মাথায় মণি আছে। কৃষ্ণপক্ষের রাতে এই মণি সে উগরে ফেলে। চারদিক আলো হয়ে যায়। আলোয় আকৃষ্ট হয়ে পোকা-মাকড় আসে। সাপ তাদের ধরে-ধরে খায়। ভোজনপর্ব শেষ হলে মণিটি আবার গিলে ফেলে।

সাধু কালু খাঁর খবর সফিকই নিয়ে এল এবং এমন ভাব করতে লাগল যে, অবতারের সন্ধান পেয়ে গেছে—যে-অবতারের সঙ্গে দেখা না হলে জীবন বৃথা।

আমি সফিকের সঙ্গে রওনা হলাম দু'টি কারণে—এক, সফিককে আমি অত্যন্ত পছন্দ করি। তাকে একা-একা ছেড়ে দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না ; দুই, সাধু খোঁজা উপলক্ষে গ্রামের দিকে খানিকটা হলেও ঘোরা হবে। মাঝে-মাঝে এ-রকম ঘুরে বেড়াতে মন্দ লাগে না। নিজেকে পরিব্রাজক-পরিব্রাজক মনে হয়। যেন আমি ফা'হিয়েন। বাংলার পথে-পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

খুব আগ্রহ নিয়ে রওনা হলেও আগ্রহ হাতির বাজারে পৌঁছবার আগেই শেষ হয়ে গেল। অমানুষিক পরিশ্রম হল। হাতির বাজার থেকে যে-কেরায়া নৌকা নিলাম সে-নৌকাও এখন ডোবে তখন ডোবে অবস্থা। নৌকার পাটাতনের ফুটো দিয়ে বিজবিজ করে পানি উঠছে। সারাক্ষণ সেই পানি সেঁচতে হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত সফিকের মতো পাগলেরও ধৈর্যচ্যুতি হল। কয়েক বার বলল, 'বিরাট বোকামি হয়েছে। গ্রেট মিসটেক। এর চেয়ে কঙ্গো নদীর উৎস বের করা সহজ ছিল।'

আমি বললাম, 'এখনো সময় আছে। ফিরে যাবি কি না বল্।'

'আরে না। এতদূর এসে ফিরে যাব মানে! ভালো জিনিসের জন্যে কষ্ট করতেই হবে। জাস্ট চিন্তা করে দেখ্—একজন মানুষের গা থেকে ভুরভুর করে কাঁঠালচাঁপা ফুলের গন্ধ বেরুচ্ছে। ভাবতেই গায়ের লোম খাড়া হয়ে যাচ্ছে। হাউ এক্সাইটিং!'

সন্ধ্যার পরপর ধুন্দুল নাড়া গ্রামে উপস্থিত হলাম। কাদায় পানিতে মাখামাখি। তিন বার বৃষ্টিতে ভিজেছি। ক্ষুধা এবং তৃষ্ণায় জীবন বের হবার উপক্রম। বিদেশি মানুষ দেখলেই গ্রামের লোকজন সাধারণত খুব আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে আসে। এইখানে উল্টো নিয়ম দেখলাম। আমাদের ব্যাপারে কারো কোনো আগ্রহ নেই। কোত্থেকে এসেছি? যাবো কোথায়? দায়িত্ব পালন করার ভঙ্গিতে এইটুকু জিজ্ঞেস করেই সবাই চলে

যাচ্ছে। এ কী যন্ত্রণা!

সাধু কালু খাঁ-কে দেখেও খুব হতাশ হতে হল। বদ্ধ উন্মাদ একজন মানুষ। শ্মশানে একটা পাকুড় গাছের নিচে ন্যাংটো অবস্থায় বসা। আমাদের দেখেই গালাগালি শুরু করল। গালাগালি যে এত নোংরা হতে পারে তা আমার ধারণার বাইরে ছিল। আমাকে এবং সফিককে কালু খাঁ সবচেয়ে ভদ্র কথা যা বলল তা হচ্ছে, 'বাড়িত্ যা। বাড়িত্ গিয়া খাবলাইয়া-খাবলাইয়া গু খা।'

আমি হতভম্ব। ব্যাটা বলে কী!

সফিকের দিকে তাকালাম। সে ভাব-গদগদ স্বরে বলল, 'লোকটার ভেতর জিনিস আছে বলে মনে হচ্ছে।'

আমি বললাম, 'কী করে বুঝলি? আমাদের গু খেতে বলেছে, এই জন্যে?'

'আরে না। সে আমাদের এড়াতে চাচ্ছে। মানুষের সংসর্গ পছন্দ নয়। মানুষের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার এটা সহজ টেকনিক।'

'লোকটা যে বদ্ধ উন্মাদ, তা তোর মনে হচ্ছে না?'

'তাও মনে হচ্ছে। তবে একটা প্রবাবিলিটি আছে যে, সে উন্মাদ না।'

গ্রামের কয়েক জন বয়স্ক মানুষ আমাদের সঙ্গে আছেন। সাধুর প্রতি তাঁদের ভক্তিশ্রদ্ধাও সফিকের মতোই। তাঁদের একজন বললেন,' 'বাবার মাথা এখন একটু গরম।'

আমি বিরক্ত গলায় বললাম, 'মাথা ঠাণ্ডা হবে কখন?'

'ঠিক নাই। চাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ।'

'চাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ মানে?'

'অমাবস্যা-পূর্ণিমায় মাথা গরম থাকে।'

এই ব্যাপারেও মতভেদ দেখা গেল। একজন বলল, 'অমাবস্যা-পূর্ণিমাতেই মাথাটা ঠাণ্ডা থাকে। অন্য সময় গরম। বাবার কাছে মাসের পর মাস পড়ে থাকতে হয়। অপেক্ষা করতে হয় কখন বাবার মাথা ঠাণ্ডা হবে।'

আমি বললাম, 'সফিক, বাবার গা থেকে ফুলের গন্ধ তো কিছু পাচ্ছি না। আমাদের যে-দ্রব্য খেতে বলছিল তার গন্ধ পাচ্ছি। তুই কি পাচ্ছিস?'

সফিক জবাব দেবার আগেই আমাদের সঙ্গী মানুষের একজন ভীত গলায় বলল, 'একটু দূরে যান। বাবা অখন ঢিল মারব। আইজ মনে হইতাছে বাবার মিজাজ বেশি খারাপ।'

কথা শেষ হবার আগেই ঢিলবৃষ্টি শুরু হল। দৌড়ে নিরাপদ দূরত্বে চলে গেলাম। বাবার কাণ্ডকারখানায় সফিকের অবশ্যি মোহভঙ্গ হল না। সে বেশ উৎসাহের সঙ্গেই বলল, 'দুটো দিন থেকে দেখি। এতদূর থেকে আসা। ভালো- মতো পরীক্ষা না-করে চলে যাওয়াটা ঠিক হবে না।'

'আর কী পরীক্ষা করবি?"

'মানে ওনার মাথা যখন ঠাণ্ডা হবে তখন দু'-একটা কথাটথা জিজ্ঞেস করলে...'

আমি হাল ছেড়ে দেওয়া গলায় বললাম, 'থাকবি কোথায়?'

'স্কুলঘরে শুয়ে থাকব। খানিকটা কষ্ট হবে। কী আর করা। কষ্ট বিনে কেষ্ট মেলে

না।'

জানা গেল এই গ্রামে কোনো স্কুল নেই। পাশের গ্রামে প্রাইমারি স্কুল আছে—এখান থেকে ছ' মাইলের পথ। তবে গ্রামে পাকা মসজিদ আছে। অতিথি মোসাফির এলে মসজিদে থাকে। মসজিদের পাশেই ইমাম সাহেব আছেন। তিনি অতিথিদের খোঁজখবর করেন। প্রয়োজনে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করেন।

আমি খুব একটা উৎসাহ বোধ করলাম না। গ্রামের একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ইমাম সাহেব লোক কেমন?'

সে অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে দার্শনিকের মতো বলল, 'ভালোয়-মন্দয় মিলাইয়া মানুষ। কিছু ভালো, কিছু মন্দ।'

এই উত্তরও আমার কাছে খুব সন্দেহজনক মনে হল। উপায় নেই। আকাশে আবার মেঘ জমতে শুরু করেছে। রওনা হলাম মসজিদের দিকে। গ্রামের লোকগুলো অভদ্রের চূড়ান্ত। কেউ সঙ্গে এল না। কীভাবে যেতে হবে বলেই ভাবল আমাদের জন্যে অনেক করা হয়েছে।

মসজিদ খুঁজে বের করতেও অনেক সময় লাগল।

অন্ধকার রাত। পথঘাট কিছুই চিনি না। সঙ্গে টর্চলাইট ছিল—বৃষ্টিতে ভিজে সেই টর্চলাইটও কাজ করছে না। অন্ধের মতো এগুতে হচ্ছে। যাকেই জিজ্ঞেস করি সে-ই খানিকটা জেরা করে—'জুম্মাঘরে যাইতে চান ক্যান? কার কাছে যাইবেন? আপনের পরিচয়?'

শেষ পর্যন্ত মসজিদ পাওয়া গেল। গ্রামের একেবারে শেষপ্রান্তে একটা খালের পাশে মসজিদ। মসজিদের বয়স খুব কম হলেও দু' শ' বছরের কম হবে না। বিশাল স্তূপের মতো একটা ব্যাপার। সেই স্তূপের সবটাই শ্যাওলায় ঢাকা। গা বেয়ে উঠেছে বটগাছ। সব মিলিয়ে কেমন গা-ছমছমানি ব্যাপার আছে।

আমাদের সাড়াশব্দ পেয়ে হারিকেন হাতে ইমাম সাহেব চলে এলেন। ছোটখাটো মানুষ। খালি গা। কাঁধে গামছা চাদরের মতো জড়ানো। বয়স চল্লিশের মতো হবে। দাড়িতে তাকে খানিকটা আর্নেস্ট হেমিংওয়ের মতো দেখাচ্ছে। আমার ধারণা ছিল মসজিদে রাত্রি যাপন করব শুনে তিনি বিরক্ত হবেন। হল উল্টোটা। তাঁকে আনন্দিত মনে হল। নিজেই বালতি করে পানি এনে দিলেন। গামছা আনলেন। দু' জোড়া খড়ম নিয়ে এলেন। সফিক বলল, 'ভাই, আমাদের খাওয়াদাওয়া দরকার। সারাদিন উপোস। টাকাপয়সা নিয়ে যদি খাওয়ার ব্যবস্থা করেন।'

ইমাম সাহেব বললেন, 'ব্যবস্থা হবে জনাব। আমার বাড়িতেই গরিবি হালতে ডালভাতের ব্যবস্থা।'

'নাম কি আপনার?'

'মুনশি এরতাজউদ্দিন।'

'থাকেন কোথায়, আশেপাশেই?'

'মসজিদের পিছনে—ছোট্র একটা টিনের ঘর আছে।'

'কে কে থাকেন?'

'আমার স্ত্রী, আর কেউ না।'

'ছেলেমেয়ে?'

'ছেলেমেয়ে নাই জনাব। আল্লাহ্পাক সন্তান দিয়েছিলেন, তাদের হায়াত দেন নাই। হায়াত-মউত সবই আল্লাহ্পাকের হাতে। আপনারা হাত-মুখ ধুয়ে বিশ্রাম করেন, আমি আসতেছি।'

ভদ্রলোক ছোট-ছোট পা ফেলে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। সফিক বলল, 'ইমাম সাহেবকে নিতান্ত ভদ্রলোক বলে মনে হচ্ছে। মাই ডিয়ার টাইপ। মনে হচ্ছে আমাদের দেখে খুশি হয়েছেন।'

আমি বললাম, 'ভদ্রলোক জঙ্গুলে জায়গায় একা পড়ে আছেন—আমাদের দেখে সেই কারণেই খুশি। এই মসজিদে নামাজ পড়তে কেউ আসে বলে আমার মনে হয় না।'

'বুঝলি কি করে?'

'লোকজনের যাতায়াত থাকলে পায়ে চলার পথ থাকত। পথ দেখলাম না।'

সফিক হাসতে-হাসতে বলল, 'মিসির আলির সঙ্গে থেকে-থেকে তোর অবজারভেশন পাওয়ার বেড়েছে বলে মনে হয়।'

'কিছুটা তো বেড়েছেই। ইমাম সাহেব আমাদের বসিয়ে রেখে যে চলে গেলেন, কী নিয়ে ফিরবেন জানিস?'

'কী নিয়ে?'

'দু' হাতে দুটো কাটা ডাব নিয়ে।'

'এই তোর অনুমান?'

আমি হাসিমুখে বললাম, 'মিসির আলি থাকলে এই অনুমানই করতেন। অনুমানের ভিত্তি হচ্ছে গ্রামে প্রচুর ডাব গাছ। অতিথিদের ডাব দেওয়া সনাতন রীতি।'

'লজিক তো ভালোই মনে হচ্ছে।'

আমার লজিক ভুল প্রমাণ করে মুনশি এরতাজউদ্দিন ট্রে হাতে উপস্থিত হলেন। ট্রেতে দু' কাপ চা। একবাটি তেল-মরিচ মাখা মুড়ি। এই অতি পাড়াগাঁ জায়গায় অভাবনীয় ব্যাপার তো বটেই। মফস্বলের চা অতিরিক্ত গরম, অতিরিক্ত মিষ্টি এবং অতিরিক্ত কড়া হয়। তবু চা হচ্ছে চা। চব্বিশ ঘন্টা পর প্রথম চায়ে চুমুক দিলাম, মনটা ভালো হয়ে গেল। চমৎকার চা। বিস্মিত হয়ে বললাম, 'চা কে বানিয়েছে? আপনার স্ত্রী?'

ইমাম সাহেব লাজুক মুখে বললেন, 'জ্বি। তার চায়ের অভ্যাস আছে। শহরের মেয়ে। আমার শ্বশুরসাহেব হচ্ছেন নেত্রকোণার বিশিষ্ট মোক্তার মমতাজউদ্দিন। নাম শুনেছেন বোধহয়।'

আমরা এমন ভঙ্গি করলাম যে নামটা আমাদের কাছে অপরিচিতি নয়, আগে অনেক বার শুনেছি।

ইমাম সাহেব বললেন, 'আমি চা খাই না। আমার স্ত্রীর চায়ের অভ্যাস আছে। শহর থেকে ভালো চায়ের পাতা এনে দিতে হয়। বিরাট খরচান্ত ব্যাপার'।

'আপনি কি ইমামতি ছাড়া আর কিছু করেন?'

'জ্বি-না। সামান্য জমিজমা আছে। আধি দেই। আমার শ্বশুর সাহেব তাঁর মেয়ের নামে নেত্রকোণা শহরে একটা ফার্মেসি দিয়েছেন—সানরাইজ ফার্মেসি। তার আয়

মাসে-মাসে আসে। রিজিকের মালিক আল্লাহ্‌পাক। তাঁর ইচ্ছায় চলে যায়।'

'ভালো চলে বলেই তো মনে হচ্ছে।'

'জ্বি জনাব, ভালোই চলে। সংসার ছোট। ছেলেপুলে নাই।'

এশার নামাজের সময় হয়ে গিয়েছিল। ইমামসাহেব আজান দিয়ে নামাজ পড়তে গেলেন। কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তিকে নামাজে আসতে দেখলাম না। ইমাম- সাহেবকে জিজ্ঞেস করে জানলাম—লোক এমনিতেই হত না। দু' বছর ধরে একেবারেই হচ্ছে না। শুধু জুমাবারে কিছু মুসুল্লি আসেন।

লোকজন না-হওয়ার কারণও বিচিত্র। মসজিদ সম্পর্কে গুজব রটে গেছে, এখানে জিন থাকে। নাপাক অবস্থায় নামাজ পড়লে জিন তার সঙ্গে বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়। নানান ধরনের যন্ত্রণা করে।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, 'জিন কি সত্যি-সত্যি আছে?'

'অবশ্যই আছে। আল্লাহ্‌পাক কোরান মজিদে বলেছেন। একটা সুরা আছে—সুরায়ে জিন।'

'সেই কথা জিজ্ঞেস করছি না—জানতে চাচ্ছি জিন গিয়ে বিরক্ত করে এটা সত্যি কিনা?'

'জ্বি জনাব, সত্য। তবে লোকজন জিনের ভয়ে মসজিদে আসে না—এটা ঠিক না, আসলে সাপের ভয়ে আসে না।'

'সাপের ভয়ে আসে না! কী বলছেন আপনি?'

'একবার নামাজের মাঝখানে সাপ বের হয়ে গেল। দাঁড়াস সাপ। অবশ্য কাউকে কামড়ায় নাই। বাস্তুসাপ কামড়ায় না। মাঝেমধ্যে ভয় দেখায়।'

সফিক আঁৎকে উঠে বলল, 'মাই গড! যখন-তখন সাপ বের হলে এইখানে থাকব কীভাবে?'

'ভয়ের কিছু নাই। কার্বলিক এসিড ছড়ায়ে দিব।'

'কার্বলিক এসিড আছে?'

'জ্বি। নেত্রকোণার ফার্মেসি থেকে তিন বোতল নিয়ে আসছি। আমার স্ত্রীরও খুব সাপের ভয়। এই অঞ্চলে সাপখোপ একটু বেশি।'

মসজিদের সামনে উঁচু চাতালমতো জায়গায় বসে আছি। সাপের ভয়ে খানিকটা আতঙ্কগ্রস্ত। আকাশে মেঘ ডাকছে। বড় ধরনের বর্ষণ মনে হচ্ছে আসন্ন। ইমাম সাহেব বললেন, 'খাওয়া দিতে একটু দেরি হবে। আমার স্ত্রী সব একা করছে—লোকজন নাই।'

'ভাব দেখে মনে হচ্ছে—বিরাট আয়োজন।'

'জ্বি-না, আয়োজন কিছু না, দরিদ্র মানুষ। আপনারা এসেছেন শুনে আমার স্ত্রী খুব খুশি। কেউ আসে না। আমি বলতে গেলে একা থাকি। সবাই আমাকে ভয় করে।'

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, 'কেন?'

'সবার একটা ধারণা হয়েছে আমি জিন পুষি। জিনদের দিয়ে কাজকর্ম করাই.....'

'বলেন কী!'

'সত্য না জনাব। তবে মানুষ অসত্যকে সহজে বিশ্বাস করে। অসত্য বিশ্বাস করা

সহজ, কারণ শয়তান অসত্য বিশ্বাসে সাহায্য করে।'

ইমাম সাহেব বেশ মন খারাপ করে চুপ হয়ে গেলেন। প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্যে জিজ্ঞেস করলাম, 'সাধু কালু খাঁ সম্পর্কে কী জানেন?'

ইমাম সাহেব বললেন, 'তেমন কিছু জানি না। তবে আপনাদের মতো দূর-দূর থেকে ওনার কাছে লোকজন আসে—এইটা দেখেছি। বিশিষ্ট ভদ্রলোকরাই আসে বেশি। ময়মনসিংহের ডি. সি. সাহেব ওনার পত্নীকে নিয়ে এসেছিলেন।'

'ওনার ক্ষমতাটমতা কিছু আছে?'

'মনে হয় না। কুৎসিত গালাগালি করেন। কামেল মানুষের এই রকম গালিগালাজ করার কথা না। তা ছাড়া কালু খাঁর কারণে অনেক বেদাতী কাণ্ডকারখানা হয়। এইগুলাও ঠিক না।'

'কী কাণ্ডকারখানা হয়?'

'উনি নগ্ন থাকেন। এইজন্য অনেকের ধারণা নগ্ন অবস্থায় তাঁর কাছে গেলে তাঁর মেজাজ ঠিক থাকে। অনেকেই নগ্ন অবস্থায় যান।'

'সে কী।'

'উনি পাগলমানুষ। সমস্যার কারণে যাঁরা তাঁর কাছে আসেন তাঁরাও এক অর্থে পাগল। পাগলমানুষের কাজকর্ম তো এই রকমই হয়। সমস্যা হলে তার পরিত্রাণের জন্য আল্লাহ্‌পাকের দরবারে কান্নাকাটি করতে হয়। মানুষ তা করে না, সাধু-সন্ন্যাসী, পীর-ফকির খোঁজে।'

ইমাম সাহেবের কথাবার্তায় আমি অবাক হলাম। পরিষ্কার চিন্তা-ভাবনা। গ্রাম্য মসজিদের ইমামের কাছ থেকে এমন যুক্তিনির্ভর কথা আশা করা যায় না। লোকটির প্রতি আমার একধরনের শ্রদ্ধাবোধ তৈরি হল। তা ছাড়া ভদ্রলোকের আচার-আচরণেও সহজ সারল্য আছে, যে-সারল্যের দেখা সচরাচর পাওয়া যায় না।

রাত ন'টার দিকে ইমাম সাহেব বললেন, 'চলেন যাই, খানা বোধহয় এর মধ্যে তৈরি হয়েছে। ডাল-ভাত-এর বেশি কিছু না। নিজ গুণে ক্ষমা করে চারটা মুখে দিবেন।'

ইমাম সাহেবের বাড়িটা ছোট্ট টিনের দু'-কামরার বাড়ি। একচিলতে উঠোন। বাড়ির চারদিকে দর্মার বেড়া। আমাদের ঘরে নিয়ে বসানো হল। মেঝেতে শতরঞ্জি বিছানো। থালা-বাসন সাজানো। আমরা সঙ্গে-সঙ্গে খেতে বসে গেলাম। খাবারের আয়োজন অল্প হলেও ভালো। সব্জি, ছোটো মাছের তরকারি, ডাল এবং টকজাতীয় একটা খাবার। ইমাম সাহেব আমাদের সঙ্গে বসলেন না। খাবার পরিবেশন করতে লাগলেন। খাবারের শেষ পর্যায়ে আমাদের অবাক করে দিয়ে ইমাম সাহেবের স্ত্রী ঘরে ঢুকলেন, এবং শিশুর মতো কৌতূহলী চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ব্যাপারটা এত আচমকা ঘটল যে আমি বেশ হকচকিয়েই গেলাম। অজ পাড়াগাঁয়ে এটা অভাবনীয়। কঠিন পর্দাপ্রথাই আশা করেছিলাম। আমি খানিকটা সংকুচিত হয়েই রইলাম। ইমাম সাহেবকেও দেখলাম খুব অপ্রস্তুত বোধ করছেন।

সফিক মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি কেমন আছেন?'

ইমাম সাহেবের স্ত্রী সঙ্গে-সঙ্গে বললেন, 'ভালো নাই। আমার সঙ্গে একটা জিন থাকে। জ্বিনটার নাম কফিল। কফিল আমারে খুব ত্যক্ত করে।'

সফিক হতভম্ব হয়ে বলল, 'আপনি কী বললেন, বুঝলাম না।'

মেয়েটি যন্ত্রের মতো বলল, 'আমার সঙ্গে একটা জিন থাকে। জ্বিনটার নাম কফিল। কফিল আমারে বড় যন্ত্রণা করে।'

সফিক অবাক হয়ে তাকাল আমার দিকে। আমি নিজেও বিস্মিত। ব্যাপার কী কিছু বুঝতে পারছি না। ইমাম সাহেব স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন—'লতিফা, তুমি একটু ভিতরে যাও।'

ভদ্রমহিলা তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, 'ক্যান? ভিতরে ক্যান? থাকলে কী অসুবিধা?'

'ওনাদের সঙ্গে কিছু কথা বলব। তুমি না থাকলে ভালো হয়। সব কথা মেয়েছেলেদের শোনা উচিত না।'

লতিফা তীব্র চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে রইল। খাওয়া বন্ধ করে আমরা হাত গুটিয়ে বসে রইলাম। এ কী সমস্যা!

লতিফা মেয়েটি রূপবতী। শুধু রূপবতী নয়, চোখে পড়ার মতো রূপবতী। হালকা-পাতলা শরীর। ধবধবে ফরসা গায়ের রঙ। লম্বাটে স্নিগ্ধ মুখ। বয়সও খুব কম মনে হচ্ছে। দেখাচ্ছে আঠার-উনিশ বছরের তরুণীর মতো। এত কম বয়স তার নিশ্চয় নয়। যার স্বামীর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি তার বয়স আঠার-উনিশ হতে পারে না। আরো একটি লক্ষ করার মতো ব্যাপার হল—মেয়েটি সাজগোজ করেছে। চুল বেঁধেছে, চোখে কাজল দিয়েছে—কপালে লাল রঙের টিপ। গ্রামের মেয়েরা কপালে টিপ দেয় বলেও জানতাম না।

ইমাম সাহেব আবার বললেন,'লতিফা, ভিতরে যাও।'

মেয়েটি উঠে চলে গেল।

ইমাম সাহেব গলার স্বর নিচু করে বললেন, 'লতিফার মাথা পুরাপুরি ঠিক না। ওর দুটো সন্তান নষ্ট হয়েছে। তারপর থেকে এ-রকম। তার ব্যবহারে আপনারা কিছু মনে করবেন না। আমি তার হয়ে আপনাদের কাছে ক্ষমা চাই। কিছু মনে করবেন না।—আল্লাহর দোহাই।'

আমি বললাম, 'কিছুই মনে করি নি। তা ছাড়া মনে করার মতো কিছু তো উনি করেন নি।'

ইমাম সাহেব ক্লান্ত গলায় বললেন, 'জিনের কারণে এ-রকম করে। জিনটা তার সঙ্গে-সঙ্গে আছে। মাঝে-মাঝে মাসখানিকের জন্য চলে যায়। তখন ভালো থাকে। গত এক মাস ধরে তার সাথে আছে।'

'আপনি এ-সব বিশ্বাস করেন?'

'বিশ্বাস করব না কেন? বিশ্বাস না-করার তো কিছু নাই। বাতাস আমরা চোখে দেখি না, কিন্তু বাতাস বিশ্বাস করি। কারণ বাতাসের নানান আলামত দেখি। সেই রকম জিন কফিলেরও নানান আলামত দেখি।'

'কী দেখেন?'

'জিন যখন সঙ্গে থাকে, তখন লতিফা খুব সাজগোজ করে। কথায়-কথায় হাসে, কথায়-কথায় কাঁদে।'

'জিন তাড়াবার ব্যবস্থা করেন নি?'

'করেছি। লাভ হয় নাই। কফিল খুব শক্ত জিন। দীর্ঘদিন লতিফার সঙ্গে আছে।

প্রথম সন্তান যখন গর্ভে আসল তখন থেকেই কফিল আছে।'

'জিন চায় কী?'

ইমাম সাহেব মাথা নিচু করে রইলেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি কোনো কারণে খুব কষ্ট পাচ্ছেন। আমার মনে ক্ষীণ সন্দেহ হল—জিন বোধহয় লতিফা মেয়েটিকেই স্ত্রী হিসেবে চায়। বিংশ শতাব্দীতে এই ধরনের চিন্তা মাথায় আসছে দেখে আমি নিজের ওপরও বিরক্ত হলাম। ইমাম সাহেব বললেন, 'এই জিনটা আমার দুইটা বাচ্চা মেরে ফেলেছে। আবার যদি বাচ্চা হয় তারেও মারবে। বড় মনকষ্টে আছি জনাব। দিন-রাত আল্লাহ্‌পাকেরে ডাকি। আমি গুনাহ্‌গার মানুষ, আল্লাহ্‌পাক আমার কথা শুনেন না।'

'আপনার স্ত্রীকে কোনো ডাক্তার দেখিয়েছেন?'

'ডাক্তার কী করবে? ডাক্তারের কোনো বিষয় না। জিনের ওষুধ ডাক্তারের কাছে নাই।।'

'তবু একবার দেখালে হত না?'

'আমার শ্বশুরসাহেব দেখিয়েছিলেন। একবার লতিফাকে বাপের বাড়িতে রেখে এসেছিলাম। শ্বশুরসাহেব তারে ঢাকা নিয়ে গেলেন। চিকিৎসাটিকিৎসা করালেন। লাভ হল না।'

বারান্দা থেকে গুনগুন শব্দ আসছে। উৎকর্ণ হয়ে রইলাম—খুবই মিষ্টি গলায় টেনে-টেনে গান হচ্ছে—যার কথাগুলোর বেশির ভাগই অস্পষ্ট। মাঝে-মাঝে দু'-একটা লাইন বোঝা যায়, যার কোনো অর্থ নেই। যেমনঃ

'এতে না দেহে না দেহে না এতে না।'

ইমাম সাহেব উঁচু গলায় বললেন, 'লতিফা, চুপ কর। চুপ কর বললাম।'

গান থামিয়ে লতিফা বলল, 'তুই চুপ কর্। তুই থাম্ শুয়োরের বাচ্চা।'

অবিকল পুরুষের ভারি গলা। আমার গা কাঁটা দিয়ে উঠল। সেই পুরুষকণ্ঠ থমথমে স্বরে বলল, 'চুপ কইরা থাকবি। একটা কথা কইলে টান দিয়া মাথা আলগা করুম। শইল থাকব একখানে মাথা আরেকখানে। শুয়োরের বাচ্চা আমারে চুপ করতে কয়।'

আমরা হাত ধুয়ে উঠে পড়লাম। এত কাণ্ডের পর খাওয়াদাওয়া চালিয়ে যাওয়া সম্ভব না। এ-জাতীয় যন্ত্রণায় পড়ব, কখনো ভাবি নি।

সফিক নিচু গলায় বলল, 'বিরাট সমস্যা হয়ে গেল দেখি। ভয়ভয় লাগছে। কী করা যায় বল্ তো?'

মসজিদের ভেতর এর আগে কখনো রাত্রি যাপন করি নি। অস্বস্তি নিয়ে ঘুমুতে গেলাম। কেমন যেন দম-বন্ধ দম-বন্ধ লাগছে। মসজিদের একটামাত্র দরজা—সেটি পেছন দিকে। ভেতরে গুমোট ভাব। ইমাম সাহেব যত্নের চূড়ান্ত করেছেন। স্ত্রীর অস্বাভাবিক আচরণজনিত লজ্জা হয়তো-বা ঢাকার চেষ্টা করেছেন। আমাদের জন্যে দুটো শীতল পাটি, পাটির চারপাশে কার্বলিক এসিড ছড়ানো হয়েছে। তার চেয়েও বড় কথা—দুটো মশারি খাটানো হয়েছে।

ইমাম সাহেব বললেন, 'ভয়ের কিছু নাই। হারিকেন জ্বালানো থাকবে। আলোতে সাপ আসে না। দরজা বন্ধ। সাপ ঢোকারও পথ নাই।'

আমি খুব, যে ভরসা পাচ্ছি, তা নয়। চৌকি এনে ঘুমুতে পারলে হত। মসজিদের

ভেতর চৌকি পেতে শোয়া—ভাবাই যায় না।

সফিকের হচ্ছে ইচ্ছাঘুম। শোয়ামাত্র নাক ডাকতে শুরু করেছে। বাইরে ঝিরঝির করে বৃষ্টি হচ্ছে। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। মসজিদের ভেতর আগরবাতির গন্ধ। যে-গন্ধ সবসময় মৃত্যুকে মনে করিয়ে দেয়। সব মিলিয়ে গা ছমছমানো ব্যাপার।

আমি ইমাম সাহেবকে বললাম, 'আপনি চলে যান, আপনি এখানে বসে আছেন কেন? আপনার স্ত্রী একা। তাঁর শরীরও ভালো না।'

ইমাম সাহেব বললেন, 'আমি মসজিদেই থাকব। এবাদত-বন্দেগি করব। ফজরের নামাজ শেষ করে বাসায় গিয়ে ঘুমুব।'

'কেন?'

'লতিফা এখন আমাকে দেখলে উন্মাদের মতো হয়ে যাবে। মেঝেতে মাথা ঠুকবে।'

'কেন?'

'ওর দোষ নাই কিছু। সঙ্গে জিন আছে—কফিল। এই জিনই সবকিছু করায়। বেচারির কোনো দোষ নাই।'

আমি চুপ করে রইলাম। ইমাম সাহেব ক্লান্ত গলায় বললেন, 'এমনিতে তেমন উপদ্রব করে না। সন্তানসম্ভবা হলেই কফিল ভয়ংকর যন্ত্রণা করে। বাচ্চাটা মেরে না-ফেলা পর্যন্ত থামে না। দুইটা বাচ্চা মেরেছে—এইটাও মারবে।'

'আপনার স্ত্রী কি সন্তানসম্ভবা?'

'জ্বি।'

'আপনি কি নিশ্চিত যে পুরো ব্যাপারটা জিন করছে, অন্য কিছু না?'

'জ্বি, নিশ্চিত। জিনের সঙ্গে আমার মাঝেমধ্যে কথা হয়।'

'অবিশ্বাস্য সব কথাবার্তা বলছেন আপনি।'

'অবিশ্বাসের কিছু নাই। একদিনের ঘটনা বলি-তাহলে বুঝবেন। ভাদ্র মাস। খুব গরম। একটা ভেজা গামছা শরীরে জড়ায়ে এশার নামাজে দাঁড় হয়েছি। মসজিদে আমি একা। আমি ছাড়া আর কেউ নাই। হঠাৎ দপ করে হারিকেনটা নিভে গেল। চমকে উঠলাম। তারপর শুনি মসজিদের পিছনের দরজার কাছে ধুপ-ধুপ শব্দ। খুব ভয় লাগল। নামাজ ছেড়ে উঠতে পারি না। নামাজে মনও দিতে পারি না। কিছুক্ষণ পরপর পিছনের দরজায় ধুপধুপ শব্দ। যেন কেউ কিছু একটা এনে ফেলছে। সেজদায় যাবার সময় কফিলের গলা শুনলাম—টেনে-টেনে বলল, ''তোরে আইজ পুড়াইয়া মারব। তোরে আইজ পুড়াইয়া মারব।'' তারপর ধপ করে আগুন জ্বলে উঠল। দাউদাউ আগুন। নামাজ ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। দেখি দরজার কাছে গাদা করা শুকনা লাকড়ি। আগুন জ্বলছে। আমি চিৎকার দিয়ে উঠলাম—বাঁচাও, বাঁচাও! আমার চিৎকার শুনে লতিফা পানির বালতি হাতে ছুটে আসল। পানি দিয়ে আগুন নিভায়ে আমারে মসজিদ থেকে টেনে বার করল। আমার স্ত্রীর কারণে সেই যাত্রা বেঁচে গেলাম। লতিফা সময়মতো না আসলে মারা পড়তাম।'

'জিন মসজিদের ভেতরে ঢুকল না কেন?'

'খারাপ ধরনের জ্বীন। আল্লাহ্‌র ঘরে এরা ঢুকতে পারে না। আমি এই জন্যই বেশির ভাগ সময় মসজিদে থাকি। মসজিদে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমাতে পারি। ঘরে

পারি না।’

‘কফিল আপনাকে খুন করতে চায়?’

‘তাও ঠিক না—একবারই চেয়েছিল। তারপর আর চায় নাই।’

‘খুন করতে চেয়েছিল কেন?’

ইমাম সাহেব চুপ করে রইলেন। আমি বললাম, ‘আপনার যদি আপত্তি না থাকে পুরো ঘটনাটা বলুন। আপত্তি থাকলে বলার দরকার নেই।’

‘না, আপত্তির কী আছে? আপত্তির কিছু নাই। আমি লতিফার অবস্থা একটু দেখে আসি।’

‘যান, দেখে আসুন।’

ইমাম সাহেব চলে গেলেন। আমি ভয়ে অস্থির হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ভূত, প্রেত, জিন, পরী কখনো বিশ্বাস করি নি—এখনো করছি না, তবু আতঙ্কে আধমরা হয়ে গেছি। সফিক জেগে থাকলে খানিকটা ভরসা পাওয়া যেত। সে ঘুমুচ্ছে মড়ার মতো। একেই বলে পরিবেশ। ইমাম সাহেব দশ মিনিটের মধ্যে ফিরে এলেন। বিরস গলায় বললেন, ‘ভালোই আছে, তবে ভীষণ চিৎকার করছে।’

‘তালাবন্ধ করে রেখেছেন?’

‘জ্বি–না। তালাবন্ধ করে তাকে রাখা সম্ভব না। কফিল ওর সঙ্গে থাকে—কাজেই ওর গায়ের জোর থাকে অসম্ভব। না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবেন না।’

ইমাম সাহেব মন–খারাপ করে বসে রইলেন। আমি বললাম, ‘গল্পটা শুরু করুন ভাই।’

তিনি নিচু গলায় বললেন, ‘আমার স্ত্রীর ডাকনাম বুড়ি।’

কথা পুরোপরি শেষ করতে পারলেন না। মসজিদে প্রচণ্ড শব্দে ঢিল পড়তে লাগল। ধুপধুপ শব্দ। সেই সঙ্গে মনে হচ্ছে কয়েকজন মানুষ যেন চারদিকে ছোটাছুটি করছে। আমি আতঙ্কিত গলায় বললাম, ‘কী ব্যাপার?’

ইমাম সাহেব বললেন, ‘কিছু না। কফিল চায় না আমি কিছু বলি।’

‘থাক ভাই, বাদ দিন। গল্প বলার দরকার নেই।’

‘অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই ঢিল ছোঁড়া বন্ধ হবে। ভয়ের কিছুই নাই।’

সত্যি–সত্যি বন্ধ হল। বৃষ্টির বেগ বাড়তে লাগল। ইমাম সাহেব গল্প শুরু করলেন। আমি তাঁর গল্পটাই বলছি। তাঁর ভাষাতে। তবে আঞ্চলিকতাটা সামান্য বাদ দিয়ে।

গল্পের মাঝখানেও একবার তুমুল ঢিল ছোঁড়া হল। ইমাম সাহেব একমনে আয়াতুল কুরসি পড়লেন। আমার জীবনে সে এক ভয়াবহ রাত।

২

নেত্রকোণা শহরের বিশিষ্ট মোক্তার মমতাজউদ্দিন সাহেবের বাড়িতে তখন আমি থাকি। ওনার সঙ্গে আমার কোনো আত্মীয়সম্পর্ক নাই। লোকমুখে শুনেছিলাম—বিশিষ্ট ভদ্রলোক। কেউ কোনো বিপদে পড়ে তাঁর কাছে গেলে তিনি যথাসাধ্য করেন। আমার

তখন মহাবিপদ। এক বেলা খাই তো এক বেলা উপোস দেই। সাহসে ভর করে তাঁর কাছে গেলাম চাকরির জন্য। উনি বললেন, 'চাকরি যে দিব, পড়াশোনা কী জানো।?'

আমি বললাম, 'উলা পাস করছি।'

উনি বিরক্ত হয়ে বললেন, 'মাদ্রাসা পাস-করা লোক, তোমারে আমি কী চাকরি দিব! আই.এ., বি.এ. পাস থাকলে কথা ছিল। চেষ্টাচরিত্র করে দেখতাম। চেষ্টা করারও তো কিছু নাই।'

আমি চুপ করে রইলাম। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। বড় আশা ছিল কিছু হবে। একটা পয়সা সঙ্গে নাই। উপোস দিচ্ছি। রাতে নেত্রকোণা স্টেশনে ঘুমাই।

মমতাজ সাহেব বললেন, 'তোমাকে চাকরি দেওয়া সম্ভব না। নেও, এই বিশটা টাকা রাখ। অন্য কারো কাছে যাও। মসজিদে খোঁজটোজ নাও—ইমামতি পাও কি না দেখ।'

আমি টাকাটা নিলাম। তারপর বললাম, 'ভিক্ষা নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব না। ঘরের কোনো কাজকর্ম থাকে বলেন, করে দেই।'

তিনি অবাক হয়ে বললেন, 'কী কাজ করতে চাও?'

'যা বলবেন করব। বাগানের ঘাসগুলো তুলে দেই?'

'আচ্ছা দাও?'

আমি বাগান পরিষ্কার করে দিলাম। গাছগুলোতে পানি দিলাম। দু'-এক জায়গায় মাটি কুপিয়ে দিলাম। সন্ধ্যাবেলা কাজ শেষ করে বললাম, 'জনাব যাই। আপনার অনেক মেহেরবানী। আল্লাহ্পাকের দরবারে আমি আপনার জন্য দোয়া করি।'

মমতাজ সাহেব বললেন, 'এখন যাবে কোথায়?'

'ইস্টিশনে। রাত্রে নেত্রকোণা ইস্টিশনে আমি ঘুমাই।'

'এক কাজ কর। রাতটা এইখানেই থাক। তারপর দেখি।'

আমি থেকে গেলাম।

এক দিন দুই দিন তিন দিন চলে গেল। উনি কিছু বলেন না। আমিও কিছু বলি না। বাংলাঘরের এক কোণায় থাকি। বাগান দেখাশোনা করি। চাকরির সন্ধান করি। ছোট শহর, আমার কোনো চিনা-পরিচয়ও নাই। কে দেবে চাকরি? ঘুরাঘুরি সার হয়। মোক্তার সাহেবের সঙ্গে মাঝেমধ্যে দেখা হয়। আমি বড়ই শরমিন্দা বোধ করি। উনিও এমন ভাব করেন যেন আমাকে চেনেন না। মাসখানেক এইভাবে চলে গেল। আমি মোটামুটি তাঁদের পরিবারের একজন হয়ে গেলাম। মোক্তার সাহেবের স্ত্রীকে মা ডাকি। ভেতরের বাড়িতে খেতে যাই। তাঁদের কোনো-একটা উপকার করার সুযোগ পেলে প্রাণপণে করার চেষ্টা করি। বাজার করে দেই। কল থেকে পানি তুলে দেই।

মোক্তার সাহেবের তিন মেয়ে। বড় মেয়ে বিধবা হয়ে বাবার সঙ্গে আছে। তার দুই বাচ্চাকে আমি আমপারা পড়াই। বাজার-সদাই করে দেই। টিপকল থেকে রোজ ছয়-সাত বালতি পানি তুলে দেই। মোক্তার সাহেবের কাছে যখন মক্কেলরা আসে, তিনি ঘনঘন তামাক খান। সেই তামাকও আমি সেজে দেই। চাকরবাকরের কাজ। আমি আনন্দের সঙ্গেই করি। মাঝে-মাঝে মনটা খুবই খারাপ হয়। দরজা বন্ধ করে একমনে কোরান শরিফ পড়ি। আল্লাহ্পাকরে ডেকে বলি—হে আল্লাহ্, আমার একটা উপায় করে দাও। কতদিন আর মানুষের বাড়িতে অন্নদাস হয়ে থাকব?

আল্লাহ্পাক মুখ তুলে তাকালেন। সিদ্দিকুর রহমান সাহেব বলে এক ব্যবসায়ী বলতে গেলে সেধে আমাকে চাকরি দিয়ে দিলেন। চালের আড়তে হিসাবপত্র রাখা। মাসিক বেতন পাঁচ শ' টাকা।

মোক্তার সাহেবকে সালাম করে খবরটা দিলাম। উনি খুবই খুশি হলেন। বললেন, 'তোমাকে অনেকদিন ধরে দেখতেছি। তুমি সৎ স্বভাবের মানুষ। ঠিকমতো কাজ কর, তোমার আয়-উন্নতি হবে। আর রাতে তুমি আমার বাড়িতেই থাক। তোমার কোনো অসুবিধা নাই। খাওয়াদাওয়াও এইখানেই করবে। তোমাকে আমি ঘরের ছেলের মতোই দেখি।'

আনন্দে মনটা ভরে গেল। চোখে পানি এসে গেল। আমি মোক্তার সাহেবের কথামতো তাঁর বাড়িতেই থাকতে লাগলাম। ইচ্ছা করলে চালের আড়তে থাকতে পারতাম। মন টানল না। তা ছাড়া মোক্তার সাহেবের বাগানটা নিজের হাতে তৈরি করেছি। দিনের মধ্যে কিছুটা সময় বাগানে না থাকলে খুব অস্থির-অস্থির লাগে।

একমাস চাকরির পর প্রথম বেতন পেলাম। পাঁচ শ' টাকার বদলে সিদ্দিকুর রহমান সাহেব ছ' শ' টাকা দিয়ে বললেন, 'তোমার কাজকর্ম ভালো। এইভাবে কাজকর্ম করলে বেতন আরো বাড়িয়ে দিব।'

আমার মনে বড় আনন্দ হল। আমি তখন একটা কাজ করলাম। পাগলামিও বলতে পারেন। বেতনের সব টাকা খরচ করে মোক্তার সাহেবের স্ত্রী এবং তাঁর তিন মেয়ের জন্য চারটা শাড়ি কিনে ফেললাম। টাঙ্গাইলের সুতি শাড়ি। মোক্তার সহেবের জন্য একটা খদ্দরের চাদর।

মোক্তার সহেবের স্ত্রী বললেন, 'তোমার কি মাথাটা খারাপ? এইটা তুমি কী করলা? বেতনের প্রথম টাকা—তুমি তোমার আত্মীয়স্বজনের জন্য জিনিস কিনবা, বাড়িতে টাকা পাঠাইবা।'

আমি বললাম, 'মা, আমার আত্মীয়স্বজন কেউ নাই। আপনারাই আমার আত্মীয়স্বজন।'

তিনি খুবই অবাক হয়ে বললেন, 'কই, কোনোদিন তো কিছু বল নাই!'

'আপনি জিজ্ঞেস করেন নাই—এই জন্য বলি নাই। আমার বাবা-মা খুব ছোটবেলায় মারা গেছেন। আমি মানুষ হয়েছি এতিমখানায়। এতিমখানা থেকেই উলা পাস করেছি।'

উনি আমার কথায় মনে খুব কষ্ট পেলেন। উনার মনটা ছিল পানির মতো। সবসময় টলটল করে। উনি বললেন, 'কিছু মনে নিও না। আমার আগেই জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল। তুমি আমারে মা ডাক আর আমি তোমার সম্পর্কে কিছুই জানি না—এইটা খুবই অন্যায় কথা। আমার খুব অন্যায় হইছে।'

তিনি তাঁর তিন মেয়েরে ডেকে বললেন, 'তোমরা এরে আইজ থাইক্যা নিজের ভাইয়ের মতো দেখবা। মনে করবা তোমরার এক ভাই। তার সামনে পর্দা করার দরকার নাই।'

এর মধ্যে একটা বিশেষ জরুরি কথা বলতে ভুলে গেছি—মোক্তার সাহেবের ছোটো মেয়ে লতিফার কথা। এই মেয়েটা পরীর মতো সুন্দর। একটু পাগল ধরনের। নিজের মনে কথা বলে। নিজের মনে হাসে। যখন-তখন বাংলা-ঘরে চলে আসে।

আমার সঙ্গে দুই–একটা টুকটাক কথাও বলে। অদ্ভুত সব কথা। একদিন এসে বলল, 'এই যে মৌলানা সাব, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে আসছি। আচ্ছা বলেন তো—শয়তান পুরুষ না মেয়েছেলে?'

আমি বললাম, 'শয়তান পুরুষ।'

লতিফা বলল, 'আল্লা মেয়ে–শয়তান তৈরি করেন নাই কেন?'

আমি বললাম, 'তা তো জানি না। আল্লাহ্‌পাকের ইচ্ছার খবর কেমনে জানব? আমি অতি তুচ্ছ মানুষ।'

'কিন্তু শয়তান যে পুরুষ তা আপনি জানেন?'

'জানি।'

'আপনে ভুল জানেন। শয়তান পুরুষও না স্ত্রীও না। শয়তান আলাদা এক জাত।'

আমি মেয়েটার বুদ্ধি দেখে খুবই অবাক হই। এই রকম সে প্রায়ই করে। একদিনের কথা। ছুটির দিন। দুপুর বেলা। বাংলাঘরে আমি ঘুমাচ্ছি। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। অবাক হয়ে দেখি, লতিফা আমার ঘরে। আমি ধড়মড় করে উঠে বসলাম। লতিফা বলল, 'আপনেরে একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করতে আসছি। আচ্ছা বলেন তো—

হেন কোন গাছ আছে এ–ধরায়
স্থলে জলে কভু তাহা নাহি জন্মায়।'

আমি ধাঁধার জবাব না–দিয়ে বললাম, 'তুমি কখন আসছ?'

লতিফা বলল, 'অনেকক্ষণ হইছে আসছি। আপনে ঘুমাইতেছিলেন, আপনারে জাগাই নাই। এখন বলেন—ধাঁধার উত্তর দেন,

হেন কোন গাছ আছে এ–ধরায়
স্থলে জলে কভু তাহা নাহি জন্মায়।'

আমি বললাম, 'এইটার উত্তর জানা নাই।'

'উত্তর খুব সোজা। উত্তর হইল—পরগাছা। আচ্ছা আরেকটা ধরি বলেন দেখি—

পাকলে খেতে চায় না, কাঁচা খেতে চায়
এ কেমন ফল বল তো আমায়?'

মেয়েটার কাণ্ডকারখানায় আমার ভয়ভয় লাগতে লাগল। কেন সে এই রকম করে? কেন বারবার আমার ঘরে আসে? লোকের চোখে পড়লে নানান কথা রটবে। মেয়ে যত সুন্দর তারে নিয়া রটনাও তত বেশি।

লতিফা আমার বিছানায় বসতে–বসতে বলল, 'কই, বলেন এটার উত্তর কি—

পাকলে খেতে চায় না, কাঁচা খেতে চায়
এ কেমন ফল বল তো আমায়?

বলতে পারলেন না। এটা হল—শশা। পাকা শশা কেউ খায় না। সবাই কাঁচা শশা চায়। আচ্ছা আপনার বুদ্ধি এত কম কেন? একটাও পারেন না। আপনি একটা ধাঁধা ধরেন আমি সঙ্গে–সঙ্গে বলে দেব।'

'আমি ধাঁধা জানি না লতিফা।'

'আপনি কী জানেন? শুধু আল্লাহ্–আল্লাহ্ করতে জানেন, আর কিছু জানেন?'

'লতিফা, তুমি এখন ঘরে যাও।'

'ঘরেই তো আছি। এইটা ঘর না? এইটা কি বাহির?'

'যখন-তখন তুমি আমার ঘরে আস— টা ঠিক না।'

'ঠিক না কেন? আপনি কি বাঘ না ভালুক?'

আমি চুপ করে রইলাম। আধা-পাগল ই মেয়েকে আমি কী বলব? ই মেয়ে কদিন নিজে বিপদে পড়বে, আমাকেও বিপদে ফেলবে। লতিফা বলল, 'আমি যে মাঝেমধ্যে আপনার খানে আসি—সেইটা আপনার ভালো লাগে না—ঠিক না?'

'হ্যাঁ, ঠিক।'

'ভালো লাগে না কেন?'

'নানান জনে নানান কথা বলতে পারে।'

কী কথা বলতে পারে? আপনার সঙ্গে আমার ভালবাসা হয়ে গেছে? চুপ করে আছেন কেন, বলেন।'

'তুমি খন যাও লতিফা।'

'আচ্ছা যাই। কিন্তু আমি আবার আসব। রাত-দুপুরে আসব। তখন দেখবেন—কী বিপদ!'

'কেন ই রকম করতেছ লতিফা?'

লতিফা উঠে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে বলল, 'যে ভয় পায় তাকে ভয় দেখাতে আমার ভালো লাগে। ইজন্যে -রকম করি। আচ্ছা মৌলানা সাহেব, যাই। আসসালামু আলায়কুম। ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বরকাতুহু। হি-হি-হি।'

ভাই, আপনার কাছে সত্য কথা গোপন করব না। সত্য গোপন করা বিরাট অন্যায়। আল্লাহ্‌পাক সত্য গোপনকারীকে পছন্দ করেন না। চাকরি পাওয়ার পরেও আমি মোক্তার সাহেবের বাড়িতে থেকে গেলাম শুধু লতিফার জন্য। তারে দেখার জন্য মনটা ছটফট করত। মনে-মনে অপেক্ষা করতাম কোন সময় তারে কনজর হলেও দেখব। তার পায়ের শব্দ শুনলেও বুক ধড়ফড় করত। রাত্রে ভালো ঘুম হত না। শুধু লতিফার কথা ভাবতাম। বলতে খুব শরম লাগছে ভাই-সাব, তবু বলি—লতিফার চুলের কটা কাঁটা আমি সবসময় আমার সঙ্গে রাখতাম। আমার কাছে মনে হত—ইটা চুলের কাঁটা না, সাত রাজার ধন। আমি আল্লাহ্‌পাকের দরবারে কান্নাকাটি করতাম। বলতাম—হে পরোয়ারদিগার, হে গাফুরুর রহিম, তুমি আমাকে -কি বিপদে ফেললা। তুমি আমারে উদ্ধার কর।

আল্লাহ্‌পাক আমাকে উদ্ধার করলেন। লতিফার বিবাহের প্রস্তাব আসল। ছেলে ম.বি.বি. স. ডাক্তার। বাড়ি গৌরীপুর। ভালো বংশ। খান্দানি পরিবার। ছেলে নিজে সে মেয়ে দেখে গেল। মেয়ে তার খুব পছন্দ হল। পছন্দ না-হওয়ার কোনো কারণ নাই। লতিফার মতো রূপবতী মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না। ছেলেও দেখতে শুনতে ভালো। শুধু গায়ের রঙটা কটু ময়লা। কথায়বার্তায়ও ছেলে অতি ভদ্র। বিয়ে ঠিকঠাক হয়ে গেল। বারই শ্রাবণ। শুক্রবার দিবাগত রাত্রে বিবাহ পড়ানো হবে।

আমার মনটা বড়ই খারাপ হয়ে গেল। আমি জানি, ই মেয়ের সঙ্গে আমার বিবাহের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কোথায় সে আর কোথায় আমি। চাকরশ্রেণীর আশ্রিত কজন মানুষ। জমিজমা নাই, আত্মীয়স্বজন নাই, সহায়-সম্বল নাই। তার জন্য আমি কোনোদিন আফসোস করি নাই। আল্লাহ্‌পাক যাকে যা দেন তাই নিয়াই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। আমিও ছিলাম। কিন্তু যে-দিন লতিফার বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়ে গেল সে-

দিন কী যে কষ্ট লাগল বলে আপনাকে বুঝাতে পারব না। সারা রাত শহরের পথে-পথে ঘুরলাম। জীবনে কোনোদিন নামাজ কাজা করি নাই—এই প্রথম এশার নামাজ কাজা করলাম। ফজরের নামাজ কাজা করলাম। এত দিন পরে বলতে লজ্জা লাগছে—আমার প্রায় মাথা-খারাপের মতো হয়ে গিয়েছিল। ভোরবেলা মোক্তার সাহেবের বাসায় গেলাম। সবার কাছ থেকে বিদায় নিলাম। এইখানে আর থাকব না। বাজারে চালের আড়তে থাকব। মোক্তার সাহেবের স্ত্রী বললেন, 'এখন যাবে কেন বাবা? মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। কত কাজকর্ম! কাজকর্ম শেষ করে তারপর যাও।'

আমি মিথ্যা কথা বলি না। প্রথম মিথ্যা বললাম। আমি বললাম, 'মা, সিদ্দিকুর রহমান সাহেব আমাকে আজই দোকানে গিয়ে উঠতে বলেছেন—উনি আমার মনিব-অন্নদাতা। ওনার কথা না রাখলে অন্যায় হবে। বিয়ের সময় আমি চলে আসব। কাজকর্মের কোনো অসুবিধা হবে না, মা।'

সবার কাছ থেকেই বিদায় নিলাম। লতিফার কাছ থেকে বিদায় নিতে পারলাম না। সে যখন সামনে এসে দাঁড়াল তখন চোখ তুলে তার দিকে তাকাতে পর্যন্ত পারলাম না।

লতিফা বলল, 'চলে যাচ্ছেন?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ।'

'কেন, আমরা কি কোনো দোষ করেছি?'

'ছি ছি—দোষ করবে কেন?'

'আচ্ছা, যাওয়ার আগে এই ধাঁধাটা ভাঙায়ে দিয়ে যান—বলেন দেখি—

'ছাই ছাড়া শোয় না ;

লাথি ছাড়া ওঠে না। এই জিনিস কি?'

'জানি না লতিফা।'

'এত সহজ জিনিস পারলেন না। এটা হল কুকুর। আচ্ছা যান। দোষঘাট হলে ক্ষমা করে দিয়েন।'

আমি আড়তে চলে আসলাম। রাত আটটার দিকে মোক্তার সাহেব লোক পাঠিয়ে আমাকে ডাকিয়ে নিয়ে গেলেন। তিনি শোবার ঘরে চেয়ারে বসে ছিলেন। আমাকে সেইখানে নিয়ে যাওয়া হল। আমি খুবই অবাক হলাম। একটু ভয়ভয়ও করতে লাগল। তাকিয়ে দেখি মোক্তার সাহেবের স্ত্রী খাটে বসে আছেন। নিঃশব্দে কাঁদছেন। আমি কিছুই বুঝলাম না। বুক ধড়ফড় করতে লাগল। না জানি কী হয়েছে!

মোক্তার সাহেব বললেন, 'তোমাকে আমি পুত্রের মতো স্নেহ করেছি। তার বদলে তুমি এই করলে? দুধ দিয়ে কালসাপ পোষার কথা শুধু শুনেছি। আজ নিজের চোখে দেখলাম।'

আমি মোক্তার সাহেবের স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'মা, আমি কিছুই বুঝতেছি না।'

মোক্তার সাহেব চাপা স্বরে বললেন, 'বোকা সাজার দরকার নাই। বোকা সাজবা না। তুমি যা করেছ তা তুমি ভালোই জান। তুমি পথের কুকুরেরও অধম।'

আমি বললাম, 'আমার কী অপরাধ দয়া করে বলেন।'

মোক্তার সাহেব রাগে কাঁপতে-কাঁপতে বললেন, 'মেথরপট্টিতে যে শুয়োর থাকে তুই তার চেয়েও অধম—তুই নর্দমার ময়লা।' বলতে-বলতে তিনিও কেঁদে ফেললেন।

মোক্তার সাহেবের স্ত্রী বললেন, 'লতিফা সবই আমাদের বলেছে—কিছুই লুকায় নাই। এখন এই অপমান এই লজ্জার হাত থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় লতিফার সঙ্গে তোমার বিবাহ দেওয়া। তুমি তাতে রাজি আছ, না মেয়ের সর্বনাশ করে পালানোই তোমার ইচ্ছা?'

আমি বললাম, 'মা, আপনি কী বলছেন, আমি কিছুই বুঝতে পারতেছি না। লতিফা কী বলেছে আমি জানি না। তবে আপনারা যা বলবেন—আমি তা-ই করব। আল্লাহ্পাক উপরে আছেন। তিনি সব জানেন, আমি কোনো অন্যায় করি নাই মা।'

মোক্তার সাহেব চিৎকার করে বললেন, 'চুপ থাক্, শুয়োরের বাচ্চা। চুপ থাক।'

সেই রাতেই কাজী ডাকিয়ে বিয়ে পড়ানো হল। বাসর রাতে লতিফা বলল, 'আমি একটা অন্যায় করেছি—আপনার সাথে যেন বিবাহ হয় এই জন্য বাবা-মাকে মিথ্যা করে বলেছি—আমার পেটে সন্তান আছে। বিরাট অপরাধ করেছি, আপনার কাছে ক্ষমা চাই।'

আমি বললাম, 'লতিফা, আমি তোমার অপরাধ ক্ষমা করলাম। তুমি আল্লাহ্পাকের কাছে ক্ষমা চাও।'

'আপনি ক্ষমা করলেই আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন। তা ছাড়া আমি তেমন বড় অপরাধ তো করি নাই। সামান্য মিথ্যা বলেছি। আপনাকে বিবাহ করার জন্য অনেক বড় অপরাধ করার জন্যও আমি তৈরি ছিলাম। আচ্ছা এখন বলেন এই ধাঁধাটির মানে কি—

আমার একটা পাখি আছে
যা দেই সে খায়।
কিছুতেই মরে না পাখি
জলে মারা যায়।'

বুঝলেন ভাইসাহেব, আনন্দে আমার চোখে পানি এসে গেল। এই আনন্দের কোনো সীমা নাই। আমার মতো নাদান মানুষের জন্য আল্লাহ্পাক এত আনন্দ রেখে দিয়েছেন আমি কল্পনাও করি নাই। আমি কত বার যে বললাম, আল্লাহ্পাক, আমি তোমার নেয়ামত স্বীকার করি। আমি তোমার নেয়ামত স্বীকার করি।

বিয়ের পর আমি শ্বশুরবাড়িতেই থেকে গেলাম। আমার এবং লতিফার বড় দুঃখের সময় কাটতে লাগল। শ্বশুরবাড়ির কেউ আমাদের দেখতে পারে না। খুবই খারাপ ব্যবহার করে। আমার শাশুড়ি দিন-রাত লতিফাকে অভিশাপ দেন—'মর, মর, তুই মর।'

আমার শ্বশুরসাহেব একদিন আমাকে ডেকে বললেন, 'সকালবেলায় তুমি আমার সামনে আসবা না। সকালবেলায় তোমার মুখ দেখলে আমার দিন খারাপ যায়।'

শ্বশুরবাড়ির কেউ আমার সঙ্গে কথা বলে না। তারা একসঙ্গে খেতে বসে। সেখানে আমার যাওয়া নিষেধ। সবার খাওয়াদাওয়া শেষ হলে লতিফা থালায় করে আমার জন্য ভাত নিয়ে আসে। সেই ভাত আমার গলা দিয়ে নামতে চায় না।

লতিফা রোজ বলে, 'চল, অন্য কোথাও যাই গিয়া।'

আমি চুপ করে থাকি। কই যাব বলেন? আমার কি যাওয়ার জায়গা আছে? যাওয়ার কোনো জায়গা নাই। লতিফা খুব কান্নাকাটি করে।

একদিন খুব অপমানের মধ্যে পড়লাম। আমার শ্বশুরসাহেবের পাঞ্জাবির পকেট

থেকে এক হাজার টাকা চুরি গেছে। তিনি আমারে ডেকে নিয়ে বললেন, 'এই যে দাড়িওয়ালা, তুমি কি আমার টাকা নিছ?'

আমার চোখে পানি এসে গেল। এ কী অপমানের কথা! আমি দরিদ্র। আমার যাওয়ার জায়গা নাই—সবই সত্য, কিন্তু তাই বলে আমি কি চোর? ছিঃছিঃ।

শ্বশুরসাহেব বললেন, 'কথা বল না কেন?'

আমি বললাম, 'আমারে অপমান কইরেন না। যত ছোটই হই, আমি আপনার কন্যার স্বামী।'

শ্বশুরসাহেব বললেন, 'চুপ। চোর আবার ধর্মের কথা বলে!'

লতিফা সেইদিন থেকে খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে দিল। সে বলল–এই বাড়ির ভাত সে মুখে দিবে না।

আমার শাশুড়ি বললেন, 'ঢং করিস না। এই বাড়ির ভাত ছাড়া তুই ভাত পাইবি কই?'

দুই দিন দুই রাত গেল, লতিফা পানি ছাড়া কিছুই মুখে দেয় না। আমারে বলে, 'তুমি আমারে অন্য কোথাও নিয়া চল। দরকার হইলে গাছতলায় নিয়া চল। এই বাড়ির ভাত আমি মুখে দিব না।'

আমি মহা বিপদে পড়লাম।

সারা রাত আল্লাহ্‌রে ডাকলাম। ফজরের নামাজের শেষে আল্লাহ্‌পাকের দরবারে হাত উঠায়ে বললাম—হে মাবুদ। হে পাক পরোয়ারদিগার—তুমি ছাড়া আমি কার কাছে যাব? আমার দুঃখের কথা কারে বলব? কে আছে আমার? তুমি আমারে বিপদ থাইক্যা বাঁচাও।

আল্লাহ্‌পাক আমার প্রার্থনা শুনলেন।

ভোরবেলায় চালের আড়তে গিয়েছি। সিদ্দিকুর রহমান সাহেব আমারে ডেকে বললেন, 'এই যে মৌলানা, আমার একটা উপকার করতে পারবে?'

আমি বললাম, 'জ্বি জনাব, বলেন।'

'ময়মনসিংহ শহরে আমি নতুন বাড়ি করেছি। এখন থেকে ঐ বাড়িতে থাকব। সপ্তাহে–সপ্তাহে এইখানে আসব। নেত্রকোণায় আমার যে–বাড়ি আছে—তুমি কি এই বাড়িতে থাকতে পারবে? নেত্রকোণার বাড়ি আমি বিক্রি করতে চাই না। শুনলাম তুমি বিবাহ করেছ—তুমি এবং তোমার স্ত্রী দু' জন মিলে থাক।'

আমি বললাম, 'জনাব, আমি অবশ্যই থাকব।'

'তা হলে তুমি এক কাজ কর, আজকেই চলে আস। একতলার কয়েকটা ঘর নিয়ে তুমি থাক। দোতলার ঘর তালাবন্ধ থাকুক।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'বাড়িটা শহর থেকে দূরে। তবে ভয়ের কিছু নেই, একজন দারোয়ান আছে। চব্বিশ ঘন্টা থাকবে। দারোয়ানের নাম বলরাম। ভালো লোক।'

'জনাব,আমি আজকেই উঠব।'

সেইদিন বিকালেই সিদ্দিক সাহেবের বাড়িতে গিয়া উঠলাম। বিরাট বাড়ি। বাড়ির নাম 'সরজুবালা হাউস।' হিন্দু বাড়ি ছিল। সিদ্দিক সাহেবের বাবা কিনে নিয়েছিলেন।

আট ইঞ্চি ইটের দেয়ালে বাড়ির চারদিক ঘেরা। দোতলা পাকা দালান। বিরাট বড়

বড় বারান্দা। দেয়ালের ভিতরে নানান জাতের গাছগাছড়া। দিনের বেলায়ও অন্ধকার হয়ে থাকে।

আমি লতিফাকে বললাম, 'বাড়ি পছন্দ হয়েছে লতিফা?'

লতিফা আনন্দে কেঁদে ফেলল। দুই দিন খাওয়াদাওয়া না-করায় লতিফার শরীর নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। চোখ ছোট-ছোট, ঠোঁট কালচে। মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। এই অবস্থাতেই সে রান্নাবান্না করল। অতি সামান্য আয়োজন। ভাত ডাল পেঁপে ভাজা। খেতে অমৃতের মতো লাগল ভাইসাহেব।

খাওয়াদাওয়ার পর দু' জনে হাত ধরাধরি করে বাগানে হাঁটলাম। হাসবেন না ভাইসাব, তখন আমাদের বয়স ছিল অল্প। মন ছিল অন্য রকম। হাঁটতে-হাঁটতে আমার মনে হল, এই দুনিয়াতে আল্লাহ্‌পাক আমার মতো সুখী মানুষ আর তৈরি করেন নাই। আনন্দে বারবার চোখে পানি এসে যাচ্ছিল ভাই সাহেব।

ক্লান্ত হয়ে একসময় একটা লিচুগাছের নিচে আমরা বসলাম। লতিফা বলল, 'আমি যে মিথ্যা কথা বইলা আপনেরে বিবাহ করছি, এই জন্য কি আমার উপর রাগ করছেন?'

আমি বললাম, 'না লতিফা। আমার মতো সুখী মানুষ নাই।'

'যদি সুখী হন তাহলে এই ধাঁধাটা পারেন কি না দেখেন। বলেন দেখি—

কাটলে বাঁচে, না-কাটলে মরে
এমন সুন্দর ফল কোন গাছেতে ধরে?'

'পারলাম না লতিফা'

'ভালোমতো চিন্তা কইরা বলেন। এইটা পারা দরকার। খুব দরকার—

কাটলে বাঁচে, না-কাটলে মরে
এমন সুন্দর ফল কোন গাছেতে ধরে?'

'পারব না লতিফা। আমার বুদ্ধি কম।'

'এইটা হইল সন্তানের নাড়ি-কাটা। সন্তানের জন্মের পর নাড়ি কাটলে সন্তান বাঁচে। না-কাটলে বাঁচে না। আচ্ছা এই ধাঁধাটা আপনেরে কেন জিজ্ঞেস করলাম বলেন তো?'

'তুমি বল। আমার বিচারবুদ্ধি খুবই কম।'

'এইটা আপনেরে বললাম—কারণ আমার সন্তান হবে।'

লতিফা লজ্জায় দুই হাতে মুখ ঢেকে ফেলল। কী যে আনন্দ আমার হল ভাইসাহেব—কী যে আনন্দ!

সেই রাতে লতিফার জ্বর আসল।

বেশ ভালো জ্বর। আমি জ্বরের খবর রাখি না। ঘুমাচ্ছি। লতিফা আমারে ডেকে তুলল। বলল, 'আমার খুব ভয় লাগতেছে, একটু উঠেন তো।'

আমি উঠলাম। ঘর অন্ধকার। কিচ্ছু দেখা যায় না। হারিকেন জ্বালায়ে শুয়েছিলাম। বাতাসে নিভে গেছে। হারিকেন জ্বালালাম।

তাকিয়ে দেখি লতিফার মুখ ভয়ে সাদা হয়ে গেছে। সে ফিসফিস করে বলল, 'ছাদের কার্নিশে কে যেন হাঁটে।'

আমি শোনার চেষ্টা করলাম। কিছু শুনলাম না।

লতিফা বলল, 'আমি স্পষ্ট শুনেছি। একবার না, অনেক বার শুনেছি। জুতা পায়ে দিয়া হাঁটে। জুতার শব্দ হয়। হাঁটার শব্দ হয়।'

'বোধহয় দারোয়ান।'

'না, দারোয়ান না। অন্য কেউ।'

'কি করে বুঝলা অন্য কেউ?'

'বললাম না—জুতার শব্দ! দারোয়ান কি জুতা পরে?'

'তুমি থাক। আমি খোঁজ নিয়া আসি?'

'না না। এইখানে একা থাকলে আমি মরে যাব।'

আমি লতিফার হাত ধরে বসে রইলাম। এই প্রথম বুঝলাম লতিফার খুব জ্বর। জ্বর আরো বাড়ল। একসময় জ্বর নিয়ে ঘুমায়ে পড়ল। তখন আমি নিজেই শব্দটা শুনলাম। ঝনঝন শব্দ। জুতার শব্দ না। অন্য রকম শব্দ। ঝন—ঝনঝনঝন।

একমনে আয়াতুল কুরসি পড়লাম।

তিন বার আয়াতুল কুরসি পড়ে হাততালি দিলে–সেই হাততালির শব্দ যতদূর যায় ততদূর কোনো জিন–ভূত আসে না। হাততালি দেয়ার পর ঝনঝন শব্দ কমে গেল, তবে পুরোপুরি গেল না। আমি সারা রাত জেগে কাটালাম।

ভোরবেলা সব স্বাভাবিক।

রাতে যে এত ভয় পেয়েছিলাম মনেই রইল না। লতিফার গায়েও জ্বর নেই। সে ঘর–দুয়ার গোছাতে শুরু করল। একতলার সর্বদক্ষিণের দুটো ঘর আমরা নিয়েছি। বারান্দা আছে। কাছেই কলঘর। লতিফা নিজের সংসার ঠিকঠাক করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। দারোয়ান বলরাম সাহায্য করার জন্য চলে আসল। বলরামের বয়স প্রায় সত্তরের কাছাকাছি। আদি বাড়ি নেপালে। দশ বছর বয়সে বাংলাদেশে এসেছে, আর ফিরে যায় নি। এখন পুরোপুরি বাঙালি। বাঙালি একটি মেয়েকে বিয়ে করেছিল। সে মেয়ে মরে গেছে। বলরামের এক ছেলে আছে। খুলনার এক ব্যাঙ্কের দারোয়ান। ছেলে বিয়ে–শাদি করেছে। বাবার কোনো খোঁজখবর করে না।

বলরামের সঙ্গে অতি অল্প সময়ে লতিফার ভাব। বলরাম লতিফাকে 'মা' ডাকা শুরু করল। আমি নিশ্চিন্ত হয়ে দোকানে চলে গেলাম। ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল।

বাড়িতে ঢুকে দেখি বারান্দায় পা ছড়িয়ে লতিফা বসে আছে। তার মুখ শুকনা। আমি বললাম, 'কী হয়েছে?'

'ভয় লাগছে।'

'কিসের ভয়?'

'বিকেলে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। একটা খুব খারাপ স্বপ্ন দেখেছি।'

'কী স্বপ্ন?'

'দেখলাম আমি ঘুমাচ্ছি। একটা লম্বা, কালো এবং খুব মোটা লোক ঘরে ঢুকল। লোকটার সারা শরীরে বড়–বড় লোম। কোনো দাঁত নেই। চোখগুলা অসম্ভব ছোট–ছোট। দেখাই যায় না—এ–রকম। হাতের থাবাগুলিও খুব ছোট। বাচ্চা ছেলেদের মতো। আমি লোকটাকে দেখে ভয়ে চিৎকার করে উঠলাম। সে বলল, এই, ভয় পাস কেন? আমার নাম কফিল। আমি তো তোর সাথেই থাকি। তুই টের পাস না? তুই বিয়ে করেছিস, আমি কিছু বলি নাই। এখন আবার সন্তান হবে। ভালোমতো শুনে রাখ—

তোর সন্তানটারে আমি শেষ করে দিব। এখনি শেষ করতাম। এখন শেষ করলে তোর ক্ষতি হবে। এইজন্য কিছু করছি না। সন্তান জন্মের সাত দিনের ভিতর আমি তারে শেষ করব। এই বলেই সে আমারে ধরতে আসল। আমি চিৎকার করে জেগে উঠলাম। তারপর থেকে এইখানে বসে আছি।'

আমি বললাম, 'স্বপ্ন হল স্বপ্ন। কত খারাপ-খারাপ স্বপ্ন মানুষ দেখে। সবচেয়ে বেশি খারাপ স্বপ্ন দেখে পোয়াতি মেয়েছেলে। তাদের মনে থাকে মৃত্যুভয়।'

কথাবার্তা বলে লতিফাকে মোটামুটি স্বাভাবিক করে তুললাম। সে ঘরের কাজকর্ম করতে লাগল। রান্না করল। আমরা সকাল-সকাল খাওয়াদাওয়া করলাম। তারপর বাগানে হাঁটতে বের হলাম। লতিফা বলল, 'এই বাড়িতে একটা দোষ আছে, সেইটা কি আপনি জানেন?'

'কী দোষ?'

'এই বাড়িতে একটা খারাপ কুয়া আছে। সিদ্দিক সাহেবের চার বছর বয়সের একটা ছোট্ট মেয়ে কুয়ায় পড়ে মারা গিয়েছিল। কুয়াটা দোষী।'

'কী যে তুমি বল! কুয়া দোষী হবে কেন? বাচ্চা মেয়ে খেলতে-খেলতে পড়ে গেছে।'

'তা না, কুয়াটা আসলেই দোষী।'

'কে বলেছে?'

'বলরাম বলেছে। কুয়াটার মুখ সিদ্দিক সাহেব টিন দিয়ে ঢেকে দিয়েছেন। সেই টিনে রাতের বেলা ঝনঝন শব্দ হয়। মনে হয় ছোট কোনো বাচ্চা টিনের উপরে লাফায়। তুমি গত রাতে কোনো ঝনঝন শব্দ শোন নাই?'

আমি মিথ্যা করে বললাম, 'না।'

'আমি কিন্তু শুনেছি।'

আমি বলরামের উপর খুব বিরক্ত হলাম। এইসব গল্প বলে ভয় দেখানোর কোনো মানে হয়? ঠিক করলাম, ভোরবেলায় তাকে ডেকে শক্তভাবে ধমক দিয়ে দেব।

রাতে ঘুমুতে যাবার সময়ে লক্ষ করলাম, লতিফার জ্বর এসেছে। সে কেমন ঝিম মেরে গেছে। মনটা খারাপ হয়ে গেল। হারিকেন জ্বালিয়ে রেখে ঘুমুতে গেলাম। গভীর রাতে ঘুম ভাঙল। লতিফা আমাকে ঝাঁকাচ্ছে। ঘর অন্ধকার। লতিফা বলল, 'হারিকেন আপনা-আপনি নিভে গেছে। আমার বড়ো ভয় লাগতেছে।'

আমি হারিকেন জ্বালালাম, আর তখনি ঝনঝন শব্দ পেলাম। একবার না, বেশ কয়েক বার।

লতিফা ফিসফিস করে বলল, 'শব্দ শুনলেন?'

আমি জবাব দিলাম না। লতিফা কাঁদতে লাগল।

যতই দিন যেতে লাগল লতিফার অবস্থা ততই খারাপ হতে লাগল। রোজ সে কফিলকে স্বপ্ন দেখে। কফিল তাকে শাসিয়ে যায়। বারবার মনে করিয়ে দেয়—বাচ্চা হওয়ার সাত দিনের মধ্যে সে বাচ্চা নিয়ে নিবে। মনের শান্তি পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেল।

আমি লতিফাকে তার বাবার বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইলাম, সে রাজি হল না। প্রয়োজনে সে এইখানেই মরবে, কিন্তু বাবার বাড়িতে যাবে না। আমি তার জন্য তাবিজ-কবচের ব্যবস্থা করলাম, বাড়ি-বন্ধনের ব্যবস্থা করলাম। আমি দরিদ্র মানুষ, তবু

একটা কাজের মেয়ের ব্যবস্থা করলাম, যেন সে সারাক্ষণ লতিফার সঙ্গে থাকে।

কিছুতেই কিছু হল না।

এক সন্ধ্যাবেলায় বাসায় ফিরে দেখি—লতিফা খুব সাজগোজ করেছে। লাল একটা শাড়ি পরেছে। পান খেয়ে ঠোঁট লাল করেছে। বেণী করে চুল বেঁধেছে। বেণীতে চার-পাঁচটা জবা ফুল। সে পা ছড়িয়ে মেঝেতে বসে আছে। একটু দূরে বলরাম এবং কাজের মেয়েটা। তারা দু' জন ভীত চোখে তাকিয়ে আছে লতিফার দিকে।

আমাকে দেখেই লতিফা খিলখিল করে হেসে উঠল। হাসি আর থামতেই চায় না। আমি বললাম, 'কী হয়েছে লতিফা?' লতিফা হাসি থামাল এবং আমাকে হতভম্ব করে দিয়ে পুরুষের গলায় বলল, 'মৌলানা আসছে। মৌলানারে অজুর পানি দেও। নামাজের পাটি দেও। কেবলা কোন দিকে দেখাইয়া দেও। টুপি দেও, তসবি দেও।'

আমি বললাম, 'এই রকম করতেছ কেন লতিফা?'

লতিফা আবার হাসতে-হাসতে ভেঙে পড়ে বলল, 'ওমা, মেয়েছেলের সঙ্গে দেখি মৌলানা কথা বলে! ছিঃ ছিঃ ছিঃ! মৌলানার লজ্জা নাই।'

আমি আয়তুল কুরসি পড়া শুরু করলাম।

আমাকে থামিয়ে দিয়ে লতিফা চিৎকার করে বলল, 'চুপ কর। আমার নাম কফিল। তোর মতো মৌলানা আমি দশটা হজম কইরা রাখছি। গোটা কোরান শরিফ আমার মুখস্থ। আমার সঙ্গে পাল্লা দিবি? আয়, পাল্লা দিলে আয়। প্রথম থাইকা শুরু করি... হি-হি-হি। ভয় পাইছস? ভয় পাওনেরই কথা। বেশি ভয় পাওনের দরকার নাই। তোরে আমি কিছু বলব না। তোর বাচ্চাটারে শেষ করব। তুই মৌলানা মানুষ, তুই বাচ্চা দিয়া কী করবি? তুই থাকবি মসজিদে। মসজিদে বইস্যা তুই তোর আল্লাহ্‌রে ডাকবি। পুলাপান না-থাকাই তোর জন্য ভালা। হি-হি-হি—।'

একটা ভয়ংকর রাত পার করলাম ভাইসাব। সকালে দেখি সব ঠিকঠাক। লতিফা ঘরের কাজকর্ম করছে। এইভাবে দিন পার করতে লাগলাম। কখনো ভালো কখনো মন্দ।

লতিফা যখন আট মাসের পোয়াতি, তখন আমি হাতে-পায়ে ধরে আমার শাশুড়িকে এই বাড়িতে নিয়া আসলাম। লতিফা খানিকটা শান্ত হল। তবে আগের মতো সহজ-স্বাভাবিক হল না। চমকে-চমকে ওঠে। রাতে ঘুমাতে পারে না। ছটফট করে। মাঝে-মাঝে ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন দেখে। সেই দুঃস্বপ্নে কফিল এসে উপস্থিত হয়। কফিল চাপা গলায় বলে, 'দেরি নাই—আর দেরি নাই। পুত্রসন্তান আসতেছে। সাত দিনের মধ্যে নিয়ে যাব। কান্দাকাটি যা করার কইরা নেও।' ঘুম ভেঙে লতিফা জেগে ওঠে। চিৎকার করে কাঁদে। আমি চোখে দেখি অন্ধকার। কী করব কিছুই বুঝি না।

শ্রাবণ মাসের তিন তারিখে লতিফার একটা পুত্রসন্তান হল। কী সুন্দর যে ছেলেটা হল ভাইসাহেব, না-দেখলে বিশ্বাস করবেন না। চাঁপা ফুলের মতো গায়ের রঙ। টানা-টানা চোখ। আমি এক শ' রাকাত শোকরানা নামাজ পড়ে আল্লাহ্‌র কাছে আমার সন্তানের হায়াত চাইলাম। আমার মনের অস্থিরতা কমল না।

আঁতুড়ঘরের বাইরে একটা বেঞ্চ পেতে রাতে শুয়ে থাকি। আমার স্ত্রীর সঙ্গে থাকেন আমার শাশুড়ি আর আমার স্ত্রীর দূর সম্পর্কের এক খালাতো বোন। পালা করে কেউ-না-কেউ সারা রাত জেগে থাকি।

লতিফার চোখে এক ফোঁটাও ঘুম নাই। সন্তানের মা। সারাক্ষণ বাচ্চা বুকের নিচে আড়াল করে রাখে। এক মুহূর্তের জন্য চোখের আড়াল করে না। আমার শাশুড়ি যখন বাচ্চা কোলে নেন তখনো লতিফা বাচ্চাটার গায়ে হাত দিয়ে রাখে, যেন কেউ নিয়ে যেতে না পারে।

ছয় দিনের দিন কি হল শুনেন।

ঘোর বর্ষা। সারা দিন বৃষ্টি হয়েছে। সন্ধ্যার পর আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল। এ-রকম বর্ষা আমি আমার জীবনে দেখি নাই।

লতিফা আমাকে বললো, 'আইজ রাইতটা আপনে জাগনা থাকবেন। আমার কেমন জানি লাগতেছে।'

আমি বললাম, 'কেমন লাগতেছে?'

'জানি না। একটু পরে-পরে শরীর কাঁপতেছে।'

'তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া থাক। আমি সারা রাইত জাগনা থাকব।'

'আপনে একটু বলরামরেও খবর দেন। সেও যেন জাগনা থাকে।'

আমি বলরামকে খবর দিলাম। লতিফা বাচ্চাটারে বুকের নিচে নিয়া শুইয়া আছে। আমি একমনে আল্লাহ্‌পাকেরে ডাকতেছি। জীবন দেওয়ার মালিক তিনি। জীবন নেওয়ার মালিকও তিনি।

রাত তখন কত আমি জানি না ভাইসাহেব। ঘুমায়ে পড়েছিলাম। লতিফার চিৎকারে ঘুম ভাঙল। সে আসমান ফাটাইয়া চিৎকার করতেছে। আমার বাচ্চা কই গেল—আমার বাচ্চা কই! দুইটা হারিকেন জ্বালানো ছিল, দুইটাই নিভানো। পুরা বাড়ি অন্ধকার। কাঁপতে-কাঁপতে হারিকেন জ্বালালাম। দেখি সত্যি বাচ্চা নাই। আমার শাশুড়ি ফিট হয়ে পড়ে গেলেন।

লতিফা ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে দৌড়ায়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। ছুটে গেল কুয়ার দিকে।

কুয়ার উপর টিন দিয়া ঢাকা ছিল। তাকায়ে দেখি টিন সরানো। লতিফা চিৎকার করে বলছে—'আমার বাচ্চারে কুয়ার ভিতর ফালাইয়া দিছে। আমার বাচ্চা কুয়ার ভিতরে।' লতিফা লাফ দিয়া কুয়াতে নামতে চাইল। আমি তাকে জড়ায়ে ধরলাম।

ইমাম সাহের চুপ করে গেলেন। কপালের ঘাম মুছলেন।

আমি বললাম, 'বাচ্চাটা কি সত্যি কুয়াতে ছিল?'

'জ্বি।'

'আর দ্বিতীয় বাচ্চা? সে-ও কি এইভাবে মারা যায়?'

'জ্বি-না জনাব। আমার দ্বিতীয় বাচ্চা শ্বশুরবাড়িতে জন্মগ্রহণ করে।'

'সিদ্দিক সাহেবের ঐ বাড়ি তাহলে আপনি ছেড়ে দেন?'

'জ্বি। তাতে অবশ্য লাভ হয় না। কফিলের যন্ত্রণা কমে না। দ্বিতীয় সন্তানটাকেও সে মারে। জন্মের চারদিনের দিন—'

আমি আঁৎকে উঠে বললাম, 'থাক ভাই, আমি শুনতে চাই না। গল্পগুলো আমি সহ্য করতে পারছি না।'

ইমাম সাহেব বললেন, 'আল্লাহ্‌পাক আরেকটা সন্তান দিতেছেন। কিন্তু এই সন্তানটাকেও বাঁচাতে পারব না। মনটা বড়ই খারাপ ভাই সাহেব। বড়ই খারাপ। আমি

কত বার চিৎকার করে বলেছি—কফিল, তুমি আমারে মেরে ফেল। আমার সন্তানরে মের না। এই সুন্দর দুনিয়া তারে দেখতে দাও।

ইমাম সাহেব কাঁদতে লাগলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ভোর হল। ইমাম সাহেব ফজরের নামাজের প্রস্তুতি নিতে লাগলেন।

সেইদিন ভোরেই আমি সফিককে নিয়ে ঢাকায় চলে এলাম। সফিকের আরো কিছুদিন থেকে কালু খাঁর রহস্য ভেদ করে আসার ইচ্ছা ছিল। আমি তা হতে দিলাম না। ইমাম সাহেবের সঙ্গে আরো কিছু সময় থাকা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

৩

সাধারণত আমি আমার জীবনের ভয়ংকর অভিজ্ঞতার গল্প মিসির আলির সঙ্গে দেখা হওয়ামাত্র বলি। মজার ব্যাপার হচ্ছে—ইমাম সাহেরের এই গল্প তাঁকে বলা হল না।

ঢাকায় ফেরার তিন দিনের মাথায় তাঁর সঙ্গে আমার দেখা। নানান কথাবার্তা হল—এটা বাদ পড়ে গেল।

দু' মাস পর মিসির আলি আমার বাসায় এলেন। রাতে একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করলাম। তিনি প্রায় দু' ঘন্টা কাটিয়ে বাড়ি চলে গেলেন—ইমাম সাহেবের গল্প বলা হল না। তিনি চলে যাবার পর মনে হল—ইমাম সাহেবের গল্পটা তো তাঁকে শোনানো হল না।

আমি আমার মেয়েকে বলে রাখলাম যে এর পরে যদি কখনো মিসির আলি সাহেব আমাদের বাসায় আসেন, সে যেন আমার কানের কাছে 'ইমাম' বলে একটা চিৎকার দেয়। আমার এই মেয়ের স্মৃতিশক্তি বেশ ভালো। সে যে যথাসময়ে 'ইমাম' বলে চিৎকার দেবে, সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

হলও তাই। অনেকদিন পর মিসির আলি সাহেব এসেছেন। তাঁর সঙ্গে গল্প করছি—আমার মেয়ে কানের কাছে এসে বিকট চিৎকার দিল। এমন চিৎকার যে মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। মেয়েকে কড়া ধমক দিলাম। মেয়ে কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল, 'তুমি তো বলেছিলে মিসির চাচু এলে—''ইমাম'' বলে চিৎকার করতে।'

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, 'কানের পর্দা ফাটিয়ে দিতে তো বলি নি। যাও, এখন যাও তো!'

মিসির আলি বললেন, 'ব্যাপারটা কী?'

আমি বললাম, 'তেমন কিছু না। আপনাকে একটা অভিজ্ঞতার কথা বলতে চাচ্ছিলাম। একজন ইমাম সাহেবের গল্প। আপনার সঙ্গে দেখা হয় কিন্তু গল্পটা বলার কথা মনে থাকে না। মেয়েকে মনে করিয়ে দিতে বলেছি। সে এমন চিৎকার দিয়েছে, এখন মনে হচ্ছে বাঁ কানে কিছু শুনতে পাচ্ছি না।'

মিসির আলি বললেন, 'গল্পটা কী বলুন শুনি।'

'আজ থাক। আরেক দিন বলব। একটু সময় লাগবে। লম্বা গল্প।'

মিসির আলি বললেন, 'আরেক কাপ চা দিতে বলুন। চা খেয়ে বিদেয় হই।'

চায়ের কথা বলে মিসির আলির সামনে এসে বসলাম। মিসির আলি সিগারেট ধরাতে–ধরাতে বললেন, 'ইমাম সাহেবের গল্পটা আপনি আমাকে কখনই বলতে পারবেন না।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কেন?'

'আপনার মস্তিষ্কের একটা অংশ আপনাকে গল্পটা বলতে বাধা দিচ্ছে, যে–কারণে অনেক দিন থেকেই আপনি আমাকে গল্পটা বলতে চান অথচ বলা হয় না। আপনার মনে থাকে না। আজ আপনাকে মনে করিয়ে দেয়া হল, এবং মনেও করিয়ে দেওয়ার জন্য আপনি রেগে গেলেন। তার চেয়ে বড় কথা মনে করিয়ে দেবার পরেও আপনি গল্পটি বলতে চাচ্ছেন না। অজুহাত বের করেছেন—বলছেন, লম্বা গল্প। আমি নিশ্চিত, আপনার অবচেতন মন চাচ্ছে না এই গল্প আপনি আমাকে বলেন। আপনার সাবকনশ্যাস মাইন্ড আপনাকে বাধা দিচ্ছে।'

'আমার সাবকনশ্যাস মাইন্ড আমাকে বাধা দিচ্ছে কেন?'

'আমি তা বুঝতে পারছি না। গল্পটা শুনলে বুঝতে পারব। চা আসুক। চা খেতে–খেতে আপনি বলা শুরু করুন। আমার সিগারেটও ফুরিয়েছে। কাউকে দিয়ে কয়েকটা সিগারেট আনিয়ে দিন।'

আমি আর কোনো অজুহাতে গেলাম না। গল্প শেষ করলাম। গল্প শেষ হওয়ামাত্র মিসির আলি বললেন, 'আবার বলুন।'

'আবার কেন?'

'মানুষ যখন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার গল্প বলে তখন মূল গল্পটি দ্রুত বলার দিকে ঝোঁক থাকে বেশি। গল্পের ডিটেইলস–এ যেতে চায় না। একই গল্প দ্বিতীয় বার বলার সময় বর্ণনা বেশি থাকে। কারণ মূল কাহিনী বলা হয়ে গেছে। কথক তখন না–বলা অংশ বলতে চেষ্টা করেন। আপনিও তাই করবেন। প্রথম বার শুনে কয়েকটা জিনিস বুঝতে পারি নি। দ্বিতীয় বারে বুঝতে পারব। শুরু করুন।'

আমি শুরু করলাম, বেশ সময় নিয়ে বললাম।

মিসির আলি বললেন, 'কবে গিয়েছিলেন ধুন্দুল নাড়া? তারিখ মনে আছে?'

'আছে।'

আমি মিসির আলিকে তারিখ বললাম। তিনি শান্ত গলায় বললেন, 'আপনার তারিখ অনুযায়ী মেয়েটির বাচ্চা এখন হবে কিংবা হয়ে গেছে। আপনি বলছেন দশ মাস আগের কথা। মেয়েটির বাচ্চা হয়ে গিয়ে থাকলে তাকে যে হত্যা করা হয়েছে সেই সম্ভাবনা নিরানব্বই ভাগেরও বেশি। আর যদি এখনো হয়ে না থাকে তাহলে বাচ্চাটাকে বাঁচানো যেতে পারে। এখন ক'টা বাজে দেখুন তো।'

আমি ঘড়ি দেখলাম, 'ন'টা বাজে।'

মিসির আলি বললেন, 'রাত সাড়ে দশটায় ময়মনসিংহে যাওয়ার একটা ট্রেন আছে। চলুন রওনা হই।'

'সত্যি যেতে চান?'

'অবশ্যই যেতে চাই। আপনার অসুবিধা থাকলে কীভাবে যেতে হবে আমাকে বলে দিন। আমি ঘুরে আসি।'

'আমার অসুবিধা আছে। তবু যাব। এখন বলুন তো জিন কফিলের ব্যাপারটা

আপনি বিশ্বাস করছেন?'

'না।'

'আপনার ধারণা বাচ্চাগুলোকে খুন করা হয়েছে?'

'তা তো বটেই।'

'কে খুন করেছে?'

মিসির আলি সিগারেট ধরাতে-ধরাতে বললেন, 'কে খুন করেছে তা আপনিও জানেন। আপনার সাবকনশ্যাস মাইন্ড জানে। জানে বলেই সাবকনশ্যাস মাইন্ড গল্পটি বলতে আপনাকে বাধা দিচ্ছিল।'

'আমি কিছুই জানি না।'

মিসির আলি হাসতে-হাসতে বললেন, 'আপনার সাবকনশ্যাস মাইন্ড জানে, কিন্তু সে এটি আপনার কনশ্যাস মাইন্ডকে জানায় নি বলেই আপনার মনে হচ্ছে আপনি জানেন না।'

আমি বললাম, 'কে খুন করেছে?'

'লতিফা। দু'টি বাচ্চাই সে মেরেছে। তৃতীয়টিও মারবে।'

'কী বলছেন এ-সব!'

'চলুন, রওনা হয়ে যাই। দেরি হয়ে যাচ্ছে। ট্রেনে যেতে-যেতে ব্যাখ্যা করব।'

মিসির আলি বললেন, 'লতিফা যে পুরো ঘটনাটা ঘটাচ্ছে তা পরিষ্কার হয়ে যায় শুরুতেই, যখন ইমাম সাহেব আপনাকে বলেন কীভাবে জিন কফিল তাঁকে আগুনে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করেছিল।............

পুরোনো ধরনের মসজিদ—একটামাত্র দরজা। এই ধরনের মসজিদে বসে থাকলে বাইরের চিৎকার শোনা যাবে না, ভেতর থেকে চিৎকার করলেও বাইরের কেউ শুনবে না। কারণ সাউন্ড ওয়েভ চলার জন্যে মাধ্যম লাগে। মসজিদের দেয়াল সেখানে বাধার মতো কাজ করছে।..........

আপনি এবং ইমাম সাহেব মসজিদে ছিলেন। ইমাম সাহেব একসময় স্ত্রীর খোঁজ নিতে গেলেন এবং ফিরে এসে বললেন-লতিফা খুব চিৎকার করছে। তাই না?'

'জ্বি, তাই?'

'মসজিদের ভেতরে বসে সেই চিৎকার আপনি শুনতে পান নি। তাই না?'

'জ্বি।'

'অথচ ইমাম সাহেব যখন আগুন দেখে ভয়ে চেঁচালেন, বাঁচাও বাঁচাও—তখন লতিফা পানির বালতি নিয়ে ছুটে এল। প্রথমত ইমাম সাহেবের চিৎকার লতিফার শোনার কথা নয়। দ্বিতীয়ত শুনে থাকলেও লতিফা কী করে বুঝল আগুন লেগেছে? সে পানির বালতি নিয়ে ছুটে এল কেন? আগুন-আগুন বলে চিৎকার করলেও আমরা চিৎকার শুনে প্রথমে খালি হাতে ছুটে আসি, তারপর পানির বালতি আনি। এটাই স্বাভাবিক। এই মেয়েটি শুরুতেই পানির বালতি নিয়ে ছুটে এসেছে। কারণ পানির বালতি হাতের কাছে রেখেই সে আগুন ধরিয়েছে। আমার এই যুক্তি কি আপনার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে?'

'হচ্ছে।'

'প্রথম শিশুটি মারা গেল। শিশুটিকে ফেলা হল কুয়ায়। এই খবর মেয়েটি জানে, কারণ সে পাগলের মতো ছুটে গেছে কুয়ার দিকে—অন্য কোথাও নয়। তার বাচ্চাটিকে কুয়াতে ফেলা হয়েছে, এটা সে জানল কীভাবে? জানল, কারণ সে নিজেই ফেলেছে। এই যুক্তি কি আপনার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ, হচ্ছে?'

'আপনাকে কি আরো যুক্তি দিতে হবে? আমার কাছে আরো ছোটখাটো যুক্তি আছে।'

'আর লাগবে না। শুধু বলুন—কুয়ার ওপরের টিনে ঝনঝন শব্দ হত কেন? যে-শব্দ ইমাম সাহেব নিজেও শুনেছেন?'

'কুয়ার টিনটা না-দেখে বলতে পারব না। আমার ধারণা বাতাসে টিনটা কাঁপে, ঝনঝন শব্দ হয়। দিনের বেলায় এই শব্দ শোনা যায় না, কারণ আশেপাশে অনেক ধরনের শব্দ হতে থাকে। রাত যতই গভীর হয় চারপাশ নীরব হতে থাকে। সামান্য শব্দই বড় হয়ে কানে আসে।'

'আপনার এই যুক্তিও গ্রহণ করলাম, এখন বলুন, লতিফা এমন ভয়ংকর কাণ্ড কেন করছে?'

'মেয়েটা অসুস্থ। মনোবিকার ঘটেছে। ইমাম সাহেব লোকটি তাদের আশ্রিত। তাদের পরিবারে চাকরবাকররা যে-কাজ করে, সে তাই করত। মেয়েটি ভাগ্যের পরিহাসে এমন একজন মানুষের প্রেমে পড়ে যায়। প্রচণ্ড মানসিক চাপের সম্মুখীন হয়। পরিবারের সবার কাছে ছোট হয়, অপমানিত হয়। এত প্রচণ্ড চাপ সহ্য করার ক্ষমতা তার ছিল না। তার মনোবিকার ঘটে। পোয়াতি অবস্থায় মেয়েদের হরমোনাল ব্যালান্স এদিক-ওদিক হয়। সেই সময় মনোবিকার তীব্র হয়। মেয়েটির ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। মেয়েটি দরিদ্র ইমামকে বিয়ে করে কঠিন মানসিক চাপের সম্মুখীন হয়েছে। একই সঙ্গে সে লোকটিকে প্রচণ্ড ভালবাসে, আবার প্রচণ্ড ঘৃণাও করে। কী ভয়াবহ অবস্থা!'

'মেয়েটি ইমামকে প্রচণ্ড ঘৃণা করে, এটা কেন বলছেন?'

'ইমামতি পেশা মেয়েটির পছন্দ নয়। পছন্দ নয় বলেই মেয়েটি কফিলের গলায় বলেছে—ইমাম আসছে। অজুর পানি দে, জায়নামাজ দে, কেবলা কোন দিকে বলে দে। একধরনের রসিকতা করার চেষ্টা করছে।'

'মনোবিকার এমন ভয়াবহ রূপ নিল কেন? সে নিজের বাচ্চাকে হত্যা করছে কেন?'

'বড়ো ধরনের বিকারে এ-রকম হয়। সে নিজেকে ধ্বংস করতে চাইছে। নিজের সন্তানহত্যার মাধ্যমে সেই ইচ্ছারই অংশবিশেষ পূর্ণ হচ্ছে। আরো কিছু থাকতে পারে। না-দেখে বলতে পারব না।'

৪

ধুন্দুল নাড়া গ্রামে সন্ধ্যার পর পৌঁছলাম। পৌঁছেই খবর পেলাম পাঁচ দিন হয় ইমাম সাহেবের একটি কন্যা হয়েছে। কন্যাটি ভালো আছে। বড় ধরনের স্বস্তি বোধ করলাম।

ইমাম সাহেবের সঙ্গে দেখা করলাম মসজিদে। তিনি আমাদের দেখে বড়ই অবাক হলেন। আমি বললাম, 'আপনার স্ত্রী কেমন আছেন?'

ইমাম সাহেব বিব্রত গলায় বললেন, 'ভালো না। খুব খারাপ। কফিল তার সঙ্গে-সঙ্গে আছে। কফিল বলেছে, সাতদিনের মাথায় মেয়েটিকে মেরে ফেলবে। খুব কষ্টে আছি ভাইসাহেব। আল্লাহ্পাকের কাছে আমার জন্য খাস দিলে একটু দোয়া করবেন।'

আমি বললাম, 'আমি আমার এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি। উনি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে কিছু কথা বলবেন।'

ইমাম সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, 'কেন?'

'যাতে আপনার বাচ্চাটা ভালো থাকে, সুস্থ থাকে। উনি খুব বড় একজন সাইকিয়াট্রিস্ট। অনেক কিছু বুঝতে পারেন, যা আমরা বুঝতে পারি না। ওনার কথা শুনলে আপনাদের মঙ্গল হবে। এই জন্যেই ওনাকে এনেছি।'

'অবশ্যই আমি ওনার কথা শুনব। অবশ্যই শুনব।'

ইমাম সাহেব আমাদের ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরে অনেক লোকজন ছিল, তাদের সরিয়ে দেওয়া হল।

মিসির আলি বললেন, 'আমি কিছু কথা বলব যা শুনতে ভালো লাগবে না, তবু দয়া করে শুনুন।'

লতিফা চাপা গলায় বলল, 'আমার সাথে কী কথা?'

'আপনার বাচ্চাটির বিষয়ে কথা। বাচ্চাটি যাতে বেঁচে থাকে, ভালো থাকে, সেজন্যেই আমার কথাগুলি আপনাকে শুনতে হবে।'

লতিফা তার স্বামীর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, 'বলেন, কী বলবেন।'

মিসির আলি খুবই নিরাসক্ত গলায় কথা বলতে শুরু করলেন। কথা বলার সময় একবারও লতিফার দিকে তাকালেন না। লতিফা তার শিশুকে বুকের কাছে নিয়ে খাটে হেলান দিয়ে বসে আছে। তার মাথায় লম্বা ঘোমটা। ঘোমটার ফাঁক দিয়ে মাঝে-মাঝে তার তীব্র চোখের দৃষ্টি নজরে আসছে। ইমাম সাহেব তাঁর স্ত্রীর পাশে বসে আছেন। মিসির আলির ব্যাখ্যা যতই শুনছেন ততই তাঁর চেহারা অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে।

মিসির আলি কথা শেষ করে লতিফার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি কি আমার ব্যাখ্যা বিশ্বাস করলেন?'

লতিফা জবাব দিল না। মাথার ঘোমটা সরিয়ে দিল। কী সুন্দর শান্ত মুখ! চোখের তীব্রতা এখন আর নেই। মনে হচ্ছে অশ্রু টলমল করছে।

মিসির আলি কঠিন গলায় বললেন, 'আমার ব্যাখ্যা আপনি বিশ্বাস না-করলেও শিশুটির দিকে তাকিয়ে তার মঙ্গলের জন্যে শিশুটিকে আপনি অন্যের কাছে দিন। সে যেন কিছুতেই আপনার সঙ্গে না থাকে। আমার যা বলবার বললাম, বাকিটা আপনাদের ব্যাপার। আচ্ছা, আজ তাহলে যাই। আমরা রাতেই রওনা হব। নৌকা ঠিক করা আছে।'

আমরা বাইরে এসে দাঁড়ালাম। আমি বললাম, 'মিসির আলি সাহেব, আপনার কি মনে হয় মেয়েটি আপনার কথা বিশ্বাস করেছে?'

মিসির আলি সিগারেট ধরাতে-ধরাতে বললেন, 'হ্যাঁ, করেছে। এবং বিশ্বাস করার কারণেই তার দ্রুত রোগমুক্তি ঘটবে। আমার ধারণা, মেয়েটি নিজেও খানিকটা হলেও

এই সন্দেহই করছিল। মেয়েটি অসম্ভব বুদ্ধিমতী। চলুন, রওনা দেওয়া যাক। এই গ্রামে রাত কাটাতে চাই না।'

আমি বললাম, 'ইমাম সাহেবের সঙ্গে কথা বলে যাবেন না?'

'না। আমার কাজ শেষ, বাকিটা ওরা দেখবে।'

রওনা হবার আগে ইমাম সাহেব ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। শিশুটি তাঁর কোলে। তিনি বললেন, 'লতিফা মেয়েটাকে দিয়ে দিয়েছে। সে খুব কাঁদতেছে। আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়। মেহেরবানি করে একটু আসেন।'

আমরা আবার ঢুকলাম। বিস্মিত হয়ে দেখলাম, লতিফা ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে। মিসির আলি কোমল গলায় বললেন, 'আপনি কি কিছু বলবেন?'

লতিফা কাঁদতে-কাঁদতে বলল, 'আল্লাহ্ আপনার ভালো করবে। আল্লাহ্ আপনার ভালো করবে।'

'আপনি কোনো রকম চিন্তা করবেন না। আপনার অসুখ সেরে গেছে। আর কোনো দিন হবে না।'

লতিফা তার স্বামীর কানে-কানে কী যেন বলল।

ইমাম সাহেব বিব্রত গলায় বললেন, 'জনাব, কিছু মনে করবেন না। লতিফা আপনারে একটু ছুঁইয়া দেখতে চায়।'

মিসির আলি হাত বাড়িয়ে দিলেন। লতিফা দু' হাতে সেই হাত জড়িয়ে ধরে শিশুর মতো চিৎকার করে কাঁদতে লাগল।

নৌকায় উঠছি।

ইমাম সাহেব আমাদের তুলে দিতে এলেন। নৌকা ছাড়ার আগ-মুহূর্তে নিচু গলায় বললেন, 'ভাইসাহেব, আমি অতি দরিদ্র মানুষ, আপনাদের যে কিছু দিব আল্লাহ্পাক আমাকে সেই ক্ষমতা দেন নাই। এই কোরান শরিফটা আমার দীর্ঘ দিনের সঙ্গী। যখন মন খুব খারাপ হয় তখন পড়ি—মন শান্ত করি। আমি খুব খুশি হব যদি কোরান মজিদটা আপনি নেন। আপনি নিবেন কি না তা অবশ্য জানি না।'

মিসির আলি বললেন, 'অবশ্যই নেব। খুব আনন্দের সঙ্গে নেব।'

'ভাইসাহেব, আমার মেয়েটার একটা নাম কি আপনি রাইখা যাইবেন?'

মিসির আলি হাসিমুখে বললেন, 'হ্যাঁ, যাব। আপনার মেয়ের নাম রাখলাম লাবণ্য। ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় এই নামের একটা মেয়ের প্রেমে পড়েছিলাম। মেয়েটা আমাকে একেবারেই পাত্তা দেয় নি। মাঝেমাঝেই মেয়েটার কথা আমার মনে হয়। মনটা খারাপ হয়ে যায়। ভাই, যাই।'

সঙ্গিনী

মিসির আলি বললেন, 'গল্প শুনবেন নাকি?'

আমি ঘড়ির দিকে তাকালাম। রাত মন্দ হয় নি। দশটার মতো বাজে। বাসায় ফেরা দরকার। আকাশের অবস্থাও ভালো না। গুড়গুড় করে মেঘ ডাকছে। আষাঢ় মাস। যে-কোনো সময় বৃষ্টি নামতে পারে।

আমি বললাম, ' আজ থাক, আরেক দিন শুনব। রাত অনেক হয়েছে। বাসায় চিন্তা করবে।'

মিসির আলি হেসে ফেললেন।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, 'হাসছেন কেন?'

মিসির আলি হাসতে-হাসতেই বললেন, 'বাসায় কে চিন্তা করবে? আপনার স্ত্রী কি বাসায় আছেন? আমার তো ধারণা তিনি রাগ করে বাচ্চাদের নিয়ে বাবার বাড়িতে চলে গেছেন।'

মিসির আলির পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা এবং সামান্য সূত্র ধরে সিদ্ধান্তে চলে যাবার প্রায় অলৌকিক ক্ষমতার সঙ্গে আমি পরিচিত। তবুও বিস্মিত হলাম। আমার স্ত্রীর সঙ্গে আজ দুপুরেই বড় ধরনের ঝগড়া হয়েছে। সন্ধ্যাবেলায় সে স্যুটকেস গুছিয়ে বাবার বাড়ি চলে গেছে। একা-একা খালি বাড়িতে থাকতে অসহ্য বোধ হচ্ছিল বলে মিসির আলির কাছে এসেছি, তবে এই ঘটনার কিছুই বলি নি। আগ বাড়িয়ে পারিবারিক ঝগড়ার কথা বলে বেড়ানোর কোনো মানে হয় না।

আমি সিগারেট ধরাতে-ধরাতে বললাম, 'ঝগড়া হয়েছে বুঝলেন কী করে?'

'অনুমানে বলছি।'

'অনুমানটাই-বা কী করে করলেন?'

'আমি লক্ষ করলাম, আপনি আমার কাছে কোনো কাজে আসেন নি। সময় কাটাতে এসেছেন। গল্প করছেন এবং আমার গল্প শুনছেন। কোনো কিছুতেই তেমন আনন্দ পাচ্ছেন না। অর্থাৎ কোনো কারণে মন বিক্ষিপ্ত। আমি বললাম, ভাবি কেমন আছেন? আপনি বললেন, ভালো। কিন্তু বলার সময় আপনার মুখ কঠিন হয়ে গেল। অর্থাৎ ভাবির সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। আমি তখন নিশ্চিত হবার জন্যে বললাম, আমার সঙ্গে চারটা ভাত খান। আপনি রাজি হয়ে গেলেন। আমি ধরে নিলাম—রাগারাগি হয়েছে এবং আপনার স্ত্রী বাসায় নেই। আপনার একা-একা লাগছে বলেই আপনি এসেছেন আমার কাছে। এই সিদ্ধান্তে আসার জন্যে শার্লক হোমস হতে হয় না। একটু ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করলেই বোঝা যায়।'

আমি কিছু বললাম না। মিসির আলি বললেন, 'চা চড়াচ্ছি। চা খেয়ে গল্প শুনুন, তারপর এইখানেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন। খালি বাসায় একা-একা রাত কাটাতে ভালো লাগবে না। তা ছাড়া বৃষ্টি নামল বলে।'

'এটাও কি আপনার লজিক্যাল ডিডাকশান?'

'না—এটা হচ্ছে উইশফুল থিংকিং। গরমে কষ্ট পাচ্ছি—বৃষ্টি হলে জীবন বাঁচে। তবে বাতাস ভারি, বৃষ্টির দেরি নেই বলে আমার ধারণা।'

'বাতাসের আবার হাল্‌কা-ভারি কী?'

'আছে। হাল্‌কা-ভারির ব্যাপার আছে। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ যখন বেড়ে যায় বাতাস হয় ভারি। সেটা আমি বুঝতে পারি মাথায় চুলে হাত দিয়ে। জলীয় বাষ্পের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে মাথার চুল নরম বা শক্ত হয়। শীতকালে মাথার চুলে হাত দিয়ে দেখবেন একরকম, আবার গরমকালে যখন বাতাসে হিউমিডিটি অনেক বেশি, তখন অন্যরকম।'

'আমার কাছে তো সবসময় একরকম লাগে।'

মিসির আলি ঘর ফাটিয়ে হাসতে লাগলেন। ভাবটা এ-রকম, যেন এর চেয়ে মজার কথা আগে শোনেন নি। আমি বোকার মতো বসে রইলাম। অস্বস্তিও লাগতে

লাগল। খুব বুদ্ধিমান মানুষের সঙ্গে গল্প করার মধ্যেও একধরনের অস্বস্তি থাকে। নিজেকে খুব তুচ্ছ মনে হয়।

মিসির আলি স্টোভে চায়ের পানি বসিয়ে দিলেন। শোঁ-শোঁ শব্দ হতে লাগল। এই যুগে স্টোভ প্রায় চোখেই পড়ে না। মিসির আলি এই বস্তু কোত্থেকে জোগাড় করেছেন কে জানে! কিছুক্ষণ পরপর পাম্প করতে হয়। অনেক যন্ত্রণা।

চায়ের কাপ হাতে বিছানায় এসে বসামাত্র বৃষ্টি শুরু হল। তুমুল বর্ষণ। মিসির আলি বললেন, 'আমার বেহেশতে যেতে ইচ্ছা করে না কেন জানেন?'

'জানি না।'

'বেহেশতে যেতে ইচ্ছা করে না—কারণ সেখানে ঝড়-বৃষ্টি নেই। এয়ারকুলার বসানো একটা ঘরের মতো সেখানকার আবহাওয়া। তাপ বাড়বেও না, কমবেও না। অনন্ত কাল একই থাকবে। কোনো মানে হয়?'

'আপনি কি বেহেশত-দোজখ এইসব নিয়ে মাথা ঘামান?'

'না, ঘামাই না।'

'সৃষ্টিকর্তা নিয়ে মাথা ঘামান?'

'হ্যাঁ, ঘামাই। খুব চিন্তা করি, কোনো কূল-কিনারা পাই না। পৃথিবীর সমস্ত ধর্মগ্রন্থ কী বলে, জানেন? বলে—সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বর পারেন না এমন কিছুই নেই। তিনি সব পারেন। অথচ আমার ধারণা তিনি দুটো জিনিস পারেন না, যা মানুষ পারে।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'উদাহরণ দিন।'

'সৃষ্টিকর্তা নিজেকে ধ্বংস করতে পারেন না—মানুষ পারে। আবার সৃষ্টিকর্তা দ্বিতীয় একজন সৃষ্টিকর্তা তৈরি করতে পারেন না। মানুষ কিন্তু পারে, সে সন্তানের জন্ম দেয়।'

'আপনি তাহলে একজন নাস্তিক?'

'না, আমি নাস্তিক না। আমি খুবই আস্তিক। আমি এমন সব রহস্যময় ঘটনা আমার চারপাশে ঘটতে দেখেছি যে বাধ্য হয়ে আমাকে আস্তিক হতে হয়েছে। ব্যাখ্যাতীত সব ঘটনা। যেমন স্বপ্নের কথাটাই ধরুন। সামান্য স্বপ্ন, অথচ ব্যাখ্যাতীত একটা ঘটনা।'

'ব্যাখ্যাতীত হবে কেন? ফ্রয়েড তো চমৎকার ব্যাখ্যা করেছেন বলে শুনেছি।'

'মোটেই চমৎকার ব্যাখ্যা করেন নি। স্বপ্নের পুরো ব্যাপারটাই তিনি অবদমিত কামনার ওপর চাপিয়ে দিয়ে লিখলেন—Interpretations of dream ; তিনি শুধু বিশেষ একধরনের স্বপ্নই ব্যাখ্যা করলেন। অন্য দিক সম্পর্কে চুপ করে রইলেন। যদিও তিনি খুব ভালো করে জানতেন মানুষের বেশ কিছু স্বপ্ন আছে, যা ব্যাখ্যা করা যায় না। তিনি এই নিয়ে প্রচুর কাজও করেছেন, কিন্তু প্রকাশ করেন নি। নষ্ট করে ফেলেছেন। তাঁর ছাত্র প্রফেসর ইয়ুং কিছু কাজ করেছেন—মূল সমস্যায় পৌঁছতে পারেন নি, বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, কিছু- কিছু স্বপ্ন মানুষ কেন দেখে তা বলা যাচ্ছে না। যেমন-একটা লোক স্বপ্ন দেখল, হঠাৎ মাথার উপর সিলিং ফ্যানটা খুলে পড়ে গেল। স্বপ্ন দেখার দু' দিন পর দেখা গেল সত্যি-সত্যি সিলিং ফ্যান খুলে পড়ে গেছে। এই ধরনের স্বপ্নকে বলে প্রিকগ্নিশন ড্রীম (Precognition dream)। এর একটিই ব্যাখ্যা—স্বপ্নে মানুষ ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছে-যা সম্ভব নয়। কাজেই এ-জাতীয় স্বপ্ন ব্যাখ্যাতীত।'

আমি বললাম, 'এমনো তো হতে পারে যে, কাকতালীয়ভাবে মিলে গেছে।'

'হতে পারে। প্রচুর কাকতালীয় ব্যাপার পৃথিবীতে ঘটছে। তবে কাকতালীয় ব্যাপারগুলিকেও একটা স্ট্যাটিসটিক্যাল প্রবাবিলিটির ভেতর থাকতে হবে। Precognition dream-এর ক্ষেত্রে তা থাকে না।'

'বুঝতে পারছি না।'

'বোঝানো একটু কঠিন। আমি বরং স্বপ্ন সম্পর্কে একটা গল্প বলি—শুনতে চান?'

'বলুন শুনি-ভৌতিক কিছু?'

'না—ভৌতিক না—তবে রহস্যময় তো বটেই। আরেক দফা চা হয়ে যাক।'

'হোক।'

'কী ঠিক করলেন? থেকে যাবেন? বৃষ্টি বাড়ছে।'

আমি থেকে যাওয়াই ঠিক করলাম। মিসির আলি চা নিয়ে বিছানায় পা তুলে বসলেন। গল্প শুরু হল।

ছোটবেলায় আমাদের বাসায় 'খাবনামা' নামে একটা স্বপ্নতত্ত্বের বই ছিল। কোন স্বপ্ন দেখলে কী হয় সব ঐ বইয়ে লেখা। আমার মা ছিলেন বইটার বিশেষ ভক্ত। ঘুম থেকে উঠেই বলতেন, 'ও মিসির, বইটা একটু দেখ তো। একটা স্বপ্ন দেখলাম। স্বপ্নের মানে কি বল।'

আমি বই নিয়ে বসতাম।

'দেখ তো বাবা, গরু স্বপ্ন দেখলে কী হয়।'

আমি বই উল্টে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী রঙের গরু মা? সাদা না কালো?'

'এই তো মুশকিলে ফেললি, সাদা না কালো খেয়াল নেই।'

'সাদা রঙের গরু হলে—ধনলাভ। কালো রঙের গরু হলে—বিবাদ।'

'কার সঙ্গে বিবাদ? তোর বাবার সাথে?'

'লেখা নেই তো মা!'

মা চিন্তিত হয়ে পড়তেন। স্বপ্ন নিয়ে চিন্তার তাঁর কোনো শেষ ছিল না। আর কত বিচিত্র স্বপ্ন যে দেখতেন—একবার দেখলেন দুটো অন্ধ চড়ুই পাখি। খাবনামায় অন্ধ চড়ুই পাখি দেখলে কী হয় লেখা নেই। কবুতর দেখলে কী হয় লেখা আছে। মা'র কারণেই খাবনামা ঘাঁটতে-ঘাঁটতে একসময় পুরো বইটা আমার মুখস্থ হয়ে গেল। স্বপ্নবিশারদ হিসেবে আমার নাম রটে গেল। যে যা দেখে আমাকে এসে অর্থ জিজ্ঞেস করে। এই করতে গিয়ে জানলাম কত বিচিত্র স্বপ্নই না মানুষ দেখে। সেই সঙ্গে মজার-মজার কিছু জিনিসও লক্ষ করলাম। যেমন—অসুস্থ মানুষরা সাধারণত বিকট সব দুঃস্বপ্ন দেখে। বোকা মানুষদের স্বপ্নগুলি হয় সরল ধরনের। বুদ্ধিমান মানুষরা খুব জটিল স্বপ্ন দেখে। সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা একটা স্বপ্ন প্রায়ই দেখে, সেটা হচ্ছে কোনো একটি অনুষ্ঠানে সে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে উপস্থিত হয়েছে। সবার গায়ে ভালো পোশাকআশাক, শুধু সে-ই পুরোপুরি নগ্ন। কেউ তা লক্ষ করছে না।'

মিসির আলি সাহেব কথা বন্ধ করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই জাতীয় স্বপ্ন কি আপনি কখনো দেখেছেন?'

আমি বললাম, 'না। একটা স্বপ্নই আমি বারবার দেখি—পরীক্ষা হলে পরীক্ষা দিতে বসেছি। খুব সহজ প্রশ্ন, সবগুলির উত্তর আমার জানা। লিখতে গিয়ে দেখি কলম দিয়ে কালি বেরুচ্ছে না। কলমটা বদলে অন্য কলম নিলাম—সেটা দিয়েও কালি বেরুচ্ছে না। এদিকে ঘন্টা পড়ে গেছে।'

'এই স্বপ্নটাও খুব কমন। আমিও দেখি। একবার দেখলাম বাংলা পরীক্ষা- প্রশ্ন দিয়েছে অঙ্কের। কঠিন সব অঙ্ক। বাঁদরের তৈলাক্ত বাঁশ বেয়ে ওঠার অঙ্ক। একটা বাঁদরের জায়গায় দুটো বাঁদর। একটা খানিকটা ওঠে, অন্যটা তার লেজ ধরে টেনে নিচে নামায়—খুবই জটিল ব্যাপার। বাঁশের সবটা আবার তৈলাক্ত না, কিছুটা তেল ছাড়া.....'

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, 'সত্যিই কি এমন স্বপ্ন দেখেছেন?'

'জ্বি-না—ঠাট্টা করে বলছি—জটিল সব অঙ্ক ছিল, এইটুকু মনে আছে। যাই হোক, ছোটবেলা থেকেই এইসব কারণে স্বপ্নের দিকে আমি ঝুঁকলাম। দেশের বাইরে যখন প্যারাসাইকোলজি পড়তে গেলাম—তখন স্পেশাল টপিক নিলাম 'ড্রীম'। ড্রীম ল্যাবোরেটরিতে কাজও করলাম। আমার প্রফেসর ছিলেন ডঃ সুইন হার্ন, দুঃস্বপ্নের ব্যাপারে যাঁকে পৃথিবীর সেরা বিশেষজ্ঞ বলা যেতে পারে। দুঃস্বপ্ন অ্যানালিসিসের তিনি একটা টেকনিক বের করেছেন, যার নাম সুইন হার্ন অ্যানালিসিস। সুইন হার্ন অ্যানালিসিসে ব্যাখ্যা করা যায় না এমন সব দুঃস্বপ্নের একটা ফাইল তাঁর কাছে ছিল। সেই ফাইল তিনি তাঁর গ্রাজুয়েট ছাত্রদের দিতেন না। আমাকে তিনি খুবই পছন্দ করতেন, সম্ভবত সে-কারণেই সেই ফাইল ঘাঁটার সুযোগ হয়ে গেল। ফাইল পড়ে আমি হতভম্ব। ব্যাখ্যাতীত সব ব্যাপার। একটা উদাহরণ দিই—নিউ ইংল্যাণ্ডের একটি তেইশ বছর বয়েসী মেয়ে দুঃস্বপ্ন দেখা শুরু করল। তার নাভিমূল থেকে একটা হাত বের হয়ে আসছে। স্বাভাবিক হাতের চেয়ে সরু—লম্বা-লম্বা আঙুল। হাতটার রঙ নীলচে—খুব তুলতুলে। দুঃস্বপ্নটা সে প্রায়ই দেখতে লাগল। প্রতিবারই স্বপ্ন ভাঙত বিকট চিৎকারে। তাকে ড্রীম ল্যাবোরেটরিতে ভর্তি করা হল। প্রফেসর সুইন হার্ন রোগিণীর মনোবিশ্লেষণ করলেন। অস্বাভাবিক কিছুই পেলেন না। মেয়েটিকে পাঠিয়ে দেওয়া হল নিউ ইংল্যাণ্ডে। তার কিছুদিন পর মেয়েটি লক্ষ করল তার নাভিমূল ফুলে উঠেছে—একধরনের ননম্যালিগন্যান্ট গ্রোথ হচ্ছে। একমাসের মধ্যে সেই টিউমার মানুষের হাতের আকৃতি ধারণ করল। টিউমারটির মাথায় মানুষের হাতের আঙুলের মতো পাঁচটি আঙুল......'

আমি মিসির আলিকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, 'ভাই, এই গল্পটা থাক। শুনতে ভালো লাগছে না। ঘেন্না লাগছে।'

'ঘেন্না লাগার মতোই ব্যাপার। ছবি দেখলে আরো ঘেন্না লাগবে। মেয়েটির ছবি ছাপা হয়েছে নিউ ইংল্যাণ্ড জার্নাল অব মেডিসিনে। ছবি দেখতে চান?'

'জ্বি-না।'

'পিএইচ. ডি. প্রোগ্রামে গিয়েছিলাম, পিএইচ. ডি. না-করেই ফিরতে হল। প্রফেসরের সঙ্গে ঝামেলা হল। যে-লোক আমাকে এত পছন্দ করত, সে-ই বিষ-নজরে দেখতে লাগল। এম. এস. ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পার্ট টাইম টীচিং-এর একটা ব্যবস্থা হল। ছাত্রদের অ্যাবনরম্যাল বিহেভিয়ার পড়াই। স্বপ্ন

সম্পর্কেও বলি। স্বপ্নের সঙ্গে মানুষের অস্বাভাবিক আচরণের একটা সম্পর্ক বের করার চেষ্টা করি। ছাত্রদের বলি, তোমরা যদি কখনো কোনো ভয়ংকর স্বপ্ন দেখ, তাহলে আমাকে বলবে।

ছাত্ররা প্রায়ই এসে স্বপ্ন বলে যায়। ওদের কোনো স্বপ্নই তেমন ভয়ংকর না। সাপে তাড়া করছে, আকাশ থেকে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে—এই জাতীয় স্বপ্ন। আমার ইচ্ছা ছিল দুঃস্বপ্ন নিয়ে গবেষণার কিছু কাজ করব। সেই ইচ্ছা সফল হল না। দুঃস্বপ্ন দেখছে এমন লোকজনই পাওয়া গেল না। আমি গবেষণার কথা যখন ভুলে গেলাম, তখন এল লোকমান ফকির।

লোকমান ফকিরের বাড়ি কুমিল্লার নবীনগরে। বয়স ত্রিশ–পঁয়ত্রিশ। শিপিং করপোরেশনে মোটামুটি ধরনের চাকরি করে। দু'–কামরার একটা বাড়ি ভাড়া করেছে কাঁঠালবাগানে। বিয়ে করে নি। তবে বিয়ের চিন্তা–ভাবনা করছে। তার এক মামাতো বোনের সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে। মেয়েটিকে তার পছন্দ নয়। তবে অপছন্দের কথা সে সরাসরি বলতেও পারছে না। কারণ তার এই মামা তাকে পড়াশোনা করিয়েছেন।

ছেলেটি এক সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। আমি তাকে দেখে চমকে উঠলাম। মুখ পাণ্ডুর বর্ণ, মৃত মানুষের চোখের মতো ভাবলেশহীন চোখ। যৌবনের নিজস্ব যে–জ্যোতি যুবক–যুবতীর চোখে থাকে তার কিছুই নেই। ছেলেটি হাঁটছে খুঁড়িয়ে–খুঁড়িয়ে, কিছুক্ষণ পরপরই চমকে উঠছে। সে ঘরে ঢুকেই বিনা ভূমিকায় বলল, 'স্যার, আপনি আমাকে বাঁচান।'

আমি ছেলেটিকে বসালাম। পরিচয় নিলাম। হালকা কিছু কথাবার্তা বলে তাকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করলাম। তাতে খুব লাভ হল বলে মনে হল না। তার অস্থিরতা কমল না। লক্ষ করলাম, সে স্থির হয়ে বসতেও পারছে না। খুব নড়াচড়া করছে। আমি বললাম, 'তোমার সমস্যাটা কী?'

ছেলেটি রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে–মুছতে প্রায় অস্পষ্ট গলায় বলল, 'স্যার, আমি দুঃস্বপ্ন দেখি। ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন।'

আমি বললাম, 'দুঃস্বপ্ন দেখে না এমন মানুষ তুমি খুঁজে পাবে না। সাপে তাড়া করছে, বাঘে তাড়া করছে, আকাশ থেকে নিচে পড়ে যাওয়া—এগুলি খুবই কমন স্বপ্ন। সাধারণত হজমের অসুবিধা হলে লোকজন দুঃস্বপ্ন দেখে। ঘুমের অসুবিধা হলেও দেখে। তুমি শুয়ে আছ, মাথার নিচ থেকে বালিশ সরে গেল, তখনো এ–রকম স্বপ্ন তুমি দেখতে পার। শারীরিক অস্বস্তির একটা প্রকাশ ঘটে দুঃস্বপ্নে। আগুনে পোড়ার স্বপ্ন মানুষ কখন দেখে জান? যখন পেটে গ্যাস হয়, সেই গ্যাসে বুক জ্বালাপোড়া করে—তখন সে স্বপ্ন দেখে তাকে জ্বলন্ত আগুনে ফেলে দেওয়া হয়েছে।'

'স্যার, আমার স্বপ্ন এ–রকম না। অন্য রকম।'

'ঠিক আছে, গুছিয়ে বল। শুনে দেখি কী রকম।'

ছেলেটি সঙ্গে–সঙ্গে কথা শুরু করল। মুখস্থ বলে যাবার মতো বলে যেতে লাগল। মনে হয় আগে থেকে ঠিকঠাক করে এসেছে এবং অনেক বার রিহার্সেল দিয়েছে।

কথা বলার সময় একবারও আমার চোখের দিকে তাকাল না। যখন প্রশ্ন করলাম তখনো না।

'প্রথম স্বপ্নটা দেখি বুধবার রাতে। এগারটার দিকে ঘুমুতে গেছি। আমার ঘুমের কোনো সমস্যা নেই। শোয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়তে পারি। সে-রাতেও তাই হল। বিছানায় শোয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়েছি। সঙ্গে-সঙ্গেই স্বপ্নটা দেখেছি।'

'কী করে বুঝলে শোয়ামাত্র স্বপ্ন দেখেছ?'

'জেগে উঠে ঘড়ি দেখেছি, এগারটা দশ।'

'স্বপ্নটা বল।'

'আমি দেখলাম খোলামেলা একটা মাঠের মতো জায়গা। খুব বাতাস বইছে। শোঁ-শোঁ শব্দ হচ্ছে। রীতিমতো শীত লাগছে। আমার চারদিকে অনেক মানুষ, কিন্তু ওদের কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। ওদের কথা শুনতে পাচ্ছি। হাসির শব্দ শুনছি। একটা বাচ্চা ছেলে কাঁদছে—তাও শুনছি। বুড়োমতো একটা লোকের কাশির শব্দ শোনা যাচ্ছে, কিন্তু কাউকে আবছাভাবেও দেখতে পাচ্ছি না। একবার মনে হল আমি বোধহয় অন্ধ হয়ে গেছি। চারদিকে খুব তীক্ষ্ণ চোখে তাকালাম—মাঠ দেখতে পাচ্ছি, কুয়াশা দেখতে পাচ্ছি—কিন্তু মানুষজন দেখছি না, অথচ তাদের কথা শুনছি। হঠাৎ ওদের কথাবার্তা সব থেমে গেল। বাতাসের শোঁ-শোঁ শব্দও বন্ধ হয়ে গেল। মনে হল কেউ যেন এসেছে। তার ভয়ে সবাই চুপ করে গেছে। আমার নিজেরও প্রচণ্ড ভয় লাগল। একধরনের অন্ধ ভয়।

তখন শ্লেষ্মাজড়িত মোটা গলায় একজন বলল, ''ছেলেটি তো দেখি এসেছে। মেয়েটা কোথায়?''

কেউ জবাব দিল না। খানিকক্ষণের জন্যে বাচ্চা ছেলেটির কান্না শোনা গেল, সঙ্গে-সঙ্গে থেমেও গেল। মনে হল কেউ যেন তার মুখে হাত চাপা দিয়ে কান্না বন্ধ করার চেষ্টা করছে। ভারি গলার লোকটা আবার কথা বলল, ''মেয়েটা দেরি করছে কেন? কেন এত দেরি? ছেলেটিকে তো বেশিক্ষণ রাখা যাবে না। এর ঘুম পাতলা হয়ে এসেছে। ও জেগে যাবে।''

হঠাৎ চারদিকে সাড়া পড়ে গেল। একসঙ্গে সবাই বলে উঠল, ''এসেছে, এসেছে, মেয়েটা এসেছে।'' আমি চমকে উঠে দেখলাম আমার পাশে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। খুব রোগা একটা মেয়ে। অসম্ভব ফরসা, বয়স আঠার-উনিশ। এলোমেলোভাবে শাড়ি পরা। লম্বা চুল। চুলগুলি ছেড়ে দেওয়া, বাতাসে উড়ছে। মেয়েটা ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। আমি অবাক হয়ে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আছি। সে অসংকোচে আমার হাত ধরে কাঁপা গলায় বলল, ''আমার ভয় করছে। আমার ভয় করছে।''

আমি বললাম, ''আপনি কে?''

সে বলল, ''আমার নাম নার্গিস। আপনি যা দেখছেন তা স্বপ্ন। ভয়ংকর স্বপ্ন। একটু পরই বুঝবেন। আগে এই স্বপ্নটা শুধু আমি একা দেখতাম। এখন মনে হয় আপনিও দেখবেন।''

মেয়েটা কাঁদতে শুরু করল। আতঙ্কে অস্থির হয়ে আমার গা ঘেঁষে দাঁড়াল। কাঁদতে-কাঁদতেই বলল, ''আপনি কিছু মনে করবেন না, আমার ভয় লাগছে বলেই আমি এভাবে দাঁড়িয়ে আছি। এরা প্রতি মাসে একবার করে আমাকে এই স্বপ্নটা দেখায়।''

আমি বললাম, ''এরা কারা?''

''জানি না। কিচ্ছু জানি না। আপনি থাকায় কেন জানি একটু ভরসা পাচ্ছি। যদিও জানি আপনি কিছুই করতে পারবেন না। কিছুই না, কিছুই না, কিছুই না।''

মেয়েটি হাঁপাতে শুরু করল আর তখন সেই ভারি এবং শ্লেষ্মাজড়ানো কণ্ঠ চিৎকার করে বলল, ''সময় শেষ। দৌড়াও, দৌড়াও, দৌড়াও।''

সেই চিৎকারের মধ্যে ভয়ংকর পৈশাচিক কিছু ছিল। আমার শরীরের প্রতিটি স্নায়ু থরথর করে কাঁপতে লাগল। চোখের সামনে কুয়াশা কেটে যেতে লাগল–চারদিকে তীব্র আলো। এত তীব্র যে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। যাদের কথা শুনছিলাম অথচ দেখতে পাচ্ছিলাম না, এই আলোয় সবাইকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম—এরা এরা এরা . . . . .'

'এরা কী?'

'এরা মানুষ না, অন্য কিছু—লম্বাটে পশুর মতো মুখ, হাত–পা মানুষের মতো। সবাই নগ্ন। এরা অদ্ভুত একধরনের শব্দ করতে লাগল। আমার কানে বাজতে লাগল—দৌড়াও দৌড়াও ...... আমরা দৌড়াতে শুরু করলাম। আমাদের পিছনে সেই জন্তুর মতো মানুষগুলিও দৌড়াচ্ছে।

আমরা ছুটছি মাঠের ওপর দিয়ে। সেই মাঠে কোনো ঘাস নেই। সমস্ত মাঠময় অযুত নিযুত লক্ষ কোটি ধারাল ব্লেড সারি–সারি সাজান। সেই ব্লেডে আমার পা কেটে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে—তীব্র তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা। চিৎকার করে উঠলাম, আর তখনই ঘুম ভেঙে গেল। দেখি ঘামে সমস্ত বিছানা ভিজে গেছে।'

'এই তোমার স্বপ্ন?'

'জ্বি।'

'দ্বিতীয় স্বপ্ন কখন দেখলে?'

'ঠিক একমাস পর।'

'সেই মেয়েটিও কি দ্বিতীয় স্বপ্নে তোমার সঙ্গে ছিল?'

'জ্বি।'

'একই স্বপ্ন, না একটু অন্য রকম?'

'একই স্বপ্ন।'

'দ্বিতীয় বারও কি তুমি মেয়েটির হাত ধরে দৌড়ালে?'

'জ্বি।'

'প্রথম বার যেমন তার সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছিল, দ্বিতীয় বারও হল?'

'জ্বি।'

'দ্বিতীয় বারও কি মেয়েটি পরে এসেছে? তুমি আগে এসে অপেক্ষা করছিলে?'

'জ্বি–না—দ্বিতীয় বারে মেয়েটি আগে এসেছিল, আমি পরে এসেছি।'

'দ্বিতীয় বারের স্বপ্ন তুমি রাত ক'টায় দেখেছ?'

'ঠিক বলতে পারব না, তবে শেষরাতের দিকে। ঘুম ভাঙার কিছুক্ষণের মধ্যেই ফজরের আজান হল।'

'দ্বিতীয় বারও স্বপ্নে মোটা গলার লোকটি কথা বলল?'

'জ্বি।'

লোকমান ফকির রুমালে কপালের ঘাম মুছতে লাগল। সে অসম্ভব ঘামছে। আমি বললাম, 'পানি খাবে? পানি এনে দেব?'

'জ্বি স্যার, দিন।'

আমি পানি এনে দিলাম, সে এক নিঃশ্বাসে পানি শেষ করে ফেলল। আমি বললাম, 'স্বপ্ন ভাঙার পর তুমি দেখলে, তোমরা দু'টি পা-ই ব্লেডে কেটে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে—তাই না?

লোকমান হতভম্ব হয়ে বলল, 'জ্বি স্যার। আপনি কী করে বুঝলেন?'

'তুমি খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে ঘরে ঢুকলে, সেখান থেকে অনুমান করেছি। তা ছাড়া তোমার পা স্বপ্ন দেখার পর কেটে যাচ্ছে বলেই স্বপ্নটা ভয়ংকর। পা যদি না-কাটত তাহলে স্বপ্নটা ভয়ংকর হত না, বরং একটা মধুর স্বপ্ন হত। কারণ স্বপ্নে একটি মেয়ের সঙ্গে তোমার দেখা হচ্ছে, যে তোমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। আঠার-উনিশ বছরের রূপবতী একটি মেয়ে, হাত ধরে তোমার সঙ্গে দৌড়াচ্ছে।'

আমার কথার মাঝখানেই লোকমান ফকির পায়ের জুতো খুলে ফেলল, মোজা খুলল। আমি হতভম্ব হয়ে দেখলাম, পায়ের তলা ফালা-ফালা করে কাটা। এমন কিছু সত্যি-সত্যি ঘটতে পারে আমি ভাবি নি।

লোকমান ক্ষীণ গলায় বলল, 'এটা কী করে হয় স্যার?'

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে স্বপ্নের ব্যাপারে পড়াশোনা যা করেছি তার থেকে তোমাকে একটা কথা বলতে পারি—Invert reaction বলে একটা ব্যাপার আছে। ধর, তোমার একটা আঙুল পুড়ে গেল—সেই খবর স্নায়ুর মাধ্যমে যখন তোমার মস্তিষ্কে পৌঁছবে, তখন তুমি তীব্র ব্যথা পাবে। Invertreaction-এ কী হয় জান? আগে মস্তিষ্কে আঙুলটি পোড়ার অনুভূতি পায়, তারপর সেই খবর আঙুলে পৌঁছে। তখন আঙুলটি পোড়া-পোড়া হয়ে যেতে পারে। স্বপ্নের পুরো ব্যাপারটা হয় মস্তিষ্কে। সেখানে থেকে Invert reaction-এ শরীরে তার প্রভাব পড়তে পারে।

এক লোক স্বপ্নে দেখত, তার হাতে কে যেন পিন ফোটাচ্ছে। ঘুম ভাঙার পর তার হাতে সত্যি-সত্যি পিন ফোটার দাগ দেখা যেত। তোমার ক্ষেত্রেও হয়তো তাই ঘটেছে। তবে এমন ভয়াবহভাবে পা কাটা অভশণর্র রণটর্ডধমভ-এ সম্ভব বলে আমার মনে হয় না।'

'তাহলে কী?'

'আমি বুঝতে পারছি না।'

লোকমান ক্লান্ত স্বরে বলল, 'এক মাস পরপর আমি স্বপ্নটা দেখি। কারণ পায়ের ঘা শুকাতে এক মাস লাগে।'

আমি লোকমান ফকিরের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললাম, 'তুমি এখন থেকে একটা কাজ করবে—ঘুমুতে যাবে জুতো পায়ে দিয়ে। স্বপ্নে যদি তোমাকে দৌড়াতেও হয়—তোমার পায়ে থাকবে জুতো। ব্লেড তোমাকে কিছু করতে পারবে না।'

'সত্যি বলছেন?'

'আমার তাই ধারণা। আমার মনে হচ্ছে জুতো পরে ঘুমুলে তুমি স্বপ্নটাই আর দেখবে না।'

লোকমান ফকির চলে গেল। খুব ভরসা পেল বলে মনে হল না। আমি তাকে বলে দিয়েছিলাম এক মাস পর স্বপ্ন দেখা হয়ে গেলে সে যেন আসে। সে এল দেড় মাস

পর।

তার মুখ আগের চেয়েও শুকনো, চোখ ভাবলেশহীন। অথর্ব মানুষের মতো হাঁটছে। আমি বললাম, 'স্বপ্ন দেখেছ?'

'জ্বি–না।'

'জুতো পায়ে ঘুমুচ্ছ?'

'জ্বি স্যার। জুতো পায়ে দেওয়ার জন্যেই স্বপ্ন দেখছি না।'

আমি হাসিমুখে বললাম, 'তাহলে তো তোমার রোগ সেরে গেল। এত মন–খারাপ কেন? মনে হচ্ছে বিরাট সমস্যায় পড়েছ। সমস্যাটা কী?'

লোকমান নিচু গলায় বলল, 'মেয়েটার জন্যে মন খারাপ স্যার। বেচারি একা–একা স্বপ্ন দেখছে। এত ভালো একটা মেয়ে কষ্ট করছে। আমি সঙ্গে থাকলে সে একটু ভরসা পায়। নিজের জন্যে কিছু না। মেয়েটার জন্যে খুব কষ্ট হয়।'

লোকমানের চোখে প্রায় পানি এসে গেল। আমি বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইলাম—সে বলে কী!

'স্যার, আমি ঠিক করেছি জুতো পরব না। যা হবার হবে। নার্গিসকে একা–একা যেতে দেব না। আমি থাকব সঙ্গে। মেয়েটার জন্যে আমার খুব কষ্ট হয় স্যার। এত চমৎকার একটা মেয়ে! আমি স্যার থাকব তার সঙ্গে।'

'সেটা কি ভালো হবে?'

'জ্বি স্যার হবে। আমি তাকে ছাড়া বাঁচব না।'

'সে কিন্তু স্বপ্নের একটি মেয়ে।'

'সে স্বপ্নের মেয়ে নয়। আমি যেমন, সেও তেমন। আমরা দু' জন এই পৃথিবীতেই বাস করি। সে হয়তো ঢাকাতেই কোনো এক বাসায় থাকে। তার পায়ে ব্লেডের কাটা। আমি যেমন সারাক্ষণ তার কথা ভাবি, সেও নিশ্চয়ই ভাবে। শুধু আমাদের দেখা হয় স্বপ্নে।'

মিসির আলি সিগারেট ধরিয়ে বললেন, 'গল্পটি এই পর্যন্তই।'

আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'এই পর্যন্ত মানে? শেষটা কী?'

'শেষটা আমি জানি না। ছেলেটি ক্ষতবিক্ষত পা নিয়ে একবার এসেছিল। সে বলল, জুতো খুলে ঘুমানোমাত্রই সে আবার স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নে মেয়েটির দেখা পায়। তারা দু' জন খানিকক্ষণ গল্প করে। দু' জনকে জড়িয়ে ধরে কাঁদে। এক সময় মানুষের মতো জন্তুগুলো চেঁচিয়ে বলে—দৌড়াও, দৌড়াও। তারা দৌড়াতে শুরু করে।'

'ছেলেটি আপনার কাছে আর আসে নি?'

'জ্বি–না।'

'ছেলেটির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আপনি কি কিছু জানেন?'

'না, জানি না। তবে অনুমান করতে পারি। ছেলেটি জানে জুতো পায়ে ঘুমুলে এই দুঃস্বপ্ন সে দেখবে না, তার পরেও জুতো পায়ে দেয় না। কারণ মেয়েটিকে একা ছেড়ে দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রেমের ক্ষমতা যে কী প্রচণ্ড হতে পারে, প্রেমে না–পড়লে তা বোঝা যায় না। ছেলেটির পক্ষে এই জীবনে তার স্বপ্নসঙ্গিনীর মায়া কাটানো সম্ভব না। সে বাকি জীবনে কখনো জুতো পায়ে ঘুমুবে না। সে আসলে দুঃস্বপ্নের হাত থেকে মুক্তি চায় না। দুঃস্বপ্ন হলেও এটি সেইসঙ্গে তার জীবনের মধুরতম স্বপ্ন।'

'আপনার কি ধারণা, নার্গিস নামের কোনো মেয়ে এই পৃথিবীতে সত্যি-সত্যি আছে?'

মিসির আলি নিচু গলায় বললেন, 'আমি জানি না। রহস্যময় এই পৃথিবীর খুব কম রহস্যের সন্ধানই আমি জানি। তবে মাঝে-মাঝে আমার কেন জানি এই মেয়েটির হাত ধরে একবার দৌড়াতে ইচ্ছা করে—। আরেক দফা চা হবে? পানি কি গরম করব?'

বিপদ

১

আফসারউদ্দিন খুব গম্ভীর ধরনের মানুষ। একটা দেশি জাহাজ কোম্পানির বড় অফিসার। বড় অফিসাররা এমনিতেই গম্ভীর হয়ে থাকেন। ইচ্ছে না-করলেও তাঁদের গম্ভীর থাকতে হয়। আফসার সাহেবের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সে-রকম নয়। তিনি এই পৃথিবীতে গাম্ভীর্য নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছেন। কঠিন হয়ে থাকতেই তাঁর ভালো লাগে। হাসি-তামাশা, ঠাট্টা-ফাজলামি তাঁর একেবারে সহ্য হয় না। তাঁর কথা হল—হাসি-তামাশাই যদি লোকজন করবে তাহলে কাজ করবে কখন? পৃথিবীটা কোনো নাট্যশালা না যে হাসি-তামাশা করে লোক-হাসাতে হবে।

আফসার সাহেবের দুর্ভাগ্য, তাঁর আশেপাশের মানুষজনের স্বভাব তাঁর স্বভাবের একেবারে উল্টো। তাঁর স্ত্রী মীরা সর্বক্ষণই হাসছেন। কারণে-অকারণে হাসছেন। এই তো সেদিন তাঁদের কাজের ছেলে কুদ্দুস হাত থেকে ফেলে টী-পট ভেঙে ফেলল। এই দেখে মীরা ফিক করে হেসে ফেললেন। আফসার সাহেব বললেন, 'একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। হাত থেকে ফেলে একটা দামি জিনিস ভেঙেছে। এতে হাসির কী হল?'

মীরা বললেন, 'টী-পট ভেঙেছে দেখে হাসি নি। টী-পট ভাঙার পর কুদ্দুস কেমন হতভম্ব হয়ে ভাঙা পটটার দিকে তাকিয়ে ছিল তাই দেখে হেসে ফেললাম।'

'তার মুখের ভঙ্গি দেখে তুমি হেসে ফেললে?'

'হ্যাঁ।'

'দয়া করে আমার সামনে এই কাজটা করবে না। হাসতে ইচ্ছা করলে বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে হাসবে।'

মীরা আবার হেসে ফেললেন। আফসার সাহেব বললেন, 'হাসলে যে?'

'তুমি কেমন গম্ভীর মুখে কথা বলছ তাই দেখে—'

'দয়া করে আমার সামনে থেকে যাও।'

মীরা উঠে চলে যান, তবে হাসতে-হাসতে যান। তা দেখেও আফসার সাহেবের গা জ্বালা করে।

তাঁর দুই মেয়ে সুমী আর রুমীও অবিকল মা'র মতো। দিন-রাত হাসছে। তারা মাঝে-মাঝে স্কুলের মজার-মজার সব ঘটনা বাবাকে বলতে আসে। ঘটনা বলবে কি, বলার আগেই হাসি।

আফসার সাহেব শীতল গলায় বলেন, 'কী বলতে চাচ্ছ ঠিকমতো বল। এত হাসলে বলবে কী করে?'

'না-হাসলে এই ঘটনা বলা যাবে না বাবা। হি-হি-হি—হয়েছে কি, আমাদের ক্লাসের একটা মেয়ে অরুণা—হি-হি-হি—সে করল কি, হি-হি-হি—'

'চুপ কর।'

'ঘটনাটা শোন বাবা। ভারি মজার— তারপর অরুণা—হি-হি-হি।'

'স্টপ। স্টপ।'

অরুণার গল্প বলা হয় না। মেয়ে দু'টি দুঃখিত হয়। তবে সেই দুঃখও খুব সাময়িক। আবার কোনো-একটা মজার ঘটনা ঘটে। এক বোন অন্য বোনের গায়ে হাসতে-হাসতে গড়িয়ে পড়ে।

আজ সোমবার।

আফসার সাহেব নাশতা খেতে বসেছেন। তাঁর দুই মেয়ে সুমী রুমী বসেছে দু' পাশে। রুমী কী একটা হাসির কথা বলতে যাচ্ছিল। বাবা কড়া করে তার দিকে তাকানোর কারণে সে চুপ করে গেল। সুমী তখন কী একটা বলতে গেল। মীরা চোখের ইশারায় তাকে থামিয়ে দিলেন। নাশতার টেবিলে হাসাহাসি না-হওয়াই ভালো। মীরা টী-পট থেকে কাপে চা ঢালছেন। হঠাৎ একটা দুর্ঘটনা ঘটল। মেঝে থেকে লাফ দিয়ে একটা বিড়াল আফসার সাহেবের কোলে এসে বসল। আফসার সাহেব লাফ দিয়ে তিন হাত ওপরে উঠে গেলেন। যে-পিরিচে ডিম, রুটি, মাখন এবং পনিরের টুকরো সাজানো ছিল তা ছিটকে পড়ল মেঝেতে। পুরো ঘটনাটা ঘটল দু' সেকেণ্ডের ভেতর।

সুমী রুমী খিলখিল করে হেসে ফেলল। তারা জানে এখন হাসা মানেই বিপদ। ভয়ংকর বিপদ। বাবা প্রচণ্ড রাগ করবেন। কিন্তু কিছুতেই তারা হাসি থামাতে পারল না। মীরা খুব চেষ্টা করছেন না-হাসতে। দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরেছেন। লাভ হচ্ছে না। হাসি এসে যাচ্ছে। আর বুঝি আটকানো গেল না।

আফসার সাহেব মেঘগর্জন করলেন, 'রুমী সুমী, তোমরা আমার সামনে থেকে উঠে গেলে আমি খুশি হব।'

মেয়ে দু' জন তৎক্ষণাৎ ছুটে ঘরে চলে গেল। ঘরের ভেতর থেকে তাদের হাসি শোনা যাচ্ছে—'হা-হা-হা—হি-হি-হি।'

এবার মীরাও হেসে ফেললেন। তবে শব্দ করে নয়, নিঃশব্দে। হাসির কারণে তাঁর হাত কাঁপছে। চায়ের কাপে ঠিকমতো চা ঢালতে পারছেন না।

'মীরা।'

'কি?'

'হাসছ কেন জানতে পারি?'

'হাসি এসে গেল তাই হাসছি। বিশেষ কোনো কারণে নয়।'

'কেন হাসি এসে গেল তা জানতে পারি?'

'সরি।'

'সরির কোনো ব্যাপার না। তুমি বল কেন হাসলে?'

মীরা গম্ভীর গলায় বললেন, 'তুমি কেমন চমৎকার শূন্যে উঠে গেলে! হঠাৎ মনে হল, পৃথিবীতে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বলে কিছু নেই। দৃশ্যটা দেখতে ভালো লাগল তাই হাসলাম।'

'তুমি যদি আমার সামনে থেকে চলে যাও আমি খুশি হব।'

'সত্যি চলে যেতে বলছ?'

'যদি হাসি বন্ধ করতে না পার তাহলে অবশ্যই চলে যাবে।'

'তোমার নাশতা তো বিড়াল ফেলে দিয়েছে। নাশতা নিয়ে আসি?'

'না।'

'চা দিই, নাকি চা-ও খাবে না? ভালো করে তাকিয়ে দেখ, আমি কিন্তু হাসছি না। গম্ভীর হয়ে আছি।....'

বলতে-বলতে মীরা ফিক করে হেসে ফেললেন। খানিকটা চা ছলকে টেবিলে পড়ে গেল। তিনি টী-পট নামিয়ে রেখে প্রায় ছুটে শোবার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। দুই মেয়ের হাসির সঙ্গে যুক্ত হল তাঁর হাসি।

চায়ের কাপ হাতে আফসার সাহেব একা-একা বসে আছেন। তাঁর মন বিষণ্ন। শোবার ঘর থেকে মা এবং দুই মেয়ের হাসির শব্দ ভেসে আসছে। হাসির জোয়ার নেমেছে। রাগে আফসার সাহেবের গা জ্বলে গেল। যে-বিড়ালের জন্যে এত কাণ্ড, সে নিশ্চিন্ত এবং আনন্দিত ভঙ্গিতে মেঝেতে পড়ে থাকা ডিম, পনির এবং মাখন-রুটি খাচ্ছে। সে একা খাচ্ছে না, তার সঙ্গে দুটো বাচ্চাও আছে। তারাও খাচ্ছে এবং মাঝে-মাঝে চোখ তুলে আফসার সাহেবকে দেখছে। আফসার সাহেবের ইচ্ছে করছে প্রচণ্ড লাথি দিয়ে বিড়ালটাকে ফুটবলের মতো দূরে ছুঁড়ে দেন।

মেঝে পরিষ্কার করার জন্যে কাজের ছেলে কুদ্দুস এসেছিল। আফসার সাহেব তার দিকে রাগী চোখে তাকাতেই সে ভয় পেয়ে রান্নাঘরে ঢুকে গেল। তারও কি হাসির রোগ আছে? রান্নাঘর থেকে হাসির মতো আওয়াজ আসছে। হ্যাঁ, কুদ্দুস ব্যাটাও হাসছে।

বিড়াল পরিবার মহানন্দে খেয়ে যাচ্ছে। আফসার সাহেবের রাগ ক্রমেই বাড়ছে। তিনি ঠিক করে ফেললেন—ডান পায়ে বিড়ালটার গায়ে একটা দুর্দান্ত কিক বসাবেন, যাতে সে ভবিষ্যতে কখনো এইভাবে তাঁকে অপদস্থ না-করে। কিক বসাতে যাবেন, তখন একটা ব্যাপার ঘটল। তিনি পরিষ্কার শুনলেন—মা-বিড়ালটা যে-সব কথা বলছে তা তিনি বুঝতে পারছেন। ম্যাঁও ম্যাঁও করেই নিচু গলায় কথা বলছে, কিন্তু তিনি প্রতিটি শব্দ বুঝতে পারছেন। এ কী অদ্ভুত কাণ্ড!

মা-বিড়ালটা বলছে, 'খোকাখুকু সাবধান! লোকটা আমাদের দিকে তাকাচ্ছে, মতলব ভালো না। মনে হচ্ছে উঠে দাঁড়াবে।'

একটা বাচ্চা বিড়াল বলল, 'উঠে দাঁড়ালে কী হয় মা?'

'লাথি মারতে পারে। তোমরা একটু দূরে সরে যাও।'

'কতটা দূরে যাব?'

'খুব বেশি দূর যেতে হবে না। লাথি মারলেও সে তোমাদের মারবে না। আমাকে মারবে। মানুষ কখনো বিড়ালের বাচ্চার গায়ে হাত তোলে না।'

'কেন মা?'

'মানুষের মনে মায়া বেশি, এই জন্যে। তবু সাবধানের মার নেই। এই লোক খুব রেগে আছে। রেগে গেলে মানুষের মাথার ঠিক থাকে না। কি করতে কি করে বসবে। কী দরকার রিস্ক নিয়ে?'

'রিস্ক কী মা?'

'রিস্ক হচ্ছে একটা ইংরেজি শব্দ। এর বাংলাটা ঠিক জানি না।'

বিড়ালের বাচ্চা দু'টি অনেকটা দূরে চলে গেল। সেখান থেকে তাকিয়ে রইল আফসার সাহেবের দিকে। আফসার সাহেব পাথরের মূর্তির মতো বসে রইলেন। ব্যাপারটা কী? বিড়ালের মানুষের মতো কথা বলার কোনোই কারণ নেই। শুধুমাত্র রূপকথার বইতে পশু-পাখি মানুষের মতো কথা বলে। এটা কোনো রূপকথা নয়। তিনি বিংশ শতাব্দীতে বাস করছেন। বাবর রোডের দোতলা বাসার ডাইনিং রুমে বসে আছেন। অফিসের গাড়ি চলে এসেছে, এখন অফিসে যাবেন। এই সময় বিড়ালের ভাষা তিনি বুঝতে পারছেন, তা হতেই পারে না। বিড়াল একটিমাত্র শব্দ জানে—"মিঁয়াও"। এই শব্দের কোনো মানে নেই। আর থাকলেও মানুষের তা বোঝার কথা না।

আফসার সাহেব সিগারেট ধরালেন।

একটা বিড়ালের বাচ্চা তখন কথা বলে উঠল, 'মা, লোকটা সিগারেট ধরিয়েছে। এখন বোধহয় আর আমাদের মারবে না।'

বিড়ালের মা বলল, 'আমারও তাই ধারণা। তবে খোকাখুকু, এখন একটু সাবধানে থাক। কারণ লোকটা জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরা ছুঁড়ে ফেলবে। গায়ে লাগলে তোমাদের পশমে আগুন ধরে যাবে। মনে নেই একবার জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরায় পা দিয়ে পা পুড়িয়ে ফেললে, মনে আছে?'

'আছে। আচ্ছা মা, তোমার এত বুদ্ধি কেন?'

'দূর বেটি! আমার বুদ্ধি নেই।'

'তোমার অনেক বুদ্ধি। তুমি লাফ দিয়ে ওই লোকটার কোলে বসলে—এই জন্যেই তো সে নাশতার প্লেট মেঝেতে ফেলে দিল। তার নাশতা এখন আমরা খাচ্ছি। আচ্ছা মা, তুমি রোজ এই রকম কর না কেন?'

'এ-রকম রোজ করা যায় না। পরপর দু'দিন করলেই এরা রাগ করবে। আমাদের বাড়ি থেকে বের করে দেবে। একদিন করেছি তো, সবাই ভাবছে অ্যাকসিডেন্ট।'

'অ্যাকসিডেন্ট কী মা?'

'অ্যাকসিডেন্ট হচ্ছে একটা ইংরেজি শব্দ। এর মানে দুর্ঘটনা।'

'তুমি ইংরেজিও জান?'

'অল্প-অল্প জানি, শুনে-শুনে শিখেছি। বাটার মানে মাখন, চীজ হল পনির, নরমাল ওয়াটার মানে পানি, তবে ফ্রীজের পানি না।...'

'ইস্ মা, তোমার যে কী বুদ্ধি!'

আফসার সাহেবের মাথা ঘুরছে। গা-হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। এ-সব কী? তাঁর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? এ-সব তো মাথা-খারাপের লক্ষণ। তিনি দ্রুত ভাবতে চেষ্টা করলেন তাঁর বংশে কোনো পাগল আছে কি না। মনে পড়ল না। তিনি তাকালেন বিড়ালগুলির দিকে।

ছোট বিড়ালটা বলল, 'মা—দেখ, লোকটা আমার দিকে তাকাচ্ছে।'

বিড়ালের মা বলল, 'লোকটা-লোকটা বলছ কেন? এইসব অসভ্যতা। আমরা উনার বাড়িতে থাকি। সম্মান করে কথা বলা উচিত।'

'কী বলব মা?'

'স্যার বল। স্যার বলাই ভালো। কিংবা ভদ্রলোক বলতে পার।'

'ভদ্রলোক বলা কি ঠিক মা? উনি একবার আমাদের বস্তায় ভরে ফেলে দিতে চেয়েছিলেন।'

'ফেলে তো দেয় নি।'

'উনার মেয়েগুলির জন্যে ফেলেন নি। মেয়েগুলি কাঁদতে লাগল। লোকটা ভালো না মা। খারাপ লোক। সবসময় বকাঝকা করে।'

'সারাদিন অফিস করে ক্লান্ত হয়ে আসে। বকাঝকা করবে না তো কি! এই সব ছোটখাটো দোষ ধরতে হয় না।'

'একবার তোমার গায়ে লাথি দিয়েছিল মা!'

'মনের ভুলে দিয়েছে। রোজ তো আর দেয় না।'

আফসার সাহেব আর সহ্য করতে পারলেন না। কী সর্বনাশ, এ-সব কী হচ্ছে! ক্লান্ত গলায় ডাকলেন, 'মীরা—মীরা। প্লীজ, তাড়াতাড়ি আস!'

মীরা ছুটে বের হয়ে এলেন। রুমী সুমীও এল। তারা অবাক হয়ে তাকাচ্ছে। কুদ্দুসও রান্নাঘর থেকে মাথা বের করেছে। মীরা বললেন, 'কী ব্যাপার?'

আফসার সাহেব কিছু বলতে পারলেন না। তিনি বিড়ালের কথা বুঝতে পারছেন, এই হাস্যকর কথা তাঁর পক্ষে বলা সম্ভব না। নিশ্চয়ই তাঁর শরীর খারাপ করেছে। মাথায় রক্ত উঠে গেছে কিংবা এই জাতীয় কিছু।

মীরা বললেন, 'তোমার মুখ এমন ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে কেন? শরীর খারাপ করেছে?'

'হুঁ। হঠাৎ মাথাটা ঘুরে উঠল।'

'নিশ্চয়ই প্রেশার। মহসিনকে খবর দেব? ও এসে তোমার প্রেশার মেপে দেবে।'

'কাউকে খবর দেবার দরকার নেই।'

'প্রেশার মাপলে ক্ষতি তো কিছু নেই। আর শোন, আজ অফিসে যাবারও দরকার নেই। প্রচুর ছুটি তোমার পাওনা। অতিরিক্ত কাজের চাপে তোমার এই অবস্থা হয়েছে। সুমী, যা তো, নিচে গিয়ে ড্রাইভারকে বলে আয় আজ তোর বাবা অফিসে যাবে না।'

মীরা তাঁকে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। জানালার পর্দা টেনে ঘর খানিকটা অন্ধকার করে দিলেন।

'তুমি চুপচাপ শুয়ে বিশ্রাম নাও। আমি মহসিনকে খবর দিচ্ছি। ও বিকেলে এসে তোমার প্রেশার মাপবে।'

আফসার সাহেব কিছু বললেন না। মহসিন এসে তাঁর প্রেশার মাপবে এই খবরও তাঁর ভালো লাগল না। মহসিন মীরার সবচেয়ে ছোট ভাই। কিছুদিন হল ডাক্তারি পাস করে বের হয়েছে। এমনিতে ছেলে খুব ভালো, তবে ঠাট্টা-তামাশা বড় বেশি করে। সহ্য করা যায় না।

'মীরা!'

'কি?'

'মহসিনকে খবর দেবার দরকার নেই।'

'আচ্ছা যাও, খবর দেব না।'

'তুমি একটু বস তো আমার পাশে।'

মীরা বসলেন। কপালে হাত দিয়ে স্বামীর গায়ের উত্তাপ দেখলেন। গা ঠাণ্ডা, জ্বর নেই। কিন্তু চোখ-মুখ যেন কেমন দেখাচ্ছে। যে-কোনো কারণেই হোক মানুষটা খুব ভয় পেয়েছে। গলার স্বরও জড়ানো।

'মীরা।'

'কী?'

আফসার সাহেব ইতস্তত করে বললেন, 'তুমি কি বিড়ালের কথা বুঝতে পার?'

মীরা হতভম্ব হয়ে বললেন, 'বিড়ালের কথা বুঝতে পারি মানে! এ-সব কী বলছ?'

আফসার সাহেব অত্যন্ত বিব্রত ভঙ্গিতে বললেন, 'আমার ধারণা বিড়াল মাঝে-মাঝে মানুষের মতো কথা বলে। মন দিয়ে শুনলে ওদের সব কথা বোঝা যায়।'

মীরা বিস্মিত হয়ে বললেন, 'তুমি ওদের কথা বুঝতে পারছ?'

'হ্যাঁ।'

'বুঝতে পারলে ভালো। এখন ঘুমুতে চেষ্টা কর।'

আফসার সাহেব চোখ বন্ধ করে শুয়ে রইলেন। রুমী সুমী স্কুলে গেল না। মাঝে-মাঝে পা টিপে-টিপে এসে বাবাকে দেখে গেল। সুমী বাবার কানে-কানে বলল, 'তোমার কী হয়েছে বাবা?' তিনি জবাব দিলেন না। তাঁর কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না।

মা-বিড়ালটা একবার এসে ঘুরে গেল। সে দুঃখিত গলায় তার বাচ্চাদের বলল, 'বেচারা আজ অফিসে গেল না কেন বুঝতে পারছি না। অসুখবিসুখ করল কি না কে জানে? চারদিকে ইনফ্লুয়েঞ্জা হচ্ছে।'

একটা বাচ্চা বলল, 'ইনফ্লুয়েঞ্জা কী মা?'

'একটা রোগের নাম। এইসব তুমি বুঝবে না। সবসময় প্রশ্ন করে বিরক্ত করবে না।'

'প্রশ্ন না করলে জানব কী করে?'

মা-বিড়াল বলল, 'এখন এ-ঘর থেকে চলে যাও। বেচারা ঘুমানর চেষ্টা করছে। তাকে ঘুমুতে দাও।'

'ইনফ্লুয়েঞ্জা কী, তা তো তুমি বললে না!'

'বললাম তো ইনফ্লুয়েঞ্জা একটা অসুখের নাম। তখন জ্বর হয়, মাথায় পানি ঢালতে হয়।'

'আমাদের কি ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়?'

'না, আমাদের হয় না।'

'আমাদের কী কী অসুখ হয় মা?'

'আহ্, চুপ কর তো! বেচারাকে কি তোমরা ঘুমুতে দেবে না?'

'আমাদের কী কী অসুখ হয় সেটা যদি তুমি আমাদের না-বল তাহলে আমরা শিখব কী করে?'

'বারান্দায় চল। বারান্দায় বলব।'

বিড়াল তার দু' বাচ্চাকে নিয়ে বের হয়ে গেল। বাচ্চা দু'টির যাবার তেমন আগ্রহ নেই। বারবার ফিরে তাকাচ্ছে।

আফসার সাহেব সারা দিন বিছানায় শুয়ে রইলেন। তাঁর বুক ধক্‌ধক্ করছে, মাথা ঘুরছে। এ কী সমস্যা! এ কী সমস্যা!

সন্ধ্যাবেলা তাঁর ছোট শ্যালক মহসিন এসে উপস্থিত। সঙ্গে প্রেশার মাপার যন্ত্র। মীরা বলেছিল তাকে খবর দেবে না। কিন্তু খবর দিয়েছে। মীরা কথা রাখে নি। আফসার সাহেব মহসিনকে সহ্যই করতে পারেন না, দেখামাত্র তাঁর মাথায় রক্ত উঠে যায়। আজও উঠে গেল। মহসিন দাঁত বের করে বলল, 'কেমন আছেন দুলাভাই?'

তিনি শুকনো গলায় বললেন, 'ভালো।'

'শুনলাম আজ অফিসে যান নি।'

'শরীরটা ভালো লাগছে না।'

'শুয়ে-শুয়ে কী করছেন?'

'কিছু করছি না।'

'বুবু বলছিলেন—আপনি নাকি এখন অ্যানিম্যাল ল্যাংগোয়েজে এক্সপার্ট হয়ে গেছেন—হা-হা-হা।'

আফসার সাহেবের ইচ্ছে করল ফাজিলটার গালে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিতে। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলালেন।

'বিড়ালের সব কথা নাকি বুঝে ফেলছেন?'

আফসার সাহেব চুপ করে রইলেন। মহসিন বলল, 'বিড়াল কোন ভাষায় কথা বলে দুলাভাই? সাধু না চলিত?'

'আমার শরীরটা ভালো লাগছে না—তুমি অন্য ঘরে যাও।'

'রাগ করছেন নাকি?'

'না, রাগ করছি না। তুমি আমাকে একটু একা থাকতে দাও।'

'আগে প্রেশারটা মাপি, তারপর যত ইচ্ছা একা থাকবেন।'

প্রেশার মাপা হল। দেখা গেল প্রেশার স্বাভাবিক। মহসিন বলল, 'আপনার সমস্যা কি জানেন দুলাভাই? আপনার সমস্যা হচ্ছে—গাম্ভীর্য। একটু সহজ হোন। স্বাভাবিকভাবে হাসি-তামাশায় জীবন পার করার চেষ্টা করুন। দেখবেন, বিড়ালের কথা আর শুনতে পাচ্ছেন না।'

'তুমি যাও তো এ-ঘর থেকে।'

'যাচ্ছি। কয়েকটা ঘুমের ট্যাবলেট দিয়ে যাচ্ছি। রাতে দু'টা খেয়ে ঘুমুবেন। আপনার ঘুম দরকার।'

আফসার সাহেব মীরার ওপর খুবই রাগ করলেন। মীরা কাজটি ঠিক করে নি। কেন সে এই ব্যাপারটা জানাচ্ছে? বিড়ালের কথা বুঝতে পারার পুরো ব্যাপারটা যে হাস্যকর তা কি তিনি বোঝেন না? খুব ভালো বোঝেন। তিনি জানেন, তাঁর কোনো সমস্যা হয়েছে....হয়তো মাথা গরম হয়ে আছে কিংবা কানে কোনো সমস্যা হয়েছে। এটা কি লোকজনকে বলে বেড়ানোর মতো ঘটনা? সবকিছু সবাইকে বলতে নেই, এই সাধারণ বুদ্ধি কি মীরার নেই?

দেখা গেল, সন্ধ্যা নাগাদ লোকজনে বাড়ি ভরে গেল। ঢাকার আত্মীয়স্বজনরা অনেকেই এসে গেছেন। সবার মুখে রহস্যময় হাসি। রাগে-দুঃখে আফসার সাহেবের চোখে পানি এসে গেল।

এমন অবস্থা হবে জানলে তিনি কিছুতেই মীরাকে ব্যাপারটা বলতেন না।

আফসার সাহেব সারারাত জেগে কাটালেন। এক ফোঁটা ঘুম হল না। তন্দ্রামতো আসে আর মনে হয় কী ভয়ংকর কাণ্ড ঘটে গেছে—তিনি বিড়ালের কথা বুঝতে পারছেন। তখনি ঘুম ভেঙে যায়। তিনি ধড়মড় করে উঠে বসেন। তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে মীরাও রাত জেগেই কাটালেন। মীরা একসময় বললেন, 'এত অস্থির হচ্ছ কেন? যদি বিড়ালের কথা বুঝতে পার—পারলে। এতে অসুবিধা তো কিছু হচ্ছে না।'

আফসার সাহেব বললেন, 'আমি যে বিড়ালের কথা বুঝতে পারি তা কি তুমি বিশ্বাস কর?'

মীরা বললেন, 'হ্যাঁ, করি।'

'না। তুমি বিশ্বাস কর না। আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বলছ।'

'তুমি ঘুমুবার চেষ্টা কর।'

'চেষ্টা করছি—লাভ হচ্ছে না। আমার এ কী সর্বনাশ হল বল তো?'

'কোনো সর্বনাশ হয় নি। দেখবে কাল ভোরেই সব ঠিক হয়ে গেছে।'

'কীভাবে ঠিক হবে?'

'আমি ব্যবস্থা করব।'

'কী ব্যবস্থা করবে?'

'ভোর হোক, তখন দেখবে।'

শেষরাতের ঠাণ্ডায়-ঠাণ্ডায় আফসার সাহেব ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুম ভাঙল সকাল দশটায়। বাসা খালি। বাচ্চারা স্কুলে চলে গেছে। মীরা নাশতা বানিয়ে অপেক্ষা করছেন। আফসার সাহেব হাত-মুখ ধুয়ে নাশতার টেবিলে বসলেন। আশেপাশে বিড়ালগুলিকে দেখতে পেলেন না। খানিকটা নিশ্চিন্ত বোধ করলেন। মীরা বললেন, 'আজ অফিসে গিয়ে লাভ নেই। রাতে ভালো ঘুম হয় নি। বাসায় থাক, রেস্ট নাও।'

'আরে না। পরপর দু' দিন কামাই দেওয়ার কোনো মানে হয় না। ভালো কথা—বিড়ালটা কোথায়?'

'জানি না। আছে নিশ্চয়ই কোথাও। বাদ দাও তো।'

আফসার সাহেব অফিসে চলে গেলেন। অফিসে নানান কাজে সময় কেটে গেল।

একটা মীটিং ছিল, মীটিং শেষ করে বাসায় ফিরতে-ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল।

বাসায় ফিরে স্বস্তি বোধ করলেন। বিড়াল নেই। তিনি কিছু জিজ্ঞেস করলেন না, তবে বুঝলেন—কুদ্দুস এদের বাসা থেকে তাড়িয়েছে। ভালোই করেছে। অনেক দিন পর আফসার সাহেব সুমী রুমীকে সঙ্গে নিয়ে টিভি দেখলেন। কি একটা ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান হচ্ছে। ভয়ংকর রোগা একটা লোক নানা ধরনের আবোল-তাবোল কথা বলে হাসাবার চেষ্টা করছে। আফসার সাহেবের ক্ষমতা থাকলে চড় দিয়ে বদমাশটার সব ক'টা দাঁত ফেলে দিতেন। ক্ষমতা নেই বলে কিছু করতে পারলেন না। রুমী বলল, 'লোকটা কি রকম মজা করতে পারে দেখলে বাবা? এমন হাসাতে পারে!'

তিনি হুঁ-জাতীয় শব্দ করলেন এবং ভাব করলেন যেন মজা পাচ্ছেন। রাতে দুই মেয়ে যখন স্কুলে কি-সব ঘটনা ঘটেছে বলতে শুরু করল, সে-সবও তিনি মন দিয়ে শোনার চেষ্টা করলেন। রাত দশটায় মহসিন টেলিফোন করল ঃ

'দুলাভাই, ভালো?'

'হ্যাঁ, ভালো।'

'বিড়ালের কথা নিশ্চয়ই আর শোনেন নি?'

'না।'

'ভেরি গুড। রাতে ঘুমুতে যাবার আগে ঘুমের ট্যাবলেট দু'টা মনে করে খাবেন।'

'আচ্ছা।'

'এই সঙ্গে আপনাকে একটা ছোট্ট অ্যাডভাইস দিচ্ছি। সবসময় এমন কঠিন ভাব করে থাকবেন না। রিল্যাক্স করুন। হাসুন, গল্প করুন। সবাইকে নিয়ে কোথাও বেড়াতে যান।'

'কোথায় যাব?'

'কক্সবাজার চলে যান। আসলে আপনার যা হয়েছে তা হল—নার্ভ উত্তেজিত হয়েছে। নার্ভ একসাইটেড হলে এ-সব হতে পারে। রাখি দুলাভাই?'

'আচ্ছা।'

রাত এগারটার দিকে হাত-মুখ ধুয়ে এক গ্লাস গরম দুধ খেয়ে আফসার সাহেব ঘুমুতে গেলেন। ঘুমের ট্যাবলেট খাবার ইচ্ছে ছিল না—এমনিতেই ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে, তবু দু'টা ট্যাবলেট খেলেন। ভালো ঘুম হল। একটানা ঘুম। ঘুম ভাঙল খুব ভোরে। তিনি শোবার ঘর থেকে বের হয়ে বারান্দায় এসে বেতের চেয়ারে বসলেন। রাতে ভালো ঘুম হওয়ায় শরীরটা ঝরঝরে লাগছে। বারান্দায় বসে সকাল হওয়া দেখতে তাঁর সবসময়ই ভালো লাগে। এক কাপ চা পেলে হত। চা বানানোর কেউ নেই। সবাই ঘুমুচ্ছে। তিনি নিজেই রান্নাঘরে ঢুকে গেলেন। চা বানানো এমন কোনো কঠিন কর্ম না। পানি গরম করতে পারলেই হল।

চায়ের কাপ হাতে আফসার সাহেব চেয়ারে এসে বসলেন। তখনই মা-বিড়ালটাকে দেখতে পেলেন। পিলারের আড়ালে চুপচাপ বসে আছে। বাচ্চা দু'টিও আছে। হ্যাঁ, তারা কথা বলছে। আফসার সাহেব তাদের প্রতিটি কথা বুঝতে পারছেন।

ছোট বিড়াল : 'মা দেখ, ভদ্রলোক চা খাচ্ছেন।'

মা : 'বললাম না চুপ থাকতে, কথা বলছিস কেন?'

ছোট বিড়াল : 'মা, উনাকে জিজ্ঞেস কর তো—কেন আমাদের বস্তায় ভরে

ফেলে দিয়ে এল?'

মা : 'আহ্! কী যে বোকার মতো কথা বলিস! মানুষ কি আমাদের কথা বোঝে? বুঝলে তো সব সমস্যার সমাধানই হত। মানুষ যদি একবার পশুদের কথা বুঝত তাহলে পশুদের আর কোনো দুঃখ থাকত না।'

ছোট বিড়াল : 'যদি আমাদের কথা বুঝতে পারত তাহলে আমি উনাকে কী বলতাম, জান?'

মা : 'কী বলতে?'

ছোট বিড়াল : 'বলতাম—কেন আপনারা আমাদের এমন কষ্ট দিলেন? সারা রাত হেঁটে-হেঁটে এসেছি। আমরা তো ছোট, আমাদের বুঝি কষ্ট হয় না?'

ছোট বিড়াল দু'টির একটি শুধু কথা বলছে। অন্যটি শুয়ে আছে। মা-বিড়ালটি একটু পরপর জিভ দিয়ে শুয়ে থাকা বাচ্চাটাকে চেটে দিচ্ছে। এই বিড়ালটা খুবই অসুস্থ। দীর্ঘ পথ হেঁটে এসে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। মা-বিড়াল তার কানে-কানে বলল—

মা বিড়াল : 'খুব খারাপ লাগছে মা?'

অসুস্থ বিড়াল : 'হ্যাঁ।'

মা : 'খিদে লেগেছে?'

অসুস্থ বিড়াল : 'হ্যাঁ।'

মা : 'আমার লক্ষ্মী সোনা। চুপ করে শুয়ে থাক। দেখি কিছু পাওয়া যায় কি না।'

অসুস্থ বিড়াল : 'মা, আমরা কি লুকিয়ে থাকব?'

মা : 'লুকিয়ে থাকাই ভালো। দেখতে পেলে ওরা হয়তো আবার আমাদের বস্তায় ভরে দূরে কোথাও ফেলে দিয়ে আসবে।'

অসুস্থ বিড়াল : 'মানুষরা এমন কেন?'

মা : 'পৃথিবীটা তো মা মানুষরাই দখল করে নিয়েছে। পৃথিবী এখন চলছে ওদের ইচ্ছামতো।'

অসুস্থ বিড়াল : 'পৃথিবী ওরা দখল করে নিয়েছে কেন মা?'

মা : 'ওদের বুদ্ধি বেশি।'

অসুস্থ বিড়াল : 'আমাদেরও তো মা বুদ্ধি বেশি। তোমার মতো বুদ্ধি তো কারোরই নেই।'

মা : 'আমাদের বুদ্ধি কোনো কাজে লাগে না রে মা। আর কথা বলিস না। তোর শরীর দুর্বল।'

অসুস্থ বিড়াল : 'মা, ঐ ভদ্রলোক কী খাচ্ছেন?'

মা : 'চা খাচ্ছেন।'

অসুস্থ বিড়াল : 'আমার একটু চা খেতে ইচ্ছা করছে মা।'

মা : 'ইচ্ছা করলেই তো খাওয়া যায় না সোনা।'

আফসার সাহেব উঠে পড়লেন। ফ্রীজ খুলে দুধ বের করলেন। বাটিতে দুধ ঢাললেন। কয়েক টুকরা পাউরুটি নিলেন। খানিকটা জেলিও পিরিচের এক কোণায় দিলেন। খবারগুলি পিলারের কাছে রাখলেন। চায়ের কপে সামান্য চা ছিল। একটা পিরিচে তা-

ও ঢেলে এগিয়ে দিলেন।

ছোট বিড়াল : 'মা, উনি এ-সব করছেন কেন?'

মা : 'বুঝতে পারছি না।'

ছোট বিড়াল : 'উনি কি আমাদের খেতে দিচ্ছেন?'

মা : 'তা-ই তো মনে হচ্ছে।'

ছোট বিড়াল : 'আমরা কি খাব?'

মা : 'একটু অপেক্ষা করে দেখি।'

ছোট বিড়াল : 'আমার ভয়ভয় লাগছে মা। আমার মনে হচ্ছে খেতে যাব, আর ওমনি উনি আমাদের ধরে বস্তায় ভরবেন।'

মা : 'অন্যের সম্পর্কে এত ছোট ধারণা করতে নেই মা। এতে মন ছোট হয়। উনি ভালবেসে খেতে দিয়েছেন। এস, আমরা খাই।'

তারা তিন জনই এগিয়ে গেল। ছোট বিড়াল দু'টি একসঙ্গে দুধের বাটিতে জিভ ভেজাতে লাগল। মা-বিড়াল বিরক্ত হয়ে বলল, 'তোমরা দেখি ভদ্রতা কিছুই শিখলে না। উনাকে ধন্যবাদ দেবে না? ধন্যবাদ দাও।' ছোট বিড়াল দু'টি একসঙ্গে বলল, 'ধন্যবাদ।'

'খাওয়া শেষ করে আর একবার ধন্যবাদ দেবে।'

'আচ্ছা।'

ছোটা বিড়ালটা বলল, 'পিরিচের গায়ে লাল রঙের এই জিনিসটা কী মা?'

'এর নাম জেলি, রুটি দিয়ে খায়। তোমাদের জেলি খাওয়া ঠিক হবে না।'

'কেন মা?'

'এতে দাঁত খারাপ হয়।'

এই পর্যায়ে মীরা শোবার ঘর থেকে বের হলেন। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। আফসার সাহেব থমথমে গলায় বললেন, 'তুমি কি বিড়ালগুলিকে বস্তায় ভরে ফেলে দিতে বলেছিলে?'

মীরা বললেন, 'তোমাকে কে বলল?'

'ফেলে দিতে বলেছিলে কি বল নি?'

'হ্যাঁ, বলেছিলাম।'

'খুব অন্যায় করেছ।'

'অন্যায় করব কেন? এর আগেও তো একবার বস্তায় ভরে বিড়াল ফেলা হয়েছে। সেবার তো তুমিই ফেলতে বলেছিলে। বল নি?'

'আর ফেলবে না।'

'এদেরকে কি তুমিই খাবার দিয়েছ?'

'হ্যাঁ।'

'এখনো কি তুমি এদের কথা বুঝতে পারছ?'

'পারছি।'

মীরা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। তাঁর মনে হল ব্যাপারটাকে আর অবহেলা করা ঠিক হবে না। কোনো-একজন ডাক্তারের কাছে তাঁকে নিতে হবে। কোনো বড়

মনোবিজ্ঞানী, যিনি ব্যাপারটা বুঝবেন।

নাশতার টেবিলে মীরা বললেন, 'আজ সন্ধ্যায় তোমাকে যদি কোনো ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে চাই, তুমি যাবে?'

'সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে?'

'হ্যাঁ।'

'সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে কেন যাব? তোমার কি ধারণা, আমি পাগল?'

'না, তুমি পাগল না। আবার ঠিক সুস্থও না। কোনো সুস্থ মানুষ কখনো বলবে না, সে বিড়ালের কথা বুঝতে পারছে।'

আফসার সাহেব কোনো উত্তর দিলেন না।

মীরা বললেন, 'তুমি অফিসে চলে যাও। ঘরে বসে-বসে বিড়ালের কথা শুনলে হবে না। এইসব নিয়ে একেবারেই চিন্তা করবে না। সন্ধ্যাবেলা আমরা একজন বড় ডাক্তারের কাছে যাব।'

'ঠিক আছে, যাব। কিন্তু বিড়ালগুলিকে তুমি তাড়াবে না। দুপুরে আলাদা করে খেতে দেবে। রাতেও খেতে দেবে। মনে থাকে যেন।'

'তোমার কি মনে হয় না, তুমি বাড়াবাড়ি করছ?''

আফসার সাহেব শীতল গলায় বললেন, 'না, আমি বাড়াবাড়ি করছি না।' বলেই মনে হল হয়তো তিনি ঠিক বলছেন না। কিছুটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। এখন তাঁর আচরণ নিশ্চয়ই সহজ-স্বাভাবিক মানুষের আচরণ নয়। অস্বাভাবিক একজন মানুষের আচরণ। তাঁকে যদি কেউ সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে যেতে চায়, তাহলে তাকে দোষ দেওয়া যাবে না। তিনি ক্লান্ত গলায় বললেন, 'মীরা, এ কী সমস্যায় পড়া গেল বল তো!'

মীরা বললেন, 'সব ঠিক হয়ে যাবে।'

আফসার সাহেব ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেললেন। তাঁর কেন জানি মনে হচ্ছে, কিছুই ঠিক হবে না। যতই দিন যাবে ততই সব এলোমেলো হয়ে যাবে।

২

পাগলের ডাক্তারদের চেহারায় না-হোক, চোখে খানিকটা পাগল-পাগল ভাব থাকে। তারা সহজভাবে আলাপ-আলোচনা করতে-করতে দুম করে কঠিন কোনো কথা বলে সরু চোখে রুগীর দিকে তাকিয়ে থাকে। কথাবার্তা বলতে হয় বিছানায় শুয়ে। একটা ছবি চোখের সামনে ধরে জিজ্ঞেস করে, 'ছবি দেখে আপনার মনে যা আসছে বলুন তো! কী দেখছেন ছবিতে?' পাগলের ডাক্তার বা সাইকিয়াট্রিস্ট সম্পর্কে আফসার সাহেবের এই ছিল ধারণা। তিনি এমন একজন লোকের সঙ্গে দেখা করবেন, এ-জাতীয় মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে ঘর থেকে বেরুলেন। যাঁর সঙ্গে দেখা হল তাকে দেখে মোটামুটি হতাশই হলেন। লুঙ্গি-পরা আধবুড়ো একজন লোক, যে দরজা খুলেছে খালি গায়ে এবং তাঁদের দেখেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে শার্ট খুঁজতে শুরু করেছে। আলনায় বেশ কয়েকটা শার্ট এক জায়গায় রাখা। একটা নিতে গিয়ে ভদ্রলোক সব ক'টা ফেলে দিলেন। যে-

শার্ট গায়ে দিলেন তার সবগুলি বোতাম সাদা রঙের, কিন্তু মাঝখানের একটা বোতাম কালো।

ভদ্রলোক বিব্রত গলায় বললেন, 'আসুন, আসুন। আপনাদের সাতটার সময় আসার কথা ছিল না?'

মীরা বললেন, 'একটু আগে এসে পড়েছি। বাসা খুঁজে পাব কি না বুঝতে পারছিলাম না, এই জন্যে সকাল-সকাল রওনা হয়েছিলাম। আগে এসে আপনাকে অসুবিধায় ফেলি নি তো?'

'জ্বি-না, কোনো অসুবিধা নেই। বসুন, আমি চায়ের ব্যবস্থা করি।'

ভদ্রলোক তাঁদের কিছু বলার সুযোগ না-দিয়ে ছোটো একটা কেতলি হাতে বের হয়ে গেলেন। পায়ে স্পঞ্জের স্যাণ্ডেল, পরনে লুঙ্গি। সেই লুঙ্গিও যে খুব ভদ্রভাবে পরা, তা নয়। মনে হচ্ছে যে-কোনো সময় কোমর থেকে খুলে আসবে।

আফসার সাহেব বললেন, 'এই তোমার সাইকিয়াট্রিস্ট?'

মীরা বললেন, 'হ্যাঁ। তাঁর পোশাক-আশাক দেখে বিভ্রান্ত হয়ো না। উনি বিখ্যাত ব্যক্তি। নাম বললেই চিনবে-উনি মিসির আলি।'

'মিসির আলি আবার কে?'

'মানসিক সমস্যার বিশ্লেষণের ব্যাপারে তাঁর মতো মানুষ এখনো জন্মায় নি। অতি বিখ্যাত ব্যক্তি।'

'অতি বিখ্যাত ব্যক্তির হাল তো দেখছি ফকিরের মতো। ঘরের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে—খেতে পান না।'

'উনি কখনো কারও কাছ থেকে কোনো টাকাপয়সা নেন না।'

'চলে কী করে?'

'আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্যারাসাইকোলজি পড়াতেন। এখন চাকরি চলে গেছে। শুনেছি টিউশনি করেন।'

আফসার সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, 'তুমি কিছু মনে করো না। যত বিখ্যাত ব্যক্তিই হোন, আমার কিন্তু তাঁর উপর বিন্দুমাত্র ভক্তি-শ্রদ্ধা হচ্ছে না।'

'ভক্তি-শ্রদ্ধার তো কোনো ব্যাপার নেই। তুমি তোমার সমস্যার কথা বলবে—ফুরিয়ে গেল।'

'আমি এই ভদ্রলোকের সঙ্গে কোনো কথাই বলব না। উনি চা আনতে গেছেন। চা এলে চা খাব। চলে যাব।'

'আচ্ছা, এখন বস।'

'কোথায় বসব? বসার জায়গা কোথায়?'

ঘরে বসার জায়গা আসলেই নেই। দু'টি চেয়ারের একটার ওপর কেরোসিন কুকার। অন্যটির ওপর গাদাখানিক বই। বিছানায় বসা যায়। তবে সেই বিছানায় চাদরের ওপর কি কারণে জানি খবরের কাগজ বিছানো। বসতে হলে খবরের কাগজের ওপর বসতে হয়।

আফসার সাহেব বিরক্ত মুখে খবরের কাগজের ওপর বসলেন। মীরা বসলেন স্বামীর পাশে। মিসির আলির নামের সঙ্গে মীরার পরিচয় আছে। মুখোমুখি এই প্রথম দেখলেন। মীরার ভাই মহসিন ঠিকানা দিয়েছে। এবং বলেছে—এই লোকের চেহারায়

বিভ্রান্ত না-হতে। মীরা নিজেও এখন খানিকটা বিভ্রান্ত বোধ করছেন। প্রফেশন্যাল কোনো সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যাওয়াই ভালো ছিল। অ্যামেচারদের ওপর খুব ভরসা করা যায় না।

মিসির আলি চায়ের কেতলি এবং তিনটা কাপ হাতে ঢুকলেন। কাপে চা ঢালতে-ঢালতে বললেন, 'আফসার সাহেব, আপনি কেমন আছেন?'

'ভালো। আমার নাম জানলেন কী করে?'

'আপনার শ্যালক মহসিন সাহেব, উনিই আপনার নাম বলেছেন। আপনার সমস্যা কি, তার আভাসও দিয়েছেন। এখন আপনি বলুন, সমস্যাটা আপনার মুখ থেকে শুনি।'

'ও যা বলেছে তাই। নতুন করে আমার কিছু বলার নেই।'

'আপনি কি কিছু বলতে চাচ্ছেন না?'

'জ্বি-না।'

'কেন বলুন তো?'

আফসার সাহেব উত্তর দিলেন না।

মিসির আলি হাসিমুখে বললেন, 'যে-কোনো কারণেই হোক, আপনি আমাকে পছন্দ করছেন না। সাইকিয়াট্রিস্ট হিসেবে আমি সম্ভবত আপনাকে ইমপ্রেস করতে পারি নি। এটা নতুন কিছু না। সবার ক্ষেত্রে ঘটে। তখন আমি কী করি জানেন? এমন কিছু করি, যাতে আমার ওপর বিশ্বাস ফিরে আসে। কারণ পুরোপুরি বিশ্বাস না-আসা পর্যন্ত আমি কোনো সাহায্য করতে পারি না। যেই মুহূর্তে আমার ওপর আপনার পরিপূর্ণ আস্থা আসবে, সেই মুহূর্ত থেকে আপনি আমার কথা মন দিয়ে শুনবেন। আমার যুক্তি গ্রহণ করবেন।'

আফসার সাহেব বললেন, 'তাহলে বিশ্বাস অর্জনের জন্য কিছু করুন।'

'পারছি না। সবসময় পারি না।'

আফসার সাহেব চায়ের কাপ নামিয়ে রাখতে-রাখতে বললেন, 'মীরা, চল যাই।'

মীরা দুঃখিত গলায় বললেন, 'তুমি ওঁকে কিছুই বলবে না?'

'না।'

'সমস্যাটা নিজের মুখে বলতে অসুবিধা কী?'

আফসার সাহেব কঠিন দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'চল যাই। আমার শরীর ভালো লাগছে না। বাসায় গিয়ে শুয়ে থাকব। তা ছাড়া আমার কোনো সমস্যাও নেই।'

মিসির আলি উঠে দাঁড়ালেন। সহজ গলায় বললেন, 'চলুন, আপনাদের রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি।'

'তার প্রয়োজন হবে না।'

'অনেক অপ্রয়োজনীয় কাজ আমি করি। আপনাদের জন্যে চা আনার কোনো প্রয়োজন ছিল না, তবু এনেছি। চা অনেক দূর থেকে আনতে হয়েছে। চা-টা যেন গরম থাকে এ-জন্যে ছুটতে-ছুটতে এসেছি। চা গরম ছিল না?'

আফসার সাহেব একটু বিব্রত বোধ করলেন। মীরা আবার বললেন, 'বস না। কিছু বলতে না-চাইলে বলবে না। দু' মিনিটের জন্যে বস।'

আফসার সাহেব বসলেন।

মিসির আলি বললেন, 'আমার ধারণা, অফিসে চাকরি সম্পর্কিত বড় রকমের সমস্যায় আপনি আছেন। সম্ভবত আপনার চাকরি চলে গেছে। এটা কি ঠিক?'

মীরা ভয়ংকরভাবে চমকে উঠলেন।

আফসার সাহেব চমকালেন না। স্থির দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ মিসির আলির দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'আপনি ঠিকই ধরেছেন। তবে চাকরি এখনো যায় নি। হয়তো শিগ্‌গিরই চলে যাবে। অফিসের মালিকপক্ষের সঙ্গে অনেক দিন থেকেই বনিবনা হচ্ছিল না। গত দু' মাসে তা চরম আকার নিয়েছে। এখন অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, হয় ওরা আমাকে ছাড়িয়ে দেবে, নয়তো আমিই রিজাইন করব।'

মীরা ক্ষীণ গলায় বললেন, 'এইসব কিছুই তো তুমি আমাকে বল নি!'

আফসার সাহেব বললেন, 'তোমাকে বলার সময় হয় নি বলেই বলি নি। সময় হলে নিশ্চয়ই বলতাম।'

'এত বড় একটা ব্যাপার তুমি গোপন করে রাখবে?'

'হ্যাঁ, রাখব।'

আফসার সাহেব পকেট থেকে সিগারেট বের করতে-করতে মিসির আলির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার এই ব্যাপার আপনি কী করে অনুমান করলেন?'

'খুব সহজেই অনুমান করেছি। কোনো মানসিক সমস্যা যখন হয় তখন তার পিছনে কিছু-না-কিছু কারণ থাকে। পারিবারিক অশান্তি, চাকরির ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা ইত্যাদি। একটা ছোটো বাচ্চা যখন পরিবারের কারো সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পায় না, যখন সে দেখে বাবা-মা সারাক্ষণ ঝগড়া করছেন—তখন সে কথা বলা শুরু করে টবের ফুলগাছের সঙ্গে। এমনভাবে কথা বলে, যেন ফুলগাছটা তার কথা শুনছে, কথার জবাব দিচ্ছে। আসলে এ-রকম কিছু ঘটছে না।'

'আপনার ধারণা আমি বিড়ালের কথা বুঝতে পারি না? আমি যা বলছি বানিয়ে-বানিয়ে বলছি?'

'না, আমি তেমন কিছু ধারণা করছি না। আপনি যা বলছেন তা-ই বিশ্বাস করছি। সেই বিশ্বাস থেকেই আমি এগোব।'

'এবং একসময় আপনি প্রমাণ করতে চেষ্টা করবেন যে আমি যা বলছি তা ভুল।'

'তা-ও না। আমি সত্য যা তা-ই প্রমাণ করতে চেষ্টা করব। আপনি সহজ হয়ে বসুন। সহজভাবে আমার কথার জবাব দিন। সত্য প্রতিষ্ঠায় আমাকে সাহায্য করুন। আমি আপনার ব্যাপারে খুবই আগ্রহ বোধ করছি।'

'কেন?'

'কারণ আপনি যা বলছেন, তা আগে কেউ বলে নি। কিছু-কিছু পীর- দরবেশের কথা আমরা বইপত্রে পাই, যাঁরা দাবি করতেন পশু-পাখির কথা বুঝতে পারেন, কিন্তু সেই দাবির পক্ষে তেমন কোনো প্রমাণ পাই না। একজন অতি বিখ্যাত ভারতীয় চিকিৎসকের কাহিনী আছে, যিনি গাছপালা থেকে অষুধ তৈরি করতেন। তাঁর সম্পর্কে প্রচলিত গল্প হচ্ছে—তিনি গাছের কথা বুঝতে পারতেন। তিনি পথ দিয়ে যখন হেঁটে যেতেন, গাছ তাঁকে ডেকে বলত—তুমি আমার পাতা ছিঁড়ে নিয়ে যাও। পাতার রস বের করে শ্বাসকষ্টের রুগীকে মধু মাখিয়ে খেতে দাও। রোগ আরোগ্য হবে। প্রাচীন ভারতের ঐ চিকিৎসকের নাম গল্পে আছে—মহাদেব একবার রাগে অন্ধ হয়ে ব্রহ্মার

মাথা কেটে ফেলেছিলেন। কোনো উপায় না দেখে পৃথিবী থেকে অশ্বিনীকুমারকে দেবলোকে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি সেই ছিন্ন মস্তক জোড়া লাগান।'

আফসার সাহেব বললেন, 'আমি কি একটা সিগারেট খেতে পারি?'

'অবশ্যই পারেন। ইচ্ছা করলে আমাকে একটা দিতেও পারেন।'

আফসার সাহেব সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন। তবে মিসির আলিকে সিগারেট দিলেন না। একজন সিগারেট চেয়েছে, তার পরেও তাকে দেওয়া হচ্ছে না। ব্যাপারটা দৃষ্টিকটু।

মিসির আলি বললেন, 'কী ব্যাপার, সিগারেট দেবেন না? কেড়ে নিতে হবে?'

আফসার সাহেব বললেন, 'সরি! এই নিন।' বলেই হেসে ফেললেন।

মীরা লক্ষ করলেন, আফসার সাহেব অনেকটা সহজ হয়ে এসেছেন। মুখের কাঠিন্য কমে গেছে। মীরা মিসির আলি নামের লোকটির প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করলেন। এই লোক আর কিছু পারুন না-পারুন, তাঁর স্বামীর প্রাথমিক কাঠিন্য ভেঙে দিয়েছেন। এটি কম কথা নয়। তা ছাড়া লোকটির কথা বলার ভঙ্গিও তাঁর ভালো লাগল। কথাবার্তায় কোনো সবজান্তা ভঙ্গি নেই। পা উঠিয়ে ছেলেমানুষের মতো বসে আছেন। কথা বলার সময় হাত নাড়ছেন। তাঁর সামনে রাখা চায়ের কাপে এক ফোঁটা চা-ও নেই। অনেক আগেই চায়ের শেষ বিন্দুটিও তিনি শেষ করেছেন। অথচ বেচারার সেটা খেয়াল নেই। খালি চায়ের কাপেই ক্রমাগত চুমুক দিচ্ছেন। মাঝে-মাঝে চুমুক দেবার আগে চায়ের কাপে ফুঁ দিচ্ছেন। ভাবটা এমন যে, গরম চা ফুঁ দিয়ে ঠাণ্ডা করে খেতে হচ্ছে।

মিসির আলি খাট থেকে নামতে-নামতে বললেন, 'আফসার সাহেব, আমি ছোট একটা ক্যাসেট প্লেয়ার জোগাড় করেছি। সেখানে বিড়ালের কথা টেপ করা আছে। আপনাকে তা শোনাব এবং আপনি বলবেন-বিড়াল কী বলছে। পারবেন না?'

'অবশ্যই পারব।'

'আজ শুধু এই পরীক্ষাটাই করব, তারপর অন্য পরীক্ষা অন্য সময়ে করা হবে।'

আফসার সাহেব বললেন, 'আমি টেপ শুনে যদি বলি বিড়াল এই কথা বলছে তাহলে তা আপনার বোঝার উপায় নেই আমি ভুল বলছি না সত্যি বলছি।'

'বোঝার উপায় আছে।'

'কী উপায়? আপনি নিশ্চয়ই বিড়ালের কথা বোঝেন না!'

'তা বুঝি না। তার পরেও উপায় আছে—আচ্ছা এখন মন দিয়ে শুনুন—'

টেপ খানিকক্ষণ বাজানো হল। একটা বিড়ালের ম্যাঁয়াও ম্যাঁয়াও শোনা যাচ্ছে। আফসার সাহেব তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয় তীক্ষ্ণ করে শুনলেন। টেপ বাজান শেষ হল। মিসির আলি বললেন, 'বলুন, বিড়ালটা কী বলল।'

'বুঝতে পারি নি।'

'কিছুই বুঝতে পারেন নি?'

'জ্বি-না।'

'ভালো কথা।—এখন অন্য একটা শুনুন। খুব মন দিয়ে শুনুন। একই বিড়ালের কথা।—ভিন্ন সময়ে ভিন্ন পরিস্থিতিতে।'

আফসার সাহেব শুনলেন। তাঁর মুখে হতাশার ভাব স্পষ্ট হয়ে উঠছে। কারণ

এবারও তিনি কিছু বুঝতে পারছেন না। কিছুই না । বিড়ালের সাধারণ ম্যাঁয়াও।

'কিছু বুঝলেন?'

'জ্বি–না।'

'কিছুই না?'

'না।'

'আরো একটি অংশ শোনাচ্ছি। দেখুন, এটা বুঝতে পারেন কি না। এবার অন্য বিড়াল, আগেরটা না।'

আফসার সাহেব হতাশ গলায় বললেন, 'আমার মনে হয় না কিছু বুঝতে পারব। এ–রকম হচ্ছে কেন কে জানে!'

'খুব মন দিয়ে শুনুন।'

'মন দিয়েই শুনছি।'

'আরো মন দিন। চোখ বন্ধ করে শুনুন।'

তিনি শুনলেন। কিছুই বুঝলেন না। মিসির আলি বললেন, 'তিনটি ভিন্ন পরিস্থিতিতে বিড়ালের কথা টেপ করা হয়েছে। প্রথম বার বিড়ালকে দুধ খেতে দিয়ে গায়ে–মাথায় হাত বোলান হয়েছে। সে যখন শব্দ করেছে তখন তা টেপ করা হল। দ্বিতীয় বার তাকে একটা সুচালো কাঠি দিয়ে খোঁচা দেওয়া হচ্ছিল। তৃতীয় বারে অন্য একটা বিড়ালকে ভয় দেখানো হচ্ছিল।'

আফসার সাহেব বিষণ্ন গলায় বললেন, 'আপনি নিশ্চয়ই আমার কথা পুরোপুরি অবিশ্বাস করছেন। ধরেই নিয়েছেন আমি মিথ্যা করে বলেছি—বিড়ালের কথা বুঝতে পারি।'

'আমি এত দ্রুত এবং এত সহজে কোনো সিদ্ধান্তে আসি না। আমি এখনো ধরে নিচ্ছি আপনি বিড়ালের সব কথা বুঝতে পারেন। এই মুহূর্তে হয়তো পারছেন না। আপনাকে আমি যা করতে বলব তা হচ্ছে, সহজ–স্বাভাবিক জীবন–যাপনের চেষ্টা করবেন। বিড়াল নিয়ে খুব বেশি ভাববেন না, আবার খুব কমও ভাববেন না। খাওয়াদাওয়া করবেন। নিয়মিত অফিসে যাবেন। অফিসের সমস্যা মেটাতে চেষ্টা করবেন। যদি না–মেটে তাতেও ক্ষতি নেই। সব পরিস্থিতিতে খাপ খাইয়ে চলার চেষ্টা আপনাকে করতে হবে।'

মীরা বললেন, 'ওকে নিয়ে বাইরে কোথাও বেড়াতে গেলে কেমন হয়? যেমন ধরুন, কক্সবাজারে কিছুদিন কাটিয়ে এলাম।'

মিসির আলি বললেন, 'আমি তার প্রয়োজন দেখছি না। সমস্যা থেকে দূরে সরে যাওয়া সমস্যা সমাধানের কোনো পথ নয়। সমস্যাকে মোকাবেলা করতে হয় সমস্যার ভেতরে থেকে।'

আফসার সাহেব বললেন, 'আমরা কি এখন উঠব?'

'জ্বি, নিশ্চয়ই উঠবেন। আর শুনুন আফসার সাহেব, আপনি এখন এক ধরনের ঘোরের মধ্যে আছেন। এই ঘোর–ঘোর ব্যাপারটা আমার ভালো লাগছে না।'

'আমি ঘোরের মধ্যে আছি, এটা কেন বলছেন?'

'এটা বলছি, কারণ আপনার চারপাশে কী ঘটছে তা আপনি দেখছেন না। তাকিয়ে আছেন, কিন্তু কিছুই আপনার চোখে পড়ছে না। আমি দীর্ঘ সময় ধরে একটা খালি

কাপে চুমুক দিচ্ছি। মাঝে-মাঝে এমন ভাব করছি যে গরম চা ফুঁ দিয়ে ঠাণ্ডা করে নিচ্ছি। ব্যাপারটা আপনার চোখেও পড়ে নি। অথচ আপনার স্ত্রী ঠিকই ধরেছেন। খালি কাপে চুমুক দেওয়ার ব্যাপারটা ছিল ইচ্ছাকৃত। আপনার বর্তমান মানসিক অবস্থা বোঝার জন্যে এটা করতে হয়েছে।'

এই প্রথম বারের মতো আফসার সাহেবের মনে হল—তাঁর সামনে বসে থাকা রোগা এবং মোটামুটি কুদর্শন মানুষটি অসম্ভব বুদ্ধিমান। এই মানুষটা খুব ঠাণ্ডা মাথায় পুরো পরিস্থিতি হাতের মুঠোয় নিয়ে নিতে পারে। এ-জাতীয় মানুষের সঙ্গে এর আগে তাঁর পরিচয় হয় নি। তিনি বললেন, 'উঠি মিসির আলি সাহেব?'

মিসির আলি বললেন, 'চলুন, আমিও আপনাদের সঙ্গে যাই—এগিয়ে দিয়ে আসি।'

'এগিয়ে দিতে হবে না।'

'আমি এমনিতেও বেরুব। বিসমিল্লাহ্ হোটেল বলে একটা রেস্টুরেন্ট আছে—আমি রাত ন'টায় সেখানে ভাত খেতে যাই।'

মীরা বললেন, 'আপনি কি একা থাকেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনাকে কি কিছু ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে পারি?'

মিসির আলি সহজ গলায় বললেন, 'না। বিখ্যাত মানুষদের লোকজন ব্যক্তিগত প্রশ্ন করে বিরক্ত করে। আমি বিখ্যাত কেউ নই। আমার ব্যক্তিগত জীবন এতই সাধারণ যে প্রশ্ন করার কিছুই নেই।'

আফসার সাহেব হঠাৎ করে প্রায় সবাইকে চমকে দিয়ে বললেন,—'আমাকে একটু সাহায্য করুন। প্লীজ। আমি জানি আপনি পারবেন।'

৩

আফসার সাহেব তিন দিন পর অফিসে এসেছেন। এই তিন দিনে অনেক কাগজপত্র তাঁর টেবিলে জমা থাকার কথা। তিনি টেবিলে কোনো কাগজপত্র দেখলেন না। এটাকে মোটামুটি অস্বাভাবিক ব্যাপার বলা যেতে পারে। তাঁর মনে একটা ক্ষীণ সন্দেহ হল। সেই সন্দেহ নিজের মনেই চেপে রাখলেন।

অফিসে তাঁর চেয়ারে বসার পরপর তিনি দুধ ছাড়া এককাপ চা খান। এই চা তাঁর বেয়ারা নাজিম বানিয়ে দেয়। পানি গরম করাই থাকে। তিনি অফিসে ঢোকামাত্র কাপে টী-ব্যাগ দিয়ে তাঁর কাছে নিয়ে আসা হয়।

অপ্রয়োজনীয় কোনো কথা তিনি নাজিমের সঙ্গে বলেন না। শুধু নাজিম কেন, কারো সঙ্গেই বলেন না। তাঁর মতে অফিস হচ্ছে কাজকর্মের জায়গা, গল্পগুজবের আখড়া না। আজ আফসার সাহেব নিয়মের ব্যতিক্রম করলেন। নাজিম চায়ের কাপ নামিয়ে রাখামাত্র হাসিমুখে বললেন, 'কেমন আছ নাজিম?'

নাজিম বিস্মিত হয়ে বলল, 'ভালো আছি, স্যার।'

'ভালো থাকলেই ভালো। তুমি থাক কোথায়?'

'পুরানা পল্টন।'

'বাসায় কে কে আছে?'

'স্ত্রী, দুই ছেলে, এক মেয়ে আর আমার মা।'

'তোমাদের বাসায় কোনো বিড়াল আছে নাকি?'

নাজিম এই প্রশ্নের কোনো মানে বুঝতে পারল না। তার বাসায় বিড়াল আছে কি না এটা স্যার কেন জিজ্ঞেস করলেন? আফসার সাহেব দ্বিতীয় বার প্রশ্নটি করলেন, 'কী, আছে বিড়াল?'

'জ্বি স্যার, একটা আছে।'

'কত বড়?'

নাজিম এই প্রশ্নেরও কোনো মানে বুঝল না। বিড়াল কত বড়—তার মানে আবার কী? বিড়াল তো বিড়ালের মতো বড়ই হবে। একটা বিড়াল তো আর বাঘের মতো বড় হবে না, কিংবা ইঁদুরের মতো ছোটও হবে না। নাজিম ক্ষীণ স্বরে বলল, 'বিড়ালের কথা জিজ্ঞাস করতেছেন কেন স্যার?'

আফসার সাহেব অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, 'এমনি জিজ্ঞেস করছি—বিড়াল সম্পর্কে একটা বই পড়ছিলাম তো। পড়তে-পড়তে হঠাৎ... আচ্ছা এখন যাও।'

বিড়াল সম্পর্কে তিনি যে বই পড়ছেন, এই ঘটনা সত্যি। তিনি ভেবে রেখেছিলেন বিড়াল বিষয়ে যেখানে যত বই পাবেন, পড়বেন। সমস্ত নিউ মার্কেট ঘেঁটে একটামাত্র বই পেয়েছেন। উইলিয়াম বেলফোর্ডের "ক্যাট ফ্যামিলি ঃ বিহেভিয়ারেল স্টাডিজ"। সে-বইয়ে বিড়াল সম্পর্কে বলতে গেলে কিছুই নেই। বাঘ, চিতাবাঘের কথায় পাতা ভর্তি। সুন্দর-সুন্দর রঙিন ছবি—আসল ব্যাপার কিছু নেই।

নাজিম এসে ঢুকল। ক্ষীণ গলায় বলল, 'স্যার।'

বই থেকে মুখ তুলে আফসার সাহেব বললেন, 'কি ব্যাপার?'

'বড় সাহেব আপনেরে সালাম দিছেন।'

বই বন্ধ করে আফসার সাহেব উঠে দাঁড়ালেন।

ডেল্টা শিপিং করপোরেশনের বড়সাহেবের নাম ইসহাক জোয়ারদার। ছোটখাটো মানুষ। মেজাজ অত্যন্ত খারাপ। আফসার সাহেবকে তিনি দু' চোখে দেখতে পারেন না। অবশ্যি কথায়-বার্তায় তা কখনো বুঝতে দেন না।

'স্যার, ডেকেছেন?'

ইসহাক সাহেব হাসিমুখে বললেন, 'গল্পগুজব করার জন্যে ডেকেছি। কেমন আছেন বলুন। শরীর ঠিক আছে?'

'জ্বি।'

'তিন দিন অফিসে আসেন নি, তাই ভাবলাম কোনো সমস্যা কি-না।'

'জ্বি-না স্যার, কোনো সমস্যা নেই।'

'আপনার এক আত্মীয়ের সঙ্গে পার্টিতে দেখা। তাঁকে আপনার ব্যাপারে খুব উদ্বিগ্ন মনে হল।'

'কেন?'

'বলছিল—আপনার মাথায় কোনো সমস্যা হয়েছে। আপনি নাকি বলে বেড়াচ্ছেন বিড়ালের কথা বুঝতে পারেন?'

আফসার সাহেব চুপ করে রইলেন। ভেবে পেলেন না ঘটনা এত দ্রুত ছড়াচ্ছে

কীভাবে? মনে হচ্ছে সপ্তাহখানেকের ভেতর ঢাকা শহরের সব লোক জেনে যাবে। পত্রিকার লোক আসবে ইন্টারভ্যু নেওয়ার জন্যে। বলা যায় না, টিভির কোনো ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানেও তাঁর ডাক পড়তে পারে। টিভি উপস্থাপক একটা বিড়াল নিয়ে স্টুডিওতে উপস্থিত হবেন। চিকন গলায় বলবেন—সুপ্রিয় দর্শকমণ্ডলী, এবার আপনাদের জন্যে রয়েছে এক বিশেষ ধরনের বিনোদনের ব্যবস্থা। আজ আমরা স্টুডিওতে এমন এক ব্যক্তিত্বকে এনেছি যিনি বিড়ালের কথা বুঝতে পারেন বলে দাবি করেন। সেই বিশেষ ব্যক্তিত্বকে হাততালি দিয়ে অভ্যর্থনা করবার জন্যে আপনাদের অনুরোধ করছি। তালি পড়ছে। হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছে......

আফসার সাহেবের চিন্তার সুতো ছিঁড়ে গেল। ইসহাক সাহেব বললেন—'বিড়ালের কথা বুঝতে পারেন বলে যা শুনছি তা কি সত্যি?'

'জ্বি স্যার, সত্যি।'

'আই সি, ভেরি ইন্টারেস্টিং। শুধু কি বিড়ালের কথাই বুঝতে পারেন, না কুকুর, গরু, গাধা, ভেড়া, ছাগল—সবার কথাই বুঝতে পারেন?'

'বিড়ালের ব্যাপারটা জানি। অন্যগুলি পরীক্ষা করে দেখি নি।'

'আপনি একটা কাজ করুন না কেন? খাতা এবং পেনসিল নিয়ে চিড়িয়াখানায় চলে যান। যে-সব প্রাণীর কথা আপনি বুঝতে পারেন তাদের নামের বিপরীতে একটা করে টিক চিহ্ন দিন। আমার ধারণা, বিড়ালের কথা যখন বুঝতে পারছেন অন্যদেরটাও ইনশাআল্লাহ্ পারবেন।'

আফসার সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, 'স্যার, আপনি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন?'

'সরি—তা একটু ঠাট্টা অবশ্যি করেছি। ক্ষমা করবেন। আমি যদি বলতাম বিড়ালের কথা বুঝতে পারছি, তাহলে আপনিও আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করতেন।'

'না, আমি করতাম না।'

'হয়তো-বা করতেন না। যাই হোক, আমি করে ফেলেছি। তার জন্যে ক্ষমা চাচ্ছি। আপনি এক কাজ করুন—অফিস থেকে দিন দশেকের ছুটি নিন।'

'আমার ছুটির প্রয়োজন নেই।'

'আমার মনে হয় প্রয়োজন আছে। আপনি ছুটি নিন। সাইকিয়াট্রিস্টকে দিয়ে ভালোমতো চিকিৎসা করান, নয়তো কিছুদিন পর বলা শুরু করবেন—আপনি পিঁপড়ার কথাও বুঝতে পারছেন। আমি ছুটির ব্যবস্থা করে রেখেছি। যদি চান আমি কয়েক জন সাইকিয়াট্রিস্টের ঠিকানাও আপনাকে দিতে পারি।'

'আমি স্যার তার কোনো প্রয়োজন বোধ করছি না।'

'আপনি হয়তো করছেন না, আমি করছি। আমি এমন কাউকে অফিসের গুরুত্বপূর্ণ কাজ দিতে পারি না, যে পশুদের কথা বুঝতে পারে। আমার এমন অফিসার দরকার, যে মানুষের কথা বুঝতে পারবে। আমি লক্ষ করেছি, আমাদের মধ্যে বেশির ভাগই মানুষের কথা বুঝতে পারি না।'

আফসার সাহেব উঠে দাঁড়ালেন।

ইসহাক সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, 'চলে যাচ্ছেন নাকি?'

'জ্বি, চলে যাচ্ছি। আপনার অত্যন্ত অপমানসূচক কথা শুনতে ইচ্ছা করছে না।'

'কি করবেন বলুন, আমি তো আর বিড়াল না। বিড়াল হলে হয়তো আমার কথাগুলি খুব অপমানসূচক মনে হত না।'

আফসার সাহেব নিজের ঘরে ঢুকলেন। অসহ্য রাগে শরীর কাঁপছে। রাগ সামলাতে কষ্ট হচ্ছে। রীতিমতো বমি এসে যাচ্ছে। এই মানুষটি তাঁকে এ-জাতীয় অপমান আগেও করেছে, ভবিষ্যতেও করবে। এত অপমানের ভেতর চাকরি করার কোনো মানে হয় না। কোনো মানে হয় না। তাঁর কিছু সঞ্চয় আছে। মিরপুরে জায়গা কিনে রেখেছেন। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে লাখ তিনেক টাকা পাওয়ার কথা। বয়স এমন কিছু হয় নি। চেষ্টাচরিত্র করলে আরেকটা চাকরি কি জোগাড় করতে পারবেন না? তিনি কাজ জানেন। জাহাজ চলাচল জাতীয় যে-কোনো প্রতিষ্ঠানে ভালো চাকরি পাওয়ার কথা।

তিনি পি. এ.-কে ডেকে রেজিগনেশন লেটার ডিকটেট করলেন। ড্রাফট দেখে দু'টা বানান ঠিক করলেন। চিঠি টাইপ করে আনতে পাঠালেন। পি. এ. সাধারণত কোনো কাজই দ্রুত করে না। এই কাজটা সে অত্যন্ত দ্রুত করল। তিনি চিঠিতে সই করলেন। সই করার পর তাঁর গায়ের জ্বালা খানিকটা কমল। মন শান্ত হল। নাজিমকে চা বানাতে বললেন। নাজিম চা বানিয়ে আনল।

'নাজিম!'

'জ্বি স্যার।'

'চাকরি ছেড়ে দিয়েছি নাজিম।'

'স্যার, শুনেছি।'

'কার কাছে শুনলে?'

'পি. এ. স্যার চিঠি টাইপ করছিলেন। সবাইকে বলেছেন।'

'ও, সবাই তাহলে জানে। ভালো, জানলেই ভালো।'

আফসার সাহেব বিস্মিত হলেন। সবাই জানে, অথচ কেউ এসে তাঁকে বলল না রেজিগনেশ্ন লেটার না-দেবার জন্যে! এরা কেউ কি তাঁকে পছন্দ করে না? মানুষ হিসেবে তিনি কি এই সামান্য সহানুভূতিটুকুও পেতে পারেন না? দীর্ঘ পনের বছর তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেছেন। কাজে ফাঁকি দেন নি। দশটায় অফিসে আসার কথা, দশটায় এসেছেন। পাঁচটা পর্যন্ত অফিস। কোনো দিন পাঁচটা বাজার দশ মিনিট আগে অফিস ছেড়ে যান নি।

'নাজিম!'

'জ্বি স্যার।'

'চা ভালো হয়েছে, তুমি এখন যাও।'

আফসার সাহেব রেজিগনেশন লেটার পি. এ.-র হাতে জমা দিয়ে অফিস ছেড়ে বের হলেন। তখনো দুপুরে-লাঞ্চের সময় হয় নি। তাঁর মনে ক্ষীণ আশা ছিল শেষ মুহূর্তে হয়তো সবাই এসে ভিড় করবে। তা-ও কেউ করল না।

তিনি দুপুরে কিছু খেলেন না। বাসায়ও ফিরে গেলেন না। দীর্ঘ সময় রাস্তায়-রাস্তায় হাঁটলেন। একসময় ক্লান্ত হয়ে পার্কে ঢুকলেন বিশ্রামের জন্যে। দীর্ঘ আট বছর পর পার্কে এলেন। ঢাকা শহরের পার্কগুলি যে এখনো এত সুন্দর আছে তা তিনি ভাবেন নি। পার্কে বসে থাকতে তাঁর ভালোই লাগল। কিছুক্ষণ আগে ভালো একটা

চাকরি ছেড়ে এসেছেন—এই নিয়ে তাঁর মনে কোনো অনুশোচনা বোধ হল না। বরং একধরনের শান্তি অনুভব করলেন। পার্কে বসেই ঠিক করলেন, আজ অন্য দিনের মতো সাড়ে পাঁচটায় বাসায় উপস্থিত হবেন না। নিয়মের ব্যতিক্রম করবেন। একটা ছবি দেখলে কেমন হয়? ছাত্রজীবনে প্রচুর সিনেমা দেখতেন। গত দশ বছরে একটাও দেখেন নি। সিনেমা হলে ঢুকে ছবি দেখতে কেমন লাগে কে জানে।

তিনি বাড়ি ফিরলেন রাত এগারটায়। শীতের দিনে রাত এগারটা মানে অনেক রাত। মীরা উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায় এতটুকু হয়ে গেছেন। চারদিকে খোঁজখবর করছেন। কেউ কিছু বলতে পারছে না। মীরা ভেবে রেখেছেন, সাড়ে এগারটা পর্যন্ত দেখবেন। তারপর হাসপাতালে-হাসপাতালে খোঁজ নেয়া শুরু করবেন।

আফসার সাহেবকে দেখে আনন্দে তাঁর চোখে প্রায় পানি এসে গেল। সুমী রুমী ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল বাবাকে। সুমী কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, 'কোথায় ছিলে বাবা?'

আফসার সাহেব হাসিমুখে বললেন, 'একটা ছবি দেখলাম।'

'কী দেখলে?'

'বলাকা সিনেমা হলে একটা সিনেমা দেখলাম।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ, সত্যি।'

'কী নাম ছবির?'

'ভাবির সংসার।'

'কী আছে ছবিতে?'

'মারামারি-কাটাকাটি, গান-বাজনা, নাচ—সবই আছে। কিছুই বাদ নেই।'

মীরা দীর্ঘ সময় স্বামীর দিকে তাকিয়ে থেকে নরম গলায় বললেন, 'হাত-মুখ ধুয়ে খেতে এস। তোমার জন্যে আমরা সবাই না-খেয়ে বসে আছি।'

খাবার টেবিলে বসেই আফসার সাহেব বললেন, 'বিড়ালকে খেতে দিয়েছ?'

মীরা শীতল গলায় বললেন, 'ঐ-সব নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না।'

'বিড়ালকে কি খাবার দিয়েছ?'

'হ্যাঁ।'

'ভালোমতো দিয়েছ?'

'হ্যাঁ, ভালোমতোই দেওয়া হয়েছে। তুমি ভাত খাও তো!'

'কেন জানি খেতে ইচ্ছা করছে না। এক গ্লাস দুধ দাও। দুধ খেয়ে শুয়ে পড়ি।'

'ভাত সত্যি খাবে না?'

'না।'

মীরা গ্লাসে করে দুধ নিয়ে এলেন। দুধের গ্লাস রাখতে-রাখতে ইংরেজিতে বললেন, 'শুনলাম তুমি নাকি চাকরি ছেড়ে দিয়েছ?'

'হ্যাঁ। কার কাছে শুনলে?'

'অফিস থেকে টেলিফোন করে জানিয়েছে।'

'ও।'

'এত বড় একটা সিদ্ধান্ত নেবার আগে আমাকে জিজ্ঞেস করারও প্রয়োজন মনে

করলে না?'

'জিজ্ঞেস করা তো অর্থহীন। সিদ্ধান্ত নেব আমি। এই সিদ্ধান্ত তুমি তো নিতে পারবে না।'

'সংসার চলবে কীভাবে?'

'অসুবিধা হবে না, চলবে।'

'এই বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। এখন তো আর আট হাজার টাকা বাড়ি ভাড়া পাবে না—দু'-কামরার একটা ঘুপচি ঘর নিতে হবে।'

'নেব। মানুষের দিন তো সব সময় সমান যায় না। এখন আমার দিন খারাপ যাচ্ছে।'

আফসার সাহেব দুধের গ্লাস হাতে উঠে দাঁড়ালেন। মীরা বললেন, 'কোথায় যাচ্ছ?'

'তোমরা খাওয়া শেষ কর। আমি বারান্দায় বসি।'

'আমাদের সঙ্গে বস না।'

'এখন বসতে ইচ্ছা করছে না। একটু একা-একা থাকি।'

বারান্দায় বসার কিছুক্ষণের মধ্যেই বিড়ালটাকে তার বাচ্চা দু'টি নিয়ে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। আফসার সাহেব কান পেতে রইলেন। হ্যাঁ, বুঝতে পারছেন। কথা বুঝতে তাঁর কোনোই অসুবিধা হচ্ছে না।

বাচ্চা বিড়াল : 'মা, স্যার আজ এত দেরি করে বাসায় এসেছেন কেন?'

মা : 'বুঝতে পারছি না। ভদ্রলোকের কোনো-একটা সমস্যা হয়েছে।'

বাচ্চা : 'কী সমস্যা?'

মা : 'তাঁর স্ত্রী টেলিফোনে কথাবার্তা যা বলছিলেন তাতে মনে হচ্ছে চাকরি নিয়ে সমস্যা। উনি বোধহয় চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। আমাদের সামনে ভয়াবহ বিপদ।'

বাচ্চা : 'বিপদ কেন?'

মা : 'চাকরি ছেড়ে দিলে তাঁদের টাকাপয়সার সমস্যা হবে। রাতদিন ঝগড়াঝাঁটি হবে। এখন তা-ও মাঝে-মাঝে খাবারটাবার দেয়—তখন তা-ও দেবে না।'

বাচ্চা : 'মা, আজ তো এখন পর্যন্ত আমাদের কোনো খাবার দিল না।'

মা : 'রাতের খাবার শেষ হোক, তখন দিলে দিতেও পারে।'

বাচ্চা : 'মা, তোমার কি মনে হয় দেবে?'

মা : 'বুঝতে পারছি না—দিতেও পারে।'

বাচ্চা : 'খুব খিদে লেগেছে মা।'

মা : 'একটা ইঁদুর মেরে খাওয়াতে পারি—খাবি?'

বাচ্চা : 'না, রান্না-করা খাবার খাব। মা, ওরা আজ কী রান্না করেছে?'

মা : 'সিম দিয়ে কৈ মাছ। মাছের সঙ্গে একটু সিম দিলে ভালো হয়—ভেজিটেবল একেবারেই খাওয়া হচ্ছে না।'

বাচ্চা : 'সিম দিলেও কিন্তু আমি খাব না মা।

মা : 'এমনিতেই খাওয়া পাওয়া যাচ্ছে না। তার ওপর যদি এই যন্ত্রণা তোমরা কর, তাহলে তো মুশকিল। সিম যদি দেয় তাহলে খেতে হবে। সিমে অনেক

ভিটামিন।'

বাচ্চা : 'ভিটামিন কী মা?'

মা, 'এইসব তোমরা বুঝবে না। ভিটামিন খুব প্রয়োজনীয় একটা জিনিস।'

আফসার সাহেব উঠে পড়লেন। খাবার ঘরে উঁকি দিলেন। বাচ্চাদের খাওয়া হয়ে গেছে। তারা হাত ধুচ্ছে। মীরার খাওয়া এখনো শেষ হয় নি। আফসার সাহেব বললেন, 'মীরা, তুমি তো আমাকে মিথ্যা কথা বলেছ।'

মীরা বললেন, 'কী মিথ্যা বললাম?'

'তুমি বলেছ বিড়ালদের খাবার দিয়েছ। আসলে দাও নি।'

'এটা এমন কোনো মিথ্যা না, যার জন্যে তুমি এমন কঠিনভাবে বাচ্চাদের সামনে আমার কাছে কৈফিয়ত তলব করবে।'

'আমাকে মিথ্যা কথা কেন বললে? কেন বললে, বিড়ালদের খাবার দেওয়া হয়েছে?'

'তুমি হঠাৎ করে যাতে আপসেট না-হও সে-জন্যেই সামান্য মিথ্যাটা বললাম। তোমার দুশ্চিন্তার কারণ নেই—এক্ষুণি খাবার দিচ্ছি। যদি চাও চেয়ার- টেবিলে দেব। কাঁটা চামচ দেব। সালাদও বানিয়ে দেব।'

আফসার সাহেব কঠিন কিছু বলতে গিয়েও বললেন না। মীরা বললেন, 'তুমি যে অসুস্থ হয়ে পড়ছ, তা কি তুমি বুঝতে পারছ? জীবনে কোনোদিন তুমি নিজের মেয়েদের খাবারের ব্যাপারে কোনো খোঁজ নাও নি—আজ ব্যস্ত হয়ে পড়েছ বিড়াল নিয়ে। অকারণে হৈচৈ করছ। তোমার স্বভাবচরিত্র বদলে যাচ্ছে। একা-একা সিনেমা দেখে ফিরলে। আমরা দুশ্চিন্তা করতে পারি—এটা একবারও তোমার মনে এল না।'

'সরি।'

'থাক, সরি বলতে হবে না।'

মীরার রাগ বেশিক্ষণ থাকল না। কিছুক্ষণ পরই নরম গলায় বললেন, 'কিছু মনে করো না। অনেক কড়া কথা বলে ফেলেছি। আমি দেখতে পাচ্ছি তুমি একধরনের সমস্যার ভেতর দিয়ে যাচ্ছ। তোমার সঙ্গে আরো শান্ত ব্যবহার করা উচিত ছিল, তা করি নি। আমি লজ্জিত। এস, ঘুমুতে এস। ভয় নেই, তোমার বিড়ালকে খেতে দিয়েছি। দুটো আস্ত কৈ মাছ দিয়েছি।'

আফসার সাহেব বললেন, 'সঙ্গে সিম দিয়েছ তো?'

'সিম?'

'হ্যাঁ, সিম। বিড়ালের বাচ্চা দুটো গ্রীন ভেজিটেবল একেবারেই খেতে চায় না। অথচ ওদের দরকার।'

মীরা অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে রইলেন। খানিকক্ষণ পর স্বামীর হাত ধরে বললেন, 'এস, ঘুমুতে এস।'

সেই রাতে আফসার সাহেব ভয়ংকর একটা দুঃস্বপ্ন দেখলেন। ঘুমের মধ্যেই বিকট চিৎকার করতে লাগলেন। মীরা তাঁর গা ঝাঁকাতে-ঝাঁকাতে ব্যাকুল হয়ে ডাকতে লাগলেন, 'কী হয়েছে? এ্যাই, এ্যাই, কী হয়েছে?' রুমী সুমীও ঘুম ভেঙে বাবার ঘরে ছুটে এল।

আফসার সাহেব চোখ মেলতেই মীরা কাঁদো-কাঁদো গলায় বললেন, 'কী স্বপ্ন দেখেছ? কী স্বপ্ন?'

আফসার সাহেব হতচকিত চোখে তাকাচ্ছেন। কিছু বলতে পারছেন না। তাঁর সারা গা ঘামে ভিজে গেছে। তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে।

মীরা বললেন, 'কী স্বপ্ন দেখলে?'

আফসার সাহেব বসে ক্ষীণ গলায় বললেন, 'পানি খাব। এক গ্লাস খুব ঠাণ্ডা পানি দিতে বল।'

সুমী পানি আনতে ছুটে গেল।

আফসার সাহেব তৃষ্ণার্তের মতো পানি পান করলেন। পানির গ্লাস এত উঁচু করে ধরলেন যে কিছু পানি গলা বেয়ে নেমে শার্ট ভিজে গেল। কুদ্দুস, যে থাকে ঘরের অন্য প্রান্তে, সেও উঠে এসেছে। ঘুমের মধ্যে আফসার সাহেব যে ভয়ংকর চিৎকার দিয়েছেন তা ঘরের শেষ পর্যন্ত গিয়েছে।

মীরা স্বামীর গায়ে হাত রেখে কোমল গলায় বললেন, 'কী স্বপ্ন দেখেছ?'

আফসার সাহেব ক্লান্ত গলায় বললেন, 'স্বপ্নে দেখেছি, আমি একটা বিড়াল হয়ে গেছি। বিড়াল হয়ে মাঠে ছোটাছুটি করছি। জ্যোৎস্না রাত—আবছাভাবে সবকিছু দেখা যাচ্ছে। আমি অসম্ভব ক্ষুধার্ত। আমি বসে আছি ইঁদুরের গর্তের কাছে। একসময় একটা ইঁদুর বের হল—আমি লাফ দিয়ে ইঁদুরের ওপর পড়লাম। ইঁদুরটাকে ছিঁড়ে টুকরা-টুকরা করলাম। আমার সমস্ত মুখে ইঁদুরের রক্ত লেগে গেল।'

মীরা নরম গলায় বললেন, 'স্বপ্ন হচ্ছে স্বপ্ন। স্বপ্ন নিয়ে মাথা ঘামানর কোনোই কারণ নেই। ভোর হোক, আমরা মিসির আলি সাহেবের কাছে যাব। ওঁকে সব বলব।'

'আমি কোথাও যাব না।'

'আচ্ছা বেশ, যেতে না-চাইলে যাবে না।'

'আমাকে আর এক গ্লাস পানি দাও।'

মীরা পানি নিয়ে এলেন। আফসার সাহেব ক্লান্ত গলায় বললেন, 'মীরা, দেখ আমার হাত দু'টায় ইঁদুরের গন্ধ। বিশ্রী পচা গন্ধ।'

'কী বলছ তুমি!'

'হ্যাঁ, সত্যি তাই। এই হাতে আমি ইঁদুর ধরেছি। গন্ধ তো হবেই—তুমি শুঁকে দেখ।'

'পাগলামি করো না তো। ঘুমুতে যাও। তুমি বলছ মনগড়া কথা। তুমি কি ইঁদুর কখনো শুঁকে দেখেছ যে, ইঁদুরের গন্ধ কেমন তা জান? আরাম করে ঘুমাও তো!'

আফসার সাহেব ঘুমুতে গেলেন না। বাথরুমে ঢুকে অনেকক্ষণ সাবান দিয়ে হাত ধুলেন। তাতেও তাঁর মন শান্ত হল না। শাওয়ার ছেড়ে দিয়ে দীর্ঘ সময় গোসল করলেন। যখন বেরিয়ে এলেন, তখন তাঁর চোখ লাল হয়ে আছে। গা ঈষৎ গরম। সম্ভবত জ্বর আসছে। তোয়ালে হাতে মীরা দাঁড়িয়ে আছেন। রুমী সুমীও আছে। তারা যথেষ্ট পরিমাণে ভয় পেয়েছে। তবে চুপ হয়ে আছে, কিছু বলছে না। আফসার সাহেব লক্ষ করলেন—খাবার টেবিলের নিচে দুটো বাচ্চা নিয়ে মা-বিড়ালটা বসে আছে। তারা কথা বলছে ফিসফিস করে। তবে তাদের ফিসফিসানি বুঝতে আফসার সাহেবের কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

বাচ্চা বিড়াল : 'মা, উনার কী হয়েছে?'

মা-বিড়াল : 'বুঝতে পারছি না।'

বাচ্চা : 'শীতের সময়, এত ভোরে কেউ গোসল করলে ঠাণ্ডা লাগবে না?'

মা-বিড়াল : 'তা তো লাগবেই। দেখছিস না, শীতে কেমন কাঁপছেন! ভদ্রলোকের কিছু-একটা সমস্যা হয়েছে। সমস্যাটা আমি বুঝতে পারছি না।'

বাচ্চা : 'বোঝার চেষ্টা কর না কেন মা? তোমার তো কত বুদ্ধি!'

মা-বিড়াল : 'বুঝে লাভ কিছু নেই। উনাকে সাহায্য করতে পারব না। আমরা হচ্ছি পশু। পশু কখনও মানুষকে সাহায্য করতে পারে না।'

বাচ্চা : 'ভদ্রলোক এত কষ্ট পাচ্ছেন, আমরা কিছুই করব না?'

মা-বিড়াল : 'প্রার্থনা করতে পারি।'

বাচ্চা : 'প্রার্থনা কী ?'

মা-বিড়াল : 'প্রার্থনা হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার কাছে কিছু চাওয়া।'

বাচ্চা : 'সৃষ্টিকর্তা কে মা?'

মা : 'যিনি আমাদের সবাইকে সৃষ্টি করেছেন।'

বাচ্চা : 'আমাদের সবাইকে কে সৃষ্টি করেছেন?'

মা : 'আহ্, চুপ কর তো! দিন-রাত এত প্রশ্নের জবাব দিতে ভালো লাগে না।'

আফসার সাহেব তোয়ালে দিয়ে গা জড়িয়ে শোবার ঘরে ঢুকলেন। মীরা বললেন, 'গরম এককাপ চা এনে দি?'

'দাও।'

মীরা চা বানিয়ে এনে দেখলেন, আফসার সাহেব আবার সাবান দিয়ে হাত ধুচ্ছেন। মীরাকে দেখে ফ্যাকাসেভাবে তাকালেন। ক্লান্ত গলায় বললেন, 'মীরা, আমি মনে হয় পাগল হয়ে যাচ্ছি।'

মিসির আলিকে আজ অনেক ভদ্র দেখাচ্ছে। আগের দিন খোঁচা-খোঁচা দাড়ি ছিল, আজ ক্লিন শেভ্ড্। ঘরও বেশ গোছানো। বিছানায় খবরের কাগজ ছড়ানো নেই। চেয়ারে বই গাদা করে রাখা হয় নি। কেরোসিন কুকারটিও অদৃশ্য। টেবিলে সুন্দর টেবিল-ল্যাম্প জ্বলছে। মিসির আলি চেয়ারে বসে টেবিল-ল্যাম্পের আলোয় গভীর মনযোগে পড়ছেন সরীসৃপ-বিষয়ক একটি বই। গত কিছুদিন ধরেই তিনি ক্রমাগত জীবজন্তু সম্পর্কিত বই পড়ে যাচ্ছেন। শুরু করেছিলেন বিড়াল দিয়ে, এখন চলে এসেছেন সরীসৃপে। পড়তে অদ্ভুত লাগছে। আগে তাঁর ধারণা ছিল সাপ ডিম দেয়। সেই ডিম থেকে বাচ্চা ফুটে বের হয়। এখন দেখা যাচ্ছে কিছু-কিছু সাপ ডিম দেয় না, সরাসরি বাচ্চা দেয়। চন্দ্রবোড়া এ-রকম একটা সাপ।

দরজায় শব্দ হচ্ছে। ভিক্ষার জন্যে ভিখিরি এসেছে। মিসির আলিকে দরজা খুলতে হল না। ষোল-সতের বছরের এক ছেলে ভেতর থেকে বের হয়ে দরজা খুলে দিল এবং কাটা-কাটা গলায় বলল-'কাম কইরা ভাত খান। বিনা কামে ভাত নাই।' এই ছেলেটির নাম মজনু। তাকে ঘরের কাজকর্মের জন্যে মাসে দেড় শ' টাকা বেতনে রাখা হয়েছে। এই বাড়িতে মজনুর আজ সপ্তম দিন। সপ্তম দিনে সে দেখিয়ে দিয়েছে যে সে কাজ জানে। শুধু যে জানে তা নয়—খুব ভালো জানে। মিসির আলিকে এখন আর

বিসমিল্লাহ্‌ হোটেলে ভাত খেতে যেতে হয় না। ঘরেই রান্না হয়। সেই রান্নাও অসাধারণ। খাওয়ার ব্যাপারটায় যে আনন্দ আছে তা তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। আজ দুপুরে মজনু পাবদা মাছের ঝোল রান্না করেছে টমেটো এবং মটরশুঁটি দিয়ে। সেই রান্না খেয়ে মিসির আলি মজনুর বেতন দেড় শ' টাকা থেকে বাড়িয়ে এক শ' পঁচাত্তর করে দিয়েছেন।

'মজনু।'

'জ্বি স্যার।'

'চা বানাও তো দেখি—'

মজনু গম্ভীর গলায় বলল, 'দুধ, লেবু, না আদা?'

'যা ইচ্ছা বানাও।'

'আপনার ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা লাগছে। আদা চা খান, শরীরের জন্যে ভালো।'

'দাও, আদা-চা দাও—'

মজনুর আদা-চা খেয়ে মিসির আলির মন ভালো হয়ে গেল। অসাধারণ ব্যাপার! চা যতটুকু গরম হওয়া দরকার ততটুকুই গরম। ঠাণ্ডাও না, বেশি গরমও না। আদার পরিমাণও যেন মাপা। ঝাঁজ আছে, আবার চায়ের স্বাদও নষ্ট হয় নি।

'মজনু।'

'জ্বি স্যার।'

'আগে কি কোনো হোটেলে কাজটাজ করতে?'

'জ্বে না—।'

'এত চমৎকার রান্নাবান্না শিখলে কীভাবে?'

মজনু জবাব না-দিয়ে ভেতরে চলে গেল। সে রাতের রান্না বসিয়েছে। দুপুরের খাবার সে রাতে দেয় না। রাতে আলাদা রান্না হয়। চায়ে চুমুক দিতে-দিতে মিসির আলি ভাবতে লাগলেন—মজনুর বেতন এক শ' পঁচাত্তর না করে পুরোপুরি দু' শ' করে দেওয়াই ভালো। যে-কোনোভাবেই হোক, এই ছেলেকে আটকে রাখতে হবে। তাঁর নিজের অর্থনৈতিক সমস্যার কিছুটা সমাধান হয়েছে। বিলেতে থাকাকালীন তিনি প্রফেসর রেইজেনবার্গের সঙ্গে যুগ্ম-সম্পাদনায় অ্যাবনর্ম্যাল বিহেভিয়ের ইন ফেজ ট্রানজিশন বইটি লিখেছিলেন। সেই বই এ-বৎসর কয়েকটা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়েছে। প্রকাশক ভালো টাকা দিচ্ছে। প্রথম দফায় তিনি পাঁচ হাজার ডলারের একটি চেক পেয়েছেন। সেই চেক ভাঙানো হয়েছে। মার্বেল স্টোনের অসম্ভব সুন্দর টেবিল-ল্যাম্প এবং একটি ডেকসেট ঐ টাকায় কেনা। মিসির আলি এখন রোজই কিছু-না-কিছু কিনছেন। জিনিসপত্র কেনার ভেতরে যে আনন্দ আছে, তাও তিনি জানতেন না।

আবার দরজার কড়া নড়ছে।

মিসির আলির মনে পড়ল সাড়ে চার শ' টাকায় তিনি একটা কলিং বেল কিনেছেন। বেলটা এখনো লাগানো হয় নি। মজনুকে পাঠিয়ে একজন ইলেকট্রিক মিস্ত্রি নিয়ে আসতে হবে। রান্না শেষ হলে ওকে পাঠাবেন।

মিসির আলি নিজেই দরজা খুললেন। মীরা এবং আফসার সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন। আফসার সাহেবের দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত। মনে হয় গত তিন-চার দিন দাড়ি কাটেন নি।

মুখভর্তি খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। শরীরও মনে হয় ভেঙে পড়েছে।

'আসুন, ভেতরে আসুন।'

দু' জন ঘরে ঢুকলেন। মীরা ক্ষীণ স্বরে বললেন, 'আপনাকে আবার বিরক্ত করতে এলাম।'

মিসির আলি বললেন, 'আপনাদের আরো আগেই আসা উচিত ছিল—আপনারা দেরি করে ফেলেছেন বলে মনে হচ্ছে। আফসার সাহেব, বসুন।'

আফসার সাহেব বসলেন।

মিসির আলি বললেন, 'আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে—আপনার সমস্যা মোটেই কমে নি—বরং বেড়েছে। আমি কি ঠিক বলছি?'

আফসার সাহেব কিছু বললেন না। মীরা বললেন, 'জ্বি, ঠিক বলছেন।'

'প্রাথমিকভাবে আপনার যা বলার আছে বলুন। তারপর আমি কিছু প্রশ্ন করব।'

আফসার সাহেব কিছুই বললেন না। পাথরের মতো মুখ করে বসে রইলেন। মীরা বললেন, 'গত দু' রাত ধরে সে ভয়ংকর স্বপ্ন দেখছে। ভয়াবহ স্বপ্ন।'

'কী রকম স্বপ্ন?'

'সে বিড়াল হয়ে গেছে। ধরে-ধরে ইঁদুর খাচ্ছে—এইসব স্বপ্ন।'

মিসির আলি হাসতে-হাসতে বললেন, 'আমার কাছে স্বপ্নটা খুব ভয়াবহ মনে হচ্ছে না। যদি উল্টোটা স্বপ্নে দেখতেন অর্থাৎ আপনি ইঁদুর এবং বিড়াল আপনাকে ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খাচ্ছে—তাহলে ভয়াবহ হত।'

আফসার সাহেব কঠিন গলায় বললেন, 'আমি যা দেখছি তা যথেষ্টই ভয়াবহ। আমার পরিস্থিতিতে আপনি নন বলেই বুঝতে পারছেন না।'

'আমি খুব ভালো বুঝতে পারছি। পরিবেশ হালকা করার জন্যেই হাসতে-হাসতে কথাগুলি বলেছি। সমস্যা যত বড় হবে, তাকে তত সহজভাবে গ্রহণ করা উচিত।'

'আপনি কি তা করেন?'

'হ্যাঁ, করি। একবার ভয়ংকর জটিল একটা সমস্যাকে হাসিমুখে গ্রহণ করেছিলাম—সেই গল্প অন্য এক সময় বলব—আজ আপনার সঙ্গে কথা বলি। আমি প্রশ্ন করছি, প্রশ্নগুলির জবাব দিন।'

'তারও আগে আমি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি—কেন আমি এ-রকম ভয়ংকর স্বপ্ন দেখছি?'

'মস্তিষ্ক নানান কারণে উত্তেজিত হয়ে আছে। একটা বিষয় নিয়ে ক্রমাগত ভাবছেন—তাই স্বপ্নে দেখছেন। জেলেদের স্ত্রীরা সব সময় স্বপ্নে দেখে তাদের স্বামীরা নৌকাডুবিতে মারা গেছে, কখনো স্বপ্নে দেখে না তারা মারা গেছে রোড অ্যাক্সিডেন্টে। আপনার ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটছে। ভালো কথা—ফ্রানৎস্ কাফকার মেটামরফোসিস গল্প কি আপনি পড়েছেন? গল্পে একটা মানুষ আস্তে-আস্তে কুৎসিত একটি পোকা হয়ে যায়।'

'না, আমি পড়ি নি। গল্প-উপন্যাস আমি খুব কম পড়ি।'

'আচ্ছা, এখন প্রশ্ন-উত্তর পর্বে চলে আসছি। আমি প্রশ্ন করার সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দেবেন। ভাবার জন্যে সময় নেবেন না। ভেবে উত্তর দেবেন এমন প্রশ্নও আমি করব না। বিড়ালের কথা এখনো বুঝতে পারছেন?'

'পারছি।

'আপনি কি এদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন?'

'না।'

'যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছেন?'

'হ্যাঁ। আমি একবার কথা বলার চেষ্টা করেছি।'

'বিড়াল বুঝতে পারে নি?'

'না।'

'কিন্তু বিড়াল তো আপনাদের কথা বুঝতে পারে। অন্তত তাদের কথাবার্তা থেকে নিশ্চয়ই তা বোঝা যায়।'

'হ্যাঁ, বোঝা যায়।'

'তাহলে আপনার কথা সে বুঝল না কেন?'

'জানি না।'

'আপনি নিজে কি বিশ্বাস করেন যে আপনি বিড়ালের কথা বুঝতে পারেন?'

'হ্যাঁ, বিশ্বাস করি।'

মিসির আলি সিগারেট ধরাতে-ধরাতে বললেন, 'না, আপনি বিশ্বাস করেন না। অন্য প্রশ্নগুলির জবাব আপনি সঙ্গে-সঙ্গে দিয়েছেন। এই প্রশ্নটির জবাব দিতে বেশ দেরি করেছেন। আপনি যদি পুরোপুরি বিশ্বাস করতেন যে বিড়ালের কথা আপনি বুঝতে পারেন, তাহলে আজ যে-মানসিক সমস্যা আপনার হচ্ছে সেই সমস্য হত না। আপনি একই সঙ্গে ব্যাপারটা বিশ্বাস করছেন এবং করছেন না। আমি কি ঠিক বলছি?'

'হ্যাঁ, ঠিক বলছেন। আমি বিড়ালের কথা বুঝি। তার পরেও আমার মনে সন্দেহ আছে।'

'কেন আছে?'

'বিড়াল এমন সব কথা বলে যা একটি বিড়াল বলবে বলে মনে হয় না।'

'উদাহরণ দিন।'

'যেমন ধরুন—মা-বিড়াল তার বাচ্চাদের জেলি খেতে নিষেধ করছে, কারণ জেলি খেলে দাঁত নষ্ট হবে। কিংবা সে বাচ্চাদের গ্রীন ভেজিটেবল খাওয়াতে চাচ্ছে-কারণ তাতে ভিটামিন আছে—।'

'এ ছাড়াও অন্য কোনো কারণ কি ঘটেছে, যার জন্যে আপনার মনে সন্দেহ হচ্ছে-বিড়ালের কথা আসলে বোঝা যায় না?'

'হ্যাঁ, এ-রকম ব্যাপারও ঘটেছে। আমি ইদানীং রাস্তায় প্রচুর হাঁটাহাঁটি করি। বেশ কয়েক বার বিড়ালের সঙ্গে দেখা হয়েছে। ওরা ম্যাঁও ম্যাঁও করেছে, কিন্তু ওদের কোনো কথা আমি বুঝতে পারি নি।'

মিসির আলি বললেন, 'আপনাদের যদি সময় থাকে আমার সঙ্গে একটা বাড়িতে চলুন। ওদের গোটা তিনেক বিড়াল আছে। আমি দেখতে চাই ওদের কথা আপনি বুঝতে পারেন কি না।'

মীরা বললেন, 'সেটা কি ঠিক হবে? তাঁরা কী না কী মনে করবেন—'

'তাঁরা কিছুই মনে করবেন না। আমরা কী জন্যে যাচ্ছি তাও তাঁদের বলা হবে না।'

আফসার সাহেব বললেন, 'আমার বাসায় চলুন। সেখানে তো বিড়াল আছে।'

'সেই বিড়ালের কথা যে আপনি বুঝতে পারেন তা তো বলেছেন, আমি নতুন বিড়াল নিয়ে পরীক্ষা করতে চাই। অবশ্যি অস্বস্তি বোধ করলে থাক।'

'না, অস্বস্তি বোধ করছি না। চলুন।'

মিসির আলি মজনুর কাছে বাড়ি বুঝিয়ে দিয়ে রওনা হলেন। মজনু ব্যাপারটা ঠিক পছন্দ করল না। বিরক্ত মুখে বলল, 'ফিরতে কি দেরি হইব?'

'হ্যাঁ, একটু দেরি হবে।'

'রান্না হইছে। ভাত খাইয়া যান।'

'না—ভাত এখন খাব না। তুমি একটা ইলেকট্রিক মিস্ত্রি ডেকে কলিং বেল লাগিয়ে নিও।'

মিসির আলি তাঁর পরিচিত ঐ ভদ্রলোকের বাসায় এক ঘন্টা কাটালেন। তাঁদের বিড়াল তিনটা না, দু'টা। একটি অতি বৃদ্ধ। নড়াচড়ার শক্তি নেই। অন্যটি টম ক্যাট। বেশ উগ্র স্বভাবের। এরা অনেক বারই ম্যাঁয়াও ম্যাঁয়াও করল। আফসার সাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিড়াল দু'টিকে দেখলেন। ওদের কথা শুনলেন, কিন্তু ওরা কি বলছে কিছুই বুঝলেন না।

বাড়ি থেকে বের হয়ে মিসির আলি বললেন, 'আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে বিড়ালগুলির কথা কিছুই বুঝতে পারেন নি। তাই না?'

'হ্যাঁ। আমি কিছুই বুঝি নি। কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন—আমি আমাদের বাসার বিড়ালটার কথা বুঝি। খুব ভালো বুঝি।'

মিসির আলি বললেন, 'আপনি নিজে কি ধরতে পারছেন—আপনার কথায় যুক্তি নেই? আপনি একটিমাত্র বিড়ালের কথা বুঝতে পারছেন, অন্য কোনো বিড়ালের কথা বুঝতে পারছেন না। তা কী করে হয়?'

'জানি না কী করে হয়। মিসির আলি সাহেব, আমি খুব কষ্টে আছি। আপনি আমার কষ্ট দূর করুন। এইভাবে কিছুদিন গেলে আমি পাগল হয়ে যাব। আমার ধারণা, ইতোমধ্যে খানিকটা পাগল হয়েছি।'

মিসির আলি বললেন, 'আমি আপনার ব্যাপারটা নিয়ে ক্রমাগত ভাবছি। আমি এখনো তেমন কিছু বুঝতে পারছি না। তবে মনে হচ্ছে বুঝতে পারব। রহস্য উদ্ধার হবে।'

'কি জন্যে মনে হচ্ছে রহস্য উদ্ধার হবে? তেমন কোনো কারণ কি ঘটেছে?'

'না, তেমন কোনো কারণ ঘটে নি। তার পরেও মনে হচ্ছে। আমার প্রায়ই এ-রকম হয়। একধরনের ইনট্যুশন কাজ করে।'

মিসির আলি হেঁটে-হেঁটে বাসায় ফিরলেন। বাসার সদর দরজা খোলা। মজনু কলিং বেলও লাগায় নি। মিসির আলি ঘরে ঢুকে বড় ধরনের চমক খেলেন—তাঁর ঘর খালি। মজনু সবকিছু নিয়ে ভেগে গেছে। ডলার ভাঙিয়ে সাত হাজার টাকা রেখেছিলেন ফটো অ্যালবামের ভেতর—সেই অ্যালবামও নেই। এত ভারি যে মিউজিক সেন্টার—তা-ও নেই। টেবিল-ল্যাম্প, কলিং বেল—তা-ও নেই। শীতবস্ত্রের মধ্যে তাঁর একটা ভালো শাল ছিল—সেটিও নিয়ে গিয়েছে।

তবে রান্না করে গেছে। টেবিলে সুন্দর করে খাবারদাবার সাজিয়ে রাখা। পানির গ্লাস, একটা পিরিচে লবণ, কাঁচামরিচ এবং কাটা শসা। রান্না হয়েছে কৈ মাছের দোপিঁয়াজী, একটা ভাজা এবং ডাল।

মিসির আলি হাত ধুয়ে খেতে বসে গেলেন। প্রতিটি আইটেম অসাধারণ হয়েছে। খেতে-খেতেই মনে হল অতি ভদ্র, নিপুণ রাঁধুনি এই ছেলেটির সন্ধান বের করা খুব কঠিন না। এই ছেলে কোনো বিদেশির বাড়িতে আগে কাজ করত। কথাবার্তায় প্রচুর ইংরেজি শব্দ—তা-ই বলে দেয়। ইংরেজি শব্দগুলি খাবারদাবার-সংক্রান্ত। কাজেই ধরে নেয়া যায় সে বাবুর্চি ছিল। চুরির দায়ে তার চাকরি চলে যায়—কিংবা পুলিশ হয়তো তাকে খুঁজছে। সে সাময়িক আশ্রয় নিতে এসেছিল তাঁর কাছে। ছেলেটি যে-বাড়িতে কাজ করত, সেই বাড়ি গুলশান এলাকায়। কারণ কথাবার্তায় সে গুলশান মার্কেটের কথা প্রায়ই বলত। সে বলছিল একটা প্রেশার কুকার হলে অনেক রকম রান্না সে রাঁধতে পারবে। গুলশান মার্কেটে প্রেশার কুকার পাওয়া যায়।

মজনু এত সব ভারি জিনিস নিজের কাছে রাখবে না। যেহেতু বুদ্ধিমান সে, চেষ্টা করবে অতি দ্রুত জিনিসগুলি বিক্রি করে দিতে।

কোথায় বিক্রি করবে? তার পরিচিত জায়গায়। অবশ্যই গুলশান মার্কেটে। কাজেই এখন একটা বেবিট্যাক্সি নিয়ে তিনি যদি গুলশান মার্কেটে চলে যান তাহলে মজনুকে পাওয়া যাবে।

মিসির আলি খাওয়া শেষ করে হাত ধুয়ে বিছানায় এসে বসলেন। বিস্মিত হয়ে দেখলেন তাঁর বালিশের কাছে একটা পিরিচে দু' খিলি পান, একটা সিগারেট এবং ম্যাচ রাখা। তিনি পান মুখে দিয়ে সিগারেট ধরালেন এবং মজনুকে ক্ষমা করে দিলেন। এবং তার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁর কাছে মনে হল তিনি আফসার সাহেবের রহস্যভেদের কাছাকাছি চলে গেছেন। কিছু জিনিস এখনো জট পাকানো আছে। তবে তা হয়তো-বা খুলে ফেলা যাবে। কয়েকটা ছোটখাটো ব্যাপার পরীক্ষা করে দেখতে হবে। আরো কয়েকটা দিন লাগবে।

বিছানায় শুয়ে-শুয়ে গান শুনতে ইচ্ছা করছে। মিউজিক সেন্টারটা খুব শখ করে কিনেছিলেন। একটা গানও শোনা হল না। মন-খারাপ লাগছে। মন-খারাপ ভাব কাটানোর জন্যেই আবার সরীসৃপের বইটা হাতে নিলেন।

ভয়ংকর বিষধর এবং একই সঙ্গে অপরূপ সুন্দর সাপের নাম ল্যাকেসিস মিউটা। এই ল্যাটিন নামের বঙ্গানুবাদ হল—নিঃশব্দ নিয়তি। বাহ্, কী সুন্দর নাম! মানুষ যেমন এসেছে বাঁদর থেকে, পাখিরা এসেছে সরীসৃপ থেকে। পাখিদের আদি পিতা-মাতা হচ্ছে সরীসৃপ—ভাবতেও যেন কেমন লাগে।

মিসির আলি বইয়ের পাতা উল্টে যাচ্ছেন। তাঁর মন-খারাপ ভাব কেটে যাচ্ছে। গান শুনতে ইচ্ছা করছে। গানের কথা মনে পড়তেই আবার খানিকটা মন-খারাপ হল। পূর্বা দামের একটা লং প্লেয়িং রেকর্ড কিনে এনেছিলেন। রেকর্ডটা পড়ে আছে। শোনা হয় নি। এই মুহূর্তে তাঁর শুনতে ইচ্ছা করছে-'আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে'। পূর্বা দাম এই গানটি কেমন গেয়েছেন কে জানে!

৪

আফসার সাহেব গত দু' দিন ধরে নিজের ঘর থেকে বের হচ্ছেন না। ঘরের সব ক'টা জানালা বন্ধ, পর্দা ফেলা। দিনের বেলাতেও ঘর অন্ধকার হয়ে আছে। তিনি খাবার খেতে খাবার টেবিলেও যাচ্ছেন না। খাবার নিয়ে মীরা তাঁর ঘরে যাচ্ছেন। আফসার সাহেব ঠিকমতো খাচ্ছেনও না। অল্প কিছু মুখে দিয়েই বলছেন, 'খিদে নেই'। মীরা বিরাট বিপদে পড়েছেন। কি করবেন বুঝতে পারছেন না। বাচ্চাসহ বিড়ালটাকে বস্তায় ভরে আবার ফেলে দিয়ে আসা হয়েছে। এবার কাছে কোথাও নয়, গাড়ি করে একেবারে জয়দেবপুরে।

মীরা অবশ্যি আফসার সাহেবকে বলেছেন—বিড়ালগুলিকে বাসার বাইরে রাখা হয়েছে। মীরা ভেবেছিলেন এটা শুনে আফসার সাহেব রেগে যেতে পারেন। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার—রাগেন নি। বরং এই প্রসঙ্গে কোনো কথাও বলেন নি। মনে হচ্ছে বস্তায় ভরে ফেলে দিয়ে আসার ব্যাপারটা তিনিও আন্দাজ করছেন।

আত্মীয়স্বজনরা ক্রমাগত আসছে। কেউ-কেউ দিনের মধ্যে দু' বার তিন বার আসছে। মীরার বেশির ভাগ সময় এবং শক্তি ব্যয় হচ্ছে যেন তারা আফসার সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে না-পারেন। আত্মীয়স্বজনরা খুব বিরক্ত হচ্ছেন। কেউ-কেউ রাগও করছেন। আফসার সাহেবের এক মামা কঠিন গলায় মীরাকে বললেন, 'তুমি ওকে লুকিয়ে রাখলে তো লাভ হবে না। ওর চিকিৎসা হওয়া প্রয়োজন।'

মীরা বললেন, 'চিকিৎসা হচ্ছে। আপনি তো চিকিৎসক না। আপনি যাবেন—ঐ সব কথা মনে করিয়ে দেবেন। আমি চাই না সে বিড়াল নিয়ে ভাবুক।'

'আমি বিড়াল নিয়েই যে কথা বলব, তা তোমাকে কে বলল?'

'আপনি কী নিয়ে কথা বলবেন?'

'কথা বলার বিষয়ের কি অভাব আছে? আমি পলিটিক্স নিয়ে কথা বলব। বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাস নিয়ে কথা বলব। এতে ওর উপকার হবে। পুরো ব্যাপারটা ভুলে থাকতে পারবে। ঘরে তালাবন্ধ করে রাখা তো কোনো সমাধান না।'

মীরা তাঁকে ঘরে ঢুকতে দিয়েছেন। তিনি চেয়ারে বসতে-বসতে প্রথম যে কথাটা বললেন তা হচ্ছে—'আচ্ছা বাবা, বিড়ালের সঙ্গে কী কী কথা তোমার হয়েছে গুছিয়ে বল। কোনো কিছু বাদ দেবে না। দরকার আছে।'

শুধু যে আত্মীয়রা আসছে তা নয়—আত্মীয়দের আত্মীয়, তাদের আত্মীয়। মুখচেনা মানুষ, পাড়ার মানুষ। পাড়ার মানুষদের পরিচিত মানুষ। টেলিফোন সারাক্ষণই বাজছে। মীরা টেলিফোন ধরেন—এমন সব কথাবার্তা তিনি শোনেন যে তাঁর চোখে সত্যি পানি এসে যায়।

পত্রিকার অফিস থেকেও টেলিফোন এল। সাপ্তাহিক চক্রবাকের প্রতিবেদক টেলিফোন করেছেন। মীরা টেলিফোন ধরলেন।

'আপনি কি আফসার সাহেবের স্ত্রী?'

'জ্বি।'

'আমি সাপ্তাহিক চক্রবাক থেকে বলছি।'

'কি ব্যাপার, বলুন।'

'আমরা খবর পেয়েছি আপনাদের বাড়িতে একজন মানুষ বিড়ালে রূপান্তরিত হয়েছেন। তাঁর সারা গায়ে সাদা-সাদা লোম বেরিয়েছে। লেজ গজিয়ে গেছে। কথাটা কি সত্যি?'

'আপনার কি ধারণা এ-রকম খবর সত্যি হতে পারে?'

'জগতে অনেক অদ্ভুত-অদ্ভুত ঘটনা তো ঘটে।'

'ঘটলেও আমাদের এখানে ঘটে নি।'

'যদি না-ঘটে তাহলে এ-রকম একটা গুজব কী করে রটল?'

'আমি জানি না কী করে রটল।'

'আচ্ছা ঠিক আছে—আমি ক্যামেরাম্যান নিয়ে আসছি—আপনার এবং যার সম্পর্কে এই গুজব রটেছে তার একটা ইন্টারভ্যু নিতে চাই।'

'কেন?'

'গুজবের উপর একটা নিউজ করব।'

মীরা টেলিফোন নামিয়ে রেখে খানিকক্ষণ কাঁদলেন। সবচেয়ে ভালো হত এই বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও আশ্রয় নেওয়া—তা সম্ভব হচ্ছে না। আফসার সাহেব বাড়ি ছেড়ে কোথাও যেতে রাজি নন। তাঁকে এখান থেকে সরাতে হলে জোর করে সরাতে হবে।

মীরার ডাক্তার ভাই সার্বক্ষণিকভাবেই এ-বাড়িতে আছে। সে আফসার সাহেবের সঙ্গে বেশ ক' বার কথা বলার চেষ্টা করেছে। কোনো লাভ হয় নি।

আফসার সাহেব কড়া চোখে তাকিয়েছেন—কোনো জবাব দেন নি। মীরার কথাবার্তার জবাব দেওয়াও তিনি ইদানীং বন্ধ করে দিয়েছেন। শুধু রুমী সুমী কিছু জিজ্ঞেস করলে জবাব দেন।

রুমী বাবার ঘরের দরজায় টোকা দিয়ে বলল, 'বাবা, আসব?'

আফসার সাহেব বললেন, 'আয়।'

রুমী ভয়ে-ভয়ে ভেতরে ঢুকল।

'কেমন আছ বাবা?'

'ভালো আছি।'

'তোমাকে এমন বিশ্রী দেখাচ্ছে কেন?'

'দাড়ি-গোঁফ কামাচ্ছি না, কাজেই বিশ্রী দেখাচ্ছে।'

'কামাচ্ছ না কেন বাবা?'

'ইচ্ছা করছে না।'

'কেন ইচ্ছা করছে না?'

'জানি না। সব কেমন এলোমেলো হয়ে গেছে।'

'বাবা, আমি কি তোমার পাশে বসব?'

'বস।'

রুমী ভয়ে-ভয়ে বসল। বাবার হাতের ওপর হাত রাখল।

'বাবা।'

'কী মা?'

'সবাই বলছে তুমি নাকি বিড়াল হয়ে গেছ। তুমি কি বিড়াল হয়েছ?'

'না মা।'

'তাহলে সবাই এ-রকম মিথ্যা কথা বলছে কেন?'

'তা তো জানি না।'

'তোমার চোখ লাল কেন?'

'ঘুম হচ্ছে না। এর জন্যে চোখ লাল।' -

'ঘুম হচ্ছে না কেন বাবা?'

'ঘুমুলেই দুঃস্বপ্ন দেখি—এই জন্যে ঘুমুতে ইচ্ছা করে না। ঘুম আসেও না।'

'তুমি কি পাগল হয়ে গেছ?'

'এখনো হই নি, তবে খুব শিগ্‌গিরই হয়ে যাব বলে মনে হচ্ছে।'

'না, হবে না। মামা তোমার জন্যে খুব বড়-বড় ডাক্তার এনেছেন। তাঁরা তোমার চিকিৎসা করবেন।'

'চিকিৎসা করে আমার কিছুই করতে পারবে না। কারণ আমার কোনো অসুখ হয় নি।'

'তুমি কি আপনা-আপনি সেরে উঠবে?'

'তা-ও তো মা জানি না।'

মহসিন বেশ ক' জন ডাক্তার এনেছে। ডাক্তারা নানানভাবে আফসার সাহেবকে পরীক্ষা করেছেন। তেমন কিছুই পান নি। প্রেশার স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি। সেটা তেমন কিছু না। আচার-আচরণেও তেমন কোনো অস্বাভাবিকতা নেই। ঘুম খুব কম হলে রিফ্লেক্স অ্যাকশান শ্লথ হয়ে যায়—তা হয়েছে। এর বেশি কিছু না। ডাক্তারদের সবারই ধারণা, ভালোমতো রেস্ট হলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

মহসিন মীরাকে বলল, 'যে করে হোক এই বাড়ি থেকে দুলাভাইকে বের করতে হবে। এখানে থাকলে তাঁর রেস্ট হবে না। মাছির মতো লোকজন ভন- ভন করছে।'

মীরা বললেন, 'আমি বললে কিছু হবে না। আমি অনেক বলেছি।'

'মুখে বললে যদি না-হয়, তাঁকে জোর করে উঠিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বাড়ির আবহাওয়া যা, তাতে যে-কোনো সুস্থ লোকও পাগল হয়ে যাবে।'

মহসিন খুব ভুল বলে নি। বাড়ির সামনে একদল দুষ্ট ছেলে জটলা পাকাচ্ছে। তারা মাঝে-মাঝে বিড়ালের মতো ম্যাঁয়াও-ম্যাঁয়াও করে চিৎকার করছে। মানুষ মাঝে-মাঝে খুব হৃদয়হীনের মতো আচরণ করে।

মহসিন বলল, 'আপা, তুমি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সব গুছিয়ে রাখ। আমি রাত দশটার পর মাইক্রোবাস নিয়ে আসব। এর মধ্যে একটা ফ্ল্যাট-বাড়ি ঠিক করে রাখব। তোমাদের সেখানে নিয়ে তুলব। আমি ছাড়া দ্বিতীয় কেউ জানবে না তোমরা কোথায় আছ। আমি আমার স্ত্রীকে পর্যন্ত বলব না।'

'কিন্তু তোর দুলাভাই? সে তো যেতে রাজি হবে না।'

'আমি রাজি করাচ্ছি।'

মহসিন শোবার ঘরের দরজায় টোকা দিয়ে বলল, 'আসব দুলাভাই?'

আফসার সাহেব বললেন, 'না।'

মহসিন দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল। আফসার সাহেব বললেন, 'আমি তো নিষেধ করেছিলাম ভেতরে আসতে।'

'ইমার্জেন্সির সময় বাধা-নিষেধ কাজে লাগে না। এখন হচ্ছে সুপার ইমার্জেন্সি। দুলাভাই, আমি জানি, আপনি আমাকে পছন্দ করেন না। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য যে, আমি আপনাকে পছন্দ করি। আপনি অতি সৎ, শাস্ত্রনীতি অক্ষরে-অক্ষরে মেনে-চলা একজন মানুষ। আপনি হয়তো বুঝতে পারছেন না যে এখন আপনার চরম দুঃসময় যাচ্ছে। এ-রকম কিছুদিন চললে আপনি পাগল হয়ে যাবেন। আপনাকে বাসা ছেড়ে গোপন কোনো জায়গায় যেতে হবে।'

'আমি তো কোনো অপরাধ করি নি যে পালিয়ে থাকব।'

'আপনার যুক্তি এক শ' ভাগ সত্যি—আপনি কোনো অপরাধ করেন নি। আমাদের এই সমাজটা এমন যে বেশির ভাগ শাস্তিই আমাদের বিনা অপরাধে পেতে হয়। এখানে শুধু যে আপনি একা শাস্তি পাচ্ছেন তাই না—আপনার মেয়ে দু'টাও শাস্তি পাচ্ছে। ওরা স্কুলে যেতে পারছে না। বাইরে গিয়ে খেলতে পারছে না। মুখ কালো করে ঘুরছে এবং কাঁদছে। ওদেরকে এই ঝামেলা থেকে মুক্ত করার জন্যে হলেও বাড়ি ছাড়তে আপনার রাজি হওয়া উচিত।'

'ভেবে দেখি।'

'হ্যাঁ, ভেবে দেখুন। খুব ভালো করে ভাবুন। বাড়ি ছাড়ার পক্ষে আরেকটি বড় যুক্তি আপনাকে দিচ্ছি। আপনার চাকরি নেই। এত বড় বাড়িতে আপনি এখন আর থাকতে পারেন না। ছোট বাড়ি নিতে হবে। আমি তেমনি ছোটখাটো একটা বাড়ি আপনার জন্যে দেখব।'

আফসার সাহেব চুপ করে রইলেন।

মহসিন বলল, 'আমি এখন চলে যাচ্ছি। রাত দশটায় এসে সবাইকে নিয়ে যাব। দ্বিতীয় কোনো কথা শুনব না। যদি আপত্তি করেন জোর করে নিয়ে যাব।'

রাত দশটায় মহসিন মাইক্রোবাস নিয়ে এল। আফসার সাহেব নিঃশব্দে গাড়িতে গিয়ে বসলেন। কোনো আপত্তি করলেন না। তাঁরা গিয়ে উঠলেন গেণ্ডারিয়ার এক ফ্ল্যাট-বাড়িতে। মহসিন করিৎকর্মা লোক। কিছু আসবাবপত্র এনে বাড়ি আগেই সাজিয়ে রেখেছে। এগার-বার বছরের একটা কাজের মেয়ে ঘর ঝাঁট দিচ্ছে।

নতুন বাসা খুব ছোট না—তিনটা রুম। বারান্দাটা ছোট হলেও শোবার ঘরটা বেশ বড়। অনেক উঁচু ছাদ। খোলামেলা ভাব আছে।

মহসিন বলল, 'দুলাভাই, আপনার বাসা পছন্দ হয়েছে?'

আফসার সাহেব বললেন, 'হ্যাঁ, হয়েছে।'

'এই বাড়ির সবচেয়ে বড় সুবিধা কী, জানেন?'

'না।'

'এই বাড়ির সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে বাতাস। দখিন-দুয়ারি বাড়ি। শীত- কাল বলে টের পাচ্ছেন না। গরমকাল আসুক, দেখবেন হু-হু করে বাড়িতে হাওয়া খেলবে। আমার এক বন্ধু আগে এই বাড়িতে থাকত, তার কাছে শুনেছি।'

আফসার সাহেব তেমন কোনো উৎসাহ দেখালেন না। আবার অনুৎসাহও দেখালেন না। মহসিন টিফিন ক্যারিয়ারে করে খাবার নিয়ে এসেছিল। রাতে তাই খাওয়া হল। আফসার সাহেব অনেক দিন পর ভালোমতো খাওয়াদাওয়া করলেন।

মহসিন মীরাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বলল, 'আপা, এই বাড়ির আসল সুবিধার

কথা এখন তোমাকে গোপনে বলে যাচ্ছি। এই বাড়ির আসল এবং একমাত্র সুবিধা হচ্ছে—তিনতলা ফ্ল্যাটের কোনো ফ্ল্যাটে বিড়াল নেই। তোমার ঐ বিড়ালও পথ খুঁজে-খুঁজে এ-বাড়িতে আসবে না। বুঝতে পারছ?'

'পারছি।'

'এখন তোমাকে যা করতে হবে তা হচ্ছে, দুলাভাইকে ভালোমতো ঘুমানোর সুযোগ করে দেওয়া। ঠিকমতো ঘুমুলেই নার্ভ শান্ত হয়ে যাবে। নার্ভ শান্ত হলেই সব সমস্যার সমাধান হবে।'

মীরা বললেন, 'আজ রাতটা তুই থেকে যা মহসিন, নতুন জায়গা, ভয়ভয় লাগছে।'

'আমি থাকব। দুলাভাইকে ঘুম পাড়ানোর দায়িত্বও আমার। আজ রাত নিয়ে তুমি চিন্তা করবে না।'

মহসিন শোবার ঘরে গিয়ে বসল। আফসার সাহেব চুপচাপ সিগারেট টানছেন। তাঁকে আজ তেমন অস্থির বোধ হচ্ছে না। রুমী সুমী তাঁর পাশেই কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমুচ্ছে।

মহসিন বলল, 'দু'টা ফ্রিজিয়াম খেয়ে আজ সারা রাত আপনি মড়ার মতো ঘুমুবেন, বুঝতে পারছেন?'

আফসার সাহেব বললেন, 'অষুধ খেয়ে কোনো লাভ নেই, ঘুম আসবে না। ঘুমুলেই দুঃস্বপ্ন দেখব-এই টেনশানে আমার ঘুম আসে না।'

'আজ টেনশান করতে হবে না। আমি সারা রাত আপনার বিছানার পাশে জেগে বসে থাকব। যখনই আপনি স্বপ্ন দেখতে শুরু করবেন, আমি আপনাকে ডেকে তুলব।'

'বুঝবে কী করে আমি স্বপ্ন দেখছি কি না?'

'স্বপ্ন দেখার সময় মানুষের চোখের পাতা কাঁপতে থাকে। একে বলে rapideye movement. সংক্ষেপে REM। যখনই দেখব আপনার চোখের পাতা কাঁপছে, আমি আপনাকে ডেকে তুলব। আমার ওপর আপনি বিশ্বাস রাখুন, আমি আপনার খাটের পাশে একটা চেয়ার টেনে বসব।'

মহসিন আসলেই তাই করল।

আফসার সাহেব ঘুমের অষুধ খেয়ে ঘুমুতে গেলেন। আশ্চর্যের ব্যাপার, মাথা বালিশে ছোঁয়ানোমাত্র ঘুমিয়ে পড়লেন, এবং চমৎকার একটা স্বপ্ন দেখলেন।—স্বপ্নেও তিনি ঘুমুচ্ছিলেন। ঘুম ভাঙলে তিনি চোখ মেললেন। লক্ষ করলেন, তিনি একটা বেতের ভাঙা স্যুটকেসের ভেতর শুয়ে আছেন। তাঁর শীত লাগছে। বেশ শীত লাগছে। তিনি মানুষ নন—বিড়াল। স্যুটকেসের ভেতর থেকে উঠে এলেন। খিদে পেয়েছে। খাবারের সন্ধানে যাওয়া উচিত। নানান রকম খাবারের ঘ্রাণ পাচ্ছেন। একটা পাউরুটির টুকরার ঘ্রাণ আসছে। পাউরুটিতে মাখন লাগানো। মাখনের ঘ্রাণও পাওয়া যাচ্ছে। বেশ কিছু পিঁপড়া পাউরুটিতে আছে। তিনি পিঁপড়ার ঘ্রাণও পাচ্ছেন। কোথায় যেন চা ফেলে দিয়েছে। সেই চা শুকিয়ে মেঝেতে সরের মতো পড়েছে। তার গন্ধও নাকে আসছে। মেঝের ঐ অংশ চেটে দেখা যেতে পারে। রান্নাঘরের ডাস্টবিনে কিছু ভাত আছে। তবে ভাত নষ্ট হয়ে গেছে। টক গন্ধ আসছে। আশ্চর্যের ব্যাপার, এক জায়গায় বসে তিনি সারা বাড়িতে কোথায় কি খাবার আছে তার গন্ধ পাচ্ছেন। তিনি হাই তুললেন। কোন-

কোন খাবার খাবেন তা মনে-মনে গুছিয়ে নিলেন। এইবার ইঁদুরের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। একটা মা-ইঁদুর বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে বের হয়েছে। শুধু গন্ধ দিয়ে তিনি প্রতিটি ইঁদুরকে আলাদা-আলাদা করে চিনতে পারছেন। মা'টা ভয়ংকর বদ। একে মারার চেষ্টা করবেন। না, থাক। ছোট-ছোট বাচ্চা আছে। কী দরকার? খিদেও চলে গেছে। ঘুম পাচ্ছে। তিনি আবার বেতের স্যুটকেসে ঢুকে পড়লেন। স্বপ্নের মধ্যেই আবার ঘুম এসে গেল। ঘুম ভাঙল রাত তিনটায়। আফসার সাহেব বিছানায় উঠে বসলেন। বিস্মিত হয়ে দেখলেন, মহসিন চেয়ারের হাতলে মাথা রেখে অকাতরে ঘুমুচ্ছে। তার নাকও ডাকছে।

আফসার সাহেব সাবধানে বিছানা থেকে নামলেন। বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। অবাক হয়ে লক্ষ করলেন, বারান্দার শেষ প্রান্তে বিড়াল একটামাত্র বাচ্চা নিয়ে চুপচাপ বসে আছে। আফসার সাহেব ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেললেন। আর ঠিক তখন বিড়ালের কথা শুনতে পেলেন।

বাচ্চা : 'মা, দেখ-দেখ, উনি বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন।'

মা : 'দেখছি।'

বাচ্চা : 'আমরা যে বাসা খুঁজে-খুঁজে এখানে চলে এসেছি তা দেখে উনি কি খুশি হয়েছেন?'

মা : 'না।'

বাচ্চা : 'আমার ভাইটা যে মারা গেছে তা কি উনি বুঝতে পারছেন মা?'

মা : 'মানুষ অসম্ভব বুদ্ধিমান, আমরা দু' জন মাত্র এসেছি। তাই দেখে তো বোঝা উচিত।'

বাচ্চা : 'আমাদের মনে যে খুব কষ্ট তা কি উনি বুঝবেন মা?'

মা : 'না। পশুদের কষ্ট মানুষ কখনো বোঝে না।'

বাচ্চা : 'এখন তাঁরা কি আমাদের আবার বস্তায় ভরে ফেলে দেবেন?'

মা : 'দিতে পারে। আবার না-ও দিতে পারে। যখন দেখবে আমরা এত কষ্ট করে পুরনো বাসায় গিয়েছি, সেখানে তাঁদের না-পেয়ে গন্ধ শুঁকে-শুঁকে এই জায়গায় এসেছি—তখন অবাক হয়ে আমাদের রাখতেও পারে।'

বাচ্চা : 'খিদে পেয়েছে মা।'

মা : 'ঘুমিয়ে পড়। ঘুমিয়ে পড়লে খিদে লাগবে না।'

বাচ্চা : 'মা।'

মা : 'কি?'

বাচ্চা : 'ভাইটার জন্য খুব কষ্ট হচ্ছে মা। কাঁদতে ইচ্ছা করছে।'

মা : 'কাঁদতে ইচ্ছা করলে কাঁদ।'

আফসার সাহেব শুনলেন বিড়ালের বাচ্চাটা কাঁদছে। এই কান্না অবিকল মানবশিশুর কান্নার মতো। আফসার সাহেবের চোখে পানি এসে গেল।

৫

মিসির আলি বড় একটা খাতায় বিড়ালের ব্যাপারটা লিখেছেন। খাতাটা নিয়ে আফসার সাহেবের বাসায় যাবেন। যাবার আগে লেখাটা আরেক বার দেখে নিচ্ছেন। মিসির আলি লিখেছেন ঃ

১· আফসার সাহেব একজন বুদ্ধিমান মানুষ, তবে গম্ভীর প্রকৃতির। ঠাট্টা-তামাশা পছন্দ করেন না। সবকিছু খুব সিরিয়াসভাবে নেন। কাজেই তিনি যখন বলেন বিড়ালের কথা বুঝতে পারছেন, তখন ধরে নেওয়া স্বাভাবিক যে, তিনি ঠাট্টা-তামাশা করছেন না। একজন বুদ্ধিমান মানুষ কোনো কারণ ছাড়া হঠাৎ বলা শুরু করবেন না যে, তিনি বিড়ালের কথা বুঝতে পারছেন। এটা বলায় তাঁর কোনো লাভ হচ্ছে না—বরং সামাজিকভাবে তিনি হাসির পাত্রে পরিণত হচ্ছেন। আমিও ধরেই নিচ্ছি তিনি বিড়ালের কথা বুঝতে পারছেন। এটা ধরে নিয়ে অন্য যুক্তিগুলি পরীক্ষা করছি।

২· ক্যাসেট প্লেয়ারে বিড়ালের কথা টেপ করা ছিল। তাঁকে শোনানো হল। তিনি কিছু বুঝতে পারলেন না। এতে দু'টি জিনিস প্রমাণিত হচ্ছে—ক· তিনি সত্যি কথা বলছেন। মিথ্যা করে বলতে পারতেন যে, কথা বুঝতে পারছেন। মিথ্যা বললেও আমাদের তা ধরার ক্ষমতা ছিল না; খ· বিড়াল হয়তো টেলিপ্যাথিক নিয়মে কথা বলে। যদি তার কথা হয় টেলিপ্যাথিক, তবে ক্যাসেট প্লেয়ারে ধরে রাখা বিড়ালের কথা হবে অর্থহীন। টেলিপ্যাথিক কথা বলার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ বিড়ালের ভোকাল কর্ড মিঁয়াও ছাড়া অন্য কোনো শব্দ করতে পারে না। একটিমাত্র শব্দে দীর্ঘ বাক্য তৈরি করা বা কথোপকথন চালানো অসম্ভব।

৩· আফসার সাহেব রাস্তায় হাঁটার সময় কিছু বিড়ালের দেখা পেতেন। তিনি তাদের কোনো কথা বুঝতে পারেন নি। বিড়ালের কথা যদি টেলিপ্যাথিক হয়, তাহলে তাদের কথাও বোঝা উচিত ছিল। আফসার সাহেবকে আমি একটি বাসায় নিয়ে গিয়েছিলাম। তাদেরও দু'টি বিড়াল ছিল। আফসার সাহেব সেই দু'টি বিড়ালের কথাও বুঝতে পারেন নি।

তাহলে ব্যাপার এই দাঁড়াচ্ছে—আমরা যেখান থেকে শুরু করেছিলাম আবার সেখানেই ফিরে গিয়েছি। এককথায়, আমরা এখন সহজ সিদ্ধান্তে চলে আসছে পারি ঃ "আফসার সাহেব বিড়ালের কথা বুঝতে পারেন না। তিনি মনগড়া কথা বলছেন।"

কিন্তু ইচ্ছা করলে এই সহজ সিদ্ধান্তে আমরা না-ও যেতে পারি। আমার সিদ্ধান্ত এ-রকম—আফসার সাহেব বিড়ালের কথা বুঝতে পারেন তবে সেই বিড়ালকে হতে হবে মা-বিড়াল এবং তার কিছু বাচ্চা থাকতে হবে। মা- বিড়াল বাচ্চাদের ট্রেনিং দেবার জন্যে ক্রমাগত তাদের নানান জিনিস শেখাবে। এই শেখানোর ব্যাপারটা সে করবে—"টেলিপ্যাথিকেলি"। বাচ্চারাও একইভাবে মা'র সঙ্গে যোগাযোগ করবে। শিক্ষার প্রাথমিক অংশ শেষ হবার পরপর বিড়ালদের এই ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাবে। আফসার সাহেবের মস্তিষ্কের একটি অংশ কোনো এক বিচিত্র কারণে বিড়ালের টেলিপ্যাথিক কথোপকথন ধরতে পারছে। আমার ধারণা, ছোট-ছোট শিশু আছে এমন যে-কোনো বিড়ালের কথাই তিনি বুঝতে পারবেন।

এই অস্বাভাবিক ক্ষমতার সঙ্গে মানুষের পরিচয় নেই বলেই মানুষ এই ক্ষমতা

দেখবে ভয়ে এবং বিস্ময়ে। মানুষ এটা সহজে গ্রহণ করতে পারবে না। শেষটায় এই ক্ষমতা আফসার সাহেবকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। মানুষ কখনোই অস্বাভাবিক কিছু সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না। কোনো মানুষ যদি কপালে তৃতীয় একটি চোখ নিয়ে জন্মায়, তাহলে আমাদের সমাজ তাকে ডাস্টবিনে ছুঁড়ে দেবে। তৃতীয় চোখের জন্যে সেই মানুষটিকে কঠিন মূল্য দিতে হবে, যদিও সেই তৃতীয় চোখের কারণে মানুষটির পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বেড়েছে। তার লাভই হয়েছে। কিন্তু আমাদের সমাজ ব্যাপারটা সেভাবে দেখবে না। মানুষকে উদার ভাবা হলেও মানুষ মোটেই উদার নয়। সে সব সময় দেখে তার গোষ্ঠীস্বার্থ। কাজেই আফসার সাহেবের সামনে খুব খারাপ দিন।

৬

মিসির আলি অনেক খুঁজে-খুঁজে আফসার সাহেবের বাসায় এসেছেন। বাসা থমথম করছে। কোনো সাড়াশব্দ নেই। বাড়িতে পা দিয়েই তাঁর মনে হল অশুভ কিছু যেন এই বাড়িতে ছায়া ফেলে আছে। ভয়াবহ কিছু ঘটে গেছে। কলিং বেল টিপতেই মীরা এসে দরজা খুললেন। তিনি এমনভাবে তাকালেন যেন মিসির আলিকে চিনতে পারছেন না। মীরার চোখ লাল, হয়তো কাঁদছিলেন।

মিসির আলি বললেন, 'কেমন আছেন?'

মীরা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, 'ভালো নেই।'

'ভেতরে আসব?'

'আসুন।'

'আফসার সাহেব কোথায়?'

মীরা চুপ করে রইলেন। মিসির আলি বললেন, 'আমি বুঝতে পারছি বড় রকমের কোনো ঘটনা ঘটেছে। আপনি কি আমাকে দয়া করে বলবেন, কী ব্যাপার?'

মীরা চাপা গলায় বললেন, 'আমাদের ঐ বিড়ালটা একটা বাচ্চা নিয়ে খুঁজে-খুঁজে এই বাড়িতে চলে এসেছিল। কী করে গেণ্ডারিয়ার এই বাড়ি খুঁজে পেল আমি জানি না। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি বিড়ালটা তার বাচ্চা নিয়ে চুপচাপ বসে আছে। সুমীর আব্বা একগাদা খাবার খেতে দিয়েছে। আমার প্রচণ্ড রাগ হল। রাগে প্রায় অন্ধ হয়ে গেলাম—আমাদের সমস্ত যন্ত্রণার মূলে এই বিড়াল। আমার মনে হল এদের শেষ না করতে পারলে আমাদের মুক্তি নেই। তখন আমি খুব একটা খারাপ কাজ করলাম।'

'কি করলেন?'

'খুব নোংরা, খুব কুৎসিত একটা কাজ—বলতে গিয়েও আমি লজ্জায় মরে যাচ্ছি। আমি রান্নাঘরে ঢুকলাম। রান্নাঘরের চুলায় চায়ের পানি ফুটছিল। আমি সেই ফুটন্ত পানি এনে এদের গায়ে ঢেলে দিলাম। এত বড় অন্যায় যে আমি করতে পারি, তা কখনো কল্পনা করি নি। কিন্তু করেছি, নিজের হাতে ফুটন্ত পানি ঢেলে দিয়েছি।'

'তারপর?'

'পানি ঢালার পরই মনে হল আমি এ কী করলাম, আমি এ কী করলাম! তখন আমি নিজেই এদের নিয়ে হাসপাতালে ছুটে গেছি। হাসপাতালে নিয়ে যাবার পরপরই

দু'টা বিড়ালই মারা যায়।'

'আফসার সাহেব কোথায়? উনি ঘটনাটা কীভাবে নিয়েছেন?'

'আমার মনে হয় সহজভাবেই নিয়েছেন। বাসায় ফিরে আমি খুব কান্নাকাটি করছিলাম। উনি আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন। আমার মাথায় হাত বোলাতে—বোলাতে বলছিলেন–মানুষমাত্রই ভুল করে। তুমিও করেছ।'

'ঘটনাটা কবে ঘটেছে?'

'গতকাল।'

মীরার চোখ দিয়ে ক্রমাগত পানি পড়ছে। তিনি নিজেকে সামলাতে পারছেন না। রুমী সুমী দরজার পর্দা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে আছে।

মিসির আলি বললেন, 'আফসার সাহেব কোথায়?'

মীরা বললেন, 'ও গিয়েছে ট্রেনের টিকিট কাটতে। সবাইকে নিয়ে সে ঢাকার বাইরে কোথাও বেড়াতে যেতে চায়।'

'সেটা ভালো হবে। যান, ঘুরে আসুন।'

মিসির আলি উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর কাছে মনে হচ্ছে এই পরিবারটি এখন সামলে উঠতে পারবে। বড় ধরনের দুর্ঘটনা এখন এদের কাছাকাছি নিয়ে আসবে। তা ছাড়া যেহেতু বিড়াল দু'টিও এখন নেই। এটাও একধরনের মুক্তি।

মিসির আলি বললেন, 'আমি আজ যাই। আপনারা বাইরে থেকে ঘুরে আসুন। তারপর একদিন এসে চা খেয়ে যাব।'

মীরা চোখ মুছতে–মুছতে নিচু গলায় বললেন, 'আপনাকে একটা ব্যাপার বলতে চাচ্ছি—আমি যখন বিড়াল দু'টাকে নিয়ে রিকশা করে হাসপাতালে যাচ্ছি, তখন হঠাৎ স্পষ্ট শুনলাম, মা-বিড়ালটা বলছে—''আমি আপনার পায়ে পড়ছি, আপনি আমার বাচ্চাটাকে বাঁচান। এই বেচারা সুন্দর পৃথিবীর কিছুই দেখল না।'' আমি কথাগুলি স্পষ্ট শুনলাম—যেন বিড়ালটা আমার মাথার ভেতর ঢুকে আমাকে কথাগুলি বলল। এই রকম কেন শুনলাম বলুন তো?'

মিসির আলি কখনো মিথ্যা বলেন না—আজ বললেন। কোমল গলায় বললেন—'এটা আপনার কল্পনা। অপরাধবোধে কাতর হয়ে ছিলেন বলেই কল্পনায় শুনেছেন। বিড়াল কি আর কথা বলতে পারে?'

মীরা বললেন, 'আমারও তাই ধারণা।'

বলতে–বলতে মীরা আবার চোখ মুছলেন।

মিসির আলি বাসার দিকে ফিরে চলছেন। শীতের সন্ধ্যা। আকাশ লাল হয়ে আছে। আকাশের লাল আলোয় কী অপূর্বই না দেখাচ্ছে শহরটাকে। হাঁটতে– হাঁটতে তাঁর মনে হল—প্রকৃতি এত সুন্দর করে নিজেকে শুধু মানুষের জন্যেই সাজায় না, তার সমস্ত জীব–জগতের জন্যেই সাজায়। মানুষ মনে করে শুধু তার জন্যেই বুঝি সাজিয়েছে, পাখি মনে করে তার জন্যে। বারান্দায় বসে–থাকা মা– বিড়াল মনে করে তাদের জন্যে। সে হয়তো তার শিশুটিকে ডেকে বলে—'মা, দেখ–দেখ কী সুন্দর! কী সুন্দর!'

১ অনীশ

হাসপাতালের কেবিন ধরাধরি ছাড়া পাওয়া যায় না, এই প্রচলিত ধারণা সম্ভবত পুরোপুরি সত্যি নয়। মিসির আলি পেয়েছেন, ধরাধরি ছাড়াই পেয়েছেন। অবশ্যি জেনারেল ওয়ার্ডে থাকার সময় একজন ডাক্তারকে বিনীতভাবে বলেছিলেন, 'ভাই একটু দেখবেন—একটা কেবিন পেলে বড় ভালো হয়।' এই সামান্য কথাতেই কাজ হবে, এটা বিশ্বাস করা কঠিন। আজকাল কথাতে কিছু হয় না। যে-ডাক্তারকে অনুরোধ করা হয়েছিল, তিনি বুড়ো। মুখের ভঙ্গি দেখে মনে হয় সমগ্র মানবজাতির ওপরই তিনি বিরক্ত। কোনো ভয়ংকর দুর্ঘটনায় মানবজাতি নিঃশেষ হয়ে আবার যদি এককোষী এ্যামিবা থেকে জীবনের শুরু করে তাহলে তিনি খানিকটা আরাম পান। তাঁকে দেখে মনে হয় নি তিনি মিসির আলির অনুরোধ মনে রাখবেন। কিন্তু ভদ্রলোক মনে রেখেছেন। কেবিন জোগাড় হয়েছে পাঁচতলায়। রুম নাম্বার চার শ' নয়।

সব জায়গায় বাংলা প্রচলন হলেও হাসপাতালের সাইনবোর্ডগুলি এখনো বদলায় নি। ওয়ার্ড, কেবিন, পেডিয়াট্রিকস—এ-সব ইংরেজিতেই লেখা। শুধু রোমান হরফের জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে বাংলা হরফ। হয়তো এগুলির সুন্দর বাংলা প্রতিশব্দ পাওয়া যায় নি। কেবিনের বাংলা কী হবে? কুটির? জেনারেল ওয়ার্ডের বাংলা কি 'সাধারণ কক্ষ'?

যতটা উৎসাহ নিয়ে মিসির আলি চার শ' ন' নম্বর কেবিনে এলেন ততটা উৎসাহ থাকল না। ঘন্টাখানেকের মধ্যে তিনি আবিষ্কার করলেন—বাথরুমের ট্যাপ বন্ধ হয় না। যত কষেই প্যাঁচ আটকানো যাক, ক্ষীণ জলধারা ঝরনার মতো পড়তেই থাকে। কমোডের ফ্ল্যাশও কাজ করে না। ফ্ল্যাশ টানলে ঘড়ঘড় শব্দ হয় এবং কমোডের পানিতে সামান্য আলোড়ন দেখা যায়। এই পর্যন্তই। তার চেয়েও ভয়াবহ আবিষ্কারটা করলেন রাতে ঘুমোতে যাবার সময়। দেখলেন বেডের পাশে সাদা দেয়ালে সবুজ রঙের মার্কার দিয়ে লেখা—

"এই ঘরে যে থাকবে
সে মারা যাবে।
ইহা সত্য। মিথ্যা নয়।।"

মিসির আলির চরিত্র এমন নয় যে এই লেখা দেখে তিনি আঁৎকে উঠবেন এবং জেনারেল ওয়ার্ডে ফেরত যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। তবে বড় রকমের অসুখবিসুখের সময় মানুষের মন দুর্বল থাকে। মিসির আলির মনে হল তিনি মারাই যাবেন। সবুজ রঙের এই ছেলেমানুষি লেখার কারণে নয়, সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক নিয়মে। তাঁর লিভার কাজ করছে না বললেই হয়। মনে হচ্ছে লিভারটির আর কাজ করার ইচ্ছেও নেই। শরীরের একটি অঙ্গ নষ্ট হয়ে গেলে অন্য অঙ্গগুলিও তাকে অনুসরণ করে। একে বলে সিমপ্যাথেটিক রিঅ্যাকশন। কারো একটা চোখ নষ্ট হলে অন্য চোখের দৃষ্টি কমতে থাকে। তাঁর নিজের বেলাতেও মনে হচ্ছে তাই হচ্ছে। লিভারের শোকে শরীরের অন্যসব অঙ্গ– প্রত্যঙ্গগুলিও কাতর। একসময় ফট করে কাজ বন্ধ করে দেবে। হৃৎপিন্ড বলবে–কী দরকার গ্যালন–গ্যালন রক্ত পাম্প করে? অনেক তো করলাম। শুরু হবে অনির্দিষ্টের পথে যাত্রা। সেই যাত্রা কেমন হবে তিনি জানেন না। কেউই জানে না। প্রাণের জন্ম–রহস্য যেমন অজানা, প্রাণের বিনাশ–রহস্যও তেমনি অজানা।

তিনি শুয়ে পড়লেন। প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। বেল টিপে নার্সকে ডাকলেই সে কড়া কোনো ঘুমের অষুধ খাইয়ে দেবে। মিসির আলির ধারণা, এরা ঘুমের ট্যাবলেট এ্যাপ্রনের পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। রুগীর সামান্য কাতরানির শব্দ কানে যাওয়ামাত্র ঘুমের ট্যাবলেট গিলিয়ে দেয়। কাজেই ওদের না–ডেকে মাথার যন্ত্রণা নিয়ে শুয়ে থাকাই ভালো। শুয়ে–শুয়ে মৃত্যুর পরের জগৎ নিয়ে চিন্তা করা যেতে পারে।

ধরা যাক মৃত্যুর পরে একটি জগৎ আছে। পার্টিকেলের যদি অ্যান্টি–পার্টিকেল থাকতে পারে, ইউনিভার্সের যদি অ্যান্টি–ইউনিভার্স হয়, তাহলে শরীরের এ্যান্টি–শরীর থাকতে সমস্যা কী? যদি মৃত্যুর পর কোনো জগৎ থাকে কী হবে সেই জগতের নিয়ম–কানুন? এ–জগতের প্রাকৃতিক নিয়ম–কানুন কি সেই জগতেও সত্যি? এখানে আলোর গতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল, সেখানেও কি তাই? নিউটনের গতিসূত্র কি সেই জগতের জন্যেও সত্যি? হাইজেনবার্গের আনসার্টিনিটি প্রিন্সিপ্‌ল? একই সময়ে বস্তুর গতি এবং অবস্থান নির্ণয় করা অসম্ভব। পরকালেও কি তাই? নাকি সেখানে এটি খুবই সম্ভব?

মিসির আলি কলিং বেলের সুইচ টিপলেন। প্রচণ্ড বমি ভাব হচ্ছে। বমি করে বিছানা ভাসিয়ে দিতে চাচ্ছেন না, আবার একা–একা বাথরুম পর্যন্ত যাবার সাহসও পাচ্ছেন না। মনে হচ্ছে মাথা ঘুরে বাথরুমের দরজায় পড়ে যাবেন।

অল্পবয়েসী একজন নার্স ঢুকল। তার গায়ের রঙ কালো, মুখে বসন্তের দাগ, তার পরেও চেহারায় কোথায় যেন একধরনের স্নিগ্ধতা লুকিয়ে আছে। মিসির আলি বললেন, 'এত রাতে আপনাকে ডাকার জন্যে আমি খুব লজ্জিত। আপনি কি আমাকে বাথরুম পর্যন্ত নিয়ে যাবেন? আমি বমি করব।'

'বাথরুমে যেতে হবে না। বিছানায় বসে–বসেই বমি করুন—আপনার খাটের নিচে গামলা আছে।'

সিস্টার মিসির আলিকে ধরে–ধরে বসালেন। আশ্চর্যের ব্যাপার, বমি ভাব সঙ্গে–সঙ্গে কমে গেল। মিসির আলি বললেন, 'সিস্টার, আপনার নাম জানতে পারি?'

'আমার নাম সুস্মিতা। আপনি কি এখন একটু ভালো বোধ করছেন?'

'বমি গলা পর্যন্ত এসে থেমে আছে। এটাকে যদি ভালো বলেন তাহলে ভালো।'

'আপনার কি মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে?'

'হচ্ছে।'

'খুব বেশি?'

'হ্যাঁ, খুব বেশি।'

'আপনি শুয়ে থাকুন। আমি রেসিডেন্ট ফিজিসিয়ানকে ডেকে নিয়ে আসছি। তিনি হয়তো আপনাকে ঘুমের কোনো অষুধ দেবেন। তা ছাড়া আপনার গা বেশ গরম। মনে হচ্ছে টেম্পারেচার দুই-এর উপরে।'

সুস্মিতা জ্বর দেখল। এক শ' দুই পয়েন্ট পাঁচ। সে ঘরের বাতি নিভিয়ে ডাক্তারকে খবর দিতে গেল।

মিসির আলি লক্ষ করছেন, তাঁর মাথার যন্ত্রণা ক্রমেই বাড়ছে। ঘর অন্ধকার, তবু চোখ বন্ধ করলেই হলুদ আলো দেখা যায়। চোখের রেটিনা সম্ভবত কোনো কারণে উত্তেজিত। ব্যথার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক আছে কি? আচ্ছা—জ্বর মাপার যন্ত্র আছে থার্মোমিটার। ব্যথা মাপার যন্ত্র এখনো বের হল না কেন? মানুষের ব্যথা-বোধের মূল কেন্দ্র—মস্তিষ্ক। স্নায়ু ব্যথার খবর মস্তিষ্কে পৌঁছে দেয়। যে-ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল ব্যথার পরিমাপক, সেই সিগন্যাল মাপা কি অসম্ভব?

ব্যথা মাপার একটা যন্ত্র থাকলে ভালো হত। প্রসববেদনার তীব্রতা নাকি সবচেয়ে বেশি। তার পরেই থার্ড ডিগ্রী বার্ন। তবে ব্যথা সহ্য করার ক্ষমতাও একেক মানুষের একেক রকম। কেউ-কেউ অতি তীব্র ব্যথাও শান্তমুখে সহ্য করতে পারে। মিসির আলি পারেন না। তাঁর ইচ্ছা করছে দেয়ালে মাথা ঠুকতে। ব্যথা ভোলবার জন্যে কী করা যায়? মস্তিষ্ককে কি কোনো জটিল প্রক্রিয়ায় ফেলে দেওয়া যায় না? উল্টো করে নিজের সঙ্গে কথা বললে কেমন হয়? কিংবা একই বাক্য চক্রাকারে বলা যায় না?

শিবে বখু কি থাব্য?

শিবে বখু কি থাব্য?

শিবে বখু কি থাব্য?

নার্স ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকল। বাতি জ্বালাল। ডাক্তার সাহেব বললেন, 'কী ব্যাপার?'

মিসির আলি বললেন, 'আমার ডেলিরিয়াম হচ্ছে। একটি বাক্য বারবার উল্টো করে বলছি। ''ব্যথা কি খুব বেশি''—এই বাক্যটিকে আমি উল্টো করে বলছি, 'শিবে বখু কি থাব্য?'

ডাক্তার সাহেব বললেন, 'কোনো রুগীর যখন ডেলিরিয়াম হয়, সে বুঝতে পারে না যে ডেলিরিয়াম হচ্ছে।'

'আমি বুঝতে পারি। কারণ আমার কাজই হচ্ছে মানুষের মনোজগৎ নিয়ে। ডাক্তার সাহেব, আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিন। সম্ভব হলে খানিকটা অক্সিজেন দেবারও ব্যবস্থা করুন। আমার মস্তিষ্কে অক্সিজেন ডিপ্রাইভেশন হচ্ছে। আমার হেলুসিনেশন হচ্ছে।'

'কি হেলুসিনেশন?'

'আমি দেখছি আমার হাত দুটো অনেক লম্বা হয়ে গেছে। এখনো লম্বা হচ্ছে।'

মিসির আলি গানের সুরে বলতে লাগলেন—

"ম্বাল তক তহা রমাআ।
ম্বাল তক তহা রমাআ।
ম্বাল তক তহা রমাআ।"
ডাক্তার সাহেব নার্সকে প্যাথিড্রিন ইনজেকশান দিতে বললেন।

মিসির আলির ঘুম ভাঙল সকাল ন'টার দিকে।

ট্রে-তে করে হাসপাতালের নাশতা নিয়ে এসেছে। দু' স্লাইস রুটি, একটা ডিম সেদ্ধ, একটা কলা এবং আধ গ্লাস দুধ। বিশ্বের দরিদ্রতম দেশের একটির জন্যে বেশ ভালো খাবার—স্বীকার করতেই হবে। তবু বেশির ভাগ রুগী এই খাবার খায় না। তাদের জন্যে টিফিন ক্যারিয়ারে ঘরের খাবার আসে। ফ্লাস্কে আসে দুধ।

জেনারেল ওয়ার্ডের অবস্থা অবশ্য ভিন্ন। সেখানকার রুগীরা হাসপাতালের খাবার খুব আগ্রহ করে খায়। যারা খেতে পারে না, তারা জমা করে রাখে। বিকেলে তাদের আত্মীয়স্বজনরা আসে। মাথা নিচু করে লজ্জিত মুখে এই খাবারগুলি তারা খেয়ে ফেলে। সামান্য খাবার, অথচ কী আগ্রহ করেই-না খায়! বড়ো মায়া লাগে মিসির আলির। কতবার নিজের খাবার ওদের দিয়ে দিয়েছেন। ওরা কৃতজ্ঞ চোখে তাকিয়েছে।

আজকের নাশতা মিসির আলি মুখে দিতে পারলেন না। পাউরুটিতে কামড় দিতেই বমি ভাব হল। এক চুমুক দুধ খেলেন। কলার খোসা ছাড়ালেন, কিন্তু মুখে দিতে পারলেন না। শরীর সত্যি-সত্যি বিদ্রোহ করেছে।

খাবার নিয়ে যে এসেছে, সে তাকিয়ে আছে তীক্ষ্ণ চোখে। রুগী খাবার খেতে পারছে না, এই দৃশ্য নিশ্চয়ই তার কাছে নতুন নয়। তবু তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে দুঃখিত। লোকটি স্নেহময় গলায় বলল, 'কষ্ট কইরা খান। না-খাইলে শরীরে বল পাইবেন না।'

মিসির আলি শুধুমাত্র লোকটিকে খুশি করবার জন্যে পাউরুটি দুধে ভিজিয়ে মুখে দিলেন। খেতে কেমন যেন ঘাসের মতো লাগছে।

আজ শুক্রবার।

শুক্রবারে রুটিন ভিজিটে ডাক্তাররা আসেন না। সেটাই স্বাভাবিক। তাঁদের ঘর-সংসার আছে, পুত্র-কন্যা আছে। জন্মদিন, বিয়ে, বিবাহবার্ষিকী আছে। একটা দিন কি তাঁরা ছুটি নেবেন না? অবশ্যই নেবেন। মিসির আলি ধরেই নিয়েছিলেন তাঁর কাছে কেউ আসবে না। কিন্তু তাঁকে অবাক করে দিয়ে এ্যাপ্রন গায়ে মাঝবয়েসী এক ডাক্তার এসে উপস্থিত। ডাক্তার আসার এটা সময় নয়। প্রথমত শুক্রবার, দ্বিতীয়ত দেড়টা বাজে, লাঞ্চ ব্রেক। ডিউটির ডাক্তাররাও এই সময় ক্যান্টিনে খেতে যান।

ডাক্তার সাহেব বললেন, 'কেমন আছেন?'

মিসির আলি হেসে ফেলে বললেন, 'ভালো থাকলে কি হাসপাতালে পড়ে থাকি?'

'আপনাকে দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে ভালো আছেন। কাল রাতে খুব খারাপ অবস্থায় ছিলেন। প্রবল ডেলিরিয়াম।'

'আপনি রাতে এসেছিলেন?'

'জ্বি।'

'চিনতে পারছি না। মাথা এলোমেলো হয়ে আছে। গত রাতে কী ঘটেছে কিচ্ছু মনে নেই।'

ডাক্তার সাহেব চেয়ারে বসলেন। তাঁর শরীর বেশ ভারি। শরীরের সঙ্গে মিল রেখে গলার স্বর ভারি। চশমার কাঁচ ভারি। সবই ভারি-ভারি, তবুও মানুষটির কথা বলার মধ্যে সহজ হালকা ভঙ্গি আছে। এ-জাতীয় মানুষ গল্প করতে এবং গল্প শুনতে ভালবাসে। মিসির আলি বললেন, 'ডাক্তার সাহেব, আমি আপনার জন্যে কী করতে পারি বলুন।'

'একটা সমস্যার সমাধান করতে পারেন। এই কেবিনটা ছেড়ে অন্য একটা কেবিনে চলে যেতে পারেন। একজন মহিলা এই কেবিনে আসতে চাচ্ছেন।'

মিসির আলি হাসতে-হাসতে বললেন, 'আমি এই মুহূর্তে কেবিন ছেড়ে দিচ্ছি।'

'এই মুহূর্তে ছাড়তে হবে না। কাল ছাড়লেও হবে।'

ডাক্তার সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। মিসির আলি বললেন, 'ভদ্রমহিলা বিশেষ করে এই কেবিনে আসতে চাচ্ছেন কেন?'

'তাঁর ধারণা, এই কেবিন খুব লাকি। কেবিনের নম্বর চার শ' নয়। যোগ করলে হয় তের। তের নম্বরটি নাকি তাঁর জন্যে খুব লাকি। সৌভাগ্য-সংখ্যা। নিউমোরলজি'-র হিসাব।'

'কী অদ্ভুত কথা!'

ডাক্তার সাহেব হালকা স্বরে বললেন, 'অসুস্থ অবস্থায় মন দুর্বল থাকে। দুর্বল মনে তের নম্বরটি ঢুকে গেলে সমস্যা।'

'মনের মধ্যে যা ঢুকেছে তা বের করে দিন।'

ডাক্তার সাহেব হেসে ফেলে বললেন, 'এটা তো কোনো কাঁটা না রে ভাই, যে, চিমটা দিয়ে বের করে নিয়ে আসব। এর নাম কুসংস্কার। কুসংস্কার মনের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে শিকড় ছড়িয়ে দেয়। কুসংস্কারকে তুলে ফেলা আমার মতো সাধারণ মানুষের কর্ম নয়। যাই ভাই। আপনি তাহলে কাল ভোরে কেবিন নম্বর চার শ' পাঁচে চলে যাবেন। কেবিনটা সিঁড়ির কাছে না, কাজেই হৈ-চৈ হবে না। তা ছাড়া জানালার ভিউ ভালো। গাছপালা দেখতে পারবেন।'

মিসির আলি গম্ভীর গলায় বললেন, 'কিছু মনে করবেন না। আমি এই রুম ছাড়ব না। এখানেই থাকব।'

ডাক্তার সাহেব বিস্মিত হয়ে তাকালেন। কি একটা বলতে গিয়েও বললেন না। মিসির আলি বললেন, 'রুম ছাড়ব না, কারণ ছাড়লে কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। আমি এই জীবনে কুসংস্কার প্রশ্রয় দেবার মতো কোনো কাজ করি নি। ভবিষ্যতেও করব না।'

'ও, আচ্ছা।'

'আপনি যদি অন্য কোনো কারণ বলতেন, রুম ছেড়ে দিতাম। আমার কাছে চার শ' নয় নম্বর যা, চার শ' পাঁচ-ও তা। তফাত মাত্র চারটা ডিজিটের।'

ডাক্তার সাহেব বিব্রত গলায় বললেন, 'আপনি কি ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলবেন? অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে ভদ্রমহিলা এ-ঘরে না-আসা পর্যন্ত অপারেশন করাবেন না। অপেক্ষা করবেন। অথচ অপারেশনটা জরুরি।'

'ওঁর অসুবিধা কী?'

'কিডনির কাছাকাছি একটা সিস্টের মতো হয়েছে। আপনি যদি তাঁর সঙ্গে কথা বলেন তাহলে ভালো হয়। ভদ্রমহিলাকে আপনি চেনেন।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। ভালো করেই চেনেন। উনি অনুরোধ করলে না বলতে পারবেন না।'

'নাম কি তাঁর?'

'আমি ওঁকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনি কথা বলুন।'

মিসির আলি তাকিয়ে আছেন।

দরজা ধরে যে-মহিলা দাঁড়িয়ে, তাঁর বয়স ত্রিশের কাছাকাছি হলেও তাঁকে দেখাচ্ছে বালিকার মতো। লম্বাটে মুখ, কাটা-কাটা চেহারা। অসম্ভব রূপবতী। সাধারণত রূপবতীরা মানুষকে আকর্ষণ করে না—একটু দূরে সরিয়ে রাখে। এই মেয়েটির মধ্যে আকর্ষণী ক্ষমতা প্রবল। মিসির আলি মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছেন। মেয়েটি বলল, 'আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন?'

'না।'

'সে কী, চেনা উচিত ছিল তো! আপনি সিনেমা দেখেন না নিশ্চয়ই?'

'না।'

'টিভি? টিভিও দেখেন না? টিভি দেখলেও তো আমাকে চেনার কথা!'

'আমার টিভি নেই। বাড়িওয়ালার বাসায় গিয়ে অবশ্যি মাঝে-মাঝে দেখি। আপনি কি কোনো অভিনেত্রী?'

'হ্যাঁ। এলেবেলে টাইপ অভিনেত্রী নই। খুব নামকরা। রাস্তায় বের হলে ''ট্রাফিক জ্যাম'' হয়ে যাবে।'

মেয়েটির কথা বলার ভঙ্গিতে মিসির আলি হেসে ফেললেন। মেয়েটিও হাসল। অভিনেত্রীর মাপা হাসি নয়, অন্তরঙ্গ হাসি। সহজ-সরল হাসি।

'আপনি কিন্তু এখনো আমার নাম জিজ্ঞেস করেননি।'

'কী নাম?'

'আসমানী। এটা আমার আসল নাম। সিনেমার জন্যে আমার ভিন্ন নাম আছে। সেই নাম আপনার জানার দরকার নেই। ভেতরে আসব?'

'আসুন।'

মেয়েটি ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসল। গলার স্বর খানিকটা গম্ভীর করে বলল, 'শুনলাম আপনি নাকি কুসংস্কার সহ্য করতে পারেন না।'

'ঠিকই শুনেছেন। সহ্য করি না এবং প্রশ্রয় দিই না।'

'কুসংস্কার-টুসংস্কার কিছু না। আপনি আপনার ঘরটা আমাকে ছেড়ে দিন। আমার এই কেবিনটা খুব পছন্দ। আমি আপনার কাছে হাতজোড় করছি। প্লীজ।'

মেয়েটি সত্যি-সত্যি হাতজোড় করল। মিসির আলি লজ্জায় পড়ে গেলেন। এ কী কাণ্ড!

'আমি এক্ষুণি ছেড়ে দিচ্ছি। হাতজোড় করতে হবে না।'

'থ্যাংকস!'

'থ্যাংকস বলারও প্রয়োজন নেই, তবে আমার ধারণা, এই কেবিনটিতেও শেষ পর্যন্ত আপনি থাকতে রাজি হবেন না।'

'এ-রকম মনে হবার কারণ কী?'

'আপনি রাতে যখন ঘুমুতে যাবেন তখন হঠাৎ করে দেয়ালের একটা লেখা আপনার চোখে পড়বে—সবুজ মার্কারে কাঁচা-কাঁচা হাতে লেখা—

এই ঘরে যে থাকবে

সে মারা যাবে।

ইহা সত্য, মিথ্যা নয়।

লেখা পড়েই আপনি আঁৎকে উঠবেন। যেহেতু আপনার মন খুব দুর্বল, সেহেতু আপনি আর এখানে থাকবেন না।'

আসমানী বলল, 'কোথায় লেখাটা—দেখি।'

তিনি লেখাটা দেখালেন। আসমানী বলল, 'কে লিখেছে?'

মিসির আলি থেমে-থেমে বললেন, 'যে লিখেছে তার সঙ্গে আমার দেখা হয় নি, তবে আমি অনুমান করতে পারি, একটি বাচ্চা মেয়ের লেখা। মেয়েটির উচ্চতা চার ফুট দু' ইঞ্চি। এবং মেয়েটি এই ঘরেই মারা গেছে।'

আসমানী ভুরু কুঁচকে বলল, 'এ-সব আপনার অনুমান?'

'জ্বি, অনুমান। তবে যুক্তিনির্ভর অনুমান।'

'যুক্তিনির্ভর অনুমান মানে?'

'এক-এক করে বলি। এটা একটা মেয়ের লেখা তা অনুমান করছি দেয়ালে আঁকা কিছু ছবি দেখে। সবুজ মার্কারে আঁকা বেশ কিছু ছবি আছে, সবই বেণী-বাঁধা বালিকাদের ছবি। মেয়েরা একটা বয়স পর্যন্ত শুধু মেয়েদের ছবি আঁকে।'

'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ, তাই।'

'আর মেয়েটির উচ্চতা কীভাবে আঁচ করলেন?'

'মেয়েটির উচ্চতা আঁচ করেছি আরো সহজে। আমরা যখন দেয়ালে কিছু লিখি, তখন লিখি চোখ বরাবর। মেয়েটি বিছানায় বসে-বসে লিখেছে। সেখান থেকে তার উচ্চতা আঁচ করলাম।'

'দাঁড়িয়েও তো লিখতে পারে। হয়তো মেঝেতে দাঁড়িয়ে লিখেছে।'

'তা পারে। তবে মেয়েটি অসুস্থ। বিছানায় বসে-বসে লেখাই তার জন্যে যুক্তি-সঙ্গত।'

আসমানী গম্ভীর গলায় বলল, 'মেয়েটি যে বেঁচে নেই তা কী করে অনুমান করলেন? কাউকে জিজ্ঞেস করেছেন?'

'না, কাউকে জিজ্ঞেস করি নি। এটাও অনুমান। বাচ্চারা দেয়ালে লেখার ব্যাপারে খুবই পার্টিকুলার। যা বিশ্বাস করে তা-ই সে দেয়ালে লেখে। যদি বাচ্চাটি সুস্থ হয়ে বাসায় ফিরে যেত তাহলে অবধারিতভাবে এই লেখার জন্যে সে লজ্জিত বোধ করত এবং হাসপাতাল ছেড়ে যাবার আগে লেখাটি নষ্ট করে যেত।'

'আপনি কী করেন জানতে পারি?'

'মাস্টারি করতাম, এখন করি না। পার্ট টাইম টীচার ছিলাম। অস্থায়ী পোস্ট। চাকরি চলে গেছে।'

'আপনি আমাকে দেখে কি আমার সম্পর্কে কিছু বলতে পারেন?'

'একটা সামান্য কথা বলতে পারি—আপনার আসল নাম আসমানী নয়। অন্য কিছু।'

'এ-রকম মনে হবার কারণ কী?'

'আসমানী নামটি আপনি এমনভাবে বললেন যাতে আমার কাছে মনে হল অচেনা একটি শব্দ বলছেন। তার চেয়েও বড় কথা আপনার পরনে আসমানী রঙের একটি শাড়ি। শাড়িটি পরার পর থেকেই হয়তো আসমানী নামটা আপনার মাথায় ঘুরছে। প্রথম সুযোগে এই নামটি বললেন।'

'আমার ডাক নাম ''বুড়ি''।'

মিসির আলি কিছু বললেন না। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। বুড়ি বলল, 'আপনি অনুমানগুলি কীভাবে করেন?'

'লজিক ব্যবহার করে করি। সামান্য লজিক। লজিক ব্যবহার করার ক্ষমতা সবার মধ্যেই আছে। বেশির ভাগ মানুষই তা ব্যবহার করে না। যেমন আপনি ব্যবহার করছেন না। ভেবে বসে আছেন চার শ' নয় নম্বর ঘরটি আপনার জন্যে লাকি। এ-রকম ভাবার পিছনে কোনো লজিক নেই।'

'লজিকই কি এই পৃথিবীর শেষ কথা?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন যে লজিকই হচ্ছে পৃথিবীর শেষ কথা—। লজিকের বাইরে কিছু নেই? পৃথিবীর সমস্ত রহস্যের সমাধান আছে লজিকে, পারবেন বলতে?'

'পারব।'

'ভালো কথা। শুনে খুশি হলাম। আমি কি আপনার নাম জানতে পারি?'

'আমার নাম মিসির আলি। আপনি কি কাল ভোরে এই কেবিনে আসতে চান? না মত বদলেছেন?'

'আমি কাল ভোরে চলে আসব। যাই মিসির আলি সাহেব। স্লামালিকুম।'

মেয়েটি নিজের কেবিনে ফিরে গেল। রাত দশটার ভেতর সে চার শ' নয় নম্বর কেবিনে আগের রুগীর যাবতীয় তথ্য জোগাড় করল। এই কেবিনে ''লাবণ্য'' নামের দশ বছর বয়সী একটি মেয়ে থাকত। হার্টের ভাল্বের কী একটি জটিল সমস্যায় সে দীর্ঘদিন এই ঘরটিতে ছিল। মারা গেছে মাত্র দশ দিন আগে। তার ওজন তেষট্টি পাউণ্ড। উচ্চতা চার ফুট এক ইঞ্চি।

মিসির আলি সাহেব সামান্য ভুল করেছেন। তিনি বলেছেন চার ফুট দু' ইঞ্চি। এইটুকু ভুল বোধহয় ক্ষমা করা যায়।

২

চার শ' ন' নম্বর কেবিনের ভোল পুরোপুরি পাল্টে গেছে। দেয়াল ঝকঝক করছে, কারণ প্লাস্টিক পেইন্ট করা হয়েছে। এ্যাটাচড্ বাথরুমের দরজায় ঝুলছে হাল্কা নীল পর্দা। বাথরুমের কমোডের ফ্ল্যাশ ঠিক করা হয়েছে। পানির ট্যাপও সারানো হয়েছে। মেঝেতে পানি জমে থাকত—এখন পানি নেই।

কেবিনের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। বুড়ি বিছানায় শুয়ে-শুয়ে গভীর মনোযোগে খাতায় কী-সব লিখছে। লেখার ব্যাপারটি যে তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ, তা বোঝা যাচ্ছে হাতের কাছে বাংলা অভিধান দেখে। সে মাঝে-মাঝেই অভিধান দেখে নিচ্ছে। লেখার গতি খুব দ্রুত নয়। কিছুক্ষণ পরপরই খাতা নামিয়ে রেখে তাকে চোখ বন্ধ করে বিশ্রাম করতে দেখা যাচ্ছে। এই সময় টেবিল ল্যাম্পটি সে নিভিয়ে ঘর অন্ধকার করে দিচ্ছে। টেবিল-ল্যাম্পটা খুব সুন্দর। একটিমাত্র ল্যাম্প ঘরের চেহারা পাল্টে দিয়েছে।

বুড়ি লিখছে—

গত পরশু মিসির আলি নামের একজনের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। পরিচয় বলা ঠিক হচ্ছে না—কারণ আমি তাঁর সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানি না। তিনিও আমার সম্পর্কে কিছু জানেন না। মানুষটি বুদ্ধিমান, নিশ্চয়ই এটা চমৎকার একটা গুণ। কিন্তু তাঁর দোষ হচ্ছে, তিনি একই সঙ্গে অহঙ্কারী। অহঙ্কার—বুদ্ধির কারণে, যেটা আমার ভালো লাগে নি। বুদ্ধির খেলা দেখিয়ে তিনি আমাকে অভিভূত করতে চেয়েছেন। কেউ আমাকে অভিভূত করতে চাইলে আমার ভালো লাগে না। রাগ হয়। বয়স হবার পর থেকেই দেখছি আমার চারপাশে যারা আসছে, তারাই আমাকে অভিভূত করতে চাচ্ছে। এক-এক বার আমার চেঁচিয়ে বলার ইচ্ছা হয়েছে—হাতজোড় করছি, আমাকে রেহাই দিন। আমাকে আমার মতো থাকতে দিন। পৃথিবীতে অসংখ্য মেয়ে আছে—যাদের জন্মই হয়েছে অভিভূত হবার জন্যে। তাদের কাছে যান। তাদের অভিভূত করুন, হোয়াই মি?

এই কথাগুলি আমি মিসির আলি সাহেবকে বলতে পারলে সবচেয়ে খুশি হতাম—তাঁকে বলতে পারছি না। কারণ উনি আমাকে সত্যি-সত্যি অভিভূত করেছেন। চমকে দিয়েছেন। ছোট বালিকারা যেমন ম্যাজিক দেখে বিস্ময়ে বাক্যহারা হয়, আমার বেলাতেও তাই হয়েছে। আমি হয়েছি বাক্যহারা। মজার ব্যাপার হচ্ছে—আমার এই বিস্ময়কে তিনি মোটেই পাত্তা দিলেন না। ম্যাজিশিয়ানরা অন্যের বিস্ময় উপভোগ করে। তিনি করেন নি।

সবুজ রঙের দেয়ালের লেখা প্রসঙ্গে যখন আমি যা জেনেছি তা তাঁকে বলতে গেলাম, তিনি কোনো আগ্রহ দেখালেন না। আমি যখন তাঁর বিছানার পাশের চেয়ারে বসলাম, তিনি শুকনো গলায় বললেন, "কিছু বলতে এসেছেন?"

আমি বললাম, "না। আপনার সঙ্গে গল্প করতে এসেছি।"

তিনি বললেন, "ও।" তাঁর চোখ-মুখ দেখেই মনে হল, তিনি বিরক্ত—মহাবিরক্ত। নিতান্ত ভদ্রতার খাতিরে কিছু বলতে পারছেন না। চেয়ারে বসেছি, চট করে উঠে যাওয়া ভালো দেখায় না। কাজেই মিসির আলি সাহেবের অসুখটা কি, কত দিন ধরে হাসপাতালে আছেন—এই সম্পর্কে কয়েকটা প্রশ্ন করলাম। তিনি নিতান্তই

অনাগ্রহে জবাব দিলেন। আমি যখন বললাম, ''আচ্ছা তাহলে যাই?'' তিনি খুবই আনন্দিত হলেন বলে মনে হল। সঙ্গে-সঙ্গে বললেন, ''আচ্ছা-আচ্ছা।'' 'আবার আসবেন'—এই সামান্য বাক্যটি বললেন না। এটা বলাটাই স্বাভাবিক ভদ্রতা।

তাঁর ঘর থেকে ফিরে আমার বেশ কিছু সময় মন খারাপ রইল। আমার জন্যে এটাও একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। আমার একধরনের ডিফেন্স মেকানিজম আছে—অন্যের ব্যবহারে আমি কখনো আহত হই না—কারণ এ-সবকে আমি ছেলেবেলা থেকেই তুচ্ছ করতে শিখেছি।

মিসির আলি সাহেব আমার কিছু উপকার করেছেন, তাঁর নিজের কেবিন ছেড়ে দিয়েছেন। আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু তাই বলে তিনি আমাকে অপমান করতে পারেন না। এই অধিকার তাঁর নেই। ঘন্টা দুই আগে তিনি যা করলেন তা অপমান ছাড়া আর কী। উনি রেলিং ধরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমি ব্লাড ম্যাচিং নাকি কি হাবিজাবি করে উপরে এসেছি। আমার পায়ের শব্দে তিনি তাকালেন।

আমি বললাম, ''ভালো আছেন?''

তিনি কিছু বললেন না। তাকিয়েই রইলেন।

আমি বললাম, "চিনতে পারছেন তো? আমি বুড়ি।''

তিনি বললেন, ''ও—আচ্ছা।''

'ও—আচ্ছা' কোনো বাক্য হয়? এত তাচ্ছিল্য করে কেউ কখনো আমাকে কিছু বলে নি। আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। আমার উচিত ছিল আর কোনো কথা না-বলে নিজের কেবিনে চলে আসা। তা না-করে আমি গায়ে পড়ে বললাম, ''আজ আপনার শরীরটা মনে হয় ভালো, হাঁটাহাঁটি করছেন।'' তার উত্তরে তিনি আবারও বললেন, ''ও—আচ্ছা।''

তার মানে হচ্ছে আমি কি বলছি না-বলছি তা নিয়ে তাঁর কোনো মাথাব্যথা নেই। দায়সারা 'ও—আচ্ছা' দিয়ে সমস্যা সমাধান করছেন। আমি তো তাঁকে বিরক্ত করার জন্যে কিছু বলি নি। আমি কাউকে বিরক্ত করার জন্যে কখনো কিছু করি না। উল্টোটাই সবসময় হয়। লোকজন আমাকে বিরক্ত করে। ক্রমাগত বিরক্ত করে।

মিসির আলি নামের আপাতদৃষ্টিতে বুদ্ধিমান এই মানুষটি আমাকে অপমান করছেন। কে জানে, হয়তো জেনেশুনেই করছেন। মানুষকে অপমান করার সূক্ষ্ম পদ্ধতি সবার জানা থাকে না, অস্বাভাবিক বুদ্ধিমান মানুষরাই শুধু জানেন এবং অকারণে প্রয়োগ করেন। সেই সুযোগ তাদের দেওয়া উচিত না। আমি শীতল গলায় বললাম, ''মিসির আলি সাহেব!"

উনি চমকে তাকালেন। আমি বললাম, ''ঠিক করে বলুন তো আপনি কি আমাকে চিনতে পেরেছেন?''

''চিনব না কেন?''

''আমি যা-ই জিজ্ঞেস করাছ আপনি বলছেন—'ও আচ্ছা'। এর কারণটা কি আপনি আমাকে বলবেন?''

''আপনি কী বলছেন আমি মন দিয়ে শুনি নি। শোনার চেষ্টাও করি নি। মনে হয় সে-জন্যেই 'ও আচ্ছা' বলছি।''

''কেন বলুন তো?''

''আমি প্রচণ্ড মাথাব্যথায় কষ্ট পাচ্ছি। এই উপসর্গ নতুন হয়েছে, আগে ছিল না। আমি মাথাব্যথা ভুলে থাকার জন্যে নানান কিছু ভাবছি। নিজেকে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করছি।''

আমি বললাম, ''মাথাব্যথার সময় আপনাকে বিরক্ত করবার জন্যে দুঃখিত। কিছু মনে করবেন না।''

আমি নিজের ঘরে চলে এলাম, কিন্তু ভদ্রলোকের মাথাব্যথার গল্প বিশ্বাস করলাম না। প্রচণ্ড মাথাব্যথা নিয়ে এমন শান্ত ভঙ্গিতে কেউ দাঁড়িয়ে থাকে না, এবং প্রচণ্ড মাথাব্যথায় এত সুন্দর যুক্তিভরা কথাও মনে আসে না। ভদ্রলোকের মানসিকতা কী তা মনে হয় আমি আঁচ করতে পারছি। কিছু-কিছু পুরুষ আছে, যারা রূপবতী তরুণীদের অগ্রাহ্য করে একধরনের আনন্দ পায়। সচরাচর এরা নিঃসঙ্গ ধরনের পুরুষ হয়, এবং নারীসঙ্গের জন্যে তীব্র বাসনা বুকে পুষে রাখে।

মিসির আলি সাহেব যে একজন নিঃসঙ্গ মানুষ, তা এই দু' দিনে আমি বুঝে ফেলেছি। এই ভদ্রলোককে দেখতে কোনো আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধব এখন পর্যন্ত আসে নি। আমাদের দেশে গুরুতর অসুস্থ একজনকে দেখতে কেউ আসবে না তা ভাবাই যায় না। একজন কেউ হাসপাতালে ভর্তি হলে তার আত্মীয়স্বজন আসে, বন্ধুবান্ধব আসে, পাড়া-প্রতিবেশী আসে, এমনকি গলির মোড়ের যে মুদীদোকানি—সে-ও আসে। এটা একধরনের সামাজিক নিয়ম। মিসির আলির জন্যে কেউ আসছে না।

অবশ্যি আমাকে দেখতেও কেউ আসছে না। আমার ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করা যায়। আমি কাউকেই কিছু জানাই নি। যারা জানে তাদের কঠিনভাবে বলা হয়েছে তারা যেন আমাকে দেখতে না-আসে। তারা আসছে না, কারণ আমার নিষেধ অগ্রাহ্য করলে তাদেরই সমস্যা।

আচ্ছা, আমি এই মানুষটিকে নিয়ে এত ভাবছি কেন? নিতান্ত অপরিচিত একজন মানুষকে নিয়ে এত চিন্তা-ভাবনা করার কোনো মানে হয়! আমি নিজে নিঃসঙ্গ বলেই কি একজন নিঃসঙ্গ মানুষের প্রতি মমতাবোধ করছি?

ভদ্রলোক আমার প্রতি অবহেলা দেখিয়েছেন, আমি তাতে কষ্ট পাচ্ছি। আমরা অতি প্রিয়জনদের অবহেলাতেই কষ্ট পাই। কিন্তু এই ভদ্রলোক তো আমার অতি প্রিয় কেউ নন। আমরা দু' জন দু' প্রান্তের মানুষ। তাঁর জগৎ ভিন্ন, আমার জগৎ ভিন্ন। হাসপাতাল ছেড়ে চলে যাবার পর আর কখনো হয়তো তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হবে না।

আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, এই হাসপাতালে যে-ক'টা দিন আছি সেই ক'টা দিন ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্পটল্প করলে আমার ভালো লাগবে। কারো সঙ্গে কথা বলেই আমি আরাম পাই না। যার সঙ্গেই কথা বলি, আমার মনে হয় সে ঠিকমতো কথা বলছে না। ভান করছে। নিজেকে জাহির করার চেষ্টা করছে। যেন সে পৃথিবীর সবচেয়ে জ্ঞানী মানুষ। সে ধরেই নিচ্ছে তার কথাবার্তায় মুগ্ধ হয়ে আমি মনে-মনে তার সম্পর্কে খুব উঁচু ধারণা করছি, অথচ আমি যে মনে-মনে অসংখ্য বার বলছি হাঁদারাম, হাঁদারাম, তুই হাঁদারাম, সেই ধারণাও তার নেই।

মিসির আলি নিশ্চয়ই সে-রকম হবেন না। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে নিশ্চয়ই আমি কখনো মনে-মনে বলব না—'হাঁদারাম'। আমার নিজের একটি নিতান্তই ব্যক্তিগত গল্প আছে, যা আমি খুব কম মানুষকেই বলেছি। এই গল্পটাও হয়তো আমি

তাঁকে বলতে পারি। আমার এই গল্প আমি যাঁদেরকে বলেছি তাঁদের সবাই খুব আগ্রহ নিয়ে শুনেছেন, তারপর বলেছেন–আপনার মানসিক সমস্যা আছে। ভালো কোনো সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যান।

মানুষ এই এক নতুন জিনিস শিখেছে, কিছু হলেই সাইকিয়াট্রিস্ট। মাথা এলোমেলো হয়ে আছে। সাইকিয়াট্রিস্ট সেই এলোমেলো মাথা ঠিক করে দেবেন। মানুষের মাথা কি এমনই পলকা জিনিস যে সামান্য আঘাতেই এলোমেলো হয়ে যাবে? এই কথাটিও মিসির আলি সাহেবকে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে। ভদ্রলোক মাস্টার মানুষ, কাজেই ছাত্রীর মতো ভঙ্গিতে খানিকটা ভয়ে-ভয়ে যদি জিজ্ঞেস করা যায়—আচ্ছা স্যার, মানুষের মাথা এলোমেলো হবার জন্যে কত বড় মানসিক আঘাতের প্রয়োজন? তখন তিনি নিশ্চয় এই প্রশ্নের জবাব দেবেন। সেই জবাবের গুরুত্ব থাকবে। কারণ মানুষটির ভেতর লজিকের অংশ বেশ শক্ত।

৩.

বুড়ি বলল, 'স্যার, আসব?'

মিসির আলি বিছানায় কাত হয়ে বই পড়ছিলেন—বইটির নাম—'Mysteries ofafterlife'—লেখক F.Smyth.। মজার বই। মৃত্যুর পরের জগৎ সম্পর্কে এমন সব বর্ণনা আছে, যা পড়লে মনে হয় লেখকসাহেব ঐ জগৎ ঘুরে এসেছেন। বেশ কিছুদিন সেখানে ছিলেন। ভালোমতো সবকিছু দেখা। এ- জাতীয় বই যে লেখা হয়, ছাপা হয় এবং হাজার-হাজার কপি বিক্রি হয় এটাই এক বিস্ময়।

তিনি বই বন্ধ করে বুড়ির দিকে তাকালেন। মেয়েটির সঙ্গে বেশ কয়েকবার তাঁর দেখা হয়েছে। মেয়েটির ভাবভঙ্গিতে মনে হয় তাঁর সঙ্গে দেখা করার ব্যাপারে সে একধরনের আগ্রহ বোধ করছে। আগ্রহের কারণ স্পষ্ট নয়। তার কি কোনো সমস্যা আছে? থাকতে পারে।

মিসির আলি এই মুহূর্তে অন্যের সমস্যা নিয়ে ভাবতে চাচ্ছেন না। তাঁর নিজের সমস্যাই প্রবল। শরীর-সমস্যা। ডাক্তাররা অসুখের ধরন এখনো ধরতে পারছেন না। বলছেন যকৃতের একটা অংশ কাজ করছে না। যকৃৎ মানুষের শরীরের বিশাল এক যন্ত্র। সেই যন্ত্রের অংশবিশেষ কাজ না-করলেও অসুবিধা হবার কথা নয়। তাহলে অসুবিধা হচ্ছে কেন? মাথার যন্ত্রণাই-বা কেন হচ্ছে? টিউমারজাতীয় কিছু কি হয়ে গেল? টিউমার বড় হচ্ছে-মস্তিষ্কে চাপ দিচ্ছে। সেই চাপটা শুধু সন্ধ্যার পর থেকে দিচ্ছে কেন?

বুড়ি আবার বলল, 'স্যার, আমি কি আসব?'

মেয়েটির পরনে প্রথম দিনের আসমানী রঙের শাড়ি। হয়তো এই শাড়িটিই তার ''লাকি শাড়ি''। অপারেশন টেবিলে যাবার আগে সে বলবে-আমাকে এই লাকি শাড়িটা পরতে দিন। প্লীজ ডাক্তার, প্লীজ।

রাত আটটা প্রায় বাজে। এমন কিছু রাত নয়, তবু মিসির আলির ঘুম পাচ্ছে। কারো সঙ্গেই কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। তিনি তার পরেও বললেন, 'আসুন, আসুন।'

বুড়ি ঘরে ঢুকল না। দরজার ও-পাশ থেকেই বলল, 'আপনার কি মাথা ধরা আছে?'

'এখন নেই। রোজই সন্ধ্যা থেকে শুরু হয়। আজ এখনো কেন যে শুরু হচ্ছে না বুঝতে পারছি না।'

বুড়ি হাসতে-হাসতে বলল, 'মনে হচ্ছে মাথা না-ধরায় আপনার মন খারাপ হয়ে গেছে। স্যার, আমি কি বসব?'

'বসুন, বসুন। আমাকে স্যার বলছেন কেন তা তো বুঝতে পারছি না!'

'আপনি শিক্ষক-মানুষ, এই জন্যেই স্যার বলছি। ভালো শিক্ষক দেখলেই ছাত্রী হতে ইচ্ছা করে।'

'আমি ভালো শিক্ষক, আপনাকে কে বলল?'

'কেউ বলে নি। আমার মনে হচ্ছে। আপনি কথা বলার সময় খুব জোর দিয়ে বলেন। এমনভাবে বলেন যে, যখন শুনি মনে হয় আপনি যা বলছেন তা মনে- প্রাণে বিশ্বাস করেন বলেই বলছেন। ভালো শিক্ষকের এটা হচ্ছে প্রথম শর্ত।'

'দ্বিতীয় শর্ত কী?'

'দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে জ্ঞান। ভালো শিক্ষককে প্রচুর জানতে হবে এবং ভালোমতো জানতে হবে।'

'আপনি নিজেও কিন্তু শিক্ষকের মতো কথা বলছেন।'

বুড়ি বলল, 'আমার জীবনের ইচ্ছা কী ছিল জানেন? কিন্ডার গার্টেনের শিক্ষিকা হওয়া। ফ্রক-পরা ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে ঘুরে বেড়াবে, আমি তাদের পড়াব, গান শেখাব। ব্যথা পেয়ে কাঁদলে আদর করব। অথচ আমি কী হয়েছি দেখুন-একজন অভিনেত্রী। আমার সমস্ত কর্মকাণ্ড বয়স্ক মানুষ নিয়ে। আমার জীবনে শিশুর কোনো স্থান নেই। স্যার, আমি কী বকবক করে আপনাকে বিরক্ত করছি?'

'না, করছেন না।'

'আপনি আমাকে তুমি করে ডাকলে আমি খুব খুশি হব। আপনি আমাকে তুমি করে ডাকবেন, এবং নাম ধরে ডাকবেন। প্লীজ।'

'বুড়ি ডাকতে বলছ?'

'হ্যাঁ, বুড়ি ডাকবেন। আমার ডাক নামটা বেশ অদ্ভুত না? যখন সত্যি-সত্যি বুড়ি হব, তখন বুড়ি বলে ডাকার কেউ থাকবে না।'

মিসির আলি বললেন, 'তুমি কি সবসময় এমন গুছিয়ে কথা বল?'

'আপনার কী ধারণা?'

'আমার ধারণা তুমি কম কথা বল। যারা কথা বেশি বলে, তারা গুছিয়ে কিছু বলতে পারে না। যারা কম কথা বলে, তারা যখন বিশেষ কোনো কথা বলতে চায়, তখন খুব গুছিয়ে বলতে পারে। আমার ধারণা তুমি আমাকে বিশেষ কিছু বলতে চাচ্ছ।'

'আপনার ধারণা সত্যি নয়। আমি আপনাকে বিশেষ কিছু বলতে চাচ্ছি না। আগামীকাল আমার অপারেশন। ভয়ভয় লাগছে। ভয় কাটানোর জন্যে আপনার সঙ্গে গল্প করতে এসেছি।'

'ভয় কেটেছে?'

'কাটে নি। তবে ভুলে আছি। আপনার এখান থেকে যাবার পর—গরম পানিতে গোসল করব। আয়াকে গরম পানি আনতে বলেছি। গোসলের পর কড়া ঘুমের অষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ব।'

মিসির আলি হাই তুললেন। মেয়েটির কথা এখন আর শুনতে ভালো লাগছে না। তাকে বলাও যাচ্ছে না—তুমি এখন যাও। আমার মাথা ধরেছে। মাথা সত্যি- সত্যি ধরলে—বলা যেত। মাথা ধরে নি।

'আপনি কি ভূত বিশ্বাস করেন স্যার?'

মিসির আলি হেসে ফেলে বললেন, 'গল্পটা বল।'

'কোন গল্পটা বলব?'

'কেউ যখন জানতে চায়, আপনি কি ভূত বিশ্বাস করেন, তখন তার মাথায় একটা ভূতের গল্প থাকে। ঐটা সে শোনাতে চায়। তুমিও চাচ্ছ।'

'আপনি ভুল করেছেন। আমি আপনাকে কোনো গল্প শোনাতে চাচ্ছি না। কোনো ভৌতিক গল্প আমার জানা নেই।'

'ও, আচ্ছা।'

'আর একটা কথা, আপনি দয়া করে ''ও আচ্ছা'' বাক্যটা বলবেন না, এবং নিজেকে বেশি বুদ্ধিমান মনে করবেন না।'

'বুড়ি, তুমি রেগে যাচ্ছ।'

'আমাকে তুমি-তুমি করেও বলবেন না।'

বুড়ি উঠে দাঁড়াল এবং প্রায় ঝড়ের বেগে ঘর ছেড়ে চলে গেল। মিসির আলি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। তাঁর মনে হল, প্রকৃতি শুধুমাত্র মেয়েদের মধ্যেই বিপরীত গুণাবলীর দর্শনীয় সমাবেশ ঘটিয়েছে। মেয়েকে যেহেতু সবসময়ই সন্তান ধারণ করতে হয়, সেহেতু প্রকৃতি তাকে করল—শান্ত, ধীর, স্থির। একই সঙ্গে ঠিক একই মাত্রায় তাকে করল—অশান্ত, অধীর, অস্থির। প্রকৃতির এইসব হিসাব-নিকাশ খুব মজার। দেখে মনে হয় পরিহাসপ্রিয় প্রকৃতি সবসময়ই মজার খেলা খেলছে।

মিসির আলি বই খুললেন, মৃত্যুর পরের জগৎ সম্পর্কে স্মিথ সাহেবের বক্তব্য পড়া যাক।

"স্থূল দেহের ভেতরই লুকিয়ে আছে মানুষের সূক্ষ্ম দেহ। সেই দেহকে বলে বাইওপ্লাজমিক বডি। স্থূলদৃষ্টিতে সেই দেহ দেখা যায় না। স্থূল দেহের বিনাশ হলেই সূক্ষ্ম দেহ বা বাইওপ্লাজমিক বডি স্থূল দেহ থেকে আলাদা হয়ে যায়। সূক্ষ্ম দেহ শক্তির মতো। শক্তির যেমন বিনাশ নেই-সূক্ষ্ম দেহেরও তেমনি বিনাশ নেই। সূক্ষ্ম দেহের তরঙ্গধর্ম আছে। তরঙ্গদৈর্ঘ্য, স্থূল দেহের কামনা-বাসনার সঙ্গে সম্পর্কিত। যার কামনা-বাসনা বেশি, তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য তত বেশি।''

মিসির আলি বই বন্ধ করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। স্মিথ নামের এই লোক কিছু বৈজ্ঞানিক শব্দ ব্যবহার করে তাঁর গ্রন্থটি ভারিক্কি করার চেষ্টা করেছেন। নিজের বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন পাঠকদের কাছে। গ্রন্থের শুভ ভূমিকার কথাই সবাই বলে—গ্রন্থের যে কী প্রচণ্ড ''ঋণাত্মক'' ভূমিকা আছে, সে-সম্পর্কে কেউ কিছু বলে না। একজন ক্ষতিকর মানুষ সমাজের যতটা ক্ষতি করতে পারে, তারচেয়ে এক শ' গুণ বেশি ক্ষতি করতে পারে সেই মানুষটির লেখা একটি বই। বইয়ের কথা বিশ্বাস করার

আমাদের যে-প্রবণতা, তার শিকড় অনেক দূর চলে গেছে। একটা বই মাটিতে পড়ে থাকলে তা মাটি থেকে তুলে মাথায় ঠেকাতে হয়। এই ট্রেনিং দিয়ে দেওয়া হয়েছে সুদূর শৈশবে।

'স্যার, আসব?'

মেয়েটি আবার দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। তাকে লজ্জিত এবং অনুতপ্ত মনে হচ্ছে। ঝড়ের বেগে ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার অপরাধে সে নিজেকে অপরাধী করে কষ্ট পাচ্ছে।

'স্যার, আসব?'

মিসির আলি হাসতে-হাসতে বললেন, 'না।'

মেয়েটি ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসতে-বসতে বলল, 'একটু আগে নিতান্ত বালিকার মতো যে-ব্যবহার আপনার সঙ্গে আমি করেছি, এ-রকম ব্যবহার আমি কখনোই কারো সঙ্গেই করি না। আপনার সঙ্গে কেন করলাম তা-ও জানি না। আপনার কাছেই আমি জানতে চাচ্ছি-কেন এমন ব্যবহার করলাম?'

মিসির আলি বললেন, 'এটা বলার জন্যে তুমি আস নি। অন্য কিছু বলতে এসেছ-সেটাই বরং বল।'

বুড়ি নিচু গলায় বলল, 'আমি খুব বড় ধরনের একটা সমস্যায় ভুগছি। কষ্ট পাচ্ছি। ভয়ংকর কষ্ট পাচ্ছি। আমার সমস্যাটা কেউ-একজন বুঝতে পারলে আমি কিছুটা হলেও শান্তি পেতাম। মনে হয় আপনি বুঝবেন।'

'বোঝার চেষ্টা করব। বল তোমার সমস্যা।'

'বড় একটা খাতায় সব লেখা আছে। খাতাটা আপনাকে দিয়ে যাব। আপনি ধীরেসুস্থে আপনার অবসর সময়ে পড়বেন। তবে একটি শর্ত আছে।'

'কি শর্ত?'

'কাল আমার অপারেশন হবে। আমি মারাও যেতে পারি। যদি মারা যাই, তাহলে আপনি এই খাতায় কি লেখা তা পড়বেন না। খাতাটা নষ্ট করে ফেলবেন। আর যদি বেঁচে থাকি তবেই পড়বেন।'

মিসির আলি বললেন, 'তোমার এই শর্ত পালনের জন্যে সবচেয়ে ভালো হয় যদি খাতাটা তোমার কাছে রেখে দাও। তুমি মরে গেলে আমি খাতাটা পাব না। বেঁচে থাকলে তুমি নিজেই আমাকে দিতে পারবে।'

'খাতাটা আমি আমার কাছে রাখতে চাচ্ছি না। আমি চাই না অন্য কেউ এই লেখা পড়ুক। আমি মারা গেলে সেই সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে। আপনার কাছে খাতাটা থাকলে এই দুশ্চিন্তা থেকে আমি মুক্ত থাকব।'

'দাও তোমার খাতা।'

'কাল ভোরবেলা অপারেশন থিয়েটারে যাবার আগে-আগে আপনার কাছে পাঠাব।'

'ভালো কথা, পাঠিও।'

'এখন আপনি কোনো-একটা হাসির গল্প বলে আমার মন ভালো করে দিন।'

'আমি কোনো হাসির গল্প জানি না।'

'বেশ, তাহলে একটা দুঃখের কথা বলে মন খারাপ করিয়ে দিন। অসম্ভব

খারাপ করে দিন। যেন আমি হাউমাউ করে কাঁদি।'

রাতের বেলার রাউন্ডের ডাক্তার এসে মিসির আলির ঘরে বুড়িকে দেখে খুব বিরক্ত হলেন। কড়া গলায় বললেন, 'কাল আপনার অপারেশন। আপনি ঘুরে- ফিরে বেড়াচ্ছেন, এর মানে কী?'

বুড়ি শান্ত গলায় বলল, 'এমনও তো হতে পারে ডাক্তার সাহেব যে আজ রাতই আমার জীবনের শেষ রাত। মৃত্যুর পর কোনো-একটা জগৎ থাকলে ভালো কথা, কিন্তু জগৎ তো না-ও থাকতে পারে। তখন?'

ডাক্তার সাহেব বললেন, 'প্লীজ, আপনি নিজের ঘরে যান। বিশ্রাম করুন।'

বুড়ি উঠে চলে গেল। ডাক্তার সাহেব বললেন, 'এই ভদ্রমহিলার সঙ্গে কি আপনার পরিচয় আছে?'

'সম্প্রতি হয়েছে।'

'উনি তো ডেনজারাস মহিলা।'

'ডেনজারাস কোন অর্থে বলছেন?'

'সব অর্থেই বলছি। যে-কোনো সিনেমা-পত্রিকা খুঁজে বের করুন—ওঁর সম্পর্কে কোনো-না-কোনো স্ক্যান্ডালের খবর পাবেন। একবার সুইসাইড করার চেষ্টা করেছেন-একগাদা ঘুমের অষুধ খেয়েছিলেন। এই হাসপাতালেই চিকিৎসা হয়। একবার গায়ে আগুন লাগাবার চেষ্টাও করেছেন। তাঁর বাঁ পায়ের স্কিন অনেকখানিই নষ্ট। বাইরে থেকে স্কিন গ্রাফটিং করিয়েছেন।'

'মনে হচ্ছে খুব ইন্টারেস্টিং চরিত্র।'

'অনেকের কাছে ইন্টারেস্টিং মনে হতে পারে। আমার কাছে কখনো মনে হয় না। এই মহিলার লক্ষ লক্ষ টাকা। ইচ্ছা করলেই তিনি ইংল্যান্ড আমেরিকায় গিয়ে অপারেশনটা করাতে পারেন। দেশেও নামী-দামী ক্লিনিক আছে, সেখানে যেতে পারেন। তা যাবেন না। এসে উঠবেন সরকারি হাসপাতালে। কেন বলুন তো?'

'কেন?'

'পাবলিসিটি, আর কিছুই না। অপারেশন হয়ে যাবার পর পত্রিকায় খবর হবে—অমুক হাসপাতালে অপারেশন হয়েছে। স্রোতের মতো ভক্ত আসবে। হসপিটাল অ্যাডমিনিসট্রেশন কলাপস্ করবে। আমাদের পুলিশে খবর দিতে হবে। পুলিশ লাঠি চার্জ করবে। আবারও খবরের কাগজের প্রথম পাতায় নিউজ হবে। হাসপাতাল থেকে রিলিজ্ড্ হয়ে যাবার পর তিনি খবরের কাগজে ইন্টারভ্যু দেবেন। সাংবাদিক জিজ্ঞেস করবে, আপনি বিদেশে চিকিৎসা না-করিয়ে এখানে কেন করালেন? তিনি হাসিমুখে জবাব দেবেন—'আমি দেশকে বড় ভালবাসি।' খবরের কাগজে তার হাস্যমুখী ছবি ছাপা হবে। নিচে লেখা—রূপা চৌধুরী দেশকে ভালবাসেন।

'তাঁর নাম রূপা চৌধুরী?'

'কেন, আপনি জানতেন না?'

'না।'

'রূপা চৌধুরীর নাম জানেন না শুনলে লোকে হাসবে। ওর কথা বাদ দিন; আপনি কেমন আছেন বলুন। মাথাধরা শুরু হয়েছে?'

'এখনো হয় নি, তবে হবে-হবে করছে।'

'আগামী বুধবার পিজিতে আপনার ব্রেনের একটা ক্যাট স্ক্যান করা হবে।'
'টিউমার সন্দেহ করছেন?'
'হ্যাঁ।'
'সর্বনাশ!'
'আগে ধরা পড়ুক, তারপর বলবেন সর্বনাশ। তবে সর্বনাশ বলার কিছু নেই—মস্তিষ্কের টিউমার প্রায় কখনোই ম্যালিগনেন্ট হয় না। তা ছাড়া মস্তিষ্কের অপারেশন প্রায়ই হয়। অপারেশন তেমন জটিলও নয়। নিউরো সার্জনরা আমার কথা শুনলে রেগে যাবেন, তবে কথা সত্যি।'

৪

ডাক্তার সাহেবের কথা সত্যি।
অপারেশন শেষ হবার পরপরই খবর ছড়িয়ে পড়ল রূপা চৌধুরী এই হাসপাতালে আছেন। হাজার-হাজার লোক আসতে থাকল। সে এক দর্শনীয় ব্যাপার।
মিসির আলি খবর পেলেন অপারেশন ঠিকঠাকমতো হয়েছে। মেয়েটি ভালো আছে। এটিও আনন্দিত হবার মতো ব্যাপার। তার দিয়ে যাওয়া খাতাটা পড়া শুরু করা যায়। পড়তে ইচ্ছা করছে না। অসুস্থ অবস্থায় কোনোকিছুতেই মন বসে না।
ক্যাট স্ক্যান করা হয়েছে। কিছু পাওয়া যায় নি। তার চেয়েও বড় কথা লিভারের সমস্যা বলে যা ভাবা হয়েছিল, দেখা যাচ্ছে সমস্যা সেখানে নয়। মেডিক্যাল কলেজের যে-অধ্যাপক চিকিৎসা করছিলেন, তিনি গতকাল বলেছেন, 'আপনার শরীরে তো কোনো অসুখ পাচ্ছি না। অসুখটা আপনার মনে নয় তো?'
মিসির আলি হেসে ফেললেন।
প্রফেসর সাহেব বললেন, 'হাসছেন কেন? আপনি মনোবিদ্যার একজন ওস্তাদ মানুষ তা জানি—কিন্তু মনোবিদ্যার ওস্তাদ মানুষদের মনের রোগ হবে না, এমন তো কোনো কথা নেই। ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদেরও ক্যান্সার হয়। হয় না?'
'অবশ্যই হয়। তবে মনের রোগ এবং জীবাণু বা ভাইরাসঘটিত রোগকে এক লাইনে ফেলা ঠিক হবে না।'
'আচ্ছা, ফেলছি না। আপনাকে আমার যা বলার তা বললাম, আপনার অসুস্থতার কোনো কারণ ধরা যাচ্ছে না।'
'আপনি কি আমাকে হাসপাতাল ছেড়ে দিতে বলছেন?'
'শুধু-শুধু কেবিনের ভাড়া গোনার তো আমি কোনো অর্থ দেখি না। অবশ্যি একটা উপকার হচ্ছে। বিশ্রাম হচ্ছে। যে-কোনো রোগের জন্যেই বিশ্রাম একটা ভালো অষুধ। সেই বিশ্রাম আপনি বাড়িতে গিয়েও করতে পারেন।'
'তা পারি।'
'আমি আপনাকে একটা পরামর্শ দিই মিসির আলি সাহেব?'
'দিন।'
'ময়মনসিংহের গ্রামে আমার সুন্দর একটা বাড়ি আছে। পৈত্রিক বাড়ি—যা সারা

বছর খালি পড়ে থাকে। আপনি আমার ঐ বাড়িতে কিছুদিন থেকে আসুন না।'

'আপনার পৈত্রিক বাড়িতে?'

'হ্যাঁ।'

'এই বিশেষ ফেভার আপনি কেন করতে চাচ্ছেন? আমি আপনার একজন সাধারণ রুগী। এর বেশি কিছু না। আপনি নিশ্চয়ই আপনার সব রুগীদের হাওয়া বদলের জন্যে আপনার পৈত্রিক বাড়িতে পাঠান না।'

'তা পাঠাই না.......... ।'

'আমাকে পাঠাতে চাচ্ছেন কেন?'

'আমি যদি বলি মানুষ হিসেবে আপনাকে আমার পছন্দ হয়েছে, তাহলে কি আপনার বিশ্বাস হবে?'

'বিশ্বাস হবে না। যে-সব গুণাবলী একজন মানুষকে সবার কাছে প্রিয় করে তার কিছুই আমার নেই। আমি শুকনো ধরনের মানুষ। গল্প করতে পারি না। গল্প শুনতেও ভালো লাগে না।'

ডাক্তার সাহেব উঠে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে বললেন, 'আমার বড় মেয়েটি আপনার ছাত্রী। তার ধারণা, আপনি অসাধারণ একজন মানুষ। সে চাচ্ছে যেন আপনার জন্যে বিশেষ কিছু করা হয়।'

মিসির আলি হেসে ফেললেন। তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁকে সম্পূর্ণ অন্য চোখে দেখে-এটা তিনি লক্ষ করেছেন। যদিও তার কোনো কারণ বের করতে পারেন নি। অন্য দশ জন শিক্ষক যেভাবে ক্লাস নেন তিনিও সেভাবেই নেন। এর বেশি তো কিছু করেন না। তার পরেও তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরা এ-রকম ভাবে কেন? রহস্যটা কী?

'মিসির আলি সাহেব!'

'জ্বি।'

'আমার বড় মেয়ের স্বামী ধনবান ব্যক্তি। আমার বড় মেয়ে চাচ্ছে তার খরচে আপনাকে বাইরে পাঠাতে, যাতে সর্বাধুনিক চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন। আপনি রেগে যাবেন কি না এই ভেবেই এ-প্রস্তাব এতক্ষণ দিই নি।'

'আপনার বড় মেয়ের নাম কি?'

'আমার মেয়ে বলেছে আপনি তার নাম জানতে চাইলে নাম যেন আমি না বলি। সে তার নাম জানাতে চাচ্ছে না। আপনি কি আমার মেয়ের প্রস্তাবটি গ্রহণ করবেন?'

'না, তবে আপনার প্রস্তাব গ্রহণ করব। আপনার পৈত্রিক বাড়িতে কিছুদিন থাকব। বাড়ি নিশ্চয়ই খুব সুন্দর?'

'হ্যাঁ—খুবই সুন্দর। সামনে নদী আছে। আপনার জন্যে নৌকার ব্যবস্থা থাকবে। ইচ্ছা করলে নৌকায় রাত্রিযাপন করতে পারবেন। পাকা বাড়ি। দোতলায় বারান্দা বেশ বড়। বারান্দায় এসে দাঁড়ালে ঘরে যেতে ইচ্ছা করে না—এমন।'

মিসির আলি ক্লান্ত গলায় বললেন, 'প্রাকৃতিক দৃশ্য আমাকে তেমন আকর্ষণ করে না।'

'গিয়ে দেখুন, এখন হয়তো করবে। অসুস্থ মানুষকে প্রকৃতি খুব প্রভাবিত করে। পরিবেশেরও রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা আছে। আমি কি ব্যবস্থা করব?'

'করুন।'

'দিন পাঁচেক সময় লাগবে। আমি একজন ডাক্তারের ব্যবস্থাও করব। আমার ছাত্র গৌরীপুর শহরে প্র্যাকটিস করে। তাকে চিঠি লিখে দেব, যাতে তিন-চার দিন পরপর সে আপনাকে দেখে আসে। খাওয়াদাওয়া নিয়ে চিন্তা করবেন না। বজলু আছে। সে হচ্ছে একের ভেতর তিন। কেয়ার টেকার, কুক এবং দারোয়ান। এই তিন কাজেই সে দক্ষ। বিশেষ করে রান্না সে খুব ভালো করে। মাঝে-মাঝে তার রান্নার প্রশংসা করবেন। দেখবেন সে কত খুশি হয়।'

ডাক্তার সাহেবের পৈত্রিক বাড়ি বারোকাদায়।

ময়মনসিংহ-মোহনগঞ্জ লাইনের অতিথপুর স্টেশনে নেমে ছ' মাইল যেতে হয় রিকশায়, দু' মাইল হেঁটে, এবং বাকি দু'-তিন মাইল নৌকায়।

মিসির আলির খুবই কষ্ট হল। অতিথপুর থেকে রওনা হয়ে বেশ কয়েকবার মনে হল, না-গেলে কেমন হয়? শেষ পর্যন্ত পৌঁছলেন একটামাত্র কারণে- ডাক্তার সাহেব নানান জোগাড়-যন্তর করে রেখেছেন। লোকজনকে খবর দেওয়া হয়েছে। এরপরে না-যাওয়াটা অন্যায়।

ডাক্তার সাহেবের পৈত্রিক বাড়ি খুবই সুন্দর। সম্প্রতি চুনকাম করা হয়েছে বলেই বোধহয়—সবুজের ভেতর ধবধবে সাদা বাড়ি ঝকঝক করছে। বাড়ি দেখে খুশি হবার বদলে মিসির আলির মন খারাপ হয়ে গেল। এত বড় বাড়ি খালি পড়ে আছে। খাঁ-খাঁ করছে। কোনো মানে হয়? বাড়ির জন্যে তো মানুষ নয়, মানুষের জন্যেই বাড়ি।

বাড়ির সামনে নদী না—খালের মতো আছে। অল্প পানি। সেই পানিতেই পানসিজাতীয় বিরাট এক নৌকা। বজলু হাসিমুখে বলল—'স্যার, নৌকা আপনার জন্যে। বড় আপা চিঠি দিয়েছে—যেন প্রত্যেক বিকালে নৌকার মধ্যে আপনার চা দিই।'

'ঠিক আছে, নৌকাতে চা দিও।'

'আগামীকাল কী খাবেন, স্যার যদি বলেন। মফস্বল জায়গা। আগে-আগে না-বললে জোগাড়-যন্তর করা যায় না। রাতের ব্যবস্থা আছে কই মাছ, শিং মাছ। মাংসের মধ্যে আছে কবুতরের মাংস। মাছের মাথা দিয়া মাষকালাইয়ের ডাল রানধা করছি।'

'যথেষ্ট হয়েছে। দেখ বজলু খাওয়াদাওয়া নিয়ে তুমি বেশি ব্যস্ত হয়ো না। খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে আমার আগ্রহ খুব কম। দুই পদের বেশি কখনো রান্না করবে না।'

বজলু সব ক'টা দাঁত বের করে হেসে ফেলল—

'আপনি বললে তো স্যার হবে না। বড় আপা চিঠি দিয়ে দিয়েছেন—লিখেছেন, স্যারের যত্নের যেন কোনো ত্রুটি না হয়। সবসময় খুব কম করে হলেও যেন প্রতি বেলা পাঁচ পদের আয়োজন হয়। আমি স্যার অনেক কষ্টে পাঁচ পদের ব্যবস্থা করেছি—কই মাছের ভাজি, শিং মাছের ঝোল, কবুতরের মাংস, বেগুন ভর্তা আর ডাল। আগামীকাল কী করি, এই চিন্তায় আমি অস্থির।'

'অস্থির হবার কোনো প্রয়োজন নেই বজলু। আপাতত চা খাওয়াও।'

'তাহলে স্যার নৌকায় গিয়া বসেন। বিছানা পাতা আছে। আপা বলে দিয়েছেন নৌকায় চা দেওয়ার জন্যে।'

মিসির আলি সাহেব নৌকাতেই বসলেন। তাঁর মন বলছে, বজলু তাঁকে বিরক্ত করে মারবে। ভালবাসার অত্যাচার, কঠিন অত্যাচার। একে গ্রহণও করা যায় না, বর্জনও করা যায় না।

নৌকায় বসে মিসির আলি একটা মজার জিনিস লক্ষ করলেন। খাল বরাবর আমগাছগুলি টিয়া পাখিতে ভর্তি। দশ-পনেরটি নয়, শত-শত। এরা যখন ওড়ে তখন আর এদের সবুজ দেখায় না। কালো দেখায়। এর মানে কী? টিয়া কালো দেখাবে কেন? চলমান সবুজ রঙ যদি কালো দেখায়, তাহলে তো চলন্ত ট্রেনের সবুজ কামরাগুলিও কালো দেখানোর কথা। তা কি দেখায়? মিসির আলি মনে করতে পারলেন না। বজলুকে একবার পাঠাতে হবে চলন্ত ট্রেন দেখে আসার জন্যে। সে দেখে এসে বলুক।

প্রথম রাতে মিসির আলির ভালো ঘুম হল না। প্রকাণ্ড বড় খাট-তাঁর মনে হতে লাগল তিনি মাঠের মাঝখানে শুয়ে আছেন। বাতাসও খুব সমস্যা করতে লাগল। জানালা দিয়ে এক-একবার দমকা হাওয়া আসে, আর তাঁর মনে হয় তাঁকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। মাঝরাতে দরজা-জানালা বন্ধ করে তিনি বুড়ির খাতা নিয়ে বসলেন।

৫

আমার বাবা মারা যান, যখন আমার বয়স পনের মাস।

বাবার অভাব আমি বোধ করি নি, কারণ বাবা সম্পর্কে আমার কোনো স্মৃতি নেই। স্মৃতি থাকলেই অভাববোধের ব্যাপারটা চলে আসত। আমাকে মানুষ করেছেন আমার মা। তিনি অত্যন্ত সাবধানী মহিলা। বাবার অভাব যাতে আমি কোনোদিন বুঝতে না-পারি, তার সবরকম চেষ্টা তিনি বাবার মৃত্যুর পর থেকেই করে আসছেন। তিনি যা-যা করেছেন তার কোনোটিই কোনো সুস্থ মহিলা কখনো করবেন না। মা হচ্ছেন একজন অসুস্থ, অস্বাভাবিক মহিলা। যেহেতু জন্ম থেকেই আমি তাঁকে দেখে আসছি, তাঁর অস্বাভাবিকতা আমার চোখে ধরা পড়তে অনেক সময় লেগেছে।

বাবার মৃত্যুর পর ঘর থেকে তাঁর সমস্ত ছবি, ব্যবহারি জিনিস সরিয়ে ফেলা হয়—কিছু নষ্ট করে দেওয়া হয়, কিছু পাঠিয়ে দেওয়া হয় আমার দাদার বাড়িতে। মা'র যুক্তি ছিল—বাবার স্মৃতিজড়িত কিছু তাঁর চারপাশে রাখতে পারবেন না। স্মৃতির কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা তাঁর নেই।

বাবা কেমন ছিলেন, তিনি কী করতেন, কী গল্প করতেন—এ-সব নিয়েও মা কখনো আমার সঙ্গে কিছু বলেন নি। বাবার সম্পর্কে কিছু বলতে গেলেই তাঁর নাকি অসম্ভব কষ্ট হয়। মা এই কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে বাবার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সবকিছু থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন। বাবার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সবার সঙ্গেই সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। আমার নাম 'তিতলী', যা বাবা আগ্রহ করে রেখেছিলেন তা-ও বদলানো হল। আমার নতুন নাম হল রূপা। তিতলী নাম মা বদলালেন, কারণ এই নাম তাঁকে বাবার কথা মনে করিয়ে দিত।

মা অসম্ভব রূপবতী। আরেকটি বিয়ে করাই মা'র জন্যে স্বাভাবিক ছিল। পাত্রের অভাব ছিল না। রূপবতীদের পাত্রের অভাব কখনো হয় না। মা বিয়ে করতে রাজি

হলেন না। বিয়ের বিপক্ষে একটি যুক্তি দিলেন, যে-ছেলেটিকে বিয়ে করব তার স্বভাব-চরিত্র যদি রূপার বাবার চেয়ে খারাপ হয়, তাহলে কখনো তাকে ভালবাসতে পারব না। দিনরাত রূপার বাবার সঙ্গে তার তুলনা করে নিজে কষ্ট পাব, তাকেও কষ্ট দেব। সেটা ঠিক হবে না। আর যদি ছেলেটি রূপার বাবার চেয়ে ভালো হয়, তাহলে রূপার বাবাকে আমি ক্রমে-ক্রমে ভুলে যাব। তাও ঠিক হবে না। এই মানুষটিকে আমি ভুলতে চাই না।

আমার মামারা ছাপোষা ধরনের মানুষ। মা'কে নিয়ে তাঁরা দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। কন্যাসহ বোনের বোঝা মাথায় নেবার মত সামর্থ্য বা ইচ্ছা কোনোটাই তাঁদের ছিল না। তবু মা তাঁদের ঘাড়ে সিন্দাবাদের ভূতের মত চেপে রইলেন। কিছুদিন তিনি এক ভাইয়ের বাড়িতে থাকেন, তারপর যান অন্য ভাইয়ের বাসায়। মামারা ধরেই নিলেন মা তাঁর জীবনটা এভাবেই পার করবেন। তাঁরা মা'র সঙ্গে কুৎসিত গলায় ঝগড়া করেন। গালাগালি করেন। মা নির্বিকার। আমার বয়স যখন পাঁচ হল তখন আমাকে বললেন, 'রূপা, তোকে তো এখন একটা স্কুলে দিতে হয়। ঘুরে-ঘুরে জীবন পার করলে হবে না। আমাকে থিতু হতে হবে। আমি এখন একটা বাসা ভাড়া নেব। সম্ভব হলে একটা বাড়ি কিনে নেব।'

আমি বললাম, 'টাকা পাবে কোথায়?'

মা বললেন, 'টাকা আছে। তোর বাবার একটা পয়সাও খরচ করি নি, জমা করে রেখেছি।'

বাবা বিদেশি এক দূতাবাসে চাকরি করতেন। চাকরিকালীন সময়ে রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা যান বলে ইন্সুরেন্স থেকে এবং দূতাবাস থেকে বেশ ভালো টাকাই পেয়েছিলেন। মা সেই টাকার অনেকখানি খরচ করে নয়াটোলায় দোতলা এক বাড়ি কিনে ফেললেন। বেশ বড় বাড়ি। প্রায় এক বিঘা জমি নিয়ে বাড়ি। একতলা দোতলা মিলে অনেকগুলি ঘর। ভেতরের দিকে দুটো আমগাছ, একটা সজনেগাছ, একটা কাঁঠালগাছ। বাড়ি পুরনো হলেও সব মিলিয়ে খুব সুন্দর। একতলাটা পাঁচ হাজার টাকায় ভাড়া হল। আমরা থাকি দোতলায়। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বাড়ি। মা সেই পাঁচিল আরো উঁচু করলেন। ভারি গেট করলেন। একজন দারোয়ান রাখলেন। আমাদের নতুন জীবন শুরু হল।

নতুন জীবন অনেক আনন্দময় হওয়া উচিত ছিল। মামাদের ঝগড়া-গালাগালি নেই। অভাব-অনটন নেই। এত বড় দোতলায় আমরা দু' জনমাত্র মানুষ। বাড়িটাও সুন্দর। দোতলায় রেলিং দেওয়া টানা-বারান্দাও আছে। আমার খেলার সঙ্গী-সাথীও আছে। একতলার ভাড়াটের আমার বয়সী দু'টি যমজ মেয়ে আছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, আমাদের নিজস্ব বাড়িতে আমার ভয়াবহ জীবন শুরু হল। মা সারাক্ষণ আমাকে আগলে রাখেন। নিজে স্কুলে নিয়ে যান, যে-চারঘন্টা স্কুল চলে মা মাঠে বসে থাকেন। ছুটি হলে আমাকে নিয়ে বাসায় ফেরেন। দুপুরে খাবার পরই আমাকে আমার ঘরে আটকে দেন। ঘুমুতে হবে। বিকেলে যদি বলি, 'মা, নিচে খেলতে যাই?'

তিনি গম্ভীর মুখে বলেন, 'না। দোতলার বারান্দায় বসে খেল। খেলার জন্যে নিচে যেতে হবে কেন?'

'নিচে গেলে কী হবে মা?'

'তুমি নিচে গেলে আমি এখানে একা-একা কী করব?'

আসল কথা হচ্ছে মা'র নিঃসঙ্গতা। আমি তাঁর একমাত্র সঙ্গী। সেই সঙ্গী তিনি একমুহূর্তের জন্যেও চোখের আড়াল করবেন না। দিনের পর দিন রাগারাগি করেছি, কান্নাকাটি করেছি, কোনো লাভ হয় নি।

কতবার বলেছি, 'মা, সবাই কত জায়গায় বেড়াতে যায়—চল আমরাও যাই। বেড়িয়ে আসি।'

'কোথায় যাবে?'

'চল কক্সবাজার যাই।'

'না।'

'তাহলে চল অন্য কোথাও যাই।'

'ঢাকার বাইরে যেতে আমার ইচ্ছা করে না।'

'ঢাকার ভেতরেই কোথাও যাই চল।'

'কোথায় যেতে চাস?'

'মামাদের বাড়ি।'

'না।'

'বাবার দেশের বাড়িতে যাবে মা? বড়চাচা তো লিখেছেন যেতে।'

'সেই চিঠি তুমি পড়েছ?'

'হ্যাঁ।'

'কেন পড়লে? আমি বলি নি—আমার কাছে লেখা কোনো চিঠি তুমি পড়বে না? বলেছি, না বলি নি?'

'বলেছ।'

'তাহলে কেন পড়েছ?'

'আর পড়ব না মা।'

'এইভাবে বললে হবে না। চেয়ারের উপর উঠে দাঁড়াও। কানে ধর। কানে ধরে বল—আর পড়ব না।'

মা'র চরিত্রে অস্বাভাবিকতার বীজ আগে থেকেই ছিল। যত দিন যেতে লাগল তত তা বাড়তে লাগল। মানুষের মানিয়ে চলার ক্ষমতা অসাধারণ। আমি মা'র সঙ্গে মানিয়ে চলার চেষ্টা করতে লাগলাম, এবং চলতেও লাগলাম। নিজের মনে থাকি। প্রচুর গল্পের বই পড়ি। মাঝে-মাঝে অসহ্য রাগ লাগে। সেই রাগ নিজের মধ্যে রাখি, মা'কে জানতে দিই না। আমার বয়স অল্প হলেও আমি ততদিনে বুঝে গিয়েছি—আমিই মা'র একমাত্র অবলম্বন। তাঁর সমস্ত জগৎ, সমস্ত পৃথিবী আমাকে নিয়েই।

মাঝে-মাঝে মা এমন সব অন্যায় করেন, যা ক্ষমার অযোগ্য। আমি সেই অপরাধও ক্ষমা করে দিই। একটা উদাহরণ দিই। আমি সেবার ক্লাস নাইনে উঠেছি। যারা এস· এস· সি· পরীক্ষা দেবে তাদের ফেয়ারওয়েল হচ্ছে। ফেয়ারওয়েলে নাটক করা হবে। আমাকে নাটকে একটা পার্ট দেওয়া হল। আমার উৎসাহের সীমা রইল না। মা'কে কিছুই জানালাম না। জানালে মা নাটক করতে দেবেন না। মা জেনে গেলেন। গম্ভীর হয়ে রইলেন। কিছু বললেন না। আমি মা'কে সহজ করার অনেক চেষ্টা করলাম। মা সহজ হলেন না। যেদিন নাটক হবে তার আগের রাতে খাবার টেবিলে মা

প্রথমবারের মতো বললেন, 'তোমাদের নাটকের নাম কি?'

আমি উৎসাহের সঙ্গে বললাম—'হাসির নাটক মা। নাম হচ্ছে—দুই দু' গুণে পনের। দম-ফাটানো হাসির নাটক।'

'তোমার চরিত্রটা কী?'

'আমি হচ্ছি বড় বোন, পাগলাটে ধরনের মেয়ে। তাকে যে-কাজটি করতে বলা হয় সে সবসময় তার উল্টো কাজটি করে। তারপর খুব অবাক হয়ে বলে—Ohmy God, এটা কী করলাম! আমার অভিনয় খুব ভালো হচ্ছে মা। আমাদের বড়আপা গতকালই আমাকে ডেকে নিয়ে বলেছেন—আমার ভেতর অভিনয়ের জন্মগত প্রতিভা আছে। চর্চা করলে আমি খুব নাম করব। মা, তুমি কি নাটকটা দেখবে?'

'না।'

'দেখতে চাইলে দেখতে পারবে। এই অনুষ্ঠানে গার্জিয়ানরা আসতে পারবেন না। তবে বড়আপা বলেছেন, যারা অভিনয় করছে তাদের মা'রা ইচ্ছে করলে আসতে পারবেন। তুমি যাবে মা? চল না। প্লীজ।'

মা শুকনো গলায় বললো, 'দেখি।'

'তুমি গেলে আমি অসম্ভব খুশি হব মা। অসম্ভব, অসম্ভব, অসম্ভব খুশি হব। এত খুশি হব যে চিৎকার করে কাঁদব।'

মা কিছু বললেন না। আমার মনে ক্ষীণ আশা হল মা হয়তো যাবেন। আনন্দে সারা রাত আমি ঘুমুতে পারলাম না। তন্দ্রামতো আসে আবার তন্দ্রা ভেঙে যায়। কী যে আনন্দ!

ভোরবেলা দরজা খুলে বেরুতে গিয়ে দেখি দরজা বাইরে থেকে তালাবন্ধ। আমি চেঁচিয়ে ডাকলাম, 'মা-মা-মা।'

মা এলেন। আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'তালাবন্ধ করে রেখেছ কেন মা?'

মা শীতল গলায় বললেন, 'আমি অনেক চিন্তা করে দেখলাম-তোমার অভিনয় করা ঠিক হবে না।'

'কী বলছ তুমি মা?'

'যা সত্যি তাই বলছি।'

'স্কুলে আপারা কী মনে করবে মা! আমি না-গেলে নাটক হবে না।'

'না-হলে না-হবে। নাটক এমন কিছু বড় জিনিস না।'

'পরে যখন স্কুলে যাব ওদের আমি কী বলব?'

'বলবি অসুখ হয়েছিল। মানুষের অসুখ হয় না?'

আমি কাঁদতে-কাঁদতে বললাম, 'ঠিক আছে মা—আমি স্কুলে যাব না। তুমি তালা খুলে দাও।'

'তালা সন্ধ্যার সময় খুলব।'

আমি যাচ্ছি না দেখে স্কুলের এক আপা আমাকে নিতে এলেন, মা তাঁকে বললেন, 'মেয়েটা অসুস্থ। খুবই অসুস্থ। সে মামার বাড়িতে আছে।' একবার ভাবলাম চিৎকার করে বলি—আপা আমি বাড়িতেই আছি, মা আমাকে তালাবন্ধ করে রেখেছে। পরমুহূর্তেই মনে হল—থাক।

মা তালা খুললেন সন্ধ্যাবেলায়। তাঁকে কিছুমাত্র লজ্জিত বা দুঃখিত মনে হল না।

শুধু রাতে আমার সঙ্গে ঘুমুতে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন। কান্না দেখে আমি মা'র অপরাধ ক্ষমা করে দিলাম।

আমি যখন ক্লাস টেনে উঠলাম তখন মা আরো একটি বড় ধরনের অপরাধ করলেন। আমাদের একতলায় তখন নতুন ভাড়াটে। তাদের বড় ছেলের নাম আবীর। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ইংরেজিতে অনার্স পড়েন। লাজুক স্বভাবের ছেলে। কখনো আমার দিকে চোখ তুলে তাকান না। যতবার আমার সঙ্গে দেখা হয় তিনি লজ্জায় লাল হয়ে যান। আমি ভেবে পাই না, আমাকে দেখে উনি এত লজ্জা পান কেন? আমি কী করেছি? আমি তো তাঁর সঙ্গে কথাও বলি না। তাঁর দিকে তাকাইও না।

একদিন সন্ধ্যাবেলা চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ছাদে গিয়েছি, দেখি, উনি ছাদে হাঁটাহাঁটি করছেন। আমাকে দেখে চমকে উঠে বললেন, 'আমার বাবা আমাকে আপনাদের এই ছাদটা দেখতে পাঠিয়েছেন, এই জন্যে ছাদে এসেছি। অন্য কিছু না।'

আমি বললাম, 'ছাদ দেখতে পাঠিয়েছেন কেন?'

'আমার বড় বোনের মেয়ে হয়েছে। এই বাসায় ওর আকিকা হবে। বাবা বললেন—ছাদে প্যান্ডেল করে লোক-খাওয়াবেন, যদি ছাদটা বড় হয়।'

'ছাদটা কি বড়?'

'বড় না, তবে খুব সুন্দর। আমি যদি কিছুক্ষণ ছাদে থাকি আপনার মা কি রাগ করবেন?'

'না, রাগ করবেন কেন?'

'ওঁকে দেখলেই মনে হয় আমার উপর উনি খুব রাগ করে আছেন। আমার কেন জানি মনে হয়—উনি আমাকে সহ্য করতে পারেন না।'

আমি হাসতে-হাসতে বললাম, 'আপনি শুধু-শুধু ভয় পাচ্ছেন। মা শুধু আমার উপর রাগ করেন, আর কারো উপর রাগ করেন না।'

তিনি বললেন, 'আপনি যে এতক্ষণ ছাদে আছেন, আমার সঙ্গে কথা বলছেন, এটা জানতে পারলে আপনার মা খুব রাগ করবেন।'

'রাগ করবেন কেন? আর আপনি আমাকে আপনি-আপনি করছেন কেন? শুনতে বিশ্রী লাগছে। আমি আপনার ছোট বোন মীরার চেয়েও বয়সে ছোট। আমাকে তুমি করে বলবেন।'

মনে হল আমার কথা শুনে তিনি খুব ঘাবড়ে গেলেন। আমার দারুণ মজা লাগল। উনি অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকে বললেন, 'আপনি কি ---- মানে তুমি কি রোজ ছাদে এসে চা খাও? '

'হ্যাঁ। হেঁটে-হেঁটে চা খেতে আমার খুব ভালো লাগে। হেঁটে-হেঁটে চা খাই, আর নিজের সঙ্গে গল্প করি।'

'নিজের সঙ্গে গল্প কর মানে?'

'আমার তো গল্প করার কেউ নেই। এই জন্যে নিজের সঙ্গে গল্প করি। আমি একটা প্রশ্ন করি। আবার আমিই উত্তর দিই। আচ্ছা, আপনি চা খাবেন? আপনার জন্যে চা নিয়ে আসব?'

'না-না-না।'

'এ-রকম চমকে উঠে ''না-না'' করছেন কেন? আপনার জন্যে আলাদা করে চা বানাতে হবে না। মা একটা বড় টী-পটে চা বানিয়ে রেখে দেন। একটু পরপর চা খান। আমি সেখান থেকে ঢেলে এককাপ চা নিয়ে আসব। আপনি আমার মতো হাঁটতে-হাঁটতে চা খেয়ে দেখুন, আপনার ভালো লাগবে।'

'ইয়ে—তাহলে দু' কাপ চা আন। দু' জনে মিলেই খাই। তোমার মা জানতে পারলে আবার রাগ করবেন না তো?'

'না, রাগ করবেন না।'

আমি ট্রে-তে করে দু' কাপ চা নিয়ে ছাদের সিঁড়ির দিকে যাচ্ছি—মা ডাকলেন, 'বুড়ি এদিকে আয়। কি ব্যাপার? চা কার জন্যে নিয়ে যাচ্ছিস?'

আমি মা'র কথা বলার ভঙ্গিতে ভয়ানক চমকে উঠলাম। কী ভয়ংকর লাগছে মা'কে। হিংস্র কোনো পশুর মতো দেখাচ্ছে। তাঁর মুখে ফেনা জমে গেছে। চোখ টকটকে লাল।

'তুই কি আবীর ছেলেটির জন্যে চা নিয়ে যাচ্ছিস?'

'হ্যাঁ।'

'এতক্ষণ কি ছাদে তার সঙ্গে কথা বলছিলি?'

'হুঁ।'

'ও কি তোর হাত ধরেছে?'

আমি হতভম্ব হয়ে বললাম, 'এ-সব কী বলছ মা!'

'হ্যাঁ কি না?'

'মা, আমি শুধু দু'-একটা কথা ······'

'শোন্ বুড়ি, তুই এখন আমার সঙ্গে নিচে যাবি। ঐ বদ ছেলের মা'কে তুই বলবি—আপনার ছেলে আমার গায়ে হাত দিয়েছে। আমি ঐ বদ ছেলেকে শিক্ষা দেব, তারপর বাড়ি থেকে তাড়াব। কাল দিনের মধ্যেই এই বদ পরিবারটাকে বাড়ির বাইরে বের করে দিতে হবে।'

আমি কাঁদতে-কাঁদতে বললাম, 'এ-সব তুমি কী বলছ মা?'

মা হিসহিস করে বললেন, 'আমি যা বললাম তা যদি না করিস, আমি তোকে খুন করব। আল্লার কসম আমি তোকে খুন করব। আয় আমার সঙ্গে, আয় বললাম, আয়।'

আমি কাঁদতে-কাঁদতে মা'র সঙ্গে নিচে গেলাম। মা আবীরের মা'কে কঠিন গলায় বললেন, 'আপনার ছেলে আমার মেয়ের গায়ে হাত দিয়েছে। আপনার ছেলেকে ডেকে আনুন। এর বিচার করুন।'

ছেলের মা হতভম্ব হয়ে বললেন, 'আপা, আপনি এ-সব কী বলছেন? আমার ছেলে এ-রকম নয়। আপনি ভুল সন্দেহ করছেন। আবীর এমন নোংরা কাজ কখনো করবে না।'

'আপনি আপনার ছেলেকে ডেকে আনুন। আমি তার সামনেই কথা বলব।'

উনি এসে দাঁড়ালেন। লজ্জায় ভয়ে বেচারা এতটুক হয়ে গেছে। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। মা আমাকে বললেন, 'বুড়ি বল্, বল্ তুই। এই বদ ছেলে কি তোর গায়ে হাত দিয়েছে? সত্য কথা বল্। সত্য কথা না-বললে তোকে খুন করে ফেলব। বল্ এই ছেলে কি তোর গায়ে হাত দিয়েছে?'

আমি কাঁদতে–কাঁদতে বললাম, 'হ্যাঁ, দিয়েছে।'

'বুকে হাত দিয়েছে কি না বল্। দিয়েছে বুকে হাত?'

'হ্যাঁ।'

মা কঠিন গলায় বললেন, 'আপনি নিজের কানে শুনলেন আমার মেয়ে কি বলল, এখন ছেলেকে শাস্তি দেবেন বা দেবেন না সেটা আপনাদের ব্যাপার। আমার কথা হল আগামীকাল দুপুরের আগে আপনারা এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাবেন।'

আমি এক পলকের জন্যে তাকালাম আবীর ভাইয়ের দিকে। তিনি পলকহীন চোখে আমার দিকেই তাকিয়ে আছেন। সেই চোখে রাগ, ঘৃণা বা দুঃখ নেই; শুধুই বিস্ময়।

তাঁরা পরদিন দুপুরে সত্যি–সত্যি বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন। রাতে মা আমার সঙ্গে ঘুমুতে এসে, আমাকে জড়িয়ে ধরে খুব কাঁদতে লাগলেন। আমি মনে–মনে বললাম, 'মা, তোমাকে আমি ক্ষমা করতে চেষ্টা করছি, পারছি না। তুমি এমন করে কেঁদো না মা। আমার কষ্ট হচ্ছে। এমনিতেই অনেক কষ্ট পেয়েছি। আর কষ্ট দিও না।'

প্রথম পর্যায়ের লেখা এই পর্যন্তই। তারিখ দেওয়া আছে। সময় লেখা—রাত দু'টা পনের। সময়ের নিচে লেখা—একটানা অনেকক্ষণ লিখলাম। ঘুম পাচ্ছে। এখন ঘুমুতে যাব। মা আমার বিছানায় এসে শুয়েছেন। আজ সারা দিন হাঁপানিতে কষ্ট পেয়েছেন। এখন সম্ভবত হাঁপানিটা কমেছে। আরাম করে ঘুমুচ্ছেন। আজ সারা দিন মা'র নামাজ কাজা হয়েছে। ঘুম ভাঙলে কাজা নামাজ শুরু করবেন। রাত পার করে দেবেন নামাজে। কাজেই মা'র ঘুম না ভাঙিয়ে খুব সাবধানে বিছানায় যেতে হবে।

মিসির আলি তাঁর নোটবই বের করে পয়েন্ট নোট করতে বসলেন। পয়েন্ট একটিই—মেয়ের মা'র চরিত্রে যে-অস্বাভাবিকতা আছে তা মেয়ের মধ্যেও চলে এসেছে। মেয়ে নিজে তা জানে না। সে নিজেকে যতটা স্বাভাবিক ভাবছে তত স্বাভাবিক সে নয়। একটি স্বাভাবিক মেয়ে তার মৃত বাবার জন্যে অনেক বেশি ব্যস্ততা দেখাত। এত বড় একটি লেখার কোথাও সে বাবার নাম উল্লেখ করে নি। এমন না যে বাবার নাম তার অজানা। মা'র সম্পর্কে রূপবতী শব্দটি সে ব্যবহার করেছে—বাবা সম্পর্কে কিছুই বলে নি। তার মা, এত বড় একটা কাণ্ড করার পরেও মা'র কষ্টটাই তার কাছে প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিজেকে সে মা'র কাছ থেকে আলাদা করতে পারছে না। এর ফলাফল সাধারণত শুভ হয় না। এত বড় ঘটনার পরেও যে মা'র কাছ থেকে নিজেকে আলাদা করতে পারছে না—সে আর কোনোদিনও পারবে না।

মিসির আলি রূপার খাতার পাতা ওল্টালেন।

৬

এস. এস.সি.-তে আমার এত ভালো রেজাল্ট হবে আমি কল্পনাও করি নি। আমাদের ক্লাসের অন্য সব মেয়েদের প্রাইভেট টিউটর ছিল, আমার ছিল না। মা'র পছন্দ নয়। মা'র ধারণা, অল্পবয়স্ক প্রাইভেট মাস্টাররা ছাত্রীর সাথে প্রেম করার চেষ্টা

করে, বয়স্করা নানান কৌশলে গায়ে হাত দেওয়ার চেষ্টা করে। কাজেই যা পড়লাম, নিজে-নিজে পড়লাম। রেজাল্ট হবার পর বিস্ময়ে হকচকিয়ে গেলাম। কি আশ্চর্য কাণ্ড, ছেলেমেয়ে সবার মধ্যে ফিফ্‌থ্‌। পাঁচটা বিষয়ে লেটার।

আমি বললাম, 'তুমি কি খুশি হয়েছ মা?'

মা যন্ত্রের মতো বললেন, 'হুঁ।'

'খুব খুশি না অল্প খুশি?'

'খুব খুশি।'

'আমাদের সঙ্গে যে, মেয়েটা ফোর্থ হয়েছে সে শান্তিনিকেতনে পড়তে যাচ্ছে। তুমি কি আমাকে শান্তিনিকেতনে পড়তে দেবে?'

মা আমাকে বিস্মিত করে দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, দেব।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ, সত্যি। কীভাবে যেতে হয়, টাকাপয়সা কত লাগে খোঁজখবর আন্।'

'তুমি সত্যি-সত্যি বলছ তো মা?'

'বললাম তো—হ্যাঁ।'

'আমার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না।'

'বিশ্বাস না হবার কী আছে? এই দেশে কি আর পড়াশোনা আছে? টাকা থাকলে তোকে বিলেতে রেখে পড়াতাম।'

আমার আনন্দের সীমা রইল না। ছোটাছুটি করে কাগজপত্র জোগাড় করলাম। অনেক যন্ত্রণা! সরকারি অনুমতি লাগে। আরো কি কি সব যন্ত্রণা। সব করলেন রুমার বাবা। রুমা হচ্ছে সেই মেয়ে, যে ফোর্থ হয়েছে। রুমার বাবা সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি। তিনি যে শুধু ব্যবস্থা করে দিলেন তাই না, আমাদের দু' জনের জন্যে দুটো স্কলারশিপেরও ব্যবস্থা করে দিলেন। পাসপোর্ট-ভিসা সব উনি করলেন। বাংলাদেশ বিমানে যাব, সকাল ৯টায় ফ্লাইট। উত্তেজনায় আমি রাতে ঘুমুতে পারলাম না। মা আমাকে জড়িয়ে ধরে সারা রাতই ফুঁপিয়ে কাঁদলেন। খানিকক্ষণ কাঁদেন, তারপর বলেন, 'ও বুড়ি, তুই কি পারবি আমাকে ছেড়ে থাকতে?'

'কষ্ট হবে, তবে পারব। তুমিও পারবে।'

'না—আমি পারব না।'

'যখন খুব কষ্ট হবে তখন কোলকাতা চলে যাবে। কোলকাতা থেকে শান্তিনিকেতন দেড় ঘন্টা লাগে ট্রেনে। শান্তিনিকেতনে অতিথি ভবন আছে, সেখানে উঠবে। আমার যখন খারাপ লাগবে, আমিও তাই করব, হুট করে ঢাকায় চলে আসব।'

'তুই বদলে যাচ্ছিস।'

'আমি আগের মতোই আছি মা। সারা জীবন এই রকমই থাকব।'

'না, তুই বদলাবি। তুই ভয়ংকর রকম বদলে যাবি। আমি বুঝতে পারছি।'

'তোমার যদি বেশি রকম খারাপ লাগে তাহলে আমি শান্তিনিকেতনে যাবার আইডিয়া বাদ দেব।'

'বাদ দিতে হবে না। তোর এত শখ, তুই যা।'

'মা শোন, যাবার পর যদি দেখি খুব খারাপ লাগছে তাহলে চলে আসব।'

খুব ভোরে আমার ঘুম ভাঙল। দেখি মা বিছানায় নেই। দরজা খুলতে গিয়ে দেখি বাইরে থেকে তালাবন্ধ। আমি আগের বারের মতো হৈচৈ-চেঁচামেচি করলাম না, কাঁদলাম না—চুপ করে রইলাম। তালাবন্ধ রইলাম সন্ধ্যা পর্যন্ত। সন্ধ্যাবেলা মা নিচু গলায় বললেন, 'ভাত খেতে আয় বুড়ি। ভাত দিয়েছি।'

আমি শান্ত মুখে ভাত খেতে বসলাম। এমন ভাব করলাম যেন কিছুই হয় নি। মা বললেন, 'ডালটা কি টক হয়ে গেছে? সকালে রান্না করেছিলাম, দুপুরে জ্বাল দিতে ভুলে গেছি।'

আমি বললাম, 'টক হয় নি। ডাল খেতে ভালো হয়েছে মা।'

'ভাত খাবার পর কি চা খাবি? চা বানাব?'

'বানাও।'

আমি চা খেলাম। খবরের কাগজ পড়লাম। ছাদে হাঁটতে গেলাম। মা যখন এশার নামাজ পড়তে জায়নামাজে দাঁড়ালেন, তখন আমি এক অসীম সাহসী কাণ্ড করে বসলাম। বাড়ি থেকে পালালাম। রাত ন'টায় উপস্থিত হলাম এষার বাসায়। এষা আমার বান্ধবী। এষার বাবা-মা খুবই অবাক হলেন। তাঁরা তক্ষুণি আমাকে পৌঁছে দিয়ে আসতে চান। অনেক কষ্টে তাঁদের আটকালাম। একরাত তার বাসায় থেকে, ভোরবেলা চলে গেলাম রুবিনাদের বাড়ি। রুবিনাকে বললাম, 'আমি দু' দিন তোদের বাড়িতে থাকব। তোর কি অসুবিধা হবে? আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছি।'

রুবিনা চোখ কপালে তুলে ফেলল। আমি বললাম, 'তুই তোর বাবা-মা'কে কিছু একটা বল্, যাতে তাঁরা সন্দেহ না করেন যে আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছি।'

রুবিনাদের বাড়িতে দু' দিনের জায়গায় আমি চার দিন কাটিয়ে পঞ্চম দিনের দিন মা'র কাছে ফিরে যাওয়া স্থির করলাম। বাড়ি পৌঁছলাম সন্ধ্যায়। মা আমাকে দেখলেন, কিছুই বললেন না। এ-রকমভাবে তাকালেন যেন কোথাও বেড়াতে গিয়েছিলাম। ফিরে এসেছি। আমি চাপা গলায় বললাম, 'কেমন আছ মা?'

মা বললেন, 'ভালো।'

'তুমি মনে হয় আমার উপর ভয়ংকর রাগ করেছ। কি শাস্তি দিতে চাও—দাও। আমি ভয়ংকর অন্যায় করেছি। শাস্তি আমার প্রাপ্য।'

মা কিছু বললেন না। রান্নাঘরে ঢুকে গেলেন। আমি লক্ষ করলাম, বসার ঘরে অল্পবয়সী একটি ছেলে বসে আছে। কঠিন ধরনের চেহারা। রোগা, গলাটা হাঁসের মতো অনেকখানি লম্বা। মাথার চুল তেলে জবজব করছে। সে খবরের কাগজ পড়ছিল। আমাকে একনজর দেখে আবার খবরের কাগজ পড়তে লাগল।

আমি মা'কে গিয়ে বললাম, 'বসার ঘরে বসে আছে লোকটা কে?'

'ওর নাম জয়নাল। আমাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়। ইনজিনিয়ারিং পড়ে। ফাইনাল ইয়ারে। এ-বছর পাশ করে বেরুবে।'

'এখানে কী জন্যে?'

'তুই চলে যাবার পর আমি খবর দিয়ে আনিয়েছি। একা থাকতাম। ভয়ভয় লাগত।'

'আই এম সরি মা। এ-রকম ভুল আর করব না। আমি চলে এসেছি, এখন তুমি

ওকে চলে যেতে বল।'

'তুই আমার ঘরে আয় বুড়ি। তোর সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে।'

আমি মা'র ঘরে গেলাম। মা দরজা বন্ধ করে দিলেন। মা'র দিকে তাকিয়ে আমি চমকে উঠলাম। এতক্ষণ লক্ষই করি নি এই পাঁচদিনে মা'র চেহারা, স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ ভেঙে গেছে। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে একটা জীবন্ত কঙ্কাল। মা বললেন, 'তুই চলে যাবার পর থেকে আমি পানি ছাড়া আর কিছুই খাই নি। এটা কি তোর বিশ্বাস হয়?'

আমি কাঁপা গলায় বললাম, 'হয়।'

মা বললেন, 'দোকান থেকে ইঁদুর-মারা বিষ এনে আমি গ্লাসে গুলে রেখেছি—তোর সামনে খাব বলে। আমি যে তোর সামনে বিষ খেতে পারি এটা কি তোর বিশ্বাস হয়?'

আমি কাঁদতে-কাঁদতে বললাম, 'হয়।'

মা বললেন, 'এক শর্তে আমি বিষ খাব না। আমি যে-ছেলেটিকে বসিয়ে রেখেছি, তাকে তুই বিয়ে করবি। এবং আজ রাতেই করবি। আমি কাজী ডাকিয়ে আনব।'

আমি বললাম, 'এ-সব তুমি কী বলছ মা!

'এই ছেলে খুব গরিব ঘরের ছেলে। ভালো ব্রিলিয়ান্ট ছেলে। আমি তাকে ইন্টারমিডিয়েট থেকে পড়ার খরচ দিয়ে যাচ্ছি। তোর জন্যেই করছিলাম। এই ছেলে বিয়ের পর এ-বাড়িতে থাকবে, আমাদের দু' জনকে দেখাশোনা করবে।'

আমার মুখে কথা আটকে গেল। মাথা ঘুরছে। কি বলব কিছুই বুঝতে পারছি না। মা বললেন, 'টেবিলের দিকে তাকিয়ে দেখ—গ্লাসে বিষ গোলা আছে। এখন মন ঠিক কর। তারপর আমাকে বল।'

সেই রাতেই আমার বিয়ে হল। নয়াটোলার কাজী সাহেব বিয়ে পড়িয়ে দিয়ে গেলেন। দেন মোহরানা—এক লক্ষ এক টাকা। বিয়ে উপলক্ষে দামী একটা বেনারসি পরলাম। মা আগেই কিনিয়ে রেখেছিলেন।

বাসর হল মা'র শোবার ঘরে।

আমার স্বামী বাসর—রাতে প্রথম যে-কথাটি আমাকে বললেন, তা হচ্ছে—'গত পাঁচদিন তুমি কার-কার বাড়িতে ছিলে আমাকে বল। আমি খোঁজ নেব।'

আমি কঠিন গলায় বললাম, 'কী খোঁজ নেবেন?'

আমার স্বামী বললেন, 'গরিব হয়ে জন্মেছি বলে আজ আমার এই অবস্থা—বড়লোকের নষ্ট মেয়ে বিয়ে করতে হল। নষ্টামি যা করেছ করেছ। আর না। আমি মানুষটা ছোটখাটো, কিন্তু ধানি মরিচ। ধানি মরিচ চেন তো? সাইজে ছোট—ঝাল বেশি।'

আমার ধারণা শরীর থেকেও ভালবাসার জন্ম হতে পারে। আমি আমার স্বামীকে ভালবাসলাম। আমার ধারণা, এই ভালবাসার উৎস শরীর। মানুষের মন যেমন বিচিত্র তার শরীরও তেমনি।

আমি এবং আমার মা, আমরা দু' জনই ছিলাম নিঃসঙ্গ। তৃতীয় ব্যক্তি এসে আমাদের এই নিঃসঙ্গতা দূর করল। বাড়ির একতলাটা মা আমাদের দু' জনকে ছেড়ে

দিলেন। মা'র সঙ্গে থেকেও তাঁর কাছ থেকে আলাদা থাকার স্বাদ খানিকটা হলেও পাওয়া গেল। আমরা একসঙ্গে খাবার খেতাম। তখন আমার স্বামী মজার-মজার কথা বলে আমাদের খুব হাসাতেন। আমার মা'কে তিনি বেশ পছন্দ করতেন। আমরা হয়তো খেতে বসলাম, তিনি আমার মা'র দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আম্মা, আপনাকে এমন মনমরা লাগছে কেন? তাহলে শোনেন একটা মজার গল্প—মন ভালো করে দেবে। আমাদের দেশের বাড়িতে সফদরগঞ্জ বাজারে এক দর্জি থাকত। এক ঈদে সে তিনটা হাতা দিয়ে এক পাঞ্জাবি বানাল . . . . .

গল্প এই পর্যন্ত শুনেই মা হাসতে-হাসতে ভেঙে পড়লেন। মা হাসছেন, আমি হাসছি আর উনি মুখ গম্ভীর করে বসে আছেন—কখন আমরা হাসি থামাব সেই অপেক্ষা।

ঘর-জামাইদের নানান রকম ত্রুটি থাকে। তারা সারাক্ষণ শ্বশুরবাড়ির টাকাপয়সা সম্পর্কে খোঁজখবর করে। তাদের চেষ্টাই থাকে কী করে সব- কিছুর দখল নেওয়া যায়। আমার স্বামী তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। তিনি কখনো এ-সব নিয়ে মাথা ঘামান নি। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। রাতদিন পড়াশোনা নিয়ে থাকতেন। অবসর সময়টা মা'কে গল্প শোনাতে পছন্দ করতেন। আমাকে গল্প শোনানোর ব্যাপারে তিনি তেমন আগ্রহ বোধ করতেন না। আমার শরীর তিনি যতটা পছন্দ করতেন, আমাকে ততটা করতেন না।

বিয়ের দু' মাস যেতেই আমার ধারণা হল সম্ভবত আমি 'কনসিভ' করেছি। পুরোপুরি নিশ্চিতও হতে পারছি না। একই সঙ্গে ভয় এবং আনন্দে আমি অভিভূত।

এক রাতে স্বামীকে বললাম। তিনি সরু চোখে দীর্ঘ সময় আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'পেটে বাচ্চা?'

আমি চুপ করে রইলাম।

'বয়স কত বাচ্চার?'

'জানি না। আমি কী করে জানব? ডাক্তারের কাছে নিয়ে চল, ডাক্তার দেখে বলুক।'

'ডাক্তারের কাছে নিতে হবে না। বাচ্চা কখন এসেছে সেটা তুমিই জান। ঐ যে পাঁচ রাত ছিলে অন্য জায়গায়, ঘটনা তখন ঘটে গেছে।'

'কী বলছ তুমি!'

'এ-রকম চমকে উঠবে না। চমকে ওঠার খেলা আমার সাথে খেলবে না। তোমার পেটে অন্য মানুষের সন্তান।'

আমি হতভম্ব।

আমার স্বামী কুৎসিততম কথা ক'টি বলে বাতি নিভিয়ে শুতে এলেন এবং অন্যসব রাতের মতোই শারীরিকভাবে আমাকে গ্রহণ করলেন। ঘৃণায় আমি পাথর হয়ে গেলাম।

আমি বললাম, 'আমার শান্তির দরকার নেই। অশান্তিই ভালো।'মানসিক আঘাতে -আঘাতে আমি বিপর্যস্ত। একদিন ইচ্ছে করেই আমার স্বামী আমার পেটে লাথি বস ালেন এই আশায় যেন গর্ভপাত হয়ে যায়। আমি দু'হাতে পেটে চেপে বসে পড়তেই তিনি গভীর আগ্রহে বললেন, 'কি, যন্ত্রণা খালাস হয়ে গেছে?'রাতে আমি ঘুমুতে

ভঙ্গিতে। দিনের কোনোকিছুই তখন তাঁর মনে থাকে না।

আমার স্বামী আমাকে বললেন, 'বাচ্চাটিকে তুমি নষ্ট করে ফেল। যদি নষ্ট করে ফেল, তাহলে আমি আর কিছু মনে পুষে রাখব না। সব ভুলে যাব। সব চলবে আগের মতো। তুমি মেয়ে খারাপ না।'

আমি বললাম, 'বাচ্চা আমি নষ্ট করব না। এই বাচ্চা তোমার।'

'চুপ থাক। নষ্ট মেয়েছেলে।'

'তুমি দয়া করে আমাকে বিশ্বাস কর।'

'চুপ—চুপ। চুপ বললাম—পাঁচ রাত বাইরে কাটিয়ে ঘরে ফিরেছ। রাতে কী মচ্ছব হয়েছিল আমি জানি না? ঠিকই জানি। আমি খোঁজ নিয়েছি।'

'তুমি কোনো খোঁজ নাও নি।'

'চুপ। চুপ বললাম।'

আমি দিনরাত কাঁদি। আমার মা-ও দিনরাত কাঁদেন। এক পর্যায়ে মা আমাকে বলতে বাধ্য হলেন—'বাচ্চাটা নষ্ট করে ফেলাই ভালো। বাচ্চাটা তুই নষ্ট করে ফেল। সংসারে শান্তি আসুক।'

আমি বললাম, 'আমার শান্তির দরকার নেই। অশান্তিই ভালো।

মানসিক আঘাতে-আঘাতে আমি বিপর্যস্ত। একদিন ইচ্ছে করেই আমার স্বামী আমার পেটে লাথি বসালেন এই আশায় যেন গর্ভপাত হয়ে যায়। আমি দু'হাতে পেটে চেপে বসে পড়তেই তিনি গভীর আগ্রহে বললেন, 'কি, যন্ত্রণা খালাস হয়ে গেছে?'

রাতে আমি ঘুমুতে পারি না। দিনে খেতে পারি না। ভয়ংকর অবস্থা। আমার পেটের সন্তানটির বৃদ্ধিও ব্যাহত হচ্ছে। ডাক্তার প্রতিবারই পরীক্ষা করে বলেন'—বেবির গ্রোথ তো ঠিকমতো হচ্ছে না। সমস্যা কী? আরো ভালোমতো খাওয়াদাওয়া করবেন। প্রচুর বিশ্রাম করবেন। দৈনিক দু' গ্লাস করে দুধ খাবেন। আন্ডার ওয়েট বেবি হলে খুব সমস্যা। এই দেশে বেশির ভাগ শিশুমৃত্যু হয় আন্ডারওয়েটের জন্য।'

আমার সন্তানের যখন ছ' মাস তখন ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটল। আমার স্বামী এক সকালে চায়ের টেবিলে শান্তমুখে ঘোষণা করলেন—'আমি আজ এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি। আপনারা আমার কথা শোনেন নি। সন্তানটাকে নষ্ট করতে রাজি হন নি। কাজেই আমি বিদায়। তবে আরেকটা কথা—যদি সন্তানটা মৃত হয়, মৃত হবারই কথা, তাহলে আমি আবার ফিরে আসব। অতীতে যা ঘটেছে তা মনে রাখব না। রূপা মেয়ে খারাপ না। পাকেচক্রে তার পেটে অন্য পুরুষের সন্তান এসে গেছে। আমি সেই অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছি। সন্তান মৃত হলে সব চলবে আগের মতো।'

আমার মা কঠিন গলায় বললেন, 'সন্তান মৃত হওয়ার কথা তুমি বললে কেন? এই কথা কেন বললে?'

'বললাম, কারণ আমি জানি সন্তান মৃত হবে। আমি.... আমি......'

'তুমি কি?'

আমার স্বামী আর কিছু বললেন না। মা'র অনুরোধ, কান্নাকাটি, আমার কান্না কিছুতেই কিছু হল না, তিনি চলে গেলেন। আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। প্রচণ্ড জ্বর, গায়ে চাকা-চাকা কি-সব বেরুল, মাথার চুল পড়ে গেল। ভয়ংকর- ভয়ংকর স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম। সেই সময়ের সবচেয়ে কমন স্বপ্ন ছিল—আমি একটা ঘরে বন্দি হয়ে

আছি। ঘরে কোনো আসবাবপত্র নেই। সাদা দেয়াল। হঠাৎ সেই সাদা দেয়াল ফুঁড়ে একটা কালো লম্বা হাত বের হয়ে এল। হাত না, যেন একটা সাপ। সাপের মাথা যেখানে থাকে সেখানে মাথার বদলে মানুষের আঙুলের মতো আঙুল। হাতটা আমাকে পেঁচিয়ে ধরল। ঠাণ্ডা কুৎসিত তার স্পর্শ। ঘুম ভেঙে যায়। দেখি, সারা শরীর ঘামে চটচট করছে। বাকি রাতটা জেগে থাকার চেষ্টা করি। আবার একসময় তন্দ্রার মতো আসে। সেই একই স্বপ্ন দেখি, চিৎকার করে জেগে উঠি।

বাচ্চার ন' মাসের সময় ডাক্তার খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বললেন, 'বাচ্চার সাইজ অত্যন্ত ছোট, মুভমেন্ট কম। আপনি হাসপাতালে ভর্তি হয়ে যান। মনে হচ্ছে বাচ্চা যথেষ্ট অক্সিজেন পাচ্ছে না।'

হাসপাতালে ভর্তি হলাম। দুর্বল, অপুষ্ট একটি শিশুর জন্ম দিলাম। নিজেও খুব অসুস্থ হয়ে পড়লাম। বাচ্চাকে রাখা হল ইনকিউবিটরে। অসুস্থ অবস্থায় একদিন দেখি দরজার কাছে আমার স্বামী দাঁড়িয়ে। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমি বললাম, 'ভেতরে এস।'

সে হিসহিস করে বলল, 'বিষের পুঁটলিটা কই? এখনো বেঁচে আছে? এখনো বেঁচে আছে কেন তা তো বুঝলাম না তার তো মরে যাওয়া উচিত ছিল। আমি দরগায় মানত করেছি। এমন দরগা, যেখানে মানত মিস হয় না।'

আমি আঁৎকে উঠলাম। সে ঘরে ঢুকল না, খানিকক্ষণ দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেল। আমি মা'কে বললাম, 'কিছুতেই আমি হাসপাতালে থাকব না। কিছুতেই না। হাসপাতালে থাকলেই সে এসে কোনো-না-কোনোভাবে বাচ্চার ক্ষতি করার চেষ্টা করবে।'

মা বললেন, 'তোর এই অবস্থায় হাসপাতাল ছাড়া ঠিক হবে না। বাচ্চা খানিকটা সামলে নিয়েছে, কিন্তু তোর অবস্থা খুব খারাপ। বাড়িতে নিয়ে গেলে তুই মরে যাবি।'

'মরে গেলেও আমি বাড়িতেই যাব। এখানে থাকব না।'

'ডাক্তার তোকে ছাড়বে না।'

'ডাক্তারকে তুমি ডেকে আন মা। আমি তাঁর পা জড়িয়ে ধরব।'

ডাক্তার আমাকে ছাড়লেন। বাচ্চা নিয়ে আমি বাসায় চলে এলাম। দারোয়ানকে বলে দিলাম, দিনরাত যেন গেট বন্ধ থাকে। কাউকেই যেন ঢুকতে দেওয়া না-হয়। কাউকেই না।

আমার শরীর খুবই খারাপ হল। একরাতের কথা—ঘুমুচ্ছি। মা ঘরে ঢুকে বললেন, 'বাচ্চাটা যেন কেমন করছে।'

আমার বুক ধড়াস করে উঠল। আমি ক্ষীণ স্বরে বললাম, 'কেমন করছে মানে কী মা?'

'মনে হচ্ছে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে।'

'তুমি বসে আছ কেন? তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাও।'

'অ্যাম্বুলেন্স খবর দিয়েছি।'

'অ্যাম্বুলেন্স আসতে দেরি করবে, তুমি বেবিট্যাক্সি করে যাও।'

এমন সময় বাচ্চা দুর্বল গলায় কেঁদে উঠল। মা ছুটে পাশের ঘরে গেলেন। পরক্ষণেই আমার ঘরে ফিরে এলেন। তাঁর মুখ সাদা। হাত-পা কাঁপছে। আমি চিৎকার

করে জ্ঞান হারালাম।

জ্ঞান ফিরল চারদিন পর হাসপাতালে। আমি বললাম, 'আমার বাচ্চা, আমার বাচ্চা?'

মা পাথরের মতো মুখ করে রইলেন। আমি আবার জ্ঞান হারালাম।

আমার বাচ্চার কবর হল আমাদের বাড়ির পিছনে। আম গাছের নিচে। ছোট্ট একটা কবর ছাড়া বাড়িতে কোনো রকম পরিবর্তন হল না। সবকিছু চলতে লাগল আগের মতো। আমার স্বামী ফিরে এলেন। আমার মাথায় হাত রেখে বললেন, 'আই অ্যাম সরি। সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে তুমি শোক কাটিয়ে উঠবে। আমি তোমাকে সাহায্য করব।'

আমি প্রাণপণ চেষ্টা করলাম শোক কাটিয়ে উঠতে।

প্রবল শোক একবার আসে না। দু' বার করে আসে। তাই নাকি নিয়ম। অন্যের কথা জানি না, আমার বেলায় নিয়ম বহাল রইল। চার মাসের মাথায় মা মারা গেলেন। মা শেষের দিকে খুব চুপচাপ হয়ে গিয়েছিলেন। কারো সঙ্গে কথা বলতেন না। নিজের ঘরে দরজা-জানালা বন্ধ করে বসে থাকতেন। মৃত্যুর দু' দিন আগে আমাকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, 'আমার বিরুদ্ধে তোর কি কোনো অভিযোগ আছে?'

আমি বললাম, 'না।'

'আমার গায়ে হাত দিয়ে স্পষ্ট করে বল।'

আমি মায়ের গায়ে হাত দিয়ে স্পষ্ট করে বললাম, 'তোমার বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই।'

'সত্যি!'

'হ্যাঁ—সত্যি। শুধু খানিকটা অভিমান আছে।'

'অভিমান কেন?'

'তোমার জামাই যেমন মনে করে, আমার ছেলের বাবা সে নয়—তুমিও তাই মনে কর।'

মা চমকে উঠে বললেন, 'এই কথা কেন বলছিস?'

আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললাম, 'তুমি রাতদিন এত নামাজ পড়—রোজা রাখ। কিন্তু কখনো তুমি আমার ছেলের কবরের কাছে দাঁড়িয়ে একটু দোয়া পড় নি। তার থেকেই এই ধারণা হয়েছে। বিশ্বাস কর মা, আমি ভালো মেয়ে।'

মা কাঁদতে-কাঁদতে বললেন, 'ঐ কবরটা আমি সহ্য করতে পারি না বলে কাছে যাই না। দূর থেকে দোয়া পড়ি মা। দিনরাতই আল্লাহ্‌কে ডেকে তোর ছেলের মঙ্গল কামনা করি।'

মা মারা গেলেন।

যতটা কষ্ট পাব ভেবেছিলাম ততটা পেলাম না। বরং নিজেকে একটু যেন মুক্ত মনে হল। অতি সূক্ষ্ম হলেও স্বাধীনতার আনন্দ পেলাম। মনের এই বিচিত্র অবস্থার জন্যে লজ্জাও পেলাম।

মা'র মৃত্যুর মাসখানেকের মধ্যে আমার মধ্যে মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণ দেখা গেল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি। সন্ধ্যা হয়-হয় করছে। হঠাৎ শুনলাম আমার বাচ্চাটা কাঁদছে। ওঁয়া-ওঁয়া করে কান্না। এটা যে আমার বাচ্চার কান্না তাতে কোনো সন্দেহ রইল না। আমার সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল।

এ-রকম ঘটনা প্রায়ই ঘটতে লাগল। রাতে ঘুমুতে যাচ্ছি—বাতি নিভিয়ে মশারির ভেতর ঢুকছি—অমনি আমার সমস্ত শরীর ঝনঝন করে উঠল। আমি শুনলাম, আমার বাচ্চা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে কাঁদছে। আমি ছুটে গেলাম কবরের কাছে। আমার স্বামী এলেন পিছনে, পিছনে। তিনি ভীত গলায় বললেন, 'কী ব্যাপার? কী ব্যাপার?'

আমি বললাম, 'কিছু না।'

'কিছু না, তাহলে দৌড়ে চিৎকার করে নিচে নেমে এলে কেন?'

'এমনি এসেছি। কোনো কারণ নেই।'

'তোমার মাথাটা আসলে খারাপ হয়ে গেছে রূপা।'

'বোধহয় হয়েছে।'

'ভালো কোনো ডাক্তারকে দিয়ে চিকিৎসা করাও।'

'আচ্ছা করাব। এখন তুমি আমার সামনে থেকে যাও। আমি এখানে একা- একা খানিকক্ষণ বসে থাকব।'

'কেন?'

'আমার ইচ্ছা করছে, তাই।'

'এখন বৃষ্টি হচ্ছে। তুমি অকারণে বৃষ্টিতে ভিজবে?'

'হ্যাঁ।'

'একজন ভালো সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গে তোমার দেখা করা দরকার।'

'দেখা করব। এখন তুমি যাও।'

সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গেও দেখা করলাম। কাউকে জানালাম না, একা-একা গেলাম। সাইকিয়াট্রিস্ট বেশ বয়স্ক মানুষ। মাথার চুল ধবধবে সাদা। হাসিখুশি মানুষ। তিনি চোখ বন্ধ করে আমার সব কথা শুনলেন। কেউ চোখ বন্ধ করে কথা শুনলে আমার ভালো লাগে না। মনে হয় কথা শুনছেন না। এঁর বেলা সে-রকম মনে হল না। আমি যা বলার সব বললাম। তিনি চোখ মেলে হাসলেন। সান্ত্বনা দেওয়ার হাসি। যে-হাসি বলে দেয়—আপনার কিছুই হয় নি। কেন এমন করছেন?

সাইকিয়াট্রিস্ট বললেন, 'কফি খাবেন?'

আমি বললাম, 'না।'

'খান—কফি খান। কফি খেতে-খেতে আমরা কথা বলি।'

'বেশ, কফি দিতে বলুন।'

কফি চলে এল। তিনি বললেন, 'আপনার ধারণা, আপনি আপনার ছেলের কান্না শুনতে পান?'

'ধারণা না। আমি সত্যি-সত্যি শুনতে পাই।'

'আপনি কান্না শুনতে পান, তার মানে এই না যে, আপনার ছেলেরই কান্না। ছোট বাচ্চাদের কান্না একরকম।'

'আমি আমার ছেলের কান্নাই শুনতে পাই।'

'আচ্ছা বেশ। সবসময় শুনতে পান, না মাঝে-মাঝে পান?'

'মাঝে-মাঝে পাই।'

'আগে থেকে কি বুঝতে পারেন যে এখন কান্না শুনবেন?'

'তার মানে কী?'

'গা শিরশির করে, কিংবা মাথা ধরে।—যার পরপর কথা শোনা যায়।'

'না—তেমন কিছু না।'

'আপনার মা মারা গিয়েছেন–তাঁর কথা কি শুনতে পান?'

'না।'

'ছোটবেলায় এমন কিছু কি হত? অর্থাৎ এ–রকম কান্না বা শব্দ শুনতে পেতেন?'

'না।'

'আপনার সমস্যাটা তেমন জটিল নয়। আপনার ছেলের মৃত্যুজনিত আঘাতে এটা হয়েছে। আঘাত ছিল তীব্র। এতে মস্তিষ্কের ইকুইলিব্রিয়াম খানিকটা ব্যাহত হয়েছে। আপনার কোলে আরেকটা শিশু এলে সমস্যা কেটে যাবে। আপনার যা হয়েছে তা হল জীবনের দুঃখজনক স্মৃতি মনে অবদমিত অবস্থায় আছে। আপনি চলে গেছেন Anxiety state–এ, সেখান থেকে নিউরাসথেনিয়া . . . .'

'আপনার কথা কিছু বুঝতে পারছি না।'

'বোঝার দরকার নেই। এমন কিছু করুন যেন নিজে ব্যস্ত থাকেন। ঘুমের অষুধ দিচ্ছি। রাতে ঘুমুবার সময় খাবেন, যাতে ঘুমটা ভালো হয়। যখন আবার কান্নার শব্দ শুনবেন তখন দৌড়ে কবরের কাছে যাবেন না, কারণ কান্নার শব্দ কবর থেকে আসছে না। শব্দ তৈরি হচ্ছে আপনার মস্তিষ্কে। আপনি নিজেকেই নিজে বোঝাবেন। মনে–মনে বলবেন, এ–সব কিছু না। এ–সব কিছু না। বাড়িটাও ছেড়ে দিন। ঐ বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যান।

ডাক্তার সাহেবের ঘর থেকে বের হয়ে বেবিট্যাক্সি নিয়েছি, ঠিক তখন স্পষ্ট আবার কান্নার শব্দ শুনলাম। আমার বাচ্চাটিই যে কাঁদছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। আমি মনে–মনে বললাম, আমি কিছু শুনছি না। আমি কিছু শুনছি না। তাতে লাভ হল না। সারা পথ আমি আমার বাচ্চার কান্না শুনতে–শুনতে বাড়িতে এলাম।

আমার স্বামী খুব ভালোভাবে পাশ করলেন। ইলেকট্রিক্যাল ইনজিনিয়ারিং–এ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান পেয়ে গেলেন। বিশ্ববিদ্যালয়েই তাঁর একটা চাকরি হল। আমরা আমাদের বাড়ি ছেড়ে কলাবাগানে দু'–কামরার ছোট একটা ঘর ভাড়া নিলাম। আমি সংসারে মন দেওয়ার চেষ্টা করলাম। প্রচুর কাজ এবং প্রচুর অকাজ করি। রান্নাবান্না করি। সেলাইয়ের কাজ করি। আচার বানানোর চেষ্টা করি। যে–ঘর একবার মোছা হয়েছে সেই ঘর আবার ভেজা ন্যাকড়ায় ভিজিয়ে দিই। কাজের একটি মেয়ে ছিল, তাকেও ছাড়িয়ে দিলাম। কারণ একটাই—আমি যাতে ব্যস্ত থাকতে পারি।

সারা দিন ব্যস্ততায় কাটে। রাতের বেলায়ও আমার স্বামী আমাকে অনেক রাত পর্যন্ত জাগিয়ে রাখেন। শারীরিক ভালবাসার উন্মাদনা এখন আমার নেই—তবু ভান করি যেন প্রবল আনন্দে সময় কাটছে। আসলে কাটে না। হঠাৎ–হঠাৎ আমি আমার বাচ্চার কান্না শুনতে পাই। আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় অবশ হয়ে আসে।

আমার স্বামী বিরক্ত গলায় বললেন, 'কী হল? এ–রকম করছ কেন?'

আমি নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করি। তিনি তিক্ত গলায় বলেন, 'এইসব ঢং কবে বন্ধ করবে? আর তো সহ্য হয় না। মানুষের সহ্যের একটা সীমা আছে।'

আমি কাঁদতে শুরু করি। তিনি কুৎসিত গলায় বলেন—'বাথরুমে দরজা বন্ধ করে কাঁদ। সামনে না। খবরদার, চোখের সামনে কাঁদবে না।'

ভাড়া-বাসায় বেশিদিন থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হল না। আমি প্রায় জোর করেই নিজের বাড়িতে ফিরে গেলাম। যে-বাড়িতে আমার ছোট্ট বাবার কবর আছে সেই বাড়ি ছেড়ে আমি কী করে দূরে থাকব!

নিজের বাড়িতে ফেরার পরপর আলস্য আমাকে জড়িয়ে ধরল। কোনো কাজেই মন বসে না। আমি বেশির ভাগ সময় বসে থাকি আমার বাবুর কবরের পাশে। দোতলার সিঁড়ি থেকে ক্রুদ্ধ চোখে আমাকে দেখেন আমার স্বামী। তাঁর চোখে রাগ ছাড়াও আর যা থাকে, তার নাম ঘৃণা।

৭

মাথার যন্ত্রণা পুরোপুরি অগ্রাহ্য করে মিসির আলি তাঁর নোটবই লিখে ভরিয়ে ফেলছেন। রূপার লেখা বারবার করে পড়ছেন। স্বামীর সঙ্গে মেয়েটির সম্পর্ক তিনি ঠিক ধরতে পারছেন না। মেয়েটির এই ভয়াবহ সমস্যায় স্বামীর অংশ কতটুকু তা বের করা দরকার।

রূপার পুরো লেখাটা স্বামীর প্রতি ঘৃণা নিয়ে লেখা ; তার পরেও বোঝা যাচ্ছে ছেলেটি তার স্ত্রীকে সাহায্য করার চেষ্টা করছে। সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে গিয়েছে। সাইকিয়াট্রিস্টের কথামতো আলাদা বাসা ভাড়া করেছে।

মিসির আলি তাঁর নোটবইতে লিখলেন—আমাকে ধরে নিতে হবে মেয়েটি মানসিক দিক দিয়ে সুস্থ নয়। সে পৃথিবীকে তার অসুস্থ মানসিকতা নিয়ে দেখছে এবং বিচার করছে। স্বামীকেও সে একইভাবে দেখছে। সে তার স্বামীর ছবি যে-ভাবে এঁকেছে তাতে তাকে ঘৃণ্য মানুষ বলে মনে হচ্ছে, অথচ এই মেয়ে তার মা'র ছবি এঁকেছে গভীর মমতায়। মা'র ছবি এত মমতায় আঁকা সত্ত্বেও মা'র ভয়াবহ রূপ বের হয়ে এসেছে। আমার কাছে জয়নাল ছেলেটিকে হৃদয়বান ছেলে বলেই মনে হচ্ছে। এই ছেলে দু' জন নিঃসঙ্গ মহিলাকে আনন্দ দেওয়ার জন্যে হাসির গল্প করে। তাদের হাসাতে চেষ্টা করে। ছেলেটি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে—তার স্ত্রীর সন্তানটি তার নয়। তার পরেও সে স্ত্রীকে গ্রহণ করেছে। ভালোভাবেই গ্রহণ করেছে। এবং বলছে মেয়েটা ভালো।

রূপা শিশুর কান্না শুনছে। এটা কেন হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না। মিসির আলি নোটবইতে কবে-কবে কান্না শোনা গেল তা লিখে রাখতে শুরু করলেন। এর থেকে যদি কিছু বের হয়ে আসে।

'স্যার, ট্রেইন দেইখ্যা আসছি।'

মিসির আলি লেখা থামিয়ে অবাক হয়ে বললেন, 'কি দেখে এসেছ?'

'ট্রেইন। রেলগাড়ি। আপনে বললেন রেলগাড়ি দেখতে। চলন্ত রেলগাড়ি কী রঙে দেখা যায় দেখতে কইলেন। দেখলাম।'

'কি দেখলে? কালো দেখা যায়?'

'জ্বি—না, সবুজ দেখা যায়। সবুজ জিনিস, চলন্ত অবস্থায় যেমন সবুজ, থামন্ত অবস্থায়ও সবুজ। এইটা হইল আপনার সাধারণ কথা।'

মিসির আলি চিন্তিত মুখে বললেন, 'সাধারণ ব্যাপারেও মাঝে-মাঝে কিছু অসাধারণ জিনিস থাকে বজলু। সেই অসাধারণ জিনিস খুঁজে বের করতে আমার ভালো লাগে। সারা জীবন তাই খুঁজেছি। কখনো পেয়েছি কখনো পাইনি। চলন্ত ট্রেন তোমাকে দেখতে বললাম কেন জান?'

'জ্বি না।'

'আমি লক্ষ করেছি উড়ন্ত টিয়া পাখি কালো দেখা যায়। সবুজ রঙ গতির কারণে কালো হয়ে যায় কি না, সেটাই আমার দেখার ইচ্ছা ছিল।'

'উড়ন্ত টিয়া পাখি কালো দেখা যায়, জানতাম না স্যার।'

'আমিও জানতাম না। দেখে অবাক হয়েছি। আচ্ছা বজলু তুমি যাও, আমি এখন জরুরি একটা কাজ করছি। একটি মেয়ের সমস্যা নিয়ে ভাবছি।'

বজলু বলল, 'গৌরীপুর থাইক্যা ডাক্তার সাহেব আসছেন। আপনেরে দেখতে চান।'

'এখন দেখা হবে না।'

'আপনার মাথাধরার বিষয়ে কথা বলতে চান।'

'এখন কথাও বলতে পারব না। আমি ব্যস্ত। অসম্ভব ব্যস্ত।'

বজলু মানুষটার মধ্যে ব্যস্ততার কিছু দেখল না। কাত হয়ে বিছানায় পড়ে আছে। হাতে একটা খাতা। এর নাম ব্যস্ততা? বজলু মাথা চুলকে বলল, 'রাতে কী খাবেন স্যার?'

'চা খাব।'

'ভাত-তরকারির কথা বলতে ছিলাম। হাঁস খাইবেন স্যার? অবশ্য বর্ষাকালে হাঁসের মাংসে কোনো টেস্ট থাকে না। হাঁস খেতে হয় শীতকালে। নতুন ধান উঠার পরে। নতুন ধান খাওয়ার কারণে হাঁসের শরীরে হয় চর্বি—'

'তুমি এখন যাও বজলু।'

মিসির আলি খাতা খুললেন।

আমার স্বামী এম· এস· ডিগ্রী করার জন্যে আজ সকালে টেক্সাস চলে গেলেন। টীচিং অ্যাসিস্টেন্টশিপ নিয়ে গেলেন। যাবার টিকিট আমি করে দিলাম। তিনি বললেন, 'আমি ছ' মাসের মধ্যে তোমাকে নিয়ে যাব। তুমি পাসপোর্ট করে রাখ।'

আমি বললাম, 'আমাকে নিতে হবে না। আমি ঢাকা ছেড়ে কোথাও যাব না।'

'ঢাকা ছেড়ে যাওয়াই তোমার উচিত।'

'কোনটা আমার উচিত, কোনটা উচিত নয় তা আমি বুঝব।'

'তোমার হাজব্যান্ড হিসেবে আমারও বোঝা উচিত।'

'অনেক বুঝেছ, আর না।'

'তুমি কি বলতে চাচ্ছ স্পষ্ট করে বল।

'যা বলতে চেয়েছি স্পষ্ট করেই বলেছি।'

'তুমি কি আমার সঙ্গে বাস করতে চাও না?'

আমি একটু সময় নিলাম। খুব বেশি না, কয়েক সেকেন্ড। এই কয়েক

সেকেন্ডকেই মনে হল অনন্তকাল। তারপর তার চোখের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট গলায় বললাম, 'না।'

'কি বললে?'

'বললাম, না।'

'ও, আচ্ছা।'

আমার স্বামী–ভদ্রলোক অনেকক্ষণ তাঁর মুখে বিস্ময়ের ভাব ধরে রাখলো। তারপর আবার বললো, 'ও আচ্ছা।'

আমি বললাম, 'আমি যে তোমার সঙ্গে বাস করতে চাচ্ছি না, তা কি তুমি বুঝতে পার নি?'

'না, পারি নি।'

আমি হাসলাম। তিনি বললো, 'তোমার টাকাটা আমি পৌঁছেই পাঠিয়ে দেব। দেরি করব না।'

'দেরি করলেও অসুবিধা নেই। না–পাঠালেও ক্ষতি নেই। আমার যা আছে তা আমার জন্যে যথেষ্ট।'

'তুমি কি আবার বিয়ে করবে?'

'জানি না, করতেও পারি। করার সম্ভাবনাই বেশি।'

'যদি বিয়ে করবে বলে ঠিক কর—তাহলে অবশ্যই সেই ভদ্রলোককে আগেভাগে জানিয়ে দিও যে তোমার মাথার ঠিক নেই। তুমি অসুস্থ একজন মানুষ।'

'আমি জানাব।'

উনি চলে যাবার পর আমি পুরোপুরি একা হয়ে গেলাম। নিজেকে ব্যস্ত রাখার অনেক চেষ্টা করলাম। পুরনো বন্ধুদের খুঁজে বের করে আড্ডা দিই। মহিলা সমিতিতে নাটক দেখি, বই পড়ি, রাতে কড়া ঘুমের অষুধ খেয়ে ঘুমুতে যাই।

এক রাতের কথা, বিশ মিলিগ্রাম ''ইউনেকটিন'' খেয়ে ঘুমিয়েছি। ঘুমের মধ্যেই মনে হল আমার ছেলেটা আমার পাশে শুয়ে আছে। তার গায়ের গন্ধ পাচ্ছি। সেই অদ্ভুত গন্ধ, যা শুধু শিশুদের গায়েই থাকে। একেকজনের গায়ে একক রকম গন্ধ, যা শুধু মায়েরাই আলাদা করতে পারেন। আমি ছেলের মাথায় হাত রাখলাম। মাথাভর্তি চুল। রেশমের মতো নরম কোঁকড়ানো চুল।

ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড় করে উঠে বসলাম। কোথাও কেউ নেই, থাকার কথাও নয়। স্বপ্ন তো স্বপ্নই। কিন্তু সেই স্বপ্ন এত স্পষ্ট। সত্যের এত কাছাকাছি? তৃষ্ণা পেয়েছিল। ঠাণ্ডা পানির জন্যে খাবার ঘরে গিয়েছি, ফ্রীজের দরজায় হাত রেখেছি—আর ঠিক তখন শুনলাম আমার ছেলে আমাকে ডাকছে—'মা, মা।'

এতদিন শুধু কান্নার শব্দ শুনেছি। আজ প্রথম তাকে কিছু বলতে শুনলাম। আমার সমস্ত শরীর শক্ত হয়ে গেল। মনে হল মাথা ঘুরে পড়ে যাব। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে কাঁপা–কাঁপা গলায় ডাকলাম, 'ও খোকা। খোকা! তুই কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছিস?'

কী আশ্চর্য কাণ্ড, আমার ছেলে জবাব দিল! স্পষ্ট বলল, 'হুঁ'।

'তুই কোথায় খোকা?'

'উঁ।'

'খোকা তুই কোথায়?'

'উঁ।'

'তুই কোথায়? আরেক বার আমাকে ডাক তো! আর মাত্র একবার।'

আমার ছেলে আমাকে ডাকল–'মা, মা।'

আমি সহ্য করতে পারলাম না। অচেতন হয়ে পড়ে গেলাম।

আমি জানি এর সবটাই মায়া। একধরনের বিভ্রম। আমার মাথা এলোমেলো হয়ে আছে। দুঃখে–কষ্টে–যন্ত্রণায় আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কিছুদিনের মধ্যেই আমাকে পাগলা গারদে ঢুকিয়ে দেবে। একটা নির্জন ঘরে আটকা থাকব। নিজের মনে হাসব, কাঁদব। গায়ের কাপড়ের কোনো ঠিক থাকবে না। অ্যাটেনডেন্টদের কেউ–কেউ আমার গায়ে হাত দিয়ে আনন্দ পাবে। আমার কিছুই করার থাকবে না।

এই সময় আমার এক বান্ধবী রেনুকা বলল, 'বুড়ি, তুই ছবি করবি? আমার মামা ছবি বানাচ্ছেন। অল্পবয়সী সুন্দরী নায়িকা খুঁজছেন। তোকে দেখলে হাতে আকাশের চাঁদ পাবেন। তুই এত সুন্দর!'

আমি বললাম, 'তোর ধারণা আমি সুন্দর?'

সে বলল, 'পৃথিবীর চারজন রূপবতীর মধ্যে তুই একজন। সেই চারজনের নাম শুনবি? তুই, তারপর হেলেন অব ট্রয়, কুইন অব সেবা, ক্লিওপেট্রা। তুই রাজি থাকলে মামাকে বলে দেখি।'

'আমি তো অভিনয় জানি না।'

'বাংলাদেশি ছবিতে অভিনয় করার প্রথম এবং একমাত্র যোগ্যতা হচ্ছে অভিনয় না–জানা। তুই অভিনয় জানিস না শুনলে মামা আনন্দে লাফাতে থাকবে। করবি অভিনয়?'

'করব।'

'চল, এখনই তোকে মামার কাছে নিয়ে যাই।'

প্রথম ছবি হিট করল। দ্বিতীয় ছবি হিট করল। তৃতীয়টা হল সুপার হিট। ছবি করা তো কিছু না—নিজেকে ব্যস্ত রাখা। ডাবল শিফট কাজ করি, অমানুষিক পরিশ্রম। রাতে ঘুমের অষুধ খেয়ে মড়ার মতো ঘুমাই। অনেক দিন ছেলের কান্না শুনি না। কথা শুনি না, মনে হল আমার মনের অসুখটা কেটে গেছে। এতে আনন্দিত হবার কথা। তা হই না। আমার ছেলের গলা শোনার জন্যে তৃষিত হয়ে থাকি। তারপর একদিন তার কথা শুনলাম।

'জায়া জননী' ছবির ডাবিং হচ্ছে। পর্দায় ঠোঁট নাড়া দেখে ভয়েস দেওয়া। একটা বাক্য কিছুতেই মেলাতে পারছি না। ক্লোজআপে ধরা আছে বলে ফাঁকি দেবার উপায় নেই। ঠোঁট মেলানোর চেষ্টা করতে–করতে মহা বিরক্ত বোধ করছি। ডিরেক্টর বললেন, 'কিছুক্ষণ রেস্ট নাও রূপা, চা খাও। দশ মিনিট টী ব্রেক।'

আমি আমার ঘরে চলে এলাম। নায়িকাদের জন্যে আলাদা একটা ঘর থাকে। সেখানে কারো প্রবেশাধিকার নেই। আমি একা–একা চা খাচ্ছি। হঠাৎ আমার ছেলের গলা শুনলাম। প্রায় দু' বছর পর শুনছি, কিন্তু এত স্পষ্ট! এত তীব্র! আমার শরীর ঝনঝন করে উঠল।

'মা, ও মা।'
'কি খোকা?'
'তুমি কী কর?'
'চা খাচ্ছি।'
'তুমি কোথায়?'
'তুই কোথায় খোকা? তুই কোথায়?'
'এইখানে।'
'কী করছিস?'
'খেলছি।'
'ও খোকা। খোকা।'
'কি?'
'খোকা। খোকা।'
'উঁ।'
'কাছে আয়।'

আমার ছেলে কাঁদতে শুরু করল। তারপর সব আবার চুপচাপ হয়ে গেল। আমি ঘর থেকে বের হয়ে ডিরেক্টরকে বললাম, 'আজ আর কাজ করব না। আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিন, আমার ভয়ংকর খারাপ লাগছে।'

সেই রাতে আমি একগাদা ঘুমের অষুধ খেলাম। মরবার জন্যেই খেলাম। ডাক্তাররা আমাকে বাঁচিয়ে তুললেন।

মিসির আলি খাতা বন্ধ করে ডাকলেন, 'বজলু।'

বজলু ছুটে এল। মিসির আলি বললেন, 'আমার ঢাকা যাওয়া দরকার। এখন যদি রওনা দিই তাহলে কতক্ষণে ঢাকা পৌঁছব!'

বজলু হতভম্ব হয়ে বলল, 'এখন কী যাইবেন? রাত দশটা বাজে।'

'গৌরীপুর থেকে ঢাকা যাবার কোনো ট্রেন কি নেই? যে-ট্রেন শেষরাতে ছাড়ে? চল, রওনা দিয়ে দিই।'

'স্যার, আপনের মাথাটা খারাপ।'

'কিছুটা খারাপ তো বটেই। জ্যোৎস্না রাত আছে। জ্যোৎস্না দেখতে-দেখতে যাব।'

'সত্যি যাইবেন?'

'হ্যাঁ, সত্যি যাব। একটি দুঃখী মেয়ের সঙ্গে দেখা করা দরকার। খুব দরকার।'

৮

রূপা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে।

মিসির আলি বললেন, 'এমন করে তাকাচ্ছ কেন? চিনতে পারছ না?'

'পারছি।'

'তোমার খাতা ফেরত দিতে এসেছি। সবটা পড়ি নি। অর্ধেকের মতো পড়েছি।'

'সবটা পড়েন নি কেন?'

'সবটা পড়ার প্রয়োজন বোধ করি নি। আমার যা জানার তা জেনেছি। তুমি শান্ত হয়ে আমার সামনে বস। আমার যা বলার বলব। আমি যখন কথা বলব তখন আমাকে থামাবে না। চুপ করে শুনে যাবে।'

রূপা কিছু বলল না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। মিসির আলি বললেন, 'তোমার খাতা পড়ে প্রথম যে-ব্যাপারটায় আমার খটকা লেগেছে তা হচ্ছে—তোমার ছেলের কবর গোরস্তানে কেন হল না? কেন তোমার বাড়িতে হল? তোমার মা এই কাজটি কেন করলেন? যে-মহিলা স্বামীর স্মৃতিচিহ্ন রাখেন না, সেই মহিলা তাঁর নাতির স্মৃতিচিহ্ন ধরে রাখার চেষ্টা কেন করবেন? রহস্যটা কী?

দ্বিতীয় খটকা—তোমার মা ধর্মপ্রাণ মহিলা। তিনি তোমার ছেলের কবরের কাছে দাঁড়িয়ে কখনো দোয়া-দরুদ পড়েন না। এর মানে কী? এটা কি তাহলে কবর না? মেয়ে ভোলানোর চেষ্টা?...

'গোরস্তানে কবর দিতে হলে ডেথ সার্টিফিকেট লাগে। তাঁর কাছে ডেথ সার্টিফিকেট ছিল না। কারণ বাচ্চাটি মরে নি। তুমি নিজেও তোমার মৃত শিশু দেখ নি।...

'ব্যাপারটা কি এ-রকম হতে পারে না যে তোমার মা দেখলেন—তোমাদের বিয়ে টিকিয়ে রাখতে হলে বাচ্চাটিকে মৃত ঘোষণা করাই সবচেয়ে ভালো বুদ্ধি? বাচ্চাটি দূরে সরিয়ে দিতে তাঁর খারাপ লাগল না, কারণ তিনিও খুব সম্ভব তোমার স্বামীর মতোই বিশ্বাস করেছেন—এই শিশুর বাবা তোমার স্বামী নন। তোমার মা মানসিকভাবে অসুস্থ একজন মহিলা। তাঁর পক্ষে এ-রকম মনে করাই স্বাভাবিক।...

'এখন আসছি তুমি যে শিশুর কথা শুনতে পাচ্ছ সে-ব্যাপারটিতে। শিশুর সঙ্গে মায়ের টেলিপ্যাথিক যোগাযোগ মোটামুটিভাবে স্বীকৃত। তুমি তারিখ দিয়ে-দিয়ে সব লিখেছ বলে আমার খুব সুবিধা হয়েছে। আমি লক্ষ করলাম শুরুতে তুমি শুধু কান্না শুনতে।

'প্রথম যখন মা-মা ডাক শুনলে, হিসেব করে দেখলাম শিশুটির বয়স তখন এক বছর। এক বছর বয়সী শিশুরা মা ডাকতে শেখে। . . . .

'তোমার লেখা থেকে তারিখ দেখে হিসেব করে বের করলাম, তোমার ছেলে পুরো বাক্য যখন বলছে তখন তার বয়স তিন। এই বয়সে বাচ্চারা ছোট-ছোট বাক্য তৈরি করে। ...

'আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি যে তোমার সঙ্গে তোমার ছেলের একধরনের যোগাযোগ হয়েছে। পুরো ব্যাপারটা প্যারানরম্যাল সাইকোলজির বিষয়। এবং রহস্যময় জগতের অসাধারণ একটি উদাহরণ। ...

'আমার ধারণা, একটু চেষ্টা করলেই তুমি তোমার ছেলেকে খুঁজে পাবে। এত বড় একটা কাজ তোমার মা একা করতে পারেন না। তাঁকে কারো-না-কারোর সাহায্য নিতে হয়েছে। তোমাদের বাড়ির দারোয়ান, কাজের মেয়ে—এদের কাছ থেকে সাহায্য পেতে পার। পুলিশকে খবর দিতে পার। বাংলাদেশের পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ ইচ্ছা করলে অসাধ্য সাধন করতে পারে। তার পরেও যদি কাজ না হয় তুমি তোমার

টেলিপ্যাথিক ক্ষমতা ব্যবহার কর। ছেলের কাছ থেকেই জেনে নাও সে কোথায় আছে।'

রূপা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

মিসির আলি বললেন, 'কিছু বলবে?'

রূপা না-সূচক মাথা নাড়ল।

মিসির আলি বললেন, 'আজ উঠি। ধাক্কা সামলাতে তোমার সময় লাগবে। সাহস হারিও না। মন শক্ত রাখ। যাই।'

রূপা কোনো উত্তর দিল না, মূর্তির মতো বসে রইল।

এক মাস পরের কথা। মিসির আলির শরীর খুব খারাপ করেছে। তিনি তাঁর ঘরেই দিনরাত শুয়ে থাকেন। হোটেলের একটি ছেলে তাঁকে হোটেল থেকে খাবার দিয়ে যায়, বেশির ভাগ দিন সেইসব খাবার মুখে দিতে পারেন না। প্রায় সময়ই অসহ্য মাথার যন্ত্রণায় ছটফট করেন। এ-রকম সময়ে তিনি একটি চিঠি পেলেন। হাতের লেখা দেখেই চিনলেন—রূপার চিঠি। রূপা লিখেছে—

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আমি আমার ছেলেকে খুঁজে পেয়েছি। সে এখন আমার সঙ্গেই আছে। আপনার সামনে আসার সাহস আমার নেই। আমি জানি আপনাকে দেখে চিৎকার করে কেঁদেকেটে একটা কাণ্ড করব। আপনাকে বিব্রত করব। আমি কোনোদিনই আপনার সামনে যাব না। শুধু একদিন আমার ছেলেটাকে পাঠাব। আপনি তার একটি নাম দিয়ে দেবেন এবং তার মাথায় হাত দিয়ে একটু আদর করবেন। আপনার পুণ্যস্পর্শে তার জীবন হবে মঙ্গলময়।

আমি শুনেছি আপনার শরীর ভালো না। কঠিন অসুখ বাঁধিয়েছেন। আপনি চিন্তা করবেন না। একজন দুঃখী মা'র হৃদয় আপনি আনন্দে পূর্ণ করেছেন। তার প্রতিদান আল্লাহ্‌কে দিতেই হবে। আমি আল্লাহ্‌র কাছে আপনার আয়ু কামনা করেছি। তিনি আমার প্রার্থনা শুনেছেন।'

মাথার তীব্র যন্ত্রণা নিয়েও তিনি হাসলেন। মনে-মনে বললেন-বোকা মেয়ে, প্রকৃতি প্রার্থনার বশ নয়। প্রকৃতি প্রার্থনার বশ হলে পৃথিবীর চেহারাই পাল্টে যেত। পৃথিবীর জন্যে প্রার্থনা তো কম করা হয় নি।

মিসির আলি টিয়া পাখির বিষয়টি নিয়ে ভাবতে বসলেন। উড়ন্ত টিয়া পাখি কালো দেখায় কেন? কিছু-একটা নিয়ে ব্যস্ত থাকা। মাথার তীব্র যন্ত্রণা ভুলে থাকার ছেলেমানুষি এক চেষ্টা।

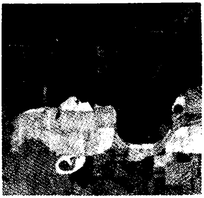

মিসির আলির অমিমাংসিত রহস্য

১

'আপনি কি ভূত দেখেছেন স্যার? ইংরেজিতে যাকে বলে spirit, ghost, astral body মানে প্রেতাত্মার কথা বলছি, অশরীরী......'

মিসির আলি প্রশ্নটির জবাব দেবেন কি না বুঝতে পারছেন না। কিছু মানুষ আছে যারা প্রশ্ন করে, কিন্তু জবাব শুনতে চায় না। প্রশ্ন করেই হড়বড় করে কথা বলতে থাকে। কথার ফাঁকে-ফাঁকে আবার প্রশ্ন করে, আবার নিজেই জবাব দেয়। মিসির আলির কাছে মনে হচ্ছে তাঁর সামনের চেয়ারে বসে থাকা এই মানুষটি সেই প্রকৃতির। ভদ্রলোক মধ্যবয়স্ক। গোলাকার মুখে পুরুষ্ট গোঁফ। কুস্তিগির-কুস্তিগির চেহারা। কথার মাঝখানে হাসার অভ্যাস আছে। হাসার সময় কোনো শব্দ হয় না, কিন্তু সারা শরীর দুলতে থাকে। ওসমান গনি নামের এই মানুষটির প্রধান বৈশিষ্ট্য অবশ্য নিঃশব্দে হাসার ক্ষমতা নয়; প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাঁর নিচের পাটির একটি এবং ওপরের পাটির দু'টি দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো। যে-যুগে রুট ক্যানালিং-এর মতো আধুনিক দন্ত চিকিৎসা শুরু হয়েছে, সে-যুগে কেউ সোনা দিয়ে দাঁত বাঁধায় না। এই ভদ্রলোক বাঁধিয়েছেন। ধবধবে সাদা দাঁতের মাঝে ঝকঝকে তিনটি সোনালি দাঁত।

'কথা বলছেন না কেন স্যার, ভূত কি কখনো দেখেছেন?'

'জ্বি-না।'

'না-দেখাই ভালো। আমি একবার দেখেছিলাম, এতেই অবস্থা কাহিল। ঘাম দিয়ে জ্বর এসে গিয়েছিল। এক সপ্তাহের উপর ছিল জ্বর। পায়ের পাতা চুলকাত। ডাক্তার পরীক্ষা করে বলল—অ্যালার্জি। ডাক্তারদের কারবার দেখুন, আমি বললাম, ভূত দেখে জ্বর এসে গেছে। তার পরেও ডাক্তার বলে অ্যালার্জি। অ্যান্টি হিস্টামিন দিয়েছিল। অ্যান্টি হিস্টামিন কি ভূতের অষুধ, আপনি বলুন?'

মিসির আলি বললেন, 'আজ আমার একটু কাজ ছিল। বাইরে যাব। আপনি বরং অন্য একদিন আসুন, আপনার গল্প শুনব।'

'দশ মিনিট লাগবে স্যার। ভূতের গল্পটা বলেই চলে যাব। আমার সঙ্গে একটা

মাইক্রোবাস আছে, আপনি যেখানে যেতে চান আপনাকে নামিয়ে দিয়ে যাব। রিকন্ডিশান্ড মাইক্রোবাস। গত আগস্ট মাসে কিনেছি। দু' লাখ পঁচিশ নিয়েছে।'

মিসির আলি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'আপনি কি খুব অল্পকথায় আপনার ভূত দেখার গল্প বলতে পারবেন? যদি পারেন তাহলে বলুন, গল্প শুনব। খুব যে আগ্রহ নিয়ে শুনব তা না। অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েরা ভূতের গল্প খুব আগ্রহ করে শোনে। আমার বয়স একান্ন। তার চেয়েও বড় কথা ভূত-প্রেতের ব্যাপারে আমার উৎসাহ কম।'

'আমারো কম। খুবই কম। গল্পটা বলে চলে যাই স্যার।'

'আচ্ছা বলুন। আপনি কি এই গল্প শোনাতেই এসেছেন?'

'দ্যাটস কারেক্ট স্যার। আপনার ঠিকানা পেয়েছি আমার ভাগ্নির কাছ থেকে। সে বইটই পড়ে। বই পড়ে তার ধারণা হয়েছে আপনি দারুণ বুদ্ধিমান। অনেক বড় বড় সমস্যা নাকি সমাধান করেছেন। তখন ভাবলাম, যাই, ভদ্রলোককে দেখে আসি। বুদ্ধিমান লোকের সঙ্গে কথা বলেও আনন্দ। গাধা টাইপের লোকের সঙ্গেও অবশ্যি কথা বলে আনন্দ পাওয়া যায়। যাদের বুদ্ধি মাঝামাঝি, এদের সঙ্গে কথা বলে কোনো আনন্দ নেই। আমি আসায় বিরক্ত হন নি তো?'

'না, বিরক্ত হই নি। আপনার কি কোনো সমস্যা আছে?'

'না, কোনো সমস্যা নেই। প্রথম দিন ভূত দু'টাকে দেখে ভয় পেয়ে জ্বর হয়েছিল। এখন আর হয় না।'

'প্রায়ই দেখেন?'

'জ্বি-না। প্রায়ই দেখি না। ধরেন মাসে, দু'মাসে একবার।'

'এরা আপনাকে ভয় দেখায়?'

'না, ভয় দেখায় না। গল্পটা তাহলে বলি—'

'সংক্ষেপ করে বলুন, আমার এক জায়গায় যেতে হবে।'

'আপনি স্যার কোনো চিন্তা করবেন না। আমার মাইক্রোবাস আছে। গত আগস্ট মাসে কিনেছি। নাইনটিন এইটি মডেল......'

'মাইক্রোবাসের কথা আগে একবার শুনেছি। ভূতের কথা কি বলতে চাচ্ছিলেন বলুন।'

'ও হ্যাঁ—আমার হচ্ছে স্যার বিরাট ফ্যামিলি। পাঁচ মেয়ে। সব ক'টার চেহারা খারাপ। মা'র মতো মোটা, কালো, দাঁত উঁচু। একটারও বিয়ে হয় নি। এদিকে আবার আমার ছোট বোনটি মারা গেছে—তার তিন মেয়ে এক ছেলে উঠে এসেছে আমার বাড়িতে। গোদের উপর বিষফোঁড়া। আমার মা, এক খালাও সঙ্গে থাকেন। বাড়িভর্তি মেয়ে। একগাদা মেয়ে থাকলে যা হয়, দিন-রাত ক্যাঁচ-ক্যাঁচ-ক্যাঁচ-ক্যাঁচ। সন্ধ্যার পর থেকে শুরু হয় ভিসিআর। রোজ রাতে এরা দু'টা করে ছবি দেখে। আমার মা চোখে কিছুই দেখেন না, তিনিও ভিসিআর-এর সামনে বসে থাকেন। শব্দ শোনেন। শব্দ শুনেই হাসেন-কাঁদেন। গলার আওয়াজ শুনে বলতে পারেন কে শ্রীদেবী, কে রেখা। এই হল স্যার বাড়ির অবস্থা।'

মিসির আলি হতাশ গলায় বলেন, 'আপনি মূল গল্পটা বলুন। আপনি অপ্রয়োজনীয় কথা বেশি বলছেন।'

'মূল গল্পটা তাহলে বলি। বাড়ির মেয়েগুলির যন্ত্রণায় আমি রাতে ঘুমাই ছাদের চিলেকোঠায়। ছোট্ট ঘর। খাট আছে, ড্রেসিং টেবিল আছে, শুধু বাথরুম নেই—এই একটা অসুবিধা। আমার আবার ডায়াবেটিস আছে, কয়েকবার প্রস্রাব করতে হয়। ছাদে প্রস্রাব করি। কাজের ছেলেটা সকালে এক বালতি পানি দিয়ে ধুয়ে দেয়। কাজের ছেলেটার নাম হল ইয়াসিন।'

'প্লীজ, গল্পটা তাড়াতাড়ি শেষ করুন।'

'জ্বি স্যার, শেষ করছি। গত বৎসর চৈত্র মাসের ছয় তারিখের কথা। রাতে ঘুমাচ্ছি, প্রস্রাবের বেগ হওয়ায় ঘুম ভেঙে গেল। মাথার কাছে টেবিল ল্যাম্প ছিল। টেবিল ল্যাম্প জ্বালালাম। তখনি দেখি ঘরের কোণায় দু'টা ভূত। খুব ছোট সাইজ, লম্বায় এই ধরেন এক ফুটের মতো হবে। গজ-ফিতা দিয়ে মাপি নি। চোখের আন্দাজ। দু'-এক ইঞ্চি এদিক-ওদিক হতে পারে।'

'তারা করছে কী?'

'বই নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে। একজনের হাতে সবুজ মলাটের ময়লা একটা বই, অন্যজন সেই বই কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। খিচ-খিচ, খির্চ-খিচ করে কথা বলছে। আমি ওদের দিকে তাকাতেই কথা বন্ধ করে ফেলল। আমি তখনো ভয় পাই নি। কারণ হঠাৎ ঘুম ভেঙেছে তো, এরা যে ভূত এইটাই বুঝি নি। কাজেই ধমকের মতো বললাম, 'এ্যাই, এ্যাই।'

'তখন কী হল?'

'ধমক শুনে হাত থেকে বই ফেলে দিল। তারপর মিলিয়ে গেল। তখন বুঝলাম, এরা ভূত। ছোট সাইজের ভূত। তখন ভয় লাগল। জ্বর এসে গেল।'

'এই আপনার গল্প?'

'জ্বি।'

'আচ্ছা ঠিক আছে। চলুন এখন উঠি।'

'ইন্টারেস্টিং লাগছে না স্যার?'

'জ্বি, ইন্টারেস্টিং।'

'ভূত এত ছোট সাইজের হয়, তা-ই জানতাম না। একটার আবার থুতনিতে অল্প দাড়ি, ছাগলা দাড়ি।'

'আসুন, আমরা উঠি।'

ওসমান গনি উঠলেন। মনে হল খুব অনিচ্ছায় উঠলেন। তাঁর আরো কিছুক্ষণ বসার ইচ্ছা ছিল। মিসির আলি ঘরে তালা দিতে-দিতে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। ওসমান গনির কথাবার্তা থেকে পরিষ্কার হয়ে গেছে—এই লোক তার 'ছোট ভূতের' গল্প বলার জন্য বারবার আসবে। নানানভাবে তাঁকে বিরক্ত করবে। একদল মানুষ আছে, যারা অন্যদের বিরক্ত করে আনন্দ পায়। ইনিও মনে হচ্ছে সেই দলের।

'স্যার।'

'বলুন।'

'ভূতদের ঐ বইটা ড্রয়ারে তালাবন্ধ করে রেখে দিয়েছি।'

'খুব ভালো করেছেন। এই বই তালাবন্ধ থাকাই ভালো।'

'একদিন আপনাকে দেখাতে নিয়ে আসব।'

'কোনো প্রয়োজন নেই। মানুষের বইয়ে আমার আগ্রহ আছে। ভূতের বইয়ের প্রতি আমার আগ্রহ নেই।'

'আমারও নেই। এই জন্যে ড্রয়ারে তালাবন্ধ করে রেখে দিয়েছি। উল্টেও দেখি নি। তার উপর স্যার বইটা থেকে দুর্গন্ধ আসে। গো-মূত্রের গন্ধের মতো গন্ধ।'

ভদ্রলোক আনন্দিত ভঙ্গিতে হাসলেন। মনে হচ্ছে বইটি থেকে গো-মূত্রের গন্ধ আসায় তিনি আনন্দিত। মিসির আলি মনে বিরক্তি চেপে রাখতে পারলেন না। কঠিন গলায় বললেন, 'চলুন রওনা হওয়া যাক। আমার জরুরি কাজ আছে।'

'জ্বি আচ্ছা। কাজের সঙ্গে আপোস নাই। আগে কাজ, তারপর অন্য কথা। আমি তাহলে কাল আসি?'

'কাল আসার কি দরকার আছে?'

'দরকার আছে স্যার। ভূতের গল্পটা ভালোমতো বলা হয় নাই। ওরা আমার সঙ্গে কী-সব কথাবার্তা বলে—একটা আছে ফাজিল ধরনের, আমাকে ডাকে ছোট মামা।'

'ভাই শুনুন, আমার কাছে আসার আর দরকার নেই। আমি নিজে অসুস্থ। বিশ্রাম করছি।'

'আপনি তো স্যার বিশ্রামই করবেন। বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে থাকবেন। আমি পাশে বসে গল্প বলব—'

'আপনি দয়া করে আর আসবেন না। আমি একা-একা বিশ্রাম করতে পছন্দ করি।'

'জ্বি আচ্ছা, আসব না। শুধু যদি স্যার আমাকে একটা উপদেশ দেন। কাগজে লিখে দেন, তাহলে খুব ভালো। উপদেশটা মানিব্যাগে রেখে দেব।'

মিসির আলি হতভম্ব গলায় বললেন, 'কী উপদেশ?'

'লিখবেন—"ওসমান গনি, আপনার মৃত্যু হবে পানিতে ডুবে। খুব সাবধান। খুব সাবধান।" এই লিখে আপনার নামটা সই করবেন।'

'আমি আপনার কথাবার্তা কিছুই বুঝতে পারছি না। এ-সব কথা আমি কেন লিখব?'

'অকারণে লিখতে বলছি না স্যার। কারণ আছে। যে-ভূতটা আমাকে ছোট মামা ডাকে, সে আমাকে বলেছে—আমার মৃত্যু হবে পানিতে ডুবে। আমাকে সাবধান করে দিয়েছে। ভূতের কথা কে বিশ্বাস করে বলেন? কেউ বিশ্বাস করে না। আমিও করি না। এখন যদি আপনি দয়াপরবশ হয়ে লিখে দেন—'

'দেখুন ওসমান গনি সাহেব—এ-জাতীয় কথা আমি কখনো লিখব না। চলুন, আমরা ঘর থেকে বের হই। আকাশের অবস্থা ভালো না—ঝড়-বৃষ্টি হবে।'

'লেখাটা না দিলে আমি স্যার যাব না। লিখে দিলে আর কোনোদিন এসে বিরক্ত করব না। আমি স্যার এককথার মানুষ। মানিব্যাগটা খুললেই আপনার লেখাটা চোখে পড়বে। তখন সাবধান হয়ে যাব। পানির ধারেকাছে যাব না।'

'এটা লিখে দিলে আপনি চলে যাবেন?'

'জ্বি।'

'আর কোনোদিন আসবেন না?'

'বললাম তো স্যার, আমি এককথার মানুষ।'

'বেশ, বসুন। লিখে দিচ্ছি।'

'চা খেতে ইচ্ছা করছে। চিনি ছাড়া এক কাপ চা কি হবে?'

'চা হবে না।'

'আপনার কি প্যাড আছে স্যার? প্যাডে লিখে দিলে ভালো হয়।'

'না, আমার প্যাড নেই।'

'তাহলে নাম সই করে ঠিকানা লিখে দেবেন। আর টেলিফোন নাম্বার, যদি টেলিফোন থাকে।'

'ঠিকানা লিখে দিচ্ছি। টেলিফোন নেই।'

'টেলিফোন না-থাকাই ভালো। বড়ই যন্ত্রণা। এমন সব আজেবাজে টেলিফোন আসে। এই পর্যন্ত আছাড় দিয়ে আমি ক'টা টেলিফোন ভেঙেছি বলুন তো স্যার?'

মিসির আলি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'এই নিন আপনার কাগজ। এখন চলুন, যাওয়া যাক। দয়া করে আবার এসে আমাকে বিরক্ত করবেন না।'

'স্যার থ্যাংকস। খুব উপকার করেছেন।'

ওসমান গনি রাস্তায় নেমে বিস্মিত হয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন। কোনো মাইক্রোবাস দেখা যাচ্ছে না। মিসির আলি বললেন, 'আপনার মাইক্রোবাস কোথায়?' ওসমান গনি খুব স্বাভাবিক গলায় বললেন, 'নতুন ড্রাইভার। বাস নিয়ে পালিয়ে গেছে বোধহয়। আপনি কী বলেন স্যার?'

মিসির আলি কী বলবেন ভেবে পেলেন না। যে-চায়ের দোকানের সামনে মাইক্রোবাসটি দাঁড়িয়ে ছিল, সেই চায়ের দোকানিকে জিজ্ঞেস করা হল। সে বলল, তার দোকানের সামনে কখনোই কোনো মাইক্রোবাস দাঁড়িয়ে ছিল না।

ওসমান গনি চিন্তিত গলায় বললেন, 'বিরাট সমস্যা হয়ে গেল। আমি এখন বাসায় যাব কী করে? আমার তো বাসার ঠিকানা মনে নেই।'

'আমি আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না। বাসার ঠিকানা মনে নেই মানে?'

'আমার কিছু মনে থাকে না। ও, আচ্ছা আচ্ছা, নোটবুকে ঠিকানা লেখা আছে। স্যার, আপনি আমাকে একটা রিকশা ঠিক করে দিন। আর নোটবই দেখে ঠিকানাটা রিকশাওয়ালাকে ভালো করে বুঝিয়ে দিন। কী যন্ত্রণার মধ্যে পড়লাম দেখুন তো!'

মিসির আলি নোটবই খুললেন। সেখানে প্রথমে বাংলা এবং পরে ইংরেজিতে লেখা—

"ইনি মানসিকভাবে অসুস্থ।

দয়া করে তাঁকে সাহায্য করুন। তাঁর বাসার ঠিকানা............."

'স্যার, ঠিকানাটা লেখা আছে না?'

'আছে।'

'পরের পৃষ্ঠায় ডায়াগ্রাম আছে। ডায়াগ্রাম দেখে রিকশাওয়ালাকে বুঝিয়ে দিন, ও নিয়ে যাবে।'

মিসির আলি নোটবই হাতে দাঁড়িয়ে রইলেন। এ-জাতীয় ঝামেলায় তিনি আগে পড়েন নি। ওসমাস গনি নিজেই রিকশা ডেকে আনলেন। তাঁকে বেশ উৎফুল্ল মনে হল। মিসির আলি রিকশাওয়ালাকে বুঝিয়ে দিলেন কীভাবে যেতে হবে। ওসমান গনি বললেন, 'স্যার, তাহলে যাই। আপনার সঙ্গে কথা বলে ভালো লাগল। কারো সঙ্গে কথা

বলে আজকাল আরাম পাই না। এই জন্যেই ছাদের ঘরে একা-একা থাকি। বড় ভালো লাগল স্যার। তবে সব ভালো দিকের যেমন মন্দ দিক আছে—এটারও আছে। মাইক্রোবাসটা চুরি হয়ে গেল। বাসায় ফিরেও শান্তি নেই। থানা-পুলিশ করতে হবে।'

মিসির আলি বললেন, 'আমি কি আসব আপনার সঙ্গে?'

ওসমান গনি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'না না না। কোনো প্রয়োজন নেই। এ-রকম আগেও হয়েছে, রিকশা করে চলে গেছি। আচ্ছা স্যার, যাই। আপনিও বাসায় চলে যান। রাত অনেক হয়ে গেছে। এত রাতে কোথাও যাওয়া ঠিক না। তা ছাড়া আমার মনে হয় আপনার আসলে কোথাও যাবারও কথা না। আমার হাত থেকে বাঁচার জন্য বলেছেন—''কাজ আছে।'' বুদ্ধিমান লোকেরা এ-রকম করে। আপনি স্যার আসলেই বুদ্ধিমান।' ওসমান গনি নিঃশব্দে গা দুলিয়ে হাসতে লাগলেন।

মিসির আলি ঘরে ফিরলেন খানিকটা বিভ্রান্ত হয়ে। বিভ্রান্তির অনেকগুলি কারণ। প্রথম কারণ—ওসমান গনিকে মানসিক রুগী বলে মনে হচ্ছে না। যে-মানুষ খুঁজে খুঁজে তার ঠিকানা বের করতে পারে, সে নোট বইয়ে লেখা পড়ে বাসায় ফিরে যেতে পারে না, তা হয় না।

লোকটি যে পাগল সাজার ভান করছে তাও না। যে ভান করবে, সে সারাক্ষণই করবে। আসল পাগলের চেয়ে নকল পাগল অনেক বেশি পাগলামি করে। মিসির আলি যে তাকে বিদেয় করবার জন্যে বলছেন-'তাঁর কাজ আছে', এই ব্যাপারটি ওসমান গনির কাছে ধরা পড়েছে। নকল পাগল হলে তা সে কখনো স্বীকার করত না। চেপে যেত। তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে? রাতে ঘুমুতে যাবার সময় মিসির আলি বালিশের কাছে রাখা খাতায় পেনসিলে অস্পষ্টভাবে লিখলেন—

নাম : ওসমান গনি।
বয়স : পঞ্চাশের কাছাকাছি।
বিশেষত্ব : তিনটি সোনাবাঁধানো দাঁত। হাসেন কোনো রকম শব্দ না করে।

(১) কেন এসেছিলেন? বুঝতে পারা যাচ্ছে না।
(২) অন্যরা দাবি করছে তিনি মানসিকভাবে অসুস্থ। তিনি নিজে দাবি করছেন না।
(৩) তবে তিনি যে ভৌতিক গল্পের কথা বলছেন, তা মানসিক অসুস্থতার দিকেই ইঙ্গিত করে।
(৪) লোকটি বিত্তবান বলেই মনে হল। কারণ তিনি যে-তেতলা বাড়ির কথা বললেন, সেই বাড়িটি তাঁর হওয়ারই সম্ভাবনা। নোটবইয়ের ঠিকানায় গুলশানের কথা লেখা। গুলশান বিত্তবানদের এলাকা।
(৫) ভদ্রলোকের হাতে পাথর-বসানো তিনটি আঙটি, ব্যবসায়ীরা সাধারণত পাথর-টাথরে বিশ্বাসী হয়। তিনি সম্ভবত একজন ব্যবসায়ী।

রাত এগারটা পাঁচ মিনিটে মিসির আলি বাতি নিভিয়ে ঘুমুতে গেলেন। কঠিন নিয়মে তিনি এখন নিজেকে বাঁধার চেষ্টা করছেন। ঘুম আসুক না-আসুক, রাত এগারটা বাজতেই বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়বেন। ঘুম আনানোর যে-সব প্রক্রিয়া আছে সেগুলি প্রয়োগ করবেন। তার পরেও যদি ঘুম না আসে কোনো ক্ষতি নেই। বিছানায়

গড়াগড়ি করবেন। উঠবেন ভোর পাঁচটায়। ঘুম পাড়িয়ে দেবার কোনো যন্ত্র আবিষ্কৃত হয় নি, কিন্তু ঘুম ভাঙানোর যন্ত্র আছে। তিনি দু' শ' ত্রিশ টাকা দিয়ে একটি অ্যালার্ম-ঘড়ি কিনেছেন। এই ঘড়ি ভোর পাঁচটায় এমন হৈচৈ শুরু করে যে, কার সাধ্য বিছানায় শুয়ে থাকে। বিজ্ঞানের এই সাফল্যের দিনে ঘুম আনার যন্ত্র বের হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। অ্যালার্ম-ঘড়ি যে-হারে বিক্রি হয়, ঘুম-ঘড়িও সেই হারে বিক্রি হবে।

ঘুম আনানোর প্রক্রিয়াগুলি কাজ করছে না। মিসির আলি সাত শ' ভেড়া গুনলেন। এই গুণন প্রক্রিয়ায় মস্তিষ্কের ক্লান্ত হয়ে যাবার কথা। ক্লান্ত হবার পরিবর্তে মস্তিষ্ক আরো উত্তেজিত হল। মনে-মনে গল্প বললেও নাকি ঘুম আসে। গল্প বলার সময় ভাবতে হয়, এক দল ঘুম-ঘুম চোখের শিশুরা গল্প শুনছে। মিসির আলি গল্প শুরু করলেন। সব গল্প শুরু হয় এইভাবে—এক দেশে ছিল এক রাজা। তাঁর গল্পটা একটু অন্য রকম হল—এক দেশে ছিল এক রানী। রানীর দুই রাজা। সুয়োরাজা এবং দুয়োরাজা। সুয়োরাজাটা বড়ই ভালো..........।

কল্পনার শিশুদের একজন প্রশ্ন করল, 'সুয়োরাজার নাম কি?'

'সুয়োরাজার নাম হচ্ছে ওসমান গনি। মোটাসোটা একজন মানুষ, পঞ্চাশের মতো বয়স। হাতে তিনটা আঙটি। এর মধ্যে একটা আঙটি হচ্ছে নীলার। সুয়োরাজার তিনটা দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো.......'

কল্পনার শিশুটি বলল, 'এ আবার কেমন রাজা?'

মিসির আলি বিছানা থেকে উঠে পড়লেন। বাতি জ্বালালেন না, অন্ধকারেই বাথরুমে ঢুকে চোখে-মুখে পানি ঢাললেন। বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে সিগারেট ধরালেন, যদিও তাঁর বর্তমান নিয়ন্ত্রিত জীবন্‌যাপন পদ্ধতিতে রাত এগারটা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত কোনো সিগারেট খাবার ব্যবস্থা নেই। তিনি একধরনের অস্বস্তি বোধ করছেন, একধরনের বিভ্রান্তি—যা ওসমান গনি নামের মানুষটি তৈরি করে গেছেন। মাথা থেকে বিভ্রান্তি তাড়াতে পারছেন না। স্নায়ু উত্তেজিত হয়ে আছে। বারান্দায় প্রচুর হাওয়া, আকাশ মেঘলা। শ্রাবণের ধারাবর্ষণ সম্ভবত শুরু হবে। তাঁর শীত-শীত লাগছে। জ্বলন্ত সিগারেট হাতে নিয়েই তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। সিগারেট পুড়তে-পুড়তে একসময় তাঁর হাতেই নিভে গেল। তাঁর ঘুম ভাঙল ভোর পাঁচটায়। দু' শ' ত্রিশ টাকায় কেনা অ্যালার্ম-ঘড়ি তাঁকে যথাসময়ে ডেকে তুলল।

তিনি হাতমুখ ধুলেন। কেরোসিন কুকারে চা বানিয়ে খেলেন। খানিকক্ষণ ফ্রী-হ্যান্ড একসারসাইজ করলেন। এও নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন পদ্ধতির অংশ। ডাক্তার বিশেষভাবে বলে দিয়েছেন। পাথরের মতো মুখ করে বলেছেন, 'মিসির আলি সাহেব, আপনার শরীরের কলকব্জা সবই নষ্ট হয়ে গেছে। এটা কি আপনি জানেন?'

মিসির আলি হাসতে-হাসতে বললেন, 'জানি।'

'আরো কিছুদিন বেঁচে থাকতে চান, না এখনি মরে যেতে চান?'

'অল্প কিছুদিন বাঁচতে চাই।'

'কতদিন?'

'এই ধরুন এক বৎসর।'

মিসির আলি ভেবেছিলেন ডাক্তার বলবেন, এক বৎসর কেন? ডাক্তার সে-প্রশ্ন করলেন না, খসখস করে প্রেসক্রিপশনে একগাদা কথা লিখতে লাগলেন।

ভোরবেলা খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে পনের মিনিট ফ্রী-হ্যান্ড একসারসাইজ হচ্ছে তার একটি। একসারসাইজের পর এক ঘন্টা প্রাতঃভ্রমণের ব্যাপার আছে। ডাক্তার সাহেব লিখে দিয়েছেন—ঝড় হোক, টাইফুন হোক, ভূমিকম্প হোক—এক ঘন্টা হাঁটতেই হবে।

এখন ঝড়, টাইফুন বা ভূমিকম্প কোনোটাই হচ্ছে না। টিপটিপ করে বৃষ্টি অবশ্যি পড়ছে। সেই বৃষ্টি অগ্রাহ্য করে বের হওয়া যায়। ছাতা মাথায় প্রাতঃভ্রমণ মন্দ নয়। সকালবেলা এই বেড়ানোটা তাঁর খারাপ লাগে না। বিচিত্র সব চরিত্র দেখা যায়। একদল মানুষ প্রাতঃভ্রমণকে প্রায় উপাসনার পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। উপাসনার যেমন কিছু নিয়ম আছে, এদেরও আছে। আরেক দল আছে 'খাদক' জাতীয়। ভ্রমণের এক পর্যায়ে বিশাল টিফিন-ক্যারিয়ার খুলে হাউহাউ করে পরোটা-গোস্ত যেভাবে গিলতে থাকেন, তাতে মনে হয় তাঁদের সৃষ্টি করা হয়েছে খোলা মাঠে বসে গোস্ত-পরোটা খাবার জন্যে।

মিসির আলি বেরুবার মুখে বাধা পেলেন। গেটের কাছে আসতেই ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর বয়েসী এক ভদ্রলোক এসে শীতল গলায় বললেন, 'আপনি কি বেরুচ্ছেন?'

মিসির আলি বিস্মিত হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ।'

'কাল রাতে ওসমান গনি নামের কেউ কি আপনার কাছে এসেছিলেন?'

'এসেছিলেন।'

'ঐ বিষয়ে আপনার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলব। আমি পুলিশের লোক। ইন্সপেক্টর অব পুলিশ। আমার নাম রকিবউদ্দিন।'

মিসির আলি সহজ গলায় বললেন, 'ওসমান গনি কি মারা গেছেন?'

'হ্যাঁ, মারা গেছেন। আপনি কী করে জানলেন?'

'অনুমান করেছি। আমার অনুমানশক্তি ভালো।'

'অনুমানশক্তি ভালো থাকাই ভালো। আসুন, কথা বলি। বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হোম মিনিস্টার নিজেই ইন্টারেস্ট দেখিয়েছেন। বেশিক্ষণ আমি আপনাকে বিরক্ত করব না। প্রাথমিকভাবে আধ ঘন্টার মতো কথা বলব। পরে আবার আসব।'

'রকিবউদ্দিন সাহেব, এখন তো আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারব না। এখন মর্নিং-ওয়াকে যাচ্ছি। এক ঘন্টা মর্নিং-ওয়াক করব। আপনাকে এক ঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে।'

'এক ঘন্টা অপেক্ষা করা সম্ভব নয়, আপনাকে এক্ষুণি কথা বলতে হবে।'

'এমন কোনো আইন কি আপনাদের আছে যে পুলিশ যখন কথা বলতে চাইবে তখনি কথা বলতে হবে?'

'আইনের বিষয় নয়, হোম মিনিস্টার নিজে বলেছেন। তিনি বিষয়টায় খুব আগ্রহ দেখাচ্ছেন।'

'আমি এই মুহূর্তে তেমন আগ্রহ দেখাচ্ছি না। কাজেই আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে। আমি আমার ঘরের চাবি দিয়ে দিচ্ছি, আপনি আমার ঘরে অপেক্ষা করতে পারেন। তবে আপনার যদি ধারণা হয় আমি পালিয়ে যেতে পারি, তাহলে আপনি আমার সঙ্গেও আসতে পারেন।'

'ঠিক আছে, আমি অপেক্ষা করব। আপনি দেরি করবেন না। দিন, ঘরের চাবি দিন।'

মিসির আলি চাবি দিয়ে গেট খুলে রওনা হলেন। রাস্তার মোড় পর্যন্ত গিয়ে একবার পিছনে ফিরলেন। ইন্সপেক্টর সাহেব আগের জায়গায় চাবি হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। ভদ্রলোকের মুখ শ্রাবণ মাসের আকাশের চেয়েও মেঘলা।

বৃষ্টি জোরেসোরে পড়া শুরু করেছে। রাস্তায় নোংরা পানি। পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ময়লা পানিতে ডুবিয়ে প্রাতঃভ্রমণে যাবার কোনো মানে হয় না—তবু মিসির আলি যাচ্ছেন। ঝড় হোক, টাইফুন হোক, ভূমিকম্প হোক—তাঁকে এক ঘন্টা হাঁটতে হবে। সকালের খোলা হাওয়া গায়ে লাগাতে হবে। এক বৎসর তাঁকে বেঁচে থাকতে হবে। দেখা যাক, ডাক্তারের উপদেশ মেনে কতদূর কি হয়।

আজ শরীর অন্যদিনের চেয়েও বেশি খারাপ লাগছে। চোখ জ্বালা করছে, কোনো কিছুর দিকেই বেশি সময় তাকিয়ে থাকা যাচ্ছে না। শরীরের সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নষ্ট হতে শুরু করেছে। শুধু শরীর নয়—মনও নষ্ট হতে শুরু করেছে। ওসমান গনির মৃত্যুসংবাদ তাঁকে বিচলিত করে নি। করা উচিত ছিল। খ্রিস্টানরা মৃত্যুসংবাদে গির্জায় ঢং-ঢং করে ঘন্টা বাজায়। নিয়মটা সুন্দর। সবাইকে জানিয়ে দেয়া—শোন, তোমরা শোন! তোমাদের একজন চলে গিয়েছে—ঢং ঢং ঢং . . . . .

'কেমন আছেন মিসির আলি সাহেব?'

মিসির আলি তাকালেন–অপরিচিত একজন মানুষ। অপরিচিত মানুষদের প্রশ্নের জবাব খুব অল্প কথায় দিতে হয়, কিন্তু মিসির আলি একটি দীর্ঘ বাক্য বললেন, 'আমি ভালো না। শরীর নষ্ট হয়ে যাচ্ছে—মনও নষ্ট হচ্ছে। অপেক্ষা করছি ঘন্টার জন্যে, ঢং ঢং ঢং। ভাই যাই।"

অপরিচিত ভদ্রলোক অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন। তিনি এতটা অবাক হচ্ছেন কেন তাও মিসির আলি ধরতে পারলেন না।

২

পুলিশের লোকদের বিব্রত করে সবাই বোধহয় এক ধরনের আনন্দ পায়। এক ঘন্টার জায়গায় মিসির আলি দু' ঘন্টা দেরি করে ফেললেন। ভ্রমণ শেষ করে হোটেল রহমানিয়ায় নাশতা করলেন।ম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব ক'টা পত্রিকা পড়লেন। গুরুত্বপূর্ণ মৃত্যুর কথা খবরের কাগজে থাকবেই। ওসমান গনি সম্পর্কিত কোনো খবর কোনো পত্রিকাতেই নেই। হোম মিনিস্টারের কাছে মানুষটি গুরুত্বপূর্ণ হলেও খবরের কাগজের লোকদের কাছে হয়তো নয়। হোটেল রহমানিয়া থেকে বের হয়ে তিনি নিতান্তই অকারণে নিউমার্কেট কাঁচা-বাজারে গেলেন। ভোরবেলা এখানে মাছের পাইকারি কেনা-বেচা হয়। গাদাগাদি করে রাখা মাছের স্তূপ হাঁকডাক হয়ে বিক্রি হয়। যারা কেনে, তারা মুখ কালো করে কেনে, যারা বিক্রি করে তারাও মুখ কালো করে বিক্রি করে। দেখতে মজা লাগে।

মিসির আলি ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে বললেন, 'এক ঘন্টার কথা বলেছিলাম, একটু দেরি হল।'

ইন্সপেক্টর রকিবউদ্দিন গম্ভীর গলায় বললেন, 'আপনি এক ঘন্টা পঁচিশ মিনিট

দেরি করেছেন।'

বোঝাই যাচ্ছে মানুষটি বিরক্ত। পুলিশের লোকদের বিরক্তি প্রকাশের ভঙ্গি অন্যদের মতো নয়। রকিবউদ্দিন তাঁর বিরক্তি প্রকাশ করছেন ঘন-ঘন নিঃশ্বাস ফেলে। রকিবউদ্দিনের সঙ্গে আরো একজনকে দেখা যাচ্ছে। সে মনে হচ্ছে পদমর্যাদায় ছোট। ঘরে আরো চেয়ার থাকতেও বসেছে মোড়ায়। তার হাতে কাগজ এবং কলম।

মিসির আলি বললেন, 'আপনারা কি চা খাবেন? চা করি?'

'চা খাব না। আপনি আমার সামনে বসুন। কথার জবাব দিন।'

'আপনি এমন ভঙ্গিতে কথা বলছেন যেন আমি একজন আসামী। আমি কি আসামী?'

'খুন যখন হয়, তখন খুনীর পরিচিত সবাইকেই আসামী ভেবে নিয়ে পুলিশ এগোয়।'

'ওসমান গনি খুন হয়েছেন?'

'আপনি প্রশ্ন করবেন না। প্রশ্ন করার কাজটা আমি করব। আপনি উত্তর দেবেন।'

'বেশ, প্রশ্ন করুন।'

'আপনি দাঁড়িয়ে না-থেকে আমার সামনের চেয়ারটায় বসুন।'

'চেয়ারে না-বসে আমি বরং খাটে বসি। পা তুলে বসা আমার অভ্যাস। আপনারা শোবার ঘরে চলে আসুন। আমি খাটে পা তুলে বসব, আপনারা চেয়ারে বসবেন।'

রকিবউদ্দিন কঠিন মুখে বললেন, 'আমি অন্যের শোবার ঘরে ঢুকি না। কথাবার্তা যা হবার এখানেই হবে।'

'বেশ, প্রশ্ন করুন।'

রকিবউদ্দিনের সঙ্গের লোকটি খাতা এবং পেন্সিল হাতে তৈরি। মনে হচ্ছে শর্টহ্যাণ্ড-জানা কেউ। আজকালকার পুলিশদের সঙ্গে শর্টহ্যাণ্ড-জানা লোকজন হয়তো থাকে, মিসির আলি জানেন না। পুলিশের সঙ্গে তাঁর সে-রকম যোগাযোগ কখনো ছিল না। প্রশ্নোত্তর শুরু হল। প্রশ্নের ধারা দেখে মনে হচ্ছে রকিবউদ্দিন দীর্ঘ দেড় ঘন্টা বসে-বসে সব প্রশ্ন সাজিয়ে রেখেছেন। কোনটির পর কোনটি করবেন তা-ও ঠিক করে রাখা। তবে প্রশ্নগুলির মধ্যে প্রাণ নেই। প্রতিটি প্রশ্ন একই ভঙ্গিতে করা হচ্ছে। স্বরের ওঠানামা নেই, রোবট-গন্ধী প্রশ্ন।

ইন্সপেক্টর : মিসির আলি সাহেব।
মিসির : জ্বি?
ইন্সপেক্টর : আপনি কী করেন?
মিসির : এক সময় অধ্যাপনা করতাম। এখন কিছু করি না।
ইন্সপেক্টর : কিছু না-করলে আপনার সংসার চলে কী করে?
মিসির : আমার সংসার নেই। একা মানুষ। কোনো-না-কোনোভাবে চলে যায়।
ইন্সপেক্টর : একা মানুষদেরও বেঁচে থাকার জন্যে টাকা লাগে। সেই টাকাটা আসে কোত্থেকে?
মিসির : ওসমান গনির মৃত্যুর সঙ্গে আপনার এই প্রশ্নের কোনো সম্পর্ক ধরতে পারছি না।
ইন্সপেক্টর : আপনি আমার প্রশ্নের জবাব দিন। আপনাকে সম্পর্ক খুঁজতে হবে না।

মিসির : বাজারে আমার লেখা কিছু বই আছে, পাঠ্য বই। বইগুলি থেকে রয়েলটি পাই।

ইন্সপেক্টর : বাড়ি ভাড়া কত দেন?

মিসির : আগে দিতাম পনের শ' টাকা। ইলেকট্রিসিটি এবং পানিসহ। এখন কিছু দিতে হয় না।

ইন্সপেক্টর : দিতে হয় না কেন?

মিসির : বাড়িওয়ালা ভদ্রলোকের একটা সামান্য সমস্যার আমি সমাধান করেছিলাম। তারপর থেকে উনি ভাড়া নেন না।

ইন্সপেক্টর : কী সমস্যা?

মিসির : ভৌতিক সমস্যা। ওঁর বাড়িতে ভূতের উপদ্রব ছিল। সেই উপদ্রব দূর করেছি।

ইন্সপেক্টর : আপনি কি ভূতের ওঝা নাকি?

মিসির : আমি ভূতের ওঝা নই। অবশ্যি এক অর্থে ভূতের ওঝা বলতেও পারেন। কিছু মনে করবেন না। আপনার প্রশ্নের ধারা আমি বুঝতে পারছি না।

ইন্সপেক্টর : ওসমান গনি সাহেব কি মাঝে–মাঝে আপনাকে অর্থসাহায্য করতেন?

মিসির : না। গতকালই আমি তাঁকে প্রথম দেখি।

ইন্সপেক্টর : আপনি বলতে চাচ্ছেন যে উনি আপনার কাছে এসেছিলেন?

মিসির : জ্বি।

ইন্সপেক্টর : উনি কখন এসেছিলেন আপনার কাছে?

মিসির : উনি রাত আটটার সময় এসেছিলেন, সাড়ে ন'টায় চলে যান।

ইন্সপেক্টর : ওঁর সম্পর্কে আপনি কী জানেন?

মিসির : আমি কিছুই জানি না।

ইন্সপেক্টর : আপনি মিথ্যা কথা বললেন, কারণ উনি যে ব্যবসায়ী তা আপনি জানতেন। আপনার শোবার ঘরের বালিশের কাছে রাখা একটা খাতায় আপনি তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন।

মিসির : জেনে লিখি নি, অনুমান করে লিখেছি। আরেকটি কথা, খানিকক্ষণ আগে যে বললেন আপনি কারোর শোবার ঘরে ঢোকেন না, তা ঠিক নয়। আপনি আমার অনুপস্থিতিতে আমার শোবার ঘরে ঢুকেছেন।

ইন্সপেক্টর : সন্দেহজনক জায়গায় অনুসন্ধান চালানোর অধিকার পুলিশের আছে।

মিসির : তার জন্যে সার্চ ওয়ারেন্ট লাগে। আপনার কি সার্চ ওয়ারেন্ট আছে?

ইন্সপেক্টর : মিসির আলি সাহেব, আমার সার্চ ওয়ারেন্ট আছে। আমি কাঁচা কাজ কখনো করি না। দেখতে চান?

মিসির : দেখতে চাই না। বুঝতে পারছি আপনি সত্যি কথা বলছেন। আর কী জানতে চান বলুন।

ইন্সপেক্টর : ওসমান গনি সাহেব ঠিক কী কারণে এসেছিলেন?

মিসির : ঠিক কী কারণে এসেছিলেন তা আমার কাছে পরিষ্কার নয়। দুটো ছোট সাইজের ভূতের কথা বললেন, আমার কাছে মনে হল তিনি মানসিকভাবে অসুস্থ।

ইন্সপেক্টর : আপনার ধারণা উনি মানসিক রুগী?

মিসির : আমি পুরোপুরি নিশ্চিত নই, তবে সম্ভাবনা অবশ্যই আছে।

ইন্সপেক্টর : তাঁর হত্যাকারীর নাম তিনি আপনাকে বলে গেছেন? সেই নাম বলুন।

মিসির : আপনার কথায় আমি বিস্মিত বোধ করছি। এ–ধরনের কোনো কথাই হয় নি। তা ছাড়া শুধু–শুধু তিনি আমাকে হত্যাকারীর নাম বলতে যাবেন কেন?

ইন্সপেক্টর : এটা আমাদেরও প্রশ্ন। আচ্ছা, উনি যখন কথা বলছিলেন, তখন কোনো বিশেষ কিছু কি আপনার নজরে পড়েছে?

মিসির : আমি খুব খুঁটিয়ে ওকে লক্ষ করি নি। তাঁর সোনাবাঁধানো তিনটা দাঁত দেখে বিস্মিত হয়েছি। এ–যুগে সোনা দিয়ে কেউ দাঁত বাঁধায় না।

ইন্সপেক্টর : উনি কি আপনাকে বললেন যে ওর দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো? নাকি এও আপনার অনুমান?

মিসির আলি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'অনুমান নয়, দেখলাম।'

ইন্সপেক্টর সাহেব মুখ বিকৃত করলেন। মনে হচ্ছে মিসির আলির কোনো কথাই তিনি বিশ্বাস করছেন না। মিসির আলির কাছে মনে হল পুরো ব্যাপারটা জট পাকিয়ে যাচ্ছে। একবার জট পাকাতে শুরু করলে জট পাকানোর প্রক্রিয়া দ্রুত ঘটতে থাকে। মিসির আলি বললেন, 'ওসমান গনি যে আমার কাছে এসেছিলেন, এই তথ্য আপনি কোথায় পেলেন?'

ইন্সপেক্টর রকিবউদ্দিন যন্ত্রের মতো বললেন, 'ওঁর লেখার টেবিলে আপনার লেখা একটা চিরকুট ছিল। আপনার ঠিকানাও সেই চিরকুটে লেখা। দেখুন তো এই হাতের লেখাটি আপনার?'

'জ্বি, আমার।'

'চিরকুটে এই জাতীয় কথা আপনি কেন লিখলেন।'

'উনি লিখতে বললেন বলেই লিখলাম।'

'কেউ কিছু লিখতে বললেই আপনি লিখে দেন?'

'না, তা দিই না। তবে মানুষটা যদি উন্মাদ হয় এবং কিছু লিখে না–দিলে যদি তার কাছ থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনো উপায় না থাকে, তখন লিখে দিতে হয়। আমার পরিস্থিতিতে আপনি যদি পড়তেন তাহলে বুঝতেন।'

'আপনি বলতে চাচ্ছেন ওসমান গনি একজন উন্মাদ?'

'মানসিকভাবে সুস্থ না তো বটেই।'

'ঠিক আছে। আপনি যা বলছেন লিখে নিচ্ছি এবং ধরে নিচ্ছি যা বলছেন সবই সত্য।'

'মিথ্যা বলার আমার কোনো কারণ নেই।'

'দেখুন মিসির আলি সাহেব, আমি সতের বছর ধরে পুলিশে চাকরি করছি। দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতায় দেখেছি, কারণে মিথ্যা বলার চেয়ে অকারণে মিথ্যা বলতে মানুষ বেশি পছন্দ করে।'

'আপনার অবজারভেশন ঠিক আছে।'

রকিবউদ্দিন উঠে দাঁড়াতে–দাঁড়াতে বললেন, 'এখন আপনি আমার সঙ্গে চলুন।'

'কোথায়?'

'ওসমান গনি সাহেবের ডেড বডি দেখবেন।'

'তার কি প্রয়োজন আছে? মৃত মানুষ দেখতে ভালো লাগে না।'

'মৃত মানুষ দেখতে কারোরই ভালো লাগে না। আপনাকে আমার সঙ্গে আসতে বলছি—আপনি আসুন।'

'চলুন।'

কিছুই মিলছে না। গুলশানের অভিজাত এলাকায় তেতলা বাড়ি। বাড়ির সামনে বিশাল লন। ফোয়ারা আছে, মার্বেল পাথরের একটি শিশু ফোয়ারার মধ্যমণি। চারদিক থেকে তার গায়ে পানি এসে পড়ছে। বাড়ির সামনে কোনো ফুলের বাগান নেই। ঘাসে ঢাকা লন, ঢেউয়ের মতো উঁচুনিচু করা। মনে হয়, বাড়ির সামনে ঢেউ খেলছে। বাড়ির প্যাটার্নও জাহাজের মতো। ফুলের বাগান বাড়ির দু'পাশে। দেশিফুলের প্রচুর গাছ।

মিসির আলিকে গেটের বাইরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হল। কড়া পুলিশ পাহারা। কেউ ভেতরে ঢুকতে পারছে না। রকিবউদ্দিন ভেতরে গেলেন। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর ফিরে এসে মিসির আলিকে নিয়ে গেলেন। দোতলার ঘরে নিচু খাটের ওপর মৃতদেহ শোয়ানো। সাধারণত মরা–বাড়িতে হৈচৈ কান্নাকাটি হতে থাকে। এখানে তার কিছুই নেই। ঘরের এক কোণায় রাখা গদিআঁটা চেয়ারে একটি অল্পবয়সী মেয়ে পাথরের মতো মুখ করে বসে আছে। মেয়েটি একদৃষ্টিতে মৃতদেহটির দিকে তাকিয়ে আছে। মেয়েটির মাথার চুল খুব লম্বা। গায়ে উজ্জ্বল সবুজ রঙের শাড়ি। খাটের এক কোণায় যিনি বসে আছেন, তিনি সম্ভবত ডাক্তার। সাফারির পকেট থেকে স্টেথেসকোপের মাথা বের হয়ে আছে। মৃত মানুষদের জন্যে কোনো ডাক্তার প্রয়োজন হয় না। উনি কেন আছেন কে জানে। ঘরের ভেতর একজন পুলিশ অফিসার আছেন। তাঁকে একইসঙ্গে নার্ভাস এবং বিরক্ত মনে হচ্ছে। তিনি স্থির হয়ে এক সেকেন্ডও দাঁড়াচ্ছেন না।

সাধারণত মৃতদেহ চাদরে ঢাকা থাকে। এ–ক্ষেত্রে তা করা হয় নি। মৃতদেহের মুখের ওপর কোনো চাদর নেই। মিসির আলি বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে আছেন। তাঁর বিস্মিত হবার সঙ্গত কারণ ছিল।

রকিবউদ্দিন বললেন, 'মিসির আলি সাহেব, ভালো করে দেখুন। উনিই কি আপনার কাছে গিয়েছিলেন?'

'না, উনি যান নি।'

'দাঁত দেখার প্রয়োজন আছে?'

'না, দাঁত দেখার প্রয়োজন নেই। যিনি আমার কাছে গিয়েছিলেন, তিনি মোটাসোটা ধরনের খাটো মানুষ। গায়ের রঙ শ্যামলা।'

'যিনি আপনার কাছে গিয়েছিলেন, তিনি বলেছেন যে তাঁর নাম ওসমান গনি?'

'জ্বি।'

গদিতে বসে থাকা মেয়েটি তীক্ষ্ণ গলায় বলল, 'এখানে এত কথা বলছেন কেন? কথা বলার জায়গার তো অভাব নেই।'

রকিবউদ্দিন মিসির আলিকে সঙ্গে নিয়ে বের হয়ে এলেন। মিসির আলি বললেন,

'আমি কি চলে যাব?'

'হ্যাঁ, চলে যাবেন। দরকার হলে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব।'

'দরকার হবে বলে মনে করছেন?'

রকিবউদ্দিন ভাবলেশহীন গলায় বললেন, 'বুঝতে পারছি না। এটা একটা সিম্পল কেইস অব স্যুইসাইড। বাথরুমের ভেতর তাঁকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ ছিল। পুলিশের উপস্থিতিতে দরজা ভাঙা হয়।'

'ও।'

'আত্মহত্যা সম্পর্কে একটা নোট রেখে গেলে আর কোনো সমস্যা ছিল না। নোটটোট নেই—উল্টো আপনার সম্পর্কে আজগুবি কিছু কথা লেখা।'

'আপনার তাহলে ধারণা হচ্ছে কথাগুলি আজগুবি?'

'হ্যাঁ, তাই ধারণা হচ্ছে। পয়সা বেশি হলে মানুষ কিছু-কিছু পাগলামি করে। এইসব কিছু করেছেন। একজন কাউকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। সে গিয়ে বলেছে তার নাম ওসমান গনি। হতে পারে না?'

'হ্যাঁ, হতে পারে।'

'আচ্ছা, আপনি চলে যান। প্রয়োজন হলে আবার যোগাযোগ করব। তবে প্রয়োজন হবে বলে মনে হয় না। এটা একটা আত্মহত্যা। এ-ব্যাপারে সবাই স্যাটিসফায়েড। ফ্যামিলির তরফ থেকে তা-ই বলা হয়েছে।'

'পোস্ট মর্টেম হবে না?'

'হওয়া তো উচিত। অপঘাতে মৃত্যুর সুরতহাল হতে হয়। তবে এরা হচ্ছে সমাজের মাথা। এদের জন্যে নিয়ম-কানুন ভিন্ন।'

রকিবউদ্দিন গেট পর্যন্ত মিসির আলিকে এগিয়ে দিলেন। মিসির আলি বললেন, 'এদের আত্মীয়স্বজন কারো সঙ্গে কি আমি কথা বলতে পারি? যে- বাথরুমে উনি মারা গেলেন সেই বাথরুমটা দেখতে পারি?'

রকিবউদ্দিন বিরক্ত গলায় বললেন, 'কেন?'

'এন্নি। কারণ নেই কোনো। কৌতূহল বলতে পারেন।'

'এইসব বিষয়ে কৌতূহল যত কম দেখাবেন ততই ভালো। বাড়িতে যান। আরাম করে ঘুমান।'

'জ্বি আচ্ছা। সবুজ শাড়িপরা মেয়েটি কি ওঁর আত্মীয়?'

'হ্যাঁ, আত্মীয়। নাদিয়া গনি। রবীন্দ্রসংগীত করেন, নাম জানেন না?'

'না। ওঁর সঙ্গে দুটো কথা বলতে পারলে. . . . . .'

'বাড়ি যান তো—যন্ত্রণা করবেন না।'

মিসির আলি বাড়ি ফিরে ঘুমিয়ে পড়লেন। অসময়ে দীর্ঘ ঘুম। ঘুম ভাঙলো দুপুর দুটোর দিকে। খিদেয় প্রাণ বের হয়ে যাচ্ছে। খেতে হবে হোটেলে। বাইরে বেরুবার উপায় নেই—ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। তিনি হাত বাড়িয়ে মাথার কাছে রাখা খাতাটা নিলেন—ওসমান গনি প্রসঙ্গে একটা কথা মনে হয়েছে। কথাটা লিখে রাখা দরকার। পাতা ওল্টাতে লাগলেন—ওসমান গনি সম্পর্কে যে-পাতায় লিখেছিলেন, ঐ পাতাটা ছেঁড়া। ইন্সপেক্টর রকিবউদ্দিন পাতাটা ছিঁড়ে নিয়ে গেছেন।

সন্ধ্যার মধ্যে মিসির আলি আরো একটি তথ্য আবিষ্কার করলেন। তাঁর বাড়ির

গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে একজন কেউ তাঁর ওপর লক্ষ রাখছে। পুলিশের লোক বলেই মনে হল। সন্ধ্যার পর ডিউটি বদল হল। অন্য একজন এল। বৃষ্টি সমানে পড়ছে। বেচারাকে ছাতামাথায় হাঁটাহাটি করতে হচ্ছে। কে জানে তাকে সারা রাতই এভাবে কাটাতে হবে কি-না।

রাত ন'টার দিকে বৃষ্টি একটু ধরে এলে মিসির আলি রাতের খাবার খেতে বের হলেন। ছাতামাথায় লোকটি নিরীহ ভঙ্গিতে চট করে গলিতে ঢুকে পড়ল। মিসির আলিও সেই গলিতে ঢুকলেন। ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া লোকটির কাছে গিয়ে বললেন, 'আপনি কি আমার ওপর লক্ষ রাখছেন?'

সে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'জ্বি-না স্যার।'

'আপনি পুলিশের লোক তো?'

'জ্বি স্যার, আমি পুলিশের লোক। তবে আমি আপনার ওপর লক্ষ রাখছি না। বিশ্বাস করুন স্যার।'

'বিশ্বাস করছি, আমি হোটেল রহমানিয়ায় ভাত খেতে যাচ্ছি। আপনি আমার সঙ্গে আসতে পারেন।'

'আমি স্যার খেয়ে এসেছি।'

মিসির আলি লম্বা-লম্বা পা ফেলে হোটেলের দিকে রওনা হলেন। তাঁকে তেমন চিন্তিত মনে হল না। যদিও চিন্তিত হবার কথা। পুলিশের একজন লোক সারাক্ষণ তাঁর ঘরের দিকে লক্ষ রাখবে, এটা স্বস্তিবোধ করার মতো কোনো ঘটনা নয়। নিতান্ত সম্পর্কহীন একটা লোক তাঁর সম্পর্কে ডাইরিতে কেন লিখবে? ওসমান গনি সেজে কেনই বা একজন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসবে? একটা সময় ছিল, যখন এ-জাতীয় সমস্যা নিয়ে ভাবতে ভালো লাগত। এখন লাগে না। ক্লান্তিবোধ হয়। তিনি সারা জীবন বিশ্বাস করে এসেছেন, পৃথিবীতে জটিল সমস্যা বলে কিছু নেই। পৃথিবীর নিজস্ব একধরনের সারল্য আছে। সে- কারণেই পৃথিবীর সব সমস্যাই সরল সমস্যা। কিন্তু আসলেই কি তাই? তাঁর ভাবতেও ভালো লাগছে না। ওসমান গনির বিষয়টা নিয়ে তেমন কৌতূহলও কেন জানি বোধ করছেন না। ওসমান গনি ধনবান এবং সম্ভবত ক্ষমতাবান একজন মানুষ ছিলেন। জীবনে যা পাওয়ার সব পেয়ে যাবার পর আত্মহনন করলেন। ঘটনাটা ঘটাবার আগে ছোট্ট একটা রসিকতা করলেন। এর বেশি কি? মৃত্যু কীভাবে হল আগামীকালের খবরের কাগজ পড়ে জানা যাবে। কিংবা কে জানে খবরের কাগজে হয়তো কিছু থাকবে না। ক্ষমতাবান মানুষদের কোন খবরটি পত্রিকায় যাবে, কোনটি যাবে না—তাও তাঁরা ঠিক করে দেন।

মিসির আলি ভাত ডাল এবং এক পিস ইলিশ মাছ দিয়ে রাতের খাবার শেষ করলেন। ইলিশ মাছ খাওয়াটা ঠিক হয় নি। গলায় কাঁটা বিঁধে গেছে। ঢোক গিললেই কাঁটার অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। এম্নিতে কিছু বোঝা যায় না। মুশকিল হচ্ছে গলায় কাঁটা বিঁধলেই অকারণে কিছুক্ষণ পরপর ঢোক গিলতে ইচ্ছা করে।

বাসায় ঢোকবার মুখে বাড়িয়ালার ছেলের বউ দিলরুবার সঙ্গে দেখা। দিলরুবা বারান্দায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখছে। মিসির আলি লক্ষ করেছেন, এই মেয়েটি বৃষ্টি দেখতে পছন্দ করে। বৃষ্টি হলেই মেয়েটাকে তিনি বারান্দায় দেখেন। দিলরুবা খুশি-খুশি গলায় ডাকল, 'মিসির চাচা। আপনার কী হয়েছে বলুন তো?'

'কিছু হয় নি, কী হবে?'

'আজ সকালে বাবার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল। আপনি বাবাকে চিনতে পারেন নি। হড়বড় করে একগাদা কথা বলেছেন। ঘন্টা বাজছে—ঢং ঢং ঢং . .'

দিলরুবা খিলখিল করে হাসছে। মেয়েটির হাসিমুখ দেখতে ভালো লাগছে।

'আপনার শরীর ভালো আছে তো মিসির চাচা?'

'হ্যাঁ মা, শরীর ভালো।'

তিনি সহজে কোনো মেয়েকে মা ডাকতে পারেন না। এই মেয়েটিকে মা ডেকে ভালো লাগছে। খানিকক্ষণের জন্যে হলেও ভুলে গেছেন যে তাঁর গলায় কাঁটা ফুটে আছে।

৩

বিশিষ্ট বেহালাবাদক শিল্পপতি ওসমান গনির মর্মান্তিক মৃত্যু
[স্টাফ রিপোর্টার]

বিশিষ্ট বেহালাবাদক শিল্পপতি জনাব ওসমান গনি গত বারই জুন রাত তিনটায় গুলশানস্থ বাসভবনে মর্মান্তিক মৃত্যুবরণ করেন। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ—জনাব ওসমান গনি ঐ রাতে তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী নাদিয়া গনিকে কিছুক্ষণ বেহালা বাজিয়ে শোনান। অতঃপর তাঁকে বলেন বড় ধরনের দুঃসংবাদের জন্যে সবাইকে সবসময় মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হয়। কন্যা এই পর্যায়ে জানতে চান, তিনি এ-জাতীয় কথা কেন বলছেন। ওসমান গনি তার উত্তরে নানান ধরনের রসিকতা করতে থাকেন, এবং এক সময় তাঁকে এক পট গরম কফি এনে দিতে বলেন। নাদিয়া গনি কফির পট নিয়ে বাবার ঘরে ঢুকে বাবাকে দেখতে পান না। বাবা স্নান করছেন। বেরুতে দেরি হবে ভেবে তিনি আবার রান্নাঘরে ফিরে যান। নতুন এক পট কফি বানিয়ে ফিরে আসেন। এই সময় তিনি বাথরুম থেকে আর্তস্বর শুনে চমকে ওঠেন। বাথরুমের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। সেখান থেকে শব্দ ভেসে আসছে। নাদিয়া গনি বাথরুমের দরজা খুলতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। তাঁর হৈচৈ শুনে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা ছুটে আসেন। বাথরুমের দরজা ভেঙে ফেললে দেখা যায়, ওসমান গনির নিষ্প্রাণ দেহ বাথটাবের পানিতে ডুবে আছে। প্রাথমিকভাবে মনে হয়েছিল তিনি আত্মহত্যা করেছেন, পরবর্তী সময়ে সুরতহাল রিপোর্টে বলা হয়—বাথটাবে স্নানরত অবস্থায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তাঁর মৃত্যু ঘটে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দশ বছর আগে তাঁর স্ত্রীও দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি আর দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করেন নি। নিঃসঙ্গ জীবন কাটিয়ে দেন। প্রচারবিমুখ এই নিবেদিতপ্রাণ শিল্পীর মৃত্যুতে নগরীতে শোকের ছায়া নেমে আসে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিশ্ববিশ্রুত বেহালাবাদক ইহুদি মেনহুইনের সঙ্গে তাঁর দু'টি অ্যালবাম আছে, যা প্রকাশ করেছে কলম্বিয়া রেকর্ডস। এই বরেণ্য শিল্পী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠান করলেও নিজ দেশের বেতার টেলিভিশন বা কোনো অনুষ্ঠানে তাঁকে কখনোই বেহালা বাজাতে দেখা যায় নি।

মিসির আলি খবরটি মন দিয়ে পড়লেন। খবরের সঙ্গে ওসমান গনির একটি ছবি ছাপা হয়েছে। যুবক বয়সের ছবি। অত্যন্ত সুপুরুষ একজন মানুষ। বড়-বড় চোখ। সেই চোখে একধরনের বিষণ্নতা আছে। পরক্ষণেই মনে হল, ভদ্রলোকের চোখ দু'টি বিষণ্ন—এটা তাঁর মনগড়া অনুমান। মানুষটি একজন বেহালাবাদক এবং মৃত। সেই

কারণেই ছবিটি তিনি দেখছেন মমতা এবং বিষাদ নিয়ে। নিজের মমতা এবং বিষাদের কারণে ছবির চোখ দু'টি বিষাদমাখা বলে মনে হচ্ছে।

তিনি খবরটা আবার পড়লেন। তাঁর কাছে মনে হল, রিপোর্টার ওসমান গনির চরিত্রে একধরনের মহত্ত্ব আরোপের চেষ্টা করেছেন। এই শিল্পী নিজের দেশের কোনো অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন নি—এটি তাঁর চরিত্রের কোনো বড় দিক নয়। তিনি যা করেছেন, তা হচ্ছে দেশের মানুষের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন। বড় মাপের শিল্পীরা এ-কাজ কখনো করবেন না। তা ছাড়া ভদ্রলোক শুধু শিল্পী নন, শিল্পপতি। অর্থাৎ তিনি শিল্পকে যেমন চিনেছেন, অর্থকেও তেমনি চিনেছেন।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন নি—এই বাক্যটিতেও তাঁর চরিত্রের মহত্ত্ব প্রকাশ পায় না। বরং এটা এভাবে ব্যাখ্যা করা যায়—স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর দাম্পত্যজীবন অসহনীয় ছিল। যে-কারণে স্ত্রীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় বার বিবাহের যন্ত্রণায় যেতে চান নি।

মিসির আলি তৃতীয় বারের মতো রিপোর্টটি পড়লেন। তাঁর কাছে মনে হল রিপোর্টটি অসম্পূর্ণ। কত বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু, তা দেওয়া নেই। জন্ম-তারিখ নেই। পুত্র-কন্যাদের কথা নেই। কার কাছে বেহালা বাজানো শিখেছেন, কতদিন ধরে বাজাচ্ছেন তাও নেই। বরং রিপোর্টটি অপ্রয়োজনীয় খবরে ঠাসা। তিনি কফি খেতে চাইলেন। মেয়ে তাঁর জন্যে কফি নিয়ে এল। পটভর্তি কফি। এটা না-লিখে রিপোর্টার ভদ্রলোক কন্যার কাছ থেকে জেনে নিতে পারতেন—তিনি তাঁর কন্যাকে কী বাজিয়ে শুনিয়েছিলেন। মৃত্যুর আগে কোন রাগটি বাজানো হয়েছিল? নিশিরাতের কোনো রাগ, নাকি ভোরবেলার রাগ ভৈরবী?

রাত এগারটা বাজল। মিসির আলি যন্ত্রের মতো ঘুমুতে গেলেন। মনস্থির করলেন অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে মাথা ভারাক্রান্ত করবেন না। মাথা থেকে ওসমান গনিকে ঝেড়ে ফেলে ঘুমুতে যাবেন। হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে একটি মানুষ মারা গেছে, যাক না। কত লোক তো মারা যায়। আচ্ছা ভালো কথা, আমরা সবসময় বলি হৃদযন্ত্র। ফুসফুসকে ফুসফুসযন্ত্র বলি না। কিডনিকে কিডনিযন্ত্র বলি না। পত্রিকায় কখনো লেখা হয় নি "অমুক কিডনিযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন।" আবেগ এবং অনুভূতির সঙ্গে যাকে এক করে দেখা হয়, সেই হৃৎপিণ্ডকে আমরা বলছি যন্ত্র। কোনো মানে হয় না।

রাত একটা বেজে গেল। মিসির আলির ঘুম এল না। মাথা ক্রমেই উত্তপ্ত হতে থাকল। তাঁর ঘুমুনো প্রয়োজন। রাতজাগা তাঁর জন্যে একেবারেই নিষিদ্ধ। তিনি বিছানা থেকে নামলেন। দশ মিলিগ্রামের দু'টি ফ্রিজিয়াম খেলেন। মশারির ভেতর ঢুকতে গিয়ে ঢুকলেন না। ঘরের দরজা খোলা রেখেই বাড়িওয়ালার সদর দরজায় কলিংবেল টিপলেন।

বেশিক্ষণ টিপতে হল না। বাড়িওয়ালা ওয়াদুদ সাহেব নিজেই উঠে এসে দরজা খুললেন। বিস্মিত গলায় বললেন, 'কী ব্যাপার?'

'একটা টেলিফোন করব।'

'অবশ্যই অবশ্যই করবেন। কী হয়েছে বলুন তো? কারো অসুখবিসুখ?'

'জ্বি-না, অসুখবিসুখ না। একটা ব্যাপার নিয়ে মস্তিষ্ক উত্তেজিত হয়ে আছে।

টেলিফোন না–করা পর্যন্ত মনে স্বস্তি পাব না। রাতে ঘুমুতে পারব না।'

'আসুন, ভেতরে আসুন। একটা কেন, এক শ'টা টেলিফোন করুন। নাম্বার কী বলুন, আমি ডায়াল করে দিচ্ছি।'

'নাম্বার জানি না। বের করতে হবে। ওসমান গনির কন্যা নাদিয়া গনির সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'কারা এরা?'

'আজকের খবরের কাগজ পড়েছেন?'

'না।'

'তাহলে চিনবেন না। চেনার দরকার নেই। আমি কি আপনাকে ঘুম থেকে তুলেছি?'

'তা তুলেছেন। আমি দশটার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ি। এটা কোনো ব্যাপার না। আপনি তো আসেনই না। আপনার সঙ্গে কথা বললে ভালো লাগে। চা–টা কিছু খাবেন?

'খাব।'

রাত দুটোর সময় টেলিফোন পেয়ে কোনো তরুণী মধুর গলায় কথা বলবেন এটা আশা করা যায় না। কিন্তু মিসির আলিকে অবাক করে দিয়ে নাদিয়া গনি মিষ্টি গলায় বললেন, 'আপনি কে?'

'আমার নাম মিসির আলি।'

'কিছু মনে করবেন না। আপনি এমনভাবে নাম বললেন, যেন নাম শুনলেই আমি আপনাকে চিনে ফেলব। আমি কিন্তু আপনাকে চিনতে পারছি না।'

'পরিচয় দিলেও চিনতে পারবেন না। আমি কি কিছুক্ষণ আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারি?'

'অবশ্যই পারেন। রাত দু'টার সময় যখন টেলিফোন করেছেন, নিশ্চয়ই কোনো জরুরি কারণে করেছেন। কী বলতে চান বলুন।'

মিসির আলি চট করে কোনো কথা খুঁজে পেলেন না। আসলে টেলিফোনটি করা হয়েছে ঝোঁকের মাথায়। কী বলা হবে কিছুই ভাবা হয় নি।

নীরবতায় নাদিয়া গনি অধৈর্য হলেন না। শান্ত গলায় বললেন, 'টেলিফোনে কথা বলতে কি আপনার অস্বস্তি বোধ হচ্ছে?' আমি আপনাকে চিনি না। কখনো নাম শুনি নি। আপনার সঙ্গে আমার এমন কোনো কথা থাকতে পারে না যার জন্যে আপনি অস্বস্তি বোধ করবেন।'

'অস্বস্তি বোধ করছি না। কী বলব গুছিয়ে উঠতে পারছি না।'

'তাহলে এক কাজ করুন—ভালোমতো গুছিয়ে একদিন টেলিফোন করুন। এবং দয়া করে রাত দু'টো–তিনটায় নয়। এই সময় টেলিফোনের জন্যে প্রশস্ত নয়।'

'আপনি কি টেলিফোন রেখে দিচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, এতক্ষণ যে ধরে রেখেছি তাই কি যথেষ্ট নয়? এই ভদ্রতাটুকু কি সবাই দেখায়?'

মিসির আলি সহজ গলায় বললেন, 'না, দেখায় না। আর আপনি শুধু যে ভদ্রতার জন্যে টেলিফোন রিসিভার হাতে নিয়ে বসে আছেন তাও না। আমার ধারণা আপনি

যথেষ্ট কৌতূহল নিয়েই অপেক্ষা করছেন।'

'আপনার এ-রকম মনে করার কারণ কী?'

'মনে করার অনেকগুলি কারণ আছে। আপনি যে বললেন, আপনি আমাকে চেনেন না, কখনো আমার নাম শোনেন নি—তা ঠিক নয়। আপনার বাবার লেখার টেবিলে আমার একটা নোট পাওয়া গেছে। সেখানে তাঁকে সাবধান করা হয়েছে, যেন পানি থেকে দূরে থাকেন। শুধু এই কারণেই আপনার কাছে আমার নাম মনে থাকার কথা। তার ওপর পুলিশের কাছে আপনি অবশ্যই শুনেছেন যে, ওসমান গনি নাম নিয়ে একজন আমার কাছে গিয়েছিল। ঘটনাটা অদ্ভুত। গত চারদিন ধরে দিনরাত পুলিশ আমার বাসার দিকে লক্ষ রাখছে। এ-তথ্যও অবশ্যই আপনার জানা থাকার কথা। তার পরেও আপনি মিথ্যা করে বললেন, আপনি কখনো আমার নাম শোনেন নি।'

মিসির আলি দম নেবার জন্যে থামলেন। নাদিয়া গনি শীতল গলায় বললেন, 'আপনি এত দ্রুত কথা বলছেন কেন? আপনার সব কথা বুঝতে পারছি না। স্লোলি বলুন।'

মিসির আলি বললেন, 'গভীর রাতে টেলিফোনে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত। আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি। পরে আপনার সঙ্গে কথা বলব।'

নাদিয়া গনি হালকা গলায় বললেন, 'আমি গাড়ি পাঠাচ্ছি। আপনি আসুন, কথা বলব।'

'এখনই পাঠাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, এখনই। আপনি তো জেগেই আছেন। আসতে অসুবিধা আছে?'

'না, অসুবিধা নেই।'

নাদিয়া গনি হাসিমুখে বললেন, 'আসুন।' তাঁর কথা বলার ভঙ্গি সহজ ও স্বাভাবিক। গভীর রাতে বাড়িতে অতিথি আসা যেন নৈমিত্তিক ব্যাপার। প্রায়ই আসে। মেয়েটির পরনের শাড়ি খুব পরিপাটি। কিছুক্ষণ আগেই মুখ ধুয়ে হালকা ক্রীম গালে লাগানো হয়েছে। এত রাতেও চোখে-মুখে স্নিগ্ধ আভা। রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি কোথাও নেই। চুল বেণী করা নয়, ছেড়ে দেওয়া। এত চুল মিসির আলি এর আগে কোনো মেয়ের মাথায় দেখেন নি। সবুজ রঙ সম্ভবত মেয়েটির প্রিয় রঙ। আজও সবুজ শাড়ি পরা। বয়স কত হবে? ২৫-এর মতো? হতে পারে। আবার বেশিও হতে পারে। গান গাওয়া ছাড়া সে আর কী করে? পড়াশোনা কোন পর্যন্ত? মেয়েটি কি বিবাহিতা? অনেক কিছুই জানতে ইচ্ছা করছে।

নাদিয়া তাঁকে দোতলায় নিয়ে গেলেন। দোতলার বারান্দা সুন্দর করে সাজানো। মুখোমুখি গদিআঁটা বেতের চেয়ার বসানো। চেয়ার দু'টির মাঝখানে সাদা টেবিল-ক্লথে ঢাকা বেতের টেবিল। টেবিলে টী-কোজি ঢাকা টী-পট। একটা অ্যাশট্রে আছে। অ্যাশট্রের পাশে এক প্যাকেট সিগারেট, একটা দেয়াশলাই। কাচের ছোট্ট বাটিতে নানান ধরনের বাদামের মিশ্রণ। বারান্দা অন্ধকার। ঘরের ভেতর বাতি জ্বলছে। তার আলো এসে পড়েছে বারান্দায়।

'মিসির আলি সাহেব?'

'জ্বি।'

'ইচ্ছা করে বারান্দা অন্ধকার করে রেখেছি। অন্ধকারের আড়াল থাকলে কথা বলতে সুবিধা হয়।'

মিসির আলি বললেন, 'আপনার কি এমন কথা আছে, যা বলার জন্যে অন্ধকারের আড়াল প্রয়োজন হবে?'

'না।'

মিসির আলি সিগারেট ধরালেন। মেয়েটিও মিসির আলিকে খানিকটা অবাক করে দিয়ে সিগারেট নিল। সিগারেট ধরাল আনাড়ি ভঙ্গিতে নয়, অভ্যস্ত ভঙ্গিতে।

'আপনি কি আমার সিগারেট খাওয়া দেখে আবাক হচ্ছেন?'

'খানিকটা হয়েছি।'

'চা নিন। খুব ভালো চা। কীভাবে বানিয়েছি জানেন? সিক্সটি পারসেন্ট বাংলাদেশি চা, ফোর্টি পারসেন্ট দার্জিলিং টী। খুব সামান্য জাফরানও দেওয়া হয়েছে।'

মিসির আলি চা নিলেন। তাঁর কাছে আহামরি কিছু মনে হল না। চিনি কম হয়েছে। আরেকটু বেশি হলে ভালো হত। চিনি চাইতে ইচ্ছা করছে না। আশেপাশে কোনো কাজের লোক দেখা যাচ্ছে না। চিনি চাইলে হয়তো এ-মেয়েটিকেই উঠে যেতে হবে।

'মিসির আলি সাহেব?'

'জ্বি।'

'প্রথমেই আপনার কিছু ভুল ভাঙিয়ে দেওয়া দরকার। আপনার ধারণা হয়েছে, বাবার কাছে লেখা আপনার নোট আমি পড়েছি। এই ধারণা সত্যি নয়। বাবার মৃত্যু আমার জন্যে এত আপসেটিং ছিল যে আমাকে পেথিড্রিন ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িযে রাখা হয়েছিল। পুলিশ এসে তাঁর টেবিলের সব কাগজপত্র নিয়ে গেছে। সেখানে কী লেখা বা কী লেখা না, আমি কিছুই জানি না। আপনার কাছে এক লোক গিয়ে বলেছে, সে ওসমান গনি। এই তথ্যও আমাকে বলা হয় নি। আমি পুলিশকে বলে দিয়েছি বাবার মৃত্যু সম্পর্কিত কোনো কিছু নিয়েই যেন আমাকে বিরক্ত না-করা হয়। তারা তা করছে না। বাবার সম্পর্কে আমি কারো সঙ্গেই কথা বলতে চাই না।'

'আপনি কিন্তু কথা বলেছেন। পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টারের সঙ্গে কথা বলেছেন।'

'তা বলেছি। এই লোক আপনার মতোই গভীর রাতে আমাকে টেলিফোন করেছিল। গভীর রাতে কেউ টেলিফোন করলে আমি সাধারণত কথা বলি।'

'কেন?'

'আপনি অনুমান করুন, আপনার ধারণা, আপনার অনুমানশক্তি প্রবল। পরীক্ষা হয়ে যাক।'

মিসির আলি চায়ের কাপ নামিয়ে রাখতে-রাখতে বললেন, 'আপনি কী করে জানলেন যে আমার ধারণা, আমার অনুমানশক্তি প্রবল? আপনার কাছে এই দাবি আমি করি নি।'

'পুলিশ ইন্সপেক্টর রকিবউদ্দিনের সঙ্গে করেছেন। রাত দু'টায় আপনার টেলিফোন পাওয়ার পরপর আমি ইন্সপেক্টর রকিবউদ্দিন সাহেবকে টেলিফোন করে আপনার সম্পর্কে সব তথ্য জানতে চাই। তিনি আমাকে বলেছেন।'

'আমার সম্পর্কে কী তথ্য জানেন?'

'অনেক কিছুই জানি। আপনি যে একজন বিখ্যাত ব্যক্তি তাও জানি। অসম্ভব জটিল কিছু সমস্যার আপনি সমাধান দিয়েছেন। আপনার আগ্রহের বিষয় হচ্ছে সাইকোলজি। অনেকের ধারণা, আপনি প্যারাসাইকোলজি বিষয়ের একজন বিশেষজ্ঞ। এখন আপনি বলুন দেখি, কেন আমি রাতের টেলিফোন অ্যাটেন্ড করি? কেনই-বা গভীর রাতে আপনাকে আসতে বললাম?'

'সত্যি জানতে চান?'

'হ্যাঁ, জানতে চাই।'

'আপনার ভয়াবহ ধরনের ইনসমনিয়া আছে। রাতের পর রাত আপনি জেগে থাকেন। এই সময় আপনি নিঃসঙ্গ বোধ করেন এবং আমার ধারণা খানিকটা ভয়ও পান। রাতে কেউ টেলিফোন করলে আপনার এ-কারণেই ভালো লাগে। কারো সঙ্গে কথা বলতে পারলে ভালো লাগে। আপনার শুচিবাইর মতো আছে। রাতে কয়েকবার আপনি গোসল করেন। কিছুক্ষণ আগে গোসল সেরেছেন। এখনো চুল শুকায় নি। আপনার বাবার মৃত্যুর পর আপনি আরো নিঃসঙ্গ হয়েছেন। কারণ তাঁরও ইনসমনিয়া ছিল। তিনিও রাত জাগতেন। দু' জন্ন সঙ্গ দিতেন দু' জনকে।'

'কী করে বুঝলেন, বাবার ইনসমনিয়া ছিল?'

'পত্রিকার রির্পোট অনুযায়ী। বেহালা বাজানো শোনার পর আপনি বাবার জন্যে কফি আনতে গেলেন। অর্থাৎ আপনারা আরো রাত জাগবেন। নয়তো পট- ভর্তি করে কফি আনতেন না। আপনার বাবারও গভীর রাতে স্নানের অভ্যাস ছিল। কারণ আপনি কফি নিয়ে এসে দেখেন—বাথরুমের দরজা বন্ধ। শাওয়ার দিয়ে পানি পড়ছে। আপনি ধরে নেন আপনার বাবার বেরুতে দেরি হবে। কাজেই কফির পট নিয়ে ফিরে যান, এবং আবারো নতুন করে কফি বানান। বাবার গভীর রাতে স্নান আপনার কাছে মোটেই অস্বাভাবিক মনে হয় নি। কারণ আপনার বাবার এই অভ্যাসের সঙ্গে আপনি পরিচিত।'

নাদিয়া আরেকটি সিগারেট ধরালেন। মিসির আলি বললেন, 'আপনি কি আমাকে বিশেষ কিছু বলতে চান? বলতে চাইলে বলতে পারেন।'

'কী জানতে চান?'

'আপনি যা বলবেন আমি তাই শুনব। তবে সবার আগে জানতে চাই—আপনার কি ধারণা, আপনার বাবার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে?'

'ডাক্তাররা তাই বলছেন।'

'আপনার কী ধারণা?'

নাদিয়া আধ-খাওয়া সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, 'আমার ধারণা বাবা আত্মহত্যা করেছেন। কেন করেছেন তা-ও আমি জানি। আমার মা আত্মহত্যা করেছিলেন। তাঁর মৃতদেহও বাথরুমের বাথটাবে পাওয়া যায়। মা বিখ্যাত কেউ ছিলেন না। তাঁর মৃত্যুসংবাদ পত্রিকায় আসে নি।'

'তিনি কত বছর আগে মারা যান?'

'জুন মাসের ২১ তারিখে ন' বছর আগে।'

'আপনার বাবার ইনসমনিয়া কি আপনার মা'র মৃত্যুর পর থেকে শুরু হয়েছে?'

'না, আগেও ছিল। তবে মা'র মৃত্যুর পর বেড়েছে।'

'আপনি কি চান আমি আপনার বাবার মৃত্যুসংক্রান্ত বিষয়টি নিয়ে চিন্তা- ভাবনা করি?'

'আমি চাই না। কী ঘটছে আমি জানি। আমি খুব ভালো করে জানি। আমার বুদ্ধি অন্যের চেয়ে কম বা আপনার চেয়ে কম, তা মনে করার কোনো কারণ নেই।'

'আমি তা মনে করছি না।'

নাদিয়া হাতঘড়িতে সময় দেখলেন। হাই তুলতে-তুলতে বললেন, 'চারটা কুড়ি বাজে। এই সময় আমি ঘুমুতে যাই। গাড়ি তৈরি আছে, আপনাকে পৌঁছে দেবে। আপনার সঙ্গে কথা বলে আমার ভালো লেগেছে। তবে আর কথা বলতে চাচ্ছি না। কোনোদিনই না। দয়া করে আর কখনো আসবেন না এবং কখনো আমাকে বিরক্ত করবেন না।'

মিসির আলি উঠতে-উঠতে বললেন, 'আপনার এমন কোনো আত্মীয়স্বজন কি আছে, যার তিনটা দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো?'

নাদিয়া গলার স্বর একটু তীক্ষ্ণ করে বললেন, 'সোনা দিয়ে দাঁত বাঁধানো কেউ কি এসে আপনাকে বলেছিল—আমি ওসমান গনি?'

'জ্বি।'

'সোনা দিয়ে দাঁত বাঁধানো এমন কাউকে আমি চিনি না। আমার ধারণা, বাবা কাউকে পাঠিয়েছিলেন। বাবার মধ্যে একধরনের অভিনয় প্রবণতা ছিল। আমি যখন খুব ছোট, তখন একবার তিনি রাক্ষস সেজে আমাদের ভয় দেখিয়ে- ছিলেন। এই রকম কিছু হবে। সব মানুষের মধ্যেই কিছু পরিমাণ ইনসেনিটি থাকে।'

'আচ্ছা, আমি তাহলে উঠি।'

'পুলিশের লোক কি এখনো আপনার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকে?'

'থাকে।'

'আর যেন না থাকে আমি সেই ব্যবস্থা করব। আসুন, আপনাকে গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি।'

গাড়িতে ওঠার ঠিক আগের মুহূর্তে মিসির আলি বললেন, 'শেষবার বেহালায় আপনার বাবা কী বাজিয়েছিলেন—অর্থাৎ কোন রাগ?'

'উনি একটা ঘুমপাড়ানি গানের সুর বাজিয়েছিলেন—ওঁর নিজের খুব প্রিয় সুর, আমারো প্রিয়-একটি চেক লোকগীতির সুরে লালাবাই। লাইনগুলি হচ্ছে-

"Precious baby, Sweetly sleep
Sleep in peace
Sleep in comfort, slumber deep.
I will rock you, rock you, rock you
I will rock you, rock you, rock you."

বলতে-বলতে নাদিয়ার চোখ ভিজে উঠল। মিসির আলি বললেন, 'আপনার সম্পর্কে তেমন কিছু জানি না। আপনি পড়াশোনা কতদূর করেছেন?' নাদিয়া বললেন 'আমি আপনার আর কোনো প্রশ্নেরই জবাব দেব না।'

৪

'এটা কি অম্বিকাবাবুর বাড়ি?'

দরজা ধরে যে-মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে, সে জবাব দিল না। তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইল। মেয়েটির বয়স উনিশ-কুড়ি। হালকা-পাতলা গড়নের শ্যামলা মেয়ে। চোখ দু'টি অপূর্ব। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার চোখ নয়। কিন্তু মেয়েটি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। মিসির আলি বললেন, অম্বিকাবাবুর সঙ্গে আমার খুব প্রয়োজন। আমার নাম মিসির আলি।'

'আমি আপনাকে চিনি।'

'তাই বুঝি? তাহলে তো ভালোই হল। লোকজন আমাকে চিনতে শুরু করেছে এটাই সমস্যা। তোমার নাম কি?'

'অতসী।'

'অতসী, তোমার বাবা কি আছেন?'

মেয়েটি জবাব দিল না। দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রইল। মিসির আলি নিশ্চিত হলেন অম্বিকাবাবু বাড়িতেই আছেন। তবে অতসী হয়তো তা স্বীকার করবে না। মিথ্যা করে বলবে, বাবা বাড়ি নেই। তবে মেয়েটিকে দেখে মনে হচ্ছে মিথ্যা বলার অভ্যাস এখনো হয় নি। মিথ্যা বলার আগে তাকে নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হচ্ছে। মিসির আলি মেয়েটিকে বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন। হাসিমুখে বললেন, 'উনি বোধহয় বাড়ি নেই।'

অতসী হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সঙ্গে-সঙ্গে বলল, 'জ্বি-না, নেই।'

'তাঁর সঙ্গে আমার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কখন এলে তাঁকে পাওয়া যাবে বল তো?'

মিসির আলি আবার মেয়েটিকে বিপদে ফেললেন। এখন অতসীকে বাধ্য হয়ে সময় দিতে হবে। কিংবা বলতে হবে তাঁর সঙ্গে দেখা করা যাবে না। এই দু'টির কোনটি সে বলবে কে জানে।

মিসির আলি বললেন, 'তাঁর সঙ্গে দেখা না করলেও অবশ্যি চলে। তোমার সঙ্গে কথা বললেও হয়। আমি বরং তোমার সঙ্গে দু'-একটা কথা বলে চলে যাই।'

অতসী চমকে উঠে বলল, 'আমার সঙ্গে? আমার সঙ্গে কী কথা?'

'তুমি কথা বলতে না চাইলে বলতে হবে না।'

'আসুন, ভেতরে আসুন।'

'ভেতরে আসারও প্রয়োজন দেখছি না। এখানে দাঁড়িয়েই কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করে চলে যাই। জিজ্ঞেস করব?'

'করুন।'

'অম্বিকাবাবুর তিনটি দাঁত কি সোনা দিয়ে বাঁধানো?'

অতসী হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। এবার সে তাকাল ভীত চোখে। তার চোখের পাতা দ্রুত কাঁপছে। নাকের পাটায় ঘাম জমছে। চোখে-চোখেও তাকাচ্ছে না। মাথা নিচু করে আছে। চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এখন আর নেই।

'অতসী।'

অতসী তাকাল। কিছু বলল না।

'শোন মেয়ে, তোমার বাবা এক রাতে আমার সঙ্গে গল্প করতে এসেছিলেন। তিনি বললেন, তাঁর নাম ওসমান গনি। তিনি অপ্রকৃতিস্থ একজন মানুষের অভিনয় করলেন। বেশ ভালো অভিনয়। আমি ধরতে পারলাম না।'

'বাবা কি আপনাকে এ-বাড়ির ঠিকানা দিয়ে এসেছিলেন?'

'না।'

'তাহলে ওনাকে খুঁজে বের করলেন কীভাবে?'

মিসির আলি হাসতে-হাসতে বললেন, 'তুমি একটু আগে বলেছ, তুমি আমার নাম জান। নাম যদি জান, তাহলে এটাও জানা উচিত যে, মানুষ খুঁজে বের করার মতো বুদ্ধি আমার আছে। কী করে বের করেছি জানতে চাও?'

অতসী হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

'তাহলে শোন। তোমার বাবা বলেছিলেন তাঁর ডায়াবেটিস। এই অংশটি অভিনয় নয়। কারণ তিনি চিনি ছাড়া চা খেতে চাইলেন। একজন ডায়াবেটিক পেশেন্ট, যে ঢাকায় থাকে, সে চিকিৎসার জন্যে ডায়াবেটিক সেন্টারে যাবে এটাই স্বাভাবিক। কাজেই আমি গেলাম বারডেমে, জিজ্ঞেস করলাম, তাঁদের এমন কোনো রুগী আছে কি না, যার তিনটি দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো। তারা সঙ্গে-সঙ্গে বলল—অম্বিকাবাবু। সোনা দিয়ে দাঁত বাঁধানো না থাকলে খুঁজে বের করতে আরেকটু সময় লাগত।'

অতসী তাকিয়ে আছে। তার চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছে না সে বিস্মিত হয়েছে কি না। মিসির আলি চাচ্ছেন মেয়েটি বিস্মিত হোক। কারণ মেয়েটিকে বিস্ময়ে অভিভূত করা তাঁর নিজের স্বার্থেই প্রয়োজন। সে বিস্ময়ে অভিভূত হলেই তাঁর সব প্রশ্নের জবাব দেবে। আগ্রহ করে দেবে।

'অতসী।'

'জ্বি।'

'তোমার বাবা যে বাড়িতেই আছেন তা আমি জানি। যদিও বুঝতে পারছি না, কেন তুমি তোমার বাবার সঙ্গে আমাকে দেখা করতে দিচ্ছ না।'

'আমার বাবা অসুস্থ।'

'ও।'

'বিশ্বাস করুন তিনি অসুস্থ।'

'বিশ্বাস করছি।'

'আপনি কি ভেতরে এসে বসবেন?'

'তুমি দরজা থেকে হাত নামালেই ঘরে ঢুকব। আজ সারাদিন খুব ছোটাছুটি করেছি। চা খাওয়া হয় নি। তুমি কি চা খাওয়াবে?'

'আপনি দুধ ছাড়া চা যদি খেতে পারেন, তাহলে খাওয়াব। ঘরে দুধ নেই।'

'চা দুধ ছাড়া খাওয়াই ভালো।'

অতসী দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াল। মিসির আলি ঘরে ঢুকলেন। ঘরে ঢুকে তাঁর মন খারাপ হয়ে গেল। হতদরিদ্র অবস্থা। এই ঘরটি নিশ্চয়ই এদের বসার ঘর। দু'টা বেতের চেয়ার। অনেক জায়গায় বেত খুলে গেছে। তার দিয়ে মেরামত করা। ঘরের প্রায় পুরোটা জুড়ে বড় একটা চৌকি। চৌকিতে পাটি পাতা। সেই পাটিও দীর্ঘ ব্যবহারে জীর্ণ। পাটির পাশে হাতপাখা—যদিও একটি সিলিং ফ্যান দেখা যাচ্ছে। মাকড়সা জাল বানিয়েছে

ফ্যানের পাখায়—অর্থাৎ ফ্যানটি অনেকদিন ঘুরছে না।

মিসির আলি মনস্থির করতে পারলেন না কোথায় বসবেন। পাটিতে বসবেন না বেতের চেয়ারে বসবেন। পাটিতে বসাই ঠিক করলেন। এখান থেকে বাড়ির ভেতরের খানিকটা দেখা যায়।

মেয়েটি চা বসিয়েছে বারান্দায়। এদের রান্নাঘর সম্ভবত বারান্দায়। দু'-কামরার বাড়ি। ভেতরের ঘরে নিশ্চয়ই মেয়েটি ঘুমায়। বসার ঘরে থাকেন অম্বিকাবাবু। ভদ্রলোকের পেশা কী, তা বোঝা যাচ্ছে না। চটপটে ধরনের কথাবার্তা এবং গল্প তৈরি করে বিশ্বাসযোগ্যভাবে বলার ক্ষমতা থেকে দু' ধরনের সম্ভাবনার কথা মনে হয় ঃ

(১) ভদ্রলোকের পেশা দালালি করা।

(২) ভদ্রলোক একজন জ্যোতিষী।

জ্যোতিষী হবার সম্ভাবনাই বেশি, কারণ তাঁর হাতে তিনটি পাথরের আংটি। তবে জ্যোতিষীরা ঘরে নানান নিদর্শন ছড়িয়ে রাখবে, রাস্তায় সাইনবোর্ড থাকবে—

"জ্যোতিষসম্রাট অম্বিকাচরণ
কর গণনা ও কোষ্ঠী বিচার করা হয়।"

অতসী চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ঢুকল। মৃদু গলায় বলল, 'চা নিন।'

মিসির আলি চায়ের কাপ হাতে নিলেন।

অতসী ক্ষীণ গলায় বলল, 'ঘরে চিনিও নেই। চিনি ছাড়া চা। আপনি কিছু মনে করবেন না। বাবা চায়ে চিনি খান না, কাজেই চিনি কেনা হয় না।'

'অতসী, তুমি বস।'

অতসী বেতের চেয়ারে বসল। মিসির আলি বললেন, 'তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে চিনি ছাড়া চা দিয়ে তুমি মন-খারাপ করেছ। মন-খারাপ করার কিছু নেই। আমি চায়ে দুধ খাই, চিনি খাই না।'

মেয়েটি কিছু বলল না। মিসির আলি বললেন, 'তুমি আর তোমার বাবা, তোমরা দু' জন এখানে থাক?'

'হ্যাঁ।'

'তোমরা ক' ভাই-বোন?'

'আমি একা।'

'তোমার মা জীবিত নেই?'

'না।'

'কতদিন আগে মারা গেছেন?'

'ষোল-সতর বছর আগে।'

'কি করেন তোমার বাবা?'

'তিনি নবীনগর গার্লস স্কুলের অঙ্কের শিক্ষক ছিলেন। রিটায়ার করেছেন। আগে প্রাইভেট পড়াতেন। এখন আর পড়ান না। অসুস্থ।'

'কতদিন ধরে অসুস্থ?'

'বছর দুই।'

'খুব অপ্রিয় একটা প্রশ্ন করছি অতসী, তোমাদের চলে কীভাবে?'

অতসী জবাব দিল না। স্থির চোখে তাকিয়ে রইল। মিসির আলি পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্যে বললেন, 'আমি ভেবেছিলাম তোমার বাবা একজন জ্যোতিষী। তিনি যে স্কুল-শিক্ষক বুঝতে পারি নি।'

অতসী যন্ত্রের মতো গলায় বলল, 'আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন। বাবা মাস্টারির পাশাপাশি জ্যোতিষচর্চা করতেন।'

'করতেন বলছ কেন? এখন করেন না?'

'না।'

'শখের চর্চা?'

'শখের চর্চা না। তিনি টাকা নিতেন।'

'ও আচ্ছা। তাঁর রোজগার কেমন ছিল?'

'তাঁর রোজগার ভালোই ছিল। তিনি রোজগার যেমন করতেন খরচও তেমন করতেন। আপনি নিশ্চয়ই তাঁর হাতের আঙটি তিনটি লক্ষ করেছেন। একটি আঙটি হচ্ছে নীলার। বিক্রি করলে অনেক টাকা পাওয়ার কথা।'

'বিক্রি করছ না কেন? আমার মনে হচ্ছে বিক্রি করার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।'

অতসী জবাব দিল না। মিসির আলি বললেন, 'কাগজ-কলম আন তো। আমি আমার বাসার ঠিকানা লিখে দিচ্ছি। তোমার বাবা সুস্থ হলে আমাকে খবর দিও। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করব। হাতটাও না-হয় দেখাব।'

'আপনি হাত দেখায় বিশ্বাস করেন?'

'না, করি না। অতিপ্রাকৃত কোনো কিছুতেই বিশ্বাস করি না।"

'তাহলে বাবাকে হাত দেখাতে চাচ্ছেন কেন?'

'কৌতূহল, আর কিছুই না। আমি ভূত বিশ্বাস করি না। কিন্তু কেউ যদি বলে আমার বাসায় একটা পোষা ভূত আছে, দড়ি দিয়ে খাটের পায়ার সঙ্গে বেঁধে রাখি-তাহলে আমি অবশ্যই ঐ ভূত দেখতে যাব।'

মিসির আলি উঠে দাঁড়ালেন। অতসী তাঁকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল। মিসির আলি বললেন, 'যাই।' মেয়েটি কিছুই বলল না।

রাস্তায় নেমে মিসির আলি পিছন ফিরে তাকালেন। অতসী এখনো দরজা ধরে দাঁড়িয়ে। একটা বিশেষ জরুরি কথাই মিসির আলি জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছেন, ওসমান গনিকে মেয়েটি চেনে কি না। তিনি ফিরে এলেন। মেয়েটি দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। সেও যেন জানে—মিসির আলি ফিরে আসবেন।

'অতসী।'

'জ্বি।'

'তুমি কি ওসমান গনি সাহেবকে চেন?'

অতসী চুপ করে রইল। মিসির আলি জবাবের জন্যে মিনিট দুই অপেক্ষা করলেন। আর অপেক্ষা করার অর্থ হয় না। মেয়েটি মুখ খুলবে না।

'অতসী।'

'বলুন।'

'আমার ঠিকানাটা হারাবে না। যত্ন করে রেখ। আমি অপেক্ষা করব তোমাদের জন্যে। আমি তোমাদের সাহায্য করতে চাই।'

ঠিক তখন বাড়ির ভেতর থেকে পশুর গর্জনের মতো গর্জন শোনা গেল। কেউ মনে হয় ভারি কিছু ছুঁড়ে ফেলল।

মিসির আলি বললেন, 'তোমার বাবাকে কি তালাবন্ধ করে রাখা হয়েছে?' অতসী হ্যাঁ, না কিছুই বলল না।

মেয়েটি স্থির চোখে তাকিয়ে আছে। সে একবারও চোখের পলক ফেলল না। মিসির আলি পথে নামতে-নামতে ভাবতে লাগলেন, মানুষ সেকেন্ডে ক'বার চোখের পলক ফেলে? চোখের পলক ফেলা দিয়ে মানুষের চরিত্র কি বিচার করা যায়? যেমন সেকেন্ডে ৫ বারের বেশি যে চোখের পলক ফেলবে সে হবে রাগী। যে ৩ বারের কম ফেলবে সে হবে ঠাণ্ডা ধরনের মানুষ। কেউ কি চেষ্টা করেছে?

এক সপ্তাহ কেটে গেল। কেউ মিসির আলির সঙ্গে দেখা করতে এল না। আর বোধহয় আসবে না। আসবার হলে প্রথম দু'-তিন দিনের ভেতরই আসত। অষ্টম দিনে মিসির আলি নিজেই গেলেন। অনেকক্ষণ দরজার কড়া নাড়ার পর বাচ্চা একটা ছেলে দরজা খুলল। মিসির আলি বললেন, 'অতসী আছে?'

ছেলেটা হাসিমুখে বলল, 'আমরা নতুন ভাড়াটে। তারা চলে গেছে।'

'কোথায় গেছে, জান?'

'না।'

'আচ্ছা।'

আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, মিসির আলি কেন জানি নিশ্চিন্ত বোধ করছেন। বড় ধরনের ঝামেলা মাথার ওপর থেকে নেমে গেলে যে-ধরনের স্বস্তিবোধ হয়, সে-ধরনের স্বস্তি। শরীরটা খারাপ হবার পর থেকে তাঁর ভেতর একধরনের অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। চাপ সহ্য করতে পারেন না। ওসমান গনি-অম্বিকাচরণ এই দু' জনের ব্যাপারটা তাঁর ওপর চাপ দিচ্ছিল। এখন মনে হচ্ছে চাপ থেকে মুক্তি পেলেন। আর ভাবতে হবে না। আশি লাখ লোকের বাস এই শহরে। আশি লাখ লোকের ভেতর কেউ যদি হারিয়ে যেতে চায়, তাকে খুঁজে বের করা মুশকিল। আর দরকারই-বা কি?

মিসির আলি রিকশা নিলেন। হালকাভাবে বৃষ্টি পড়ছে। কুয়াশার মতো বৃষ্টি। বৃষ্টিতে ভিজতে-ভিজতে ঘরের দিকে রওনা হয়েছেন। তাঁর ভালো লাগছে। বৃষ্টি বাড়ছে, কিন্তু তাঁর হুড তুলতে কিংবা প্লাস্টিকের পর্দায় শরীর ঢাকতে ভালো লাগছে না। রাস্তায় লোকজন আগ্রহ নিয়ে তাঁকে দেখছে—একটা মানুষ রিকশায় বসে ভিজতে-ভিজতে এগুচ্ছে। রিকশাওয়ালা ধমকের স্বরে বলল, 'হুড তুলেন। ভিজতেছেন ক্যান?' মিসির আলি জবাব দিলেন না। রিকশাওয়ালা রাস্তার পাশে রিকশা থামিয়ে বিরক্ত মুখে হুড তুলতে লাগল। হুড থাকা সত্ত্বেও একটা মানুষ তার রিকশায় ভিজতে-ভিজতে যাবে এটা তার সহ্য হচ্ছে না। সে হয়তো সূক্ষ্মভাবে অপমানিত বোধ করছে।

রিকশা আবার চলতে শুরু করল। মিসির আলি ভাবতে শুরু করলেন, কি করে এই অম্বিকাচরণবাবুকে খুঁজে বের করা যায়। কাজটা কি খুব জটিল? তাঁর কাছে মনে হচ্ছে না। ভদ্রলোক যে-বাড়িতে ছিলেন সে-বাড়ির মালিক জানতে পারে। নতুন বাড়ির

ঠিক ঠিকানা না পারলেও, কোন এলাকায় গিয়েছেন তা বলতে পারার কথা। আশেপাশের মুদির দোকানগুলি খুঁজতে হবে। নিশ্চয় আগে যেখানে ছিলেন তার আশেপাশের মুদির দোকানে তাঁর বাকির খাতা আছে। বাকির সব টাকা দিতে না পারলে দোকানদারকে নতুন বাসার ঠিকানা বলে যাবেন, এটাই সঙ্গত। সবচেয়ে বড় সাহায্য পাওয়া যাবে বিটের পিওনদের কাছ থেকে। এরা বলতে পারবে, তবে সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।

'রিকশাওয়ালা।'

'জ্বে?'

'আপনার নাম কি ভাই?'

'কেরামত।'

'শুনুন ভাই কেরামত, আপনি আমাকে যেখান থেকে এনেছিলেন ঠিক সেইখানে নামিয়ে দিয়ে আসুন। আর হুডটা ফেলে দিন। আমার বৃষ্টিতে ভিজতে-ভিজতে যেতে ভালো লাগছে।'

রিকশাওয়ালা রিকশা থামাল। সে অসম্ভব বিরক্তি নিয়ে তাকাচ্ছে। মিসির আলি লক্ষ করেছেন, রিকশাওয়ালাদের মধ্যে এই একটা ব্যাপার আছে, তারা যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছে, কখনো সেখানে যেতে চায় না। হয়তো কোনো এক কুসংস্কার তাদের মধ্যেও আছে। যেখান থেকে যাত্রা শুরু সেখানে ফিরে আসা যাবে না। ফিরে এলে চক্র সম্পূর্ণ হয়। মানুষ কখনো চক্র সম্পূর্ণ করতে চায় না। সে চক্র ভাঙতে চায়, কিন্তু প্রকৃতি নামক অজানা অচেনা একটা কিছু বারবার মানুষের চক্র সম্পূর্ণ করে দেয়। কেন করে?

তুমুল বর্ষণ হচ্ছে।

মিসির আলি ভিজছেন। ভালো লাগছে। তাঁর খুব ভালো লাগছে।

৫

বৃষ্টিতে ভেজার জন্যেই হয়তো তাঁর জ্বর এসে গেল। বেশ জ্বর। তবে আরামদায়ক জ্বর। একধরনের জ্বরে শারীরিক কষ্ট প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। আরেক ধরনের জ্বরে শরীরে ভোঁতা ভাব চলে আসে। অনুভূতির তীক্ষ্ণতা থাকে না। গরম কম্বলের ভেতর ঢুকে আরাম করতে ভালো লাগে। ক্ষুধা নামক শারীরিক যন্ত্রণার হাত থেকেও সাময়িক ত্রাণ পাওয়া যায়। কারণ এ-জাতীয় জ্বরে ক্ষুধাবোধ থাকে না।

রাত এগারটা। বাতি নিভিয়ে ঘুমুতে যাবার নির্ধারিত সময়। মিসির আলি নিয়ম ভঙ্গ করলেন। বিছানায় যাবার পরিবর্তে খাতা হাতে বসার ঘরে ঢুকলেন। গত কয়েকদিন ধরেই ওসমান গনি সম্পর্কে কিছু-কিছু নোট করেছেন। নোটগুলি পড়া দরকার। মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে, তাঁর উচিত বাতি নিভিয়ে ঘুমুতে যাওয়া। তিনি নিশ্চিত জানেন ঘুম আসবে না। গত দু' রাত তা-ই হয়েছে। প্রায় সারা রাত জেগে কাটিয়েছেন। তার চেয়ে খাতা নিয়ে বসে থাকা ভালো। পড়তে-পড়তে একসময় হয়তো সোফাতেই ঘুমিয়ে পড়বেন। নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন করা বোধহয় তাঁর ভাগ্যে নেই। মিসির আলি

পড়তে শুরু করলেন—

ওসমান গনি

ওসমান গনিকে আমি দেখি নি। কোটিপতি মানুষ। একজন বেহালাবাদক। যারা জন্ম থেকেই কোটিপতি এবং যারা পরবর্তী সময়ে কোটিপতি হয় তাদের প্রকৃতি ভিন্ন হয়। নিতান্ত দরিদ্র অবস্থা থেকে যারা কোটিপতির পর্যায়ে আসে, তাদেরকে এক জীবনে দু' রকম সমস্যায় পড়তে হয়। অর্থকষ্টের সমস্যা এবং প্রচুর অর্থ দিয়ে কী করা যায় সেই সমস্যা। ওসমান গনির ক্ষেত্রেও তা ঘটেছে। যাদের ক্ষেত্রে এটা ঘটে, তাদের মধ্যে সামান্য পরিমাণে হলেও ভারসাম্যহীনতা দেখা যায়। সাধারণ মানুষদের বেলায় তার চরিত্র ব্যাখ্যা করে বলে দেওয়া সম্ভব বিশেষ-বিশেষ পরিস্থিতিতে সে কী করবে। রেগে যাবে, আনন্দিত হবে, না দুঃখিত হবে। হলেও কী পরিমাণ হবে। কিন্তু ওসমান গনি জাতীয় মানুষ, যাঁরা দু'টি ধাপ অতিক্রম করেছেন—তাঁদের ক্ষেত্রে আগেভাগে কিছু বলা সম্ভব না। চরিত্রে প্রেডিক্‌টিবিলিটি বলে কিছু তাঁদের থাকে না।

ওসমান গনি সম্পর্কে ডাক্তার এবং পুলিশ বলছে—স্বাভাবিক মৃত্যু। তার কন্যা বলছে আত্মহত্যা। তাঁর কন্যার বক্তব্যই আমার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে। এ-জাতীয় চরিত্রের মানুষদের কাছে জীবন একসময় অসহনীয় হয়ে ওঠে। তারা একসময় ভাবতে শুরু করে, এ-জীবনে যা পাবার ছিল, সব পাওয়া হয়ে গেছে। আর কিছুই পাওয়ার নেই। আত্মহননের পথই তখন সহজ-স্বাভাবিক পথ বলে মনে হয়।

এ-পর্যন্ত পুরো ব্যাপারটায় কোনো জটিলতা নেই। জটিলতা যিনি সৃষ্টি করেছেন, তাঁর নাম অম্বিকাবাবু। অম্বিকাবাবুর সঙ্গে আমার এখনো দেখা হয় নি। তিনি নতুন এক আস্তানায় আশ্রয় নিয়েছেন। সেই আস্তানা আমি খুঁজে বের করেছি। যদিও এখনো ঠিক করি নি, ভদ্রলোকের সঙ্গে আমি দেখা করব কি করব না।

অম্বিকাবাবুর কন্যার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। কন্যার বক্তব্য অনুযায়ী তার বাবা অসুস্থ। তাঁর সঙ্গে দেখা করা যাবে না। 'অসুস্থ মানুষের সঙ্গে দেখা করতে না-দেওয়া' মধ্যবিত্ত মানসিকতা নয়। মধ্যবিত্ত মানসিকতায় অসুস্থ মানুষদের সঙ্গেই বরং বেশি করে দেখা-সাক্ষাতের ব্যবস্থা আছে। মৃত্যুপথযাত্রী, যার শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে, তাকেও দল বেঁধে লোকজন দেখতে আসবে এবং জিজ্ঞেস করবে, "এখন শরীরটা কেমন?"

তবে মধ্যবিত্ত মানসিকতায় একধরনের অসুস্থ রুগী আছে, যাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তারা হচ্ছে মানসিক রুগী। শরীরের রোগ আমরা দেখাতে ভালবাসি কিন্তু মনের রোগ নয়। এই রোগ সম্পর্কে কাউকে জানতে দেওয়া যাবে না।

পশুর মতো অম্বিকাবাবুকে গর্জন করতে আমি শুনেছি, তবে তা অভিনয়ও হতে পারে।

তার পরেও অম্বিকাবাবু যে একজন মানসিক রুগী তা ধরে নেওয়া যায়। মেয়ের কথানুযায়ী তিনি অনেকদিন থেকেই অসুখে ভুগছেন। একজন মানসিক রুগী আমাকে দিয়ে একটি চিরকুট লিখিয়ে নিল। যে- সাবধানবাণী সেই চিরকুটে লেখা তা অক্ষরে-অক্ষরে মিলে গেল। কাকতালীয় ব্যাপার বলে একে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

আমার ধারণা, বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে আমাকে সমস্যাটির সঙ্গে জড়ানো হয়েছে। ওসমান গনি নিজে এই কাজটি করতে পারেন, যাতে তাঁর মৃত্যু নিয়ে একধরনের রহস্য তৈরি হয়। কিন্তু তিনি তা করবেন বলে মনে হয় না। একজন অসম্ভব ধনবান ব্যক্তি, যিনি নিজের ভুবন নিয়ে ব্যস্ত, তিনি আমাকে চিনবেন তা আশা করা ঠিক না। তা ছাড়া ভদ্রলোক নিভৃতচারী। তার চেয়েও বড়ো যুক্তি, আমার নোটটি পেয়ে তিনি চিন্তিত হয়ে তাঁর ছেলেবেলার বন্ধু হোম মিনিস্টারকে টেলিফোন করেছিলেন।

তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে?

এই কি দাঁড়াচ্ছে না, যে, ওসমান গনির সমস্যার সঙ্গে আমাকে জড়িয়েছেন অম্বিকাচরণ। তাঁর উদ্দেশ্য কি ওসমান গনিকে সাবধান করা? এই কাজটি তো তিনি আমাকে না-জড়িয়ে করতে পারতেন। আমাকে জড়ালেন কেন?

লেখা এই পর্যন্তই। মিসির আলি হাই তুললেন। তাঁর ঘুম পাচ্ছে। এখন শুয়ে পড়লে হয়তো ঘুম এসে যাবে। তিনি হাত-মুখ ধুয়ে রাতের শেষ সিগারেটটি খেলেন এবং তাঁর খাতায় পেনসিল দিয়ে লিখলেন,

"ওসমান গনির মৃত্যু একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। আমার ধারণা এই হত্যাকাণ্ডের নায়িকা তাঁর কন্যা নাদিয়া গনি। ওসমান গনির স্ত্রীর মৃত্যু এই মেয়েটির হাতেই হয়েছে।"

মিসির আলি অবাক হয়ে নিজের লেখার দিকে তাকিয়ে রইলেন। হুট করে এই কথাগুলি কেন লিখলেন নিজেই জানেন না। হয়তো তাঁর উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনা। তাঁর হাতে কোনো যুক্তি-প্রমাণ নেই। তবু তাঁর মন বলছে, এই হচ্ছে ঘটনা। অম্বিকাচারণ বলে এক ভদ্রলোক ঘটনা জানেন। তিনি সাহায্য প্রার্থনা করছেন মিসির আলি নামের একজনের কাছে।

মিসির আলি ঘুমুতে গেলেন রাত একটার দিকে। অনেক দিন পর তাঁর সুনিদ্রা হল।

৬

হোম মিনিস্টারের দর্শনপ্রার্থীর সংখ্যা অনেক। সবাই নিঃশব্দে অপেক্ষা করছে। ডাক্তারের চেম্বারের রুগীরা যেমন চাপা অশান্তি নিয়ে অপেক্ষা করে—সবার অপেক্ষার ধরন সে-রকম। কারণ মিনিস্টার সাহেব সবার সঙ্গে দেখা করছেন না। মিনিস্টারের পি. এ. যে-ই আসছে তার নাম-ধাম এবং সাক্ষাতের কারণ লিখে নিয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বলছে, আজ মিনিস্টার সাহেব একটা ক্যাবিনেট মীটিং-এ যাবেন। আজ দেখা হবে না। অন্য আরেক দিন আসুন। এর মধ্যেও আবার কাউকে-কাউকে বসতে বলছে। সরাসরি বলে দিলেই হয়—আপনার সঙ্গে মিনিস্টার সাহেব দেখা করবেন, আপনার সঙ্গে করবেন না।

মিসির আলি সাক্ষাতের কারণের জায়গায় প্রথমে লিখেছিলেন ব্যক্তিগত। পরমুহূর্তেই মনে হয়েছে সাক্ষাতের কারণ ব্যক্তিগত নয়। তিনি এসেছেন ওসমান গনি প্রসঙ্গে কথা বলার জন্যে। এটা কোনোক্রমেই ব্যক্তিগত নয়। কাজেই "ব্যক্তিগত" শব্দটি কেটে তার নিচে লিখলেন—"ওসমান গনি প্রসঙ্গ"। লেখার পর মনে হল, এই ওসমান গনি যে সেই ওসমান গনি তা কি মিনিস্টার সাহেব বুঝতে পারবেন? ওসমান গনি নামের আগে লেখা উচিত ছিল, বেহালাবাদক এবং শিল্পপতি ওসমান গনি। তাহলে আবার নতুন করে লিখতে হয়। পি. এ. ভদ্রলোক যদিও মাই ডিয়ার ধরনের মানুষ, তবু তাঁর ধৈর্যেরও তো সীমা আছে।

মিসির আলি অন্যদের মতো অপেক্ষা করছেন। মিনিস্টার সাহেব ভেতরে ডেকে নেবার ব্যাপারে কী পদ্ধতি ব্যবহার করছেন তা-ও বোঝা যাচ্ছে না। 'আগে এলে আগে যাবে' এই পদ্ধতি নয়। অন্য কোনো পদ্ধতি কাজ করছে। যে- পদ্ধতিই হোক, সেই পদ্ধতিতে মিসির আলির নাম বোধহয় সবার শেষে। সবারই ডাক পড়ছে, শুধু মিসির আলির ডাক পড়ছে না। একটা বেজে গেছে। মিনিস্টার সাহেব নিশ্চয়ই দুপুরের খাবার

খেতে যাবেন।

ঠিক একটা বাজতেই পি· এ· এসে বলল, 'আপনারা যাঁরা বাকি আছেন তাঁরা আগামী বুধবার আসুন। স্যার এখন লাঞ্চ ব্রেক নেবেন। তিনটায় স্যারের ক্যাবিনেট মীটিং আছে।' মিসির আলি অন্যদের সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। পি· এ· তাঁর কাছে এসে বলল, 'স্যার, আপনি বসুন। স্যার আপনাকে বসতে বলেছেন।'

'কতক্ষণ বসব?'

'তা তো স্যার বলতে পারছি না। চা খান, চা দিতে বলি।'

'বলুন।'

মিসির আলি ভেবেছিলেন, এই দুপুরে নিশ্চয়ই শুধু চা দেবে না। ভর-দুপুরে খালিপেটে চা খাওয়া ঠিক না, তা মিনিস্টার সাহেবের পি· এ· নিশ্চয়ই জানেন।

চা আসার আগেই মিসির আলির ডাক পড়ল। হোম মিনিস্টার ছদরুদ্দিন হাসিমুখে বললেন, 'আসুন ভাই, ভাত খেতে-খেতে কথা বালি।'

এটা শুধু যে ভদ্রতার কথা তা নয়, মিসির আলি লক্ষ করলেন, টেবিলে দু'টা থালা সাজানো। মিনিস্টার সাহেব নিজেই টিফিন ক্যারিয়ার খুলছেন।

'মিসির আলি সাহেব, বাথরুম থেকে হাত-মুখ ধুয়ে আসতে পারেন। সাবান, তেল, গামছা সব আছে। ইচ্ছা করলে গোসল সেরে ফেলতে পারেন। হা হা হা।'

'আপনি কি আমাকে সত্যি-সত্যি আপনার সঙ্গে খেতে বলছেন?'

'অবশ্যই।'

'এতটা ভদ্রতা কেন দেখাচ্ছেন জানতে পারি কি?'

'মিনিস্টার হলেই অভদ্র হতে হবে এমন কোনো কথা কি আছে?'

'না, তা নেই। সব সাক্ষাৎপ্রার্থীকে আপনি নিশ্চয়ই দুপুরে আপনার সঙ্গে খেতে বলেন না?'

'না, সবাইকে বলি না। তবে একজনকে সবসময় বলি। আমার প্রবলেম হচ্ছে আমি একা খেতে পারি না। খাবার সময় কথা না বললে আমার পেটের ভাত হজম হয় না। এই জন্যে যারা দেখা করতে আসে তাদের মাঝ থেকে একজনকে ঠিক করে রাখি, যার সঙ্গে ভাত খাব।'

'সেটা কীভাবে ঠিক করেন? অ্যালফাবেটিকেলি?'

'দেখুন মিসির আলি সাহেব, খেতে বলেছি খাবেন। এত কথা কেন?'

মিসির আলি খেতে বসলেন। আয়োজন অতি সামান্য। পটল ভাজি, টেংরা মাছের ঝোল, ডাল। ভাতের চালগুলিও মোটা-মোটা। ইরি হবারই সম্ভবনা।

'মিসির আলি সাহেব।'

'জ্বি?'

'খেতে পারছেন তো?'

'পারছি।

'খাবারের মান ভালো না। কী করব বলুন—মিনিস্টার হিসেবে যা পাই তাতে এর চেয়ে ভালো খাওয়া সম্ভব না। অধিকাংশ লোকের ধারণা, আমরা রাজার হালে থাকি।'

'আপনি হয়তো থাকেন না, অনেকেই থাকে।

'তাও ঠিক। সব পাখি মাছ খায়, দোষ হয় মাছরাঙার। আমরা হলাম মাছরাঙা পাখি। এখন বলুন, কি জন্যে এসেছেন আমার কাছে?'

'ওসমান গনি প্রসঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছিলাম।'

'বলুন।'

'আমার কথা আপনি কতটুক গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করবেন, সেটা ভেবেই কথা বলতে সংকোচ বোধ করছি।'

'সংকোচ বোধ করবেন না, বলুন। আপনার কথা যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হবে। আপনি কে আমি জানি। আপনার কর্মপদ্ধতি সম্পর্কেও জানি। আমার জানামতে পুলিশের কিছু জটিল মামলায় আপনি সাহায্য করেছেন। আমার আগে যিনি হোম মিনিস্টার ছিলেন তিনি আপনার প্রসঙ্গে একটা নোটও রেখে গেছেন। ওলিয়ুর রহমান সাহেব—চেনেন তাঁকে?'

'জ্বি, চিনি।'

'কীভাবে চেনেন?'

'একটা খুনের মামলার ব্যাপারে উনি আমার সাহায্য চেয়েছিলেন। আমি সাহায্য করেছিলাম।'

'এখন আপনার বক্তব্য বলুন—'

'ওসমান গনির মৃত্যুরহস্য সমাধানে আমি আপনাদের সাহায্য করতে চাই।'

'বাক্যটা আবার বলুন। ভালোমতো শুনি নি।'

মিসির আলি বাক্যটি দ্বিতীয় বার বললেন। হোম মিনিস্টার খাওয়া বন্ধ রেখে স্থির চোখে তাকিয়ে রইলেন। যখন কথা বললেন তখন তাঁর গলার স্বরে বিরক্তি চাপা রইল না—

'ওসমান গনির মৃত্যুতে কোনো রহস্য নেই। কাজেই আপনি কী ধরনের সমাধানের কথা বলছেন বুঝতে পারছি না। হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু। ডাক্তারদের তাই ধারণা। ডাক্তারদের ডেথ সার্টিফিকেটে এ-কথা পরিষ্কার লেখা আছে।'

'আমার ধারণা এটা হত্যাকাণ্ড।'

'একটা হাস্যকর ধারণা করার তো কোনো অর্থ হয় না।'

'আপনার মনে হচ্ছে ধারণাটা হাস্যকর?'

'অবশ্যই মনে হচ্ছে। শুধু আমার না, অনেকেরই মনে হবে। যাদের কল্পনাশক্তি অত্যন্ত উর্বর তাদের কথা অবশ্যি ভিন্ন। আপনি যদি বলতেন এটা আত্মহত্যা, তাও গ্রহণযোগ্য মনে করতাম। কিন্তু আপনি ভুলে গেছেন যে বাথরুম ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। দরজা ভেঙে তাঁকে বের করা হয়।'

'আমার মনে আছে।'

'তার পরেও আপনি বলছেন হত্যাকাণ্ড?'

'জ্বি, বলছি।'

হোম মিনিস্টার হাসতে-হাসতে বললেন, 'হত্যাকারী কে তাও কি জেনে গেছেন?'

'অনুমান করছি।'

'অনুমানও করে ফেলেছেন! আপনি দেখছি খুবই ওস্তাদ লোক!'

'স্যার, আপনি শুরুতে বলেছিলেন, আপনি আমার কথা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবেন। এখন কিন্তু তা করছেন না। আমার মনে হয় আপনার উচিত আমার কথা এককথায় উড়িয়ে না-দেওয়া। আমার অনুমানক্ষমতা ভালো। অতীতে অনেক বার তার প্রমাণ দিয়েছি, ভবিষ্যতেও দেব।'

'আপনি যেভাবে কথা বলছেন তাতে মনে হচ্ছে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সব আপনি চোখের সামনে দেখতে পান।'

মিসির আলি কিছু না-বলে খাওয়া শেষে করে উঠলেন। বাথরুম থেকে হাত-মুখ ধুয়ে এসে বললেন, 'আমি তাহলে যাই?'

'বসুন, খানিকক্ষণ বসুন। পান আছে, পান খান।'

'আমার পান খাওয়ার অভ্যাস নেই।'

'পান এমন কিছু জটিল খাদ্য না যে তা খাবার জন্যে অভ্যাস করতে হয়। মুখে দিয়ে চিবোলেই পান খাওয়া হয়। এটা স্বাস্থ্যের জন্যেও ভালো। দীর্ঘ সময় চিবানো হয় বলে প্রচুর জারক রস বের হয়ে হজমে সহায়তা করে। বসুন। নিজের হাতে পান বানিয়ে দেব। খেয়ে দেখুন।'

হোম মিনিস্টারের হাতে-বানানো পান চিবুতে-চিবুতে মিসির আলির মনে হল এখানে আসা ঠিক হয় নি। দিনটাই নষ্ট হয়েছে।

'মিসির আলি সাহেব।'

'জ্বি?'

'আপনার অনুমানশক্তি তো প্রবল। এখন বলুন দেখি আমার সম্পর্কে আপনার কী অনুমান? সংক্ষেপে বলুন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাকে উঠতে হবে। নিন, সিগারেট টানতে-টানতে বলুন। আপনার সিগারেটের অভ্যাস আছে তো?'

'আছে।'

মিনিস্টার সাহেব নিজেই লাইটার জ্বালিয়ে সিগারেট ধরিয়ে দিলেন। মিসির আলি সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বললেন, 'স্যার, আপনি ভান করতে পছন্দ করেন। শুধু পছন্দ না, ভান করাটা অত্যন্ত জরুরি বলে মনে করেন, আপনি অতি সাধারণ খাবারের ব্যবস্থা দুপুরে করেন। এবং একজনকে সঙ্গে নিয়ে খান, যাতে সে প্রচার করতে পারে মিনিস্টার সাহেব কী রকম ভালোমানুষ এবং কত সাধারণ খাবার খায়। অর্থের অভাবে আপনি ভালো খাবার খেতে পারছেন না অথচ বেনসন অ্যান্ড হেজেস সিগারেট ক্রমাগত টানছেন। আপনি খদ্দরের পাঞ্জাবি পরেছেন। কিন্তু যে-ঘড়িটি আপনার হাতে আছে তার নাম রোলেক্স। আমি যতদূর জানি, পৃথিবীর দামী ঘড়ির মধ্যে এটি একটি। প্রায় লাখখানেক টাকা দাম। যিনি খদ্দরের পাঞ্জাবি পরবেন, তিনি হাতে দেবেন দু' শ' তিন শ' টাকা দামের ঘড়ি। এটাই স্বাভাবিক। তবে এই ঘড়ি আপনি নিজের টাকায় কেনেন নি। উপহার হিসেবে পেয়েছেন। এই একটা ব্যাপার অবশ্যি আছে। উপহার হিসেবে পেয়েছেন এটা কী করে অনুমান করেছি, ব্যাখ্যা করব?'

মিনিস্টার সাহেব আরেকটি সিগারেট ধরাতে-ধরাতে বললেন, 'তার প্রয়োজন নেই। আপনার অনুমানশক্তি ভালো, স্বীকার করছি।'

'তাহলে কি আমি ধরে নিতে পারি আপনি আমাকে ওসমান গনি হত্যারহস্য নিয়ে কাজ করবার অনুমতি দেবেন?'

'আপনার অতিরিক্ত আগ্রহের কারণ কী?'

'আমার আগ্রহের কারণ হচ্ছে—আমি এই রহস্যের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছি। কিংবা বলা যায় আমাকে জড়িয়ে ফেলা হয়েছে। সেই অংশ আপনার অজানা নয়। ওসমান গনি সাহেবকে আমি একটি চিরকুট লিখি। তিনি ঐ চিরকুট পাওয়ার পর আপনাকে টেলিফোন করেন।

হোম মিনিস্টার শুকনো গলায় বললেন, 'ঠিক আছে—আপনি রহস্য উদ্ধারের চেষ্টা করুন। কেস সিআইডি-র হাতে দিয়ে দিচ্ছি। ওদের একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে আপনি কাজ করবেন। পুলিশ প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিতে পারে, সেই হিসেবেই সাহায্য চাওয়া হবে।'

'আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

মিসির আলি উঠে দাঁড়ালেন। হোম মিনিস্টার তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন বিরক্ত চোখে। মিসির আলি সেই বিরক্তি অগ্রাহ্য করে হাসিমুখে বললেন, 'স্যার, যাই। আপনাকে ধন্যবাদ।'

৭

নাদিয়া অবাক হয়ে বললেন, 'মিসির আলি সাহেব, আপনি কী বলতে চাচ্ছেন আমি বুঝতে পারছি না। আপনি বলতে চাচ্ছেন যে, আপনাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আমার বাবার মৃত্যু নিয়ে তদন্ত চালাতে? পুলিশ আপনাকে এই দায়িত্ব দিয়েছে?''জ্বি, হোম ডিপার্টমেন্টের চিঠি আছে। আপনি কি পড়তে চান?'

'না, পড়তে চাই না। চিঠি আপনার কাছে থাকুক। আমি বুঝতে পারছি না, এখানে তদন্তের কী আছে! হার্ট ফেলিওরে যারা মারা যায় তাদের সবার বেলাতেই কি তদন্ত হয়? সাধারণ একটি মৃত্যু. . . . . .'

'মৃত্যু সাধারণ কি না এ-বিষয়ে আপনার নিজেরও কিন্তু সন্দেহ আছে। শুরুতে আপনি আমাকে বলেছিলেন, আপনার ধারণা এটা আত্মহত্যা।'

'আমি তখন গভীর শোকের মধ্যে ছিলাম। প্রবল শোকে মানুষের চিন্তাভাবনা এলোমেলো হয়ে যায়। সহজ জিনিসকে জটিল মনে হয়। এটাই স্বাভাবিক। আপনার কি তা মনে হয় না?'

'হ্যাঁ, মনে হয়। আপনি ঠিকই বলেছেন।'

'তার চেয়েও বড় কথা, বাবা মারা গেছেন বাথরুমে। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। পুলিশের উপস্থিতিতে দরজা ভাঙা হয়।'

'তাও জানি।'

'তাহলে ঝামেলা করতে চাইছেন কেন?'

'আমি কোনো ঝামেলা করতে চাইছি না। ঝামেলা আমি একেবারেই পছন্দ করি না। আমি শুধু এ-বাড়ির মানুষদের কিছু প্রশ্ন করে চলে যাব। এক দিন, বড়জোর দু' দিন লাগবে।'

'পুলিশের কী কারণে সন্দেহ হল যে বাবার মৃত্যু তদন্তযোগ্য একটি বিষয়?'

'পুলিশের সন্দেহ হয় নি। তারা ডাক্তারের সার্টিফিকেট মেনে নিয়েছে। সন্দেহটা হয়েছে আমার।'

'সন্দেহ হবার কারণ কী?'

'অনেক কারণ আছে।'

'একটা কারণ বলুন।'

'দরজা ভেঙে আপনার বাবাকে বের করতে হল, এটাই সন্দেহের প্রধান কারণ। আমি আপনাদের বাথরুম দেখেছি—'

'জাস্ট এ মিনিট, বাথরুম কখন দেখলেন?'

'প্রথম যে-বার এ-বাড়িতে এসেছিলাম। আপনার বাবার ডেডবডি বিছানায় শোয়ানো, তখন ঘরের সঙ্গে লাগোয়া বাথরুমের দিকে তাকালাম—'

'মিসির আলি সাহেব, আপনার অবগতির জন্যে জানাচ্ছি যে, ঐ বাথরুমে বাবা মারা যান নি।'

'তাতে অসুবিধা নেই। একটা বাথরুম দেখে অন্য বাথরুমগুলি সম্পর্কে ধারণা করা যায়। আমি বাথরুমের লকিং সিস্টেম আগ্রহ নিয়ে দেখলাম। ভেতর থেকে লক করা যায়। একবার লক করলে বাইরে থেকে খোলা যায় না। তবে বাইরে থেকে চাবি দিয়ে খোলা যায়। যায় না?'

'হ্যাঁ, যায়।'

'আপনার বাবার বাথরুম ছিল ভেতর থেকে তালাবন্ধ। খুব সহজেই বাইরে থেকে চাবি দিয়ে দরজাটা খোলা যেত। তা না-করে আপনারা পুলিশ ডেকে আনলেন।'

নাদিয়া হেসে ফেললেন। তাঁর চোখে-মুখে এতক্ষণ যে কঠিন ভাব ছিল তা দূর হয়ে গেল। তিনি হালকা গলায় বললেন, 'নিন মিসির আলি সাহেব, চা নিন। চা খেতে-খেতে কথা বলি।'

মিসির আলি সিগারেট ধরালেন। নাদিয়া হাসিমুখে বললেন, 'আপনার কথা সত্যি। চাবি দিয়ে বাথরুমের দরজা খোলা যায়। এ-বাড়ির প্রতিটি দরজাই এ-রকম। এ-বাড়িতে বাথরুম নিয়ে ঘরের সংখ্যা হচ্ছে তেত্রিশ। তেত্রিশটি চাবির একটা বড় গোছা। কোনো চাবিতে নম্বর দেওয়া নেই। কারণ চাবিগুলি ব্যবহার করা হয় না। তেত্রিশটি চাবি থেকে একটা বাথরুমের চাবি অনুমানের ওপর বের করা অসম্ভব ব্যাপার। তা ছাড়া চাবির গোছা থাকে বাবার কাছে। তিনি তা কোথায় রেখেছেন তা আমাদের জানা নেই। এখন একজন বুদ্ধিমান লোক হিসেবে আপনি আমাকে বলুন, এই অবস্থায় আমাদের কী করা উচিত। চাবির গোছা খুঁজে বেড়ানো উচিত, না দরজা ভাঙা উচিত।'

'দরজা ভাঙা উচিত।'

'সেই কাজটিই আমরা করেছিলাম। আরেকটি কথা—পুলিশকে ডেকে এনে দরজা ভাঙা হয় নি। দরজা যখন ভাঙা হচ্ছে তখনই পুলিশ চলে আসে। সম্ভবত আপনার জানা নেই, দু' জন পুলিশ সেন্ট্রি আমাদের বাড়ি পাহারা দেয়। হৈচৈ শুনে তারা নিচে থেকে ওপরে চলে আসে। আমার কথাগুলি কি আপনার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে?'

'জ্বি, মনে হচ্ছে।'

'এর পরেও আপনি তদন্ত চালিয়ে যেতে চান?'

'যদি আপনি অনুমতি দেন তবেই তদন্ত চালাব।'

'আমি অনুমতি দিলাম। এ-বাড়িতে যারা আছে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করুন। ঘুরেফিরে দেখুন। সবচেয়ে ভালো হয় কী করলে জানেন? সবচেয়ে ভালো হয় যদি আপনি অতিথি হিসেবে এ-বাড়িতে উঠে আসেন। যতদিন আপনার দরকার এ-বাড়িতেই থাকবেন। খাওয়াদাওয়া এখানে করবেন। তদন্তের কাজ শেষ হলে চলে যাবেন। এতে আমার নিজেরও সুবিধা হয়।'

'কি সুবিধা?'

'আপনার পাশাপাশি থেকে তদন্তের ধারাটা দেখতে পারি। বইপত্রে পড়েছি ডিটেকটিভরা কী করে খুনী পাকড়াও করে। বাস্তবে কখনো দেখি নি। আপনার কারণে সেই সুযোগ পাওয়া যাবে।'

মিসির আলি বললেন, 'আপনার কী করে ধারণা হল যে আমি খুনী ধরতে এসেছি?'

'সঙ্গত কারণেই এ-ধারণা হয়েছে। স্বাভাবিক মৃত্যু কিংবা আত্মহত্যা—এই দু' কারণে তদন্তের জন্যে বিশেষজ্ঞ আনা হয় না। খুনটুন হলে তবেই বিশেষজ্ঞ আসে। আমি কি ভুল বলছি?'

'না, ভুল বলেন নি।'

'আপনি তাহলে আসছেন এ-বাড়িতে?'

'জ্বি, আসছি।'

'তাহলে দেরি করবেন না। আজই চলে আসুন। দি আরলিয়ার দি বেটার।'

এক স্যুটকেস বই এবং এক স্যুটকেস কাপড়চোপড় নিয়ে সন্ধ্যাবেলা মিসির আলি 'রোজ ভিলায়' উঠে এলেন। আব্দুল মজিদ নামের মধ্যবয়স্ক এক লোক তাঁকে থাকার ঘর দেখিয়ে দিল। বিরাট ঘর। অ্যাটাচড বাথরুম। সেই বাথরুমও বিশাল। বাথটাব আছে। ঠাণ্ডা পানি, গরম পানির ব্যবস্থা আছে। বাথরুমে যে-ব্যাপারটা তাঁকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করল, তা হল বড় একটা ঘড়ি। এখন পর্যন্ত কোনো বাথরুমে তিনি ঘড়ি দেখেন নি।

ঘরের আসবাবপত্রে রুচির ছাপ স্পষ্ট। খাটের পাশে বেড-সাইড কার্পেট। এক কোণায় জানালার পাশে লেখার টেবিল। টেবিলে কাগজ, কলম, খাম, পোস্টেজ স্ট্যাম্প থরেথরে সাজানো। অন্য প্রান্তে বিরাট ওয়ার্ডড্রোব। দেয়ালে রেনোয়ার দু'টি ছবির প্রিন্ট। দু'টিই অপূর্ব। প্রিন্ট মনেই হয় না। ঘরে কোনো আয়না নেই—এই একমাত্র ত্রুটি।

'আব্দুল মজিদ।'

'জ্বি স্যার।'

'ঘর খুব পছন্দ হয়েছে। এত সুন্দর করে সব সাজানো, কিন্তু কোনো আয়না নেই, ব্যাপারটা কি বলুন তো?'

'ড্রেসিং রুম স্যার আলাদা। আয়না ড্রেসিং রুমে।'

মিসির আলির বিস্ময়ের সীমা রইল না, যখন দেখলেন এই ঘরের সঙ্গে লাগোয়া দু'টি ঘর আছে। একটি বসার ঘর, অন্যটি ড্রেসিং রুম। বসার ঘরে টেলিফোন এবং

ছোট্ট টিভি সেট আছে।

'স্যার, আপনার খাবার কি এইখানে দিয়ে যাব, না ডাইনিং টেবিলে গিয়ে খাবেন?'

'এখানেই দিয়ে যাবেন।'

'ডিনার কখন দেব স্যার?'

'আমি একটু রাত করে খাই। দশটার দিকে।'

'জ্বি আচ্ছা স্যার। এখন কি চা দিয়ে যাব?'

'এক কাপ চা পেলে মন্দ হয় না। তার আগে আপনি আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিন।'

'স্যার, আপনি আমাকে তুমি করে বলবেন।'

'আচ্ছা, তুমি করেই বলব। প্রশ্নের জবাব দিতে কি কোনো অসুবিধা আছে?'

'জ্বি–না স্যার, অসুবিধা নেই। আপা বলে দিয়েছেন আপনি যা জানতে চান তা যেন বলি।'

'আপা যদি বলত—ওঁর প্রশ্নের জবাব দিও না, তাহলে কি জবাব দিতে না?'

মজিদ চুপ করে রইল। মিসির আলি বললেন, 'বস মজিদ।'

মজিদ বলল, 'আমি বসব না স্যার। যা বলার দাঁড়িয়ে–দাঁড়িয়েই বলব।'

'বেশ, তাহলে প্রশ্ন করি। খুব সহজ প্রশ্ন। তুমি কতদিন এ–বাড়িতে আছ?'

'এগার বছর।'

'কাঁটায়–কাঁটায় এগার বছর, না একটু বেশি বা একটু কম?'

'এগার বছর এক মাস।'

'তোমার কাজ কী?'

'স্যারের একটা লাইব্রেরি আছে। মিউজিক লাইব্রেরি, গানের অ্যালবাম, ক্যাসেট, সিডি ক্যাসেটের লাইব্রেরি। আমি সেই লাইব্রেরি দেখাশোনা করি।'

'তোমার চাকরিজীবন কি এখানেই শুরু, না এর আগে কোথাও কাজ করেছ?'

'বিভিন্ন জায়গায় নানান ধরনের কাজ করেছি। রানা কনস্ট্রাকশান কোম্পানিতে ছিলাম প্লামিং মেকানিক। সেখানে তিন বছর কাজ করি। তারপর স্যারের লাইব্রেরির দায়িত্ব নিই।'

'মিউজিক লাইব্রেরির জন্যে যখন আলাদা একজন লোক আছে, তখন নিশ্চয়ই ধরে নেওয়া যায় যে লাইব্রেরিটা ওসমান গনি সাহেবের অত্যন্ত প্রিয়।'

'জ্বি স্যার, খুবই প্রিয়।'

'তুমি যখন লাইব্রেরিতে থাক না, তখন কি এটা তালাবন্ধ থাকে?'

'জ্বি স্যার, তালাবন্ধ থাকে।'

'এই বাড়ির সব ঘরের জন্যে চাবি আছে—সেই চাবির গোছা কার কাছে থাকে?'

'স্যারের কাছে। তবে এই ঘরের চাবি আমার কাছে থাকে।'

'এখন ঐ চাবিগুলি কোথায়?'

'লাইব্রেরি ঘরের ড্রয়ারে। এনে দেব স্যার?'

'না, আনতে হবে না। ওসমান গনি সাহেব যখন বাথরুমে আটকা পড়লেন, হৈচৈ

হতে থাকে, তখন তুমি কোথায় ছিলে?'

'লাইব্রেরি ঘরে।'

'হৈচৈ শুনে ছুটে গেলে?'

'জ্বি না স্যার, আমি যাই নি। আমি কিছু বুঝতে পারি নি। লাইব্রেরি ঘরে আছে এয়ার কুলার। এই জন্যে দরজা-জানালা বন্ধ থাকে। ঐ রাতে এয়ার কুলার চালু ছিল। দরজা-জানালা ছিল বন্ধ। বাইরের কোনো শব্দ কানে আসে নি।'

'তুমি কখন জানতে পারলে?'

'ঘটনার দু' ঘন্টা পর।'

'গভীর রাতে এতক্ষণ লাইব্রেরি ঘরে তুমি কী করছিলে?'

'গান শুনছিলাম স্যার।'

'তোমার পড়াশোনা কতদূর?'

'দু' বছর আগে প্রাইভেটে বি· এ· পাস করেছি।'

মিসির আলি কিছুটা বিব্রত বোধ করলেন। বি· এ· পাস একজন মধ্যবয়স্ক মানুষকে তুমি-তুমি করে বলা যায় না। বলা উচিত নয়। সবাইকে তাদের প্রাপ্য সম্মান দিতে হয়। মিসির আলি আব্দুল মজিদের দিকে ভালো করে তাকালেন। বিশেষত্বহীন চেহারা। দাঁড়িয়ে আছে কুঁজো হয়ে। মুখ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। চোয়াল নড়ছে। পান চিবুচ্ছে বোধহয়। জর্দার গন্ধ আসছে। মিসির আলি বললেন, 'ওসমান গনি সাহেবের স্ত্রীও তো বাথরুমে মারা যান, তাই না।'

'জ্বি।'

'একই বাথরুম?'

'জ্বি, একই বাথরুম।'

'তখন তুমি কোথায় ছিলে?'

'মিউজিক লাইব্রেরিতে ছিলাম।'

'জেগে ছিলে?'

'জ্বি, জেগে ছিলাম।'

আব্দুল মজিদ কী-একটা বলতে গিয়েও বলল না। চুপ করে রইল। মিসির আলি বললেন, 'তুমি কী বলতে চাচ্ছ বল।'

'কিছু বলতে চাচ্ছি না স্যার।'

'আচ্ছা, যাও।'

'যদি কিছু লাগে, কলিং বেল টিপবেন। আমি চলে আসব।'

'আমার কিছু লাগবে না।'

'চা কি স্যার দিয়ে যাব?'

'দিয়ে যাও।'

আব্দুল মজিদ ঘর থেকে বের হয়েই চা নিয়ে এল। মনে হচ্ছে চা তৈরিই ছিল। মজিদ বলল, 'যদি কফি খেতে চান, কফিও দেওয়া যাবে। খুব ভালো ব্রেজিলিয়ান কফি আছে। পারকুলেটরে কফি তৈরি করা হয়। স্যার খুব পছন্দ করতেন।'

'আমি কফি পছন্দ করি না।'

আব্দুল মজিদ আবারো কী যেন বলতে গেল। শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল।

মিসির আলি বললেন, 'কিছু বলবে?'

'জ্বি-না স্যার।'

'বলতে ইচ্ছা করলে বলতে পার।'

'কিছু বলতে চাই না স্যার।'

রাতে মিসির আলি একা-একা ডিনার শেষ করলেন। খাবার নিয়ে এল আব্দুল মজিদ। মিসির আলির মনে হল, সে তাঁকে দেখছে ভীত চোখে। আড়- চোখে তাকাচ্ছে। চোখে চোখ পড়ামাত্র চোখ সরিয়ে নিচ্ছে।

'আব্দুল মজিদ।'

'জ্বি স্যার।'

'তুমি আমাকে কিছু একটা বলতে চাচ্ছ, বলে ফেল।'

আব্দুল মজিদ মাথা নিচু করে নিচু গলায় বলল, 'রাত বারটার পর যদি বাথরুমে যান তাহলে বাথরুমের দরজা বন্ধ করবেন না।'

'কেন?'

'একটু অসুবিধা আছে স্যার।'

'কী অসুবিধা?'

'দরজা খোলা যায় না।'

'দরজা খোলা যায় না মানে?'

'ভৌতিক কিছু ব্যাপার আছে স্যার। আপনি হয়তো বিশ্বাস করবেন না। দরজা আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে যায়। আর খোলে না।'

মিসির আলি সহজ গলায় বললেন, 'রাত বারটার পর বাথরুমে গেলে এবং দরজা বন্ধ করলে আপনা-আপনি দরজা বন্ধ হয়ে যায়?'

'সব সময় হয় না স্যার, মাঝে-মাঝে হয়।'

'তোমার ধারণা, ব্যাপারটা ভৌতিক?'

'জ্বি স্যার।'

'আচ্ছা, আমি মনে রাখব। সাবধান করে দেবার জন্যে ধন্যবাদ।'

আব্দুল মজিদ মাথা চুলকাতে-চুলকাতে বলল, 'আপাকে এটা না বললে খুব ভালো হয় স্যার। আপা শুনলে খুব রাগ করবেন।'

'আমি কাউকে কিছু বলব না।'

'আপনার কি পান খাওয়ার অভ্যাস আছে স্যার? পান নিয়ে আসব?'

'আন, পান আন। তবে জর্দা দিও না। আমি জর্দা খাই না।'

রাত এগারটায় মিসির আলির ঘুমুতে যাবার কথা। তিনি বারটা পর্যন্ত জেগে রইলেন। বাথরুমের দরজার ব্যাপারটা পরীক্ষা করার জন্যে। বারটা দশ মিনিটে বাথরুমে ঢুকলেন। দরজা বন্ধ করলেন। যথা সময়ে বের হয়ে এলেন। দরজা খুলতে কোনো সমস্যা হল না। তবে রাতে তাঁর ভালো ঘুম হল না। অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। বারবার ঘুম ভেঙে গেল। দুঃস্বপ্নও দেখলেন। সেই দুঃস্বপ্নে লম্বা একটা মানুষ এসে বলল, 'মিসির আলি সাহেব, আপনি সোনার দাঁত কিনবেন? আমার কাছে সোনার দাঁত আছে। খাঁটি সোনা।' মিসির আলি বললেন, 'না, আমি সোনার দাঁত কিনব না।'

'আপনাকে স্যার কিনতেই হবে। এই কে আছিস, স্যারের কয়েকটা দাঁত টেনে

তুলে ফেল। দেখি দাঁত না কিনে স্যার যায় কোথায়।'

লোকটির কথা শেষ হতেই বাথরুমের দরজা খুলে সাঁড়াশি হাতে একটা ভয়ংকর-দর্শন মানুষ বের হল। মিসির আলি ছুটছেন। লোকটাও সাঁড়াশি হাতে পিছনে পিছনে ছুটছে।

রাত তিনটার দিকে ঘুমের আশা ছেড়ে দিয়ে বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসলেন। তাঁকে থাকতে দেওয়া হয়েছে একতলায়। দোতলায় পায়ের শব্দ হচ্ছে। চটির ফটফট শব্দ আসছে। কেউ একজন বারান্দায় এক মাথা থেকে অন্য মাথায় যাচ্ছে এবং আসছে। নিশ্চয়ই নাদিয়া।

৮

কড়া নাড়তেই দরজা খুলল।

অতসী মুখ বের করল। মিসির আলি বললেন, 'ভালো আছ অতসী?' অতসী স্থির চোখে তাকিয়ে রইল।

'তোমার বাবা বাসায় আছেন তো?'

অতসী জবাব দিল না। মিসির আলি বললেন, 'আমি ভেবেছিলাম তোমরা আসবে আমার কাছে। তোমরা এলে না। শেষে নিজেই এলাম। ঠিকানা বদলেছ, খুঁজে বের করতে কিছু সময় লেগেছে। আজ কি তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করা যাবে? না আজও যাবে না?'

'যাবে।'

'তাহলে দরজা থেকে সরে দাঁড়াও। ঘরে ঢুকি।'

অতসী দরজা থেকে সরে দাঁড়াল। মিসির আলি বললেন, 'তুমি কি আমাকে দেখে অবাক হয়েছ?' অতসী নিচু গলায় বলল, 'না, অবাক হই নি। আপনি আসবেন আমি জানতাম। বসুন, বাবাকে ডেকে দিচ্ছি।'

অতসী ভেতরে চলে গেল। অম্বিকাবাবু প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ঢুকলেন। লুঙ্গি পরা, খালি গা। কাঁধের ওপর ভেজা গামছা। তিনি অবাক হয়ে মিসির আলির দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর মেয়ের মতো তিনিও পলক না-ফেলে তাকিয়ে থাকতে পারেন।

মিসির আলি বললেন, 'আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না।'

অম্বিকাবাবু বললেন, 'স্যার বসুন। আপনি মিসির আলি। আগেও একবার এসেছিলেন। আমার মেয়ে আমাকে বলেছে। কি ব্যাপার স্যার?'

'আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। আপনি বসুন। আমি বেশিক্ষণ আপনাকে বিরক্ত করব না।'

অম্বিকাবাবু বসলেন। মনে হচ্ছে একটু ভয় পাচ্ছেন। বারবার ভেতরের দরজার দিকে তাকাচ্ছেন। মনে হচ্ছে তিনি চাচ্ছেন তাঁর মেয়ে এসে বসুক তাঁর কাছে।

'অম্বিকাবাবু।'

'বলুন।'

'আপনি ওসমান গনিকে চেনেন, তাই না?'

'জ্বি, চিনি।'

'তিনি হাত দেখাবার জন্যে আপনার কাছে আসতেন?'

'জ্বি।'

'তাঁর স্ত্রীও কি এসেছিলেন?'

'এক দিন এসেছিলেন।'

'ওসমান গনি প্রায়ই আসতেন?'

'মাঝে-মাঝে আসতেন। উনি আমাকে খুব পছন্দ করতেন।'

'উনি কি পামিস্ট্রি বিশ্বাস করতেন?'

'না। উনি নাস্তিক ধরনের মানুষ। কোনো কিছুই বিশ্বাস করতেন না।'

'আপনি তাঁর মেয়েটিকে চেনেন?'

'না।'

'কখনো দেখেন নি?'

'না।'

'অতসী বলছিল আপনার শরীর খারাপ। কী রকম খারাপ?'

'আমার মানসিক কিছু সমস্যা আছে। মাঝে-মাঝে মাথা এলোমেলো হয়ে যায়। তখন কি করি বা কি না করি কিছুই বলতে পারি না। কিছু মনেও থাকে না।'

'আপনি যে আমার কাছে গিয়েছিলেন তা মনে আছে?'

'জ্বি-না, মনে নেই।'

'আমাকে কী বলেছিলেন—কিছুই মনে নেই?'

'না। স্যার, ঐ সময় আমার মাথার ঠিক ছিল না।'

অতসী চা নিয়ে ঢুকল। আগের মতো দুধ-চিনি ছাড়া চা নয়। দুধ-চা। চায়ের সঙ্গে বিসকিট আছে। চানাচুর আছে। মনে হচ্ছে আগের হতদরিদ্র অবস্থা এরা কাটিয়ে উঠেছে।

'অম্বিকাবাবু।'

'বলুন।'

'আপনি কি কখনো ওসমান গনি সাহেবের বাড়িতে গিয়েছেন?'

'না।'

'কখনো যান নি?'

'না।'

'উনি কখনো আপনাকে যেতে বলেন নি?'

'না।'

অতসী দু' কাপ চা এনেছিল। মিসির আলি তাঁর কাপ শেষ করলেন। কিন্তু অম্বিকাবাবু নিজের কাপ ছুঁয়েও দেখলেন না। তিনি সারাক্ষণ বসে রইলেন মাথা নিচু করে। তাঁর দৃষ্টি চায়ের কাপের দিকে।

'ওসমান গনি যে মারা গেছেন তা কি আপনি জানেন?'

'জানি।'

'কীভাবে জানলেন? পত্রিকায় পড়েছেন?'

অম্বিকাবাবু জবাব দিলেন না। গামছা দিয়ে মুখ মুছতে লাগলেন।

'উঠি অম্বিকাবাবু।'

'আচ্ছা।'

'আরেকদিন এসে আপনাকে হাত দেখিয়ে যাব।'

অম্বিকাবাবু মৃদু গলায় বললেন, 'এখন আর হাত দেখতে পারি না। অসুখের পর ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেছে।'

'তাহলে গল্প করার জন্যেই না-হয় আসব। যদি আপনার আপত্তি না থাকে।'

অম্বিকাবাবু কিছু বললেন না। মিসির আলি রোজ ভিলায় ফিরে এলেন। রোজ ভিলা তাঁর কাছে এখন নিজের বাড়িঘরের মতোই লাগছে। অন্যের বাড়িতে থাকছেন, খাওয়াদাওয়া করছেন—এ নিয়ে কোনো রকম অস্বস্তি বোধ করছেন না। রোজ ভিলায় আজ নিয়ে পঞ্চম দিন। এখন পর্যন্ত আব্দুল মজিদ ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে কথাবার্তা বলেন নি। যদিও এ-বাড়িতে বেশ কিছু মানুষ বাস করে। দু' জন বাবুর্চি আছে। এক জন একতলায় থাকে। সে পুরুষ। নাম মকিম মিয়া। অন্যজন মহিলা—জাহানারা। সে থাকে দোতলায়। দোতলায় ওসমান গনি সাহেবের দূর সম্পর্কের এক ফুপুও থাকেন। আশির কাছাকাছি বয়স। হুইল চেয়ারে করে মাঝেমধ্যে বারান্দায় আসেন। এই বৃদ্ধা মহিলার দেখাশোনা করার জন্যে অল্পবয়স্কা একটি মেয়ে আছে। সালেহা নাম।

নাদিয়ার কাজকর্ম দেখাশোনা করার জন্যেই একজন কাজের লোক আছে। অ্যাংলো মেয়ে। নাম এলিজাবেথ। ডাকা হয় এলি করে।

দোতলার পুরোটাই নারীমহল। পুরুষদের সন্ধ্যার পর সেখানে প্রবেশাধিকার নেই। একতলায় পুরুষ রাজত্ব। এখানে সবাই পুরুষ। দু' জন ড্রাইভার। তিন জন দারোয়ান। দু' জন মালী। এরাও একতলার বাসিন্দা। তবে এরা মূল বাড়িতে থাকে না। বাড়ির পিছনে ব্যারাকের মতো একসারিতে কয়েকটা ঘর আছে, এরা থাকে সেখানে। মূল বাড়িতে সাফাকাত নামের এক ভদ্রলোক থাকেন। সবাই তাঁকে ম্যানেজার সাহেব ডাকেন। ভদ্রলোকের সঙ্গে মিসির আলির কয়েকবারই দেখা হয়েছে। কখনো কথা হয় নি। সাফাকাত সাহেবের সঙ্গে মুখোমুখি হলেই তিনি দ্রুত পাশ কাটিয়ে চলে যান। মিসির আলির কয়েকবারই ইচ্ছা করেছে ডেকে জিজ্ঞেস করেন—'আপনি আমাকে দেখলে এমন করেন কেন?'

শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করা হয় নি। মিসির আলি নিজেকে একটু গুছিয়ে নিতে চাচ্ছেন, কিন্তু গোছাতে পারছেন না। সব এলোমেলো হয়ে আছে। অনেকগুলি প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাচ্ছে না।

রাত ন'টার মতো বাজে। মিসির আলি তাঁর শোবার ঘরে খাতা খুলে বসেছেন। পেনসিলে নোট করছেন। এখন লিখছেন সেইসব প্রশ্ন, যার উত্তর তিনি বের করতে পারছেন না :

(১) ওসমান গনির মতো ধনবান এবং ক্ষমতাবান ব্যক্তি প্রায়ই আসতেন অম্বিকাবাবুর কাছে। কিন্তু অম্বিকাবাবু কখনো এ-বাড়িতে আসেন নি। যদিও উল্টোটাই হওয়া উচিত ছিল। ওসমান গনি অনায়াসে ডেকে পাঠাতে পারতেন অম্বিকাবাবুকে। কেন তা করেন নি?

(২) ওসমান গনি পামিস্ট্রি বিশ্বাস করতেন না। তাহলে ঠিক কোন প্রয়োজনে

অম্বিকাবাবুর কাছে তিনি যেতেন? অম্বিকাবাবুর কথা অনুযায়ী ওসমান গনি তাঁকে খুব পছন্দ করতেন। কেন পছন্দ করতেন? অম্বিকাবাবুর চরিত্রের কোন দিকটি তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল?

(৩) অম্বিকাবাবু এবং তাঁর কন্যা আমাকে এড়িয়ে চলতে চাইছে। এরা দু' জনই আমাকে ভয় পাচ্ছে। কেন? আমার সঙ্গে যাতে দেখা না-হয় সে-কারণে এরা বাড়ি ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে গেল। কেন?

দরজায় টোকা পড়ছে। মিসির আলি বললেন, 'কে?'

'স্যার, আমি মজিদ। রাতের খাবার নিয়ে এসেছি স্যার।'

মিসির আলি উঠে দরজা খুলে দিলেন। মজিদ বলল, 'খাওয়া শেষ হবার পর আপা তাঁর সঙ্গে আপনাকে দেখা করতে বলেছেন।'

'আমি দোতলায় যাব, না তিনি নিচে নেমে আসবেন?'

'স্যার, আমি আপনাকে দোতলায় নিয়ে যাব।'

নাদিয়া দোতলার বারান্দায় অপেক্ষা করছিলেন। মিসির আলি ঢুকতেই হাসিমুখে বললেন, 'কেমন আছেন মিসির আলি সাহেব?'

'ভালো।'

'আপনার তদন্ত কেমন এগুচ্ছে?'

'এগুচ্ছে।'

'বসুন। বলুন তো কি জন্যে ডেকেছি?

'বুঝতে পারছি না।'

'জোছনা দেখার জন্যে ডেকেছি। বারান্দা থেকে সুন্দর জোছনা দেখা যায়। ঘরে এবং বাগানের সব বাতি নিভিয়ে দিতে বলব, তখন দেখবেন, কী সুন্দর জোছনা! স্ট্রীট ল্যাম্পগুলি সব সময় ডিসটার্ব করে। তবে সৌভাগ্যক্রমে আজ স্ট্রীট ল্যাম্প জ্বলছে না।'

অ্যাংলো মেয়েটি চায়ের ট্রে নিয়ে ঢুকল। মেয়েটির মুখ ভাবলেশহীন। কেমন পুরুষালি চেহারা। সে রোবটের মতো কাপে চা ঢালছে। নাদিয়া বললেন, 'এলি, তুমি বাতি নিভিয়ে দিতে বল। আমরা জোছনা দেখব।'

এলি মাথা নাড়ল। মোটেই বিস্মিত হল না। তার অর্থ হচ্ছে বাতি নিভিয়ে জোছনা দেখার এই পর্বটি নতুন নয়। আগেও করা হয়েছে।

'মিসির আলি সাহেব।'

'বলুন।'

'আপনি মজিদ ছাড়া আর কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করেন নি?'

'এখনো করি নি, তবে করব।'

'সময় নিচ্ছেন কেন?'

'গুছিয়ে আনতে চেষ্ট করছি। গুছিয়ে আনলেই জিজ্ঞেস করব।'

'ওরা নিজ থেকে কিছু বলছে না?'

'না।'

নাদিয়া হাসতে-হাসতে বললেন, 'এরা কি আপনাকে গোপনে বলে নি এ-বাড়িতে ভূত আছে? গভীর রাতে বাথরুমে গেলে আপনা-আপনি বাথরুমের দরজা বন্ধ

হয়ে যায়? মজিদ নিশ্চয়ই ইতোমধ্যে আপনাকে এই কথা বলেছে এবং অনুরোধ করেছে যেন আমি না–জানি। কি, করে নি?

'করেছে।'

'আপনার বাথরুমের দরজা কি কখনো বন্ধ হয়েছে?'

'এখনো হয় নি।'

নাদিয়া সিগারেট ধরাতে–ধরাতে বললেন, 'আমার বাথরুমের দরজাও বন্ধ হয় নি। ওদের প্রত্যেকের বেলাতেই নাকি হয়েছে। আপনি কি ভূত বিশ্বাস করেন মিসির আলি সাহেব?'

'না, করি না।'

'আমিও করি না।'

'আপনার বাবা—তিনি কি করতেন?'

নাদিয়া কিছু না–বলে সিগারেটে টান দিতে শুরু করলেন। হাতের ইশারায় এলিজাবেথকে চলে যেতে বললেন। এলিজাবেথ চলে গেল, এবং তার প্রায় সঙ্গে–সঙ্গেই ঘরের সব বাতি নিভে গেল। নাদিয়া বললেন, 'খুব সুন্দর জোছনা, তাই না মিসির আলি সাহেব?'

'হ্যাঁ, খুব সুন্দর। আপনি কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব দেন নি। আপনার বাবা কি ভূত বিশ্বাস করতেন?'

'তিনি নাস্তিক ধরনের মানুষ ছিলেন। কিন্তু শেষের দিকে ভূতপ্রেত বিশ্বাস করা শুরু করলেন।'

'কেন?'

'ঠিক বলতে পারব না কেন। তাঁকে কখনো জিজ্ঞেস করি নি।'

মিসির আলি বললেন, 'বাথরুমের দরজা বন্ধ হওয়া–সংক্রান্ত 'ভয়' পাওয়া শুরু হল কখন? আপনার মা'র মৃত্যুর পর, না তারো আগে?'

'তারো আগে। এর একটা ঘটনা আছে। ঘটনাটা আপনাকে বলি। আপনার তদন্তে সাহায্য হতে পারে। আপনি পা উঠিয়ে আরাম করে বসুন। টী–পট ভর্তি চা। চা খেতে–খেতে গল্প শুনুন। তার আগে বলুন, জোছনা কেমন লাগছে।'

'ভালো লাগছে।'

'জোছনা দেখার এই কায়দা কার কাছ থেকে শিখেছি জানেন? বাবার কাছ থেকে। তিনি এইভাবে জোছনা দেখতেন। যে–রাতে খুব পরিষ্কার জোছনা হত, তিনি টেলিফোন করে দিতেন মিউনিসিপ্যালিটির মেয়র সাহেবকে। তারা বাসার সামনের স্ট্রীট লাইটের বাতি নিভিয়ে দিত। ক্ষমতাবান মানুষ হবার অনেক সুবিধা।'

মিসির আলি পা উঠিয়ে বসলেন। নাদিয়া গল্প শুরু করল—

'আমার বাবা বিয়ে করেছিলেন খুব অল্প বয়সে। একুশ বছর বয়সে। আমার মা'র বয়স তখন পনের। ভালবাসার বিয়ে। বাবার তখন খুব দুর্দিন যাচ্ছে। টাকাপয়সা নেই। পরের বাড়িতে থাকেন। এর মধ্যে নতুন বৌ, যাঁকে তাঁর বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। নানান দুঃখ–কষ্টে তাঁদের জীবন কাটছে। শুরুটা সুখের নয়, বলাই বাহুল্য। এর মধ্যে মা কনসিভ করে ফেললেন। এই অবস্থায় নতুন একটি শিশু পৃথিবীতে আনা চরম বোকামি। কাজেই বাবা–মা দু' জন মিলেই ঠিক করলেন, শিশুটি নষ্ট করে

দেওয়া হবে। হলও তাই। আনাড়ি ডাক্তার। অ্যাবোরশান খুব ভালোভাবে করতে পারল না, যে–কারণে মা'র সন্তানধারণের ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেল। বিয়ের দশ বছর পরেও তাঁর আর কোনো ছেলেমেয়ে হল না। ততদিনে বাবা দু' হাতে টাকা রোজগার করতে শুরু করেছেন। অর্থের সুখ বলতে যা, তা তাঁরা পেতে শুরু করেছেন। বড় সুখের পাশাপাশি বড় দুঃখ থাকে। তাঁদের বড় দুঃখ হল–সন্তানহীন জীবন কাটাতে হবে এই ধারণায় অভ্যস্ত হওয়া।....

মা'র জন্যে এটা ছিল অত্যন্ত কঠিন। বাবা সেই কঠিন ব্যাপারটা একটু সহজ করবার জন্যে একটা ছ' মাস বয়সী ছেলে দত্তক নিলেন। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, ছেলেটি দত্তক নেবার সঙ্গে–সঙ্গেই মা কনসিভ করলেন। আমার জন্ম হল। ছেলেটির সঙ্গে আমার বয়সের ব্যবধান ন' মাসের মতো।....

আমরা দু' জন একসঙ্গে বড় হচ্ছি। সঙ্গত এবং স্বাভাবিক কারণেই মা'র সমস্ত স্নেহ তখন আমার দিকে। ছেলেটিকে তিনি সহ্যও করতে পারেন না। আবার কিছু বলতেও পারেন না—কারণ ছেলেটিকে বাবা খুব পছন্দ করতেন।...

মা একেবারেই করতেন না। ছেলেটা ছিল লাজুক ধরনের। কারো সঙ্গে বিশেষ কথাটথা বলত না। মা অতি তুচ্ছ অপরাধে তাকে শাস্তি দিতেন। শাস্তিটা হল আর কিছুই না, বাথরুমে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দেওয়া। বাথরুম ছিল মার জেলখানা। অপরাধের গুরুত্ব বিচার করে বাথরুমে থাকার মেয়াদ ঠিক হত।'

মিসির আলি কাপে চা ঢালতে–ঢালতে বললেন, 'আপনাকে কি এই জাতীয় শাস্তি পেতে হয়েছে?

'না, আমাকে এ–ধরনের শাস্তি কখনো দেওয়া হয় নি। যাই হোক, যা বলছিলাম—এক রাতের কথা। মা ছেলেটিকে শাস্তি দিয়েছেন। বাথরুমে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। সেই রাতে খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। ছেলেটিকে বাথরুমে ঢোকানোর পর খুব ঝড় শুরু হল। ঘরের জানালার বেশ কয়েকটা কাঁচ ভেঙে গেল। আমাদের বাসার পিছনে বড়ো একটা ইউক্যালিপটাস গাছ ছিল। ঐ গাছ ভেঙে বাড়ির ওপর পড়ল। মনে হল পুরো বাড়ি বুঝি ভেঙে পড়ে গেল। আমি চিৎকার করে কাঁদছি। কারেন্ট চলে গেছে। সারা বাড়ি অন্ধকার। বিরাট বিশৃঙ্খলার মধ্যে সবাই ভুলে গেল ছেলেটির কথা। তার কথা মনে হল পরদিন ভোরে। বাথরুমের দরজা খুলে দেখা গেল সে বাথটাবে চুপচাপ বসে আছে। তাকিয়ে আছে বড়–বড় চোখে। তার দেহে যে প্রাণ নেই, তা তাকে দেখে মোটেই বোঝা যাচ্ছিল না। ছেলেটি মারা গিয়েছিল ভয়ে হার্টফেল করে। বাথরুম–সংক্রান্ত ভয়ের শুরু সেখান থেকে। গল্পটা কেমন লাগল মিসির আলি সাহেব?'

মিসির আলি জবাব দিলেন না।

নাদিয়া হাই তুলতে–তুলতে বলল, 'রাত অনেক হয়েছে। যান, ঘুমিয়ে পড়ুন। আজ সারা রাত যদি বাতি না জ্বালানো হয় আপনার কি অসুবিধা হবে?'

'জ্বি–না, অসুবিধা হবে না।'

'মজিদ আপনার ঘরে মোমবাতি জ্বালিয়ে দিয়ে আসবে। অসম্ভব সুন্দর একটা জোছনা রাত। ইলেকট্রিক বাতি জ্বালিয়ে এ–রাত নষ্ট করার কোনো মানে হয় না।'

রাত বেশি হয় নি। বারটা দশ। ঘর অন্ধকার করে মোমবাতি জ্বালানোর কারণেই বোধহয়—নিশুতি রাত বলে মনে হচ্ছে। মিসির আলি খানিকক্ষণ লেখালেখি করার চেষ্টা করলেন। লেখার বিষয়—'অনিদ্রা'। অনিদ্রা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ব্যাখ্যা। এই প্রবন্ধটি তিনি গত দু' বছর ধরে লেখার চেষ্টা করছেন। যখনই কিছু মনে হয় তিনি লিখে ফেলেন। আজ কিছুই মনে আসছে না। তবু লিখছেন।

'স্যার।'

মিসির আলি চমকে তাকালেন। আব্দুল মজিদ বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

'কি ব্যাপার?'

'একটা চার্জ লাইট নিয়ে এসেছি স্যার। আপা পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

'দরকার ছিল না।'

'আপা বললেন, আপনি রাত জেগে পড়াশোনা করেন। মোমবাতির আলোয় পড়তে অসুবিধা হবে।'

'ঠিক আছে, রেখে যাও।'

ফ্যান চলছে না। গরম লাগছে। মিসির আলি বারান্দায় এসে বসলেন। বারান্দার এক কোণার মেঝেতে আরো একজন বসে আছে। মিসির আলিকে দেখে সে পিলারের আড়ালে নিজেকে সরিয়ে নিল। মিসির আলি বললেন, 'কে ওখানে? সাফকাত সাহেব না?'

'জ্বি স্যার।'

'লুকিয়ে আছেন কেন? এখানে আসুন, গল্প করি।'

সাফকাত পিলারের আড়াল থেকে বের হয়ে এল। খুব অনিচ্ছার সঙ্গে এল। মিসির আলি পাশের চেয়ার দেখিয়ে বললেন, 'বসুন, চেয়ারে বসুন।'

'জ্বি–না স্যার।'

'না কেন? চেয়ারে বসতে অসুবিধা আছে?'

সাফকাত বসে পড়ল। মিসির আলি বললেন, 'আপনি আমাকে এড়িয়ে চলেন কেন? দেখা হলেই পালিয়ে যান কিংবা পিলারের আড়ালে লুকিয়ে পড়েন। রহস্যটা কী?'

সাফকাত জবাব দিল না। শব্দ করে নিঃশ্বাস ফেলল।

'সাফকাত সাহেব।'

'জ্বি স্যার।'

'আপনি বাথরুমে গিয়েছেন আর আপনা আপনি দরজা বন্ধ হয়ে গেছে, এ–রকম কি কখনো হয়েছে?'

'দু' বার হয়েছে স্যার।'

'শেষ কবে হল? ওসমান গনি সাহেবের মৃত্যুর আগে, না পরে?'

'উনার মৃত্যুর আগে।'

'কত দিন আগে?'

'আট দিন আগে।'

'খুব ভয় পেয়েছিলেন?'

'জ্বি।'

'দরজা কতক্ষণ বন্ধ ছিল?'

'বলতে পারি না। ভয়ে আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। দরজা খুলে এরা আমাকে বের করে। তারপর হাসপাতালে নিয়ে যায়। দু' দিন ছিলাম হাসপাতালে।'

'এত ভয় পেলেন কেন?'

'হঠাৎ করে বাথরুম অন্ধকার হয়ে গেল। তারপর ঘন্টার শব্দ শুরু হল।'

'ও আচ্ছা—ঘন্টার শব্দ হচ্ছিল।'

'জ্বি—গির্জায় ঘন্টার যে-রকম শব্দ হয় সে-রকম শব্দ।'

'গির্জার ঘন্টার শব্দের কথা আপনি জানলেন কীভাবে?'

'আমার বাড়ি স্যার বরিশালের মূলাদি। ঐখানে ক্যাথলিকদের একটা গির্জা আছে।'

'বাতি নিভে গেল, গির্জার ঘন্টার শব্দ হতে লাগল, আর কী হল?'

'ফুলের গন্ধ পেলাম স্যার।'

'কি ফুল?'

'কাঁঠালিচাঁপা ফুল।'

'এই বাড়িতে আপনি তাহলে খুব ভয়ে-ভয়ে থাকেন?'

'জ্বি স্যার। কোনো সময়েই বাথরুমের দরজা বন্ধ করি না। চাকরি ছেড়ে দেওয়ার কথাও স্যার ভাবছি। চাকরি কোথাও পাচ্ছি না। চাকরির বাজার খুব খারাপ। তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া কী?'

'আপা আমাকে খুব পছন্দ করেন। উনাকে একা ফেলে রেখে যেতে ইচ্ছা করে না।'

'আপনার আপা প্রসঙ্গে বলুন, উনি কেমন মেয়ে?'

'খুব তেজী মেয়ে স্যার। খুব সাহসী। সন্ধ্যার পর থেকে এ-বাড়ির লোকজন ভয়ে অস্থির হয়ে থাকে। কিন্তু আপার মনে কোনো ভয়ডর নেই। রাতে-বিরাতে একা-একা ঘুরে বেড়ান। তা ছাড়া স্যার দেখুন, বাবার এত বড় বিজনেস, সব তিনি নিজে দেখছেন। ভালোভাবে দেখছেন।'

আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছে। মনে হচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যেই মেঘে চাঁদ ঢাকা পড়বে। সাধের জোছনা বেশিক্ষণ দেখা যাবে না। মিসির আলি উঠে পড়লেন। ঘুম পাচ্ছে। ঘরে ঢোকামাত্র আব্দুল মজিদ এল পানির গ্লাস ও বোতল নিয়ে।

'এখনো জেগে আছ মজিদ?'

'জ্বি স্যার। ঘর অন্ধকার—ঘুমাতে ভয়ভয় লাগে। আপনার কি আর কিছু লাগবে?'

'না। কাল সকালে বৃদ্ধা মহিলাটির সঙ্গে কথা বলব।'

'জ্বি আচ্ছা স্যার?'

'উনি ঘুম থেকে ওঠেন কখন?'

'বুড়ো মানুষ তো স্যার, রাতে ঘুম হয় না। ফজর ওয়াক্তে ঘুম ভাঙে।'

'আমি খুব ভোরেই ওঁর সঙ্গে কথা বলব।'

'জ্বি আচ্ছা স্যার।'

'তুমি চলে যাও। আমার আর কিছু লাগবে না।'

মজিদ তবু দাঁড়িয়ে রইল। মিসির আলি বললেন, 'কিছু বলবে?'

মজিদ নিচু গলায় বলল, 'বাড়িঘর অন্ধকার। বাথরুমে যদি যান দরজাটা খোলা রাখবেন স্যার।'

'আমার ভূতের ভয় নেই মজিদ।'

'স্যার, ভূতের ভয় আমারো ছিল না। কিন্তু এই দুনিয়ায় অনেক কিছু আছে। আমরা আর কতটা জানি! একটু সাবধান থাকলে ক্ষতি তো স্যার কিছু না।'

'আচ্ছা, দেখা যাক।'

রাতে মিসির আলি কয়েকবারই বাথরুমে গেলেন। প্রতি বারই দরজা বন্ধ রাখলেন এবং আশা করতে লাগলেন দরজা আটকে যাবে—কিছুতেই ভেতর থেকে খোলা যাবে না। কিন্তু তেমন কিছু হল না।

মিসির আলি বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। আকাশ মেঘে ঢাকা। বিজলি চমকাচ্ছে। যে-কোনো মুহূর্তে বৃষ্টি নামবে। দোতলার বারান্দায় চটি ফটফটিয়ে হাঁটার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। নাদিয়া হাঁটছে নিশ্চয়ই। মেয়েটা তাহলে সত্যি-সত্যি ঘুমায় না?

৯

হুইল চেয়ারে যে-বৃদ্ধা বসে আছেন তাঁর চেহারা এই বয়সেও অত্যন্ত সুন্দর। গায়ের রঙ দুধে-আলতায় বলে যে-কথাটি প্রচলিত আছে ভদ্রমহিলাকে দেখে তা সত্যি মনে হয়। মাথার চুল লম্বা এবং সাদা। ধবধব করছে। ধবধবে সাদা চুলেরও যে আলাদা সৌন্দর্য আছে, তা এই বৃদ্ধাকে দেখে বোঝা যায়। বৃদ্ধার হুইল চেয়ার ধরে যে-মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে তার গায়ের রঙ শ্যামলা হলেও সুশ্রী। এই মেয়েটির নামই সালেহা। কাজের মেয়ে বলে তাকে মনে হয় না। মাথায় ঘোমটা দেওয়া বলে সালেহাকে কেমন বৌ-বৌ মনে হচ্ছে।

মিসির আলি বৃদ্ধার সামনে বসতে-বসতে বললেন, 'আপনি কেমন আছেন?'

বৃদ্ধা নরম গলায় বললেন, 'বাবা, আমি ভালো আছি। এই বয়সে বেঁচে থাকাই ভালো থাকা।

'আমি আমার পরিচয় দিয়ে নিই, আমার নাম মিসির আলি . . . . .'

'আপনাকে পরিচয় দিতে হবে না বাবা। আপনি কে আমি জানি। এখানে কি জন্যে আছেন তাও নাদিয়া বলেছে।'

'দু'-একটা প্রশ্ন করব, যদি কিছু মনে না করেন।'

'কিচ্ছু মনে করব না। আপনি যত ইচ্ছা প্রশ্ন করেন। সব প্রশ্নের জবাব ঠিকমতো দিতে পারব কি না তাও তো জানি না—বয়স হয়ে গেছে, ঠিকমতো গুছিয়ে কিছু বলতে পারি না।'

'এই বাড়িতে আপনি কত দিন ধরে আছেন?'

'অনেক দিন। তা ধর কুড়ি বছর। তুমি করে বলে ফেলেছি বাবা। ভুল হয়ে গেছে।'

'কোনো ভুল হয় নি। আপনি আমাকে তুমি করে বলুন। কিচ্ছু অসুবিধা নেই।

আপনি তাহলে কুড়ি বছর ধরে এদের সঙ্গে আছেন?'

'হ্যাঁ।'

'এরা মানুষ কেমন?'

বৃদ্ধা হাত ইশারা করে সালেহা মেয়েটাকে চলে যেতে বললেন। সালেহা চলে গেল। যাবার সময় দরজা ভেজিয়ে দিয়ে গেল। বৃদ্ধা গলার স্বর নিচু করে বললেন, 'নাদিয়া মেয়েটা খুব ভালো। একটু পাগল ধরনের। রাতে ঘুমায় না, সিগারেট খায়। কিন্তু বড় ভালো, মেয়ে। অন্তরটা বিরাট বড়।'

'মেয়ের বাবা-মা সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?'

'ওরা মন্দও না আবার ভালোও না। ভালো-মন্দে মেশানো। কিন্তু নাদিয়া মেয়েটার মধ্যে মন্দের ভাগ খুব সামান্য। এই রকম সচরাচর দেখা যায় না। নিজের ছেলেমেয়েরা আমাকে দেখে না, কিন্তু পরের মেয়ে নাদিয়া আমাকে দেখে। একবার জ্বর হল—এক শ' চার। জ্বরে অচেতন হয়ে গেলাম। জ্ঞান ফিরলে দেখি এই মেয়ে আমার মাথায় পানি ঢালছে। চিন্তা কর বাবা—কোটিপতি বাবার মেয়ে! তার মুখের হুকুমে দশজন লোক ছুটে আসবে। সে কিনা মাথায় পানি ঢালে।'

'আপনার ছেলেমেয়ে ক'জন?'

'তিন ছেলে, দুই মেয়ে। বড় ছেলেটা বাহরাইনে ড্রাইভারের চাকরি নিয়ে গিয়েছিল। আর ফিরে আসে নাই। তার কোনো খোঁজখবরও জানি না। ছোটটা থাকে তার বোনের কাছে চিটাগাং। গুণ্ডামি বদমায়েশি এইসব করে। মেজো ছেলেটাকে তো বাবা তুমি দেখেছ। আব্দুল মজিদ।'

মিসির আলি বিস্মিত হয়ে বললেন, 'আব্দুল মজিদ আপনার ছেলে?'

'হ্যাঁ বাবা। আমি জানি সে তোমাকে বলে নাই যে আমি তার মা। কাউকেই বলে না। বাপ-মা'র পরিচয় দিতে লজ্জা পায়। আমার ছেলেটা ভালো, তবে বোকা ধরনের। বোকা বলেই ভালো। বয়স তো আমার কম হয় নাই। আমি দেখেছি এই জগতে বোকারাই ভালো।'

'বোকা বলছেন কেন? আমার কাছে তো বোকা মনে হয় না।'

'তুমি দূর থেকে দেখেছ, এই জন্যে তোমার কাছে বোকা মনে হয় না। আসলে বোকা।'

'এই বাড়িতে একটা বাচ্চা ছেলে মারা গিয়েছিল, আপনার মনে আছে?'

'হ্যাঁ, মনে আছে।'

'কি ব্যাপার বলুন তো।'

'ঐ ব্যাপারে কিছু বলতে চাই না বাবা। ঐটা একটা অ্যাকসিডেন্ট। এই দুনিয়ায় অ্যাকসিডেন্ট তো হয়। ছেলের নিয়তি ছিল ভয় পেয়ে মৃত্যু—তাই হয়েছে। নিয়তিকে গালাগাল দিয়ে তো লাভ নাই। কারণ আল্লাহ্‌পাক বলেছেন—নিয়তিকে গালি দিও না, কারণ আমিই নিয়তি।'

'পরবর্তী সময়ে যে দেখা গেল বাথরুম আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে যায়, এই সম্পর্কে আপনার ধারণা কী?'

'মনের ভুল। দরজা হয়তো একটু শক্ত হয়ে লাগে। এম্নি ভয় পেয়ে চিৎকার শুরু করে। কথায় আছে না—বনের বাঘে খায় না, মনের বাঘে খায়? মনের বাঘটাই বড়।

'আপনার বেলায় কখনো এই জাতীয় কিছু ঘটে নি?'

'না।'

'সালেহা, ঐ মেয়েটির কি এ-রকম অভিজ্ঞতা হয়েছে?'

'একবার নাকি হয়েছে। চিৎকার, হৈচৈ। বাথরুমের দরজা ভেতর থেকে খুলতে পারে না। আমি হুইল চেয়ারে করে গেলাম। ধাক্কা দিতেই দরজা খুলল। দরজা খুলে দেখি অচেতন হয়ে পড়ে আছে। দাঁতে-দাঁতে লেগে জিহ্বা কেটে বিশ্রী অবস্থা! ঐ যে বললাম মনের বাঘ। তাকেও ধরেছে মনের বাঘে। তুমি কি নিজে মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করতে চাও?'

'না, চাই না।'

'না-চাওয়াই ভালো। জিজ্ঞেস করার আসলে কিছু নাই। ভয় পাওয়া এই বাড়ির মানুষের একটা রোগ হয়ে গেছে।'

মিসির আলি উঠে দাঁড়ালেন। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় দেখা হল নাদিয়ার সঙ্গে। তিনি আজও টিয়াপাখি রঙের একটা শাড়ি পরেছেন। সবুজ রঙের প্রতি এই মেয়েটির খুব দুর্বলতা। নাদিয়া থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তদন্ত এগুচ্ছে?'

'হ্যাঁ, এগুচ্ছে।'

'আমার ফুপুর সঙ্গে কথা বলে এলেন?'

'হ্যাঁ। উনি আপনার কেমন ফুপু?'

'সম্পর্ক বেশ দূরের, তবে দূরের হলেও নিকট আত্মীয় বলতে উনিই আছেন।'

'আপনাকে খুব স্নেহ করেন বলে মনে হল।'

'তা করেন। বেশ স্নেহ করেন। উনি আবার খুব চমৎকার গল্প বলতে পারেন। আমি এত সুন্দর করে গল্প বলতে কাউকে শুনি নি। আপনার তদন্তের ঝামেলা শেষ হলে একবার ওঁর গল্প শুনে যাবেন।'

'তাঁর ছেলেটি সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?'

'আব্দুল মজিদের কথা বলছেন? বিরাট বোকা। সে বয়সে আমার বড়, কিন্তু প্রতি ঈদে সেজেগুজে এসে আমার পা ছুঁয়ে সালাম করবে। ও আপনার খাতির- যত্ন করছে তো? আপনার দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়েছি ওর ওপর।'

'ও যত্ন করছে। ভালোই যত্ন করছে।'

'বাড়াবাড়ি রকমের যত্ন দিয়ে সে যদি আপনাকে বিরক্ত করে আমাকে বলবেন। আমি ধমক দিয়ে দেব। ও নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে কিছু-কিছু কাজ করে, যা সহ্য করা যায় না। একবার কী করেছে শুনুন—কোত্থেকে এক মৌলানা সাহেবকে ধরে নিয়ে এসেছে। মৌলানা সাহেব নাকি দোয়া পড়ে এই বাড়ির জিন তাড়াবেন। লম্বা কোর্তা পরা মৌলানা। প্রতিটি বাথরুমে ঢুকছে আর কি দোয়া-কালাম পড়ছে। দেখুন তো কী অস্বস্তিকর অবস্থা! বাথরুম কি দোয়া পড়ার জায়গা? আচ্ছা যাই, পরে কথা হবে। আপনার তদন্ত শেষ হতে কতদিন লাগবে?'

'বেশিদিন লাগবে না। প্রায় শেষ করে এনেছি।'

'তদন্ত শেষ হলে আবার নিজের আস্তানায় ফিরে যাবেন?

'তা তো বটেই!'

নাদিয়া হাসতে-হাসতে বললেন, 'আপনি ইচ্ছা করলে কিন্তু তদন্ত শেষ হবার

পরেও আমার এখানে থেকে যেতে পারেন। আপনাকে কেন জানি না আমার পছন্দ হয়েছে। কী কারণে পছন্দ হয়েছে তা অবশ্যি আমি নিজেও ধরতে পারছি না।'

নাদিয়া সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলেন। মেয়েটির চেহারায় আচার-আচরণে মিসির আলি শোকের কোনো ছাপ দেখলেন না। পিতার মৃত্যুশোক সে কাটিয়ে উঠেছে। মনে হয় ভালোভাবেই কাটিয়েছে।

১০

গুলশান থানার ওসি বিরক্ত চোখে তাকিয়ে আছেন। তিনি তাঁর ওসি জীবনে এত বিরক্ত চোখে বোধহয় কারো দিকে তাকান নি। ওসি সাহেবের ঠিক সামনের চেয়ারে মিসির আলি বসে আছেন। মিসির আলি কয়েকবার খুব আন্তরিক ভঙ্গিতে ওসি সাহেবের দিকে তাকিয়ে হাসার চেষ্টা করলেন। ওসি সাহেব পাত্তা দিলেন না। পাত্তা দেবার কথাও না। মিসির আলি নামের এই মানুষটি তাঁর সারাটা দিন নষ্ট করেছে। সকাল ন'টার সময় এসেছে, এখন বাজছে একটা। যাবার নাম নেই। চুপচাপ চেয়ারে পা তুলে বসে আছে। ক্ষুধা-তৃষ্ণা কিছুই বোধ-হয় মানুষটির নেই।

ওসি সাহেব হাই তুলতে-তুলতে বললেন, 'আজ চলে যান মিসির আলি সাহেব। আজ আর হবে না। দীর্ঘদিন আগের ব্যাপার। পুরানো রেকর্ডপত্র কোথায় আছে কে জানে। সতের বছর তো অল্প সময় নয়।'

মিসির আলি বললেন, 'আমি বরং সন্ধ্যার দিকে একবার আসি।'

'সন্ধ্যার দিকে আসার দরকার নেই। সামনের সপ্তাহে খোঁজ নিয়ে যাবেন।'

'তথ্যটা জানা আমার খুব দরকার। সতের বছর আগে বাথরুমে অল্পবয়সী একটা ছেলে মারা গিয়েছিল। এই বিষয়ে থানায় কোনো জিডি এন্ট্রি করা হয়েছে কিনা, পোস্ট মার্টেম হয়েছে কি না, হয়ে থাকলে তার রিপোর্ট........'

ওসি সাহেব অসহিষ্ণু গলায় বললেন, 'মিসির আলি সাহেব, দেশটা বিলেত-আমেরিকা না—বাংলাদেশ। এই দেশে এক সপ্তাহ আগের জিনিসই পাওয়া যায় না। আপনি এসেছেন সতের বছর আগের ব্যাপার নিয়ে।'

'আমার খুব প্রয়োজন ছিল।'

'সতের বছর আগে কী ঘটেছিল তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। বর্তমানে কী ঘটছে তা নিয়ে মাথা ঘামান।'

'পাওয়া যাবে না বলছেন?'

'পাওয়া না-যাবারই কথা।'

'রেকর্ড নিশ্চয়ই কোথাও রাখা হয়।'

'তা রাখা হয়। ফাইলের গুদামে পড়ে থাকে। একসময় পোকায় কাটে। আমার ধারণা আপনি যে-রেকর্ডের কথা বলছেন তা এখন উই পোকার পেটে।'

'খুঁজে দেখবেন না?'

'উইপোকার পেট চিরে খুঁজতে বলছেন?'

'জ্বি-না—গুদামের কথা বলছি।'

'বললাম তো খোঁজা হচ্ছে।'

'তাহলে সন্ধ্যাবেলা একবার আসি?'

ওসি সাহেব হতাশ গলায় বললেন, 'আসুন। শুধু সন্ধ্যায় না। রাতে একবার আসুন। মাঝরাতেও আসুন।'

'আপনি মনে হচ্ছে আমার ওপর বিরক্ত হচ্ছেন।'

'হ্যাঁ, হচ্ছি। পুলিশে কাজ করি বলে কি বিরক্তও হতে পারব না? অনেক আজব চিড়িয়া আমি আমার পুলিশী জীবনে দেখেছি, আপনার মতো দেখি নি।'

'আপনার বিরক্তি উৎপাদন করেছি বলে দুঃখিত।'

'শুধু বিরক্তি না ভাই, আপনি আরো অনেক জিনিস উৎপাদন করেছেন। তার মধ্যে রাগও আছে। নেহায়েত হোম ডিপার্টমেন্টের চিঠি আছে বলে কিছু বলি নি।'

মিসির আলি হাসলেন। ওসি সাহেব তীব্রগলায় বললেন, 'হাসছেন কেন?'

মিসির আলি বললেন, 'আর হাসব না। তবে আমি আসব। সন্ধ্যা সাতটার দিকে আসব।'

১১

ডাক্তার মুসফেকুর রহমান, (এম.আর. সি. পি., প্রফেসর, পিজি হাসপাতাল) ওসি সাহেবের মতোই বিরক্ত চোখে তাকিয়ে আছেন। ডাক্তারদের সময়ের দাম আছে। সেই দামী সময়ের অংশ নিতান্ত অকারণে কাউকে দিয়ে দেওয়া যায় না। মুসফেকুর রহমান সাহেবের ধারণা, মিসির আলি নামের মানুষটি নিতান্ত অকারণে তাঁর সময় নিচ্ছে। তাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া উচিত, কিন্তু দেওয়া যাচ্ছে না। সভ্যসমাজের অনেক অভিশাপের মধ্যে একটা অভিশাপ হচ্ছে—যা করতে ইচ্ছা করে, তা করা যায় না।

ডাক্তার সাহেব বললেন, 'আপনাকে যা বলার তা তো বলেছি, তার পরেও বসে আছেন কেন?'

'এক্ষুণি চলে যাব। শুধু একটা জিনিস জানার বাকি, ওসমান গনি সাহেব কি কখনো কোনো সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে গিয়েছিলেন?'

'আমি জানি না। আর জানলেও আপনাকে বলতাম না। ডাক্তারদের কিছু এথিকেল কোড মানতে হয়। রুগীর রোগ সম্পর্কে অন্যকে কোনো তথ্য না-দেওয়া হচ্ছে তার মধ্যে একটি। কার কি অসুখ তা আমি অন্যদের বলব না।'

'কেন বলবেন না? ব্যাধি তো গোপন রাখার বিষয় নয়।'

'দেখুন মিসির আলি সাহেব, আমি বুঝতে পারছি আপনি মানুষটি তর্কে পটু। আমি আপনার সঙ্গে তর্কযুদ্ধে যেতে চাচ্ছি না। ওসমান গনি সাহেবের ব্যক্তিগত চিকিৎসক হিসেবে তাঁর সম্পর্কে আমি যা জানি তা আপনাকে বলেছি। এর বেশি কিছু জানি না।'

'শেষের দিকে তিনি কোনো ধরনের হেলুসিনেশনে ভুগছিলেন কি?'

'আমার জানা নেই।'

'একটু মনে করে দেখুন তো তিনি কি কখনো কথা প্রসঙ্গে আপনাকে বলেছেন যে

তিনি তীব্র ভয় পাচ্ছেন বা এই জাতীয় কিছু?'

'হ্যাঁ, তা বলেছেন। বাথরুমে ঢুকলে তিনি ফিসফিস করে কথা শুনতে পান—যেন কেউ তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করে। বাচ্চা ছেলের গলা। ছেলেটা তাঁর নাম ধরে ডাকত। দুঃস্বপ্ন দেখতেন। তিনি একবার জানতে চাইলেন কেন এ-রকম হচ্ছে।'

'উত্তরে আপনি তাঁকে কী বলেন?'

'আমি বলি যে অতিরিক্ত টেনশানে এ-রকম হতে পারে। আমি তাঁকে টেনশান কমাতে বলি। তাঁকে ঘুমের অষুধ দিই।'

'কী অষুধ দেন?'

'এটাও কি আপনার জানতে হবে?'

'হ্যাঁ, জানতে হবে।'

ডাক্তার সাহেব খসখস করে কাগজে অষুধের নাম লিখে মিসির আলির দিকে বাড়িয়ে দিলেন। শুকনো গলায় বললেন, 'এই অষুধটা দিই। আরো কিছু জানতে চান? এই অষুধ কীভাবে কাজ করে। কীভাবে নার্ভ শান্ত করে—এ-জাতীয় কিছু?'

'না, আর কিছু জানতে চাই না। আপনাকে যথেষ্ট বিরক্ত করা হয়েছে। ধন্যবাদ।'

মিসির আলি ঘর থেকে বেরুতে গিয়েও বেরুলেন না। আবার ফিরে এসে আগের জায়গায় বসলেন। ডাক্তার সাহেব কপাল কুঁচকে বললেন, 'কি হল?'

'একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছি। ওসমান গনি সাহেবের মেয়ে নাদিয়া গনি, সে কি কখনো তার বাবার মতো সমস্যা নিয়ে আপনার কাছে এসেছিল?'

'না, আসে নি। আপনার কথা কি শেষ হয়েছে?'

'জ্বি, শেষ হয়েছে।'

'শেষ হয়ে থাকলে দয়া করে যান। দরজার কাছ থেকে আবার ফিরে আসবেন না।'

১২

হোম মিনিস্টার সাহেব ফাইল থেকে মুখ না-তুলেই বললেন, 'কেমন আছেন মিসির আলি সাহেব?'

'জ্বি ভালো।'

'ভালো থাকলেই ভালো। বসুন। হাতের কাজ শেষ হতে সময় লাগবে। আপনার যা বলার—এর মধ্যেই বলতে হবে। আপনি আবার ভেবে বসবেন না, এটাও আমার একধরনের ভান। বেশি-বেশি কাজ দেখাচ্ছি . . . '

মিসির আলি বসলেন। মিনিস্টার সাহেব ফাইলে চোখ রেখে সহজ গলায় বললেন, 'খবরের কাগজ পড়েছেন?'

'জ্বি-না।'

'পড়লে একটা ইন্টারেস্টিং খবর দেখতে পেতেন। আমার মন্ত্রিত্ব চলে যাচ্ছে—অন্য একজন আসছেন।'

'সত্যি নাকি?'

'না, সত্যি না। কিন্তু আমাদের দেশের লোকজন খবরের কাগজে যা পড়ে তা-ই বিশ্বাস করে। সবাই ঘটনা সত্যি বলে ধরে নিয়েছে। যে-কারণে আজ আমার কাছে কোনো দর্শনার্থী নেই। অন্যদিন ওয়েটিং রুম মানুষে গিজগিজ করত। আজ শুধু আপনি এসেছেন। খবরের কাগজ পড়েন নি বলে এসেছেন। পড়লে হয়তো আসতেন না। এখন বলুন কি ব্যাপার।'

'একটা পুরানো জিডি এন্ট্রি আমার দেখা দরকার। থানার সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। তারা বলেছে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'কত দিনের পুরানো?'

'সতের বছর।'

'তাহলে না-পাওয়ারই সম্ভাবনা। তবু চেষ্টা করে দেখা যাবে। এখন বলুন, আপনার তদন্ত কতদূর? শুনেছি রোজ ভিলায় আছেন? সত্যি নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'খুবই ভালো। এখন বলুন, কিছু পেয়েছেন?'

'পেয়েছি।'

'এর মধ্যে পেয়েও গিয়েছেন। কী পেয়েছেন?'

'এটা যে হত্যাকাণ্ড এ-ব্যাপারে মোটামুটি নিশ্চিত হয়েছি।'

'বাহ্, ভেরি গুড। তাহলে হত্যাকারী কে বলে ফেলুন। শুনে দেখি চমকে উঠি কি না।'

'হত্যাকারী কে, তা এখনো জানি না।'

হোম মিনিস্টার ফাইল বন্ধ করে সিগারেট ধরাতে-ধরাতে বললেন, 'ছোটোবেলায় ডিটেকটিভ বই খুব পড়তাম—এখনো পড়ি। একটা খুন হয়। বাড়ির সবাইকে খুনী বলে সন্দেহ হতে থাকে। যার ওপর সন্দেহ সবচেয়ে কম হয়—দেখা যায় সে-ই খুনী। আপনি ঐ পদ্ধতি ব্যবহার করে দেখুন না কেন। এই মুহূর্তে কার ওপর আপনার সবচেয়ে কম সন্দেহ হচ্ছে?'

মিসির আলি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'এই মুহূর্তে সবচেয়ে কম সন্দেহ হচ্ছে আপনার ওপর।'

হোম মিনিস্টার তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, 'তার মানে? আপনি কি রসিকতা করার চেষ্টা করছেন?'

'জ্বি-না স্যার, আমি রসিকতা করার চেষ্টা করছি না। ওসমান গনির পরিবারের সঙ্গে আপনি পরোক্ষভাবে হলেও জড়িত। এই পরিবারের সঙ্গে আপনার স্বার্থ জড়িত।'

'ওসমান গনি আমার ছেলেবেলার বন্ধু। মাঝে-মাঝে ওর বাড়িতে গান শুনতে যেতাম। এর ভেতর স্বার্থ কী আছে?'

'আপনি আপনার মেজো ছেলেকে নাদিয়ার সঙ্গে বিয়ে দেবার চেষ্টা অনেকদিন থেকে করছেন। নাদিয়া রাজি হচ্ছে না বলেই বিয়েটা হচ্ছে না।'

'বন্ধুর কন্যার সঙ্গে ছেলের বিয়ে দেবার ইচ্ছা হওয়াটা কি দোষের কিছু?'

'মোটেই দোষের কিছু নয়, বরং এটাই স্বাভাবিক। আমি কিন্তু দোষের কিছু বলি নি। আমি শুধু বলেছি—এই পরিবারের সঙ্গে আপনার স্বার্থ জড়িত। পরোক্ষভাবে হলেও জড়িত। কাজেই এই পরিবারে একটা হত্যাকাণ্ড ঘটলে—আপনার কথাও ভাবা হবে।

আপনাকে বাইরে রাখা হবে না।'

'আমি যে নাদিয়ার সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ে দিতে চেয়েছি, এটা আপনাকে কে বলল? নাদিয়া?'

'জ্বি-না, সে বলে নি। নাদিয়ার সঙ্গে আমার কথাবার্তা খুব কমই হয়। সে বিব্রত বোধ করতে পারে বলে এই প্রশ্ন তাকে করি নি।'

'তাহলে আপনি কার কাছ থেকে এই তথ্য জানলেন?'

'এটা কি কোনো গোপন তথ্য যে, কেউ জানবে না? বিয়ের আলোচনা কেউ গোপনে করে না। তা ছাড়া আপনার ছেলেও তো অযোগ্য ছেলে না। খুবই যোগ্য ছেলে।'

'কী করে জানেন?'

'আমি আপনার ছেলের সঙ্গে কথা বলেছি।'

'আই সী। আপনি দেখি চষে ফেলছেন। গুড। চা খাবেন?'

'খেতে পারি।'

মিনিস্টার সাহেব চায়ের কথা বলে, মিসির আলির দিকে ঝুঁকে এসে নিচু গলায় বললেন, 'আপনার কথা সত্যি। আমার স্বার্থ আছে। ভুল বললাম, স্বার্থ একসময় ছিল, এখন নেই। একসময় আমার ছেলেকে বিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। ওসমান গনিকে অনেক অনুরোধ করেছি। সে কখনো হ্যাঁ বলে নি, আবার কখনো নাও বলে নি। আমার মধ্যে লোভ কাজ করেছে। ওসমান কোটিপতি। কিন্তু মিসির আলি সাহেব, সেই লোভ এখন আর নেই। লোভের চেয়ে বাস্তবতা এখন বেশি কাজ করছে। আমি এখন মোটামুটি নিশ্চিত যে, নাদিয়া নামের মেয়েটি পুরোপুরি উন্মাদ। মেয়েটা রাতে ঘুমায় না। বারান্দার এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত হাঁটে, আর খিলখিল করে হাসে। সিগারেট টানে। আপনি তো ঐ বাড়িতেই আছেন। আপনি লক্ষ করছেন না?'

'খিলখিল হাসি শুনি নি, তবে উনি রাত জাগেন তা সত্যি।'

'আমি সত্যি কথাই আপনাকে বললাম। তদন্ত করছেন, ভালোমতো করুন। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপও বের হয়ে যেতে পারে।'

চা চলে এল। মিসির আলি চায়ের কাপ হাতে নিলেন। মিনিস্টার সাহেব নিলেন না। রাগী-রাগী চোখে তিনি চায়ের কাপের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'মিসির আলি সাহেব।'

'জ্বি?'

'আপনার কি ধারণা নাদিয়া মেয়েটি কিছু করেছে?'

'এখনো বলতে পারছি না।'

'তার পক্ষে করা কি সম্ভব?'

'অসম্ভব কিছু না। সবই সম্ভব।'

'কেন সে এটা করবে?'

'মানসিকভাবে অসুস্থ হলেই করবে। তার মা'র কারণে একটা ছোট্ট বাচ্চা মারা গেছে। সেই থেকে মা'র ওপর তীব্র ঘৃণা জন্মাতে পারে। ঘৃণা এক পর্যায়ে ইনসেনিটিতে রূপ নিতে পারে। বলা হয়ে থাকে, নিতান্ত অপরিচিত একজনকে হত্যার চেয়ে পরিচিত একজনকে হত্যা অনেক সহজ।'

'কেন?'

'ঘৃণা ব্যাপারটি অপরিচিত কারো প্রতি থাকে না, কিন্তু পরিচিত জনের প্রতি থাকে।'

মিনিস্টার সাহেব বললেন, 'আমার ধারণা মেয়েটি কিছু করে নি, কিন্তু আমার স্ত্রীর ধারণা, করেছে। আমার স্ত্রীর ধারণা, এই মেয়ে পিশাচ ধরনের। একে বৌ করে আনলে আমরা সবাই মারা পড়ব।'

মিসির আলি বললেন, 'স্যার, আজ উঠি।'

মিনিস্টার সাহেব ক্ষীণ গলায় বললেন, 'আচ্ছা।'

১৩

রাত এগারটায় নিয়মমতো মিসির আলি বিছানায় ঘুমুতে গেলেন। এ-বাড়িতে এসে খুব অনিয়ম হচ্ছে। রোজ ঘুমুতে দেরি হচ্ছে। সকালের মর্নিং-ওয়াক করা হচ্ছে না। মিসির আলির পরিকল্পনা হল, আজ থেকে আবার আগের নিয়মে ফিরে যাবেন।

বিছানায় শুয়ে হাতের কাছে রাখা টেবিল ল্যাম্প জ্বালালেন। কিছুক্ষণ কোনো-একটা বই পড়ে চোখ ক্লান্ত করবেন—এতে চট করে ঘুম চলে আসে। মিসির আলির হাতের বইটির নাম GhostGirl, লেখিকা বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ টোরি হেডেন। বইটি লেখা হয়েছে ন' বছর বয়সী এক মেয়ে 'জেডি'কে নিয়ে। অসম্ভব রূপবতী এই বালিকা মানসিক প্রতিবন্ধী স্কুলে তাঁর ছাত্রী ছিল। মেয়েটি পড়াশোনায় খুব ভালো ছিল, কিন্তু কখনো কথা বলত না। তার শারীরিক কোনো অসুবিধা ছিল না, তবু সে থাকত কুঁজো হয়ে। যদিও সোজা হয়ে দাঁড়ানো তার জন্যে কোনো সমস্যা নয়।

মনস্তত্ত্ববিদ টোরি হেডেন এই আশ্চর্য মেয়েটির কথা ডিটেকটিভ উপন্যাসের চেয়েও রোমাঞ্চকর ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন। মেয়েটির মনের ভেতরকার গোপন অন্ধকার এক-এক করে আলোতে বের করে নিয়ে এসেছেন। মিসির আলি দু' শ' পৃষ্ঠা পর্যন্ত একটানা পড়ে ঘড়ির দিকে তাকালেন, রাত বাজছে তিনটা। আরো তিরিশ পৃষ্ঠা বাকি আছে। এখন শুয়ে পড়া উচিত। কিন্তু বইটি শেষ না-করে ঘুমুতে যেতে তাঁর ইচ্ছা করল না।

আব্দুল মজিদ ফ্লাস্কে করে চা রেখে গেছে। তিনি এক কাপ চা এবং পরপর দু'টি সিগারেট খেলেন। সিগারেট খেতে-খেতে 'জেডি' নামে মেয়েটির কথা ভেবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। তাঁর মনে হল, এ-জাতীয় মানসিক প্রতিবন্ধী বাংলাদেশেও আছে। কিন্তু তাদের সাহায্য করার জন্যে টোরি হেডেনের মতো প্রতিভাবান এবং নিবেদিত মনস্তাত্ত্বিক নেই।

মিসির আলি আবার বই পড়া শুরু করার আগে বাথরুমে ঢুকলেন। আব্দুল মজিদ বারবার করে বলেছে গভীর রাতে বাথরুমে গেলে যেন দরজা কখনোই বন্ধ না-করা হয়।

মিসির আলি দরজা বন্ধ করলেন। কেন জানি তাঁর একটু ভয় লাগল। সম্ভবত Ghost Girl পড়ার কারণে এটা হয়েছে। সাময়িকভাবে হলেও ভয়ের একটা বীজ

মনের গভীরে ঢুকে গেছে। চোখে-মুখে পানি দেবার জন্যে ট্যাপ খুললেন—আশ্চর্য ব্যাপার, ট্যাপে এক ফোঁটা পানি নেই। চোখ-মুখ জ্বালা করছে। মুখে পানির ঝাপটা দেওয়া দরকার। তাঁর ঘরে বোতলে পানি আছে। ঐ পানি নিয়ে আসা যায়। মিসির আলি বাথরুমের দরজা খুলতে গিয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হলেন। দরজা খোলা যাচ্ছে না। দরজা বন্ধ। পরপর দু'বার চেষ্টা করলেন। নব ঘোরানোই যাচ্ছে না। আশ্চর্য তো! ফুলের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। হালকা গন্ধ, কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে।

তিনি নব ছেড়ে দিয়ে দরজা থেকে সরে দাঁড়ালেন। তাঁকে খানিকটা ভীত বলে মনে হল। তিনি নিঃশব্দে বাথরুমের অন্য প্রান্তে সরে গেলেন। এবং ছোট শিশুদের মতো হাঁটু গেড়ে বসে গেলেন। আর তখনি বাথরুমের বাতি নিভে গেল। ঘর হল নিকষ অন্ধকার। এত অন্ধকার মিসির আলি এর আগে কখনো দেখেন নি। আলোর ক্ষীণ রেখা সব অন্ধকারেই থাকে—কিন্তু বাথরুমে তাও নেই। তাঁর শরীর কাঁপছে, বুক ধড়ফড় করছে। এগুলি আর কিছুই না, সেন্স ডিপ্রাইভেশনের ফলাফল। কেউ হঠাৎ অন্ধ হয়ে গেলে ভয়াবহ মানসিক আঘাতের সম্মুখীন হয়। তাঁরও তাই হচ্ছে। চোখ থেকেও কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না।

মিসির আলি বসে আছেন চুপচাপ। তাঁর পকেটে সিগারেটের প্যাকেট এবং দিয়াশলাই আছে। ইচ্ছা করলেই তিনি দিয়াশলাই জ্বালাতে পারেন। জ্বালালেন না, বরং উবু হয়ে একটা বড় ধরনের কোনো ঘটনার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। সেই ঘটনা ঘটল। তিনি পরিষ্কার শুনলেন, ঠিক তাঁর কানের কাছে শিশুদের মতো গলায় কে-একজন ডাকল, 'মিসির আলি। এই মিসির আলি।'

জবাব দেবার ইচ্ছা প্রাণপণে দমন করে তিনি পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে রইলেন—একচুলও নড়লেন না। আবারো সেই অশরীরী শব্দ হল। বাথরুমের ভেতরে আবারো বালক-কণ্ঠে কে যেন বলল, 'মিসির আলি, তুমি কোথায়? তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?'

একটু হাসির শব্দও যেন পাওয়া গেল। তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দ। মিসির আলি নিজেকে আরো ছোট করে বসে রইলেন আগের জায়গায়। তিনি যে- ভঙ্গিতে গুটিসুটি মেরে বসেছেন, তাকে বলে Mother's womb position. মায়ের পেটে শিশুরা এইভাবেই থাকে। বসে থাকার এই ভঙ্গিটি ভয় কাটাতে সাহায্য করে। কারণ মায়ের জরায়ু এমন এক স্থান, যেখানে ভয়ের কোনো স্থান নেই। শিশুর জন্যে এই পৃথিবীর সবচেয়ে নিরাপদ স্থান। ভয় পেলেই এই জায়গাটার জন্যে মানুষের মনে এক ধরনের ব্যাকুলতা জাগে।

মিসির আলি ভয় কাটানোর প্রচলিত পদ্ধতিগুলি নিয়ে দ্রুত ভাবছেন। ভয় কাটানোর সর্বজনস্বীকৃত পদ্ধতি হচ্ছে নগ্ন হয়ে যাওয়া। বলা হয়ে থাকে—ভৌতিক কোনো কারণে ভয় পেলে নগ্ন হওয়ামাত্র ভয় অর্ধেক কমে যায়। এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কী হতে পারে? মিসির আলির মাথায় আসছে না। মায়ের পেটে আমরা নগ্ন হয়ে ছিলাম, এই কি ব্যাখ্যা? এটা নিয়ে এক সময় ভাবতে হবে।

ভয় কাটানোর আরেকটি পদ্ধতি হল বড়-বড় নিঃশ্বাস নেওয়া। এই পদ্ধতির পেছনে বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে—বড়-বড় নিঃশ্বাস নেবার অর্থ বেশি করে অক্সিজেন নেওয়া। শরীরে বেশি অক্সিজেন যাওয়া মানে মস্তিষ্কে বেশি অক্সিজেন যাওয়া।

তীব্র পিপাসা হচ্ছে। বুক-মুখ শুকিয়ে কাঠ। এত ভয় পাচ্ছেন কেন? বন্ধ ঘর। অশরীরী কণ্ঠ। ফুলের গন্ধ—জমাট অন্ধকার—এর বাইরেও কি কিছু আছে?

মিসির আলি নিজের নাড়ি ধরলেন। নাড়ি খুব দ্রুত চলছে। কত দ্রুত তা অবশ্যি তিনি ধরতে পারছেন না। সঙ্গে ঘড়ি নেই। মনে হচ্ছে বাথরুমের এই অন্ধকার ঘরে সময় আটকে গেছে। কখনো বোধ হয় ভোর হবে না। আইনস্টাইনের থিওরি অব রিলেটিভিটি। সময় শ্লথ হয়ে গেছে। ভোর হতে কত বাকি?

এক সময় সামান্য আলোর আভা দেখা গেল। ভোর বোধহয় হচ্ছে। মিসির আলি বাথরুমের দরজায় হাত রাখলেন। দরজা খুলে গেল। তাঁর ঘরের দরজা বন্ধ। দরজা খুলে তিনি বাইরে এলেন। আকাশ ফরসা হলেও চারদিক এখনো অন্ধকার। এই অন্ধকারে সবুজ শাড়ি পরে নাদিয়া ঘুরছেন। মিসির আলিকে দেখে তিনি খুশি-খুশি গলায় বললেন, 'আরে, আপনি কি রোজ এত ভোরে ওঠেন?'

মিসির আলি সিগারেট ধরাতে-ধরাতে বললেন, 'রোজ উঠি না, আজ উঠলাম।'

'ভেরি গুড। আসুন, একসঙ্গে খানিকক্ষণ হাঁটি। চা দিতে বলেছি। চা খেতে-খেতে হাঁটার মধ্যে অন্য এক ধরনের আনন্দ আছে।'

মিসির আলি বাগানে নেমে এসে বললেন, 'আমি আজ চলে যাব। আপনার বাড়িতে বেশ আনন্দে সময় কেটেছে। আপনাকে ধন্যবাদ।'

নাদিয়া ভুরু কুঁচকে বললেন, 'আজ চলে যাবেন মানে? আপনি কি সমস্যার সমাধান করেছেন?'

'হ্যাঁ, করেছি। আপনি সকালে নাশতা খাবার সময় এ-বাড়িতে যারা উপস্থিত আছে সবাইকে ডাকুন, আমি সবার সামনে ব্যাখ্যা করব।'

'সবার সামনে ব্যাখ্যা করার দরকার কী? আমাকে বলুন।'

'আমি সবার সামনেই বলতে চাই।'

নাদিয়া কিছুক্ষণ স্থির চোখে মিসির আলির দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললেন। মিসির আলিও হাসলেন।

মেয়েটি আজও সবুজ শাড়ি পরেছে। মেয়েটি বোধহয় কালার-ব্লাইন্ড। একমাত্র কালার-ব্লাইন্ডদেরই বিশেষ কোনো রঙের প্রতি দুর্বলতা থাকে। মিসির আলি বললেন, 'রবীন্দ্রনাথ যে কালার-ব্লাইন্ড ছিলেন তা কি আপনি জানেন?'

'না, জানি না। আপনার কাছে প্রথম শুনলাম।'

'রবীন্দ্রনাথ ছিলেন কালার-ব্লাইন্ড। তিনি সবুজ রঙ দেখতে পেতেন না।'

নাদিয়া বললেন, 'তাতে তাঁর সাহিত্যের বা গানের কোনো ক্ষতি হয় নি। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আপনি হঠাৎ করে কালার-ব্লাইন্ডের প্রশ্ন তুললেন কেন?'

'এম্নি তুললাম। কোনো কারণ নেই।'

'আপনি কি সত্যি-সত্যি রহস্যের মীমাংসা করেছেন?'

'মনে হয় করেছি।'

'মনে হয় বলছেন কেন? আপনি কি নিশ্চিত না?'

'না। প্রকৃতি মানুষকে Truth-কে স্পর্শ করার অনুমতি দিয়েছে, কিন্তু Absolutetruth-কে স্পর্শ করার অনুমতি দেয় নি। ঐটি প্রকৃতির রাজত্ব। মানুষের সেখানে প্রবেশাধিকার নেই।'

১৪

বাড়ির সবাই এসেছে।

মিসির আলি তাদের চোখে মুখে কৌতূহল এবং সেইসঙ্গে চাপা উদ্বেগ লক্ষ্য করলেন। সবচেয়ে বেশি চিন্তিত মনে হচ্ছে সাফকাতকে। সে রীতিমতো ঘামছে। ঘন-ঘন ঢোক গিলছে। মিসির আলি কীভাবে শুরু করবেন বুঝতে পারছেন না। নাদিয়া বললেন, 'বলুন কি বলবেন। চুপ করে আছেন কেন?'

মিসির আলি সিগারেট ধরালেন। সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে খানিকক্ষণ কেশে গলা পরিষ্কার করে শুরু করলেন—

'কাল রাতে আমি প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিলাম। আমার বাথরুমের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বাতি নিভে গিয়েছিল। আমি অশরীরী একটি কণ্ঠ শুনলাম। একটা বাচ্চা ছেলে—আমার নাম ধরে ডাকল। ফুলের গন্ধ পেলাম। আপনারা বুঝতেই পারছেন, ভয়াবহ ব্যাপার। আমি আতঙ্কে অস্থির হয়ে গেলাম। অথচ মজার ব্যাপার হচ্ছে, আমি কিন্তু এ-জাতীয় একটি পরিস্থিতির জন্যে মনে-মনে তৈরি ছিলাম। আমি জানতাম একদিন-না-একদিন এ-রকম ঘটনা আমার ক্ষেত্রে ঘটবে। দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। বাতি নিভে যাবে। গলার আওয়াজ শুনব। ফুলের গন্ধ পাব। আমি খুব ভালোমতো জানতাম, পুরো ব্যাপারটা সাজানো। তার পরেও আমি প্রচণ্ড ভয় পেয়েছি।....

'আমি আমার নিজের ভয় থেকেই বুঝতে পারছি, ওসমান গনি সাহেব এবং তাঁর স্ত্রী কী পরিমাণ ভয় পেয়েছেন। তাঁর স্ত্রী সম্পর্কে আমি নিশ্চিত নই, কিন্তু আমি নিশ্চিত যে, ওসমান গনি সাহেবকে এই অবস্থার ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছিল। আমার ধারণা, তিনি আমার চেয়ে হাজার গুণ বেশি ভয় পেয়েছেন। কারণ তিনি জানেন না যে পুরো ব্যাপারটা সাজানো। তিনি ধরেই নিয়েছেন যা ঘটছে সবই সত্যি। একটা ভয়ংকর ভৌতিক কাণ্ড তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। এর সঙ্গে তিনি জড়িয়েছেন একটি শিশুর অপমৃত্যু।'

নাদিয়া মিসির আলিকে থামিয়ে দিয়ে তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, 'সাজানো ঘটনা কেন বলছেন? সাজানো ঘটনা বলার পিছনে আপনার যুক্তি কী?'

'যুক্তির অংশে যাবার আগে আপনি আমার কিছু প্রশ্নের জবাব দিন। আপনার বাবার মৃত্যু হয়েছিল বাথটাবে, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'কতটুকু পানি ছিল বাথটাবে?'

'অল্প পানি ছিল।'

'আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে—ঐ রাতে কলে পানি ছিল না?'

'আমার তেমন কিছু মনে পড়ছে না। পানি আছে কি না তা নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো মনের অবস্থা আমার ছিল না।'

মিসির আলি সিগারেট ধরাতে-ধরাতে বললেন, 'পানি না-থাকাটাই কিন্তু স্বাভাবিক। পানি থাকলে বাথটাব পানিতে পূর্ণ হয়ে যেত। দরজা ভেঙে বাথরুমে ঢুকলে আপনি দেখতেন তখনো কল দিয়ে পানি পড়ছে। আপনি নিশ্চয়ই তা দেখেন নি?'

নাদিয়া বললেন, 'আমি এত কিছু লক্ষ করি নি। তবে বাথরুমে ঢুকে আমি কল

দিয়ে পানি পড়তে দেখি নি। বাথরুমে পানি ছিল কি ছিল না, তা এত জরুরি কেন?'

'জরুরি কেন, বলছি।..........

'এক-এক করে বলি। ছোটবেলায় আমরা একধরনের খেলা খেলতাম। খেলার নাম 'টক্কা খেলা'। পেঁপে গাছের পাতা দিয়ে খেলাটা খেলা হত। পেঁপে গাছের পাতার লম্বা ডাঁটাটা ফাঁপা। সেই ফাঁপা ডাঁটায় মুখ লাগিয়ে একজনের কানের কাছে ডাঁটার অন্য প্রান্ত নিয়ে বিকট চিৎকার করা—''টক্কা টক্কা''। এই হচ্ছে টক্কা খেলা। শব্দ শুনে কানে তালা লেগে যেত।..........

'পেঁপে পাতার ডাঁটা না নিয়ে একটা লম্বা নল যদি নেওয়া হয়, সেই নলে মুখ লাগিয়ে কেউ কথা বললে, নলের অন্য প্রান্তে যে আছে সে কথা শুনবে। শব্দ প্রবাহিত হয় বায়ুর মাধ্যমে। নলের ভেতর আছে বায়ু।..........

'এখন দেখা যাক বাথরুমে কী ঘটেছে। আমার নিজের অভিজ্ঞতা বলি—দরজা আটকে যাবার কিছুক্ষণ পর আমি ঠিক আমার কানের কাছে একটা বাচ্চা ছেলের গলা শুনলাম। ভয়ংকর ব্যাপার তো বটেই। তবে ঘটনা কিন্তু সহজ। এক ধরনের টক্কা খেলা।'

নাদিয়া তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, 'টক্কা খেলা মানে?'

মিসির আলি বললেন, 'বাচ্চা ছেলের প্রেতাত্মা আমার সঙ্গে কথা বলে নি। প্রেতাত্মা সেজে অন্য কেউ কথা বলেছে—খুব সম্ভব একটি মেয়ে কথা বলেছে। মেয়েদের গলার স্বর বাচ্চাদের মতো হাই পিচের হয়ে থাকে। সে কথা বলেছে অন্য কোনো বাথরুমে বসে। বাথরুমের পানির ট্যাপের কাছে মুখ নিয়ে। যেহেতু নলে কোনো পানি নেই, ফাঁপা নল, সেহেতু টক্কা খেলার মতোই শব্দ ভেসে এসেছে আমার বাথরুমে। এই হল ব্যাপার।'

নাদিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন, 'মিসির আলি সাহেব, পানির ট্যাংক ভর্তি থাকে পানিতে। পানির ট্যাপ পুরোপুরি পানিশূন্য হতে হলে ট্যাংক খালি হতে হবে।'

'তা ঠিক। কিন্তু আমার ধারণা ট্যাংক থেকে যে পাইপ এসেছে সেই পাইপে স্টপার আছে। অর্থাৎ ট্যাংক ভর্তি রেখেও স্টপার আটকে দিয়ে পানির পাইপ খালি করা যায়। যে-কোনো একটা ট্যাপ খুলে রাখলেই পাইপের সব পানি বের হয়ে আসবে।'

সাফকাত বলল, 'স্যার ঠিক কথাই বলেছেন। পাইপের মুখে একটা চাবি আছে। আমার মনে আছে, ঐ রাতে পানি ছিল না। আমি চাবিতে গণ্ডগোল আছে কি না দেখার জন্যে ছাদে গিয়েছিলাম।'

মিসির আলি বললেন, 'এখন আপনারা বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা করা হচ্ছে ভয় দেখানোর জন্যে। এমন ভয়, যেন সেই ভয়ে হৃৎস্পন্দন থেমে যায়। বাথরুমের দরজা বন্ধ করা খুব সহজ। বাইরে থেকে কেউ খুব শক্ত হাতে নবটা চেপে ধরলেই হবে।'

সাফকাত বলল, 'স্যার, কিছু মনে করবেন না—আপনার ঘরের ব্যাপারটা ধরুন। আপনার বাথরুমের নব চেপে ধরতে হলে আপনার শোবার ঘরে ঢুকতে হবে। কিন্তু আপনার শোবার ঘর ছিল তালাবন্ধ।'

'হ্যাঁ, তালাবন্ধ ছিল। কিন্তু সাফকাত সাহেব, আপনি ভুলে যাচ্ছেন কেন—এ-বাড়ির প্রতিটি বন্ধ দরজা চাবি দিয়ে বাইরে থেকে খোলা যায়। কাজেই এমন কেউ

আমার ঘরে ঢুকেছে যার কাছে আছে চাবির গোছা। আমি যতদূর জানি এ-বাড়িতে দু' সেট চাবি আছে। এক সেট আছে নাদিয়া গনির কাছে। অন্য সেট থাকে মিউজিক লাইব্রেরি ঘরের ড্রয়ারে।..........

কেউ একজন চাবি দিয়ে দরজা খুলে আমার ঘরে ঢুকেছে। এক হাত দিয়ে চেপে ধরেছে আমার বাথরুমের নব। অন্য হাতে বাথরুমের সুইচ নিভিয়ে দিয়েছে। আপনারা হয়তো লক্ষ করেছেন, এ-বাড়ির প্রতিটি বাথরুমের সুইচ বাইরে। কাজেই যে ভয় পাওয়াতে চাচ্ছে, তার জন্যে খুব সুবিধা হয়ে গেল।..........

বুঝতেই পারছেন—ভয় দেখানোর এই ভয়ংকর খেলা একজনের পক্ষে সম্ভব নয়। খুব কম করে হলেও দু' জনের টীম দরকার। খুব ভালো টীমওয়ার্ক ছাড়া এ-কাজ হবে না। একজন বাথরুমের দরজার নব চেপে ধরে থাকবে, অন্যজন অন্য কোনো বাথরুমের ট্যাপে মুখ লাগিয়ে কথা বলবে।..........

আপনাদের আমি আগেই বলেছি, আমাকেও যে ভয় দেখানো হবে সে বিষয়ে আমি পুরোপুরি নিশ্চিত ছিলাম এবং মনে-মনে তার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। মানসিক প্রস্তুতি ছাড়াও অন্য ধরনের প্রস্তুতিও আমার মধ্যে ছিল। রাতের বেলা আমি যতবার বাথরুমে যেতাম ততবারই বাথরুমের বাইরের নবে কয়েক ফোঁটা সিলভার নাইট্রেটের দ্রবণ দিয়ে রাখতাম। দ্রবণটা পানির মতো বর্ণহীন, দু'-এক ফোঁটা দ্রবণে নবটা ভেজা-ভেজা থাকত। বাথরুমের নব ভেজা থাকা কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। যে ভয় দেখাতে আসছে, সে কোনো কিছু না-ভেবেই নবে হাত দেবে। সঙ্গে-সঙ্গে তার হাতে দাগ পড়ে যাবে। সিলভার নাইট্রেটের দাগ কঠিন দাগ। সপ্তাহখানেক থাকবেই। আমি আরো একটি জিনিস করেছি। বাথরুমের দরজার সামনে যে দাঁড়াবে, তার পায়ের ছাপ যেন ভালোমতো পড়ে তার ব্যবস্থা করেছি।..........

কেড্‌স জুতোর ছাপ আমার বাথরুমের দরজার সামনে আপনারা দেখতে পাবেন। জুতোর নাম্বার হচ্ছে বার। আব্দুল মজিদ এই জাতীয় জুতো পরে। আব্দুল মজিদ যদি তার হাত খোলে তাহলে সেখানে আমরা সিলভার নাইট্রেটের দাগ দেখতে পাব বলেই আমার ধারণা।'

কেউ কোনো কথা বলছে না। সবাই স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। শুধু সালেহার চোখ ভেজা। চোখে গভীর বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আছে মজিদের দিকে। আব্দুল মজিদের দু' হাত মুঠিবন্ধ। সে বসে আছে মাথা নিচু করে। সে কারো দিকেই তাকাচ্ছে না।

মিসির আলি আব্দুল মজিদকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে নিজের মনে কথা বলে যেতে লাগলেন।

'ফুলের গন্ধের ব্যাপারটা আপনাদের বলি। আমি ফুলের গন্ধ পেয়েছিলাম। এটা আসলে ছিল জর্দার গন্ধ, আসত আব্দুল মজিদের মুখ থেকে। জর্দা খাওয়ার কারণে সে সব সময় মুখে জর্দার গন্ধ নিয়ে বেড়ায়, নিজে তা বুঝতে পারে না। কারণ এই গন্ধে সে অভ্যস্ত। আব্দুল মজিদের ওপর সন্দেহ হবার আরেকটি কারণ হচ্ছে, সে একসময় রানা কনস্ট্রাকশানে প্লামিং মিস্ত্রি হিসেবে কাজ করেছে। কাজেই শূন্য নলের ভেতর শব্দ পরিচালনার ব্যাপার সে জানত। জানা বিদ্যাই সে ব্যবহার করেছে।..........

এখন আসা যাক হত্যাকাণ্ডগুলি কীভাবে করা হল। প্রথম হত্যা—নাদিয়ার মা'র মৃত্যুর জন্যে আব্দুল মজিদ এবং তার মা দায়ী নয় বলেই আমার বিশ্বাস। শিশুটি মারা

যাবার পর এই মহিলা মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তীব্র অপরাধবোধের কারণে বাথরুমে গেলেই তাঁর মনে হত বাথরুমের দরজা বোধ– হয় আর খুলবে না। এগুলি আমার অনুমান। ভয় পেয়ে হার্টফেল করে তিনি বাথরুমে মারা যান। ওসমান গনিকে হত্যার জন্যে আব্দুল মজিদ এবং তার মা এই ব্যাপারটি সুন্দর করে ব্যবহার করে। সুযোগ পেলেই তারা ভয় দেখাতে থাকে। বাড়িতে ভয়ংকর এক আবহাওয়াও তারা তৈরি করে। সবাইকেই ভয় দেখায়, যাতে করে সবার মনে এক সময় এই ধারণা হয় যে বাড়িতে ভৌতিক কিছু আছে। এটা আর কিছুই না, পরিবেশ তৈরি করা। মজিদ আশা করতে থাকে ওসমান গনির স্ত্রী যেভাবে মারা গেছেন—ওসমান গনিও সেইভাবে মারা যাবেন। ভয় পেয়ে হার্টফেল করবেন। তাই হয়। সুন্দর একটি হত্যাকাণ্ড ঘটে যায়। সুন্দর এই কারণে যে, হত্যাকারী হত্যা করে অনেক দূর থেকে। প্রচলিত আইনে এ–জাতীয় হত্যাকারীর বিচার আমার ধারণায় সম্ভব নয়।..........

এখন হত্যার মোটিভে আসি। মোটিভ জটিল নয়, সহজ। পরিবারের তিন সদস্যের দু' জন শেষ, একজন বাকি। সেই একজন শেষ হলে—বিপুল সম্পত্তি চলে যাবে আব্দুল মজিদ এবং তার মার হাতে। কারণ এরাই ওসমান গনির নিকট আত্মীয়। আমার যা বলার আমি বলেছি। আপনাদের কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন।'

কেউ কোনো প্রশ্ন করল না। মিসির আলি উঠে দাঁড়াতে–দাঁড়াতে বললেন, 'আমি আমার নিজের আস্তানায় চলে যাব। আমার কাজ শেষ। নাদিয়া, আপনি কি আপনার ড্রাইভারকে একটু বলে দেবেন আমাকে পৌঁছে দিতে?'

নাদিয়া পাথরের মতো মুখ করে বসে আছেন। মনে হচ্ছে না, মিসির আলির কোনো কথা তিনি শুনতে পেয়েছেন। মিসির আলি আব্দুল মজিদের মা'র দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার একটি কথা আমার খুব ভালো লেগেছে। আপনি বলেছিলেন, "আল্লাহ্ বলেন, নিয়তিকে গালি দিও না, কারণ আমিই নিয়তি।" এটা কোথায় আছে বলুন তো? কোন সূরা?'

বৃদ্ধা জবাব দিলেন না। স্থির চোখে মিসির আলির দিকে তাকিয়ে রইলেন। মিসির আলি বললেন, 'নাদিয়া বলছিলেন, আপনি নাকি খুব সুন্দর গল্প বলতে পারেন। আমার খুব ইচ্ছা একদিন এসে আপনার গল্প শুনি। যদি অনুমতি দেন একদিন এসে আপনার গল্প শুনব। আচ্ছা, আজ তাহলে যাই।'

গাড়ি মিসির আলিকে নিয়ে রওনা হয়েছে। তিনি আশা করেছিলেন, এ–বাড়ি ছেড়ে রওনা হবার সময় নাদিয়া এসে বিদায় দেবেন। কিছু বলবেন। নাদিয়া দোতলা থেকে নিচে নামেন নি। বাড়ি ছেড়ে যাবার সময় এই মেয়েটির সুন্দর মুখ আরেক বার দেখতে ইচ্ছা করছিল। জানতে ইচ্ছা করছিল সবুজ শাড়ি এই মেয়েটির এত প্রিয় কেন। জানা গেল না।

মিসির আলি খুব ক্লান্ত বোধ করছেন। তাঁর অনেক দিনের সাথী 'তীব্র মাথার যন্ত্রণা' আবার ফিরে এসেছে। চোখ জ্বালা করছে। তাকিয়ে থাকতে পারছেন না। গাড়ির সীটে হেলান দিয়ে তিনি চোখ বন্ধ করে আছেন। রহস্যের জট খোলার মধ্যে তীব্র আনন্দ আছে। সেই আনন্দ তিনি পাচ্ছেন না। কারণ রহস্যের একটি অংশের জট তিনি খুলতে পারেন নি। একটি অংশ এখনো অমীমাংসিত। অম্বিকাবাবু কেন তাঁকে এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়ালেন? তিনি কি আগাম জানতেন এমন কিছু ঘটতে যাচ্ছে? যদি

জানতেন, তাহলে কীভাবে জেনেছেন? ওসমান গনির কথাবার্তা থেকে আঁচ করেছিলেন? তিনি কখনো ওসমান গনির বাসায় যেতেন না। দূর থেকে এত বড় একটি ঘটনা আঁচ করা কি সম্ভব? তাহলে কি তাঁর জ্যোতিষ শাস্ত্র তাঁকে সাহায্য করেছে? তা হয় না। জ্যোতিষ শাস্ত্র বলে কিছু নেই।

অম্বিকাবাবু কেন ওসমান গনির বাড়িতে কখনো যেতেন না? মিসির আলির মনে ক্ষীণ সন্দেহ—হয়তো-বা ওসমান গনির পালক পুত্রটি অম্বিকাবাবুর। তিনি তাঁর নিজের ছেলেকে এদের হাতে তুলে দেন। তা যদি হয়, তাহলে অম্বিকাবাবুর ওসমান গনির বাড়িতে না-যাওয়ার একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করানো যায়। ব্যাখ্যাটি পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য নয়। অম্বিকাবাবু কেন তাঁর ছেলেকে দিয়ে দেবেন? এ-জাতীয় ঘটনা দরিদ্রদের মধ্যে ঘটে। অম্বিকাবাবু হতদরিদ্রের মধ্যে পড়েন না। তিনি একজন স্কুল শিক্ষক। তাছাড়া পুত্রের স্থান হিন্দু সমাজে অনেক ওপরে। মুখাগ্নিতে পুত্রের প্রয়োজন। মৃত্যুর পর পুত্রহীন পিতামাতার স্থান হয় পুন্নম নরকে। এমন অবস্থায় কেউ তার নিজের ছেলেকে দিয়ে দেবে, তা বিশ্বাস্য নয়। মিসির আলি আশা করেছিলেন গুলশান থানার ওসি সাহেব এ-ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করবেন। ছেলেটির অপঘাত মৃত্যুর পর নিশ্চয়ই থানায় জিডি এন্ট্রি করা হয়েছিল। সেখানে ছেলেটির সত্যিকার বাবার নাম থাকার কথা। কিন্তু ওসি সাহেব কোনো সাহায্য করতে পারেন নি। সতের বছরের পুরানো কাগজপত্র জোগাড় করা যায় নি। তবে এই রহস্যের সমাধান তেমন জটিল নয়। অম্বিকাবাবু এবং তাঁর কন্যাকে জিজ্ঞেস করলেই জানা যাবে। এমনও হতে পারে অম্বিকাবাবুর পুত্রের যখন ছ'মাস বয়স তখন তাঁর স্ত্রী মারা যান। ছোট্ট শিশুটিকে নিয়ে অম্বিকাবাবু খুবই বিব্রত বোধ করতে থাকেন ......অতসীকে জিজ্ঞেস করলেই তো জানা যাবে কবে তার মা মারা গিয়েছেন। মিসির আলির কেন জানি জানতে ইচ্ছা করছে না। থাকুক না কিছু রহস্য অমীমাংসিত। প্রকৃতি সব রহস্য মানুষকে জানাতে চায় না। কিছু নিজের কাছে লুকিয়ে রাখতে চায়। থাকুক না সেই সব রহস্য লুকানো। সব জানতেই হবে এমন কোনো কথা আছে?

সারা রাতের অনিদ্রা এবং ক্লান্তির কারণেই হয়তো-বা মিসির আলির তন্দ্রার মতো হল। তন্দ্রার মধ্যেই তিনি একটা স্বপ্ন দেখলেন। স্বপ্নে সাত-আট বছরের একটি বালককে দেখা গেল। বালকটি ছুটতে-ছুটতে তাঁর কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করল। মিসির আলি বললেন, 'কিছু বলবে খোকা?' ছেলেটি না-সূচক মাথা নাড়ল। স্বপ্নের মধ্যেই মিসির আলির মনে হল—এই সেই ছেলে—যে বাথরুমে কঠিন মৃত্যুকে গ্রহণ করেছে।

মিসির আলি বললেন, 'তুমি বাথরুমে মারা গিয়েছিলে, তাই না খোকা?'

ছেলেটি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

'বুঝলে খোকা—এ হচ্ছে নিয়তি। নিয়তিকে দোষ দিয়ে কোনো লাভ নেই—কারণ নিয়তি হচ্ছে ঈশ্বর স্বয়ং।'

ছেলেটি আবার হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। মিসির আলি বললেন, 'তুমি কিছু বলতে চাইলে বলতে পার।'

ছেলেটি নিচু গলায় বলল, 'আপনি আমার বোনকে বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। আমি আপনার জন্যে উপহার নিয়ে এসেছি।'

'কী উপহার?'

'তা বলব না।'

ছেলেটি খুব হাসতে লাগল। মিসির আলির ঘুম ভেঙে গেল। অন্য যে–কেউ এই স্বপ্নে অভিভূত হত, মিসির আলি হলেন না। কারণ তিনি জানেন, উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনাই স্বপ্ন হিসেবে তাঁর কাছে এসেছে। এর বেশি কিছু না।

গাড়ির ড্রাইভার বলল, 'গান দেব স্যার?' মিসির আলি হ্যাঁ, না কিছু বললেন না। ড্রাইভার গান দিয়ে দিল। মিসির আলি চোখ বন্ধ করে গান শুনতে লাগলেন—

'এস কর স্নান নবধারা জলে
এস নীপবনে ছায়াবীথি তলে . . .'

মিসির আলির মনে হল ধারাজলে স্নানের এই আমন্ত্রণ সবার জন্যে। কিন্তু কেউ তা গ্রহণ করে না, নীপবন থাকে শূন্য ......